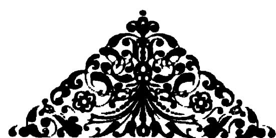


উপন্যাস সমগ্র





উপন্যাস সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী



৫



সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৪

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

সূচী



লালবাঙ্গী



ভূমিকা

'লালবাঈ' ইতিহাস নয়, উপন্যাস। যাঁরা এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এ-বই লেখা হয়নি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বাঙালির নিজস্ব ঘরোয়ানা-সৃষ্টির কাহিনী ও তার জন্মলগ্নকে কেন্দ্র করে এ-উপন্যাস রচিত হয়েছে বলেই প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের তৎকালীন পটভূমি। বিচ্ছিন্নভাবে যা ছিল নিছক বিষ্ণুপুরের কিংবদন্তী, বাংলার ইতিহাসের একটি পর্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক সর্বপ্রথম এই উপন্যাসেই নির্ণীত হয়েছিল সত্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাস রচনার পূর্বে সেই অন্ধকার অধ্যায়ের উপর ঐতিহাসিকদের গবেষণার আলোকপাত ঘটেনি। সে দায়িত্বও ঔপন্যাসিকের নয়। আমার কাছে সাহিত্যের রসসৃষ্টিই ছিল প্রধান, কল্পনার তুলিতে সেই যুগের চিত্রটিকে রক্তেমাংসে সঞ্জীবিত করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। তাই স্থানবিশেষে ইতিহাসকে নির্দয়ভাবে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি। বহু পরবর্তী কালের দু-একটি অপ্রধান চরিত্রকে উপন্যাসের কালপর্বে উপস্থিত করেছি যোগসূত্র দেখানোর প্রয়োজনে। সাহিত্যের ইতিহাসে এ জাতীয় স্বাধীনতা পূর্বজ লেখকরাও গ্রহণ করেছেন। এখানে সমস্ত চরিত্রগুলিকেই পূর্ণতা দিয়েছে কল্পনা, ঘটনাকে হতে হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ, 'লালবাঈ' ইতিহাস নয়, উপন্যাস।

धर्म्मार्थकाममोक्षाणाम् उपदेशसमन्वितम्
पुरावृत्तकथायुक्तं इतिहास प्रचक्षते ॥

ইতিহাসের চেয়ে বিচিত্র উপন্যাস আর নেই। কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, কত নৃশংস হত্যা আর গৌরবময় আত্মত্যাগ, কত রোমাঞ্চকর ঘটনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর অধ্যায় বোধহয় সবচেয়ে চমকপ্রদ। মল্লভূমের রাজধানী বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। মানভূম, বীরভূম, শূরভূম, সেনভূম, বলভূম, সামন্তভূম, শিখরভূম ও তুঙ্গভূম- এই আটটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেদিনের মল্লভূম সাম্রাজ্য, আর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিমল্ল রঘুনাথ। তারপর যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করে এসেছেন মল্লবংশের রাজারা। এই বংশেরই উনবিংশতিতম রাজা জগৎমল্ল প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন বিষ্ণুপুরে। একদিকে খরস্রোত দামোদর আর অন্যদিকে গভীর শালবন, যেন প্রকৃতিই এ রাজ্যকে দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল বহু শতাব্দী ধরে। দিল্লির সিংহাসনে পাঠানশক্তির অবসান ঘটেছে, অভ্যুত্থান হয়েছে মোগলশক্তির ; কত যুদ্ধবিগ্রহ হিংসা হানাহানি ; সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজ্য সেদিনও কোনও বিধর্মী নবাবের আনুগত্য স্বীকার করেনি। দিল্লির কোনও বাদশাহ, গৌড়ের কোনও সুবাদার নবাব কোনওদিন বিষ্ণুপুরের প্রকৃত স্বাধীনতা অপহরণের দুঃসাহস দেখায়নি।

দিল্লির সিংহাসনে যখন বাদশাহ আকবর, তখন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে ছিলেন বীর হাম্বীর। দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারের বাইরে কামানের শ্রেণী গর্জন করে উঠেছিল সেদিন দাউদ খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। দুর্গের উত্তর দিকের পরিখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল দাউদ খাঁর সৈন্যদের মৃতদেহে। বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পরাজয়ের শোণিতরঞ্জিত স্মৃতি বহন করে আজও টিকে আছে সেই পরিখা, বিষ্ণুপুর অধিবাসীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে তার নাম। পরিখা নয়, মুণ্ডমালার ঘাট হয়ে বেঁচে আছে সেই স্মৃতি। তারপরও একটি শতাব্দী পার হয়ে এসে দেখতে পাই, বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন মল্লবংশের রাজা দুর্জন সিংহ। শৌর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীতে, বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। বহু অর্থব্যয়ে মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করলেন দুর্জন সিংহ, কিন্তু

সে-বিগ্রহ একদিন বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গেল। সুতানুটির মিত্র-পরিবারের কাছে গচ্ছিত মদনমোহন বিগ্রহ ফিরিয়ে আনতে পারেননি মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ। যেমন, রঘুনাথ সিংহকে যবনযুবতী লালবাঈয়ের লালসার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি তাঁর পাটরানী চন্দ্রপ্রভা।

লালবাঈ! বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চরিত্র। আর রাজা রঘুনাথ সিংহের নিষিদ্ধ প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন লালবাঁধ।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই লালবাঁধ দীঘি থেকে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান—লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

আজও বোধহয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়; অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্ন প্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, পুবের লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, আর পশ্চিমের যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন যবনকন্যার প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান—এই লালবাঈযের জীবন-কাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে।

ভারতের সিংহাসনে তখন আওরঙ্গজেব বাদশাহ গাজী; বাংলার মসনদে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। উড়িষ্যায় তখনও পাঠানশক্তির ভস্মাবশেষে ধোঁয়া উঠছে থেকে থেকে, ইংরেজ বণিকের দল কুঠির পর কুঠি গড়ছে বাংলায়, বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ জলদস্যু, আর বাংলার পশ্চিম প্রান্তসীমায় কখনো-সখনো এসে পৌঁছচ্ছে বর্গী লুটেরার অত্যাচার।

লালবাঈয়ের জীবনকাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে, বিবিবাজারের মেলায়। কালো বোরখায় শরীর-লুকোনো এক রূপসী বাঁদীর পিছনে পিছনে।

বিবিবাজারের সওদা হয়ে এসেছিল এক দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী, এসে স্বপ্ন দেখেছিল বেগম হওয়ার।

স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন!

আজও পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে একটা করুণ কান্নার সুর শোনা যায়। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সে দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে অনেকে, সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ভয়ে, বিস্ময়ে, অপার্থিব এক পুলকে।

বিবিবাজারের লোকও হঠাৎ সেদিন এমনি ভাবেই চমকে উঠেছিল। প্রথমবার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সুদর্শন আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

বিবিবাজার তখন জমজমাট। সারা ভারতের চতুর্দিক থেকে লোক এসে জমেছে। কেউ এসেছে সওদা বেচতে, কেউ বা সওদা করতে। পুবে বেগমসাহেবার কবর থেকে পশ্চিমের মতিঝিল অবধি সারি সারি তাঁবু। চাঁদনি রাতে মনে হয় যেন ঘাসের গালিচায় সারি সারি সাদা-পালক পায়রা বসে আছে। লোকজনের গুঞ্জরন তো নয়, যেন অবিশ্রান্ত

বকম-বকম।

দূর সিন্ধু উপত্যকা থেকে এক দল বালুচ সওদাগর এসে জটলা পাকিয়েছে একদিকে। আঠারো জোড়া উট বসে বসে পিঠের কুঁজ কাঁপিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আর গনগনে আগুনের ওপর ওলটানো কড়াইয়ের মত বিরাট একখানা তাওয়ায় রুটি সেঁকছে কয়েকজন। কেউ বা উটের দুধ জ্বাল দিচ্ছে।

ওদিকের তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে একজোড়া চোখ উঁকি দিচ্ছিল। বহুক্ষণ থেকে। হাবশি প্রহরীটা পাক দিয়ে গিয়ে আমগাছের আড়াল হতেই কালো বোরখায় সারা শরীর ঢেকে বেরিয়ে এল সে দ্রুত পায়ে। তারপর কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তরতর করে এগিয়ে গেল মতিঝিলের দিকে।

কি একটা শব্দে যেন ফিরে তাকাল হাবশিটা। ছুটে এসে দ্রুত-অপস্রিয়মান কালো বোরখার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কোমরের ছুরিটা তার ঝকঝক করে উঠল জ্যোৎস্নায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সশব্দে খাপে ভরে ফেলল ছুরিটা। বীভৎস হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ।

কিন্তু কালো বোরখার চোখ কিছুই জানতে পারল না। কয়েক পলক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে একটা উটের আড়ালে। নিঃসন্দিগ্ধ হল। না, কেউ বোধহয় লক্ষ করেনি তাকে।

এবার পথ চিনে যেতে পারলেই সে সবকিছু জানতে পারবে।

একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় সে। একটি প্রশ্নের উত্তরেই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

কিন্তু বিবিবাজারে তখনও লোক চলাচল কমেনি। আলো নেবেনি একটিও।

প্রতিটি তাঁবুর সামনে মশাল জ্বলছে দাউ-দাউ করে। আর ওদিকের দোকানে সারি সারি চিরাগ বাতি। আলোয় আলো চতুর্দিক। শুধু মতিঝিলের সড়কের দু'পাশে ঘুমন্ত তাঁবু। মশালের সারি নিবে এসেছে ওদিকে। হট্টগোল যেন একটু কম।

গুনগুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে একটি মধ্যবয়সী বারাঙ্গনা। সুসজ্জিতা স্তিমিত-যৌবনা কোনও মাড়বার-নন্দিনী হয়তো। পোশাকে পরিচ্ছদে ভিন-প্রদেশী বলেই মনে হয়।

কালো বোরখার অচেনা খাতুন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। —শোনো।

ফিরে দাঁড়াল সেই বারাঙ্গনা।

—ফকিরসাহেবের চবুতরাটা কোন দিকে বলতে পারো? ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে সে।

কৌতুকের হাসি ফুটল বারাঙ্গনার মুখে। আপাদমস্তক বোরখার ওপর চোখ বুলিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধে পরা কাচের জলচুড়িগুলো ডান হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলে, কোন ফকিরসাহেব? পেশোয়ারের সুফীবাবা?

—উঁহুঁ। যিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

উত্তর শুনে কৌতুকের হাসি হাসল মা[illegible]র-বারাঙ্গনা।

বললে, জ্যোতিষাচার্য? যিনি কোষ্ঠীবিচার করেন, সামুদ্রিক গণনা জানেন? ওই বাঈজী-তল্লাট পার হয়ে, রাধামাধব মন্দিরের পাশে। বলে পথ দেখিয়ে দিল সে।

কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁক নিল সোনারপট্টির দিকে।

তাঁবু, তাঁবু, আর তাঁবু। কিন্তু এদিকের তাঁবুগুলো আলোয় ঝলমল। কিংখাবের পর্দা ঝুলছে তাঁবুর দরজায়, সামনে সশস্ত্র নজরদার টহল দিচ্ছে। বাতাসে দুলছে রেশমি রং-ঝলমল পর্দা, আর তারই ফাঁকে দেখা যায় কাশ্মীরি গালিচার ওপর স্বর্ণালঙ্কার বিছিয়ে রেখে খরিদ্দারের সঙ্গে দরদস্তুর করছে শেঠের দল। গন্ধকের পোড়া গন্ধ আসছে থেকে

থেকে। সারা ভারত থেকে এসেছে স্বর্ণকারের দল, এই মেলায় বসে খদ্দেরের রুচিমত অলঙ্কার বানিয়ে দিয়ে কয়েকশো মোহর লুটে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। কয়েকটা তাঁবুতে হীরে-জহরতের পসরা সাজানো। সামনে হুঁশিয়ার হাঁকছে বাদশাহি রক্ষী, হাতে তাদের গাদা বন্দুক। বাইরে এক জায়গায় লাঠিয়ালরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের খেয়ালখুশিতে বিশ্বাস নেই হিন্দু বেসাতিদারদের। তাই লাঠিয়ালের দল সঙ্গে এনেছে তারা। রাহাজানি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

হীরে-জহরতের পরেই জীবন্ত জহরতের পসরা। বারোশো বাঈজী আর বারাঙ্গনা আসে বিবিবাজারের এই মেলায়। লক্ষ্ণৌ আর কাশ্মীরের সুরসাধিকা বাঈজী, মাড়বার আর অযোধ্যার রূপসী বারবধূর দল, দক্ষিণী আর আরাকানী কুম্ভক রতিসঙ্গিনী।

মতিঝিলের ওপারে জানোয়ারবাগ। উটের সারি নিয়ে এসেছে বালুচ সওদাগরের দল, মহীশূর থেকে এসেছে হাতির সারি। আরবি সওদাগরের দল এনেছে তেজী ঘোড়া। কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া, মুনিয়া। পশুজগৎকে পণ্য করে নিয়ে এসেছে দেশবিদেশের বণিকেরা।

মতিঝিলের ওপার থেকে হিংস্র পশুর চিৎকার আর কলরব ভেসে আসে মাঝে মাঝে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে অল্পবয়সী বারবনিতার দল। আতর অগুরু, দিলবাহার খুশবু খরিদ করতে করতে চমকে ফিরে তাকায়।

একদল পর্তুগীজ ওদিকে মশলা আর তামাকের দোকান দিয়েছে। তার পাশে ফরাসি বেসাতিদার।

শাল কিংখাব জামদানি জামিয়ার। রেশম আর জহরত। বাঈজী আর বারনারী। সারা ভারতের রাজা-বাদশা, বিলাসী ভূস্বামী আর দস্যুপতি ভুঁইয়ারা ছুটে এসেছে বিবিবাজারে। বিলাসসামগ্রী নিয়ে যাবে শতপত্নীর মনোরঞ্জনের জন্যে, রূপযৌবনের সন্ধান পেলে কেউ বা তুলে নিয়ে যাবে নিজের অন্দরমহলে। ইংরেজের দল এসেছে একরাত্রির আনন্দ লুটে নিয়ে যেতে।

হ্যাঁ, আরেকটা হাট আছে এক প্রান্তে। শুধু বাঈজী আর বারাঙ্গনা নয়, বান্দা আর বাঁদী। যুদ্ধবন্দী আর লুটতরাজ-করে-পাওয়া মেয়ে-পুরুষদের আনা হয় বাঁদীবাজারে নিলামে বেচে দিয়ে যাবার জন্যে। জোয়ান চেহারার বান্দাদের কিনে নিয়ে যায় অনেকে, যুবতী বাঁদীদের নিয়ে যায় বিলাসী বণিকের দল। সাধারণ পণ্যের মতই কয়েকটি মোহরের পরিবর্তে আজীবন স্বত্ব বর্তায় তাদের ওপর।

আজীবন স্বত্ব। জীবনে কত মনিবের লালসার ক্ষুধা মিটিয়ে হাটে হাটে বেচাকেনা হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে। যৌবন আর স্বাস্থ্য অটুট থাকলে হাটে হাটে দর উঠবে তার, কয়েক বছরের মধ্যে বহু মনিবের হাত বদলে অযোধ্যার বাঁদী হয়তো নিজেকে আবিষ্কার করবে আফগান সওদাগরের ঘরে। বার্ধক্যে কেউ পাবে মুক্তি, অর্থাৎ অনাহার মৃত্যু। তবু পাখির মত উড়ে পালাতে ভয় পায় তারা, জানে পলাতকা বাঁদীর একমাত্র দণ্ড দাসব্যবসায়ীর কাফ্রি চরের হাতে মৃত্যু। জানে কোনও বাদশাহি আইন তাকে আশ্রয় দেবে না। কাজীর বিচারে সে শুধুই পণ্য, মনিবের আজ্ঞাধীন।

কালো বোরখার রহস্যময়ী সওদা বেচতে আসেনি, সওদা করতে আসেনি। নিজেই এসেছে বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে।

অন্য এক অভিজ্ঞ বাঁদীর কাছে, মণিবানুর কাছে শুনেছে সে বাঁদী-জীবনের ভবিষ্যৎ। শুনেছে মনিবের নৃশংস অত্যাচার আর কাফ্রি অনুচরদের নির্দয় ব্যবহারের কথা।

তাই ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহে দাসব্যবসায়ীর কড়া নজর ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কালো বোরখার রহস্যময়ী।

আগ্রার হীরাবাঈ তাকে পছন্দ করে গেছে, নব্বই মোহর কিস্মত দিতে স্বীকার করে গেছে নিলামদারকে।

হীরাবাঈ ! সেখানেও কি আছে এমনি নির্দয় হাবশি প্রহরী আর খোজা অনুচর ? কে জানে।

ভবিষ্যৎ জানার উৎসুক আগ্রহে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সে বাঈ-তল্লাট পার হয়ে।

বারবনিতাদের পল্লী থেকে বীভৎস হাসি ভেসে আসছে মদ্যপ কামচারীদের। উগ্র আতরের গন্ধ আর ঝুমঝুম ঝুমঝুম নাচের তালে তালে সুকণ্ঠ সঙ্গীত ভেসে আসছে কোনও এক কাঞ্চনীর তাঁবু থেকে। বাঈজী নয়, কাঞ্চনী। কাঞ্চনের মতোই তাদের রূপের জলুস, কাঞ্চনই তাদের ক্ষণিক বিশ্রম্ভের মূল্য।

কালো-বোরখা উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে চকিতে চেয়ে দেখলে একবার। চোখ-ঝলসানো রূপযৌবন আর দুর্মূল্য বেশবাস। ঘুঙুরের তালে তালে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ।

দ্রুত পায়ে তাঁবুটা পার হতেই রাধামাধবের মন্দিরটা চোখে পড়ল তার। একটা গাছের ঈষৎ অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল।

হ্যাঁ, ইনিই সেই ফকিরসাহেব। একটা বেদির ওপর বসে আছেন, আর চতুর্দিকে অসংখ্য নারীপুরুষ। গ্রাম্যচাষী, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, রূপজীবিনী।

জ্যোতিষাচার্যের পাশে পুঁথিপত্র, সামনে খড়ি দিয়ে আঁকা পতাকীচক্র। একজন শ্রেষ্ঠীর কোষ্ঠীবিচার করছিলেন গণৎকার। তাঁর পিছনে দু'টি মশাল জ্বলছে দাউদাউ করে। সামনে কর্পূর-প্রদীপ।

কালো বোরখার রহস্যময়ী গাছের আড়াল থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তন্ময় হয়ে।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠল সকলে। বকের পালকের মত সাদা ধবধবে একটি আরবি ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে এদিকে।

প্রথমবার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সকলে চমকে উঠল আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

কে এই সুদর্শন তরুণ ! সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান কি সে জানে না ? বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইল সেদিকে।

ভয়ে চিৎকার করে পথ ছেড়ে দাঁড়াল বারাঙ্গনা-পল্লীর মেয়েপুরুষ। মুসলমান বাদশাহি রক্ষীর দল পরস্পর কানাকানি করল, কে এই তরুণ ? চেহারা দেখে কাফের বলেই মনে হয়, কিন্তু ও কি জানে না, সম্রাট আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছেন, কোনও হিন্দু কাফের দামি ঘোড়ায় চড়তে পাবে না ? জানে না, হাতি, পালকি আর মূল্যবান ঘোড়া শুধু বাদশাহের অনুগতদের জন্যে ?

তবু কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পেল না তারা।

ক্রমশ সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার কাছে এগিয়ে এল, একেবারে জ্যোতিষাচার্যের চবুতরার কাছে। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সকলে। বেশবাস আর তার সুপুরুষ চেহারা দেখেই বুঝল, কোনও রাজবংশের রক্ত বইছে তার ধমনীতে।

চবুতরার সামনে এসে লাফিয়ে মাটিতে নামল সাদা ঘোড়ার সওয়ার।

জ্যোতিষাচার্যও উঠে দাঁড়ালেন। সস্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হল তাঁর মুখ। —রঘুনাথ, তুমি এখানে ?

রঘুনাথ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে আলিঙ্গন করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, বোসো রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবারের সংবাদ জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি আমি। কি সংবাদ, বলো।

রঘুনাথ মৃদু হেসে বললে, আপনার সন্ধানেই এসেছি গুরুদেব, বিষ্ণুপুর যাবার আমন্ত্রণ জানাতে।

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই বোধ হয় অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, অপেক্ষা করো রঘুনাথ।

তারপর ইঙ্গিতে বিদায় নিতে বললেন জনতাকে।

একে একে সকলেই বিদায় নিল। কিন্তু কালো বোরখার রহস্যময়ী তখনও দাঁড়িয়ে রইল গাছের আড়ালে। না, ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহেই নয়। সুদর্শন যুবকটির আকর্ষণে। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ। রূপের ? যৌবনের ? না, অদৃষ্টের ?

ধীরে ধীরে মোহগ্রস্তের মত এগিয়ে গেল সে। সুমধুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল বোরখার ভেতর থেকে। —ফকিরসাহেব !

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন জ্যোতিষাচার্য। আর রঘুনাথের চোখ পড়ল গারারার নীচে দুটি সুন্দর পায়ের ওপর। সুশুভ্র পায়ে কালো বান্দাছাপ দেখে শিউরে উঠল রঘুনাথ।

—কি চাও মা ? জ্যোতিষাচার্য প্রশ্ন করলেন সস্নেহে।

উত্তর এল, নসিব জানতে চাই ফকিরসাহেব।

—বোসো। তোমার করকোষ্ঠী দেখাও মা।

—কিন্তু আমি নজরানা দিতে পারব না ফকিরসাহেব। দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র আমি, বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছি।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন। বললেন, ভয় নেই মা, বিনা দক্ষিণাতেই তোমার করকোষ্ঠী বিচার করব আমি।

—মেহেরবানি আপনার। উত্তর এল মৃদুস্বরে।

সঙ্গে সঙ্গে বোরখার ভেতর থেকে একটি সুডোল সুন্দর হাত বেরিয়ে এল। আর সুমিষ্ট কণ্ঠের অনুরোধ এল, আমাকে স্পর্শ করবেন না ফকিরসাহেব, আমি দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে !

জ্যোতিষাচার্যের কানে গেল না তার কথা, তন্ময় নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর ঝুঁকে পড়ল পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর করপুটের ওপর। বিস্ময় আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল তাঁর মুখে-চোখে। যবনকন্যার কররেখার দিকে মাথা নুয়ে পড়ল তাঁর, লক্ষ করলেন না কালো বোরখার আড়াল থেকে দুটি মোহগ্রস্ত চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রূপবান রঘুনাথের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুললেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, রঘুনাথ, এমন অদ্ভুত কররেখা আমি কখনও দেখিনি।

আর যবনকন্যার উদ্দেশে বললেন, তুমি তো বিধবা নও মা।

—না ফকিরসাহেব, বেওয়া নই আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, জীবনে কোনওদিন তুমি বিধবা হবে না মা।

—শাদি ?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, বিবাহের কথা জানতে চেয়ো না কন্যা।

—ফকিরসাহেব, বাঁদীবাজার থেকে লুকিয়ে এসেছি আপনার কাছে শুধু এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায়। হতাশার স্বর ফুটে উঠল বাঁদীর কণ্ঠস্বরে।

জ্যোতিষাচার্য বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, লগ্নের সপ্তমে বহু পাপ-গ্রহদৃষ্ট শনি রয়েছে কন্যা,

তোমাকে আজীবন অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু, কিন্তু একটি অদ্ভুত রেখা রয়েছে শুক্রের স্থানে, তুমি...

হঠাৎ চুপ করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, তোমার ললাটের রেখা না দেখলে তো বলা যাবে না কন্যা। যদি আপত্তি না থাকে...

—না ফকিরসাহেব, আপত্তি নেই। শুধু হাবশি নজরদারের চোখ ফাঁকি দেবার জন্যেই বোরখায় মুখ ঢেকেছি আমি।

মুখের ওপর থেকে দুটি সুন্দর হাতে বোরখা তুলে ধরল বাঁদী। রঘুনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাঁদীর মুখের দিকে। এও কি সম্ভব! বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছে এই যবনকন্যা? এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অদৃষ্টে আছে শুধুই দাসীবৃত্তি? এ তিলোত্তমা কি করে সম্ভব হল দরিদ্র যবনের ঘরে? এ যে উর্বশীর যৌবন তার শরীরের ছন্দে!

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল রঘুনাথ।

আর বাঁদীর ললাট-লিখন পরীক্ষা করতে করতে জ্যোতিষাচার্য বললেন, তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একদিন একটি রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি! কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শিউরে উঠল বাঁদী। উঠে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষাচার্যকে কুর্নিশ করল সসম্মানে, তারপর পুনরায় বোরখায় মুখ ঢেকে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল বাঁদীবাজারের পথে।

রঘুনাথ তখনও অনিমেষ নয়নে অপস্রিয়মান বাঁদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

—মিথ্যা ঔৎসুক্য দেখিয়ো না রঘুনাথ। জ্যোতিষাচার্য গুরুগম্ভীর স্বরে সাবধান করলেন।

লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাল রঘুনাথ। তারপর জ্যোতিষাচার্যকে বিষ্ণুপুর প্রাসাদে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সাদা ঘোড়ার সওয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

দুই

বিবিবাজার! এ নাম বহুবার শুনেছে লালী। স্বপ্ন দেখেছে বিষণ্ণ বিকেলের দীঘির ঘাটে বসে বসে, যেন এক অচেনা নবাবজাদা ঘোড়সওয়ার হয়ে এসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তুলে নিয়ে গেছে তাকে, বেগমের তক্তে বসিয়েছে।

তারপর আবদার ধরেছে লালী, বিবিবাজারের হাটে যাবার।

তা শুনে রাজি হয়েছে নবাবজাদা, আদেশ দিয়েছে বিবিবাজারে একটা দিন হবে মিনাবাজার! দেশবিদেশের মেয়েরা এসে হাট বসাবে সেদিন, সওদা বেচবে, সওদা করবে শুধু মেয়েরা। কত দেশের রানী আর রাজকন্যা, শাহাজাদী আর বেগমসাহেবা। আর সকলের কৌতূহলী চোখের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেসে হেসে হেলে-দুলে ঘুরে বেড়াবে লালী। এক দোকান থেকে আরেক দোকানে। রাজ্যের যত হীরে-জহরত, জামিয়ার জামদানি, শাল আর মসলিনের ওড়না, সব কিনবে সে।

সে স্বপ্ন যে এমন ভাবে সার্থক হবে, কে ভেবেছিল।

ঠগী ডাকাতের অত্যাচারের কথা শুনেই এসেছিল এতদিন। জমিদারের ঘরে বান্দা আর বাঁদীও দেখেছে, কিন্তু তারা যে এমন জানোয়ারের মত হাটে বেচাকেনা হয়, আগে কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

রহিমগঞ্জের পীরের দরগায় মানত করতে এসেছিল লালীর মা, লালীকে সঙ্গে নিয়ে। দূর-দূর গ্রাম থেকে কত লোকই তো এসেছিল। চলছিল গরুর গাড়ির সারি। কখন রাত নেমে এসেছে খেয়ালই হয়নি। গল্পগুজবে মেতে গিয়েছিল সবাই।

হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করে চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল ঠগী লুটেরার দল। বাধা দিতে গিয়ে পুরুষগুলো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, লাঠির বাড়ি খেয়ে। সোনাদানা, মালপত্র যা-কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়ে তাদের দলকে-দল চালান দিয়ে দিল বজরায়। শুধু ছাড়া পেল অথর্ব বুড়োবুড়িরা।

রায়ের ঘাট থেকে চম্পারনের কুঠি, চম্পারন থেকে বিবিবাজার। খোজা সর্দারের হাত বদলে এই বিবিবাজারের মেলায়।

হিন্দু কাফেরদের ওপর জিজিয়া বসানোর খবর শুনে খুশি হয়েছিল লালী, গ্রামের অন্য সব মুসলমানদের মতই। আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ গাজী যেদিন ফরমান দিল : কোনও কাফের হাতিতে চড়তে পাবে না, পালকি ব্যবহার করতে পাবে না, দামি ঘোড়ায় চড়তে পাবে না—সেদিন অন্য সকলের মত লালীও খুশি হয়েছিল। কিন্তু বাঁদীবাজারে এসে সব ভুল ভেঙে গেল। হিন্দু আর মুসলমান নয়। শুধু দুটি ধর্ম, ধনী আর দরিদ্র।

তা না হলে মুসলমান ঠগীর হাতে লুঠ হল কেন তাদের সর্বস্ব, মুসলমান নিলামদার কেন কিনে নিল তাদের, চম্পারনের কুঠি থেকে।

আর এই হাবশি প্রহরী, সেও তো মুসলমান। তবে কেন এমন অমানুষিক অত্যাচার করে সে বান্দা আর বাঁদীদের ওপর।

বান্দাছাপের দিনটার কথা মনে পড়ল তার, জ্যোতিষাচার্যের চবুতরা থেকে ভীতত্রস্ত পায়ে বাঁদী-ছাউনির দিকে ফিরে আসতে আসতে।

সারি সারি তাঁবু আর হোগলার ছাউনি। হাজার হাজার বান্দা আর বাঁদী। একদিকে হিন্দু, আরেকদিকে মুসলমান। কেউ এসেছে যুদ্ধবন্দী হয়ে, জয়ী যোদ্ধার লুটের মাল হিসাবে, কেউ বা চালান এসেছে ঠগীদের বজরায়। সব এসে মিলেছে একই নিলামদারের হাতে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে, খরিদ্দার এসে নেড়েচেড়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, দরদস্তুর করে চলে যায়। দু-চারজন দু-চারজন করে চলে যায় নতুন মনিবের সঙ্গে।

দুনিয়ায় এত রকম চেহারা আছে জানত না লালী। জানত না, পুরুষের চেয়ে খোজাদের দাম বেশি। জানত না, বাঁদীদের রূপ-যৌবনের চেয়ে কৌমার্যের দাম দ্বিগুণ।

নিলামদারের খাস বান্দা খোজাগুলোর চোখ দেখলেও ভয় হয় লালীর। বান্দাছাপের দিনটা মনে পড়লে ভয়ে আঁতকে ওঠে ও।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সকলে, আর সামনের একটা জ্বলন্ত চুল্লিতে একরাশ লোহার শিক গরম হয়ে উঠছিল। তারপর একে একে প্রত্যেকের পায়ে হাবশিটা বান্দাছাপ লাগিয়ে দিচ্ছিল। উত্তপ্ত লোহার শলাকা ছুঁইয়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিল সকলে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কয়েকজন। লালীও।

জ্ঞান হয়ে দেখেছিল, শুধু পায়েই নয়, হাতের বাজুতেও উল্কি এঁকে দিয়েছে কে।

বান্দাছাপ !

মণিবানু বলেছিল, এ ছাপ আর কোনওদিন মুছবে না লালী। পালিয়ে গেলেও বাদশার আইন ধরে নিয়ে এসে ফিরিয়ে দেবে মালিকের কাছে। আর নয়তো নিলামদারের চর ছুরি বসাবে বুকে।

এই বীভৎস ভবিষ্যতে কোনও আশার আলো দেখতে পাবে ভেবেই ফকিরসাহেবের

খোঁজে বেরিয়েছিল লালী, অন্য বাঁদীর বোরখা ধার নিয়ে।

কিন্তু কি অদ্ভুত কথাই না বললেন ফকিরসাহেব। "অনূঢ়া" শব্দটা এই প্রথম শুনল লালী, তবু অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। শাদি নয়, সব বাঁদীর মতই তাকেও হয়তো শরীর বেচতে হবে।

মণিবানুর কথাটা মনে পড়ল লালীর।

—এক মনিব শাদির সামিল, লালী। মণিবানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল। বলেছিল, বাঁদী হয়েও মনিব-বদল হবে না এমন সৌভাগ্য কার হয়! সুরত বদলালেই অন্য মনিবের কাছে বেচে দেবে, আর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে, কিংবা অকর্মণ্য হয়ে গেলে বলবে, মুক্তি দিলাম।

মুক্তি অর্থাৎ মৃত্যু।

তার চেয়ে সত্যিই যদি আগ্রার হীরাবাঈ তাকে কিনে নিয়ে যায়!

নব্বই মোহর দর দিয়ে গেছে হীরাবাঈ! নব্বই মোহর! এত দাম দিয়ে বাঁদী কেনে না কেউ, মণিবানুর কাছে শুনেছে লালী।

তবু লোভ যায়নি নিলামদারের। লালী রূপসী। লালী কুমারী। কৌমার্যের মূল্য নাকি আরও অনেক বেশি।

অনিশ্চিত ভাবনায় তন্ময় হয়ে পথ চলছিল লালী। কোনও দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাঁদী-ছাউনির কাছে পৌঁছে গেছে সে ততক্ষণে। চকিত চোখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে তাঁবুর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে বোরখায় টান পড়ল।

চট্ করে ফিরে দাঁড়াল সে।

সেই হাবশি প্রহরী! মসিকৃষ্ণ দৈত্যের মত চেহারাটা দুহাতে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে আনল তাকে, মুখে তার বীভৎস লোলুপ হাসি। বাধা দিতে চেষ্টা করল লালী, কিন্তু দৈত্যের শক্তির কাছে অবশ হয়ে গেল তারা সারা শরীর।

এক টানে বোরখা ছিঁড়ে ফেলল হাবশিটা। তারপর দু'টি কামার্ত হাতের পীড়নে বুকের কাছে টেনে নিল লালীকে। তার অবশ শরীরকে দু'হাতে তুলে নিয়ে অন্ধকারের দিকে পা বাড়াল হাবশি প্রহরী।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লালী।

মুহূর্তের মধ্যে একটা হট্টগোল শোনা গেল।

বাঁদী-ছাউনি থেকে ছুটে এল নিলামদার, খোজা বান্দার দল।

নিলামদারের গম্ভীর ডাক শুনে আলিঙ্গন শিথিল করে দিল হাবশি। ছিটকে দূরে সরে এল লালী।

নিলামদার ইশারায় কি যেন বলল খোজা বান্দাদের উদ্দেশে, পরক্ষণেই লোহার শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল তারা হাবশিটাকে। তারপর চাবুকের পর চাবুক পড়ল তার পিঠে। রক্তের রেখা ফুটে উঠল ক্রমে ক্রমে। তবু এতটুকু কাতরোক্তি শোনা গেল না।

নিলামদার বাঁধন খুলে দিতে বলল।

আর তার বাঁধন খুলে দিতেই লালী সেদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল।

একটা ক্রূর কুটিল হাসি ফুটে উঠল হাবশির মুখে। তর্জনী তুলে শুধু একবার শাসাল সে লালীকে।

মণিবানুকে জড়িয়ে ধরে তাঁবুর ভেতর ছুটে পালাল লালী।

তিন

হীরাবাঈয়ের তাঁবুতে তখন ঘুঙুর বেজে চলেছে অবিরাম ছন্দে। মোহরের পর মোহর ঝরে পড়ছে সোনার রেকাবিতে। আসমানি ওড়নার গায়ে সল্‌মা আর চুমকি চমক দেয়। ওড়না নয়, যেন নীল আসমানের গায়ে তারার ঝিকিমিকি। নারেঙ্গি রঙের আঙিয়ার গায়ে কাশ্মীরি কঙ্কার ছন্দ নাচে যৌবন-অঙ্গের তালে তালে। সুর্মাচোখের হঠাৎ-হাতছানি লোভ জাগায়। রক্ত নাচায়। নাচের ঘূর্ণি ওঠে হীরাবাঈয়ের চঞ্চল পায়ে, ঘুঙুরের বোল ফোটে ঝুমুরঝুম ঝুমুরঝুম। কোকিলকণ্ঠ গজল গানের রেশ নেশা ছড়ায় সুরাবিভোর চোখে।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম লাল মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন হীরাবাঈয়ের লঘুছন্দ শরীরের দিকে। হাতে গজদন্তের কারুকার্য করা ফরসির নল।

তামাকে আতরের ছিটে দিয়ে সরে গেল হুঁকাবরদার। হীরাবাঈয়ের খাস বাঁদীর ইশারায় সোনার রেকাবিতে এল বাগদাদি সুরার পানপাত্র।

মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের চোখ জুড়ে আসছে তখন। বামন চেহারার ভাঁড়টা তালে তালে বিচিত্র ভঙ্গি করছে।

—অ্যাই! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল শোভা সিংহ।

তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে অস্ফুটে বলল, কমবখ্‌ত্‌!

সারেঙ্গীর সুরের মূর্ছনা আর নাচের ঘূর্ণি হঠাৎ থেমে পড়ল।

শোভা সিংহের কাছে এসে বসল হীরাবাঈ। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বললে, আমার ইনাম, রাজাবাহাদুর!

—রাজাবাহাদুর? হো-হো করে হেসে উঠলেন বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম।

নিজেই যাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলেন হীরাবাঈয়ের জলসায়, সেই শোভা সিংহ কিনা রাজাবাহাদুর! সামান্য ভূমিপতি হল রাজাবাহাদুর, রাজা কৃষ্ণরাম সামনে বসে থাকতে!

হীরাবাঈ অপাঙ্গে তাকিয়ে একটা মধুর কটাক্ষ হানলে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দিকে।

বললে, আপনার কাছে আর কি ইনাম চাইব মহারাজবাহাদুর, আপনি এসেছেন এ গরিবখানায়, এই তো ইনাম।

খুশির হাসি ফুটল কৃষ্ণরামের চোখে।

রাজা কৃষ্ণরামকে মহারাজবাহাদুর বলেছে বাঈজী। শোভা সিংহকে বলুক রাজাবাহাদুর।

নেশার চোখে হাত তুলে কৃষ্ণরাম অস্ফুটে বললেন, জহুরি বুলাও।

জহুরি বোধহয় হাজির ছিল পর্দার আড়ালে।

আখরোট-কাঠের পেটিটা নিয়ে এসে সামনে রাখল সে। তারপর সেটা খুলে ফেলতেই ঝাড়লণ্ঠনের তীব্র আলোয় ঝলমল করে উঠল হীরে-পান্নার সুন্দর একটি চন্দ্রহার।

হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রইল শোভা সিংহ, তারপর হীরাবাঈয়ের কটি ঘিরে পরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ঠিক হায়, এই নাও ইনাম।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার! বলে ইশারা করলেন জহুরিকে।

জহুরি ছুটে গেল।

কৃষ্ণরাম বললেন, ও হার আমার, আমি ইনাম দেব হীরাকে। হীরাকে হীরা ইনাম দেব।

জহুরি হেসে বললে, তা হলে নিলাম হোক হুজুর।

—হ্যাঁ, নিলাম! শোভা সিংহ তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বললে।

রাজা কৃষ্ণরাম ঘাড় নেড়ে বললেন, কায়েম! বলে সোনার রেকাবিতে পাঁচটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন খাজাঞ্চির হাত থেকে মোহরের থলিটা কাছে টেনে নিয়ে।

দশটা মোহর ছুঁড়ে দিলে শোভা সিংহ।

একটি মোহর একশো মোহরের প্রতিশ্রুতি। রাজ্যে ফিরে গিয়ে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবার বাক্‌দান। কিন্তু নিলামের নেশায় তখন দুজনেই বেহুঁশ হয়ে গেছে। নিলামের দর উঠছে তো উঠছেই।

রেশমি থলি থেকে এক মুঠো মোহর বের করে ছুঁড়ে দিলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

শোভা সিংহ ছুঁড়ে দিলে সমস্ত থলিটাই।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

ডাক ছাড়লেন, জামিন!

নেশা ছেড়ে গেল শোভা সিংহের। অপমানে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এত বড় অপমান? শোভা সিংহকে জামিন দিতে হবে কোনও শ্রেষ্ঠী এনে? মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের প্রতিশ্রুতিই কি জামিন নয়?

হীরাবাঈ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

—হীরা কি কসুর করল রাজাবাহাদুর!

—কসুর? ক্রোধান্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক ঝট্‌কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল শোভা সিংহ।

আর হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম। সে হাসি জ্বালা ধরিয়ে দিল শোভা সিংহের সর্বাঙ্গে। প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নিতে হবে এ অপমানের।

বিবিবাজার ছেড়ে ঘোড়া ছুটল। মেদিনীপুর নয়, উড়িষ্যার পথে। রহিম খাঁ। শোভা সিংহ মনে মনে বললে, পাঠান রহিম খাঁ আমার বন্ধু, মোগলের দাস রাজা কৃষ্ণরামকে এ অপমানের মূল্য দিতে হবে একদিন।

শোভা সিংহ যখন ঘোড়া ছুটিয়ে উড়িষ্যার পথে চলেছে, তখন বিষ্ণুপুরের যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ তার সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দামোদরের তীর ঘেঁসে চলেছে বন-বিষ্ণুপুরের পথে।

ক্ষণিকের জন্যে দেখা রূপসী মুসলমানীকে কিছুতেই যেন মন থেকে দূর করতে পারছে না রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে লোভ জেগে ওঠে, বাঁদীবাজারে ফিরে গিয়ে কালো বোরখার তিলোত্তমাকে কিনে আনতে ইচ্ছে হয়।

পরমুহূর্তে লোভ দমন করতে হয়। বিধর্মী নারীর প্রতি লোভ বিষ্ণুপুরের যুবরাজের পক্ষে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। রঘুনাথ নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যিই কি অন্যায়? বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বিষ্ণুপুরের কাছে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে, মানুষকে মানুষ বলেই জেনেছে রঘুনাথ। শ্রীচৈতন্যদেব তো যবনকে শিষ্যত্ব দিতে অস্বীকার করেননি। আর মদনমোহনের কাছে প্রেমই সারবস্তু, প্রেমই সত্য।

তবে কি বিবিবাজারের অনিন্দ্যসুন্দরী এক বাঁদীর প্রেমে আবদ্ধ হল রঘুনাথ?

অপরিচিতা এক রূপসীর কথা ভাবতে ভাবতেই মোহগ্রস্তের মত ছুটে চলেছিল রঘুনাথ। অকস্মাৎ চোখে পড়ল, এক সারি রাজহাঁস তীব্র গতিতে ভেসে চলেছে খরস্রোত দামোদরের বুকে।

পথিমধ্যে এক পান্থশালায় রাত্রিযাপন করে ফিরে চলেছে রঘুনাথ। পিতা দুর্জন সিংহ

অসুস্থ, বিষ্ণুপুরে পৌঁছতে হবে অবিলম্বে।

ঘোড়ার গতিবেগ তাই বাড়িয়ে দিল। স্পষ্ট হয়ে উঠল রাজহাঁসের দল। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখল, রাজহংস নয়, এক বহর বজরা ভেসে চলেছে সুশুভ্র পাল তুলে। দেখল, একটি সুসজ্জিত মধুকরকে কেন্দ্র করে চলেছে রাজবল্লভ, সমুদ্রফেন আর শঙ্খচূড়। তারও সামনে কয়েকটি বালাম, সারেঙ্গা, আর স্লুপ। মধুকরের কাহনে রং-ঝলমল গালিচা পাতা, গুদস্তা আর ইসকায় রুপোর পাত। আর পালের গায়ে বর্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্ন।

কৃষ্ণরাম তখন গল্প শুনছিলেন আলাপনীর কাছে। বিবিবাজারে কেনা পণ্যসামগ্রীতে বোঝাই হয়ে চলেছে তাঁর নৌকার সারি। মনের ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল গতরাত্রির তুচ্ছ কলহ। হীরাবাঈয়ের জলসার অঘটন।

মধুকরের ওপর থেকে অন্যমনস্কভাবে তীরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ কৃষ্ণরাম দেখতে পেলেন সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে। দূর থেকে আরোহীকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু মোগলরাজ্যের বুকের ওপর এই দুর্মূল্য আরবি ঘোড়ায় চড়ার দুঃসাহস যার, তাকে যবন বলে মনে হল না। বেশবাস দেখে স্বধর্মী বঙ্গবাসী বলেই মনে হল তাঁর।

আলাপনী এতক্ষণ লক্ষ করেনি, কৃষ্ণরামের মন তার কাহিনীর সূত্র হারিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সাদা ঘোড়ার সওয়ারের দিকে।

হঠাৎ রাজা কৃষ্ণরামের বিস্মিত চোখে চোখ পড়তেই গল্প থামাল আলাপনী। নিজের মনেই কি এতক্ষণ গল্প বলে চলেছিল সে ? কৃষ্ণরাম শুনছেন না তার কাহিনী ?

আহত চোখ তুলে আবার তাকাল সে। গল্প-বলার চাতুর্যের জন্যে তার খ্যাতি দেশব্যাপী। ত্রিপুরারাজের আমন্ত্রণে গিয়ে কৃষ্ণরাম রাজদরবারে দেখা পেয়েছিলেন তার, এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মুখে কাহিনী শুনে যে, নিজের দরবারের সম্পদ বাড়িয়েছিলেন তাকে ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে উপহার চেয়ে। কাশীর মাঘোৎসবে সারা ভারতের রাজপরিবার থেকে এসেছিল দক্ষ আলাপনীর দল। তাদের মধ্যে গল্প-বলার অপূর্ব চাতুর্যের জন্যে যার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে দেশে, ঘন্টার পর ঘণ্টা যে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখত, সেই আলাপনীর কাহিনীর সূত্র হারিয়ে কৃষ্ণরাম বিস্মিত চোখে কার দিকে তাকিয়ে আছেন ?

গল্প থামাতেই কৃষ্ণরামের তন্ময়তা ভাঙল। বললেন, কাদম্বরী, সওয়ারকে দেখে হিন্দু মনে হয় যেন ?

কাদম্বরী সায় দিল তাঁর কথায়—হ্যাঁ, মহারাজ !

কৃষ্ণরাম বললেন, বহরদারকে বলো, ওঁকে আমার মধুকরে আমন্ত্রণ জানাতে।

কাদম্বরী উঠে এসে হুকুম জানাল বহরদারকে, যার তত্ত্বাবধানে চলছিল সমগ্র নৌবহর।

সঙ্গে সঙ্গে বহরদারের হুকুমে একটা বালাম ছুটল তীরের দিকে। আর ঘাটে এসে নোঙর ফেলল কৃষ্ণরামের মধুকর।

তীর থেকে মধুকরে উঠে এল রঘুনাথ, কৃষ্ণরামের আমন্ত্রণে। কাদম্বরী সসম্মানে অভিবাদন করে রঘুনাথকে কৃষ্ণরামের কাছে নিয়ে গেল।

পরিচয় পেয়ে রঘুনাথকে পাশে বসালেন কৃষ্ণরাম।

তারপর সুরার পাত্র এগিয়ে দিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর সহাস্যে বিবৃত করলেন শোভা সিংহের ঔদ্ধত্য।

বললেন, উচ্চাশার কোনও সীমা নেই রঘুনাথ। মেদিনীপুরের সামান্য ভূমিপতি শোভা সিংহ রাজা হবার স্বপ্ন দেখে। জহরতের নিলাম ডাকে রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

মনে মনে হাসল রঘুনাথ, কাদম্বরী কৃষ্ণরামকে মহারাজ সম্বোধন করেছে এবং তিনি তা স্বীকার করছেন দেখে। বর্ধমানরাজও আদৌ মহারাজ নন। তবু রঘুনাথ বিচলিত বোধ করল বিবিবাজারে হীরাবাঈয়ের মুজরার ঘটনা শুনে।

বিবিবাজারের ইতিহাসও তো এমনি এক ঘটনা থেকেই।

দায়ুদ খাঁ ফিরছিলেন আগ্রা থেকে। পালকিতে ছিল তাঁর বেগম। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে। সামনে পিছনে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ গতিবেগ থামল পালকির। লাগাম টেনে ধরতে হল দায়ুদ খাঁকে।

সামনের পথ রোধ করে চলেছেন অযোধ্যার নবাব। হাতির পিঠে চড়ে ছত্রের মেলায় চলেছেন তিনি।

বেগম উষ্মা প্রকাশ করল বাঁদীর কাছে, বাঁদী জানাল, মালিকা বেগম রুষ্ট হয়েছেন, জানতে চান তিনি, কার এমন দুঃসাহস যে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়!

আত্মাভিমানে আঘাত লাগল দায়ুদ খাঁর। জেদের বশবর্তী হয়ে বললেন, পালকি ঘোরাও। ছত্রের মেলায় যাব আমরাও।

সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে গেল। ছত্রের মেলায় যত হাতি এসেছে সব কিনে ফেললেন দায়ুদ খাঁ।

সে খবর শুনলেন অযোধ্যার নবাব। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। পাঠান দায়ুদ খাঁ কিনবে ছত্রের হাতি? নিলামদারকে ডেকে বললেন, দায়ুদ খাঁ যেন একটা হাতিও কিনতে না পায়।

নিলামদারের রেকাবিতে সেদিনও এমনি মোহরের পর মোহর জমেছিল। কিন্তু অযোধ্যার নবাবের কাছে হার মেনেছিলেন দায়ুদ খাঁ।

অপমানে রাগে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

এসে পত্তন করেছিলেন বিবিবাজার। অথচ সেই বিবিবাজারই চলে গেল আলমগীরের রাজত্বে। পাঠান দায়ুদ খাঁর সাম্রাজ্য সঙ্কীর্ণ হতে হতে কোনও রকমে টিকে রইল শুধু উড়িষ্যায়।

তাই রঘুনাথ বললে, অহঙ্কারের পতন অনিবার্য, দায়ুদ খাঁর মত শোভা সিংহকেও নিঃস্ব হতে হবে একদিন।

কৃষ্ণরাম বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন, তা নয় রঘুনাথ। আমি ভাবছি বাংলার কথা। সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বিষ্ণুপুরই চিরকাল স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর-সবই মোগলের পদানত। মোগল বাদশার অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওদিকে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার, এদিকে মোগলের। এ সময়ে সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যথাসাধ্য মোগল অত্যাচারও কমাতে হবে সদ্ভাবের সুযোগ নিয়ে। এ সময়ে যদি শোভা সিংহ বিদ্রোহ করে...

—বিদ্রোহ? চমকে উঠল রঘুনাথ।

কৃষ্ণরাম বললেন, হ্যাঁ রঘুনাথ, আমি খবর পেয়েছি শোভা সিংহ বিবিবাজার থেকে উড়িষ্যার পথে চলেছে। সম্ভবত রহিম খাঁর সন্ধানে। পাঠান রহিম খাঁ মোগলের শত্রু, তার শিবিরের দিকে চলেছে শোভা সিংহ। কিন্তু একজন হিন্দু ভূমিপতিও যদি বিদ্রোহ করে, তা হলে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার বেড়ে যাবে, আর শায়েস্তা খাঁ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে আসবে চট্টগাঁ থেকে।

রঘুনাথ হেসে বললে, চট্টগাঁ? চট্টগাঁ অধিকার করেছে শায়েস্তা খাঁ। খবর পেয়েছি,

চট্টগাঁ এখন ইসলামাবাদ। পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুরা বিতাড়িত হয়েছে সেখান থেকে।

কৃষ্ণরাম বললেন, সত্য হলে শুভসংবাদ। হিংস্র পশুর অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে বাংলার সীমান্তবাসীরা। কিন্তু এ সাফল্য সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে রঘুনাথ, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে বাংলার হিন্দু প্রজার ওপর শায়েস্তা খাঁর সমস্ত নৃশংসতা নেমে আসবে।

রঘুনাথ হেসে বললে, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে সে-বিদ্রোহ দমনের ভার নিলাম আমি, রাজা কৃষ্ণরাম।

তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করল রঘুনাথ।

চার

প্রয়োজন হলে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞা করল রঘুনাথ, তারপর কৃষ্ণরামের মধুকর থেকে বিদায় নিয়ে বিষ্ণুপুরের পথ ধরল।

নিয়তি হয়তো গোপনে হাসল রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা শুনে।

শৌর্য আর সত্যাশ্রয়ের আদর্শে গড়ে উঠেছে রঘুনাথ, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সতর্কে পদক্ষেপ করার কথা তাই উদয় হল না তার মনে। যুক্তি নয়, হৃদয়ের ইচ্ছাই তাকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করল।

অনুশোচনা হল না তার জন্য, খুশি মনেই বিষ্ণুপুরের পথে পুনরায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দুপাশে শাল শিমুলের ঘন অরণ্য ভেদ করে শাহি সড়কের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল রঘুনাথের ঘোড়া। ক্রমশ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হল খরস্রোত দামোদরের স্থিরবিদ্যুৎ। রজতাভ এক প্রাগৈতিহাসিক অজগরের মতো মনে হল দূরের দামোদরকে। শাহি সড়কের দুপাশে শাল শিমুলের ঘন সবুজ অরণ্যে যেন উজ্জ্বল বসন্তের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাম্রাভ পাতায় ছেয়ে গেছে বন-বনান্ত। আর গোধূলি-সন্ধ্যার আকাশের গায়ে ছোঁয়া লেগেছে সেই কুসুমাগ্নির। হয়তো বা রঘুনাথের মনের যৌবনেও।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল সেই রূপসী বাঁদীর মুখখানি শুধু বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, গুনগুন সুর তোলে।

—মিথ্যা ঔৎসুক্য দেখিয়ো না রঘুনাথ।

জ্যোতিষাচার্য সাবধান করে দিতেই লজ্জায় অপ্রতিভ রঘুনাথের মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল। লাল মেঘ নয়, আকাশের গায়েও বুঝি সেই শরমাতুর রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে।

খরদ্বিপ্রহরের ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছিল রঘুনাথ। কিন্তু বিশ্রাম নিতে সাহস হল না। দূরের দিকচক্রবালে কালো মেঘ জমে উঠেছে। বাতাসের গায়ে আর্দ্র স্পর্শ। কালবৈশাখীর দুরন্ত গতিতে যেন মেঘ ছুটে আসছে, ক্রমশ ঢেকে ফেলছে লাল মেঘের ছায়া। পলাশের শীর্ষে তাম্রবর্ণ নতুন পাতার শিখা সন্ধ্যার ছায়ায় ম্লান হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বিষ্ণুপুর আর মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ। তাই ক্লান্ত শরীরেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে রঘুনাথ। মনের মধ্যে গুনগুন করে শুধু একটি অজানা অচেনা নারীর মুখশ্রী। বাঁদীবাজারের এক যবনীর রূপ।

হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় দুরন্ত বেগে ছুটে এল দূর দিগন্ত থেকে। সনসন শব্দে কেঁপে

উঠল অরণ্যভূমি। গাছের শাখায় শাখায় ঘা খেয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেজে উঠল ঝড়ের তালে তালে। উন্মত্ত ঐরাবতের মত একরাশ কালো মেঘের দৈত্য যেন ছুটে এল হঠাৎ।

ধারাবর্ষণ শুরু হল। প্রবল বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল রঘুনাথের।

পাহাড়ের পর পাহাড়। শাহি সড়ক ছেড়ে সর্পিল আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে, চড়াই উতরাই পার হয়ে কদমে কদমে ছুটে চলল রঘুনাথের সুশিক্ষিত আরবি ঘোড়া।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষ্ণুপুরে ফিরে যেতে হবে। বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহ রোগশয্যায় পড়ে আছেন। পিতার রোগশয্যার পাশে ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল রঘুনাথ।

মায়ের আদেশ মনে পড়ল রঘুনাথের। জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েই ফিরে আসার আদেশ দিয়েছেন রাজমহিষী। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি অসুস্থ স্বামীর জন্য।

অন্ধকার খাড়াই পথ বেয়ে ছুটে চলেছিল রঘুনাথের সাদা ঘোড়া।

পাহাড়ি ঢালু বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পিছনে তাকাল রঘুনাথ। কানে আসছে সুমিষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ।

অস্পষ্ট একটা মূর্তি চোখে পড়ল।

লাগাম টেনে ধরল রঘুনাথ।

অন্ধকার পথে একজন সংবাদবাহী ছুটে আসছে যেন। হাতের লাঠিতে ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বিষ্ণুপুরের পথ ধরল রঘুনাথ। সংবাদবাহীকে বাদশাহি সওয়ানে নেগার মনে হওয়ায় আর অপেক্ষা করল না।

বিষ্ণুপুর প্রাসাদের আলোকমালা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন চোখের সামনে। বিড়াই নদীর তীর ধরে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হল।

দ্বাররক্ষী নত মস্তকে অভিবাদন জানিয়ে পথ ছেড়ে দিল যুবরাজকে।

রঘুনাথ কুশল প্রশ্ন করল প্রাসাদের।

রক্ষী বিষণ্ণ কণ্ঠে জানাল, মহারাজার অবস্থা সঙ্কটজনক। রাজবৈদ্য গোপনে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

দূর থেকে গানের রেশ ভেসে আসছে তখন।

রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, এ দুঃসময়ে গান কেন প্রাসাদে?

রক্ষী উত্তর দিলে, মদনমোহনের মন্দিরে সঙ্কীর্তনের আদেশ দিয়েছেন রানীমা। মহারাজার মঙ্গলের জন্যে অষ্টপ্রহরের ব্যবস্থা হয়েছে, যুবরাজ।

সঙ্কীর্তন!

প্রাসাদের কাছে এসে প্রহরীর হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেল রঘুনাথ।

সঙ্কীর্তনে আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে। কীর্তনিয়ার দলকে ঘিরে বসেছে রাজপরিবারের সকলে, সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবের দল।

আর কীর্তনমঞ্চের বেদিতে দুর্জন সিংহের পত্নী, বিষ্ণুপুরের রানীমা। রাজপ্রাসাদের অসূর্যম্পশ্যাও কীর্তনের সুরে সুর মিলিয়ে দেয় এখানে। বীর হাম্বীরের রানী সুদক্ষিণাও এমনিভাবে ভক্তির আনন্দে মিশে যেতেন প্রজাদের সঙ্গে।

মৃদঙ্গ আর অনুচ্চনাদ খোল-করতালের মৃদুমধুর ধ্বনি যেন এক কল্পরাজ্যের আবেশ এনেছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। গৌরচন্দ্রিকার নিঃসঙ্গ সঙ্গতে ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে যায় রঘুনাথ।

বেদির ওপর রসাবিষ্ট ঢুলুঢুলু নয়নে গান গেয়ে চলেন রাজমহিষী।

মায়ের ভাবাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে রঘুনাথের সর্বশরীর।

রাজমহিষী নয়, যেন দেবমূর্তি। কোলের কাছে উপবিষ্ট রূপবান কিশোর গোপাল

সিংহ, গোপালবেশে সজ্জিত। ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার রসকলি, শরীরে বৃন্দাবনী অঙ্গবাস, কৃষ্ণচূড়া কবরীতে রক্তিম পুষ্পের স্তবক। পদলহরীর মাধুর্য যেন তাঁর নিরাভরণ দুটি মসৃণ বাহুর ছন্দমুদ্রায় ঝরে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। মুখে প্রীতিপূর্ণ ভাবাবেশ। মৃদু মৃদঙ্গ বাজে। 'কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত। কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত!'

ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে আসে গীতমঞ্চ। শুধু শান্ত স্নিগ্ধ রাজমহিষীর কণ্ঠ-সুর ভেসে আসে। তন্ময় হয়ে যায় রঘুনাথ। অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। রাজপত্নীর দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে, আর কণ্ঠে শান্ত সঙ্গীত : 'বিপরীত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব, বান্ধব কুন্তল ভার। গাঁথি দুহুঁক হিয়ে পুন পহিরায়ব টুটল মোতিম হার।'

কীর্তনের পদ গুনগুন করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন রাজমহিষী, সভার কাছে বিদায়-নমস্কার জানিয়ে মদনমোহনের মন্দিরে প্রণাম রেখে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

ঐশ্বর্যের বেশ নয়, সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবীর মতই অঙ্গে তাঁর বৃন্দাবনী শাড়ি, কণ্ঠে সুবর্ণ তুলসীহার, মাথায় কৃষ্ণচূড়া কবরী, আর মুখে চন্দনের পুষ্পকলি, সুগৌর বাহুতে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। কণ্ঠের সঙ্গীতের সঙ্গে শরীরের ছন্দও যেন নেচে চলে মধুর আবেশে।

কীর্তনিয়াদের ধীরস্বর পদলহরী ভেসে আসে—

হরি হরি কব, নব-পল্লব-শয়নে।
রতি-রণ-ছরমে, ঘরমে দুহু বৈঠব, বীজন কিশলয় বিজনে॥
লোচন-খঞ্জন কাজরে রঞ্জব নব-কুবলয় দুই কানে।
সিন্দূর চন্দনে তিলক বনায়ব, অলক করব নিরমানে॥

কিশোর গোপালকে জরিয়া দাসীর হাতে দিয়ে ধীরে ধীরে রাজমহিষী এসে দাঁড়ালেন দুর্জন সিংহের শয্যাকক্ষে। পিছনে রঘুনাথ।

সভাপণ্ডিত রাজবৈদ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিলেন রোগশয্যার পাশে। দাসীর দল পাখার বাতাস করছিল বিষ্ণুপুররাজের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে।

রাজমহিষীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই সসম্মানে উঠে দাঁড়াল রাজবৈদ্য।

দুর্জন সিংহের শিয়রে পূজাপুষ্প স্পর্শ করিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রঘুনাথকে দেখতে পেলেন রাজমহিষী।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল রঘুনাথ। রাজমহিষী অস্ফুট কণ্ঠে আশিস উচ্চারণ করে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেবের সন্ধান পেয়েছ রঘুনাথ?

রঘুনাথ ধীরস্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ। কাজ শেষ করেই ফিরে আসবেন গুরুদেব।

পরক্ষণেই রঘুনাথের সিক্ত বেশবাসের দিকে চোখ পড়ল রানীমার। বললেন, বেশ বদলে ফেলবে যাও রঘুনাথ, বিশ্রাম নেবে যাও।

বিদায় নিয়ে বেশ পরিবর্তন করে সঙ্গীত-কক্ষে এসে ঢুকল রঘুনাথ। রাজসিক বিলাসের মধ্যে বিশ্রাম চায় না রঘুনাথ। সঙ্গীতই তার বিশ্রাম, সঙ্গীতই সাধনা।

মখমলের গালিচায় শরীর এলিয়ে বসল রঘুনাথ। শবরী দাসীকে ইঙ্গিত করতেই তানপুরা এনে দিল সে।

তানপুরাটা কাছে টেনে নিয়ে ক্লান্ত হাতে টুং-টাং টুং-টাং ধ্বনি তুলল। ধীরে ধীরে গজল গানের সুর ফুটল রঘুনাথের কণ্ঠে, বোল ফুটল তানপুরার তারে।

কিন্তু মনের মত তান খুঁজে পাচ্ছে না রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় এসে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। কি এক অনাস্বাদিত পুলক।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল এক রূপসী বাঁদীকে দেখে জীবনে এই

কি প্রথম নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করল সে ! যবন-কন্যার রূপের ঝলকে কি যেন দাহ, কি এক অবোধ্য বেদনা।

অন্যমনস্কভাবে আবার তানপুরায় সুর তুলতে যাচ্ছিল রঘুনাথ, হঠাৎ সম্মুখের সুবৃহৎ আয়নায় গদাধর চক্রবর্তীর প্রতিচ্ছবি পড়ল।

—এসো চক্রবর্তী। ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে গদাধর চক্রবর্তীকে কাছে বসতে বলল রঘুনাথ।

পরমুহূর্তেই রঘুনাথ দেখলে গদাধরের পিছনে কিশোর কৃষ্ণমোহন। গদাধরের শিষ্য। তাকেও ইশারায় আসন নিতে বললে রঘুনাথ।

রঘুনাথ তানপুরার তারে ধ্বনির তরঙ্গ তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, দিল্লির খবর পেয়েছ চক্রবর্তী ?

—পেয়েছি যুবরাজ। সঙ্গীত-সরস্বতীকে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চান আওরঙ্গজেব।

রঘুনাথ হেসে বললে, সুখবর বন্ধু। এই সুযোগ, সঙ্গীত-সরস্বতী এবার হয়তো বিষ্ণুপুরে এসে অধিষ্ঠিতা হবেন ! কিন্তু ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ?

চক্রবর্তী বলল, হ্যাঁ, রাজি হয়েছেন দিল্লি ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে। ওস্তাদ পীর বক্সও রাজি হয়েছেন। কিন্তু...

বাকি কথাটুকু বলতে বিব্রত বোধ করল গদাধর। কিভাবে বলবে কথাটা। যে-বেতন একমাত্র আলমগীরের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য কি তা বহন করতে পারবে ?

রঘুনাথ বুঝতে পারল, কেন এ সঙ্কোচ।

বলল, থামলে কেন গদাধর, বলো, কি দক্ষিণা চেয়েছেন তাঁরা।

গদাধর লজ্জিতভাবে বললে, মাসিক পাঁচশো তঙ্খা চেয়েছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। পীর বক্স সাহেবও...

রঘুনাথ হেসে বললে, চক্রবর্তী, মদনমোহনের পুজোয় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারে বিষ্ণুপুর, তা হলে সঙ্গীত-সরস্বতীর পুজোয় সামান্য হাজার টাকা দিতে পারবে না ? লোক পাঠাও চক্রবর্তী, আমন্ত্রণ জানাও তাঁদের।

কৃষ্ণমোহন খুশি হয়ে বললে, সে ভার আমি নিলাম গুরুজি, এখন গান শুরু করুন যুবরাজ।

রঘুনাথ হাসলে। —চক্রবর্তীর সামনে আমাকে গান গাইতে বোলো না কৃষ্ণমোহন। দেবদত্ত কণ্ঠের কাছে আমার গান সুরের অপমান।

চক্রবর্তী ক্ষুব্ধ হল। বললে, এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না যুবরাজ। সামান্য শিক্ষার্থী আমি। গুরুর পদে বরণ করতে চাই ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে। তবেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে আমার।

রঘুনাথ গদাধরকে তানপুরা এগিয়ে দিয়ে বললে, না চক্রবর্তী, তুমিই গাও। আমার মন আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ? কিন্তু কেন ? প্রশ্ন করতে পারল না কেউই। অথচ সে-কথা প্রকাশ করে বলতে পারলে হয়তো গোপন হৃদয়ের যন্ত্রণার লাঘব হত, হয়তো স্বস্তি পেত রঘুনাথ।

বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ীর চটুল চোখ মনে পড়ল আবার।

রঘুনাথের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দেখতে পেল গদাধর, দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যই হয়তো তানপুরা তুলে নিল। ধীরে ধীরে সুরের মূর্ছনায় ভরে গেল সমস্ত পরিবেশ। রঙ্গনাথের

সুরট চৌতাল : কাহে ব্রজ ছোড় চলি আয় জাওঅত...

গান শেষ করে গদাধর দেখলে ক্লান্ত রঘুনাথের কপালে স্বেদবিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে। পথের ক্লান্তির জন্যে সামনের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রঘুনাথ।

মৃদু হেসে কৃষ্ণমোহনকে ইশারা করল গদাধর, তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। প্রাসাদের বাইরে এসে যমুনাবাঁধের পাড়ে গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল দুজনে।

কৃষ্ণমোহন বয়সে তরুণ। কিন্তু রাজ্যের স্বপ্ন তার চোখে। মল্লবীরের রাজত্ব এই বন-বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের প্লাবন আনতে হবে। শুধু অসুরের শক্তি নয়, সুরের বন্যাতেও যেন চতুর্দিকে ভেসে যায় বিষ্ণুপুরের খ্যাতি।

আর এতদিন পরে সে সুযোগ বুঝি ঘটল। রাজা দুর্জন সিংহ রোগশয্যায়, রাজকবিরাজ গোপনে হতাশা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যুবরাজ রঘুনাথ সিংহাসন পাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। তখন, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ রঘুনাথের চেষ্টায় নিঃসন্দেহে নতুন জোয়ার আসবে সঙ্গীতের পৃথিবীতে।

কৃষ্ণমোহন বললে, আশ্চর্য সঙ্গীতপ্রীতি রঘুনাথের! পাঁচশো টাকা মাসোহারার কথা শুনেও এতটুকু বিচলিত হলেন না যুবরাজ।

গদাধর মাথা নাড়লে কৃষ্ণমোহনের কথায় সম্মতি জানিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সেই জন্যেই বড় ভয় হয় কৃষ্ণমোহন।

—ভয়? বিস্মিত হল কৃষ্ণমোহন।

গদাধর বললে, বড় ভয় হয় কৃষ্ণমোহন, সিংহাসন পেয়ে যখন রাজকোষের দৈন্য চোখে পড়বে, তখন হয়তো অত্যাচারী হয়ে উঠবেন যুবরাজ, কিংবা অমিতব্যয়ী আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবেন। এক কথায় উনি ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্সকে আনাতে বললেন, কিন্তু এ তো বিচক্ষণতা নয় কৃষ্ণমোহন। যুবরাজের উচিত ছিল রানীমার পরামর্শ গ্রহণ করা, উচিত ছিল দেওয়ানজির অনুমতি গ্রহণ করা।

কৃষ্ণমোহন উত্তর দিল, মিথ্যা দুশ্চিন্তা আপনার, যুবরাজ সঙ্গীতের ভক্ত বলেই এত সহজে রাজি হয়েছেন, বিষয়ান্তরে হয়তো এত সহজে রাজি হতেন না।

গদাধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কি জানি! বিবাহের পর হয়তো পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। শুনেছি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সঙ্গে যুবরাজের বিবাহ দিতে চান রানীমা।

কৃষ্ণমোহন বললে, কিন্তু বর্ধমানরাজ কি....

গদাধর হেসে উত্তর দিল, রাজনীতিতে সবই সম্ভব কৃষ্ণমোহন। জ্যোতিষাচার্য বিবিবাজারের মেলা থেকে বিষ্ণুপুরে আসবেন, তারপর কন্যার কোষ্ঠীবিচার করে যদি সম্মতি দেন...

জ্যোতিষাচার্যের গণনা! জ্যোতিষাচার্যের কোষ্ঠীবিচার!

বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষবংশের গণনাকে বড় ভয় পায় সকলে। বড় নির্দয় সে গণনা। বড় বেশি অভ্রান্ত।

দূরে বিড়াই নদীর তীরে দৈবজ্ঞপল্লী চাকদহের আকাশে তখন মৃদু মৃদু ঢোলকের আওয়াজ উঠছে; আর যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠছে দুলে দুলে।

সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল কৃষ্ণমোহন।

দৈবজ্ঞের গণনায় ভুল ছিল না সেদিন। ভুল অর্থ বুঝেছিলেন মল্লরাজ বীর হাম্বীর। কুঞ্জ দৈবজ্ঞ আর বিদুর দৈবজ্ঞ সেদিন রাজসভায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিচার করতে করতে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বলেছিলেন, মহারাজ, বিষ্ণুপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে বহুমূল্য

রত্ন। ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন-ঐশ্বর্য আজ সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে, এ ঐশ্বর্য বিষ্ণুপুর রাজ্য কোনওদিন ভোগ করেনি, সারা ভারতে এ রত্নের তুলনা মিলবে না।

বীর হাম্বীর বিচলিত হয়ে উঠলেন সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। দৈবজ্ঞদের বিদায় দিয়ে বিশ্রামকক্ষে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, বিশ্রামকক্ষ থেকে অন্দরমহলে।

দাসীদের পরিচর্যা অসহ্য মনে হল তাঁর। রানী সুদক্ষিণার মধুর হাস্য দেখে বিরক্তি বোধ করলেন। তখন ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলেছে তাঁর মনে।

তুলনাহীন রত্ন-ঐশ্বর্য! কল্পনার চোখে বীর হাম্বীর দেখলেন, দুহাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মণিমুক্তা মাণিক্য, হীরে আর জহরত বিলিয়ে দিচ্ছেন তিনি অন্দরমহলের দাসীদের উদ্দেশে। আর সবচেয়ে মূল্যবান কণ্ঠহারটি যেন পরিয়ে দিচ্ছেন রানী সুদক্ষিণার গলায়।

বিচলিত মনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দেহরক্ষীর উদ্দেশে হাঁক দিলেন রাজা বীর হাম্বীর।

দেহরক্ষী ছুটে এল।

বীর হাম্বীর বললেন, পঞ্চাশজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে তৈরি হতে বলো। বলেই ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

প্রাসাদের সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন বিষ্ণুপুররাজ, আর তাঁর পিছনে পিছনে পঞ্চাশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী।

দস্যুর লোভ জেগে উঠেছে তখন তাঁর উষ্ণ রক্তে। দৈবজ্ঞের নির্দেশ অভ্রান্ত—জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের লোভে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের দিকে।

নির্দিষ্ট পথের পাশে গোপনে বসে রইল পঞ্চাশজন অনুচর। রত্নের প্রতীক্ষায়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কিন্তু কোনও পথিকের দেখা নেই। তবে কি দৈবজ্ঞের গণনা ভুল?

তরবারি বের করে প্রতিজ্ঞা করেন বীর হাম্বীর, জ্যোতিষীর গণনা ভুল প্রমাণিত হলে এই তরবারিই তার শাস্তি দেবে। গণনা যদি সত্য হয়, তা হলে এই তরবারিই সে-রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে, রাজকোষের সম্পদ বাড়াবে।

অধৈর্য আবেগ চেপে গোপনে বসে থাকেন মল্লরাজ, প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়ে আসে।

হঠাৎ এক সারি ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন বীর হাম্বীর। তিনটি গরুর গাড়ি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ঈপ্সিত রত্ন কি থাকতে পারে এই দরিদ্র যাত্রীদের কাছে? কে জানে, হয়তো দস্যুর সন্দেহ নিরসনের জন্যেই এই দারিদ্র্যের ছদ্মবেশ!

আনন্দে অধীর হয়ে বীর হাম্বীর অনুচরদের ইশারা করলেন। চতুর্দিক থেকে বজ্র-গর্জনে লাফিয়ে পড়ল অনুচরের দল।

রত্নপেটিকার সঙ্গে আরোহীদেরও বন্দী করে নিয়ে এলেন বীর হাম্বীর।

কিন্তু প্রাসাদে এসে পেটিকার আবরণ উন্মোচন করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

রত্ন? হ্যাঁ, অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার। হীরে-জহরত নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য পাণ্ডুলিপি। বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গুরুস্থানীয়দের আদেশে কৃষ্ণের প্রিয় দুঃখী শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য এবং নরোত্তম ঠাকুর এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলেছেন গৌড়ে।

লজ্জায় অনুশোচনায় শ্রীনিবাসের পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চাইলেন বীর হাম্বীর। বললেন,

গুরুদেব, মার্জনা করুন এ নির্দয় দস্যুকে, পরিত্রাণের পথ দেখান। অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি সত্য, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিন আমাকে।

দীক্ষা নিয়েছিলেন বীর হাম্বীর, আর সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল সেদিন। বিষ্ণুপুরের নাম হয়েছিল গুপ্তবৃন্দাবন।

কিন্তু দস্যুরাজ বীর হাম্বীর ভক্তিরসে অবগাহন করেও তাঁর মনের পাপ ধুয়ে ফেলতে পারলেন না।

বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরি করালেন কালাচাঁদের বিগ্রহ। কিন্তু সে বিগ্রহে প্রাণের সন্ধান পেলেন না তিনি। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অনুসন্ধান করে বেড়ালেন এমন এক মূর্তি, যার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ মিলবে।

পরিব্রাজক বীর হাম্বীর হঠাৎ একদিন খুঁজে পেলেন মদনমোহনের বিগ্রহ। বৃষভানুপুরে ধরণীদাস বৈষ্ণবের গৃহে অতিথি হয়ে দেখতে পেলেন সেই মনোহর মূর্তি, দেখে মুগ্ধ হলেন বীর হাম্বীর। লোভ জেগে উঠল তাঁর দস্যুহৃদয়ে।

মদনমোহনকে নিশীথের অন্ধকারে বুকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে এলেন তিনি, এনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

মদনমোহন এসেছেন সত্য। প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিষ্ণুপুর রাজ্যে। অত্যাশ্চর্য এক প্রেমের বাণী শুনতে পেয়েছে কৃষ্ণমোহন। কিন্তু কবে মুরলীধরের বংশীধ্বনিতে সঙ্গীতের প্লাবন আসবে বিষ্ণুপুরে? অনুশোচনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল কৃষ্ণমোহন। প্রেমের দেবতা মদনমোহনকে চায় সে সুরের দেবতারূপে।

সঙ্গীতসাধনার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই দিনের পর দিন কেটে চলে তিন সঙ্গীতসাধকের। গদাধর চক্রবর্তী, রঘুনাথ, কৃষ্ণমোহন।

সেদিনও এমনি এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাতে শুরু করল কৃষ্ণমোহন, আর কল্পনার চোখে দেখল, যেন বাঁশির সুরে ছুটে এসেছেন শ্রীরাধিকা, আর শ্রীরাধার পিছনে মুরলীধর।

বাঁশি শুনতে শুনতে হঠাৎ গদাধর বলে উঠল, আসবে সে! আসবে।

—কে আসবে গদাধর?

পিছন থেকে কে যেন কৌতুকের কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

চমকে ফিরে তাকাল দুজনেই। আবছা অন্ধকারে যমুনাবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ঋজু মূর্তিটির তাকিয়ে গদাধর বললে, গুরুদেব, আপনি!

পাঁচ

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বিদায় জানিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল হীরাবাঈ। আহত অভিমানে ফুলে ফুলে উঠল, অশ্রু টলমল করল তার চোখের কোণে।

তার রূপের মোহমন্ত্র ব্যর্থ হল শোভা সিংহের কাছে। তার বিনীত অনুরোধকে উপেক্ষা করল মেদিনীপুরের সামান্য এক ভূম্যধিকারী।

উন্মত্ত আস্ফালনে কাঞ্চনীর আসরের সৌজন্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল শোভা সিংহ।

চিৎকার আর হট্টগোল শুনে ছুটে এল আশপাশের বাঈজীর দল। উঁকি মারল কিংখাবের পর্দা সরিয়ে। কৌতুকের চোখে। হীরাবাঈয়ের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে

উচ্চরোল বিদ্রূপের হাসি হাসল তারা।

তাদের বাঁকা হাসির বিদ্যুৎ এসে বিঁধল হীরাবাঈয়ের বুকে।

মনে হল জীবনে সে এমন অপমানিত বোধ করেনি কখনও! তার সুর্মা-টানা চোখের চটুল কটাক্ষের কাছে বশ মেনেছে কত রাজা-বাদশা, কত শ্রেষ্ঠী আর ফিরিঙ্গি বণিক। তার মুজরার সুর ভেঙে দিয়ে যেতে সাহস পায়নি কেউ।

অথচ সামান্য এক ভুঁইয়া কিনা হীরাবাঈয়ের আসরে দম্ভের আস্ফালন দেখিয়ে তার সম্মান মাটিতে লুটিয়ে দিল!

বাঈতল্লাটে এসে জমেছিল সারা হিন্দুস্থানের নামী বাঈজীর দল। কাশ্মীরি এবং কুমায়ুনি, দিল্লি আর লক্ষ্ণৌ, যোধপুরী আর দক্ষিণী—হাজারো ঘরানার সুরসুন্দরীদের সামনে হীরাবাঈয়ের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল এক তুচ্ছ তালুকদার।

সহ-সাধিকাদের সামনে হীরাবাঈয়ের অপমান করে গেল শোভা সিংহ। সাধারণ বেশ্যার ঘরেও মদ্যপ ইয়ারদোস্তরা এভাবে ঈর্ষা আর কলহের বীজ বুনে দিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হয়। বাঈজীর আসরের রীতিনীতি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল শোভা সিংহ।

লজ্জায় অপমানে অন্য অন্য কাঞ্চনীদের কাছে মনে মনে ছোট হয়ে গেল হীরাবাঈ। সব গৌরব টলে পড়ল তবলচি অযোধ্যাপ্রসাদের সামনে। আপন ঐশ্বর্যের জলুসে বারে বারে যার চোখ ঝলসে দিতে চায়, তাচ্ছিল্যের আঘাত হানতে চায় যাকে, তারই চোখের সামনে হীরাবাঈয়ের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গেল শোভা সিংহ।

তাই রেশমি রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে ওস্তাদ সৌকত খাঁকে বললে, তাঁবু তুলতে বলো ওস্তাদজি, আগ্রায় ফিরে যাব আমি।

বুড়ো সৌকত খাঁ মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, কেন বেটি, মেলা শেষ হবার আগেই ফিরে যাবি কার ওপর রাগ করে?

হীরাবাঈ কান্নার সুরে বললে, শোভা সিংহ আমার ইজ্জত ভেঙে দিয়ে গেছে ওস্তাদজি।

ইজ্জত।

সত্যি, ওস্তাদ সৌকত খাঁ হীরাবাঈয়ের আসরে এমন ঘটনা কখনও দেখেনি! বাঈজীর আসরের আদব জানে না কাফের?

হীরাবাঈ বললে, শোভা সিংহকে এর জবাব পেতে হবে ওস্তাদজি, হীরাবাঈয়ের ইজ্জতকে যেমন সে ধুলোয় লুটিয়েছে, এমনি ধুলোয় লুটিয়ে দেব তার শিরোপা।

এই প্রতিশোধের বাসনা নিয়েই কি বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁদীকে কিনে নিল হীরাবাঈ? কে জানে।

নিলামদারের হাতে গুনে গুনে একশো মোহর তুলে দিয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বাঁদীকে কিনে নিল হীরাবাঈ।

নৃত্যনটীর সুডোল বাহুর আলিঙ্গনে সহানুভূতির আশ্রয় পেল লালী। ফিসফিস করে হীরাবাঈ জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার বহিন?

বহিন? চমকে উঠল বাঁদী।

ভয়ভীরু স্বরে বললে, লালী।

মৃদু হাসল হীরাবাঈ।—লালী, না লয়লী?

তারপর ধীরে ধীরে বললে, বাঁদী নও তুমি, তুমি আমার বহিন। আমার এ গরিবখানা আজ থেকে লালীর দৌলতখানা হয়ে উঠবে!

শুনে অপ্রতিভ হাসি হাসলে লালী।

কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি হীরাবাঈয়ের দৌলত। চোখ ঝলসে গেল তার। হীরাবাঈয়ের তাঁবুর জলুস দেখেই চোখ ঝলসে গিয়েছিল, আগ্রার অট্টালিকা দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

নারীর পায়ে এত ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে পারে পুরুষ, জানত না। জানত না, নবাবি রংমহলের বাইরেও এমন রত্নালঙ্কারের ছড়াছড়ি।

একশো মোহর দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে এল হীরাবাঈ। নিয়ে এল আগ্রার হীরামহলে।

'আজ থেকে তুমি বাঁদী নও, আমার বহিন তুমি।'

শুনে লালী বিস্মিত হয়েছিল সেদিন। ভেবেছিল সুরাসক্তা হীরাবাঈয়ের খেয়াল হয়ত। হয়ত-বা রাত পোহালেই সব ভুলে যাবে, ক্রোধে ফেটে পড়বে হীরাবাঈ তার এই রাত্রির বিভ্রান্তির জন্যে।

ছাদের ওপর নরম গালিচায় শুয়ে হীরাবাঈ তাকিয়ে ছিল অন্ধকার আকাশের দিকে, আকাশের ক্ষীণালোক তারার দিকে।

নিঃশব্দ অন্ধকারে হীরাবাঈয়ের পাশে অস্বস্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে বসে ছিল লালী। চোখ ছিল অট্টালিকার ওপর নুয়ে-পড়া দেওদার গাছের পাতায়, পাতার ফাঁকে উঁকি দেওয়া ভাঙা চাঁদের ম্লান আলোর দিকে। তন্ময় হয়ে নিজের বিচিত্র অতীত ইতিহাস ভাবছিল লালী। দুঃখের, আশঙ্কার জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে এ কোন রহস্যের আশ্রয়ে এসেছে সে!

হঠাৎ লালীর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল হীরাবাঈ। আবার বললে, বাঁদী নও তুমি লালী, তুমি আমার বহিন।

চমকে উঠল লালী। দেওদার গাছের শাখায় একটা রাতপাখি ঝটপট করল তাই, না হীরাবাঈয়ের প্রলাপ শুনে?

লালী কোনও কথা বলল না।

হীরাবাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল। বললে, তোমাকে না পেলে আমার সব বরবাদ হয়ে যেত লালী। সব বরবাদ হয়ে যেত।

এবারও কোনও উত্তর দিল না লালী। নিঃশব্দে রুপোর পাত্রে সুরা ঢেলে দিলে, বাঁদীর মতই বিনীত ভঙ্গিতে, বিনত লজ্জায়।

পাত্রটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল হীরাবাঈ।

ধীরে ধীরে বলল, লালী, কত খুঁজেছি তোমাকে, সারা দুনিয়া ঘুরেছি তোমার খোঁজে, শেষে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ বিবিবাজারে দেখা পেলাম তোমার।

বিস্মিত একজোড়া চোখ চেয়ে লালী প্রশ্ন করলে, আমাকে? আমাকে চিনতেন আপনি বাঈসাহেবা?

খিলখিল করে হেসে উঠল হীরাবাঈ।

বললে, হ্যাঁ, তোমাকে দেখেই চিনেছি আমি। তুমিই পারবে। পারবে না আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে? আমার নাচ আর গানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তুমি?

এ কি উন্মাদের কথা হীরাবাঈয়ের মুখে? অনভিজ্ঞ লালী ভাবলে, সুরার নেশাতেই বুঝি অর্থহীন প্রলাপ বকে চলেছে হীরাবাঈ। তাই ভয়ে ভয়ে লালী অস্ফুটে বললে, পারব।

—পারবে, নিশ্চয় পারবে। গভীর আবেগে লালীর হাতটা মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধরল হীরাবাঈ।

তারপর সুন্দর একটি লীলায়িত মুদ্রায় তালি দিল হাতে। সে আওয়াজ শুনে ছুটে এল মণিবানু। মাথা নুইয়ে বললে, ফরমাইয়ে বাঈসাহেবা।

ঢুলুঢুলু স্বপ্নরঙিন চোখে হীরাবাঈ বললে, শরবত। তারপর একটু থেমে বললে, আর

তানপুরা।

কুর্নিশ করলে মণিবানু। হুকুম তামিল করতে চলে গেল। আর যাবার সময় একবার ফিরে তাকাল লালীর দিকে।

সে দৃষ্টিতে ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পেল লালী।

হীরাবাঈ তাকে একশো মোহর দিয়ে কিনে নিয়েছিল বিবিবাজার থেকে। হাজারো বান্দা আর বাঁদী লালীর সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়েছিল সেদিন।

আর মণিবানু চুপিচুপি বলেছিল, বাঁদীবাজারে তোর মত নসিব নিয়ে কেউ কখনও আসেনি লালী। আর আমাকে হয়তো সারাজীবন কাফ্রি খোজার মার খেয়ে মরতে হবে।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মণিবানু।

সে দীর্ঘশ্বাসের ব্যথা ভুলতে পারল না লালী। সহানুভূতিতে চোখে জল এল বাঁদীতল্লাট ছেড়ে আসার সময়। দুঃখ হল মণিবানুর দুঃসহ নসিবের কথা ভেবে।

একশো মোহর ছুঁড়ে দিয়ে হীরাবাঈ লালীকে নিয়ে এল তার তাঁবুতে। স্নেহের বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, কি পেলে তুমি সুখী হবে লালী, কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে?

এ আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না লালী। প্রশ্ন না রসিকতা বুঝতে পারল না। পুনরায় প্রশ্ন করলে হীরাবাঈ, বললে, কি চাও লালী, বলো। কি পেলে হাসি ফুটবে তোমার হাসিনা মুখে?

লালী উত্তর দিলে, মণিবানুকেও নিয়ে আসুন সাহেবান।

খিলখিল করে হেসে উঠল হীরাবাঈ। পাঁচ মোহর কিস্মতে একটা বাঁদী চায় লালী। আর কিছু নয়?

লালীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে মণিবানুকেও কিনে আনল হীরাবাঈ! বললে, এই নাও লালী, তোমার পাঁচ মোহরের বাঁদী।

বাঁদী? না, না, বাঁদী নয়, বন্ধু। একান্তে সে মণিবানুকে সোহাগে জড়িয়ে ধরেছিল সেদিন, আনন্দের অশ্রু ঝরেছিল তার চোখে।

অথচ সেই মণিবানুর চোখেই আজ ঈর্ষার জ্বালা!

আর লালী? হীরাবাঈয়ের সহানুভূতি তার চোখে স্বপ্ন দিয়েছে।

স্বপ্ন দেখে সে চাঁদনি রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে।

হয়তো জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নয়। হয়তো হীরাবাঈয়ের মুজ্‌রা থেকেই কোনও নবাবজাদা তুলে নিয়ে যাবে তাকে। শাদি নয়, সুখ আর আনন্দ। সুরা আর ঐশ্বর্যের অবগাহনেই হয়তো জীবন কাটবে তার।

'একদিন একটি রাজ্যপরিচালনা করার শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়।' জ্যোতিষাচার্যের কথাটা বার বার মনে পড়ল লালীর। পুরুষকে জয় করবার, ঐশ্বর্য জয় করবার স্বপ্নময় উন্মাদনা জেগে উঠল তার উষ্ণ রক্তে।

ঐশ্বর্যের লোভে ভুলে গেল সেই সুপুরুষ চেহারার সাদাঘোড়ার সওয়ারকে।

ছয়

ভোরের সানাই শুনে ঘুম ভেঙে গেল রঘুনাথের।

দীর্ঘপথ অশ্বারোহণের অবসাদ দূর হয়েছে শরীরের। ম্লান হয়ে এসেছে অনভিজ্ঞ যৌবনের প্রথম রোমাঞ্চ। তবু অকস্মাৎ যেন মনের পটে ক্ষণিকের জন্যে ভেসে উঠল

যবনীর সুতীব্র রূপের ঝলসানি।

স্নানাগার থেকে সিক্তকেশে অলিন্দে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। গৌরবর্ণ নিরাবরণ ঊর্ধ্ব দেহে জলের বিন্দু চিকচিক করে উঠল মুক্তামালার মত। ঊষার রক্তিম আলোকে আরও সুন্দর হয়ে উঠল রঘুনাথ। অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখলে রুগ্ণ শরীর নিয়েই প্রতিদিনের মত দর্শন-গবাক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহ আর রাজমহিষী। রাজপত্নীর ক্রোড়ে সুন্দরকান্তি কিশোর গোপাল, রঘুনাথের অনুজ।

প্রাসাদ-নিম্নের পথে জনতা ভিড় করে আছে রাজা ও রাজপত্নীর দর্শন পাবার জন্যে। প্রত্যূষে রাজদর্শন শুভকর, তাই বিষ্ণুপুর-অধিবাসীরা চিরন্তন প্রথায় রাজদর্শন করে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে যাচ্ছে।

জনতা রঘুনাথের দর্শন পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করল। জয়ধ্বনি তুলল রঘুনাথের। তৃপ্তির হাসি দেখা দিল দুর্জন সিংহের মুখে, রাজপত্নীর চোখে। একবার জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনাথের মুখের দিকে, একবার কনিষ্ঠপুত্র গোপালের মুখের দিকে তাকালেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভবিষ্যৎ বিষ্ণুপুররাজকে দেখতে পেলেন রানীমা। স্নিগ্ধ আবেশে হাসলেন রঘুনাথের চোখে চোখ রেখে। আর রঘুনাথ অপ্রতিভ বোধ করল। লজ্জা লুকোবার জন্যে যমুনাবাঁধের কালো জলের দিকে তাকাল রঘুনাথ।

এক ঝাঁক পারাবত প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে উড়ে গেল। যমুনাবাঁধের জলে নেমে এল এক দল রাজহাঁস। নিথর কালো জলে স্নান করছে পুরাঙ্গনার দল। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দাসীর ডাকে চমক ভাঙল।

ফিরে তাকাল রঘুনাথ।

দাসী জানাল, গোপনে তাঁর সাক্ষাৎ চায় এক পত্রবাহক। মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে সে।

বিস্মিত হল রঘুনাথ। প্রশ্ন করলে, কার পত্রবাহক ? বর্ধমানরাজের ?

কৌতুকে হেসে উঠল দাসী। বললে, বর্ধমানরাজের চিঠির অপেক্ষাতেই কি দাঁড়িয়ে আছেন যুবরাজ ?

দাসীর অবিনীত রসিকতায় ক্রোধ প্রকাশ করে দ্রুত পায়ে মদনমোহন মন্দিরের দিকে পা বাড়াল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সংবাদবাহীকে অপেক্ষা করতে দেখে প্রশ্ন করলে, কার সাক্ষাৎ চাও তুমি ?

—আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, যুবরাজ। বলে নতমস্তকে একখানি চিঠি দিল সে রঘুনাথকে। বললে, মেদিনীপুর থেকে আসছি আমি, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা এ চিঠি আপনার হাতে গোপনে পৌঁছে দিতে আদেশ দিয়েছেন।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল রঘুনাথের কপালে। শোভা সিংহের কন্যা কুমারী চন্দ্রপ্রভা গোপনে চিঠি লিখেছে রঘুনাথকে ?

প্রাসাদে খাজাঞ্চিখানায় পত্রবাহককে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে আপন কক্ষে ফিরে এল রঘুনাথ। দাসীকে আদেশ দিল পত্রবাহকের আহার-বিশ্রাম পর্যবেক্ষণ করতে। পাঁচটি রজতমুদ্রা আর একজোড়া বস্ত্র উপহার পেয়ে বিদায় নিল সে।

আর, চিঠি পড়ে বিস্মিত হল রঘুনাথ।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার করুণ মিনতিতে ভরা চিঠি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের প্রণয়-ভিক্ষা যেন।

বড় বিচলিত বোধ করল রঘুনাথ। এ কি অদ্ভুত আমন্ত্রণ ! কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় রঘুনাথের।

শৈশবের একটি তুচ্ছ ঘটনা কি এভাবে দুটি মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে ফেলতে পারে এক সূত্রে ?

বিস্মৃতপ্রায় একটি দৃশ্য ভেসে উঠল রঘুনাথের চোখের সামনে।

জগন্নাথধাম থেকে ফিরে আসছিল তীর্থযাত্রীর দল। শত শত নারীপুরুষ। কন্যকা, কুমারী, যুবতী আর বৃদ্ধা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ। হঠাৎ খবর এসে পৌঁছল রাজা দুর্জন সিংহের দরবারে। গুপ্তচরের মুখে দুঃসংবাদ শুনলেন দুর্জন সিংহ : হার্মাদ দস্যুদের পঞ্চাশখানি সমুদ্রতরী দেখা গেছে বঙ্গোপসাগরে। সশস্ত্র পর্তুগীজ দস্যুর দল নাকি যাত্রা করেছে জগন্নাথধামের উদ্দেশে। হার্মাদ দস্যুর কথায় সেদিন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন দুর্জন সিংহ।

পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার আর লুণ্ঠনের কথা অজানা ছিল না। বালেশ্বর উপকূলের একটি দৃশ্য মনে পড়েছিল দুর্জন সিংহের। পাঁচ হাজার নারীপুরুষকে বন্দী করে এনে 'কড়ি' আর 'দামে'র মূল্যে তাদের বেচে দিয়ে গিয়েছিল ফিরিঙ্গি দস্যুর দল। লুণ্ঠন করেছিল উপকূলের শত শত গ্রাম। ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছিল নারীত্ব। কৌমার্য আর সতীত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছিল দস্যুদের অত্যাচারে। বিবাহমণ্ডপ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, লুটে নিয়ে গিয়েছিল হাজারো সুন্দরী গৃহস্থবধূকে।

তাই দুর্জন সিংহ বলেছিলেন, মোগলশক্তি হার্মাদ দস্যুদের বাধা দিতে না পারলেও বিষ্ণুপুরকে এগিয়ে যেতে হবে। উড়িষ্যার সমুদ্রতীর রক্ষা করতে হবে ফিরিঙ্গির অত্যাচার থেকে। কিন্তু...

সভাসদরা বুঝলেন দুর্জন সিংহের দুশ্চিন্তা। উড়িষ্যা আর বাংলার প্রান্তবর্তী রাজ্য বিষ্ণুপুর। হার্মাদের দুঃসাহস ক্রমশই বেড়ে চলেছে তখন। হয়তো বালেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর অভিমুখেও যাত্রা করবে পর্তুগীজ অসুরের দল। অন্যদিকে বর্গীদের আশঙ্কা। ঘোড়সওয়ার বর্গী দস্যুরা মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে তখন উড়িষ্যার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত, পাঠান তাদের বাধা দিতে পারছে না।

সভাসদরা মন্তব্য করলে, এ সময় বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হবে না মহারাজ। বর্গী শত্রুর হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্যে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।

দুর্জন সিংহ বললেন, কিন্তু হার্মাদের হাত থেকেও বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করতে হবে।

উভয়সঙ্কটের মধ্যে কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না দুর্জন সিংহ।

ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বিষ্ণুপুর রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে পর্তুগীজ শক্তিকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারে ?

যুবরাজ রঘুনাথ তখন কিশোর।

সহাস্য মুখে এগিয়ে এল সে। বললে, আছে।

খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন দুর্জন সিংহ।

মাত্র একশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করল রঘুনাথ।

সমুদ্র-তীরে শিবির ফেলে অপেক্ষা করল গুপ্তচরের নির্দেশের জন্যে।

জগন্নাথধাম থেকে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী তখন ফিরে চলেছে রথযাত্রা দর্শন করে। এমন সময় হঠাৎ খবর এসে পৌঁছল কিশোর রঘুনাথের কাছে : হিজলীর বন্দরে জাহাজ রেখে বালেশ্বরের দিকেই এগিয়ে আসছে দস্যুসেনা।

মাত্র একশো অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে গেল রঘুনাথ।

গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে চলেছে তখন হার্মাদের দল। নৃশংস অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। হাজার হাজার নারী আর পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে একদল দস্যু,

আরেকদল এগিয়ে আসছে তীর্থযাত্রীদের সন্ধানে।

বন্দীদের হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত চালিয়ে পশুর মত টানতে টানতে রণপোত বোঝাই করে নিয়ে চলেছে তাদের। হয়তো অন্য কোনও বন্দরে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবার জন্যে।

মাত্র একশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক কিশোর রঘুনাথ ছুটে চলল তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

চাঁদবানীর কাছে এসে দেখা মিলল তীর্থযাত্রীদের। পঙ্গপালের মত চলেছে তারা, নিশ্চিন্ত মনে। সামনে একটি সুসজ্জিত হাতি। হাওদার রঙিন পর্দা উড়ছে বাতাসে। দূর থেকে একটি কিশোরী-মুখ দেখতে পেল রঘুনাথ, রং-ঝলমল হাওদার ওপর। কিন্তু কে এই আরোহিণী ? রঘুনাথ বুঝতে পারল না। পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে উঠল তার মনে।

পিছন থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে লক্ষ রেখে চলল রঘুনাথ। এমন সময় হঠাৎ আসুরিক চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল পর্তুগীজ দস্যু। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর মুক্ত অসি নিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। গভীর অরণ্যে লুকিয়ে দূরবীক্ষণ চোখে দিয়ে দেখতে পেল রঘুনাথ। তাদের সংখ্যাধিক্য আর নৃশংসতা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সে। গৌরবর্ণ সুপুরুষ চেহারা তাদের, গায়ে লাল মখমলের কুর্তা, মাথায় উজ্জ্বল সবুজ রঙের শিরস্ত্রাণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে রঘুনাথ দেখল হাতির পিঠে হাওদার ওপর উঠে দাঁড়াল একটি কিশোরী, সুদর্শনা, হাতে তার উন্মুক্ত অসি।

সঙ্গে সঙ্গে ইশারা করল রঘুনাথ। একশো অশ্বারোহী বীরবিক্রমে বন্যার মত ভেঙে পড়ল পর্তুগীজ দস্যুদের ওপর।

পদাতিক হার্মাদের দল বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল তাদের দ্বিখণ্ডিত শরীর।

কিন্তু পরমুহূর্তে রঘুনাথ দেখল, তেজোদ্দীপ্তা কিশোরীর হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছে, আর দুদিক থেকে দুজন পর্তুগীজ দস্যু তাকে বন্দী করবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

রঘুনাথের ঘোড়া লাফিয়ে পড়ল তাদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে সেই কিশোরীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল রঘুনাথ।

সেই সময়েই কামানের ধ্বনি শোনা গেল। শ্বেত পতাকা তুলে দূরে সরে গেল রঘুনাথ। বুঝল, মোগল সৈন্যও এসে পৌঁছেছে।

মোগলের কামান আর বিষ্ণুপুরের বীরত্বের পায়ে প্রাণ দিল শত শত পর্তুগীজ দস্যু, নিশ্চিহ্ন হল সমগ্র হার্মাদের দল।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে নামল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।

কে জানত সে-দৃষ্টি শুধু কৃতজ্ঞতার নয়, দেহ মন প্রাণ সমর্পণের।

যে-জীবন একদিন রঘুনাথই বাঁচিয়েছিল, সে-জীবন যে এমন ভাবে জড়িয়ে যাবে তার চলার পথের সঙ্গে, কোনওদিন কল্পনাও করেনি সে।

সাত

রঘুনাথের অনভিজ্ঞ যৌবন তখন মনে মনে অন্য এক স্বপ্ন বুনে চলেছে।

শোভা সিংহের কন্যার কাছ থেকে এসেছে রহস্যময় আমন্ত্রণ। দূতের হাতে গোপন পত্র দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে চন্দ্রপ্রভা।

সুদীর্ঘকাল পূর্বের সেই অপরূপ দৃশ্য বারংবার ভেসে ওঠে রঘুনাথের মনের পটে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেই সুদর্শনার মুখচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তার কল্পনার চোখে।

চন্দ্রপ্রভা! চন্দ্রপ্রভার এই অদ্ভুত আমন্ত্রণের কোনও অর্থ খুঁজে পায় না রঘুনাথ। অকস্মাৎ যে একদিন পর্তুগীজ দস্যুর আক্রমণ থেকে তীর্থযাত্রিণী চন্দ্রপ্রভাকে বাঁচিয়েছিল, তারই শৌর্যের মোহে কি রূপময়ী চন্দ্রপ্রভা প্রণয়ের মালা গেঁথেছে এই দীর্ঘদিনের অবসরে?

চন্দ্রপ্রভার চিঠিটা আবার পড়ল রঘুনাথ। অপরূপ ছন্দোময় এক টুকরো চিঠি। প্রতিটি অক্ষরে যেন কোমল যৌবনের স্পর্শ।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল এক রূপসী বাঁদীকে দেখে জীবনে প্রথম নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল রঘুনাথ, কিন্তু সে-রূপের ঝলকে ছিল দাহ, ছিল এক অবোধ্য বেদনা। চন্দ্রপ্রভার চিঠি যেন চন্দনধূপের স্নিগ্ধ সুগন্ধ। যৌবন-জ্বালার শরীরে জ্বালাহর প্রলেপ।

চন্দ্রপ্রভার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না রঘুনাথ।

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে একখানি বজরা নিয়ে। সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণমোহন এবং সশস্ত্র দেহরক্ষী। মনে সন্দেহ উঁকি দেয় মাঝে মাঝে। হয়তো শোভা সিংহেরই কৌশল, হয়তো প্রবঞ্চনা করে রঘুনাথকে বন্দী করতে চায় অহঙ্কারী ভূস্বামী। তাই গোপনে দেহরক্ষীর দলকে বজরা অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছে রঘুনাথ।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ আর বিড়াই নদীর শান্ত স্রোতের জোলো হাওয়ায় এক বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে রঘুনাথ। শরীরে জড়ানো চম্পাবরন রেশমের উত্তরীয় বাতাসে উড়ে উড়ে নেচে বেড়ায়, বিস্তৃত কপালের ওপর উড়ে পড়ে কুঞ্চিত কেশ।

বিষ্ণুপুরের প্রতীক-আঁকা পালের গায়ে হাওয়া লাগে, দ্রুত বেগে যেন উড়ে চলে রঘুনাথের বজরা। আঠারো দাঁড়ের বজরা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলে অদ্ভুত এক জলতরঙ্গের ধ্বনি তুলে। মাঝির দল গান ধরে চাপা গলায়।

নদীর তীরের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে কৃষ্ণমোহন, হয়তো বা মাঝিদের ঐকতান সঙ্গীতের দিকে কান রেখে।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে চলে। বাঁশবন, আম-কাঁঠালের বাগান, কোথাও বা পাষাণে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন ঘাট।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে থমকে দাঁড়ায় কোনও রাখাল কিশোর। বিস্ময়ে অভিভূত দুটি চোখ মেলে তাকায় রঘুনাথের বজরার দিকে।

ক্রমে ক্রমে অপরাহ্ণ ঘনিয়ে এল। বিড়াই নদী থেকে কংসাবতীর স্রোতে বাঁক নিল বজরা।

দূর থেকে রঘুনাথ দেখলে এক দল গ্রাম্য মেয়ে কলসি কাঁখে এগিয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। গাছগাছালির মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তারা।

রঘুনাথের বজরা কাছে এসে পড়তেই থমকে দাঁড়াল গ্রাম্যবধূদের দল, পরমুহূর্তেই ভয়ে ছুটে পালাল তারা। কেউ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, কারও বা অঙ্গবাস আটকে গেল কাঁটাঝোপের গায়ে। সশব্দে পড়ে গেল মাটির কলসি। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল

চতুর্দিকে।

সে-দৃশ্য দেখে সশব্দে হেসে উঠল মাঝিমাল্লার দল।

রঘুনাথ কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, দুঃখ হয় কৃষ্ণমোহন।

—দুঃখ ?

রঘুনাথ ধীর স্বরে বললে, হ্যাঁ কৃষ্ণমোহন, বর্গী, মোগল, আর পর্তুগীজের অত্যাচার বাংলাদেশের মনে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, ভাবলে দুঃখ হয়। বিদেশী দেখলেই তাই ভয়ে ছুটে পালায় তারা, অথচ···

অথচ এই দেশেরই তো একটি কিশোরী মেয়েকে একদিন তরবারি-হাতে রুখে দাঁড়াতে দেখেছিল রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার চোখে দেখেছিল বীরাঙ্গনার দুঃসাহস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তানপুরা তুলে নিল রঘুনাথ। গান শুরু করলে ধীর সুরে। হয়তো মনের উৎকণ্ঠা চাপা দেবার জন্যেই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আলো নিবে গেল পশ্চিমের আকাশে। কংসাবতীর তীরে নির্দিষ্ট ঘাটে এসে পৌঁছল রঘুনাথের বজরা। কৃষ্ণমোহনকে অপেক্ষা করতে বলে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের সন্ধানে চলল রঘুনাথ।

যুবরাজ রঘুনাথ নয়, বেশবাস দেখে মনে হয় কোনও তীর্থান্বেষী পরিব্রাজক। সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের পথ খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকার গ্রাম্য সড়ক ধরে এগিয়ে চলে রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ উঁকি দেয় মনে, কটিবন্ধের গুপ্ত অস্ত্রে হাত রেখে সাহস আনে বুকে।

একদিকে কুমারী চন্দ্রপ্রভার উপরোধ, অন্যদিকে অজ্ঞাত আশঙ্কা। চন্দ্রপ্রভার চিঠির মধ্যে শোভা সিংহেরই কোনও কৌশল লুকিয়ে নেই তো ? হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে যায় বিবিবাজার থেকে বিদায় নিয়ে বিষ্ণুপুর ফিরে আসার পথে রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনা। কে জানে, হয়তো সেদিন যে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল বর্ধমানরাজের কাছে, শোভা সিংহের কানেও হয়তো সে কথা পৌঁছে গেছে। এবং সেই জন্যেই হয়তো কৌশলে রঘুনাথকে বন্দী করতে চায় শোভা সিংহ।

কিন্তু শত বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চুপ থাকতে পারে না রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার প্রেমের আহ্বান হয়তো বা সত্য। হয়তো তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনে চলেছে একটি রূপময়ী কন্যা।

দয়িতা-হৃদয়ের আকর্ষণই নয়, আত্মসম্মানকে অকলঙ্কিত রাখার আগ্রহে ছুটে এসেছে রঘুনাথ। সত্য হোক মিথ্যা হোক, শত্রুতার আশঙ্কায় একটি অসহায়া নারীর আমন্ত্রণে সাড়া দিতে ভয় পেয়েছে রঘুনাথ, এমন কলঙ্ক যেন তার চরিত্রকে স্পর্শ করতে না পারে ! তাই ছুটে এসেছে রঘুনাথ সুদূর মেদিনীপুরের চিতোয়া-বরদার অরণ্যে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর খড়্গেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশে পা বাড়াল রঘুনাথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল এক সারি মশালের আলো, বাতাসে ভেসে এল আরতির শঙ্খধ্বনি।

মশালের আলোকমালা লক্ষ করে ক্রমশ মন্দির-প্রাঙ্গণের কাছে এসে পৌঁছল রঘুনাথ। গ্রামবাসীদের ভিড় ভেঙে পড়েছে তখন দেবালয়ের চতুর্দিকে।

সম্ভ্রান্ত কোনও বিদেশী তীর্থান্বেষী মনে করে রঘুনাথকে পথ করে দিল জনতা। গর্ভগৃহের বেদির কাছে এসে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তেই কানে এল পালকির ছন্দোময় ঘুঙুরের বোল !

ফিরে তাকাল রঘুনাথ।

দূর থেকে দেখল, একটি মূল্যবান পালকি এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। পালকির

গায়ে মিনার কারুকার্য চমক দিল মশালের আলোয়। জাফরানি রঙের রেশমি পর্দা নড়ে উঠল।

পালকি নামিয়ে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল বাহকের দল।

মশালচিরা সারি বেঁধে দাঁড়াল মন্দির পর্যন্ত।

জাফরানি পর্দা নড়ে উঠল, উঁকি দিল দুটি সুন্দর পা। আর সে-দুটি পা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে গেল।

রঘুনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সে-দিকে। দূর থেকে লুকিয়ে দেখল সে-রূপ।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার শরীরে এমন উচ্ছল যৌবন! সেই কিশোরী আজ যৌবনসম্ভারে যেন দেবীর মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে।

কুমারী চন্দ্রপ্রভা ধীরে ধীরে পালকি থেকে নামল। তার পিছনে পিছনে দুজন রসিকা সখী।

ক্রমে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল তিনজনই। আর রঘুনাথ পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী খড়্গেশ্বরীর বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লক্ষ করে দেখল, কুমারী চন্দ্রপ্রভা যেন লজ্জাতুর অপাঙ্গে তাকিয়ে জনতার মধ্যে বার বার কাকে খুঁজছে।

অদ্ভুত এক কৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত হল রঘুনাথের মুখ।

পুরোহিতের হাত থেকে পূজার পুষ্প নিয়ে প্রণাম করল চন্দ্রপ্রভা, তারপর একটি সোনার বিল্বপত্র রাখল প্রণামীর থালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আরেকটি স্বর্ণপত্র পড়ল সশব্দে।

চমকে চোখ তুলে তাকাল চন্দ্রপ্রভা, চোখোচোখি হল রঘুনাথের সঙ্গে। আর উভয়ের চোখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে-চোখ যেন পরস্পরকে বলল, চিনেছি। চিনেছি তোমাকে।

রঘুনাথ সরে এল নির্জন অন্ধকারে। জনতার অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন সন্দেহের কারণ খুঁজে না পায়।

চন্দ্রপ্রভাও পালকির ঘুঙুর বাজিয়ে চলে গেল। যেমন এসেছিল তেমনই।

রাত্রির অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিরুদ্দেশভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে কংসাবতীর ঘাটে ফিরে এল রঘুনাথ।

বজরায় ফিরে এসে অপেক্ষা করল চন্দ্রপ্রভার জন্য। তারপর একসময় ক্লান্ত হাতে বীণা তুলতে গিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রঘুনাথ।

অন্ধকারে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটি নারীমূর্তি যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

দেহরক্ষীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

প্রশ্ন বুঝতে পারল রক্ষী। বললে, সংবাদ পেয়েছি যুবরাজ। শোভা সিংহ এখন উড়িষ্যায়। হেমন্ত সিংহও অনুপস্থিত।

নারীমূর্তি ততক্ষণে কাছে এসে পৌঁছেছে।

মধুকণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেল রঘুনাথ। — আমি বিষ্ণুপুর যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে যুবরাজ নিজেই তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন, রসিকা।

নারীকণ্ঠেও হাসির সুর শোনা গেল— কুমারী চন্দ্রপ্রভা আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন যুবরাজ।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, যুবরাজ নিজেও প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছেন সখী।

সখীকে অনুসরণ করে শোভা সিংহের প্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্দরমহলে এসে পৌঁছল রঘুনাথ।

সখীর ইশারায় চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে। আর রঘুনাথ সেদিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষ নয়নে। মুগ্ধ বিস্ময়ে।

চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ল চন্দ্রপ্রভার। কথা খুঁজে পেল না। অলজ্জ অভিসারিণীর আবেগময় লিপির দৌত্য যে-দয়িতকে কাছে ডেকে এনেছে, তার উপস্থিতিতে লজ্জায় কথা হারাল চন্দ্রপ্রভা।

অথচ এই মুহূর্তটির জন্যে কত দীর্ঘ— দীর্ঘ দিন সে অপেক্ষা করেছে।

সখীর কাঁধে ভর দিয়ে লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রঘুনাথের কাছে এগিয়ে এল সে।

তারপর শরমকাতর দুটি চোখ তুলে তাকাল। দুটি স্নিগ্ধ চোখ যেন বললে, একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে-কথা কি ভুলে গেছেন?

না, ভুলে যায়নি সে। কিন্তু অতীতের সেই দুর্ঘটনাকে রঘুনাথ এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তার স্মৃতির পটে।

সখী সুরঞ্জাক্ষী খিলখিল করে হেসে উঠল রঘুনাথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ করে। চন্দ্রপ্রভার লজ্জানম্র চোখেও কি যেন কৌতুক খেলে গেল। চন্দ্রপ্রভার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বললে রসিকা সখী।

চন্দ্রপ্রভা অবনত লজ্জায় ঠোঁট টিপে হাসল সে-কথা শুনে।

সখী কৌতুকের স্বরে বললে, যে-জীবন একদিন আপনি রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে-জীবন আপনার পায়েই সমর্পণ করতে চান রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রাজকুমারী? বিস্মিত হল রঘুনাথ। বর্ধমানপতি কৃষ্ণরামের সন্দেহ কি তা হলে সত্য? শোভা সিংহ কি স্বাধীন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠল রঘুনাথ। কে যেন এই পথেই এগিয়ে আসছে, পায়ের শব্দ শুনতে পেল রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভাও বিচলিত বোধ করল। প্রাসাদরক্ষীরা কি জানতে পেরেছে রঘুনাথের কথা? ভীতত্রস্তভাবে সখীর মুখের দিকে তাকাল চন্দ্রপ্রভা।

সখী সুরঞ্জাক্ষী ইশারায় পাশের কক্ষে সরে যেতে বলল চন্দ্রপ্রভাকে।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করল চন্দ্রপ্রভা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। না, রক্ষীদের সন্দেহ উদ্রেকের কারণ ঘটেনি হয়তো।

চন্দ্রপ্রভা ফিরে এল আবার, কপালে তার স্বেদবিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে তখন। তার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি খেলে গেল রঘুনাথের মুখে। বললে, তোমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরেই এসেছি চন্দ্রপ্রভা। বলো, কি বলতে চাও তুমি।

চন্দ্রপ্রভার শরমাতুর দুটি চোখ নিবদ্ধ হল মাটিতে।— একদিন জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আজ সম্মান বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিন। লজ্জাকম্পিত স্বরে বললে চন্দ্রপ্রভা।

শুধু সখী সুরঞ্জাক্ষী বললে, প্রথম দর্শনেই সখী তার দেহমনপ্রাণ আপনার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন যুবরাজ। সেই কথাটুকু জানাবার জন্যেই আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন।

রঘুনাথ মৃদু হেসে বললে, প্রথম আলাপের দিনটি আমিও ভুলিনি চন্দ্রপ্রভা; ভুলতে পারিনি।

সুরঞ্জাক্ষী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, দৈবের নির্বন্ধে যখন চারিচক্ষুর মিলন হয়েছিল একদিন, তখন সেই মিলনকে স্বীকার করে নিন যুবরাজ।

রঘুনাথ বললে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চন্দ্রপ্রভা, আর সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে

যে-মূল্যই দিতে হোক, আমি সম্মত থাকব।

সুরঙ্গাক্ষী হেসে বললে, আরেকটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যুবরাজ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল রঘুনাথ।

সুরঙ্গাক্ষী বললে, সখীর এই রূপ এই যৌবন যেন শত পত্নীর ভিড়ে হারিয়ে না যায়। ।পুরের সিংহাসনে যেন পাটরানীর গৌরবে অধিষ্ঠিতা হতে পারেন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, সে-প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি আমি। কোনও দিন যদি অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তোমার অসম্মান করি, তার আগে যেন তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয় চন্দ্রপ্রভা।

—ছি ছি, এ কি কথা বলছেন যুবরাজ! রঘুনাথের মুখে হাত চাপা দিল চন্দ্রপ্রভা।

মৃদু হেসে চন্দ্রপ্রভার অনামিকায় বিষ্ণুপুর যুবরাজের চিহ্ন-আঁকা অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিল রঘুনাথ।

আনন্দে উৎফুল্ল দু'টি চোখ তুলে তাকাল চন্দ্রপ্রভা, তারপর রঘুনাথকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

সুরঙ্গাক্ষী বললে, চলুন যুবরাজ, ভোর হওয়ার আগেই মেদিনীপুর ছেড়ে যেতে হবে আপনাকে।

সুড়ঙ্গের পথ দেখিয়ে বজরায় পৌঁছে দিল সে রঘুনাথকে। বজরা ছেড়ে দিল। আর রঘুনাথের মনে পড়ল শৈশবের সেই দৃশ্য।

রাত্রির অন্ধকারে শোভা সিংহের গুপ্তচরের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেসে চলল রঘুনাথের বজরা। কংসাবতীর স্রোত বেয়ে বিষ্ণুপুরের পথে ফিরে যেতে যেতে রঘুনাথের মনে পড়ল প্রায়-বিস্মৃত শৈশবের সেই ঘটনা।

আশ্চর্য। যে-ঘটনা রঘুনাথের মন থেকে মুছে গিয়েছিল, যে-কন্যকার মুখ তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অতলে, আজ নতুন করে রঘুনাথের মনে যৌবনের জোয়ার আনল সেই ছবি।

নারীর হৃদয় বুঝি ভিজে মাটির পথ। একবার যার পায়ের ছাপ আঁকা হয়, কল্পনার রৌদ্র আর সময়ের বাতাসে শুকিয়ে সে-ছাপ চিরজীবী হয়ে থাকে। আর পুরুষের মন বুঝি বা আয়নার মত, ক্ষণে ক্ষণে নতুন ছায়া পড়ে।

কিন্তু এমনভাবে কোনও রূপসী নারী তার দেহমন উৎসর্গ করবার জন্যে উপযাচিকা হয়ে এগিয়ে আসতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি রঘুনাথ।

এমনি দুঃসাহস আরও একদিন দেখেছিল রঘুনাথ। কিন্তু সেদিন চন্দ্রপ্রভার দৃষ্টিতে ছিল তীব্রতা, ছিল রণোন্মাদিনীর তেজোদ্দীপ্তি।

যে-জীবন একদিন রঘুনাথই বাঁচিয়েছিল, সে-জীবন যে এমন ভাবে জড়িয়ে যাবে তার চলার পথের সঙ্গে, কোনও দিন কল্পনাও করেনি সে।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে যে-রোমাঞ্চের কাজল পরিয়েছিল সে, আজ চন্দ্রপ্রভার যৌবনরূপ সেই মোহাঞ্জনই এঁকে দিল রঘুনাথের চোখে।

মনে মনে রঘুনাথ বললে, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব আজীবন।

সমগ্র বিষ্ণুপুরে তখন দুঃখের ছায়া নেমেছে। দীর্ঘকাল ধরে রোগশয্যায় পড়ে ছিলেন দুর্জন সিংহ। কিন্তু রাজবৈদ্যের ওপর আস্থা ছিল সকলের। রঘুনাথ ফিরে এসে শুনল রাজবৈদ্য প্রকাশ্যে হতাশা জানিয়েছেন।

বিষণ্ণ মুখে পিতার শয্যাকক্ষে গিয়ে হাজির হল রঘুনাথ। দেখলে, পরিবারের সকলে

দাঁড়িয়ে আছে হতাশার চোখ মেলে।

শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রঘুনাথ। দুর্জন সিংহের তন্দ্রার ঘোর কাটল। অস্ফুটে ডাকলেন, রঘুনাথ!

জ্যোতিষাচার্য সামনেই বসে ছিলেন। বললেন, রঘুনাথ এসেছে মহারাজ।

—এসেছে? স্পর্শ পাবার আশায় হাত বাড়ালেন দুর্জন সিংহ।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে শিয়রের কাছে গিয়ে বসল।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অস্ফুটে দুর্জন সিংহ বললেন, অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে রঘুনাথ। তাই মৃত্যুর আগে কয়েকটা কথা তোমাকে বলে যেতে চাই।

চোখের অশ্রু মুছলেন রাজপত্নী।

রঘুনাথের চোখেও জল এল। বললে, আপনার আদেশ আমি চিরকাল পালন করব।

মৃদু হাসি দেখা দিল দুর্জন সিংহের ঠোঁটে। বললেন, জানি।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, রঘুনাথ, সারা বাংলা দেশ অশান্তিতে ডুবে আছে। একদিকে মগ আর পর্তুগীজ, আর অন্যদিকে বর্গী আর পাঠান।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, মোগলও তো অত্যাচারী মহারাজ, বিধর্মী মোগলও বাংলার শত্রু।

দুর্জন সিংহ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, মোগলও অত্যাচারী! মোগলও শত্রু। কিন্তু রঘুনাথ, স্থায়ী শত্রুকে সহ্য করা যায়, প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তা ছাড়া, মোগলের অত্যাচার হয়তো একদিন লুপ্ত হবে, কারণ মোগল রাজ্যশাসন করে। মগ আর বর্গী দস্যুর নির্যাতন আর লুণ্ঠন প্রতিরোধ করতে হলে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে রঘুনাথ, বিদ্রোহ করে বাংলাকে মোগলের হাত থেকে স্বাধীন করার সময় এখনও আসেনি।

—আপনার আদেশ বুঝতে পারছি না মহারাজ! জ্যোতিষাচার্য বললেন।

রঘুনাথও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাল পিতার রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে।

দুর্জন সিংহ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নির্জীব পড়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, রঘুনাথ, মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবে এই আমার ইচ্ছা। আর···

—আব?

—মুসলমানকে ঘৃণা কোরো না রঘুনাথ। ধর্মের বিদ্বেষ যেন বিষ্ণুপুরকে কোনও দিন কলঙ্কিত না করে। একদিন ধর্মের হানাহানি সব মুছে যাবে রঘুনাথ, সব মুছে যাবে।

বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের কাছে এ-কথা নতুন নয়। ধর্মের হানাহানি সব মুছে যাবে, সব মুছে যাবে। এ-কথা বহুবার শুনেছে রঘুনাথ। সবার উপরে মানুষ সত্য। সবার উপরে প্রেম।

যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ মনে পড়ল রঘুনাথের। জগন্নাথধামে হরিদাস মৃত্যুশয্যায়, তখন চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদের হরিদাসের পাদোদক সেবন করিয়েছিলেন। আর উৎসবে শ্রাদ্ধে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে তাঁরা আহার করতেন যবন হরিদাসের সঙ্গে।

তবে?

তবে কেন বিবিবাজারের কালো-বোরখায়-শরীর-লুকানো সেই পরমাসুন্দরী বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্যায়বোধ জেগেছিল?

'মুসলমানকে ঘৃণা কোরো না রঘুনাথ!'

দুর্জন সিংহের কথা বার বার মনের মধ্যে অনুরণন তুলে যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমানীকেই মনে পড়িয়ে দিতে চায়।

না, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার কাছে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে-প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তাকে।

কিন্তু বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছেও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ সে, হয়তো শোভা সিংহের বিরুদ্ধে, চন্দ্রপ্রভার পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে হবে তাকে।

আট

লালী নয়। লালবাঈ। বিবিবাজারের দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী নয়। ধনী সওদাগর আর নবাবজাদারা যার পায়ে সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে চায়, এমন এক রূপসী কলাবিদ।

হীরাবাঈ যেন তার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। প্রতিশোধ নেবার অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে এতদিনে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে, নৃত্যগীতের সব জ্ঞান ঢেলে দিয়ে যেন লালীকে নতুন করে গড়তে চায় হীরাবাঈ।

বুড়ো সৌকত খাঁ লালীকে গান শেখাতে শেখাতে থেমে পড়ে। মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু মৃদু হাসে হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু হীরাবাঈয়ের যেন ক্লান্তি নেই, সাধনালব্ধ সব জ্ঞান যেন কয়েকটি বছরের মধ্যে লালীর হৃদয়ে ঢেলে দিতে চায়।

তাই বুড়ো ওস্তাদ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হীরাবাঈ তখন তাকে নাচ শেখাতে শুরু করে। সম্ভ্রান্ত তওয়ায়েফের আদবকায়দা, জলসায় দাঁড়িয়ে পোশাক বদলের কানুন দেখিয়ে দেয়।

লালীর রক্তেও যেন নেশা ধরে যায়।

হীরাবাঈয়ের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, ভোগবিলাস লালীর মনেও স্বপ্ন জাগায়।

অথচ ওস্তাদ সৌকত খাঁ বুঝতে পারে না, কেন এই দুর্জয় সাধনা হীরাবাঈয়ের। শুধু অযোধ্যাপ্রসাদ লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হীরাবাঈ নির্জনে লালীকে বলে, গালে ফাগ নয়, আগ লাগাও তোমার চোখে। যেন পুরুষের কলিজা পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে-আগুনে।

লালী হেসে বলে, যাকে মোহব্বতের চোখে দেখব সেই মাশুককেও পুড়িয়ে ফেলব যে তা হলে।

—মোহব্বত ? ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় হীরাবাঈ।

বলে, ওসব মিথ্যে লালী, সব মিথ্যে। পুরুষকে কোনও দিন বিশ্বাস কোরো না, কোনও দিন তার মোহব্বতকে বিশ্বাস করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না। আর ভুলে যেয়ো না— হিন্দু কাফের, হিন্দু কখনও ভালবাসতে পারে না।

শেষের কথাটা যেন অযোধ্যাপ্রসাদকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে হীরাবাঈ।

কৌতুকের স্বরে লালী বলে, তুমিও তো হিন্দু ছিলে। হিন্দু কাফেরের ঘরেই জন্ম তোমার।

হীরাবাঈ গম্ভীর স্বরে বলে, হ্যাঁ লালী। হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই তাকে আরও ভাল করে চিনেছি।

চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে হীরাবাঈয়ের। সে-চোখ দেখে ভয় পায় লালী। সুর্মাটানা দুটি অপরূপ চোখ, যে-চোখের দৃষ্টির কাছে সিংহ বশ মানে, যে-চোখের চটুল চাহনির মোহে কত রাজকোষ নিঃস্ব হতে দেখেছে সে, সেই চোখের পিছনে এত জ্বালা দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে লালী।

সৌকত খাঁ দাড়িতে হাত বোলায় আর হাসে।

বলে, প্রেম কি জিনিস যেদিন বুঝবি বেটি, সেদিন জানতে পারবি হীরার মনে কেন এই

জ্বালা।

সে-কথা জানে লালী : জানে হিন্দুধর্ম শুধু প্রেমের গান গায়, কিন্তু প্রেমের দাম দিতে নারাজ। হীরাবাঈয়ের কাছেও শুনেছে সে, শুনেছে হিন্দু রাজা আর ভুঁইয়াদের কথা। মুসলমানী বাঈজীর লালসায় আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাতে বসে তারা, তবু তাকে পত্নীর মর্যাদা দিতে রাজি নয়। প্রেমের চেয়ে ধর্ম বড় তাদের কাছে।

কানে কানে সে-মন্ত্র বহুবার শুনিয়েছে হীরাবাঈ, বলেছে, পুরুষকে নিঃস্ব করাই তোমার ব্রত হবে লালী। তবু মনে মনে কত স্বপ্নই না দেখে সে।

হঠাৎ কোনও দিন হয়তো মনে পড়ে যায়, বিবিবাজারের সেই সুপুরুষ চেহারার সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে। সারা রাত ঘুম নামে না তার চোখে।

রঘুনাথ। এক টুকরো বিধর্মী নাম, মনের হাতে বার বার নাড়াচাড়া করে লালী। স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন বোনে।

সেদিনও এমনই কি এক স্বপ্ন দেখছিল লালী, বিলাসের শয্যায় শরীর এলিয়ে, চোখ বুজে।

নরম গালিচার ওপর পা টিপে টিপে কখন হীরাবাঈ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি।

—লালী !

ডাক শুনে চমকে চোখ ফেরাল লালী। উঠে বসল হীরাবাঈকে দেখতে পেয়ে।

হীরাবাঈ মৃদু হেসে বললে, খবর আছে লালী, খুশির খবর।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল ও।

হীরাবাঈ হাসল আবার ঠোঁট টিপে টিপে। বললে, এবার ওড়না তোলবার দিন এসেছে তোমার। লালী নয়, এবার থেকে তোমার নাম হবে লালবাঈ। আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।

ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল লালী। বললে, আমি ? আমি যাব মাইফেলে ?

—কেন যাবে না বহিন ? মৃদু হাসলে হীরাবাঈ। বললে, সব তাল তো ওস্তাদজির কাছে শিখে নিয়েছ, মজলিসি আদব তো শিখিয়েছি সবই। এখন থেকে মুজরায় না গেলে বাঈজীর কলিজা বানাবে কি করে লালী !

লালীর চোখেমুখে ফুটল আশঙ্কার ছাপ।

বললে, কিন্তু আমি যে কিছুই শিখিনি, কিছুই জানি না আমি ! না, না, যাব না আমি, যাব না—

লালীর পাশে এসে বসল হীরাবাঈ। কৌতুকের হাসি হেসে তার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, সব শিখেছ তুমি, সব, সব। তোমার এই রূপ-যৌবন দেখেই রহিম খাঁ মুগ্ধ হবে লালী, তোমার গানের রোশনি তাকে মুগ্ধ করবে।

—রহিম খাঁ ? বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল লালী।

—হ্যাঁ। পাঠান রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে আমাদের।

লালী ফিসফিস করে বললে, বেশ, যাব আমি, যাব।

আর সে-কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল হীরাবাঈ। স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লালীর চোখের তারায় চোখ রেখে ! কি যেন খুঁজলে লালীর এই আকস্মিক সম্মতিতে।

হীরাবাঈয়ের মনে বুঝি সন্দেহ উঁকি দিল। নরম-দিল মেয়েটার চোখে কিসের ছায়া ? কোন দুর্জয় বাসনা !

—ওস্তাদজি যাবেন আমাদের সঙ্গে ? প্রশ্ন করলে লালী।

হীরাবাঈ হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ওস্তাদজিও যাবেন।

—আর গঙ্গাতিলক ? কৌতুকের হাসি হেসে পুনরায় প্রশ্ন করলে লালী।

হঠাৎ যেন উষ্মার ছায়া দেখা দিল হীরাবাঈয়ের চোখে, পরক্ষণেই ক্রোধ চাপা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, তবল্‌জিও যাবে।

আশ্চর্য ! ঠাট্টা-বিদ্রূপে অযোধ্যাপ্রসাদকে আঘাতের পর আঘাত হানে হীরাবাঈ, কিন্তু লালী তাকে গঙ্গাতিলক বলে বিদ্রূপ করলেই লালীর বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে ওঠে তার। অথচ অযোধ্যাপ্রসাদের মনে যেন রাগ নেই।

অদ্ভুত মানুষ এই অযোধ্যাপ্রসাদ। শুধুই যেন রহস্যে ঘেরা। ওস্তাদ সৌকত খাঁকে যতই দেখছে ততই যেন ভালবেসে ফেলছে লালী। মেহেদি-রাঙানো আবক্ষ দাড়ি, রক্তিম তমাশবিন্ চেহারা, আর সুর্মাটানা দুটি বড় বড় শান্ত চোখ।

সারা জীবন ধরে মানুষটা যেন শুধু গানকেই ভালবেসেছে। নারীর প্রেম যেন তাকে স্পর্শও করেনি।

আর অযোধ্যাপ্রসাদ ? আশ্চর্য, বাঈজীর তবল্‌চি হয়েও লোকটার হিন্দুয়ানির অহঙ্কার যায়নি। কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, গলায় তুলসীর মালা, পরনে গরদের ধুতি আর চাদর।

তাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে হীরাবাঈ, অযোধ্যাপ্রসাদকে ডাকে গঙ্গাতিলক বলে। কিন্তু লালীর মুখে এ বিদ্রূপ শুনে মনের গোপনে জ্বলে উঠল হীরাবাঈ।

সত্যি, মানুষটাকে কেমন যেন বেমানান লাগে এই আবহাওয়ায়। তবু কেন যেন অযোধ্যাপ্রসাদকে সহ্য করে হীরাবাঈ, কেন, তা লালী বুঝতে পারে না।

কেমন যেন সন্দেহ হয় ওর। বহুবার দেখেছে, হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে হঠাৎ এক এক সময় বড় তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে অযোধ্যাপ্রসাদ। তবলার তাল কেটে যায়। ধমক দিয়ে ওঠে ওস্তাদ সৌকত খাঁ।

লজ্জায় সারা মুখ কালো হয়ে যায় তখন, বড় বিষণ্ণ দেখায় অযোধ্যাপ্রসাদকে, চোখ দুটো হয়ে ওঠে করুণ।

এই অযোধ্যাপ্রসাদের কাছেই শুনেছে লালী, শুনেছে হীরাবাঈয়ের জীবনের ইতিহাস।

রূপে গুণে অদ্বিতীয়া এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তারপর কয়েকটি বছর কেটেছিল তাদের সুখে শান্তিতে।

কিন্তু যার রূপ-যৌবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, সে কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারে ? সুবাদারের লালসার ইন্ধন জোগাবার জন্যে গ্রামে গ্রামে ভৈরবীর বেশে ঘুরে বেড়াত ঘটকী চর, তাদেরই দৃষ্টিতে পড়ল সেই গৃহবধূ।

একদিন যথারীতি কলসি কাঁখে নিয়ে গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে আর ফিরে এল না সে।

—ফিরে এল না ? বিস্মিত স্বর ফুটেছিল লালীর গলায়।

—না। বিষণ্ণ হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল অযোধ্যাপ্রসাদ।

বলেছিল, না, ফিরে এল না। শুধু সঙ্গীরা ভয়ে আতঙ্কে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল। সুবাদারি ফৌজ-বোঝাই দুখানা বজরা নাকি লুকিয়ে ছিল আড়ালে। হঠাৎ গ্রাম্যবধূদের ওপর লাফিয়ে পড়ে হীরাকে জোর করে বজরায় তুলে নিয়ে গেছে তারা।

—তারপর ?

অযোধ্যাপ্রসাদের চোখ ছলছল করে উঠেছিল। বলেছিল, তারপর ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে এল মেয়েটির স্বামী। দেখল, শুধু কলসিটা পড়ে আছে, আর তার পাশে কয়েক টুকরো ভাঙা শাঁখা। সেগুলো বুকে আঁকড়ে ফিরে গেল সে। ভাবলে, আর বুঝি কোনও

দিন ফিরে পাবে না তাকে।

শুনতে শুনতে লালীর চোখেও জল এসেছিল। কান্নার স্বরে বলেছিল, পায়নি ফিরে ?

—পেয়েছিল। কিন্তু, কিন্তু ফিরে নিতে পারেনি সে। এক বছর বাদেই সুবাদারের লোক সেই ঘাটেই নামিয়ে দিয়ে গেল তাকে। কিন্তু নবাবের উচ্ছিষ্ট হয়ে ফিরে এসেছে যে-মেয়ে, তাকে সমাজ ফিরে নিতে চাইল না। সপরিবারে সকলকে পতিত হতে হবে, ভয় দেখাল সমাজপতির দল।

শুনে বিস্মিত না হয়ে পারেনি লালী।

মনে পড়েছিল শুধু হীরাবাঈয়ের কথাটা। — হিন্দুর ধর্ম শুধু প্রেমের গান গায় লালী, প্রেমের দাম দিতে নারাজ।

সত্যিই হয়তো তাই। অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে হীরাবাঈয়ের জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে লালীর। মনে হয়েছে, কখনও যদি সুযোগ পায় ও, তা হলে মুসলমানের প্রতি হিন্দু কাফেরের এই ঘৃণার প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ নেবে নারীর ওপর অক্ষম পুরুষের এই হৃদয়হীন নির্যাতনের।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের অত্যাচার এদিকে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নৃত্য-গীতকে রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চান আলমগীর। ওদিকে আগ্রা থেকে অসুখের ভান করে লুকিয়ে পালিয়েছেন মারাঠা-সূর্য শিবাজী। তাই আক্রোশে ফেটে পড়েছেন শাহ্ আলম— দুনিয়ার বাদশাহ্।

নিজের কীর্তির গ্লানি মনের আয়নায় হয়তো দেখতে পেতেন শাহ্ আলম। তাই ফরমান জারি করলেন, কেউ ইতিহাস লিখতে পাবে না তাঁর রাজত্বকালের। তাঁর জীবনের কোনও ঘটনাই লিপিবদ্ধ করতে পাবে না কোনও হিন্দু বা মুসলমান।

আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় সাজাহানের দিন কাটছে। পার্বত্য মূষিক বলে যাকে বিদ্রূপ করেছিলেন, বারংবার তার কৌশলের কাছে পরাভূত হয়েছেন মোগল সম্রাট। আর শাহ সুজা ! এক অবোধ্য দুঃস্বপ্নের মত তখনও শাহান্ শাহ্র মনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাহ সুজার বিভীষিকা। সুজার মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না আওরঙ্গজেব, বিশ্বাস করতে পারেন না কোনও মানুষকে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর, আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। মনে হয়, যেন পারস্যের মিত্রসৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে সুজা। কখনও দেহরক্ষীর চোখে অবিশ্বস্ততার কুটিল হাসি খুঁজে পান।

জীবনের সব আনন্দ যেন ঘুচে গেছে তাঁর। সমস্ত মন শুধু বিপদের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন। তাই অন্যের আনন্দও সহ্য করতে পারেন না।

নৃত্যগীতে এতদিন তাঁর নিজেরই বিতৃষ্ণা ছিল। এবার অন্যের তৃষ্ণাকেও অতৃপ্ত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন বাদশাহ্।

হিন্দুর যাত্রাগান আর মেলা নিষিদ্ধ করে দিলেন, নিষিদ্ধ হল নৃত্যগীতের চর্চা।

ওস্তাদ সৌকত খাঁ দুঃখের হাসি হেসে বললে, সঙ্গীত ছিল আমার একমাত্র বেগম, তাকেও তালাক দিতে হবে বেটি !

হীরাবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। —সত্যি ওস্তাদজি। গান আর নাচকে কবর দিতে চায় শাহ্ আলম, এ যে কল্পনাও করা যায় না।

আর লালী বললে, তার চেয়ে চলো পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বেই চলে যাই আমরা।

বুড়ো সৌকত খাঁর চোখে জল টলমল করল।

বললে, বেটি, নিজের কথা ভাবছি না, হাজার হাজার গুণী খেতে না পেয়ে মারা যাবে হিন্দুস্থানে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে হারিয়ে যাবে আমাদের গান, হাজার বছরের সাধনা ?

—হ্যাঁ অযোধ্যাপ্রসাদ। গলায় কালো সুতলিতে বাঁধা রুপোর চৌকো তাবিজটা নাড়াচাড়া করতে করতে সৌকত খাঁ বললে, সব হারিয়ে যাবে, বেবাক হারিয়ে যাবে।

হীরাবাঈ শুধু বললে, না ওস্তাদজি, সারা আগ্রা আর দিল্লির ওস্তাদ আর বাঈদের দল নিয়ে যাব আমরা শাহ্ আলমের কাছে আরজি করতে। এ ফরমান বদল করতে হবে।

আওরঙ্গজেবের আদেশ বদল করতে চায় হীরাবাঈ ! সৌকত খাঁ হাসল মনে মনে। তবু আপত্তি করল না।

তারপর দল বেঁধে একদিন আরজি পেশ করতে গেল ওরা। আলমগীরের 'ঝরোকা-দর্শন'-এর সামনে।

আওরঙ্গজেব সেদিনও এসে দাঁড়ালেন ঝরোকার সামনে। সব গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য প্রতিদিন যেমন দর্শন দিয়ে জানাতেন, আমি বেঁচে আছি, সেদিনও তেমনি ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল তাঁর সামনের পথে।

কাফনে-ঢাকা কয়েকটি মৃতদেহ নিয়ে চলেছে একদল লোক, আর পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে নারী-পুরুষের মিছিল।

আওরঙ্গজেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কার মৃতদেহ চলেছে পথ দিয়ে ?

উত্তর শুনে হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

সঙ্গীতের ?

বললেন, কবরটা খুব ভাল করে খুঁড়তে বলো। যেন কোনও দিন আর মাথা তুলে উঠতে না পারে।

এ নৃশংস রসিকতা শুনে বুক কেঁপে উঠল সকলের। বুঝল, শাহ্ আলমের মত বদলানো যায় না। বুঝল শুধু সঙ্গীতেরই নয়, সঙ্গীতজ্ঞেরও মৃত্যু ছাড়া আর কোনও পথ নেই এ মোগল-রাজত্বে।

শুধু হীরাবাঈ বললে, দু'টি জায়গা আছে ওস্তাদজি। সেখানেই যেতে হবে আমাদের।

—কোথায় বেটি ? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলে সৌকত খাঁ। বললে, শাহ্ আলমের রাজত্বের বাইরে কোথায় যাবি ?

হীরাবাঈ হেসে বললে, পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বে। রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছিল ওস্তাদজি।

সৌকত খাঁ সম্মতি জানাল। —হ্যাঁ, সেখানেই যেতে হবে।

হীরাবাঈ বললে, রহিম খাঁ যদি ইজ্জত না দেয়, বিষ্ণুপুর যাব ওস্তাদজি ! শাহ্ আলমের গোলাম নয় বিষ্ণুপুর। আর, আর বিষ্ণুপুরের কুমার রঘুনাথ সঙ্গীতরসিক···

কিন্তু সেখানেও কি আশ্রয় পাবে হীরাবাঈ ? শাহ্ সুজাকে যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আওরঙ্গজেব, তেমনি করেই সঙ্গীতের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবে দিনের পর দিন।

শাহ্ সুজা ! সত্যিই কি বেঁচে আছেন তিনি ? কে জানে, হয়তো আওরঙ্গজেবের সন্দেহই ঠিক। শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যেই হয়তো মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিয়েছেন সুজা।

সুজার কথা মনে পড়লেই বুকে সহানুভূতির ব্যথা অনুভব করে হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ শুনেছে, আরাকানরাজ সুবর্মার ভোগ-লালসা চরিতার্থ করতে বাধ্য হয়েছে সুজার দুই কন্যা, শুধু পরীবানু নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সব গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কোচবিহার-রাজের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল হীরাবাঈ। ফেরার পথে গৌড়ের মেলায় গ্রাম্য বাউলের মুখে সুজার এ কাহিনী শুনেছে সে। শুনে সুজার দুঃখে চোখে জল এসেছে সকলের। যাত্রাগানেও হয়তো এমনি করেই শাহ্ আলমের স্বরূপ প্রকাশ করে দিচ্ছে গ্রাম্য

কবির দল। তাই হয়তো নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা আর মেলাও নিষিদ্ধ করেছেন শাহ আলম।

হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর ছাড়া আর বুঝি আশ্রয় নেই হীরাবাঈয়ের। একমাত্র ভরসা রহিম খাঁ।

মণিবানুকে ডেকে হুকুম দিল হীরাবাঈ।

বললে, হাতির পিঠে হাওদা চড়াতে বলো। আর ওস্তাদজিকে বলো সারেঙ্গিদের খবর দিতে।

বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে তবলচি অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, আর আমি?

একদৃষ্টে অযোধ্যাপ্রসাদের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে হীরাবাঈ বললে, হ্যাঁ, তুমিও যাবে গঙ্গাতিলক!

কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন অযোধ্যাপ্রসাদ।

নয়

রুপোর হাওদায় রংদার রেশমের আম্বারি, আম্বারির গায়ে মখমলের ঝালর। মখমলের ওপর জরি আর আয়নার তারা। রুপোর পাতে রং-বেরঙের মিনা।

হাওদা থেকে নামল হীরাবাঈ, হীরাবাঈয়ের পিছনে পিছনে লালী। আর পিছনের হাতির পিঠ থেকে নামল বুড়ো ওস্তাদ, তবলচি অযোধ্যাপ্রসাদ আর সারেঙ্গির দল।

রহিম সেখের রংমহলের দরজায় নামল সকলে। পাইক-পেয়াদা দাসদাসী সবাই সেলাম করে আদাব জানাল।

কিন্তু হীরাবাঈ যেন খুশি হল না। রহিম খাঁ আসেনি কেন? আদব জানে না লোকটা? ভাবে, আসরফি ছুঁড়ে দিলেই মন পাওয়া যায়, গান শোনা যায়?

না, রহিম সেখ তার কেল্লায় গেছে সৈন্যদের কাছে একটা সুখবর পৌঁছে দিতে। তাদের চোখে নতুন স্বপ্ন এঁকে দিতে গেছে রহিম খাঁ। সারা হিন্দুস্থানে মোগল সৈন্যদের শিবিরে শিবিরে বিষাদের ছায়া নেমেছে। ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেবের ওপর তাদের সুপ্ত আক্রোশটা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে হয়তো। ভারতবর্ষে পাঠানশক্তিকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করার এই সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু সুখবরটা কি, জানতে পারল না হীরাবাঈ। ভাবলে, নাচের মুজরায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে জেনে নেবে রহিম খাঁর স্বপ্ন।

একটি একটি করে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল রহিম খাঁর রংমহলে। আতরদান এল, এল সুরার পাত্র।

আর হায়দারি আঙুর।

দ্রুতপায়ে নাচঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হীরাবাঈ। নূপুরের ছন্দে হঠাৎ যেন তাল কেটে গেল। রহিম খাঁ পাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে গোপন পরামর্শে রত শোভা সিংহের চোখে চোখ পড়ল তার। বিবিবাজারের সেই ঘটনার ছবি ভেসে উঠল হীরাবাঈয়ের মনে।

বাঈজীর সম্মান রাখেনি আহাম্মক। তার সব ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সারেঙ্গিদের সামনে।

কিন্তু মেদিনীপুরের ভূস্বামী উড়িষ্যায় এসেছে কোন উদ্দেশ্যে? কেন এই গোপন পরামর্শ? এ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিল সে বর্ধমানরাজের কাছে। বছরের পর বছর

পার হয়ে গেছে, এখনও কি শোভা সিংহের মনে টিকে আছে সেই সুপ্ত আক্রোশ ?

রহিম খাঁকে তস্‌লিম করে দাঁড়াল হীরাবাঈ। ভেড়ুয়ার পিঠে পা তুলে দিয়ে। তার সুন্দর পা দুটি থেকে জরি আর পান্না বসানো নাগরা খুলে নিল আরেকজন ভেড়ুয়া।

রহিম খাঁ দিল্ ছুঁড়ে দেওয়ার ইশারা করে নাচের অনুমতি দিল। বললে, খুশি মনে নাচো হীরাবাঈ।

শোভা সিংহ হেসে সায় জানাল। —হ্যাঁ, দিল্ জখম করে দাও তোমার গানে।

হীরাবাঈ রহিম খাঁর সামনে গিয়ে কুর্নিশ করলে। —বাদশাহ্ !

শোভা সিংহের কাছে গিয়ে বললে, রাজাবাহাদুর !

দুজনেই কৌতুকের হাসি হেসে পরস্পরের দিকে তাকাল।

হীরাবাঈ বললে, এ পূর্ণিমার চাঁদ আর কত নাচ দেখাবে বাদশা ! তার চেয়ে গান শুনুন লালবাঈয়ের। দ্বিতীয়ার চাঁদ সে, তিল তিল করে বাড়ছে তার রূপযৌবন।

লালবাঈ ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল রহিম খাঁ।

—হ্যাঁ হুজুর ! বলেই ইশারা করলে হীরাবাঈ।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে নাচের তালে তালে রহিম খাঁর সামনে এসে দাঁড়াল লালী।

রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ্ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তাকিয়ে রইল লালবাঈয়ের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার দিকে !

লাল রেশমের ঘাগরা, রেশমি জমিতে জরি আর পোখরাজের রোশনাই। লাল মখমলের কাঁচুলিতে যৌবনের বহ্নি। সাদা মসলিনের ওড়না লালবাঈয়ের মুখের স্বচ্ছ্ আবরণ।

মোহগ্রস্তের মত সেদিকে তাকিয়ে রইল রহিম খাঁ। এ-রূপ যেন কখনও দেখেনি সে, এ-সৌন্দর্য বুঝি বা বেহেস্তের হুরীর শরীরেই সম্ভব।

হীরাবাঈ ফিসফিস করে বললে, ওড়না তুলে দিন বাদশাহ, পহেলি মাইফেল হোক আজ আপনার রংমহলে।

—পহেলি মাইফেল ?

লালসালুব্ধ চোখে লালবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নেশার পায়ে টলতে টলতে এসে ওড়না তুলে দিল রহিম খাঁ।

জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে ওড়না তুলল লালবাঈ। রহিম খাঁ দিল পহেলি মাইফেলের আদেশ। এ-রীতির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তাকে আজীবন ! স্বেচ্ছায় মুক্তি না চাইলে বাঈজীর সম্মান আর আশ্রয় দিতে হবে রহিম খাঁকে, যতদিন না লালবাঈ নিজে মুক্তি চায়।

কিন্তু হীরাবাঈ ! হঠাৎ বড় বিষণ্ণ বোধ করল হীরাবাঈ। লালীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সেই সার্থক মুহূর্তে কেন এই বেদনাবোধ ? নিজেকে এত অসহায় বুঝি কখনও মনে হয়নি তার।

নৃত্যরতা লালবাঈয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রহিম খাঁ ইশারায় ডাকলে হীরাবাঈকে। তাকিয়া হেলান দিয়ে কাছে বসতে বলল তাকে। তারপর একসময় সুরার নেশায় ডুবে গেল রহিম খাঁ, ডুবে গেল শোভা সিংহ।

লালবাঈয়ের নাচের ঘূর্ণিতে তখন ঝড়তুফান। উড়ছে ওড়না, ঘুরছে ঘাগরার জরিদার সল্‌মাচমক কিনার। লাল মখমলের কাঁচুলি দুলছে, কাঁপছে। জ্বলন্ত যৌবনের শিখা যেন। তালে তালে বেজে চলেছে ঘুঙুরের ঝমক্। নাচ নয়, যেন তুফান।

হীরাবাঈয়ের আঙুলের মিনে-করা সোনার মিজরাব গুনগুন সুর তোলে সেতারের

বুকে। ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দ হল জলসা, সেতারের সুর মিলিয়ে গেল, কালো মেঘের পর্দায় ঢাকা পড়ল যেন আসমানের চাঁদ। মেঘ সরে গেল, আবার ফুটে উঠল আলো, ককিয়ে কেঁদে উঠল তানপুরার তার। মৃদু কণ্ঠে গান শুরু করল হীরাবাঈ, মনের নিঃস্বতা চাপা দেবার জন্যেই।

ধীরে ধীরে সুর ফুটল হীরাবাঈয়ের কণ্ঠে। জমে উঠল জলসার মসরুর।

গানের ভাঁজে ভাঁজে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিল হীরাবাঈ রহিম খাঁর চোখে, তারপর মৃদু হেসে শুরু করলে দরবারীর তেরানা। সপাট দুনী আর ছুটতানের ফুলঝুরি উঠল।

তেজ, তাবিশ আর মিঠাসের জলুসে জলসা মেতে উঠেছে তখন। নাচের ঘুঙুর বেজে চলেছে লালবাঈয়ের পায়ে।

এমন সময় আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লালবাঈ। ঘুঙুরের আওয়াজ থমকে থেমে গেল।

বিস্ময়ে সবাই ফিরে তাকাল লালীর দিকে। তার চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, দরজার পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে আছে এক মসিকৃষ্ণ দৈত্যরূপী হাবশি।

লালীর আতঙ্কের চিৎকার শুনে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসল হাবশিটা, তারপর আবার কুর্নিশ করল রহিম খাঁকে।

চিনতে পারল লালী।

চিনতে পেরেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

মনে করল বিবিবাজারের সেই দৃশ্য! ফকির সাহেবের চবুতরা থেকে বাঁদীপট্টির তাঁবুতে ফিরে আসার ঘটনাটুকু মনে পড়ল।

সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিল হাবশিটার পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিল তার ঘনকৃষ্ণ পিঠের ওপর। বাঁধন খুলে দেওয়ার পর—তর্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিল হাবশিটা।

সে-দৃশ্য মনে পড়তেই ভয়ে ভয়ে হীরাবাঈয়ের পাশে এসে বসল লালী, মুখ তুলে হাবশিটার দিকে তাকাতেও সাহস হল না।

দশ

প্রতিদিনের মতই সেদিনও মুজরা মিইয়ে গেল। চিতোয়া-বরদার চিঠি পেয়েই গোপন পরামর্শের জন্যে উঠে গেল শোভা সিংহ আর রহিম খাঁ। একে একে নিবে গেল জলসা-মহলের প্রতিটি আলো। সুর থেমে গেল সারেঙ্গির।

বালাখানায় ফিরে এল হীরাবাঈয়ের দল।

রাতের আকাশে তখন তারার ঝিকিমিকি। অট্টালিকা-সংলগ্ন সায়রের জলে ভাঙা-চাঁদের জ্যোৎস্না। শান্ত শীতল বাতাসের কোমল স্পর্শে লালবাঈয়ের শরীরে এক অনাস্বাদিত পুলক জেগে উঠল।

কাঞ্চনীর বেশ ত্যাগ করে সহজ পোশাকে শরীর জড়িয়ে জানালায় এসে দাঁড়াল লালী।

ক্রমশই যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। অস্বস্তি বোধ করে। তার এই উদ্দেশ্যহীন জীবন-যৌবনকে কত দূরে টেনে নিয়ে যাবে সে? কোথায় গিয়ে মিলবে চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম? তার যৌবনহৃদয় প্রেমের জন্যে কাঙাল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

রহিম খাঁর সাবাস, হাবশি চরের লালসালুব্ধ দৃষ্টি, হীরাবাঈয়ের স্নেহসিঞ্চন— সব-কিছুর মধ্যেও হাঁপিয়ে ওঠে লালী। নিজেকে তার অভিশপ্ত মনে হয়। 'আজীবন তোমাকে অনূঢ়া থাকতে হবে কন্যা।' ফকিরসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নয়, যেন এক সুতীব্র অভিশাপ।

বাঁদীবাজারের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে সেদিন যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিল সে মনে মনে, কে জানত তা এমন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন! কে জানত ঐশ্বর্য আর আনন্দের জলুস শুধুই বাইরের আবরণ, হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে পারে না বিলাসব্যসনের উদগ্র নেশা।

হাবশি সুলেমানকে দেখে ভয় পায় লালী। কিন্তু রহিম খাঁ? না, রহিম খাঁর আসরফির মূল্যে আত্মবিক্রয় করেছে সে, ভালবাসতে পারেনি। ঘৃণা? হ্যাঁ, রহিম খাঁকে হয়তো বা মনের গোপনে ঘৃণা করে লালী। তার বীরত্ব, অহঙ্কার, উদ্দামতার নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে লালী, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

শুধু শান্তি পায় একজনের সান্নিধ্যে।

অযোধ্যাপ্রসাদ!

কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, বেশবাসে হিন্দুয়ানি। তবু অযোধ্যাপ্রসাদের প্রতি কি এক অবোধ্য আকর্ষণ বোধ করে লালী। প্রেম নয়, কামনা নয়। তবু তার কাছে দুদণ্ড বসতে পেলে যেন মনের বিক্ষুব্ধ স্রোত শান্ত হয়ে যায় নিমেষে। তাই বার বার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, অথচ কাছে গিয়ে কথা ফোটে না লালীর মুখে। শুধু 'গঙ্গাতিলক' বলে বিদ্রূপ করে বসে আর হাসে।

গানের মুজরায় তবল্‌চি অযোধ্যাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কখনও উদাস হয়ে যায় লালী, সব ভুলে যায়, মন চলে যায় কোন-এক না-ভাবার গভীরতায়। এমন একটি ব্যর্থ জীবনকে কানায় কানায় ভরে দিতে পারলে যেন শান্তি পায় লালী। তাই হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

—বেশরম্! ক্রোধের স্বরে চিৎকার করে সাবধান করে দেয় হীরাবাঈ।

হুঁশ ফিরে আসে হীরাবাঈয়ের ধমকে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক লজ্জারুণ রক্তে লাল হয়ে ওঠে লালীর মুখ। অপ্রতিভ হাসি হেসে তানপুরার তারে আঙুল বুলিয়ে যায় লালী, কিন্তু মনে মনে হীরাবাঈয়ের দুর্বোধ্য ব্যবহারে বিস্মিত হয়। কখনও আক্রোশে ফেটে পড়ে।

তবু অপমান লুকোবার জন্যে কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়ে, আর বলে, গঙ্গাতিলক কেমন মাথা নেড়ে নেড়ে তবলা বাজায় দেখছিলাম।

গোপন হৃদয়ের জ্বালা লুকিয়ে প্রতিজ্ঞা করে, জলসার মাঝে যেভাবে লালীকে বার বার অপমান করে হীরাবাঈ, সুযোগ পেলে এমনি ভাবেই একদিন এ-অপমানের জবাব দেবে সে।

কখনও কখনও সন্দেহ উঁকি দেয়। লোকচক্ষুর সামনে অযোধ্যাপ্রসাদকে এড়িয়ে চলে হীরাবাঈ, তবল্‌চির তাল ভুল হলে নির্দয়কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, কিন্তু হীরাবাঈয়ের মনেও হয়তো মোহব্বত লুকিয়ে আছে অযোধ্যাপ্রসাদকে ঘিরে। কে জানে!

তা হোক, তবু অযোধ্যাপ্রসাদকে সে ছিনিয়ে নেবে হীরাবাঈয়ের হাত থেকে। তার রূপযৌবনের বহ্নিশিখার কাছে হীরাবাঈয়ের রূপ একটা চাঁদির চুটকির দামও পাবে না অযোধ্যাপ্রসাদের চোখে।

মনে মনে আক্রোশে জ্বলে ওঠে লালী।

—মোহব্বত! ক্রুদ্ধ চোখে একদিন তাকিয়েছিল হীরাবাঈ। বলেছিল, সব মিথ্যা লালী, সব ঝুটা। হিন্দু কাফের, হিন্দু কখনও ভালবাসতে পারে না।

কৌতুকের হাসি হেসে জানালায় দাঁড়ায় লালী। তার মন বলে, অযোধ্যাপ্রসাদের আকর্ষণ থেকে লালীকে দূরে রাখবার জন্যেই সাবধান করেছিল হীরাবাঈ।

উপদেশ নয়, ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পায় সে হীরাবাঈয়ের কথায়।

বুঝতে পারে, পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে সে লালী আর অযোধ্যাপ্রসাদের মধ্যে। হয়তো দুজনের মধ্যে একটা দূরত্বের পাঁচিল গড়ে তুলতে চায় হীরাবাঈ। একটা বিচিত্র রহস্যময় খেলা। তাই বাধা পেয়ে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে লালী। নেশা জেগে ওঠে তার উষ্ণ রক্তে।

ঝরোকায় দাঁড়িয়ে সায়রের নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকে লালী। হঠাৎ একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচড় দিয়ে ওঠে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে সায়রের পাড়ে গুলবাগিচার দিকে। ক্ষণে ক্ষণে সুরার পাত্র তুলে নেয়, জ্বালা দিয়ে জ্বালা জুড়োতে চায়।

হঠাৎ চোখ পড়ে একটি ছায়াশরীরের দিকে। অযোধ্যাপ্রসাদ? হ্যাঁ, নিরালা জ্যোৎস্নার আবছায়ায় জলের ধারে একাকী বসে আছে অযোধ্যাপ্রসাদ।

অনুসন্ধানী চোখে হীরাবাঈয়ের কক্ষের দিকে তাকায় লালী।

আলো নিবে গেছে হীরাবাঈয়ের ঘরে। হয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে হীরাবাঈ।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল লালী। করুণ বিষণ্ণতার দেহমনে একটা জ্বালাহর প্রলেপ দিতে চায় সে। অযোধ্যাপ্রসাদের ছায়াশরীরের দিকে লক্ষ রেখে তাই এগিয়ে গেল সায়রের দিকে। নেশায় পা টলতে থাকে তার।

একেবারে অযোধ্যাপ্রসাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

—গঙ্গাতিলক।

ফিরে তাকাল অযোধ্যাপ্রসাদ। তাকে হীরাবাঈ মনে করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পেরে ম্লান একাকিত্বের কণ্ঠে বললে, কে, লালী?

লালী শান্তস্বরে বললে, এত রাত্রে একা বসে বসে কি ভাবছেন তবল্‌জি?

—কি ভাবছি? হাসল অযোধ্যাপ্রসাদ। বললে, জীবনে আমার কি আছে, কে আছে, লালী, যে তার কথা ভাবব বিনিদ্র চোখে?

—সব, সব আছে আপনার। মৃদু হেসে নেশার কণ্ঠে লালী উত্তর দিলে। বললে, চাইতে জানলেই পাওয়া যায় তবল্‌জি, জোর করে কেড়ে নিতে জানলে সবই পাওয়া যায়।

—প্রেম?

—প্রেম, মোহব্বত, তাও পেতে হলে তাকত দরকার। তাও জোর করে আদায় করতে হয় গঙ্গাতিলক।

সশব্দে হেসে উঠল অযোধ্যাপ্রসাদ। বললে, না লালী, প্রেম ভিক্ষা পেতে হয়। প্রেম জোর করে নেওয়া যায় না, যে পায় তার কাছে আপনা থেকেই আসে।

কৌতুকের হাসি হেসে অযোধ্যাপ্রসাদের পাশে বসে পড়ে লালী। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে।

তারপর অযোধ্যাপ্রসাদের একটা হাত তুলে নেয় মুঠোর মধ্যে। নেশায় ভেঙে পড়ে জড়ানো গলায় বলে, হয়তো তাই, হয়তো মোহব্বত আপনা থেকেই এসে ধরা দেয়।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে লালী, অযোধ্যাপ্রসাদের শরীরে তার উষ্ণ দেহের স্পর্শ দিয়ে। বলে, তাই আপনা থেকেই এসেছি তবল্‌জি।

কামনামত্ত নাগিনীর মতো দুবাহু বাড়িয়ে অযোধ্যাপ্রসাদকে আলিঙ্গন করতে চায় লালী। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ে অযোধ্যাপ্রসাদের মুখে।

শিউরে ওঠে অযোধ্যাপ্রসাদ।

লালীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ফিরে যাও লালী, ফিরে যাও। সুরার নেশায় বেহুঁশ হয়ে গেছ তুমি, চলো পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে···

হঠাৎ সশব্দে হেসে ওঠে লালী— এত ভয় গঙ্গাতিলক ? ধর্ম নষ্ট হবার এত ভয় তোমার ?

—লালী ! হীরাবাঈয়ের ক্রুদ্ধস্বর শুনে পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে লালী।

দেখে, হীরাবাঈ এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে।

সুরার নেশায় পা টলতে থাকে লালীর। উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হীরাবাঈকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে বলে, সেলাম বাঈসাহেবা ! মাফ্···বেকসুর মাফ্ করে দাও হীরাবাঈ। তোমার আশককে কেড়ে নিতে এসেছিলাম। জানতাম না, জানতাম না তোমার অপেক্ষাতেই গঙ্গাতিলক বসে আছে ! তোমার কসম।

অট্টহাসে হেসে উঠল লালী, তারপর টলতে টলতে চলে গেল। দূর থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললে, সেলাম গঙ্গাতিলক। বলেই নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল স্খলিত পদক্ষেপে।

অযোধ্যাপ্রসাদ ধীরে ধীরে বললে, নেশা শয়তান, হীরা। নেশা ইজ্জত ভুলিয়ে দেয় মানুষের।

হীরাবাঈ বললে, লালীকে বাঁচাতে চাই আমি, হিন্দুস্থানের সেরা কাঞ্চনী করতে চাই। ওকে নষ্ট কোরো না তুমি, কাঞ্চনী থেকে কস্‌বী বানিয়ো না ওকে, এই আমার আরজি।

অযোধ্যাপ্রসাদ ম্লানমুখে বলে, এ কি মিথ্যে সন্দেহ তোমার হীরা ! আমি শুধু একজনকেই ভালোবাসি হীরা, একজনকে।

—তবল্‌জি ! ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে ওঠে যেন হীরাবাঈ। বলে, তোমার কসম ভুলে যেয়ো না। হীরাবাঈয়ের তবল্‌চি তুমি, আর কোনও পরিচয় নেই তোমার। সে-কথা ভুলে গেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে তোমাকে।

হাসে অযোধ্যাপ্রসাদ। —সাচ্চা জহরতকে কাচ বানাতে চাও হীরা ? বেশ, তাই হবে। শুধু দেখা পেতে চাই তোমার, কথা শুনতে চাই, আর কিছু নয়। তাই হবে হীরা, ভুলেই থাক্‌ব। জানব, আমি শুধু হীরাবাঈয়ের তবল্‌চি।

—হ্যাঁ, শুধু তবল্‌চি।

দ্রুতপায়ে ফিরে এল হীরাবাঈ।

লালীর কক্ষে ঢুকে দেখলে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাসছে লালী।

হীরাবাঈ ডাকলে, লালী !

লালী ফিরে তাকাল।

হীরাবাঈ বললে, তোমার যে-পায়ে নিজের হাতে পায়েল পরিয়ে দিয়েছি, ভুলে যেয়ো না সে-পায়ে শিকল পরাবার এক্তিয়ারও আমার আছে। ভুলে যেয়ো না, তুমি আমার বাঁদী।

পরক্ষণেই সদর্পে বেরিয়ে আসে হীরাবাঈ, উত্তর শোনবার জন্যে অপেক্ষা না করে। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, আর তবল্‌চিকে কোনও দিন যেন গঙ্গাতিলক বলে বিদ্রূপ করতে না দেখি, মনে রেখো।

আতঙ্কের চোখ তুলে তাকায় লালী। দেখে হীরাবাঈ চলে গেছে, ঘরের মাঝখানে এক দমকা বিভীষিকার বাতাস রেখে।

বহিন বলে যে একদিন স্নেহের আলিঙ্গন দিয়েছিল তাকে, সে-ই আজ মনে পড়িয়ে দিয়েছে লালী একজন সামান্যা ক্রীতদাসী। একশো মোহর দিয়ে কেনা বাঁদী তার।

হীরাবাঈকে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়।

মনে হয়, এক নিমেষে যেন তার সব সম্ভ্রম সব ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে গেছে হীরাবাঈ।

নিশ্চুপ পড়ে থাকে লালী। চোখ তুলতে পারে না। তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে এসে হীরাবাঈয়ের দরজায় কান পাতে। শুনতে পায়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সশব্দে কাঁদছে হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ কাঁদে ?

এগারো

দূর-উড়িষ্যার পাঠান দুর্গে রহিম খাঁর সঙ্গে বিদ্রোহের মন্ত্রণা করতে করতে শোভা সিংহ্ তার অনুজ হেমন্ত সিংহের চিঠি পেল।

চিঠি পেয়েই রহিম খাঁকে ইশারা করে গানের জলসা থেকে উঠে এল। খবর জানবার আগ্রহে রহিম খাঁও বেরিয়ে এল জলসাঘর থেকে। প্রশ্ন করলে, কি খবর দোস্ত, হঠাৎ গানের মৌজ নষ্ট করে দিলে কি কারণে ?

আক্রোশে জ্বলে উঠল শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দুঃসাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে বন্ধু।

রহিম খাঁ বিস্মিত হয়ে তাকাল শোভা সিংহের দিকে। বিচলিত বোধ করল যেন। —কি দুঃসাহস শোভাজি ?

শোভা সিংহ রোষদীপ্ত হাসি হেসে নিজের মনেই বললে, আওরঙ্গজেব দক্ষিণের শিবাজীকে দেখেছে, বন্ধু, কিন্তু বাংলার শোভাজির পরিচয় পায়নি এখনও।

রহিম খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে, লেফাফা কি খবর এনেছে দোস্ত্ ? যুদ্ধের ?

শোভা সিংহ সহাস্যে বললে, না, যুদ্ধকে ভয় পায় বাংলার নবাব। তাই কাপুরুষ ইব্রাহিম খাঁ শোভা সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার কন্যাকে নবাবি অন্দর-মহলে নিয়ে যাবার জন্যে তাঞ্জাম পাঠিয়েছিল, রহিম শেখ।

দাঁতে দাঁত চেপে রহিম খাঁ বললে, জানোয়ার !

শোভা সিংহ্ বললে, চিন্তার কারণ নেই বন্ধু, শোভা সিংহের কন্যা সে-তাঞ্জাম পদাঘাত করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠল রহিম খাঁ। বললে, শোভা সিংহের কন্যার যোগ্য উত্তরই সে দিয়েছে, দোস্ত্। কিন্তু—

—কিন্তু কি, রহিম শেখ ?

চিন্তার রেখা দেখা দিল রহিম খাঁর কপালে। বললে, এ অপমানের খবর আওরঙ্গজেবের কাছেও গিয়ে পৌঁছবে শোভাজি। আর সে-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে— বর্ধমানরাজকেও আনতে হবে বিদ্রোহীদের দলে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দাস কৃষ্ণরাম হবে বিদ্রোহী ? অসম্ভব রহিম শেখ, অসম্ভব।

—হিন্দুর ওপর মোগলের অত্যাচারে রাজা কৃষ্ণরামও বিরক্ত হয়ে আছেন, তাঁকে বন্ধুতে পরিণত করা কঠিন নয়, শোভাজি। স্বাধীন বিষ্ণুপুরের স্বার্থে আঘাত লাগেনি বলেই মল্লরাজ আলমগীরের বন্ধু, হয়তো বিদ্রোহ দমনের জন্যে তার সাহায্য নিতে পারে মোগল নবাব। সে শক্তিতে বাধা দিতে হলে বর্ধমানরাজকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করতে হবে। যে অধীন সে-ই বিদ্রোহ করে শোভাজি, বিদ্রোহ স্বাধীনের জন্যে নয়।

শোভা সিংহ্ চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু শত্রুকে বন্ধু করার যে কোনও পথই নেই শেখজি !

রহিম খাঁ হেসে বললে, আছে। শুনেছি রাজা কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী এক কন্যা আছে। আপন কন্যার জন্যে যোগ্য পাত্র খুঁজে না পেয়ে দিল্লির শাহজাদীদের মতই তাকে আজীবন কুমারী রাখতে বাধ্য হয়েছে কৃষ্ণরাম। তার কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠাও শোভাজি। আত্মীয়তার চেয়ে বড় বন্ধন আর নেই।

শোভা সিংহ সহাস্যে বললে, মূর্খ কৃষ্ণরাম শোভা সিংহকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করবে না, বন্ধু। মোগলের পদানত ভূস্বামীর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি।

রহিম খাঁ বললে, কন্যার বিবাহ সম্পর্কে হতাশ হয়ে এখন হয়তো ভুল ভেঙেছে কৃষ্ণরামের, প্রস্তাব পাঠাও বন্ধু, আমার বিশ্বাস, অপমান করার দুঃসাহস হবে না কৃষ্ণরামের। ভীত কৃষ্ণরামও জানে, আত্মীয়তার চেয়ে বড় বন্ধন আর নেই।

'আত্মীয়তার চেয়ে বড় বন্ধন আর নেই।' রহিম খাঁর কথাটা বারংবার মনের চারপাশে ঘুরে বেড়াল। চিন্তার দ্বন্দ্বে ডুবে গেল শোভা সিংহ।

বিবিবাজারের হীরাবাঈয়ের জলসায় যে অপমান ছুঁড়ে দিয়েছিল রাজা কৃষ্ণরাম, তার প্রতিশোধ নেবে সে, না তাকে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বেঁধে উত্তর দেবে লালসামন্ত ইব্রাহিম খাঁর ঘৃণ্য দুঃসাহসের !

উড়িষ্যা থেকে চিতোয়া-বরদার পথে ফিরে আসতে আসতে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হল শোভা সিংহের মনে। পথের আশেপাশে অসংখ্য দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্বেষের বিষ জ্বলে উঠল তার বুকে।

আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের প্রতিটি চিহ্ন যেন ঘৃতাহুতি দিল শোভা সিংহের ক্রোধাগ্নিতে।

মেদিনীপুরের পরগনা চিতোয়া-বরদায় ফিরে এল শোভা সিংহ, ফিরে এসেই শুনল আওরঙ্গজেবের নতুন নির্দেশ। তাম্রলিপ্ত থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দির নাকি বিনষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন দিল্লীশ্বর।

প্রজারা ভিড় করে এসে নিবেদন জানাল। চিতোয়া-বরদার প্রত্যেকটি মন্দিরকে বাঁচাতে হবে মোগল সম্রাটের অত্যাচার থেকে।

অত্যাচারের পর অত্যাচার। তখন আলগমীর হয়তো স্বপ্ন দেখছেন, সমগ্র 'ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারলেই তাঁর সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। বিদ্রোহী পাঠানও যে তাঁর স্বধর্মী, একথা তাঁর মনে হয়নি।

সুবা বাংলার বুকেও হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া ধার্য হল। পরোয়ানা এসে পৌঁছল দেববিগ্রহ বিনষ্ট করার নির্দেশ নিয়ে। গৃহস্থবধূর লক্ষ্মীর আসনেও হাত পৌঁছল বিধর্মী মনসবদারের। নিষিদ্ধ হল নাচ আর গান, হিন্দুর মেলা, দীপালি উৎসব আর হোরি উৎসব। রাজকর্মে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হল। পেশকার, দিওয়ানিয়ান, ক্রোরির আসন থেকে অবসর নিতে হল হিন্দু কর্মচারীদের। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ মাশুল ধার্য হল পণ্যদ্রব্যের ওপর।

দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল হিন্দু প্রজারা। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

তবু সহ্য করে ছিল শোভা সিংহ, বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেছে শুধু, স্বপ্ন দেখেছে সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে হিন্দুরাজ্য। বিদ্বেষী মোগল সম্রাটের হাত থেকে রাঢ়ভূমিকে ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে দিনের পর দিন।

কিন্তু সহ্যেরও বোধহয় সীমা আছে।

শোভা সিংহ কোনও দিন কল্পনাও করেনি, মোগল ঔদ্ধত্য শেষে তারই কন্যার দিকে লোভের হাত বাড়াবে। কল্পনা করেনি, তারই জায়গিরের দেবমন্দির ধূলিসাৎ করার আদেশ দেবে কোনও মনসবদার।

মনে মনে সঙ্কল্প ঠিক করে দূত পাঠাল শোভা সিংহ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠিয়ে।

সামাজিক উপঢৌকন নিয়ে বর্ধমান-রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হল দূত। যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে উপঢৌকনের স্বর্ণথাল আর শোভা সিংহের চিঠি তুলে দিল কৃষ্ণরামের হাতে।

প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম। দরবার কাঁপিয়ে অট্টহাস হাসল কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম।

কৃষ্ণরাম সহাস্যে বললেন, শোভা সিংহের এ প্রস্তাবের উত্তর দেবে সত্যবতী, তার কাছেই পাঠিয়ে দাও এ-পত্র।

খবর পৌঁছে গেল অন্দর-মহলে।

দূতের চিঠি আর উপহারের স্বর্ণথাল হাতে নিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে দাঁড়াল আলাপনী কাদম্বরী।

গজদন্তে বাঁধানো মুকুরের সামনে দাসীপরিবৃত হয়ে প্রসাধন করতে করতে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকাল সত্যবতী। প্রশ্ন করলে, কিসের উপহার কাদম্বরী?

কাদম্বরী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, মহারাজের অধীন এক তুচ্ছ জায়গিরভোগী শোভা সিংহ দূত পাঠিয়েছে রাজকুমারী। পরমাসুন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করতে চায় একজন সামান্য ভৌমিক।

অপমানে ক্রোধে ফেটে পড়ল সত্যবতী। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী কন্যাকে পত্নীরূপে পেতে চায় এক সামান্য ভূস্বামী? যার রূপে-গুণে বংশ-মর্যাদায় সমকক্ষ পাত্রের সন্ধান মেলেনি সারা ভারতে, হীন স্বামীর গলায় বরমাল্য তুলে দেওয়ার চেয়ে আজীবন কুমারীব্রত পালন করাকেই যে শ্রেয় মনে করে, তাকে পত্নীরূপে পেতে চায় এক অধীনস্থ জায়গিরদার? কাদম্বরীর হাতের স্বর্ণপাত্রের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল সত্যবতী।

বললে, এ রসিকতার কি অর্থ কাদম্বরী?

কাদম্বরী বললে, শোভা সিংহ এই যৌতুক পাঠিয়েছে রাজকুমারী, মহারাজের ইচ্ছা এ ঔদ্ধত্যের জবাব তুমি নিজেই দেবে।

একজোড়া স্বর্ণখচিত শঙ্খকঙ্কণ আর দুটি নারকেলের গায়ে সিঁদুরের প্রলেপ স্বর্ণথালের ওপর! সেদিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হেসে সত্যবতী বললে, দূতকে বলে দাও কাদম্বরী, এ কঙ্কণ শোভা সিংহের হাতেই মানাবে, আমার হাতে এই গুপ্তছুরিকাই একমাত্র ভূষণ।

বলে কটিবন্ধ থেকে ধারালো কুকরি বের করে দেখাল সত্যবতী।

সশব্দে হেসে উঠল কাদম্বরী। বললে, এ নারকেল ভাঙার স্থান কোথায় শ্বেত-পাথরের এই রাজপ্রাসাদে, বরং শোভা সিংহের মাথায়—

দুজনেই সশব্দে হেসে উঠল। দাসীর দল কৌতুকের হাসিতে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তর শুনে দূত বিদায় নিল, যাবার আগে জানিয়ে দিল শোভা সিংহের প্রত্যুত্তর। বললে, যে কঙ্কণ আজ ফিরিয়ে নিয়ে চলেছি মহারাজ, সেই কঙ্কণ শৃঙ্খল হয়ে ফিরে আসবে একদিন।

বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম দূতের মুখে শোভা সিংহের অহঙ্কার শুনে। বিভ্রান্ত বোধ করলেন তার ঔদ্ধত্যে। রাজা কৃষ্ণরাম দেওয়ানজিকে নির্দেশ দিলেন গোপনে

চিতোয়া-বরদার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে।

এ দুঃসাহসের পিছনে নিশ্চয় কোনও প্রস্তুতি আছে, নিশ্চয় গোপনে শক্তি সঞ্চয় করছে শোভা সিংহ। শুধুমাত্র পাঠান রহিম খাঁর শক্তিতে আস্থা রেখে অধীশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানোক্তি-করা সম্ভব নয় কোনও তুচ্ছ ভৌমিকের পক্ষে।

পুত্রের উদ্দেশে বললেন, শোভা সিংহের এ ঔদ্ধত্যের খবর সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে জগৎরাম। তাঁকে সাবধান করে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়ে রাখতে হবে। হয়তো বিদ্রোহের দেরি নেই।

জগৎরাম ভীত হয়ে পড়ল। সত্যিই হয়তো বিদ্রোহের আর দেরি নেই। দূতের উত্তরেই বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখতে পেয়েছে জগৎরাম। রাঢ়ভূমির প্রজাকুল অন্ধ আক্রোশ পুষে চলেছে আলমগীরের হিন্দু-নির্যাতনের জন্যে। শোভা সিংহের শক্তি তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু তার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গমাত্র কেন্দ্র করে প্রজাবর্গের নৃশংস উল্লাস ধ্বনিত হতে পারে মোগলের অনুগত বর্ধমানরাজের বিরুদ্ধে।

কালবিলম্ব না করে রাজমহলের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জগৎরাম।

ইব্রাহিম খাঁর দরবারে লক্ষ মোহরের নজরানার থলি তুলে দিয়ে খবর পৌঁছে দিল।

নজরানার লক্ষ মোহর খাজাঞ্চির হাতে দিয়ে জগৎরামকে আদর-আপ্যায়নে প্রীত করল অলস আর ভীরুস্বভাব ইব্রাহিম খাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করলে না জগৎরামের কথা। প্রবল-প্রতাপ আলমগীরের রাজত্বে কিনা একজন সামান্য জায়গিরদার বিদ্রোহ করবার স্বপ্ন দেখছে! অসম্ভব।

ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে শুনল অন্দরমহলের বেগমসাহেবা দিলরস বেগম।

শুনে হাসল।

বললে, মিথ্যা দুশ্চিন্তা জাঁহাপনা। আলমগীরের রাজত্বে কারও বিদ্রোহ করার সাহস থাকতে পারে না। আর তুচ্ছ শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলেও সে-আগুন আপনা থেকেই নিবে যাবে।

কিন্তু মনে মনে বললে, বিদ্রোহ বাইরে নয় ইব্রাহিম খাঁ, বিদ্রোহ তোমার অন্দর-মহলে।

বারো

কল্কা-তোলা পশমি বনাতের পর্দায় ঢাকা তাঞ্জাম ফিরে এল নবাব ইব্রাহিম খাঁর প্রাসাদে। জলসামহলের দারোগার কানে ফিসফিস করে কি যেন বললে বিশ্বস্ত সিন্ধুকি। দারোগা খবর দিল খোজা প্রহরীকে।

তারপর খোজার কাছ থেকে শুনল ইব্রাহিম খাঁর পহেলি বাঁদী। সুরার পাত্র তুলে দিতে গিয়ে কি য়েন বলতে গেল সে নবাবের কানে কানে।

আর পরক্ষণেই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আয়েশি শরীরটাকে তোলবার চেষ্টা করে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ইব্রাহিম খাঁ। —চুপ রহো বেয়াদব! দরবারের খবর কিনা রংমহলে পৌঁছে দিয়ে জলসার মৌতাত ভেঙে দিতে এসেছে বেকুফ!

ধমক শুনে ভয়ে সরে গেল বাঁদী।

মুহূর্তের জন্যে নাচের ঘূর্ণি থামিয়ে ইব্রাহিম খাঁর চোখে চোখ রেখে কটাক্ষ হানলে তয়ফা। যৌবনের লোভানি জ্বালাল শরীরের ছন্দে।

সুরার নেশায় মশগুল হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল ইব্রাহিম খাঁ। দুনিয়া রসাতলে যাক,

এমন নাচের মেজাজ নষ্ট করতে পারবে না সে সুদূর রাঢ়ভূমির এক ভৌমিক-কন্যার দুঃসাহসের খবর শুনে।

একদৃষ্টে ইরানি তয়ফার দিকে তাকিয়ে রইল ইব্রাহিম খাঁ। নাচের তালে তালে উড়ে পড়ছে গোলাপি ওড়না, কাঁপছে সোনালি জরির কাঁচুলি, চুনিচমক ঘাগরার মগজি ভেসে উঠছে ইরানি মেয়ের কোমর ঘিরে।

যৌবন-লালসার বিকৃত আনন্দে ডুবে গেল ইব্রাহিম খাঁ, ডুবে গেল বাংলার সুবাদারি মসনদ।

সুবাদারের অন্তঃপুর নয়, যেন বিলাস আর প্রমোদের রঙ্গভূমি। সহস্র নর্তকীর নূপুরনিক্কণের কাছে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের দুঃখ, কান্না। সুরা এবং সুরসুন্দরীর নেশায় ডুবে গেছে তখন সমগ্র জলসামহল।

কিন্তু সেই ফাঁকে অন্দরমহলে দেখা দিয়েছে কুটিল চক্রান্ত। অন্দরমহলের কর্ত্রী 'বেগমসাহেবা' দিল্‌রস বেগমের ঈষৎ শুভ্রকেশ তখন সাকিনা বেগমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের হিসেব কষে কষে শুভ্রতর হয়ে উঠছে। অন্যদিকে নবাবের প্রিয়পাত্রী সাকিনা বেগমের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

সাকিনার গোপন প্রেমাভিসারে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে প্রৌঢ়া দিল্‌রস বেগম। অথচ প্রকাশ্যভাবে তার আশনাইয়ে বাধা দিতে পারে না 'বেগমসাহেবা'।

সাকিনা বেগমের রূপ আর যৌবনের মোহে অন্ধ হয়ে আছে ইব্রাহিম খাঁ। লক্ষ লক্ষ আসরফি ঢেলে দেয় তার পায়ে, সাকিনা বেগমের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তৈরি হয় লক্ষ মুদ্রার হামাম-ই-গুলাব।

গোলাপ-নির্যাসে স্নান করবার জন্যে শ্বেত-মর্মরের এক বিশাল হামাম তৈরি হয়েছে সাকিনা বেগমের খাসমহলে। সে স্নানাগার পরিণত হয়েছে প্রণয়াভিসারের গোপন কক্ষে।

এই হামাম-ই-গুলাবের পাশের প্রসাধনকক্ষে তখন অপেক্ষা করে আছে সাকিনা বেগম।

রূপসী বাঁদীর দল তখন সাকিনার প্রসাধনে ব্যস্ত। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালি জরি সুপুষ্ট দুটি বেণীর গায়ে এঁকেবেঁকে লুটিয়ে পড়েছে আয়নায় মোড়া মেঝের ওপর। গোলাপি মসলিনের ওড়নার নীচে কাশ্মীরি রেশমের স্তনাবরণ। আসমানি আঙিয়ার গায়ে চুনি পান্না হীরে জহরতের চমক। স্বচ্ছ রেশমের চম্পাবরন পায়জামার কিনারায় রুপালি জরির নক্‌শায় ফিরোজা বসানো। হীরে মুক্তার টায়রা সিঁথিতে, কণ্ঠের সাতনরি মুক্তামালার লহরী বুকের তরঙ্গ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

মণিবন্ধের কঙ্কণের সারি সরিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটির ছোট্ট আয়নায় বার বার নিজের রূপ দেখে সাকিনা, নিজেই মুগ্ধ হয়!

বাঁদীরা অনুযোগ করে, এমন চাঁদের রূপ কি ওই ছোট্ট আয়নায় ধরা দেয় মালিকা বেগম!

শুনে খুশির হাসি হাসে সাকিনা, ঠোঁটের রং আর চোখের কোণে সুর্মার রেখা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে তাকায় দেয়ালের বড় আয়নার দিকে।

দেয়ালের চারপাশে, মাথার ওপরে আর পায়ের নীচে— সমস্ত ঘরখানাই ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কেনা দামি আয়নায় সাজানো। আর সেদিকে তাকিয়ে হাজারো সাকিনা বেগমের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় সে।

কপালের বাঁকা টায়রার নীচে যেন তুলিতে আঁকা একজোড়া ভুরু, আর তারও নীচে রহস্যময় একজোড়া চোখ।

ক্ষণে ক্ষণে দরজার মখমলের সবুজ পর্দাটার দিকে তাকায় সাকিনা বেগম, বাঁদীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রসাধনের মেজ থেকে কস্তুরির পাত্রটা তুলে নিয়ে হঠাৎ বাঁদীদের গায়ে ঢেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল সাকিনা। তারপর এসে বসল শ্বেতপাথরের বাঁধানো ফোয়ারার বেদিতে, বসল আঙুরের ভারে নুয়ে পড়া লতাঝোপের পাশে। নগ্ন নারীমূর্তির ফোয়ারা থেকে অবিরত ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ শীতল গোলাপজল। তাজা গোলাপের পাপড়ি ভাসে সে জলের তরঙ্গে। ফোয়ারার অন্য মূর্তিটির হাতের সুরাপাত্র থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফুটন্ত জল।

একদিকে ঠাণ্ডা জল, অন্যদিকে গরম জল এসে মিশছে। ফুটন্ত জলের ওপর দুলে দুলে উঠছে উষ্ণ বাষ্পের কুণ্ডলি।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে চোখ রেখে প্রতীক্ষার সময় গোনে সাকিনা বেগম।

এখনই এসে পৌঁছবে দশহাজারি মনসবদার জাফর খাঁ, সাকিনার অবৈধ প্রণয়ের আশক।

ক্ষণে ক্ষণে দরজার সবুজ মখমলের পর্দাটার দিকে আশার চোখে তাকায় সাকিনা বেগম, পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বাঁদীদের ওপর।

আভের পাখা নেড়ে বাতাস করছিল দুজন বাঁদী, তাদেরই একজনের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তার মুখের ওপর ঘা-কয়েক বসিয়ে দিলে সাকিনা, ময়ূরের পেখমগুলো ভেঙে গেল সে-আঘাতে।

তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল সাকিনা বেগম। প্রসাধনের মেজ থেকে গজদন্তের কারুকার্য করা সোনার আতরদানটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখল।

তারপর এসে বসল শ্বেতপাথরের বাঁধানো বেদিটায়।

চৌবাচ্চার ওপর আবলুস কাঠের আবরণ।

স্নানের সময় দুটো খোজা চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই আবরণ সরিয়ে দেয়, বাঁদীরা ছড়িয়ে দেয় তাজা গোলাপের পাপড়ি। মুহূর্তের নির্দেশে ঠাণ্ডা জলের ধারাবর্ষণ বন্ধ হয়, ঝরে পড়ে উত্তপ্ত জলের স্রোত।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই সাকিনা বেগমের। এমন গভীর রাত্রিতে স্নানের জন্যে আসেনি সে হামাম-ই-গুলাবে। এসেছে প্রণয়-অভিসারে।

ঝরোকার পাশে গিয়ে বসে সাকিনা, যে ঝরোকার গা বেয়ে উঠেছে আঙুরের লতা, নুয়ে পড়েছে রসালো সমরখন্দি আঙুরের ভারে!

ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে সাকিনা বেগম, তারপর হতাশা দেখা দেয় তার চোখে।

হঠাৎ একটা শিস বেজে উঠল। সাকিনার দুচোখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে ইশারায়।

পরক্ষণেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল সাকিনা। এ পদশব্দ তার চেনা।

বাঁদীরা ছুটে গেল, আর পরমুহূর্তেই একজন বাঁদী কিংখাবের পর্দা তুলে ধরল। সুদর্শন সুপুরুষ তুরানি মনসবদার জাফর খাঁ একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এল, আলিঙ্গন করলে সাকিনা বেগমকে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সরে গেল বাঁদী আর খোজার দল।

সাকিনা বেগমের বিশ্বস্ত বাঁদী পর্দার বাইরে এসে প্রহরায় নিযুক্ত রইল। ইব্রাহিম খাঁর জলসার দরজা এখান থেকে দেখা যায়. সেদিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে। জলসামহলের খোজা-দারোগাকে কুর্নিশ করতে দেখলেই বুঝতে হবে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বালাখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। শিস্ দিয়ে সাবধান করে দিতে হবে তখন।

খোজা প্রহরী দুজনকে ইশারা করলে বাঁদী, চাকা ঘুরিয়ে চৌবাচ্চার সব জল নিষ্কাশন

করার জন্যে। প্রয়োজন ঘটলে যেন ওই চৌবাচ্চার আবলুস কাঠের আবরণের নীচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে জাফর খাঁ।

খোজাদের নির্দেশ দিয়ে জলসামহলের দিকে ফিরে তাকাল বাঁদী। আর পরমুহূর্তেই দেখলে অদূরের আবছায়া অলিন্দে যেন একটি নারীমূর্তি ছায়ার মত দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে তাকে! চোখোচোখি হতেই মূর্তিটা আড়ালে সরে গেল।

বিস্মিত হল বাঁদী।

বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগম না? আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। সে জানে, নবাব-আত্মীয়া দিল্‌রস বেগম এ-আনন্দমহলের সর্বময় বেগমসাহেবাই নয়, তার অঙ্গুলিনির্দেশে জল্লাদের খড়্গ নামতে পারে জাফর খাঁর ঘাড়ের ওপর।

রুদ্ধশ্বাসে পর্দার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকেই সে ফিসফিস করে ডাকলে, মালিকা বেগম!

দূর থেকে বাঁদীর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে নিজের মনেই হাসল বেগসাহেবা দিল্‌রস। মূর্খ ক্রীতদাসী জানে না, এখনও বেগমসাহেবার চক্রান্ত সম্পূর্ণ হয়নি। অকারণে ইব্রাহিম খাঁর মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে সাকিনা বা জাফরকে দগ্ধ করতে চায় না দিল্‌রস।

স্বপ্ন সফল করবার জন্যেই সেনাপতি নুরুল্লা খাঁর সঙ্গে চক্রান্ত করে সিন্ধুকি নিয়োগ করেছিল দিল্‌রস, সুরা-বিভোর নবাবকে পাঞ্জা ছাপ দিতে বাধ্য করেছিল শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার জন্যে তাঞ্জাম পাঠানোর সময়।

হিসেবে ভুল হয়নি দিল্‌রস বেগমের। অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে পাইকের দল, ফিরে এসেছে শূন্য তাঞ্জাম। কিন্তু সে-খবর গোপন রেখেছে বেগমসাহেবা, বিশেষ মুহূর্তের জন্যে।

বাংলার মসনদে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিতে হবে জুলেখা বানুকে। বিলাসী ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত্‌ যদি দিল্‌রসের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, যদি বিবাহে অসম্মতি জানায়, তা হলে ইব্রাহিম খাঁকে সে অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করবে আলমগীরের কাছে। ইব্রাহিম খাঁর নবাবি তক্তে বসাবে ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে। জুলেখা বানুর ওপর নুরুল্লার দুর্বলতার কথা অজানা নয় দিল্‌রস বেগমের। অজানা নয় শাহ্‌ আলম আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের কথা।

অপমানে অত্যাচারে হিন্দু ভূস্বামী আর ভৌমিকদের বিদ্রোহী করে তুলবে দিল্‌রস। ইব্রাহিম খাঁর কাপুরুষতা প্রমাণ করবে দিল্লীশ্বরের কাছে।

তেরো

মেদিনীপুরের পরগনা বরদার অরণ্যে তখন অনুজ হেমন্ত সিংহের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে একটি মৃৎপ্রাচীরের দুর্গ। দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে এসে জড়ো হল শত শত রাজমিস্ত্রী, অস্ত্রনির্মাতা কর্মকার, অগণিত সৈন্য।

রহিম খাঁকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করলেও কেবলমাত্র পাঠানশক্তির ওপর আস্থা রেখে বসে থাকা চলে না। বাংলার স্বাধীনতা, হিন্দুর স্বাধীনতাই যেখানে কাম্য, সেখানে বিদেশী বিধর্মীর বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করা চলে না। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার করতে হবে, কিন্তু কাজ সমাধা হলে যাতে দুটি কণ্টকই ছুঁড়ে ফেলা যায়, তার শক্তি রাখতে হবে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে।

গোপনে শক্তিসঞ্চয় করে চলে শোভা সিংহ।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের রাজ্যের কোনও কোনও তালুকদার আর ভূস্বামী গোপনে সাহায্য পাঠায়। প্রতিশ্রুতি জানায় বিদ্রোহের মুহূর্তে যোগদান করার। দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি নতুন নগর— রাজনগর। চতুর্দিকে মাটির বুরুজ তৈরি হয়, কামান আমদানি হয় উড়িষ্যার অস্ত্রশালা থেকে। স্পর্ধার প্রথম জয়ধ্বনি ওঠে শোভা সিংহের দুর্গে, রাজনগরের প্রজাদের মুখে।

আলমগীরের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে তিনটি নতুন দেবমন্দির গড়ার আদেশ দিল শোভা সিংহ।

তারপর অনুজ হেমন্ত সিংহকে বললে, বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজনগরে নিয়ে আসতে হবে।

—জ্যোতিষাচার্য ? হাসল হেমন্ত সিংহ। বললে, দৈবেই যদি বিশ্বাস আপনার, তখন এত প্রস্তুতির কি প্রয়োজন ছিল !

শোভা সিংহ মৃদু হেসে বললে, দৈবে বিশ্বাসের জন্যে নয় হেমন্ত। দৈবজ্ঞকে করতে হবে রাজনীতির অস্ত্র।

চন্দ্রপ্রভা বিস্ময়ের চোখ তুলে বললে, কেন বাবা, জ্যোতিষশাস্ত্র কি সত্য নয় ?

শোভা সিংহ স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাল কন্যার মুখের দিকে, তারপর মৃদু হেসে বললে, জানি না মা, হয়তো সত্য, হয়তো বা মিথ্যা। কিন্তু একজনের গণনার ওপর নির্ভর করে কি একটি জাতি তার কর্তব্য স্থির করবে মা ? একজন জ্যোতিষীর গণনায় ভুল হলে সমগ্র বাংলা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

চন্দ্রপ্রভা হেসে বললে, একজন সেনাপতির ওপর আস্থা রেখেই তো একটি দেশ তার মূল্য দিতে বাধ্য হয়।

যুক্তির দিক থেকে তীব্র সত্য। শোভা সিংহ উত্তর খুঁজে পায় না।

তাই হেমন্ত সিংহ বললে, না প্রভা, শুধুমাত্র একজন অধিনায়কের আদেশে এ বিদ্রোহ নয়, সমগ্র বাংলার হিন্দু প্রজাদের মঙ্গলকামনা আছে এ বিদ্রোহের পিছনে। স্বেচ্ছাচারী পররাজ্যলোভী বিদ্রোহী নই আমরা। দেশের স্বাধীনতা বলতে বুঝি ধর্মের, সংস্কৃতির স্বাধীনতা। হিন্দুধর্মের, শিক্ষার, সংস্কৃতির স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।

চন্দ্রপ্রভা হেসে বললে, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র কি হিন্দুর সংস্কৃতি নয় ?

—না, শোভা সিংহ বললে, জ্যোতিষচর্চা হিন্দুর কুসংস্কার মাত্র।

শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠল চন্দ্রপ্রভা। এ কি বিধর্মীয় কথা শুনতে হল তাকে ! দৈব মিথ্যা ? জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা ? দৈব মিথ্যা হলে যে দেবতাও মিথ্যা হয়ে যাবে।

বিশালাক্ষীর মন্দিরের কাছে ছুটে গেল চন্দ্রপ্রভা। এ পাপ-উক্তির জন্যে দেবী বিশালাক্ষী যেন চিতোয়া-বরদার ভূম্যধিপতিকে ক্ষমা করেন।

কিন্তু কন্যার চোখে অশ্রুসজল আতঙ্ক দেখেও বিচলিত হল না শোভা সিংহ।

বললে, জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে হেমন্ত। উদ্দেশ্য জানতে পারবে তিনি রাজনগরে উপস্থিত হলেই !

অগ্রজের আদেশে বিষ্ণুপুর যাত্রা করল হেমন্ত সিংহ। আর সেই সময়ে দূত ফিরে এল বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে।

শোভা সিংহের উদ্দেশ্যকে কৃষ্ণরাম ভুল বুঝলেন। ঔদ্ধত্য মনে করে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন শোভা সিংহের প্রস্তাব।

দূতের মুখে সত্যবতীর বিদ্রূপ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল শোভা সিংহ।

পরমুহূর্তে অট্টহাসে কাঁপিয়ে তুলল চতুর্দিক। চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে উঠল পাপের

কুটিল ছায়া, সে দৃষ্টিতে অন্যায় লালসার শিখা দেখতে পেল দূত।

শোভা সিংহ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, রাজনন্দিনী! শোভা সিংহের পত্নীর আসন প্রত্যাখ্যান করেছ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে, কিন্তু একদিন এ সম্মানও পাবে না তুমি। সেদিন বারবিলাসিনীর মতো শুধুমাত্র অঙ্কশায়িনী হতে হবে এই তুচ্ছ ভূস্বামীর।

পরক্ষণেই নিজের কন্যার কথা মনে পড়ল শোভা সিংহের।

চন্দ্রপ্রভা!

নবাব ইব্রাহিম খাঁর লালসার হাত থেকে বাঁচাতে হবে চন্দ্রপ্রভাকে, বাঁচাতে হবে সমস্ত পাপ আর অন্যায়ের হাত থেকে।

ধীরে ধীরে চিত্তবিশ্রামের শয্যায় শরীর এলিয়ে দিল শোভা সিংহ। কপালে ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার রেখা। নিজের কাছেই যেন ধরা পড়ে গেছে শোভা সিংহ। মোগল নবাবের সঙ্গে হিন্দু ভূস্বামীর বুঝি কোনও পার্থক্য নেই! নারীর সম্মান উভয়ের হাতেই বিপর্যস্ত—এ-সত্য হঠাৎ যেন ব্যঙ্গ করে উঠেছে শোভা সিংহকে।

হুঁকাবরদার তামাক সেজে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হুকুমের অপেক্ষায়। সুগন্ধি অম্বরির আমেজে ভরে গেল সমস্ত ঘর।

ফরসির নলটায় দুটো টান দিয়েই শোভা সিংহ ধীরে ধীরে চোখ বুজল। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছে তখন।

চন্দ্রপ্রভা বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে পুষ্প আর চরণামৃত নিয়ে ফিরে এসে দেখলে, শোভা সিংহ নিদ্রাচ্ছন্ন।

ধীরে ধীরে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল চন্দ্রপ্রভা। পুষ্প আর চরণামৃত তুলে রেখে বাইরের অলিন্দে এসে দাঁড়াল সুরঞ্জাক্ষীর পাশে।

মৃদু হাসল সুরঞ্জাক্ষী। বললে, কার মঙ্গল-প্রার্থনা জানিয়ে এলে? কুমার রঘুনাথের?

চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিলে, না, শক্তি-পূজারী সমগ্র বাংলার।

—কিন্তু কুমার রঘুনাথ শুনেছি বৈষ্ণব। সুরঞ্জাক্ষী মৃদু হেসে বলল, তাই রাধার প্রেমে ছুটে এসেছিলেন তিনি।

এ রসিকতায় সাড়া দিল না চন্দ্রপ্রভা, ঈষৎ গাম্ভীর্যের স্বরে বললে, এ মিথ্যাচার আমার ভাল লাগে না সখি, মনে হয় অন্যায়।

সুরঞ্জাক্ষী রসিকতার স্বরে প্রশ্ন করলে, কোনটা মিথ্যাচার রাজকন্যে? কুমার রঘুনাথের সঙ্গে প্রেমাভিসার, না পিতার কাছে অভিসারের কথা গোপন রাখা?

—বিষ্ণুপুর যুবরাজের সঙ্গে প্রেমাভিসার।

সুরঞ্জাক্ষী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, কেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা মৃদু স্বরে বললে, নিজের মনের ওপরই সন্দেহ হয়, মনে হয় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তাঁর সঙ্গে এই অভিনয় করেছি।

অভিনয় নয়?

নবাবনিযুক্ত সিন্ধুকির মুখে আনন্দ আর ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনেছে চন্দ্রপ্রভা বহুবার, প্রত্যাখ্যান করেছে তার সহস্র প্রলোভন। কিন্তু কোনও দিন কল্পনাও করেনি, এমন অসম্মানের আহ্বান জানাবে বাংলার নবাব।

মনে পড়ল চন্দ্রপ্রভার।

ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছিল শোভা সিংহের অনুরক্ত এক মুসলমান ঘাটোয়াল। শাহি সড়কে প্রহরা দিতে দিতে নবাবি তাঞ্জাম দেখে ছুটে এসেছিল সে।

বাদশাহি সওয়ানে-নেগারের কাছ থেকে গোপন সংবাদ জানতে পেরেই সাবধান করতে এসেছিল।

শুনে হেসেছিল হেমন্ত সিংহ, হেসেছিল চন্দ্রপ্রভা।

তারপর একসময় রিসালহা সৈন্যের দল এসে নেমেছিল ঘোড়া থেকে। পিছনে পিছনে পাইকের সারি আর নবাবি তাঞ্জাম।

এক লক্ষ আসরফি উপঢৌকন দিয়ে চন্দ্রপ্রভাকে আহ্বান জানিয়েছিল ইব্রাহিম খাঁ, অনুরোধ জানিয়েছিল তার অন্দরমহলের সম্পদ বাড়ানোর জন্যে, মহলসরার শোভা বাড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

আর সে-চিঠি পড়ে ঘৃণায় বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠেছিল চন্দ্রপ্রভার সমস্ত শরীর।

নবাব ইব্রাহিম খাঁর তাঞ্জামে পদাঘাত করে পাইকদের ফিরিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা। তারপর চিন্তিতভাবে প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে করতে আশঙ্কার ছায়া দেখা দিয়েছিল তার চোখে। শোভা সিংহ তখন দূর-উড়িষ্যায়।

সুরঞ্জাক্ষীর বুকেও সেদিন আতঙ্ক কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আর চন্দ্রপ্রভার চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠেছিল শৈশবের একটি দৃশ্য, যেদিন হার্মাদের হাত থেকে কিশোরী চন্দ্রপ্রভাকে রক্ষা করেছিল রঘুনাথ।

সে-দৃশ্য মনে পড়তেই কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল চন্দ্রপ্রভা। কলমদান নিয়ে আসতে বলেছিল পরমুহূর্তেই।

সুরঞ্জাক্ষী বিস্মিত হয়ে বলেছিল, এত রাত্রে কলমদান কি হবে চন্দ্রপ্রভা ?

প্রণয়পত্র লিখতে হবে বিষ্ণুপুর-যুবরাজের কাছে। অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা।

বলেছিল, যে-জীবন তিনি রক্ষা করেছিলেন সে-জীবন তাঁর পায়েই উৎসর্গ করব। নবাবের ঘৃণ্য হাত সেখানে পৌঁছতে পারবে না, স্বয়ং আলমগীর বিষ্ণুপুরকে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়নি কোনও দিন।

উপযাচিকা চন্দ্রপ্রভার আমন্ত্রণে সেদিন সাড়া না দিয়ে পারেনি রঘুনাথ। যৌবনের উন্মাদনায় সেদিন রঘুনাথের সমগ্র মনের তারে প্রেমের সুর বেজে উঠেছিল। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল রঘুনাথ।

কিন্তু অভিসারিণী চন্দ্রপ্রভার সেই প্রণয়-আমন্ত্রণ কি শুধুই কৌশল ? শুধুই প্রয়োজনের আহ্বান ?

চন্দ্রপ্রভার নিজেরই সন্দেহ হয় কখনও কখনও।

সুরঞ্জাক্ষী সান্ত্বনা দেয়। —না চন্দ্রপ্রভা, তোমার বুকের মধ্যে যে প্রেম সুপ্ত ছিল, তা জেগে উঠেছিল প্রমাদমুহূর্তে। অভিনয় নয়।

চন্দ্রপ্রভা লজ্জিত হাসি হেসে বলে, সে-সত্য আমার মনের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। কিন্তু এ-প্রতীক্ষার জ্বালা সহ্য হয় না সই, মনে হয় সকলের অলক্ষ্যে নিজেই ছুটে যাই তাঁর কাছে।

—কিন্তু কুমার রঘুনাথ যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি না রাখেন ? চন্দ্রপ্রভার চোখে উষ্মা ফুটিয়ে তোলার জন্যে কপট আশঙ্কা প্রকাশ করে সুরঞ্জাক্ষী।

প্রশ্ন শুনে হাসি দেখা দেয় চন্দ্রপ্রভার মুখে।

তারপর অনামিকার বিষাক্ত অঙ্গুরীয় তুলে দেখায় চন্দ্রপ্রভা।

—এ-বিষপাত্র কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে সুরঞ্জাক্ষী।

চোদ্দ

শোভা সিংহ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে না বললেও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে হেমন্ত সিংহ। বুঝতে পারে শোভা সিংহ কেন জ্যোতিষের শরণ নিতে চায়।

জ্যোতিষাচার্যের সন্ধানে হেমন্ত সিংহ যখন বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছল তখন সমগ্র রাজপ্রাসাদ শোকে অভিভূত।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মৃত্যু হয়েছে রাজা দুর্জন সিংহের, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছে কুমার রঘুনাথ।

অতিথির আগমন-সংবাদ পেয়ে রঘুনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এল। সসম্মানে রাজপ্রাসাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানালে হেমন্ত সিংহকে।

রঘুনাথের ব্যবহারে মুগ্ধ হল হেমন্ত সিংহ, আর বিস্মিত হল জ্যোতিষাচার্যের কথায়।

চিতোয়া-বরদার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জ্যোতিষাচার্য বললেন, রাজনগরে পৌঁছতে আমার কিছু বিলম্ব হবে হেমন্ত। এই দুঃসময়ে আমি রঘুনাথকে ছেড়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া...

বিস্ময়ের চোখ তুলে জ্যোতিষাচার্যের মুখের দিকে তাকাল হেমন্ত সিংহ।

জ্যোতিষাচার্য মৃদু হেসে বললেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সংবাদ না এসে পৌঁছলে আমি বিষ্ণুপুর ত্যাগ করতে পারি না হেমন্ত।

—কি সংবাদের অপেক্ষায় আছেন আচার্য? বিস্ময়ের কণ্ঠে হেমন্ত সিংহ প্রশ্ন করলে!

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন। উত্তর দিলেন না এ-প্রশ্নের। গোপনতা রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম। কি করে এ দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করবেন তিনি হেমন্ত সিংহের কাছে।

দুর্জন সিংহের মৃত্যুর খবর পাঠানো হয়েছে মোগল সম্রাটের দরবারে। আলমগীর হয়তো এই সুযোগে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইবেন। হয়তো এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে চাইবেন।

জ্যোতিষাচার্যকে চিন্তিত দেখে হেমন্ত সিংহ বললে, দুশ্চিন্তা কিসের আচার্য?

প্রকৃত দুশ্চিন্তা গোপন করে জ্যোতিষাচার্য মৃদু হেসে বললেন, রঘুনাথ আমার পুত্রতুল্য, চিন্তা তার জন্যই হেমন্ত। দুর্জন সিংহের ইচ্ছা ছিল বর্ধমানরাজের কন্যার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ দেবেন, কিন্তু...

কিন্তু? উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল হেমন্ত সিংহ।

জ্যোতিষাচার্য ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর কোষ্ঠীবিচার করে এ বিবাহ-প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারিনি।

হেমন্ত সিংহ সহাস্যে বললে, তা হলে আমার একটা অনুরোধ আছে আচার্য। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী চন্দ্রপ্রভা রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া, চিতোয়া-বরদার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ দিন আচার্য।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকবে হেমন্ত, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার কোষ্ঠীবিচার না করে...

মনের বিরক্তি চাপা রাখলেন জ্যোতিষাচার্য। সামান্য এক ভূস্বামীর কন্যার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের যুবরাজের বিবাহ? যোটকবিচার শুভ হলেও এ বিবাহে তিনি রাজি হতে পারবেন না।

কিন্তু হেমন্ত সিংহ বুঝল না জ্যোতিষাচার্যের গোপন মনের ইচ্ছা।

কটিবন্ধ থেকে কৃপাণ বের করে মাটির ওপর চন্দ্রপ্রভার জন্মকুণ্ডলি এঁকে দিল হেমন্ত সিংহ। বললে, গণনা করে দেখুন আচার্য। এ বিবাহ শুধু বিষ্ণুপুরের মঙ্গলই নয়,

হিন্দুধর্মের মঙ্গলও আনবে।

জ্যোতিষাচার্য কপট গণনা শুরু করলেন। রাশিলগ্নের মিথ্যা সূত্র উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, না হেমন্ত, এ বিবাহ হতে পারে না, তোমার অনুরোধ অন্যায় অনুরোধ।

—কেন আচার্য? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে হেমন্ত সিংহ। আর জ্যোতিষাচার্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কৃষ্ণরামের কন্যার কোষ্ঠীবিচার করে এ বিবাহে বাধা দিয়েছি আমি, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার অদৃষ্ট আরও সাংঘাতিক, আরও দুঃখময়। চন্দ্রপ্রভা অবিশ্বাসিনী হবে।

—অবিশ্বাসিনী! ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল হেমন্ত সিংহ। তারপর হঠাৎ অট্টহাসে হেসে উঠল জ্যোতিষাচার্যের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মাটির ওপর নিজেরই কৃপাণে আঁকা জন্মকুণ্ডলির ওপর পদাঘাত করে বললে, রাজনগরের রাজকন্যার নামে এ-অপবাদ দেয় যে-জ্যোতিষশাস্ত্র সে-শাস্ত্রে পদাঘাত করি আমি। জ্যোতিষাচার্য! আপনার শাস্ত্রে বিশ্বাস করে আপনাকে আহ্বান জানাতে আসিনি। বিদ্রোহের আগে সমগ্র বাংলার প্রজাদের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্যে, বিদ্রোহ সফল হবে এই বিশ্বাস আনবার জন্যে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন। 'মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য', এই কথাটুকু আপনার অসংখ্য শিষ্য জ্যোতিষীদের সাহায্যে দেশে দেশে প্রচার করবার জন্যেই আহ্বান জানিয়েছিলাম।

রাগে অপমানে আবার জন্মকুণ্ডলির ওপর পদাঘাত করতে যাচ্ছিল হেমন্ত সিংহ। এমন সময় হঠাৎ প্রাসাদে শঙ্খধ্বনি হল।

শত শত শঙ্খ যেন একসঙ্গে বেজে উঠল সেই মুহূর্তে। বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল হেমন্ত সিংহ।

ফিরে তাকিয়েই শঙ্কিত হয়ে উঠল। ঠিক তার পিছনেই একটি মোগল বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে তার আস্ফালন দেখে।

নিজের মনেই হাসলেন জ্যোতিষাচার্য, হেমন্ত সিংহের দম্ভ দেখে। মিথ্যার আশ্রয় নিলেন তিনি, তবু অনুশোচনা হল না। শাস্ত্রই তাঁর একমাত্র আরাধ্য নয়, তিনি রাজনীতিক। বিষ্ণুপুরের মঙ্গল-অমঙ্গল তাঁর ওপর নির্ভর করে।

জ্যোতিষাচার্য ধীরে ধীরে রাজদরবারের দিকে চলে গেলেন। বুঝতে পারলেন. দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে দূত এসে পৌঁছেছে।

হেমন্ত সিংহ লক্ষ করল না, মোগল বরকন্দাজ হঠাৎ কখন অদৃশ্য হল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে শোভা সিংহের বিদ্রোহের খবর পাঠাবার জন্যেই কি ছুটে গেল সে? কে জানে!

এদিকে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সঙ্গে মোগলশক্তির সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্ব স্মরণ করে শুভাকাঙ্ক্ষা জানালেন আওরঙ্গজেব।

রঘুনাথের অভিষেকে সমগ্র পূর্ব ভারতের ভূস্বামী আর নবাবদের কাছ থেকে বহুমূল্য মণিরত্ন, দুর্মূল্য উপঢৌকন এসে জমা হল বিষ্ণুপুর প্রাসাদে।

আর রাজমাতা, দুর্জন সিংহের বিধবা পত্নী, আশীর্বাদ করলেন রঘুনাথকে। আপন কনিষ্ঠ সন্তান গোপালকে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আজ থেকে আমার ছুটি রঘুনাথ। আজ থেকে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের সব শুভাশুভের ভার তোমার হাতেই দিলাম।

ভ্রাতৃস্নেহে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরল রঘুনাথ, সস্মিত হাসিতে।

কিন্তু সিংহাসনের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করল না রঘুনাথ। মুখ্য অমাত্যের ওপর সব রাজ্যভার তুলে দিয়ে সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করতে পারলেই

যেন চরম শান্তি।

অভিষেক-উৎসবের শেষে রাজবেশ ত্যাগ করে যমুনাবাঁধের ধারে চিত্তবিশ্রামে এসে উপস্থিত হল সে।

সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে যমুনাবাঁধের জলে।

সুদৃশ্য চিত্তবিশ্রামের সঙ্গীতকক্ষে নরম কাশ্মীরি গালিচায় শরীর এলিয়ে দিয়ে রঘুনাথ রাগমূর্ছনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর কণ্ঠে সুরের লহরী খেলা করে। কখনও পীর বক্সের হাতে মৃদঙ্গের বোল ফোটে। সঙ্গীতজ্ঞ গদাধর চক্রবর্তীও রঘুনাথের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যান। সঙ্গীত-সাধক কিশোর কৃষ্ণমোহন তন্ময় হয়ে শোনে।

তারপর একসময় রঘুনাথ বলে, অর্থব্যয় শুধু আনন্দের জন্যে নয় চক্রবর্তী, বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীতের রাজ্য করে তুলতে হবে। যা একদা শুধু মোগল দরবারের সম্পদ ছিল, তা যেন সমগ্র বাংলার সম্পদ হয়ে ওঠে।

গদাধরের মনেও তো এই একই স্বপ্ন। হিন্দু-ভারত কেবল স্বাধীনতাই হারায়নি, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সব কলাজ্ঞান, সব ঐতিহ্যও যেন বন্দী হয়েছিল দিল্লীর বাদশাহের কারাগারে। সঙ্গীত আর শিল্পচর্চাকে হত্যা করতে চেয়েছেন আওরঙ্গজেব, কিন্তু তার পরিবর্তে শিল্প আর কলা বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

রঘুনাথ যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। রাজ্যের সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানায় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে। সুকণ্ঠ গায়কের সন্ধান পেলেই আহ্বান জানায়।

বলে, ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি।

সঙ্গীতের পরে আর কোনও বিদ্যা নেই, গানের পরে আর কিছু নেই।

বাহাদুর খাঁকে বলে, চক্রবর্তী আপনার প্রধান সাকরেদ ওস্তাদজি। আপনার সমস্ত জ্ঞান ওকে অর্পণ করে দিন এমনভাবে, যেন যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত।

বাহাদুর খাঁ সে-কথা শুনে মিঠি মিঠি খুশির হাসি হাসে।

ওস্তাদের আঙুলে খেলা করে তানের ঝলক। হোরি-দাদরার রংদার সুরের গমকে ভরে যায় যমুনাবাঁধের বাতাস।

উচ্চনীচ ভেদ নেই, রাজাপ্রজায় ভেদ নেই। এই সঙ্গীতকক্ষে যেন সকলেই সমান। সকলেই সঙ্গীত-সরস্বতীর সাধক। ধর্মে ধর্মে ভেদ নেই। যে সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতই তার ধর্ম।

দাসদাসীরা আতর ছিটিয়ে দেয়, এলাচ আর কস্তুরির সুগন্ধ-মাখানো পান বিতরণ করে। সোনার রেকাবিতে সোনালি তবকে মোড়া পান আর সিদ্ধির শরবত।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর মাথায় গোলাপি পেঁচদার পাগড়িতে জরি আর সল্‌মা চমক দেয়। তরন্দাম্ মসলিনের ঢিলা পাঞ্জাবি আর যোধপুরী পায়জামা। কানে হীরের কুণ্ডল ঝকমক করে ওঠে প্রতিটি তালের সঙ্গে। ওস্তাদ নয়, যেন পাঁচহাজারি এক মনসবদার।

গুনগুন করে তোম তায়নোম শুরু করে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। পরজ বসন্ত, জলদ একতারা। পুরিয়া রাগ—ঢিমাঠেকার সঙ্গে। সম এসে পড়ে খাদের কড়ির মাধ্যমে, বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন খাদের গান্ধার থেকে মুদারার কোমল রেখব পর্যন্ত।

কখনও দরবারী কানাড়ার ধৈবত গান্ধারের মূর্ছনা। পঞ্চম রেখবের মাধুর্য। ফিরৎ আর মুর্‌কির রোমাঞ্চ।

কোনও দিন হয়তো বা সঙ্গীতকক্ষ ছেড়ে নৌকাবিহারে বের হয় রঘুনাথ। সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণমোহন, প্রৌঢ় গদাধর আর পীর বক্স।

পীর বক্সের লক্ষ্ণৌ টুপিতে চুনি আর পোখরাজ ঝলমল করে। চোখে সুর্মা, চিবুকে আতর।

নদীর বুক মৃদঙ্গের সুরে ভরে ওঠে।

সেদিনও এমনি নৌকাবিহারেই বেরিয়েছিল রঘুনাথ। বিড়াই নদীর জলে নৌকাবিহার করে ফিরে এল। এসে দেখল ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুদৃশ্য রাজহংস।

ঘাটের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে, কোনও অতিথি এসেছেন বিষ্ণুপুরে ?

প্রহরী উত্তর দিলে, হ্যাঁ মহারাজ। এক সুকণ্ঠী নর্তকী এসেছেন এই রাজহংসে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

—কি নাম নর্তকীর ? উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল রঘুনাথ।

উত্তর এল, কোনও পরিচয় দেয়নি মহারাজ। শুধু নাম জেনেছি তাঁর।

—কি নাম ?

—হীরাবাঈ।

—হীরাবাঈ ?

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি।

কিন্তু নৃত্য ? নৃত্যও তো উচ্চমার্গের কলা।

রঘুনাথ বললে, না কৃষ্ণমোহন, ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরের পক্ষে দ্বিমুখী সাধনা সম্ভব নয়। হীরাবাঈ অতিথি হয়ে এসেছে, আপ্যায়নের ত্রুটি হবে না, কিন্তু নারী নরকের দ্বারী কৃষ্ণমোহন। হীরাবাঈকে স্থায়ী আশ্রয় দিলে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে।

পীর বক্স হেসে উঠল সশব্দে। বললে, একজন বাঈসাহেবাকে এত ভয় মহারাজ ! সঙ্গীতজ্ঞের কোনও ধর্ম নেই, হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই আপনার মতে, তবে পুরুষ আর নারীর পার্থক্যই বা কেন সৃষ্টি করছেন মহারাজ ?

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁও সায় দিল। বললে, হীরাবাঈ হিন্দুস্থানের সেরা বাঈ, গানের সুরে চৈতি গাছে ফুল ফোটাতে পারে হীরাবাঈ। বাঈ নয়, বুলবুল সে। আর এখানে স্থায়ী আশ্রয় পাবার জন্যেও আসেনি সে। দুদিনের ফুর্তি আর মৌজ নষ্ট করবেন না মহারাজ।

রঘুনাথ হেসে বললে, আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাই না ওস্তাদজি। হীরাবাঈ বিষ্ণুপুরের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে না।

চিত্তবিশ্রামে হীরাবাঈকে আমন্ত্রণ জানায় রঘুনাথ।

হীরাবাঈ নয়, সত্যিই যেন একটি বুলবুলের কণ্ঠ তার সুরের ঝলকে।

গান শুনে মাথা দোলায় পীর বক্স। বলে, বেশক বুলবুল।

শুনে হাসে হীরাবাঈ। সুর্মা-টানা চোখের কটাক্ষ হানে পীর বক্সের দিকে ; তারপর রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, বুলবুল আমি নই মহারাজবাহাদুর। বুলবুল লালবাঈ।

—লালবাঈ ! বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে রঘুনাথ। —কে লালবাঈ ?

—হিন্দুস্থানের সেরা বুলবুল। ভগবান তাকে যেমন রূপযৌবন দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন কণ্ঠের সুর। এত কম বয়সে এমনভাবে কেউ সুরকে আয়ত্ত করতে পারেনি মহারাজবাহাদুর।

রঘুনাথ বললে, ঠিকানা দাও তার। রূপযৌবনের মূল্য নেই বুলবুল। কিন্তু সুরকে যে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। তাকে বিষ্ণুপুরে আনতে হবে।

হীরাবাঈ হেসে বললে, এই বুলবুলকে নিয়েই খুশ থাকতে হবে মহারাজ, লাল কোয়েলকে আনা যাবে না এখানে।

—আনা যাবে না ? কত মোহর তার ভেট যে বিষ্ণুপুরের রাজকোষ তা দিতে পারবে না ?

হীরাবাঈ সহাস্যে বললে, পাঠান রহিম খাঁর আশ্রয়ে আছে সে মহারাজবাহাদুর, বিনা যুদ্ধে লালবাঈকে ছেড়ে দেবে না রহিম খাঁ।

রঘুনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, না বুলবুল, লালবাঈয়ের গান যত লোভনীয়ই হোক তার জন্যে যুদ্ধ করতে রাজি নই আমি।

রঘুনাথের চোখে একটি তির্যক কটাক্ষ হেনে হীরাবাঈ মোহময় হাসি হাসলে। বললে, এ কি কথা শুনলাম মহারাজবাহাদুর ! যে-হাতে সেতারের মিজরাব দুনিয়া ভোলানোর সুর তোলে সেই হাতেই তরোয়াল চমক দেয়, এই তাজ্জব খবর শুনেই ছুটে এসেছি এখানে।

প্রশংসা শুনে মাথা নুইয়ে লজ্জা প্রকাশ করল রঘুনাথ।

বাহাদুর খাঁ হেসে সায় দিল হীরাবাঈয়ের কথায়।

বললে, বেশক, বেশক। শুধু সিতার নয় বুলবুল, রাজাবাহাদুরের গলার কাজ তো শোননি ; হাতেই নয়, গলার সুরেও ওস্তাদ তীরন্দাজ।

মৃদু হাসলে হীরাবাঈ—সেরা তীরন্দাজের কাছে আমার নরম দিল জখম করার লোভেই তো এসেছি ওস্তাদজি। বলে অপাঙ্গের মধুর হাসি ছিটিয়ে দিল রঘুনাথের মুখে।

পুনরায় নতশিরে 'সাবাস' লুটে নিল রঘুনাথ।

বললে, গানই আমার পিয়ারী, ওস্তাদজি। তাই তরোয়ালকে বিদায় দিয়ে তানপুরা তুলে নিয়েছি।

হীরাবাঈ কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, সে কি মহারাজবাহাদুর ! না, না, তরোয়াল ছেড়ে দিলে আমাদের ভরোসা দেবে কে ?

—কেউ কাউকে আশ্রয় দেয় না বুলবুল। ধীর স্বরে উত্তর দিলে রঘুনাথ। —মানুষের ধর্ম সত্য পালন করা, কর্তব্য পালন করা।

—রাজার ধর্ম দৌলত বাড়ানো মহারাজবাহাদুর। রাজার ধর্ম যুদ্ধ। হীরাবাঈ বললে।

রঘুনাথ উত্তর দিলে, না হীরাবাঈ, আমার কর্তব্য হল রাজ্যরক্ষা, আমার ধর্ম গান। দৌলতের লোভ নেই আমার। যুদ্ধ চাই না আমি।

এই কথাটাই শোনবার জন্যে বুঝি এসেছিল হীরাবাঈ, আশ্রয় পাবার জন্যে নয়। উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখে বললে, আপনার মত সমঝদারের বাহবা না পেলে লালবাঈয়ের সব শিক্ষাই বরবাদ হয়ে যাবে। আমি তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব মহারাজ।

আবার উড়িষ্যায় ফিরে গেল সে, রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে।

গিয়ে রহিম খাঁকে বললে, আমার ইনাম দিন শেখজি।

—কি খবর ? রহিম খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

হীরাবাঈ হেসে বললে, বিষ্ণুপুরকে কোনও ভয় নেই শেখজি, যুদ্ধ চায় না রঘুনাথ, শান্তি চায়। বিষ্ণুপুর আক্রমণ না করলে অস্ত্রধারণ করবে না রঘুনাথ, বিদ্রোহে বাধা দেবে না। রঘুনাথ এখন সঙ্গীতে মত্ত।

রহিম খাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

গম্ভীর গলায় হঠাৎ হাঁক দিল রহিম খাঁ। —সুলেমান !

কালো হাবশি দৈত্যটা সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

কুর্নিশ করে বললে, ফরমাইয়ে জাহাঁপনা।

হাসল রহিম খাঁ। বললে, বিষ্ণুপুরের খবর পাওয়া গেছে সুলেমান, এবার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর ফৌজের খবর আনতে হবে তোমাকে।

আবার কুর্নিশ করে হাত পাতল সুলেমান।

রহিম খাঁ বললে, যা ইনাম পেলে খুশি হও তুমি, তাই দেব। কি চাও তুমি?

সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসল হাবশিটা, তারপর ইশারায় ঘরের এক কোণের দিকে দেখালে।

রহিম খাঁ বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, অন্যদিকে মুখ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু আঁকছে লালবাঈ।

তবু বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে সুলেমানের মুখের দিকে তাকাল রহিম খাঁ।

হাবশিটা আবার সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসল।

বললে, লালবাঈকে ইনাম দেবেন জাহাঁপনা, আপনার হুকুম মত খবর আনতে পারলে।

ক্রোধ চাপা দিল রহিম খাঁ। বললে, বেশ, তাই হবে।

তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখলে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফণা তুলে তাকিয়ে আছে লালবাঈ। দু চোখে তার বিষাক্ত আক্রোশ ঝরে পড়ছে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লালবাঈ।

সুলেমান বিদায় নিতেই হাসতে হাসতে লালবাঈয়ের দিকে এগিয়ে এল রহিম খাঁ। বললে, ভয় নেই, আমি যাকে বেগম করবার স্বপ্ন দেখছি তার দিকে যে লোভের হাত বাড়ায় তার ইনাম—

খাপ থেকে তরোয়ালটা বের করে আবার সশব্দে সেটা খাপে ভরে রহিম খাঁ বুঝিয়ে দিল কথাটা। অর্থাৎ গর্দান দিতে হবে সুলেমানকে, এই লোভের জন্যে।

বিদ্যুতের মত এক ঝিলিক মৃদু হাসি চমকে গেল লালবাঈয়ের মুখে। বললে, আলবত্!

ঘৃণার পাত্র বুঝি ক্রমশ প্রেমের পাত্রে পরিণত হয়। যে রহিম খাঁকে শুধুই অর্থের প্রতিদান দিয়েছে মনের গোপনে ঘৃণা পুষে রেখে, ঐশ্বর্যের লোভে একদিন তাকেই ভালবেসেছে লালী।

তার রক্তেও উন্মাদনা জেগে উঠেছে। স্বপ্ন দেখেছে সে রহিম খাঁর বেগম হবার। স্বপ্ন দেখেছে সারা ভারতের বাদশাহ হবে রহিম খাঁ, আর তার বেগমের আসনে নিজেকে বসিয়ে কল্পনার কুর্নিশ কুড়িয়েছে সে বান্দা আর বাঁদীদের। বিবিবাজারের ফকিরসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক, মিথ্যা হোক, সেই ভবিষ্যদ্বাণী লালীর মনের মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে। একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় আনবে লালী, রাজ্য-পরিচালনা করবে একদিন। তার জন্য যে-মূল্যই দিতে হোক, রাজি আছে লালী।

তার যৌবনের প্রথম প্রেমকে যে অঙ্কুরে বিনাশ করেছে সেই হীরাবাঈয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেবে সেদিন। ধর্মের অহঙ্কারে যে অযোধ্যাপ্রসাদ তার অযাচিত প্রেম ফিরিয়ে দিয়েছে, সেই অযোধ্যাপ্রসাদকে বেতনভোগী করে রাখতে পারবে সেদিন।

কোমল শয্যায় দেহ এলিয়ে রহিম খাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে লালী, হিন্দুস্থানের বাদশা তুমি কবে হবে মেহের! কতদিন পরে?

বিব্রত হাসি হেসে লালীকে কাছে টেনে নেয় রহিম খাঁ। বলে, দেরি নেই লাল, দেরি নেই।

—বাদশা হয়ে আমাকে বেকসুর ভুলে যাবে না তো সেদিন? কৌতুকের কটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করে লালী।

রহিম খাঁ হাসে। বলে, তোমার এ-সুরত যে একবার দেখেছে সে কি ভুলতে পারে তোমাকে? চাঁদ তোমাকে দেখে লজ্জা পায় লাল, বাগিচার গুলাব রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পাপড়ি খোলে।

খুশিতে ভরে ওঠে লালীর মুখ। আনন্দে চোখ বুজে যায় তার। চোখ বুজে স্বপ্ন দেখে।

রহিম খাঁ বলে, যেদিন বাদশা হব এই হিন্দুস্থানের, সেদিন কি পেলে খুশি হবে লাল ?

কি পেলে খুশি হবে লালী ? বাদশাহের বেগম্ তো যা চাইবে তাই পাবে হাতের মুঠোয়, কোন্ প্রার্থনা তার অপূর্ণ থাকবে সেদিন !

তবু হঠাৎ কখনও-কখনও ভয় পায় লালী। মনে পড়ে বাঁদীবাজারের সেই ফকিরসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী।—চিরকাল তোমাকে অনূঢ়া থাকতে হবে কন্যা !

লালী ধীরে ধীরে বলে, বেগমের ইজ্জত চাই মেহের, আর কিছু নয়।

—আর কিছু নয় ? শুধু বেগম হতে চাও ?

—হ্যাঁ। বেগমের ইজ্জত চাই পিয়ার। আর...

—আর ?

—আর তোমার মোহব্বত চাই মেহের ! অস্ফুটে উচ্চারণ করে লালী।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে যায় একটি সুদর্শন মুখ। সেদিন বেগম হবার বাসনা জাগেনি লালীর, শুধু প্রণয়স্পর্শেই হয়তো সুখী হত।

বিবিবাজারের সেই সুদর্শন অশ্বারোহীকে দেখে জীবনে প্রথম রোমাঞ্চ জেগেছিল তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে সেই দৃশ্যটাই ভেসে ওঠে মনের পটে। সুখস্বপ্নে নাড়াচাড়া করে এক টুকরো বিধর্মী নাম।

কিন্তু রঘুনাথের মন থেকে মুছে গেছে যবনীর রূপের মোহ। পরিবর্তে স্নিগ্ধ চন্দনের সুগন্ধে ভরে আছে তার মন।

তার যৌবন-মনের সব স্থানটুকু জুড়ে আছে উপযাচিকা এক রূপময়ী ভৌমিক-কন্যা। চন্দ্রপ্রভা !

উদাস-বিষণ্ণ বিকেলে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে বিড়াই নদীতে নৌকাবিহারে কোনও কোনও দিন বেরিয়ে পড়ে রঘুনাথ। কামনার ধনকে কাছে পাবার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

গদাধর কৌতুকে হাসে, বলে এভাবে হৃদয়ের জ্বালা লুকিয়ে রেখে কি লাভ বন্ধু।

রঘুনাথও হাসে। বলে, সেইজন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছি চক্রবর্তী। তোমার গানের মন্ত্রে আমার জ্বালা দূর করে দাও।

—বিরহের জ্বালা কি গানের সুরে দূর করা যায়, তার চেয়ে রানীমাকে বলে বরং বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারি।

রঘুনাথ হেসে বলে, না চক্রবর্তী, তা সম্ভব নয়। গুরুদেব চন্দ্রপ্রভার কোষ্ঠীবিচার করে এ-বিবাহে অসম্মতি জানিয়েছেন। বিষ্ণুপুর সব শক্তিকে তাচ্ছিল্য দেখাবার সাহস রাখে, কিন্তু দৈবকে অবিশ্বাস করতে পারে না।

গদাধর উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে, আপনিও কি দৈবে বিশ্বাস রাখেন ?

রঘুনাথ হাসে। বলে, না চক্রবর্তী, সত্য আমার কাছে আরও বড়। চন্দ্রপ্রভার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

গদাধর কৌতুকের কণ্ঠে বলে, শুধু সত্যাশ্রয়ের জন্যে ? আর কিছু নয় ?

রঘুনাথ গদাধরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, মনের ভাবকে গানে প্রকাশ করো তুমি, তাই বোধহয় মনের গোপন ব্যথাও তুমি দেখতে পাও। না চক্রবর্তী, সত্যের চেয়েও প্রেম মহান। চন্দ্রপ্রভা আমার সব সুখ হরণ করে নিয়েছে, চন্দ্রপ্রভাই আমার একমাত্র সুখ !

গদাধর তানপুরা তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু হাসে, তারপর ধীর স্বরে গান গাইতে শুরু করে। একসময় হঠাৎ গান থামিয়ে বলে, যে আপনার সব সুখ হরণ করেছে, তাকেই হরণ করে আনতে হবে বন্ধু।

রঘুনাথ সহাস্যে বলে, না গদাধর, তা হয় না। দস্যুর রক্ত আমার শিরায়, বীর হাম্বীরের যে-অভিশাপ লুকিয়ে আছে বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদে, সুযোগ পেলে তা আবার পাপের পথ খুঁজবে। দস্যুতাকে আমি ভয় পাই, গদাধর।

—কিন্তু উপযাচিকাকে হরণ করা দস্যুতা নয় বন্ধু, পৌরুষ!

—না চক্রবর্তী, হরণ করে আনতে চাই না আমি চন্দ্রপ্রভাকে। আপন গৌরবেই সে বিষ্ণুপুর সিংহাসনের পাটরানীর মর্যাদা পাবে। তবু অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয় গোপনে আবার ছুটে যাই তার কাছে।

হতাশ বিষণ্ণ মনে নৌকাবিহার থেকে ফিরে আসে রঘুনাথ, মন থেকে দূর করতে পারে না চন্দ্রপ্রভাকে।

গোপনে চিতোয়া-বরদা যাত্রা করার ইচ্ছায় চর নিয়োগ করে শোভা সিংহের খবর আনার জন্যে। চর ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে।

বিদ্রোহের জন্যে তৈরি হচ্ছে শোভা সিংহ। সুবিস্তৃত দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সহস্র পদাতিক আর অশ্বারোহীতে পূর্ণ চিতোয়া-বরদার অরণ্যদুর্গ।

খবর শুনে বিচলিত বোধ করে রঘুনাথ।

দেওয়ানজিকে বলে, বিষ্ণুপুরের সৈন্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে দেওয়ানজি ; শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে পারে।

ঢোল-শোহরত খবর পৌঁছে দেয় দিকে দিকে। সৈন্য-সংখ্যা বেড়ে চলে দিনে দিনে।

যুদ্ধ চায় না রঘুনাথ, শান্তি চায়। কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি রাখতে হবে। শক্তি রাখতে হবে সত্যপালনের।

অকস্মাৎ মনে পড়ে রঘুনাথের, বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষ্ণরাম সাহায্য প্রার্থনা করলে ছুটে যেতে হবে। বিদ্রোহ দমন করতে হবে। হয়তো চন্দ্রপ্রভার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে। প্রেমের চেয়ে সত্য বড়, সত্যাশ্রয় মানুষের ধর্ম।

পনেরো

শুধু শোভা সিংহই নয়, রাঢ়ভূমির অধিবাসীরা, সমগ্র বাংলার নির্যাতিত প্রজারাও তখন বিদ্রোহের জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণরামের অধীনস্থ ভূস্বামীরাও গোপনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাঠায়। ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজার কাছ থেকেও আসে বন্ধুত্বের উপহার।

সমগ্র বাংলা তখন আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এদিকে বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ অকর্মণ্য। রুচিহীন কাব্যপাঠ আর বিলাসব্যসনে আসক্ত ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নুরুল্লা খাঁর হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে অন্দর-মহলের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু আরেকটা অদৃশ্য শক্তির খবর জানত না শোভা সিংহ। লোকচক্ষুর আড়ালে ধীরে ধীরে যে-শক্তি সঞ্চিত হচ্ছিল হুগলীর বন্দরে, তার দিকে চোখ ছিল না কারও।

সাজাহান তখন ভারতসম্রাট।

মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতায় গোপন সন্তর্পণে বুঝি নিজের কক্ষে ফিরে আসছিল সাজাহান-কন্যা জাহানারা ! অকস্মাৎ তার রেশমবস্ত্রের অঙ্গাবরণ জ্বলে উঠল অলিন্দের দীপশিখার স্পর্শে। নিঃশব্দে দ্রুত ছুটতে ছুটতে নিজের কক্ষে চলে এল জাহানারা, চিৎকার করে বাঁদীদের ডাকতে সাহস হল না। সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়ে গেল জাহানারার।

এ-খবর অন্দর-মহলের বাইরেও এসে পৌঁছতে সময় লাগল না। রাষ্ট্র হল, সাজাহানের অগ্নিদগ্ধ কন্যাকে সারিয়ে তুললে পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে।

গেব্রিয়েল বাউটনের কানে গেল সে-খবর। ইংরেজ চিকিৎসক বাউটন রাজধানীতে অপেক্ষা করছিল সাজাহানের দর্শন পাবার জন্যে। তার বণিকমন বুঝতে পারল এই সুযোগ । সাজাহানের দরবারে গিয়ে তস্‌লিম করে দাঁড়াল বাউটন। বললে, শাহজাদীকে সারিয়ে তুলব আমি।

সত্যিই আরোগ্যলাভ করল জাহানারা। আর খুশি হয়ে সাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, কি পুরস্কার চাও, বলো ইংরেজবন্ধু। আমার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্নের জীবনদান করেছ তুমি, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখব না।

গেব্রিয়েল বাউটন টুপি খুলে কুর্নিশ করল সাজাহানকে। বললে, শাহ্ আলম, বাংলাদেশে আমরা বাণিজ্য করতে চাই, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অনুমতি পেলেই কৃতার্থ হব।

শুধু স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি ? মণি-মুক্তা হীরে-জহরত নয় ? রাজ্যের কোনও রূপসী নারী নয় ? কোনও বিস্তৃত ভূখণ্ডের স্বামিত্ব নয় ? শুধু স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি ?

খুশি হয়ে অনুমতি দিয়ে দিলেন সাজাহান। বুঝতে পারলেন না, এই তুচ্ছ অনুমতি ইতিহাসের পট পরিবর্তন করতে পারে।

বাংলার মসনদে তখন শাহসুজা।

সাজাহানের অনুমতি নিয়ে বাংলায় এসে সুজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল বাউটনের। চিকিৎসক বাউটনের কৃতিত্বের কথা শুনে মুগ্ধ হল সুজা। বললে, আমার অন্তঃপুরেও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে আমার এক প্রিয় বেগম।

বাউটন তাকেও সারিয়ে তুলল অতি অল্প দিনের মধ্যে।

মুগ্ধ হল সুজা। বললে, দিল্লীশ্বর তোমাকে বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন, আমার কাছে পাবে যাবতীয় সাহায্য। ইংরেজ বণিকের সমৃদ্ধি মানেই বাংলার সমৃদ্ধি।

হুগলীর বন্দরে আর বালেশ্বরে দুটি কুঠি স্থাপিত হল ইংরেজ বণিকদের। তারপর বছরের পর বছর বাণিজ্যের নামে পর্তুগীজ ও দেশীয় ঠগ এবং দস্যুদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করার নামে ক্রমে ক্রমে দুর্গ গড়ে তুলল ইংরেজ কুঠিয়ালরা, পণ্যের আড়ালে এনে জড়ো করল কামান, বন্দুক, আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্র।

কুঠি নয়, দুর্গ।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে কত পরিবর্তন ঘটে গেল, ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল ! কিন্তু কেউই খবর রাখল না অরণ্য-সঙ্কুল ভাগীরথীতীরে হুগলীর কুঠিতে কি পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

সাজাহান বন্দী হলেন পুত্র আওরঙ্গজেবের কাছে। বাংলার মসনদ থেকে অপসৃত হল শাহসুজা, গ্লানির মৃত্যু বরণ করতে হল তাকে। এল শায়েস্তা খাঁ, সেও চলে গেল হার্মাদদের বিতাড়ন করে। বাংলার মসনদে এল অলস আর ভীরুস্বভাব ইব্রাহিম খাঁ।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা বুঝল, বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের একমাত্র পথ ইব্রাহিমের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে পরিতৃপ্ত করা।

বাণিজ্যের লোভ দেখাল তারা নুরুল্লা খাঁকে।

যুদ্ধই যার ধর্ম, অপরিমিত ঐশ্বর্যের লোভ দেখতে পেল সে। তরবারির বদলে বণিকের মানদণ্ড তুলে নিল নুরুল্লা খাঁ, গোপনে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তুলল।

এ-সংবাদ কিন্তু অজ্ঞাত রইল না নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে, আলমগীর আওরঙ্গজেবের কাছে।

ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ তখন মসলিনের ব্যবসায় মগ্ন। কাপাশিয়া, সোনার গাঁ, তিতবর্দি অঞ্চলে সেই কারণেই ঘুরে বেড়াত নুরুল্লা খাঁ। কুঠিয়ালদের চাহিদামত দাদন দিয়ে তৈরি করাত বিশেষ বিশেষ ধরনের মসলিন। কখনও হুগলীর বন্দর থেকে, কখনও দক্ষিণের মসলিপত্তন থেকে বিদেশে রপ্তানি হত সে-বস্ত্রসম্ভার।

রহিম খাঁর হাবশি চর সুলেমান জানত না এ-খবর। সুবাদারের অন্দর-মহলে প্রবেশ করার উপায় ঠিক করে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা আর মেঘনার সঙ্গমস্থলে বিস্তৃত মসলিন-দুনিয়ায় এসে হাজির হল সে।

সরাইখানা থেকে সরাইখানায় ঘুরে বেড়াল। তাদের বয়নকৌশল দেখে বিস্মিত হল। দাসব্যবসায়ীর নফর ছিল সে, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঠান রহিম খাঁর চর নিযুক্ত হয়েছিল। দূর থেকে লালবাঈয়ের অঙ্গে এই সূক্ষ্ম মসলিনের শোভা দেখেছে সে। কিন্তু এ-কল্পরাজ্যে এসে বিব্রত হয়ে পড়ল সুলেমান।

রহিম খাঁর নির্দেশ মনে পড়ল। কোনও বারাঙ্গনাকে অর্থের বিনিময়ে করায়ত্ত করে মসলিন-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাকে পাঠাতে হবে ইব্রাহিম খাঁর অন্তঃপুরে। দিনে দিনে বেগম-মহল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে সেই রূপজীবিনীর সাহায্যে। আর এই মসলিন-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সুলেমানকে যেতে হবে ফৌজ ও রিসালহা সৈন্যদের বসতিতে।

ক্রমে ক্রমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সুলেমান। মসলিন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে তাকে। তা না হলে হয়তো মনসবদারদের কাছে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাবে। আর এ-অভিনয় প্রকাশ হয়ে পড়ার অর্থ—মৃত্যু।

কিন্তু তখনই মনের গোপনে প্রলুব্ধি জেগে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে লালবাঈয়ের যৌবনরূপ। অতৃপ্ত কামনার শিখা জ্বলে ওঠে তার ধমনীতে।

লালবাঈকে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে হাবশি সুলেমান।

মৃত্যুকে তুচ্ছ করে নির্দিষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। মনিবের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে। রহিম খাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে লালবাঈকে উপহার পাবে।

লালবাঈয়ের রূপযৌবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সোনারগাঁও আরঙের মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিল সুলেমান।

ভারতের নানা বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে বণিকের দল এসে জমায়েত হত এই মুসাফিরখানায়। আওরঙ্গজেবের নিষেধ অমান্য করে মদ আর শরীরের বিপণি খোলা হত রাত্রির গোপনতায়! জুয়া আর শতরঞ্জের নেশায় মশগুল হয়ে যেত সমস্ত সরাইখানা। হাজার হাজার তাঁতের ঐকতান চাপা পড়ে যেত বিলাসব্যসনের হট্টগোলে।

আর দিনের আলোকে আনাগোনা হত আরঙদার মহাজনদের। ডেমড়া, বালিয়াপাড়া, মৈকুলি, নবীগঞ্জ, শাহপুর থেকে আসত তাঁতিরা। সরাসরি নিজেদের হাতের তৈরি মসলিন বিক্রি করে যেত তারা।

হাবশি সুলেমানকেও মসলিন-ব্যবসায়ী মনে করে একটি মেয়ে এসে হাজির হল একদিন।

টুক্-টুক্-টুক্-টুক্—টোকা পড়ল সুলেমানের দরজায়।

বিস্মিত হয়ে কপাট খুলে দিলে সুলেমান, আর সামনে একটি শ্যামাঙ্গী কিশোরী মেয়েকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কোমল একহারা তন্বী শরীর, চোখে অপরূপ কমনীয়তা। রূপোপজীবিনী মনে করে তার দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকাল সুলেমান। ইশারায় ভেতরে আসতে বললে তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে কৌতুকের ছন্দ নাচিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

বললে, বেচতেই এসেছি কালাসাহেব, তবে আমাকে নয়, আমার হাতের তৈরি মসলিন।

কপাটের আড়ালে বেতের গোলাকার টুকরিটা সে নামিয়ে রেখেছিল, সেটাকে সামনে এনে বসল মেয়েটি। বললে, তোমার এমন কালো কুচকুচে শরীর হাবশি সাহেব, মসলিন পরলে খোলতাই হবে। নিজে না চাও বিবির জন্যে নিয়ে যাও একটা। বলে আবার হেসে উঠল।

বেতের টুকরি খুলে একে একে কাপড় দেখাতে শুরু করল সে।

বাফেতায় মোড়া বাণ্ডিল খুলে ফেলল, ঝকঝক করে উঠল রেশমি আবরণ।

সুলেমান মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, বাঃ বাঃ, চমৎকার!

খিলখিল করে আবার হেসে উঠল কিশোরী মেয়ে। বললে, বেকুফের মতো কথা বোলো না, এ-রেশমে মসলিন মোড়া থাকে, আসল কাপড় আছে এর ভেতর।

বোকার মতো হাসল সুলেমান, নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ হয়ে পড়ায়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার?

—ফিরোজা।

—ফিরোজা? বাঃ, বেশ নাম তো! তুষ্ট করবার চেষ্টা করে সুলেমান বললে।

ফিরোজা আবার হেসে উঠল। বললে, তার চেয়ে ভাল আমার হাতে তৈরি এই মসলিন।

—তোমার হাতে তৈরি? বিস্মিত হয়ে সুলেমান প্রশ্ন করলে, মেয়েরাও মসলিন বানাতে পারে?

হাসি চাপল ফিরোজা। বললে, মসলিন মেয়েরাই তৈরি করে হাবশিসাহেব। তিরিশ বছর বয়স হলে মেয়েরাও পারে না, হাত নরম থাকে না আর।

—তাজ্জব! বিস্ময়ের সুরে বললে সুলেমান।

সুলেমানকে আরও একটু তাজ্জব বানিয়ে ফিরোজা একে একে মসলিনের ভাণ্ডার খুলে দিল তার চোখের সামনে।

ঝুনা, রংদার, সরকার-আলি। কত বিভিন্ন রঙের নানা ধরনের কল্কাতোলা, বুটিদার, চুমকিচমক।

ফিরোজা এক-থান মসলিন এগিয়ে দিয়ে বললে, এই সরকার-আলি একখানা নিয়ে যাও হাবশিসাহেব, নবাব-বাদশারা এই কাপড় পরে। আর এটা 'খাসা', এটা সবনম্—সাঁঝের শিশিরের মতো...একটার পর একটা কাপড় দেখিয়ে চলে ফিরোজা। আর মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সুলেমান। হঠাৎ কাছে এসে একটা কাপড়ের ওপর হাত রেখে বলে, এটা? কি নাম এটার?

হাতটা সরিয়ে দিয়ে হাসে ফিরোজা। হাবশির কালো চেহারাকে কটাক্ষ করে বলে, হাত দিয়ো না সাহেব, কালো হয়ে যাবে। এটা হল মসলিনের সেরা—'আবরোয়ান'। শোনোনি, এই আবরোয়ান পরে শাহজাদী জেবউন্নিসা সাহেবার কি হাল হয়েছিল আলমগীরের কাছে?

একটার পর একটা কাপড় দেখিয়ে চলে ফিরোজা। তাঞ্জেব, সরবন্দ, বদনখাস। আলাবাল্লে, সরবতী, তরন্দাম। কুমীস, তুরীয়া, নয়নসুক। চরখান, মলমল, জামদানী।

সুলেমান বললে, ভাল জামদানী দাও কিছু, বেগমপসন্দ ভাল জামদানী।

ফিক্ করে হাসল ফিরোজা। বললে, বেগমদের পছন্দ অপছন্দ কি জানা যায় সাহেব ? তোমাকেই হয়তো পছন্দ হয়ে যাবে কোনও বেগমের।

সুলেমান রসিকতা বুঝল না। বললে, নবাবের বেগমরা যা পরে, দামি জামদানী চাই আমার।

—তোড়াদার না কারেলা ? নবাব ইব্রাহিম খাঁর খাস বেগমরা পরে আবরোয়ান, বুটিদার পছন্দ করে বাঁদী সাকিনা বেগম, এখন নবাবের পিয়ারী। জুলেখা বানু চায় জলবার আর পান্নাহাজার। বেগমসাহেবা দিল্‌রস পরতেন তেরছা আর সাবুরগা। শুধু বিবির জন্যেই কিনবে ? তুমি নিজে কিছু নেবে না সাহেব ? হাম্মাদ, কসিদা ? আর নয়তো নন্দনসাহী, আনারদানা ? সাকুতা নয়তো কুস্তিদার ?

সুলেমান হঠাৎ প্রশ্ন করলে, নবাবের মহলসরায় যাও তুমি ?

ফিরোজা মৃদু হেসে বললে, হামেশা। মসলিন বেগমরা কিনবে না তো কি তোমার মতো হাবশিরা কিনবে ?

বিদ্রূপে কান দিল না সুলেমান। থলি থেকে এক মুঠো আসরফি বের করে বললে, এই নাও...আরও দেব, একটা কাজ করে দিতে হবে আমার।

ফিরোজা খিলখিল করে হেসে উঠল আবার। —কি কাজ ?

—একটা খবর এনে দিতে হবে মহলসরা থেকে।

ফিরোজাকে নবাব ইব্রাহিম খাঁর জেনানামহলে পাঠিয়ে দিয়ে সুলেমান নিজেও মসলিনের সওদা নিয়ে হাজির হল ফৌজদের বসতিতে।

দুর্মূল্য মসলিনের জামদানী আর পেশোয়াজ নিয়ে মনসবদারদের কুঠিতে গিয়ে উঠল। মসলিন-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সৈন্যদের মনোভাব জানতে হবে তাকে, নবাবের উপর অসন্তুষ্ট মনসবদারদের আনতে হবে বিদ্রোহী রহিম খাঁর দলে। বিদ্রোহ দমনের সময় তারা যেন যুদ্ধে যোগ না দেয়।

অন্যান্য মনসবদারদের মতই সাকিনা বেগমের প্রণয়ী জাফর খাঁ-ও একটি মূল্যবান পেশোয়াজ কিনল। তারপর হামিদা বাঁদীর হাতে গোপনে উপহার পাঠাল সাকিনা বেগমকে।

বেগমসাহেবা দিল্‌রসের গুপ্তচরের কাছে অজ্ঞাত রইল না সে-খবর।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ তখন অন্দর-মহলের হাওয়াবাগে বসে মুক্তপ্রাঙ্গণে বাঁদী-তালাওয়ে নর্তকী আর বাঁদীদের স্নান দেখছেন। তাঁর আশেপাশে আভের পাখা নাড়তে নাড়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাস-বেগমরা, অন্যান্য উপ-বেগম আর অন্তঃপুরিকার দল তার পিছনে পিছনে। উগ্র আতরের গন্ধ, আর বাতাসের মত স্বচ্ছ আবরোয়ানের নামমাত্র আবরণে শরীরের যৌবন প্রকাশ করে ইতস্তত পায়চারি করছে তারা।

এমন সময় বেগমসাহেবা দিল্‌রস এসে দাঁড়াল ইব্রাহিম খাঁর পিছনে।

একজন বাঁদীকে প্রশ্ন করলে, সাকিনা বেগম বুঝি তার হামাম-ই-গুলাবে আছে ? বলে মৃদু হাসলে দিল্‌রস।

বাঁদী ভয় পেয়ে নবাবের মুখের দিকে তাকালে, দিল্‌রসের অর্থপূর্ণ হাসিটা ইব্রাহিম খাঁ বুঝতে পেরেছেন কি না পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। তারপর বললে. না বেগমসাহেবা, মালিকা বেগম তোশাখানা থেকে সাজ করে আসছেন এখনই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদীপরিবৃতা হয়ে সাকিনা বেগম এসে উপস্থিত হল। গিদার্য় হেলান দিয়ে বসল ইব্রাহিম খাঁর পাশে। অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে, খাস-বেগমরা, ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে কি না।

জাফর খাঁর কাছে উপহার পাওয়া পেশোয়াজ পরে এসেছে সাকিনা। দিল্‌রসের চোখ এড়াল না।

সাকিনা হয়তো ভেবেছে, তার হাজার হাজার পেশোয়াজের মধ্যে এটি কেউই চিনতে পারবে না, সন্দেহ হবে না ইব্রাহিম খাঁরও।

এই সুযোগ। দিল্‌রস ধীরে ধীরে বললে, মহলে একজন মসলিনওয়ালী এসেছে সাকিনা। এখানে তসলিম দিতে বলব?

ইব্রাহিম খাঁ ফিরে তাকাল। বললে, হ্যাঁ এখানেই।

সাকিনার দিকে বিদ্রূপের হাসিতে তাকিয়ে বাঁদীকে ইশারা করল দিল্‌রস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছল ফিরোজা।

একজোড়া আবরোয়ান মেলে ধরে বললে, আপনার জন্যেই বানিয়েছি মালিকা বেগম, দশ হাজার পাক আছে সুতোয়।

আরেকটা থান খুলতে যাচ্ছিল ফিরোজা, দিল্‌রস বললে, সাকিনা বেগম যা পরে আছেন, ওই মসলিন আছে আর?

ফিরোজা হেসে বলল, বেগমসাহেবা, এই আবরোয়ানই তো পরে আছেন উনি।

দিল্‌রস অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, উঁহু, ও মসলিন তুমি বুনতে পারবে না।

বুঝতে পারল না ফিরোজা, বললে, মেহেরবানি করে দেখতে দেন তো ওই রকমই বুনে দেব বেগমসাহেবা।

দিল্‌রস হেসে বললে, বে-এক্তিয়ার কথা বোলো না, ও আবরোয়ান বোনা শক্ত, দেখাও না সাকিনা।

সাকিনাকে কেমন যেন ম্লান দেখাল। তবু মুখে হাসি টেনে পেশোয়াজের মগজিটা ফিরোজার সামনে এগিয়ে দিল সাকিনা। কুর্নিশ করে মগজিটা চোখের সামনে তুলে ধরেই চমকে উঠল ফিরোজা। বললে, বেগমসাহেবা, এ পেশোয়াজের আবরোয়ান তো আমারই হাতে বোনা, এরই জোড় সাহেবান। কিন্তু এ মসলিন আপনার কাছে কি করে এল মালিকা বেগম, এ তো...

অস্বস্তি ঢেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সাকিনা। দ্রুত পায়ে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল।

কৌতুকের হাসি হাসলে বেগমসাহেবা দিল্‌রস। তারপর বললে, একশো সরবন্দ চাই আমার।

—কার জন্যে সাহেবান?

উত্তর এল, তিলকুটির কাফেররা যে মন্দির বানিয়েছে, আলমগীরের হুকুম, একশো রিসালহা যাবে সে মন্দির ভাঙতে। তাদেরই খেলাত দেব।

একশো মসলিন রেখে দিয়ে দিল্‌রস বাঁদীকে বললে, খাজাঞ্চিকে বলো দাম দিয়ে দিতে।

ফিরোজা বিদায় নিতেই ইব্রাহিম খাঁর পাশে এসে বসল দিল্‌রস। হয়তো বা ইব্রাহিম খাঁর মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্যেই।

সন্দেহ উঁকি দিল আরেকজনের মনে। ফিরোজার।

নির্দিষ্ট স্থানে সুলেমানের সঙ্গে দেখা হল ফিরোজার। জানলে, তুরানি মনসবদার জাফর খাঁর কাছে সে বিক্রি করেছিল আবরোয়ানের পেশোয়াজটা।

হাবশি সুলেমান প্রশ্ন করলে, কিন্তু আমার খবর এনেছ তুমি ?

ফিরোজা হেসে বললে, নিজের বেগমদের যে সামাল দিতে পারে না, সুবা সামলাবে সে কি করে। সাকিনা বেগমের মাশুক জাফর খাঁ, আর দিল্‌রস বেগমসাহেবা সাকিনা বেগমের শত্রু।

—আর কোনও খবর ? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে সুলেমান।

ফিরোজা বললে, একশো রিসালহা পাঠানো হচ্ছে মেদিনীপুরে, তিলকুঠির মন্দির ধ্বংস করবার জন্যে।

সুলেমান আনন্দে একমুঠো আসরফি দিয়ে ফেলল ফিরোজাকে। বললে, সবচেয়ে বড় খবর এনেছ ফিরোজা। যদি সুবা-বাংলার ফৌজদার হতে পারি, তা হলে তুমি হবে আমার খাস বেগম।

ফিরোজা বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকাল হাবশির মুখের দিকে। এই মূর্খ হাবশি হবে বাংলার ফৌজদার ! নিজের মনেই হাসল ফিরোজা।

ষোলো

সংবাদ এসে পৌঁছল কৃষ্ণরামের দরবারেও।

স্বয়ং আলমগীর পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। হয়তো তাঁর কাছেও গিয়ে পৌঁছেছে ক্ষুদ্র চিতোয়া-বরদার খবর।

সমগ্র ভারতে জ্যোতিষচর্চা নিষিদ্ধ করেছেন আওরঙ্গজেব। প্রধান প্রধান শহরের জ্যোতিষীদের শৃঙ্খলে বেঁধে চাবুক-সওয়ারদের হুকুম দিয়েছেন শাস্তি দেবার জন্যে। হুকুম দিয়েছেন, যেখানে যত জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথিপত্র আছে, আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে।

'মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের দেরি নেই'—এই ভবিষ্যদ্বাণী রাষ্ট্র করে হিন্দু প্রজাদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব।

অবশিষ্ট দেবমন্দিরগুলি বিনষ্ট করার জন্য পরোয়ানা পাঠালেন প্রতিটি থানা-ফৌজদার, মুৎসুদ্দি, জায়গিরদার, ক্রোড়ি এবং আমলার নামে। কটক থেকে মেদিমীপুরের মধ্যে যেখানেই নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কারণ তাঁর সন্দেহ, এই মন্দিরগুলিতেই জমায়েত হয় অসন্তুষ্ট হিন্দু প্রজারা, বিদ্রোহের শলাপরামর্শ চলে এখানেই।

আলমগীরের আদেশে আসাদ খাঁর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল সুবে বাংলার একশো রিসালহা সৈন্য। উড়িষ্যার সওয়ানে নেগারের গুপ্তপত্রে তিনি জানতে পেরেছেন মেদিনীপুরের তিলকুঠিতে এবং রাজনগরে নতুন মন্দির গড়েছে বিধর্মীরা। সে মন্দির ধূলিসাৎ করার পরোয়ানা এসে পৌঁছল। আর পুনরায় যাতে হিন্দুরা মন্দিরগুলি গড়ে তুলতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ এল পরোয়ানায়।

থানা-ফৌজদার আর মুৎসুদ্দিদের ওপর আদেশ এল দেবমন্দির সমূলে বিনষ্ট হওয়ার পর কাজী ও শেখদের সাক্ষ্য সমেত খবর পাঠাতে হবে আলমগীরকে।

আমলাদের ঘুস আর উপঢৌকন দিয়ে বর্ধমান-হুগলীর যে ক'টি প্রাচীন দেবমন্দির রক্ষা পেয়েছে তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার কাজে নবাব-সৈন্যদের সাহায্য করার পরোয়ানা এসে পৌঁছল রাজা কৃষ্ণরামের দরবারে।

পরোয়ানা পাঠ করে বিভ্রান্তের মত একবার দেওয়ান আরেকবার পুত্র জগৎরামের মুখের

দিকে তাকালেন কৃষ্ণরাম। তারপর বিনাবাক্যে সম্রাটের নির্দেশপত্র এগিয়ে দিলেন দেওয়ানের হাতে।

অনুগত ভূমিপতির ওপর এমন আদেশ কোনও দিন কল্পনাও করেননি কৃষ্ণরাম। সমগ্র ভারতে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছেন আওরঙ্গজেব, তখনও রক্ষা পেয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বহু অনুগত ভূস্বামীর আপন অঞ্চল, রক্ষা পেয়েছে কৃষ্ণরামের অধীনস্থ এলাকাও। কখনও নবাবের হস্তক্ষেপে, কখনও উৎকোচ বা অর্থমূল্যের বিনিময়ে। কিন্তু কাজী ও শেখদের মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে হলে নিঃস্ব হয়ে যাবে তাঁর রাজকোষ। অথচ আপন ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন না রাজা কৃষ্ণরাম। হিন্দুর রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে। ঐশ্বর্যের চেয়ে ধর্ম বড় তাঁর কাছে, রাজকীয় সম্মানের চেয়ে বিশ্বাস।

আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আক্রোশ ফণা তুলল হঠাৎ, মুহূর্তের জন্যে মনে হল সব বংশগৌরব পদমর্যাদা ত্যাগ করে শোভা সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনিও যোগ দেবেন বিদ্রোহীদের দলে। কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্কিত বোধ করলেন আলমগীরের নৃশংস অত্যাচারের কথা ভেবে। না, নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন পুত্র জগৎরাম এবং কন্যা সত্যবতীর কথা। পিতা হয়ে চোখের সামনে তাদের অসম্ভ্রম, তাদের যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু দেখতে চান না কৃষ্ণরাম।

ধীরে ধীরে অন্দর-মহলে ঢুকলেন কৃষ্ণরাম। দুচোখে তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ল দুঃখের অশ্রু।

আলাপনী কাদম্বরী ছুটে এল।—কি হয়েছে রাজাবাহাদুর ?

ব্যথার হাসি হাসলেন কৃষ্ণরাম। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আশ্চর্য হয়েছ আলাপনী ! সত্যি, আমাকেও কাঁদতে হয়, রাজা কৃষ্ণরামের চোখেও জল দেখা দেয় !

বিস্মিত কাদম্বরী বললে, আমার কাছে বলুন রাজাবাহাদুর, আপনার কন্যাতুল্য আমি, আমার কাছে খুলে বলুন কে আপনাকে ব্যথা দিয়েছে।

কৃষ্ণরাম হাসলেন, দুঃখের হাসি। খুলে বললেন আওরঙ্গজেবের পরোয়ানার কথা।

শুনল কাদম্বরী।

কৃষ্ণরাম বললেন, একদিকে আমার মা সর্বেশ্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী কালো মেয়ে আমার একদিকে ; আর অন্যদিকে মা সত্যবতী, আমার বুকের হৃৎপিণ্ড জগৎরাম। দুই-ই সমান প্রিয় আমার কাছে, একজনের শুভ যে আরেকজনের অশুভ ডেকে আনবে কাদম্বরী।

বিস্ময়ের চোখে কৃষ্ণরামের মুখের দিকে তাকাল কাদম্বরী। রাজা কৃষ্ণরামের বুকে এত স্নেহ, এমন গভীর ভক্তি !

তাঁর রূঢ় রাজসিকতার আড়ালে যে এমন একটি কোমল প্রাণ লুকিয়ে আছে কে জানত।

কৃষ্ণরামের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাদম্বরীর দুচোখ জলে ভরে গেল। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল কাদম্বরী।

অন্দরের কক্ষে এসে দেখল মখমলের গালিচায় বসে স্বর্ণপিঞ্জরের পোষা ময়নাকে বুলি পড়াচ্ছে সত্যবতী।

কাদম্বরী ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে সত্যবতী।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল কৃষ্ণরামকন্যা। শুনল আওরঙ্গজেবের নির্দেশ। ক্রমে ক্রমে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। রাজা কৃষ্ণরামের রাজ্যে হিন্দুর মন্দির ধূলিসাৎ হবে নবাবি সৈন্যের হাতে ? আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ল সত্যবতীর চোখ থেকে। উঠে দাঁড়াল সে হঠাৎ। বললে, বাংলাদেশ কি নপুংসক হয়ে গেছে কাদম্বরী ? এমন

একজনও কি নেই যে এই হৃদয়হীন সম্রাটের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আসতে পারে ?

আলাপনী কাদম্বরী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আছে সত্যবতী, আছে।

—আছে ? কে কাদম্বরী ? কে সেই বীরশ্রেষ্ঠ ? সম্রাটের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস যাঁর আছে, তাঁকেই আমি বরমাল্য দেব কাদম্বরী, নিজে উপযাচিকা হয়ে ছুটে যাব আমি তাঁর কাছে। কে তিনি ?

বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল আলাপনীর মুখে।

বললে, শুনেছি এই অনাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চান একজন সাধারণ ভূস্বামী।

—কে কাদম্বরী, কে তিনি ?

উত্তর দিতে পারল না আলাপনী, চুপ করে রইল। তারপর ধীরস্বরে উচ্চারণ করলে, চিতোয়া-বরদার শোভা সিংহ, যিনি একদিন তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন।

চমকে চোখ তুললে সত্যবতী। তারপর লজ্জায় মাথা নত করে বললে, মানুষের জীবনে ভুলের শেষ নেই কাদম্বরী। কেশর দিয়েই সিংহের বিচার করি আমরা, ঐশ্বর্য দিয়ে যোগ্যতার। তাই এমন পুরুষোত্তমকেও অপমানিত করেছি !

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু শোভা সিংহ তোমার পিতারও শত্রু সত্যবতী।

—না কাদম্বরী। হিন্দুধর্মের যিনি বন্ধু, তিনি বর্ধমানরাজেরও বন্ধু। হয়তো আমার হঠকারিতার জন্যেই তিনি শত্রু হয়েছেন। পূজাপুষ্প নিয়ে আসতে বলো কাদম্বরী, সর্বেশ্বরীর পূজা দিতে যাব আমি।

স্নান করে এসে পট্টবস্ত্রে শরীর জড়িয়ে সর্বেশ্বরীর মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করল সত্যবতী। শোভা সিংহের মঙ্গলের জন্যে, বিদ্রোহীদের সাফল্য প্রার্থনার জন্যে।

মনে মনে কল্পনা করলে, সুপুরুষ এক যুবাকে যেন পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে চলেছে সে, বিদায় দিতে চলেছে বীর স্বামীকে।

কিন্তু শঙ্কিত হল আলাপনী কাদম্বরী। শিউরে উঠল সে ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। এ কি করতে চলেছে সত্যবতী !

শোভা সিংহের মঙ্গল রাজা কৃষ্ণরামের অমঙ্গল, কুমার জগৎরামের অমঙ্গল। কাদম্বরী জানে, বিবিবাজারের জলসায় শোভা সিংহ যে দম্ভের আস্ফালন দেখিয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণরাম তা ক্ষমা করতে পারবেন না, ভুলতে পারবেন না অধীনস্থ তালুকদারের অহঙ্কার।

তা ছাড়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ভয় পায় কাদম্বরী।

তার গোপন মনে লুকিয়ে আছে একটি প্রণয়লালিত নাম। তার মনের বাসনা একান্ত তারই। কারও কাছে তা প্রকাশ করেনি কাদম্বরী, প্রকাশ করতে চায়ও না ! বছরের পর বছর সযত্নে সঙ্গোপনে একজনের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে।

কুমার জগৎরাম।

জগৎরামকে ভালবেসেছে আলাপনী। জানে সে, তুচ্ছ আলাপনীর প্রেম কোনও প্রতিদানই পাবে না তাঁর কাছে। জানে, তার গোপন ব্যথাকে প্রকাশ করা চরম হঠকারিতা।

তাই কুমার জগৎরামের মঙ্গল চায় সে, জগৎরামের কুশলই তার আনন্দ।

না, জগৎরামকে বীরবেশে যুদ্ধে পাঠাতে পারবে না কাদম্বরী। চাইবে না তার গৌরবের মৃত্যু। নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকতে চায় কাদম্বরী। দেখতে এবং দেখা পেতে।

সত্যবতী সর্বেশ্বরীর মন্দিরের দিকে যাত্রা করতেই জগৎরামের শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হল কাদম্বরী।

দেখলে, পালঙ্কে অর্ধশয়ান হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে আছে

জগৎরাম। আলাপনীকে যেন লক্ষই করলে না।

কাদম্বরী কাছে এসে দাঁড়াল।

তবু কোনও কথা বলল না জগৎরাম, সুরাপাত্র তুলে নিল হাত বাড়িয়ে।

জগৎরামের মুখে হাসি ছিটিয়ে হাত বাড়াল কাদম্বরী, জগৎরামের হাত থেকে সুরাপাত্র কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখল।

মুখ বিকৃত করল জগৎরাম। —বিরক্ত কোরো না কাদম্বরী!

অভিমানাহত অপ্রতিভ মুখে বেরিয়ে এল সে। তারপর পানঘরের দাসীদের সঙ্গে বসে সোনার রেকাবি ভরে নিল নিজের হাতে সাজা কস্তুরি পানে। সোনালি তবকে মোড়া সুগন্ধি পান আর শরবত।

এসে হাজির হল আবার জগৎরামের পালঙ্কের কাছে। দেখলে, সুরার পাত্র নিঃশেষ করে চলেছে জগৎরাম।

হাত থেকে পুনরায় সুরাপাত্র সরিয়ে রেখে পানের রেকাবি এগিয়ে দিল কাদম্বরী।

পরমুহূর্তে ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হল, সযত্নে-সাজা পানের রাশি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

আড়াল থেকে এ-দৃশ্য দেখে দাসীর দল সশব্দে হেসে উঠল কৌতুকে। বিরক্তিতে রাগে কাদম্বরীর হাত থেকে সোনার রেকাবি কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জগৎরাম।

লজ্জায় অভিমানে পালিয়ে এল কাদম্বরী। নিজের কক্ষে পালিয়ে এসে সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিল। লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানায় লুটিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদল।

সতেরো

বিদ্রোহ-মুহূর্তের জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল শোভা সিংহ। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিল আওরঙ্গজেবের পরোয়ানা।

মহলসরার তাজা খবর নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উড়িষ্যায় এসে উপস্থিত হল হাবশি সুলেমান। নবাব-দরবারের সব খবর জানিয়ে কুর্নিশ করে হাত পাতল।

রহিম খাঁ মুখে হাসি টেনে বললে, পাবে, ইনাম পাবে সুলেমান! যুদ্ধে জয়লাভ করলে তুমি হবে আমার প্রধান ফৌজদার। উপহার পাবে লালবাঈকে।

তারপর বললে, এখনই ঘোড়া ছোটাও চিতোয়া-বরদায়। আমার দোস্ত্ শোভা সিংহকে সব খবর জানিয়ে তৈরি হতে বলো, আমি চললাম সসৈন্যে।

হাতির সারি, উটের সারি, অশ্বারোহী রিসালহা। পিছনে পিছনে পদাতিক সৈন্যের দল, কামানের সারি, গোলাবারুদ, রসদ আর জেনানা-মহলের তাঁবু।

কটক থেকে মেদিনীপুর সমগ্র অঞ্চল জয় করে রহিম খাঁ এসে পৌঁছল চিতোয়া-বরদা।

চিতোয়া-বরদার দুর্গে লালবাঈ এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের চন্দ্রপ্রভার আশ্রয়ে রেখে এগিয়ে চলল রহিম খাঁ, শোভা সিংহের নেতৃত্বে। বিদ্রোহী হিন্দু সৈন্যদের, হিন্দু প্রজাদেব কথা ভেবেই নেতৃত্ব দান করল সে শোভা সিংহকে।

গ্রামের পর গ্রাম বিদ্রোহীদের পদানত হল।

খবর এসে পৌঁছল বর্ধমানরাজের দরবারে।

ভীতত্রস্ত কৃষ্ণরাম ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পাঠালেন। কিন্তু কোনও সাহায্যই এসে পৌঁছল না।

বুঝলেন, ভূরীশ্রেষ্ঠও গোপনে যোগদান করেছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণরাম। কিন্তু উপায় নেই। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সৈন্যবল নেই তাঁর। তিনি কল্পনাও করেননি তাঁর অধীনস্থ তালুকদার এবং জায়গিরভোগীরা গোপনে শোভা সিংহের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

রুষ্ট হয়ে উঠলেন কৃষ্ণরাম।

তাঁরই জায়গিরভোগী তুচ্ছ এক ভৌমিক শুধু তাঁর বিরুদ্ধেই নয়, নবাবের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেছে। যার অর্থ স্বয়ং আলমগীরের বিরুদ্ধে।

ক্ষিপ্ত বিমূঢ় কৃষ্ণরাম আদেশ দিলেন, নগরকেন্দ্রে সর্বজনসমক্ষে শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা দাহ করার।

সে-খবর শুনে সত্যবতীর কাছে ছুটে এল কাদম্বরী।

বিস্মিত না হয়ে পারে না আলাপনী। যে শোভা সিংহকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল সত্যবতী, সেই সামান্য এক ভৌমিকের বিজয়-বার্তায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণরাম-কন্যা। আশ্চর্য!

কিন্তু জগৎরামকে অমঙ্গল থেকে বাঁচাতে চায় কাদম্বরী। সে জানে, শোভা সিংহের সাফল্য কৃষ্ণরামের পরাজয়, জগৎরামের পরাজয়। হয়তো বা মৃত্যু।

সত্যবতীর আনন্দ লক্ষ করে রুষ্ট হয়ে ওঠে কাদম্বরী। বিষাক্ত নাগিনী হয়ে সত্যবতীকে দংশন করতে ইচ্ছা হয়।

তাই কুশপুত্তলিকা দাহ করার আদেশ শুনে ছুটে এল কাদম্বরী। দুঃসংবাদ জানিয়ে যদি সত্যবতীকে এতটুকু আঘাত দিতে পারে তা হলেও যেন আনন্দ।

বললে, শুভ সংবাদ আছে সত্যবতী!

—কি সংবাদ কাদম্বরী? যেন শোভা সিংহের অভিযান আরও এগিয়ে এসেছে এই সংবাদটুকু শোনবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব সে।

কাদম্বরী হাসল। বললে, নগরকেন্দ্রে আজ সন্ধ্যায় শোভা সিংহকে দাহ করা হবে।

—শোভা সিংহকে? অবোধ্য চোখ তুলে প্রশ্ন করলে সত্যবতী।

কাদম্বরী আঘাতের স্বরে বললে, হ্যাঁ রাজকুমারী, তোমার পুরুষোত্তমকে!

ব্যথায় কাতর দেখাল সত্যবতীকে। বললে, সত্য কাদম্বরী? বন্দী হয়েছেন তিনি, না মৃত?

—হ্যাঁ, বন্দী হয়েছেন, জীবন্তে দগ্ধ করা হবে তাঁকে। দৃঢ় স্বরে কাদম্বরী বললে।

চুপ করে রইল সত্যবতী। তারপর ধীরে ধীরে বললে, না, কাদম্বরী, তাঁকে জীবন্তে দগ্ধ করার শক্তি নেই কারও। তাঁর কুশপুত্তলিকাও দাহ করার শক্তি নেই। মা সর্বেশ্বরী তাঁকে রক্ষা করবেন।

অট্টহাসে হেসে উঠল কাদম্বরী।

প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়।

নগরকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবে কাদম্বরী। দেখবে, তিল তিল করে কিভাবে ভস্মীভূত হয় শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে নগরবাসীদের লক্ষ করে কাদম্বরী। দেখে, দলে দলে নগর ত্যাগ করে চলেছে তারা। শ্রেষ্ঠী এবং ধনিকের দল সপরিবারে হুগলীর পথে চলেছে।

মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পড়ে কাদম্বরী। ইচ্ছা হয়, রাজা কৃষ্ণরামকে গিয়ে অনুরোধ করে, নগর ত্যাগ করে যেতে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে রাজা কৃষ্ণরামের সান্ত্বনা-বাক্য! খবর পাঠিয়ে দিয়েছে কাদম্বরী, নবাবি সৈন্য এসে পৌঁছবে এখনই, ভয় নেই।

বিচলিত পায়ে একবার নিজের কক্ষে ফিরে আসে কাদম্বরী, একবার অলিন্দে গিয়ে

দাঁড়ায়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নগরকেন্দ্রের দিকে পা বাড়ায় সে।

লোকে লোকারণ্য চতুর্দিক। শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা দেখতে পায় কাদম্বরী।

জনতার সঙ্গে মিশে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় দেখতে পায় একজন বরকন্দাজ জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে শোভা সিংহের কুশমূর্তির দিকে।

উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে কাদম্বরী। কিন্তু তার উল্লাসধ্বনি চাপা পড়ে যায় জনতার হট্টগোলে।

সত্যবতী!

হ্যাঁ, রাজকুমারী সত্যবতী হঠাৎ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে কুশপুত্তলিকা।

রাজা কৃষ্ণরাম এগিয়ে এলেন।—সরে যাও সত্যবতী, অগ্নিসংযোগ করা হবে এখনই।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে কাদম্বরী। অবিশ্বাস্য মনে হয়।

কুশপুত্তলিকার সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সত্যবতী উত্তর দেয়।—এ-কুশমূর্তিতে আগুন দিতে হলে আমাকেও দাহ্ করতে হবে।

জগৎরাম এগিয়ে আসে।—সরে এসো সত্যবতী! ধমকের সুরে বলে জগৎরাম।

সেই এক উত্তর আসে।—আমাকে দগ্ধ না করে এ-মূর্তিতে আগুন লাগাতে পারবে না কেউ।

মশাল হাতে বরকন্দাজ ভয়ে পিছু হটে।

জনতা হট্টগোল করে ওঠে। বিচলিত বোধ করেন রাজা কৃষ্ণরাম, কুমার জগৎরাম।

এমন সময় কামানের তোপধ্বনি শোনা যায়। বিভ্রান্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের দিকে ছুটে চলেন রাজা কৃষ্ণরাম। সত্যবতীকে সঙ্গে নিয়ে জগৎরামও প্রাসাদ অভিমুখে ছুটে যায়। হঠাৎ প্রাণভয়ে কাদম্বরীও তাদের অনুসরণ করে ছুটে চলে।

নবাবি সৈন্যের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল কৃষ্ণরামের।

বর্ধমান রাজপ্রাসাদ অবরোধ করল শোভা সিংহ। নগণ্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন কৃষ্ণরাম।

বন্দী হলেন রাজকুমারী সত্যবতী। কিন্তু জগৎরামের সন্ধান মিলল না সমস্ত প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও।

সত্যবতীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিল শোভা সিংহ। আদেশ দিল, রাজপরিবারের অন্যান্য নারীদের ওপর যেন অত্যাচার না হয়।

শুধু সত্যবতীর স্পর্ধার জবাব দিতে চায় শোভা সিংহ। উচিত শিক্ষা দিতে চায় অহঙ্কারী কৃষ্ণরামের কন্যাকে।

কিন্তু জগৎরাম কোথায়?

সমগ্র রাজপ্রাসাদ ঘিরে তাই প্রহরী মোতায়েন হল। যদি কোনও গুপ্তকক্ষে আশ্রয় নিয়ে থাকে জগৎরাম তা হলেও যেন পলায়নের পথ না পায়।

ক্রমশ রাত গভীর হল, শান্ত নিঃশব্দ হল নগর, প্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ মধ্যরাত্রে প্রহরীরা দেখলে একটি পালকি বেরিয়ে আসছে প্রাসাদ থেকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল প্রহরারত সৈন্যের দল।

প্রহরীদের সামনে এসে থামল বর্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্নিত পালকি। সঙ্গে একজন দাসী সেই বহুমূল্য পালকি অনুসরণ করছে।

বিস্মিত স্বরে প্রহরী প্রশ্ন করলে, কে আছেন পালকিতে ?

দাসী উত্তর দিল, মহারাজার আলাপনী !

—এত রাত্রে কোথায় চলেছেন তিনি ? প্রহরী সবিস্ময়ে পুনরায় প্রশ্ন করলে।

পালকির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের উত্তর এল, বিদ্রোহীদের অধিনায়ক রাজা শোভা সিংহের তাঁবুতে।

ভীত হয়ে পড়ল প্রহরী। ভাবলে, হয়তো অধিনায়কের নির্দেশেই চলেছে আলাপনী। বললে, চলো, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি।

শোভা সিংহ তখন সুরায় আসক্ত, তাঁবুর লাল দুলিচার ওপর নেচে চলেছে নর্তকীর দল।

প্রহরী এসে খবর দিল দ্বারীকে, দ্বারী এসে ফিসফিস করে শোভা সিংহকে বললে, কৃষ্ণরামের আলাপনী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

অনুমতি দিতেই অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কাদম্বরী এসে নতমস্তকে অভিবাদন জানালে শোভা সিংহকে।

পাশে আসন দেখিয়ে বসতে বললে শোভা সিংহ।

আলাপনী আসন গ্রহণ করে মৃদুস্বরে বললে, একটি অনুরোধ আছে মহারাজ।

—কি অনুরোধ রঙ্গিণী ? কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করলে শোভা সিংহ।

—রাজকুমারী সত্যবতীর মুক্তি ভিক্ষা করতে এসেছি আপনার কাছে।

উত্তর শুনে সশব্দে হেসে উঠল শোভা সিংহ।

বললে, এত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এত দূর থেকে এসেছি যাকে বন্দী করবার জন্যে, তাকেই মুক্তি দিতে হবে ? হেসে উঠল শোভা সিংহ। সুরার পাত্রটা তুলে নিয়ে কাদম্বরীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললে, কঙ্কণ কার হাতে মানাবে পরীক্ষা না করে তো তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায় না কাদম্বরী !

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, আপনি কি সত্যই রাজকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, না শুধুই অপমান করবার জন্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ?

শোভা সিংহ বললে, সত্যবতীকে আমার অঙ্কশায়িনী করতে চাই রসবতী, বিবাহ করেই হোক আর বাহুবলেই হোক। বলে হাসল শোভা সিংহ।

কাদম্বরী আতঙ্কে শিউরে উঠল সে-কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রাজকুমারী আপনাকে অপমান করতে চাননি মহারাজ, আপনার প্রস্তাবকে বিশ্বাস না করে বিদ্রূপ ভেবেছিলেন। তাঁকে ক্ষমা করুন আপনি, আর আমাকে সপ্তাহকাল সময় দিন, এ-বিবাহে আমি সত্যবতীকে সম্মত করাব।

শোভা সিংহ খুশি হয়ে বললে, বেশ, সাত দিন অপেক্ষা করব কাদম্বরী।

—তা হলে রাজকুমারীর সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিন আমাকে।

প্রহরীর দিকে তাকিয়ে ইশারায় সম্মতি জানাল শোভা সিংহ।

কাদম্বরী মৃদুস্বরে বললে, আরেকটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি আপনার।

মৃদু হাসি হেসে কাদম্বরীর মুখের দিকে তাকাল শোভা সিংহ। —বলো আলাপনী, বলো !

কাদম্বরী বললে, মহারাজ কৃষ্ণরামের আলাপনী আমি, আলাপনই আমার পেশা। যদি অনুমতি করেন, প্রতি সন্ধ্যায় আপনার চিত্তবিশ্রামে এসে যোগ দেব।

শোভা সিংহ খুশি হয়ে সম্মতি জানাল, তারপর খাজাঞ্চিকে ইশারা করলে।

খাজাঞ্চি লুণ্ঠিত স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে হাজির হতেই কাদম্বরী বললে, পুরস্কার চাই না মহারাজ, যথাসময়ে পুরস্কার আদায় করে নেব আমি। কিন্তু অনুগ্রহ করে এই আদেশ দিন প্রহরীদের যে, আপনার এখানে আসার সময়ে যেন কোনও প্রহরী আমার সঙ্গে না আসে।

—কেন কাদম্বরী ? বিস্মিত হয়ে শোভা সিংহ প্রশ্ন করলে।

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, প্রহরীর সঙ্গে প্রতিদিন আপনার এখানে এলে নারীর সম্মান যে ধুলোয় লুটিয়ে যাবে মহারাজ !

বিকৃতচিত্ত শোভা সিংহ খুশি হয়ে উঠল।

বললে, আদেশ দিচ্ছি, কোনও প্রহরী তোমাকে একাকী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দেবে না।

খুশি হয়ে ফিরে এল কাদম্বরী।

তারপর দিনে দিনে বিচিত্র রসালাপে মুগ্ধ করল শোভা সিংহকে।

উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার এক বিচিত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলাপনীর মুখ। শোভা সিংহ লক্ষ করল না, প্রহরীরা লক্ষ করল না। হয়তো বা লক্ষ করেও কাদম্বরীর উৎফুল্ল মুখের অন্তর্নিহিত অর্থটুকু বুঝতে পারল না।

পালকি ফিরে এল রাজপ্রাসাদে, সাবধানী ঘুঙুর বাজিয়ে কাদম্বরী প্রবেশ করল অন্দর-মহলে।

দিনের পর দিন কেটে চলে এমনি ভাবেই। প্রতি সন্ধ্যায় প্রহরীদের সামনে দিয়েই শোভা সিংহের তাঁবুর উদ্দেশে যাত্রা করে আলাপনী, সুরাসক্ত শোভা সিংহকে খুশি করে সুচতুর আলাপকৌশলে, তারপর আবার ফিরে আসে রাজপ্রাসাদে।

সেদিনও এমনি দৈনন্দিন আলাপের পর ফিরে এল কাদম্বরী।

প্রহরীকে বললে, রাজকুমারী সত্যবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই !

প্রহরী বিনত সম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সত্যবতীর কারাকক্ষে।

কারাগারের ক্ষীণ আলোকে সত্যবতীর ম্লান বিষণ্ণ দেহকান্তি দেখতে পেল কাদম্বরী।

মনের গোপনে যেন খুশি হয়ে উঠল।

সত্যবতীকে কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারে না কাদম্বরী, ক্ষমা করতে চায় না। বর্ধমানরাজের পরাজয়ের জন্যে সত্যবতীকে দায়ী মনে হয় তার।

পিতার শত্রু, ভ্রাতার শত্রুকে যে-নারী ভালবাসতে পারে, তাকে কোনও যুক্তি দিয়েই যেন ক্ষমা করা যায় না। মনে মনে তাই সত্যবতীর নির্বুদ্ধিতার জন্যে অন্ধ আক্রোশে জ্বলে ওঠে কাদম্বরী।

প্রায়ান্ধকার কারাগার-কক্ষের পালঙ্কে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে হয়তো অদৃষ্টের কথা ভাবছিল সত্যবতী।

দ্বারপ্রান্তে প্রহরীর সঙ্গে কাদম্বরীকে দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। তবে কি মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছে আলাপনী ? কোনও মধুর প্রস্তাব পাঠিয়েছে ধর্মরক্ষক শোভা সিংহ ?

উন্মুখ বিস্ময়ে শয্যা ছেড়ে এগিয়ে এল সত্যবতী।

প্রহরী লৌহদ্বার খুলে দিল।

কক্ষে প্রবেশ করল কাদম্বরী।

পুনরায় দ্বার বন্ধ করে দিল প্রহরী। তারপর টহল দিতে দিতে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল।

কাদম্বরী কটিবন্ধ থেকে গুপ্তছুরিকা বের করে বললে, এই নাও সত্যবতী। গোপনে

তোমার ইচ্ছামৃত্যুর অস্ত্র এনে দিলাম।

চকিতে দ্বারপ্রান্তে তাকাল সত্যবতী। না, প্রহরী দূরে সরে গেছে।

নিমেষের মধ্যে শয্যাতলে গুপ্তছুরিকা লুকিয়ে ফেলল সত্যবতী।

হাসল কাদম্বরী, তাচ্ছিল্যের হাসি।

বললে, মৃত্যুকে তোমার এত ভয় সত্যবতী! ভেবেছিলাম আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তুমি প্রস্তুত হয়ে আছ। সম্মান বিসর্জন দিয়েও বেঁচে থাকতে এত লোভ তোমার?

ব্যথাতুর চোখ তুলে তাকাল সত্যবতী। বললে, সম্মান তো বিসর্জন আমি দিইনি কাদম্বরী।

—এর চেয়ে অসম্মান আর কি হতে পারে রাজকুমারী? এর চেয়ে বড় লজ্জা কি আছে?

সত্যবতী মৃদু হেসে বললে, আমি বিদ্রোহীদের অধিনায়কের জন্যে অপেক্ষা করছি কাদম্বরী।

বিদ্রূপের স্বরে হেসে উঠল কাদম্বরী। বললে, কিন্তু বরমাল্য কই? দর্শন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দেবে না?

চুপ করে রইল সত্যবতী, কোনও উত্তর দিল না এ প্রশ্নের। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল তার। অসত্য নয় আলাপনীর বিদ্রূপ। যে স্বেচ্ছাচারীর হাতে কৃষ্ণরাম নিহত হয়েছেন, ভ্রাতার জীবন বিপন্ন, তাকেই পতিত্বে বরণ করার স্বপ্ন দেখেছে সত্যবতী দিনের পর দিন।

কিন্তু শোভা সিংহ কি সত্যই স্বেচ্ছাচারী? প্রবলপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে বীরশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়, মোগলশক্তিকে পদানত করে হিন্দুর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনাই যার কাম্য, সেই শোভা সিংহকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে সত্যবতী।

মায়া-মমতা, আত্মীয়-স্বজন, সকলের চেয়ে বড় ধর্ম। সেই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গৌরব বোধ করে সত্যবতী।

শোভা সিংহকে ধর্মরক্ষকের প্রতীক মনে হয়। শোভা সিংহের জয় যেন সত্যবতীরও জয়।

ধীরস্বরে সত্যবতী বলে, মায়া-মমতার চেয়ে ধর্ম বড় কাদম্বরী, স্নেহ-ভালবাসার চেয়ে দেবতা।

সত্যবতীর কথা যেন আগুন ধরিয়ে দেয় কাদম্বরীর মনে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ায় কাদম্বরী, চিৎকার করে প্রহরীকে ডাক দেয়।

প্রহরী দ্বার খুলে দেয়।

সত্যবতীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হয় না কাদম্বরীর।

কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে রোষদীপ্ত পা ফেলে ফেলে অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে যায়।

পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় কারাকক্ষের লৌহদ্বার।

আর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সত্যবতীর বুক ঠেলে।

প্রতিদিনের মত সেদিনও অন্দর-মহল থেকে পর্দায় ঢাকা পালকি এসে থামল প্রাসাদের দরজায়। পালকি অনুসরণ করে অন্দর-মহলের দাসী।

প্রহরী দাসীকে প্রশ্ন করলে, কে আছেন পালকিতে?

—আলাপনী কাদম্বরী।

দাসীর কণ্ঠস্বর বুঝি কেঁপে উঠল।

—আর কে আছে ? সন্দেহের স্বরে প্রশ্ন করে প্রহরী ।

উত্তর দিতে পারল না দাসী । বিব্রত বোধ করল প্রশ্ন শুনে ।

—কে আছে আলাপনীর সঙ্গে, বলো ? পুনরায় প্রশ্ন করল প্রহরী ।

দাসী ভীতস্বরে বললে, আলাপনী একাই আছেন, শোভা সিংহের তাঁবুতে চলেছেন তিনি ।

কিন্তু দাসীর অপ্রতিভ ভাব দেখে সন্দেহ দৃঢ় হল । পালকির পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখলে একজন অবগুণ্ঠিতা নারী, আর একজন পুরুষ ।

ক্রুদ্ধ স্বরে প্রহরী প্রশ্ন করলে, কে ইনি ?

প্রহরীর মুখের সামনেই পর্দা টেনে দিল দাসী ।

—রাজকুমার জগৎরাম । শোভা সিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে চলেছেন । দৃঢ়-সংযত কণ্ঠে আলাপনী উত্তর দিল পর্দার আড়াল থেকে ।

জগৎরাম ?

চাঞ্চল্য দেখা দিল প্রহরীদের মধ্যে । জগৎরামকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পায়নি তারা । তবে কি অন্দর-মহলেই এতদিন লুকিয়ে ছিল জগৎরাম ?

প্রহরী বললে, আলাপনী যেতে পারেন, কিন্তু জগৎরামকে বেরিয়ে আসতে হবে । তাকে শৃঙ্খলে বন্দী করে নিয়ে যেতে চাই ।

পর্দা সরে গেল আবার । বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত জগৎরাম নেমে দাঁড়াল পালকি থেকে । প্রহরীরা মুগ্ধ হল জগৎরামের দিকে তাকিয়ে । মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে মখমলের বিলাতি খেলাত, কটিবন্ধে তরবারি, কিন্তু মুখে এক অপূর্ব কমনীয় ভাব ।

শৃঙ্খলে জগৎরামকে বেঁধে ফেলল তারা, তারপর পালকির পর্দা সরিয়ে দেখলে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বসে আছে কাদম্বরী ।

ইশারা করতেই কাদম্বরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পালকিবাহীরা, আর উল্লাস প্রকাশ করতে করতে শৃঙ্খলিত জগৎরামকে নিয়ে শোভা সিংহের তাঁবুর দিকে চলল প্রহরীর দল । উপস্থিত করল তাকে শোভা সিংহের কাছে । বললে, জগৎরামকে বন্দী করে এনেছি রাজাবাহাদুর !

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে শোভা সিংহ বললে, আসুন কুমারবাহাদুর, আপনার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করে আছি ।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষবেশী কাদম্বরী মাথার উষ্ণীষ খুলে ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠল । বললে, জগৎরাম এখন ঘোড়া ছুটিয়ে নবাবের দরবারে চলেছে শোভা সিংহ, কারও শক্তি নেই তাকে বন্দী করে । আমি জগৎরাম নই, আমি আলাপনী কাদম্বরী ।

চমকে উঠল সকলে ।

ক্রুদ্ধ বিমূঢ় শোভা সিংহ শুধু বললে, অবিশ্বাসিনীকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে দাও ।

বর্ধমান-যুবরাজ জগৎরাম এদিকে ভাগীরথী অতিক্রম করে ছুটে চলেছে ইব্রাহিম খাঁর উদ্দেশে । বর্ধমান থেকে হুগলী পর্যন্ত রাঢ়ভূমি বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে, এ-খবরে হয়তো সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সুরার নেশা কেটে যেতে পারে !

আশ্চর্য ! কেউ সন্দেহ করেনি কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম এভাবে নারীর ছদ্মবেশে মুক্তি লাভ করবে । সন্দেহও করেনি এভাবে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দিতে যাবে জগৎরাম ।

কখনও নারীর ছদ্মবেশে, কখনও বা গ্রাম্য চাষীর বেশে হুগলী অতিক্রম করেছে

জগৎরাম। আর ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এক অবলা নারীমূর্তি। আলাপনী কাদম্বরী।

নিজের জীবন রক্ষা করার চিন্তাতেই বিভোর হয়েছিল ভীতত্রস্ত জগৎরাম। আলাপনীর সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করেছে প্রাসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। চোখের সামনে তখন একটিমাত্র পথ। ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে খবর পৌঁছে দিতে হবে নবাবি দরবারে। শাহী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে হবে।

যৌবনের বিলাসব্যসনে নিদ্রিত ছিল জগৎরাম। চটুল চোখের তারায় শুধু আনন্দের ছায়া দেখেছে, তার কটাক্ষে দেখেছে শুধু মোহমদির প্রেমবিলাস। কখনও সন্দেহ হয়েছে, আলাপনী কাদম্বরী হয়তো সত্যিই রাজকুমার জগৎরামের প্রেমে অবগাহন করতে চায়। কখনও বা আলাপনীর আলাপকৌশল বলে মনে হয়েছে তার চোখের রহস্যময় দৃষ্টিকে।

কিন্তু এ-চক্রান্তের মধ্যে কাদম্বরী তার নিজের মৃত্যুকে এভাবে লুকিয়ে রাখবে, কল্পনাও করেনি জগৎরাম। মৃত্যুবরণ করেই বুঝি প্রণয়পাত্রকে জীবন দিয়ে গেল কাদম্বরী।

সন্দেহ নেই, কাদম্বরীর কৌশল ধরা পড়ে যাবে বিদ্রোহীদের কাছে। তারপর হয়তো নৃশংস অত্যাচারে কাদম্বরীকে হত্যা করবে তারা। হয়তো বা—

কল্পনার চোখে যেন সে-দৃশ্য দেখতে পেল জগৎরাম। উন্মত্ত একটি হাতির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে কাদম্বরী। কামনা চরিতার্থ হওয়ার হাসি তার মুখে। গোপন মনের প্রণয়াস্পদের জীবন রক্ষা করতে পেরেছে নিজের জীবন দিয়ে—সেই আনন্দেই যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু মত্ত হস্তী তো ত্যাগের মহিমা বোঝে না! জগৎরাম যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, হাতির শুঁড় ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল কাদম্বরীর অসহায় দেহকে। তারপর, আতঙ্কে যেন চিৎকার করে উঠল কাদম্বরী। শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করে কাদম্বরীকে পায়ের তলায় পিষে ফেলল যেন মত্ত হস্তীর আক্রোশ। কানের পাশে সত্যিই যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল কাদম্বরী।

মন ভরে গেল আত্মগ্লানিতে। নদী থেকে এক আঁজলা জল পান করে নিল সে।

তারপর সুতানুটির মহাজনের কাছে স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রেখে একটি ঘোড়া সংগ্রহ করে যাত্রা করল নবাব ইব্রাহিম খাঁর উদ্দেশে।

সমস্ত খবর শুনল ইব্রাহিম খাঁ। ভীত হয়ে উঠল। আলমগীরের রাজত্বে বিদ্রোহীদের এমন দুঃসাহস হবে কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

নিরুপায় অস্বস্তিতে বললে, এ-বিদ্রোহ আপনা থেকেই থেমে যাবে জগৎরাম, সৈন্য পাঠানোর হয়তো প্রয়োজন হবে না।

জগৎরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বললে, হ্যাঁ নবাববাহাদুর, আপনা থেকেই থেমে যাবে। হুগলী পর্যন্ত অধিকার করেছে রহিম খাঁ, দু-এক দিনের মধ্যেই ঢাকার পথেও যাত্রা করবে তারা। ঢাকা অধিকার করলেই বিদ্রোহ থেমে যাবে; কিন্তু আপনার সুবেদারি তক্তে তখন বসবে শোভা সিংহ।

নির্বোধের মতো হাসল ইব্রাহিম খাঁ, তারপর দার্শনিকের ভাষায় বললে, যুদ্ধ অশান্তির মূল জগৎরাম। যুদ্ধবিগ্রহে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু শান্তিরক্ষার জন্যে প্রজারাই কেন বিদ্রোহীদের বাধা দিচ্ছে না?

জগৎরাম চুপ করে রইল। কি উত্তর দেবে সে এই অর্থহীন প্রশ্নের? সমগ্র বাংলার প্রজারা দারিদ্র্যে, অত্যাচারে, ধর্মের ওপর অন্যায় আক্রমণের ফলে আস্থা হারিয়েছে আলমগীরের ওপর। বিদ্রোহীদের হাতে এখন লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। অর্থের লোভে, দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় দলে দলে তারা ছুটে চলেছে বিদ্রোহীদের দলে

যোগদান করার জন্যে। সে-খবর কি নবাব ইব্রাহিম খাঁ জানে না।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে জগৎরাম বললে, আপনি যদি বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হন তা হলে সম্রাটের কাছে যেতে হবে আমাকে। আলমগীরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এ-খবর।

বিচলিত হয়ে উঠল ইব্রাহিম খাঁ, আলমগীরের নাম শুনে।

বলল, না, না জগৎরাম। এ-বিদ্রোহ দমনের ভার আমিই নিলাম।

জগৎরামকে বিশ্রামকক্ষে পাঠিয়ে ইব্রাহিম খাঁ মহলসরার অন্দর-মহলে ছুটে এল উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

—সাকিনা! পিয়ারী!

সাকিনা বেগমের প্রমোদকক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিল ইব্রাহিম খাঁ।

ডাক শুনে চমকে উঠল সাকিনা বেগম। ইব্রাহিম খাঁ দরবারে গিয়েছে শুনেই অসতর্ক ছিল সাকিনা। কিন্তু...

সাকিনা এবং জাফর খাঁ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বিভ্রান্তের মত। উপায়?

প্রণয়লালসায় উন্মত্ত দুটি প্রাণীর ভোগলিপ্সা মুছে গেল মুহূর্তের মধ্যে, তখন পরস্পর পরস্পরের মুখে দেখতে পাচ্ছে শুধু আপন মৃত্যুর ছায়া।

আঠারো

জগৎরাম ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। জগৎরাম নবাব-দরবারে খবর পৌঁছে দিতে চলেছে শুনেই চাঞ্চল্য দেখা দিল শোভা সিংহের শিবিরে।

আত্মধিক্কারে ক্ষণেকের জন্যে বিমর্ষ হয়ে পড়ল শোভা সিংহ, সামান্যা এক নারীর কৌশলের কাছে পরাজিত হওয়ার লজ্জায়। পরক্ষণেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাদম্বরীকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে নৃশংসভাবে হত্যা করার আদেশ দিল।

কিন্তু শোভা সিংহ বুঝল না, কৌশল নয়, এক সামান্যা নারীর আত্মবিসর্জনের কাছে পরাজিত হয়েছে সে।

পুনরায় সুরাপাত্র তুলে নিয়ে নেশাগ্রস্ত চোখে শোভা সিংহ হুকুম দিল, রাজনন্দিনী সত্যবতীকে নিয়ে এসো আমার বিলাসকক্ষে।

সুরাসক্ত শোভা সিংহের আদেশ কানে আসতেই রক্ষীদের ইশারায় নিষেধ জানাল রহিম খাঁ।

তারপর শোভা সিংহের হাতের ওপর হাত রেখে বললে, ভুল কোরো না দোস্ত্। সমগ্র সুবা হাতের মুঠোয় আনতে এখনও অনেক দেরি।

সপ্রশ্ন রক্তিম চোখ তুলে তাকাল শোভা সিংহ। —সুবা? হঠাৎ অট্টহাসে হেসে উঠল শোভা সিংহ, বললে, সারা সুবা আমার পায়ের তলায়, সুবা আমার।

রহিম খাঁ মৃদু হেসে বললে, না শোভাজি। সুবা এখনও আলমগীরের। ভুলে যেয়ো না জগৎরাম ছুটে চলেছে ঢাকার পথে, বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দেবার জন্যে।

শোভা সিংহ হেসে উঠল সশব্দে।

বললে, খবর পৌঁছে দিলেও ইব্রাহিম খাঁর নেশা ভাঙবে না বন্ধু, যুদ্ধের নাম শুনেই সুবেদারি ফেলে রেখে পালাবে বাংলার অযোগ্য নবাব। শোভা সিংহের রসিকতায় হেসে উঠল রহিম শেখ।

—কিন্তু আলমগীর যে ভীরু ইব্রাহিম খাঁ নয়, শোভাজি। রহিম খাঁ দৃঢ় গলায় উত্তর

দিল। বললে, আলমগীরের সৈন্য এসে পৌঁছনোর আগেই সারা বাংলা জয় করে নিতে হবে। সময় নষ্ট করার সময় নয় এখন।

শোভা সিংহ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—ঠিক, সময় নষ্ট করার সময় নয় এখন। রাজনন্দিনীকে আজ রাত্রেই অঙ্কশায়িনী করতে হবে।

রহিম খাঁ হেসে বললে, সত্যবতী চিড়িয়া নয় যে উড়ে পালাবে। অপমানের প্রতিশোধ নেবার অনেক সময় পাবে দোস্ত্‌, কিন্তু রাজ্য জয় করার সুযোগ মিলবে না এর পর।

নেশা ছুটে গেল শোভা সিংহের। ঠিক কথাই বলেছে রহিম খাঁ। তার যুক্তিই স্বীকার করে নিল শোভা সিংহ, বন্যার বেগে সসৈন্যে হুগলীর দিকে এগিয়ে যেতে হবে অবিলম্বে।

পাঁচশত সৈন্যের একটি রক্ষীবাহিনী রেখে যেতে হবে বর্ধমানে। সত্যবতী ততদিন কারাগারে নির্জন যন্ত্রণা ভোগ করুক। সারা বাংলা জয় করে ফিরে আসবে শোভা সিংহ।

জগৎরাম সেদিন তার সামনেই কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াবে। আর সত্যবতী?

কল্পনার চোখে দেখতে পায় শোভা সিংহ, তার ভোগ-লালসা মেটাবার জন্যে যেন বর্ধমানরাজের পরমাসুন্দরী কন্যা নিজেই উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

আবার জয়ধ্বনি উঠল বিদ্রোহী প্রজাদের, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল শোভা সিংহের বিজয়-বার্তা।

হাবশি সুলেমানের ওপর বর্ধমান শাসনের ভার দিয়ে বন্যার বেগেই এগিয়ে চলল বিদ্রোহী সৈন্য। দরিদ্র গ্রামবাসীর দল অত্যাচারে অনাহারে দিন কাটিয়ে এসে হঠাৎ এক আশার আলো দেখতে পেয়েছে। একদিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, অন্যদিকে অর্থের লোভ, লুটের ধনে অদৃষ্ট ফিরিয়ে নেবার লোভ। দলে দলে তারা ছুটে এল শোভা সিংহের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে।

হুগলী পর্যন্ত অধিকার করে ভাগীরথীতীরে এসে থামল শোভা সিংহ। কটক থেকে হুগলী পর্যন্ত সমস্ত রাঢ়ভূমি তখন বিদ্রোহী-অধিকৃত।

ভাগীরথীর তীরে তাঁবু ফেলে পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরি হবার আদেশ দিল শোভা সিংহ। গুপ্তচর পাঠিয়ে অপেক্ষা করল নবাবি সৈন্যের খবর জানবার জন্যে।

বিশ্রাম পেয়ে বিদ্রোহী সৈন্যরা অত্যাচার শুরু করল চতুর্দিকে। ইংরেজ আর ওলন্দাজের বণিককুঠি লুণ্ঠিত হল, গ্রামের পর গ্রাম।

সব অনাচার ছাপিয়ে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি উঠল সৈন্যদের কণ্ঠে। জয়ধ্বনি নয়, যেন হিন্দুর ধর্মকে বিদ্রূপ করল তাদের নৃশংসতা। লুণ্ঠিত হল হিন্দুর ধনরত্ন, খাদ্যভাণ্ডার। ধর্ষিত হল হাজার হাজার হিন্দু নারী। সেই হিন্দু বিদ্রোহী সৈন্যদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেল না ব্রাহ্মণ বধূ, বিধবা, কুমারীর দলও।

রাজ্যলোভের উন্মাদনায় শোভা সিংহও বুঝি সব আদর্শ ভুলে গেল, উদ্দেশ্য হারাল অহঙ্কারের কুহেলিকায়। সব জয়ধ্বনির ফাঁকে একটি নারীর শরীর কুহকিনীর মত বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। শোভা সিংহের অভ্রংলিহ অহঙ্কার যেন মাটিতে মিশিয়ে দেয় অতীতের একটি তুচ্ছ ঘটনার বিষাক্ত স্মৃতি।

সত্যবতীর আভিজাত্যের গরিমাকে গ্লানির পদাঘাতে নিষ্পেষিত না করে যেন শান্তি নেই। বর্ধমান-রাজকন্যার গৌরবের মুকুটকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে এক অবলা নারীর উপহাসের। জবাব দিতে হবে তার ঔদ্ধত্যের।

শুধুই প্রতিশোধ? না, কামনার শিখার মত সত্যবতীর যৌবনরূপ ভেসে উঠল শোভা সিংহের চোখের সামনে। প্রবৃত্তি জেগে উঠল।

রহিম খাঁর ওপর বিদ্রোহী সৈন্যের ভার দিয়ে বর্ধমানে ফিরে এল শোভা সিংহ।

হাবশি সুলেমান কুর্নিশ করে হাত পাতলে শোভা সিংহের সামনে।—ফরমাইয়ে জাহাঁপনা।

শোভা সিংহ সহাস্যে প্রশ্ন করল—সত্যবতী ?

ঘাড় নেড়ে ইশারায় সুলেমান জানালে, সব ঠিক আছে।

শোভা সিংহ খুশি মনে ইশারা করলে 'জরিয়া' দাসীকে।

পান-পাত্র এনে দিল জরিয়া। সুরার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল শোভা সিংহ। ক্রমশ অন্যায়ের আগুন জ্বলে উঠল তার সুরাসক্ত রক্তিম চোখে।

রাতের অন্ধকার নেমে এল রাজপ্রাসাদ ঘিরে। একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠল প্রাসাদের কক্ষে। সত্যবতীর কারাগারে।

উন্মত্ত কামনায় টলতে টলতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল শোভা সিংহ। সঙ্গে হাবশি সুলেমান।

সত্যবতীর কারাকক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল শোভা সিংহ।

সুলেমান লৌহদ্বার খুলে দিল। পুনরায় দ্বার বন্ধ করে দিল শোভা সিংহ প্রবেশ করতেই।

সত্যবতী বিস্ময়ে চোখ খুলে তাকাল শোভা সিংহের দিকে। মদ্যপ শোভা সিংহের কামনাকুটিল উন্মত্ত চোখের দিকে।

একজোড়া স্বর্ণকঙ্কণ হাতে নিয়ে সত্যবতীর সামনে মেলে ধরল শোভা সিংহ। অট্টহাসে হেসে উঠল নিঃশব্দ প্রাসাদ কাঁপিয়ে।

বললে, যে-কঙ্কণ ফিরিয়ে দিয়েছিলে রাজনন্দিনী, সেই কঙ্কণই তোমার হাতে পরিয়ে দিতে এসেছি।

ঘৃণায় বিভীষিকায় আতঙ্ক ফুটে উঠল সত্যবতীর চোখে। ভয়ে পিছিয়ে এল সত্যবতী।

দিনের পর দিন প্রহরীদের কাছে শোভা সিংহের বিজয়বার্তা শুনেছে সত্যবতী, মনে মনে উল্লসিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছে সারা ভারতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার। স্বপ্ন দেখেছে বীরশ্রেষ্ঠ শোভা সিংহের।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে শোভা সিংহ সমগ্র বাংলা জয় করে এসে দাঁড়াবে তার সামনে, আর শোভা সিংহের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবে সত্যবতী। বিনিময়ে চেয়ে নেবে ভ্রাতার জীবন, পিতার হৃতরাজ্য।

কিন্তু এ কি বীভৎস রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে শোভা সিংহ!

শোভা সিংহ তখনও অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্দিনীর রূপের মোহে। রূপলাবণ্যময়ী রাজকুমারীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করল শোভা সিংহকে। সুরার নেশায় বুঝি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল সেই বিদ্রোহী বীর।

মৃদু হেসে শোভা সিংহ বললে, একদিন তুচ্ছ ভূস্বামী বলে আমার পাণিগ্রহণ করতে চাওনি রাজকুমারী, অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে আমার প্রস্তাব। এখনও কি সেই স্পর্ধা আছে তোমার ?

সত্যবতী কোনও উত্তর দিল না।

শোভা সিংহ বললে, এখনও চিন্তা করে দেখো সত্যবতী, স্বেচ্ছায় যদি বিবাহ করতে চাও তা হলে এই বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পাবে, শোভা সিংহের পত্নীর সম্মান পাবে।

সত্যবতী ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যাকে পশুরও অধম মনে করে, তাকে পতিত্বে বরণ করতে পারে না কোনও হিন্দু নারী।

অট্টহাসে হেসে উঠল শোভা সিংহ।

কামান্ধ দৃষ্টিতে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে শোভা সিংহ্ বললে, কিন্তু এখনও আমার মধ্যে পশুত্ব দেখনি সত্যবতী। আমি সত্যিই পশু !

টলতে টলতে এগিয়ে এল শোভা সিংহ্। বললে, না সত্যবতী, বিবাহ্ করে তোমার মর্যাদা নষ্ট করতে চাই না আমি। আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। যে-ঐশ্বর্য চাও, তোমার কোনও কামনাই অতৃপ্ত রাখব না, কিন্তু আমার কামনাকেও অতৃপ্ত রেখো না তুমি।

সত্যবতী ঘৃণায় আতঙ্কে পিছিয়ে এল শোভা সিংহের কামলুব্ধ হাত থেকে বাঁচবার আশায়।

মদ্যপ শোভা সিংহ্ স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীর মনে হল, উন্মত্ত একটা অসুর যেন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

বলিষ্ঠ দুটি হাতের আলিঙ্গনে ধরা পড়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী। ছাড়া পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলে।

শোভা সিংহের শরীরে তখন পশুত্ব জেগে উঠেছে। ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সব কিছু ভুলে গেল সে।

লালসামত্তের আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হল সত্যবতীর বেশবাস, বিস্রস্তবসনা রাজকন্যাকে জয় করবার অদম্য আগ্রহে উন্মত্ত হয়ে উঠল শোভা সিংহ্।

হঠাৎ মনঃস্থির করে ফেলল সত্যবতী, বাধা দিল না।

বললে, আপনার কামনায় সম্মতি জানাচ্ছি আমি। কিন্তু হিন্দু বীর আপনি, এভাবে হিন্দু নারীর সম্মান প্রহরীদের সামনে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন না, এই ভিক্ষা আমার। সত্যবতীর চোখের কোণে বেদনার অশ্রু দেখা দিল।

শোভা সিংহ্ সন্তুষ্টির হাসি হেসে সে কথা বিশ্বাস করল। অদম্য কামনা চরিতার্থ করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আলিঙ্গন শিথিল করল সে।

পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল শোভা সিংহ্।

কটিবন্ধের গুপ্ত ছুরিকা বের করে শোভা সিংহের বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে রাজকুমারী।

চিৎকার শুনে ছুটে এল হাবশি সুলেমান, ছুটে এল প্রহরীর দল। দেখলে, রক্তাক্ত ছুরিকা হাতে উন্মাদের হাসি হাসছে বর্ধমান-রাজকন্যা, আর শোভা সিংহের মৃতদেহ পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। রক্তে ভেসে গেছে সমস্ত কারাকক্ষ।

রাজকুমারী সত্যবতীর কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পেল না সুলেমান।

কারাদ্বারের বাইরে থেকে দেখলে, হাতের রক্তাক্ত ছুরিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাগলের মত সশব্দে হেসে উঠল সত্যবতী। দেখলে, উন্মাদিনী রাজকুমারীর দুচোখ বেয়ে অশ্রুর মালা ঝরে পড়ছে।

নিজের মনেই যেন সত্যবতী বললে, তোমার বীরত্বকে আমি ভালবেসেছিলাম শোভা সিংহ্, যে হিন্দুধর্মের ধ্বজা ওড়াতে চেয়েছিলে তুমি, সেই ধর্মকে আমি ভালবেসেছিলাম। গোপন মনে প্রেমের আসন দিয়েছিলাম তোমাকে...কিন্তু তুমি এত ক্ষুদ্র ? এত হীন তুমি ? পঙ্ককীটের মত এমন নীচ তুমি ? আমি জানতাম না।

সত্যবতী বলে উঠল, যে মানুষের ধর্ম রক্ষা করতে জানে না, দেবতার ধর্ম রক্ষায় তার কোনও অধিকার নেই।

সশব্দে আবার হেসে উঠল সত্যবতী। পাগলিনীর মত। সমগ্র নিঃশব্দ প্রাসাদ কেঁপে কেঁপে উঠল তার হাসিতে। তারপর রক্তাক্ত ছুরিকা সজোরে বসিয়ে দিল সে নিজেরই বুকে।

উনিশ

খবর এসে পৌঁছল চিতোয়া-বরদার দুর্গপ্রাসাদে।

অধিনায়ক শোভা সিংহের মৃত্যুর খবর শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল দুর্গরক্ষী আর পাইক-বরকন্দাজের দল। সংবাদের পিছনে পিছনে এল মিথ্যা আশঙ্কার গুজব।

প্রধান রক্ষীর কাছ থেকে শুনল সুরঞ্জাক্ষী, সুরঞ্জাক্ষীর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রভা। মৃত্যু হয়েছে শোভা সিংহের, পরাজিত হয়েছে বিদ্রোহীরা। আর সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নির্দেশে নাকি দশ সহস্র সৈন্য এগিয়ে আসছে মেদিনীপুরের দিকে।

সুরঞ্জাক্ষী ভীত শঙ্কিত চোখে তাকাল চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে। না, সে-মুখে ভয় নেই, আশঙ্কা নেই। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার চোখের অশ্রুও কি শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে? পিতার মৃত্যুর খবর কিভাবে চন্দ্রপ্রভার কাছে প্রকাশ করবে ভেবে পায়নি সুরঞ্জাক্ষী। ভয় ছিল, সে-খবর শুনে হয়তো কান্নায় ভেঙে পড়বে চন্দ্রপ্রভা, জ্ঞান হারাবে শোকে দুঃখে।

কিন্তু এতটুকু বিচলিত বোধ করল না চন্দ্রপ্রভা। বললে, ভয় নেই সুরঞ্জাক্ষী, ইব্রাহিম খাঁকে আমার ভয় নেই। আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধ!

বিস্মিত চোখ তুলে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকাল সুরঞ্জাক্ষী। বলে কি চন্দ্রপ্রভা! গোপনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে অপেক্ষা করবে ইব্রাহিম খাঁর জন্যে? সুবেদারের বিপুল সৈন্যসংখ্যার সামনে কি দাঁড়াতে পারবে দুর্গরক্ষীরা?

সুরঞ্জাক্ষীর মনের প্রশ্ন যেন বুঝতে পারল চন্দ্রপ্রভা।

বললে, যুদ্ধসাজেই সাজতে হবে আজ। অপেক্ষা করতে হবে ইব্রাহিম খাঁর জন্যে। কিন্তু তার আগে...

অনামিকা থেকে অঙ্গুরীয় খুলে সুরঞ্জাক্ষীর চোখের সামনে মেলে ধরল। মৃদু হাসল তার চোখে চোখ রেখে।

শঙ্কিত হয়ে উঠল সুরঞ্জাক্ষী। —আত্মহত্যা!

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বললে, না, যুদ্ধ! যুদ্ধে আমরাই জয়ী হব সুরঞ্জাক্ষী, এই আমার রক্ষাকবচ, সব বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

রক্ষাকবচ?

মনে পড়ল সুরঞ্জাক্ষীর। বিষ্ণুপুর-যুবরাজ রঘুনাথের অভিজ্ঞান। যে-কোনও বিপদে-আপদে স্মরণ করলেই ছুটে আসবেন তিনি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই গোপন অভিসারলগ্নে। সেই প্রণয়াস্পদ যুবরাজ আজ বিষ্ণুপুররাজ।

সুরঞ্জাক্ষীকে তখনও দুর্বোধ্য বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে চন্দ্রপ্রভা বললে, চলো, পারাবত-কক্ষে যেতে হবে এখনই।

সংক্ষেপে বিপদের কথা জানিয়ে বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের উদ্দেশে চিঠি লিখে চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়াল পারাবত-কক্ষে।

দেশ-বিদেশে, ভারতের বিভিন্ন রাজার কাছে সংবাদ পাঠাবার জন্যে কয়েকটি শিক্ষিত পারাবতের কক্ষ। খুঁজে খুঁজে বিষ্ণুপুর-রাজপ্রাসাদের জন্যে নির্দিষ্ট পারাবতটিকে বের করে স্নেহের স্পর্শে তাকে বুকে চেপে বেরিয়ে এল চন্দ্রপ্রভা। চিঠি আর অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় বেঁধে দিল তার পায়ে।

তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদের শীর্ষে উঠে এল চন্দ্রপ্রভা। নীল নির্মেঘ আকাশের গায়ে

উড়িয়ে দিল তাকে।

দুর্গের চারিপাশে কয়েকবার চক্র দিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে উড়ে গেল সংবাদবাহী পারাবত। একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা, তাকিয়ে রইল সুরঞ্জাক্ষী। দূরে, দূরে, ক্রমশ মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেল একটি শ্বেতবিন্দু। নির্নিমেষ নয়নে আশার চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা—উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। আর সুরঞ্জাক্ষী দেখল, চন্দ্রপ্রভার রূপোজ্জ্বল দুটি চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। আশান্বিত আনন্দের, না বেদনার ?

গান, শুধু গান! দুর্জন সিংহের মৃত্যুতে রাজা রঘুনাথ পেয়েছিল রাজভাণ্ডারের অধিকার। মাতার মৃত্যুর পর সব বাধা-নিষেধ সরে গেছে। একদিকে বিরহযন্ত্রণা, অন্যদিকে শোকের ছায়া। গানের সুরে সব ভুলতে চেয়েছে রঘুনাথ।

বিষ্ণুপুর-রাজভবনের মৃদুমন্দ বাতাসে সুর কেঁপে কেঁপে যায়। সেতারের তারে কখনও কান্নার আর্তনাদ, কখনও উচ্ছল আনন্দের রেশ বাজে।

কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ আর গন্টনবাঁধের নিস্তব্ধ কালো জলের পরিবেষ্টনে রঘুনাথের সঙ্গীতসৌধ যেন এক কল্পরাজ্যের মায়া সৃজন করে থমকে আছে।

তম্বুরার তারে বিভোর হয়ে যায় বাহাদুর খাঁ। কখনও বা মৃদঙ্গে মৃদুমধুর বোল ফোটে পীর বক্সের অঙ্গুলিস্পর্শে। আর রঘুনাথ ? না, বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীশ্বর নয়। শৌর্যের, সম্পদের উত্তরাধিকারী নয় যেন। কিশোর কৃষ্ণমোহনের মতই এক সঙ্গীত-সাধক। সঙ্গীতই যেন তার প্রাণের স্পন্দন।

রাজসিক বিশ্রাম আর আনন্দের মধুস্নিগ্ধ আসর নয়—সাধনা। বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীতের কেন্দ্রভূমি করে তুলতে না পারলে যেন শান্তি নেই। চোখের সামনে কিশোর কৃষ্ণমোহন তিলে তিলে যৌবনের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, দেখতে পায় রঘুনাথ। আর দিব্যচক্ষে যেন দেখতে পায়, বিষ্ণুপুরের সাধনা সার্থক করে তুলেছে এই তরুণ সঙ্গীতরথী।

রাজকার্য ভুলে সঙ্গীতভবনে ছুটে আসে রঘুনাথ। মৃত্যুপূর্বের মুহূর্তে রানীমা তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে রঘুনাথের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম রঘুনাথ।

আর রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করেছিল, অনুজকে পালন করবে সে সন্তানস্নেহে। কিন্তু গানের নেশায় তাকেও তুলে দিল সে বৃত্তিভোগী দাসদাসীদের হাতে। হায়, রঘুনাথ যদি বুঝতে পারত, এই গোপালকে ঘিরেই একদিন বিষ্ণুপুরের বাতাস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হবে !

এদিকে গান, শুধু গান। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে বলে, চক্রবর্তীকে তালিম দিন ওস্তাদজি। যেন হিন্দুস্থানে বিষ্ণুপুর বিখ্যাত হতে পারে তার গানের জলুসে।

গদাধরকে বলে, সুরকে আয়ত্তে আনাই তোমার একমাত্র আদর্শ নয় চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুর তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, সারা ভারতবর্ষ তোমার কাছে এক নতুন ঘরোয়ানা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গদাধর। এ কি মিথ্যা স্বপ্ন দেখছেন রঘুনাথ। না, সে দেবদত্ত কণ্ঠসুর নেই তার। নিজে বড় হবার স্বপ্ন দেখে না গদাধর ; স্বপ্ন দেখে কবে কৃষ্ণমোহন ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠবে। গদাধর জানে, ওস্তাদজির কাছ থেকে সে পেয়েছে শুধু জ্ঞান, কৃষ্ণমোহনের আছে প্রতিভা।

কৃষ্ণমোহনের মনেও বুঝি এই একই স্বপ্ন, একই আশা। কে জানত, সঙ্গীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক অপার্থিব আনন্দ, এমন স্বর্গীয় পুলক !

তৃপ্তির হাসি হাসে রঘুনাথ। কৃষ্ণমোহনের সিদ্ধি যেন রঘুনাথেরই সিদ্ধি।

রঘুনাথ নৌকাবিহারে টেনে নিয়ে যায় কৃষ্ণমোহনকে। যমুনাবাঁধের তরঙ্গে তরঙ্গে গানের জোয়ার আসে। ময়ুরপঙ্খী নৌকার পাটাতনে নরম গালিচায় শরীর এলিয়ে বসে রঘুনাথ আর বাহাদুর খাঁ। কৃষ্ণমোহনের হাতে কখনও রবাব, কখনও সুরশৃঙ্গার। সেতার, সুরবাহার, দিলরুবা, পাখোয়াজ আর তবলার মৃদু মৃদু ধ্বনি।

গানের অরমা আর আসাওরির দরিয়ায় তন্ময় হয়ে ডুবে যায় সকলে।

সেদিনও এমনি এক মোহাবেশে মুগ্ধ হয়ে নৌকাবিহার করছিল রঘুনাথ। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত্রি। যমুনাবাঁধের জলে, রাজপ্রাসাদের ওপর চন্দ্রালোকের আলোকবিচ্ছুরণ। আর বাতাসে মৃদঙ্গের বোল।

তন্ময় হয়ে পীর বক্সের মৃদঙ্গ শুনছিল রঘুনাথ, রাতের আকাশের দুগ্ধফেনিল বীথিপথের দিকে চোখ রেখে।

হঠাৎ তন্ময়তা ঘুচে গেল। দেখলে, একটি শ্বেত পারাবত উড়ে এল প্রাসাদের দিকে, উড়ে এসে চক্র দিতে শুরু করল প্রাসাদশীর্ষকে কেন্দ্র করে।

সংবাদবাহী পারাবত। রঘুনাথ বুঝতে পারল। তবু, উদ্‌গ্রীব হল না সংবাদ জানবার জন্যে।

মুখ্য অমাত্যের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে গানের সুরেই বুঝি তন্ময় হয়ে থাকতে চায় রঘুনাথ।

কিন্তু তন্ময়ভাব কেটে গেল। রঘুনাথের চোখের সামনেই পারাবতটি চক্র দিতে দিতে প্রাসাদের নির্দিষ্ট কক্ষে নেমে এল। আর ক্ষণপরেই একজন রক্ষী ছুটে এল ঘাটের দিকে।

রঘুনাথ বুঝতে পারল, কোনও জরুরি খবর এসে পৌঁছেছে। ঘাটে নৌকা ভিড়োবার আদেশ দিল রঘুনাথ।

রক্ষী সসম্মানে অভিবাদন করে রঘুনাথের হাতে তুলে দিল চন্দ্রপ্রভার চিঠি। বিষ্ণুপুরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়।

চন্দ্রপ্রভার চিঠি। চন্দ্রপ্রভার আহ্বান।

বিচলিত হয়ে উঠল রঘুনাথ। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই লাজনম্র অভিসারিণীর সুন্দর মুখখানি।

প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ল রঘুনাথের। মনে পড়ল, উপযাচিকা চন্দ্রপ্রভার প্রেমের যোগ্য প্রতিদান দেবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছিল সে।

বিস্মিত হল রঘুনাথ। সঙ্গীত কি প্রেমের চেয়ে বড় আকর্ষণ? গানের নেশা কি মনের নেশাকেও ভুলিয়ে রাখে?

কত বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্নে ভেসে উঠেছে চন্দ্রপ্রভার রূপ, মানস রোমন্থনে কত না প্রণয়গভীর কাহিনী বুনেছে রঘুনাথ। তারপর ধীরে ধীরে কখন নিজেরই অজান্তে চন্দ্রপ্রভাকে মুছে ফেলেছে মন থেকে। অথচ যৌবন-সন্ধিক্ষণে একদিন যে-কোনও বিপদে-আপদে চন্দ্রপ্রভাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

চন্দ্রপ্রভার আত্মসমর্পণের সেই বিস্মৃত মুহূর্তের কয়েকটি ছবি যেন আবার নতুন করে ভেসে উঠল চোখের সামনে।

কুড়ি

শোভা সিংহের মৃত্যুর খবর পেয়ে নবাবি সৈন্যের চিতোয়া-বরদা আক্রমণের গুজবে বিশ্বাস করেছিল চন্দ্রপ্রভা। অথচ শোভা সিংহের মৃত্যুসংবাদও গিয়ে পৌঁছল না ইব্রাহিম খাঁর দরবারে।

জগৎরামের কাছে বিদ্রোহের খবর শুনেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সাকিনা বেগমের হামাম-ই-গুলাবে গিয়ে দরজার বাইরে থেকেই ইব্রাহিম খাঁ ডাকলে, সাকিনা, পিয়ারী!

ইব্রাহিম খাঁ দরবারে গিয়েছে শুনেই অসতর্ক ছিল সাকিনা, জাফর খাঁ। ডাক শুনে বিভ্রান্তের মত পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। আখরোট কাঠে ঢাকা জলশূন্য শ্বেতপাথরের জলাধারের দিকে ইশারা করলে সাকিনা।

শিউরে উঠল জাফর খাঁ। চকিতে মনে পড়ল নবাবের অঙ্গুলিনির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে ফুটন্ত জল এসে পড়তে পারে ওই জলাধারে।

জাফর খাঁ মাথা নেড়ে বললে, না সাকিনা, কাপুরুষের মত মৃত্যুবরণ করতে পারব না।

জাফর খাঁর মনের চোখে হয়তো একটি পুরনো দিনের দৃশ্য ভেসে উঠল। হয়তো সে-কাহিনী সত্য নয়, হয়তো কিংবদন্তী মাত্র। শাজাহান-কন্যা জাহানারা বেগমসাহেবার কক্ষেও এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন শাহ্ আলম। হয়তো কন্যার গুপ্ত প্রণয়ের খবর তাঁর কানেও পৌঁছেছিল। হামামের মধ্যে তখন মনসবদার আকেল খাঁ উপস্থিত।

নিরুপায় জাহানারা তাই প্রণয়পাত্রকে একটি আবৃত তাম্রজলাধারে লুকিয়ে রাখলেন। শাজাহান কিন্তু কক্ষে ঢুকেই বুঝতে পারলেন কন্যার প্রেমাস্পদ কোথায় লুকিয়ে আছে। তবে মুখে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্নান করোনি জাহানারা?

জাহানারা উত্তর দিলে, না।

হাসলেন শাজাহান, তারপর বাঁদীদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, উষ্ণ জলে শাহজাদী স্নান করবেন।

চোখের সামনে আগুন জ্বলে উঠল বিরাটাকৃতি তাম্রপাত্রের নীচে, ফুটন্ত জলের নৃশংসতায় মৃত্যুবরণ করল আকেল খাঁ।

মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী শাজাহানকে সেবা আর যত্ন দিয়ে জাহানারা তার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে গেছে, প্রমাণ করেছে এ-অপবাদ মিথ্যা, কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু মন থেকে পরিণতির সম্ভাবনাকে মুছে ফেলতে পারেনি জাফর খাঁ। এমন অগৌরবের মৃত্যুবরণ করতে চায় না তুরানি মনসবদার।

কটিবন্ধ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে জাফর খাঁ বললে, সাকিনা, মৃত্যু যদি হয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা করেই মৃত্যুবরণ করব।

বিস্মিত চোখে জাফর খাঁর মুখের দিকে তাকাল সাকিনা।

এদিকে সাকিনার উত্তর বা অনুমতি না পেয়ে পর্দার ওপার থেকে ভীতত্রস্ত ইব্রাহিম খাঁ আবার ডাকতে যাচ্ছিল, আর সেই মুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠল সাকিনা।

সশস্ত্র খোজারা ছুটে এল, বাঁদীরা ছুটে এল। আর ইব্রাহিম খাঁ পর্দা সরিয়ে সাকিনা বেগমের স্নানাগারে ঢুকে পড়ল। খোজাদের ডাকল চিৎকার করে। দেখল, হাতে মুক্ত তরবারি নিয়ে বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছে একজন তুরানি মনসবদার, আর সাকিনা আর্তনাদ করছে।

খোজারা ছুটে এসে শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলল জাফর খাঁকে।

বিমূঢ় বিভ্রান্ত জাফর খাঁ তখনও দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সাকিনার দিকে।

ইব্রাহিম খাঁ প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে সাকিনা ? কি হয়েছে ?

ভয়-ভীরু চোখ তুলে তাকিয়েই ইব্রাহিম খাঁকে এসে জড়িয়ে ধরল সাকিনা। কাঁপতে কাঁপতে বললে, হামামে এই লম্পট মনসবদারটা লুকিয়ে ছিল নবাব বাহাদুর। তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে আমার ইজ্জত নষ্ট করতে এসেছিল...

অগ্নিবর্ষী চোখে জাফর খাঁর মুখের দিকে তাকাল ইব্রাহিম খাঁ। তারপর খোজাদের ইশারা করলে। খোজারা সরিয়ে নিয়ে গেল জাফর খাঁকে। সাকিনা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ওকে কোতল করার হুকুম দিন নবাব বাহাদুর, কোতল করুন বেয়াদবকে।

ইব্রাহিম খাঁ খোজাদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় বললে, হ্যাঁ, কোতল !

হাতের তালি বাজিয়ে বাঁদীদের বিদায় নিতে বললে ইব্রাহিম খাঁ।

তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু বেতমিজ্ লোকটা মহলসরায় ঢুকল কি করে ?

সাকিনা কপট উষ্মা প্রকাশ করে বললে, এ নিশ্চয় বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগমের কাজ, আমাকে অপমান করার জন্যে। নুরুল্লা খাঁর সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে বেগমসাহেবা, তাই...

—নুরুল্লা ? আমার বিরুদ্ধে ? বিচলিত হল ইব্রাহিম খাঁ।

সাকিনা উত্তর দিলে, হ্যাঁ জাহাঁপনা, আপনার বিরুদ্ধে।

—তা হলে, তা হলে বিদ্রোহ দমন করতে যাবে কে ?

—বিদ্রোহ ?

ইব্রাহিম খাঁ বললে, হ্যাঁ সাকিনা, বিদ্রোহীরা হুগলী পর্যন্ত অধিকার করে ঢাকা আক্রমণ করতে আসছে।

সাকিনা বেগম বললে, নুরুল্লা খাঁকেই পাঠিয়ে দিন জাহাঁপনা। যদি বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ফিরে আসে তখন শাস্তি দেবেন তার চক্রান্তের, আর যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়...

—তাই ভাল সাকিনা, তাই ভাল। খুশি হয়ে উঠল ইব্রাহিম খাঁ।

বেগমসাহেবা দিল্‌রসের সব চক্রান্ত বুঝি ব্যর্থ হল। আপন প্রণয়পাত্রকে এভাবে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে নবাবের বিশ্বাস অর্জন করবে সাকিনা, কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি দিল্‌রস।

স্পষ্ট বুঝতে পারলে, নুরুল্লা খাঁকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চায় সাকিনা। হয়তো বা গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই নুরুল্লাকে হত্যা করতে চায়।

তাই ইব্রাহিম খাঁর সুরাসক্ত দুর্বল মুহূর্তে আরজি পেশ করল দিল্‌রস। বললে, বাদশাহর সক্ষম পুত্র জবরদস্ত্ খাঁ থাকতে বিদ্রোহ দমনের ভার নুরুল্লার ওপর দেওয়া কি উচিত ?

ইব্রাহিম খাঁ তখন অসন্তুষ্ট হয়ে আছে বেগমসাহেবার ওপর। বললে, জবরদস্ত্ নালায়েক এখন, সে যাবে বিদ্রোহ দমনে ?

দিল্‌রস মৃদু হেসে বললে, বিদ্রোহ আপনা থেকেই শান্ত হবে বাদশাহ, কিন্তু তার গৌরব পাবে নুরুল্লা ! আলমগীরের কাছে কি সে-খবর পৌঁছবে না ? আপনি কি জবরদস্তের বদলে ভবিষ্যতে বাংলার নবাবের মর্যাদা দিতে চান নুরুল্লা খাঁকে ?

ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু বিচলিত হল না এ কূট যুক্তিতে।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হল দিল্‌রস বেগমের।

শেষে জবরদস্ত্ খাঁকেই পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল দিল্‌রস। বললে,

তোমার ভবিষৎ তোমার পিতার হাতেই নষ্ট হতে চলেছে জবরদস্ত্‌।

—উপায় ? জবরদস্ত্‌ সপ্রশ্নে তাকাল বেগমসাহেবার দিকে।

বেগমসাহেবা কুটিল হাসি হেসে বললে, উপায় আছে। আমার উপদেশ শুনে কাজ করলে কোনও দিন ঠকতে হবে না জবরদস্ত্‌, বাংলার মসনদ হাতছাড়া হবে না ভবিষ্যতে। কিন্তু...

—কিন্তু ?

বেগমসাহেবা হেসে বললে, আমি তোমার সঙ্গে কোনও দিন বঞ্চনা করিনি জবরদস্ত্‌, বঞ্চিত হতেও চাই না তোমার কাছে। যদি জুলেখাকে তুমি বিবাহ্‌ করতে রাজি হও তা হলে আমার জামাতাকে আমিই নবাবি তক্তে বসিয়ে যাব।

ঈষৎ লজ্জা প্রকাশ করে জবরদস্ত্‌ বললে, আপনার উপদেশকে আমি আদেশ বলে মনে করব। আর, জুলেখাকে যদি দান করেন, তা হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব আমি।

দিল্‌রস খুশি হয়ে উঠল। বললে, তা হলে আজই সমস্ত অবস্থা জানিয়ে আলমগীরের কাছে চিঠি পাঠাও। বিদ্রোহ্‌ দমনে যাবার জন্যে আলমগীরের অনুমতি প্রার্থনা করো। হ্যাঁ, জানাতে ভুলো না যে, বাংলার মসনদ যখন বিদ্রোহীদের নাগালে এসে গেছে তখনও তোমাকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজি নন নবাব বাহাদুর।

ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু জানতে পারল না অন্দর-মহলের চক্রান্তে তার পুত্র তারই বিরুদ্ধে নালিশ পাঠাচ্ছে আলমগীরের কাছে।

সাকিনা বেগমের পরামর্শে ফৌজদার নুরুল্লা খাঁর নামে পরোয়ানা জারি করেই নিশ্চিন্ত হল বাংলার নবাব।

এদিকে যশোহরের বিলাসকক্ষে তন্দ্রাচ্ছন্ন নুরুল্লার মোহ্‌ ঘুচে গেল নবাবের পরোয়ানা পেয়ে। যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত ফৌজদার নুরুল্লা! মনসবদারের মন তখন সওদার দিকে। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে গোপন ব্যবসায়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঐশ্বর্যের বিলাসব্যসনে তখন সব বীরত্ব বিসর্জন দিয়ে বসে আছে নুরুল্লা। যুদ্ধই যার ধর্ম, অর্থের পিছনে ছুটে চলেছে সে। ধনরত্নের কামনায় আহুতি দিয়েছে যুদ্ধবিদ্যা।

নেশা ছুটে গেল নুরুল্লা খাঁর। মসলিনের ব্যবসায়ীকে যেতে হবে ফৌজের অধিনায়ক হয়ে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে।

যুদ্ধের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হল তার। অথচ উপায় নেই, সুবেদারের হুকুম। পরোয়ানা অমান্য করলে হয়তো আওরঙ্গজেবের দরবারেও গিয়ে পৌঁছবে তার অকর্মণ্যতার খবর।

অর্থের বিনিময়ে অন্য কোনও মনসবদারকে পাঠানো যায় কিনা খোঁজ করলে নুরুল্লা খাঁ। কিন্তু সাহস হল না।

শেষে নিজেই কিছু নবাবি ফৌজ নিয়ে যাত্রা করল হুগলীর দিকে। মাঝ-পথেই শুনল, রহিম খাঁ শাহ্‌ উপাধি নিয়ে নিজেকে বাংলার বাদশাহ্‌ বলে জাহির করেছে। সসৈন্যে নাকি এগিয়ে আসছে নবাবি ফৌজকে ধ্বংস করবার জন্যে।

রহিম খাঁর সৈন্য-সংখ্যা তখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একদিকে আলমগীরের ওপর অসন্তুষ্ট হিন্দু প্রজার দল—অন্যদিকে অর্থলোভী দরিদ্র গ্রামীণ। সকলেই যোগ দিচ্ছে রহিম খাঁর সৈন্যদলে। স্বয়ং আলমগীরও নাকি তার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাবে না।

গুজব শুনেই দ্রুত চুঁচুড়ার দিকে সসৈন্যে পালিয়ে গেল নুরুল্লা খাঁ। আশ্রয় নিল ওলন্দাজদের দুর্গে। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। নিশীথের অন্ধকারে গোপনে দুর্গ থেকে বেরিয়ে সাধারণ বেশে যশোহরে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রহিম খাঁ দুর্গ অবরোধ করল। নবাবি ফৌজ তন্নতন্ন করে খুঁজল নুরুল্লা খাঁকে। অনুসন্ধান ব্যর্থ হল তাদের। বুঝতে পারল, নুরুল্লা খাঁ প্রাণভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছে।

অন্ধ আক্রোশে ফৌজদারের বিশ্বাসঘাতকর্তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল তারা। দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল তারা রহিম খাঁর কাছে। নবাবি সৈন্যের গ্লানিময় পরাজয় উচ্ছৃঙ্খল করে তুলল রহিম খাঁর সৈন্যদের। শুরু হল লুণ্ঠন, অত্যাচার, অবিচার। হুগলী থেকে আবার এগিয়ে চলল রহিম খাঁ—মুখসুদাবাদের দিকে, রাজমহলের দিকে। ইব্রাহিম খাঁ দেখলে, আর উপায় নেই। জরুরি খবর পাঠাল আওরঙ্গজেবের কাছে।

আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে। জবরদস্ত্ খাঁর অনুযোগকে অসার মনে করে চুপ করে ছিলেন আওরঙ্গজেব। ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে খবর পেয়েই আদেশ পাঠালেন, জবরদস্ত্ খাঁকে অধিনায়ক করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাও। কিন্তু জবরদস্ত্ খাঁর ওপরও আস্থা রাখতে পারলেন না তিনি। পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাংলা ও বিহারের শাসন-কর্তৃত্বের ভার দিয়ে সৈন্য পাঠালেন। বিহারে এসে পৌঁছল আজিমুশ্বান। সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে করতেই খবর এল, জবরদস্ত্ বিদ্রোহীদের বর্ধমান পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছে।

প্রমাদ গনল আজিমুশ্বান। বিদ্রোহ দমনের সব গৌরব বুঝি জবরদস্ত্ খাঁ পেয়ে যায়। শাহজাদা সুলতান আজিমুশ্বান শঙ্কিত হয়ে উঠল নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে। হয়তো বাদশাহ বিরক্ত হয়ে জবরদস্ত্ খাঁকেই সুবাদার নিযুক্ত করবেন, আশঙ্কা হল শাহজাদার।

বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ-অপসরণের খবর গোপন রেখে যুদ্ধযাত্রার ভান করে এগিয়ে গেল আজিমুশ্বান। এমন এক অভিনয় করল যেন শাহজাদা নিজেই বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়েছে।

জবরদস্ত্ ক্ষুব্ধ হল আজিমুশ্বানের ব্যবহারে।

দিল্‌রস বেগমকে বললে, উপায় বাতলে দিন বেগমসাহেবা।

বেগমসাহেবাও উষ্মা প্রকাশ করল। বললে, আলমগীরের কাছে গিয়ে সব খবর জানিয়ে এসো জবরদস্ত্।

ইব্রাহিম খাঁ আর জবরদস্ত্ ছুটল দাক্ষিণাত্যের পথে। আর রহিম খাঁ সে-সংবাদ পেয়েই আবার বর্ধমানে সৈন্য মোতায়েন করে অপেক্ষা করল আজিমুশ্বানের জন্যে।

গজেন্দ্রগমনে বিলাসী শাহজাদা এসে পৌঁছল, শিবির স্থাপন করল বর্ধমানে। তারপর রাজসিক গর্বে শৃঙ্খল আর তরবারি পাঠালে রহিম খাঁর শিবিরে।

রহিম খাঁ তরবারি তুলে নিয়ে দূতমুখে উপদেশ দিল সন্ধি করার জন্যে। স্মরণ করিয়ে দিল রাজ্যলোভে শাজাহানের পুত্রদের গৃহবিবাদের কথা। জানালে, আফগান রহিম খাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করাই বিচক্ষণতা। এই সৌহার্দ্যের ফলে হয়তো আওরঙ্গজেবের পর আজিমুশ্বানই শাহ্ আলম হতে পারবে।

সন্ধিপত্রের আলোচনার জন্যে শাহজাদার মন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে আহ্বান জানালে রহিম খাঁ।

এমন সময় খবর এসে পৌঁছল চিতোয়া-বরদা আক্রমণ করতে আসছেন বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ। সামনে এবং পিছনে দুদিকেই তখন শত্রু।

রহিম খাঁ ডাকলে, সুলেমান!

হাবশি দৈত্যটা এসে দাঁড়াল তাঁবুর পর্দা তুলে। কুর্নিশ করে বললে, হুকুম বাদশাহ?

রহিম খাঁ চিতোয়া-বরদার দুর্গ আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে বললে, রাজনগরে

এখনই কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। যে-কোনও উপায়ে লালবাঈকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

—আমার ইনাম বাদশাহ্! আবার কুর্নিশ করে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসল হাবশিটা, তারপর কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে রহিম খাঁর সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

—পাবে ইনাম, পাবে। সারা বাংলার ফৌজদার হবে তুমি। সান্ত্বনা দিলে রহিম খাঁ।

আর হঠাৎ সে-কথা শুনে অট্টহাসে হেসে উঠল সুলেমান। নিজের বুকে একটা আঙুল ঠুকে প্রশ্ন করলে, আমি ফৌজদার? আর আপনি বাদশাহ্? সশব্দে আবার হেসে উঠল সুলেমান।

তারপর বললে, ও ইনাম চাই না বাদশাহ্, লালবাঈ আমার ইনাম।

—বেয়াদবের মতো কথা বোলো না সুলেমান। ধমক দিল রহিম খাঁ। বললে, লালবাঈ আমার বেগম, বাদশাহ্‌র বেগমকে ইনাম চাও তুমি!

—বাদশাহ্! বিদ্রূপের স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করলে সুলেমান। তারপর বেরিয়ে এসেই লাফ দিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পরমুহূর্তে।

একুশ

সংবাদবাহী পারাবত নিয়ে এল চন্দ্রপ্রভার আহ্বান। বিদ্রোহী শোভা সিংহের মৃত্যু হয়েছে, নবাব-সৈন্য নাকি এগিয়ে আসছে চিতোয়া-বরদা অধিকার করে রূপময়ী চন্দ্রপ্রভাকে বন্দিনী করবার জন্যে। ইব্রাহিম খাঁর যে তাঞ্জাম ফিরিয়ে দিয়েছিল সে পদাঘাত করে, সেই তাঞ্জামই বুঝি যাত্রা করেছে কুমারী কন্যার রূপযৌবনে নবাবের মহলসরার শোভা বাড়াবার বাসনায়।

দ্রুত প্রাসাদে ফিরে এল রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভার চিঠি পেয়ে।

রক্ষীকে বললে, শহরতকে খবর দাও, আর দেওয়ানজিকে।

দুশো নাওয়ারা সুসজ্জিত হল। পদাতিক আর নাওয়ারা সৈনিকের রণতরী একদিকে, আরেকদিকে এক সহস্র অশ্বারোহী।

সঙ্গীত-সাধক নয়, মল্লবংশের বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ। তানপুরা ফেলে দিয়ে তলোয়ার তুলে নিল সত্যাশ্রয়ী রঘুনাথ।

কিশোর কৃষ্ণমোহনকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, রাজার কর্তব্য পালন করতে চললাম বন্ধু, তোমার কর্তব্য তুমি ভুলো না। সঙ্গীতকে ফিরিয়ে আনতে হবে, শুধু শৌর্য নয়, সুরের যুদ্ধেও জয়লাভ করতে হবে।

কৃষ্ণমোহন বিনয়-সহাস্যে বললে, শুধু সঙ্গীত-সরস্বতীই নয়, লক্ষ্মীরূপিণী চন্দ্রপ্রভারও যেন অধিষ্ঠান ঘটে এ-রাজ্যে।

বিদ্যুৎগতিতে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে এগিয়ে চলল রঘুনাথ, রাজনগরের উদ্দেশে, চিতোয়া-বরদার উদ্দেশে।

অন্যদিকে বিড়াই আর কংসাবতীর ওপর দিয়ে মেদিনীপুরকে পরিবেষ্টন করে চলল সুদক্ষ নাওয়ারা সৈন্য।

বাংলার গ্রামীণ প্রজারা বাধা দিল না। অবনত মস্তকে প্রভুত্ব মেনে নিল রঘুনাথের। গ্রামের পর গ্রাম পদানত হল বিষ্ণুপুররাজের।

রহিম খাঁকেও বাধা দেয়নি তারা একদিন।

যুদ্ধ চায় না গ্রামবাসীরা, চায় শান্তি, চায় শৃঙ্খলা।

দিল্লির প্রাসাদে কিংবা আগ্রার দুর্গে কি পরিবর্তন ঘটল জানতে চায় না তারা। বাংলার নবাবি মসনদের পরিবর্তন অনুভব করে না। দারিদ্র্য আর অত্যাচার তাদের চিরসঙ্গী। গ্রাম্য রাজপ্রতিনিধির হাতে রাজস্ব তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চায়। জানে, রাজসিংহাসনে যারই অধিষ্ঠান ঘটুক, প্রজাদের জীবনে কোনও পরিবর্তন হবে না।

শোভা সিংহের স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে উল্লাস দেখা দিয়েছিল তাদের মনে। আনন্দ দেখা দিয়েছিল। শোভা সিংহের জয়ধ্বনিকে ভেবেছিল হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি। হিন্দুধর্মের বিজয়বার্তাকে ভেবেছিল স্বাধীনতার বার্তা।

সে ভুল ভেঙেছে তাদের। বুঝেছে, এ বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগসূত্র নেই। এ শুধুই স্বাধীনতার মোহ। প্রচণ্ড এক বিভ্রান্তি!

রাজনগরের দুর্গরক্ষীরাও কোনও বাধা দিল না। শোভা সিংহের মৃত্যু-সংবাদে সাহস হারিয়েছিল তারা। অপেক্ষা করছিল নবাবি সৈন্যের। যুদ্ধ নয়, আত্মসমর্পণের জন্যেই যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল। রঘুনাথের আকস্মিক আক্রমণে তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল তারা। অক্লেশে চিতোয়া-বরদা অধিকার করল রঘুনাথ।

বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে তখন আসন্ন যুদ্ধের অপেক্ষায় থমকে আছে উভয় পক্ষের সৈন্য। খরস্রোতা দামোদরের একদিকে আজিমুশ্বানের তাঁবুর সারি, অন্য তীরে আম্রকুঞ্জের আড়ালে রহিম খাঁর সৈন্য-শিবির।

দুপক্ষই কর্মব্যস্ত, দুজনেই সতর্ক দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে লক্ষ রেখে গোপনে ব্যূহ রচনা করে চলেছে।

আজিমুশ্বানের সেনাপতি খাজা আনোয়ার বিচক্ষণ রণনায়ক। সময়ের মূল্য বোঝে সে।

তাই আজিমুশ্বানকে বললে, এভাবে অপেক্ষা করলে বিদ্রোহীরা শক্তিসঞ্চয় করার সুযোগ পাবে শাহজাদা। নাওয়ারা ভাসিয়ে দামোদর পার হবার হুকুম দিন, বিদ্রোহীদের এই দুর্বল মুহূর্তেই আক্রমণ করা উচিত।

আজিমুশ্বান বললে, কিন্তু তার আগে রহিম খাঁর সন্ধির শর্তগুলো জেনে নেওয়া ভাল আনোয়ার।

সন্ধির শর্ত! হাসল খাজা আনোয়ার। যুদ্ধজয়ের মুহূর্তে কিনা সন্ধির শর্ত জানতে হবে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে! আজিমুশ্বানের আদেশের অর্থ বুঝতে পারল না আনোয়ার।

কিন্তু আজিমুশ্বানের মনে তখন দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। রহিম খাঁ দূতমুখে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রাজ্যলোভে শাজাহানপুত্রদের বিবাদের কথা। বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে এই বিবাদ পুনরায় দেখা দেবে, সাম্রাজ্যের লোভে নৃশংস হয়ে উঠবে উত্তরাধিকারীর দল।

সুতরাং রহিম খাঁর বন্ধুত্বকে অস্বীকার করা হয়তো উচিত হবে না।

জবরদস্ত্ আর ইব্রাহিম খাঁ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে দাক্ষিণাত্যে দরবার করতে গেছে আলমগীরের কাছে। আজিমুশ্বানের মিথ্যা আড়ম্বরের কথা জানতে পারবেন আওরঙ্গজেব, জানতে পারবেন বিদ্রোহ দমনের কৃতিত্ব তাঁর পৌত্রের নয়, ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্তের।

হয়তো আজিমুশ্বানকে অপসৃত করে বাংলা-বিহারের শাসনকর্তৃত্বের ভার জবরদস্তের হাতেই তুলে দেবেন তিনি।

দুর্দিনের আশঙ্কায় রহিম খাঁকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল

।

বললে, যাও আনোয়ার, রহিম খাঁ আমন্ত্রণ জানিয়েছে তোমাকে সন্ধিশর্ত আলোচনা করবার জন্যে।

বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল আনোয়ার, তারপর কুর্নিশ করে বললে, শাহজাদার হুকুম অমান্য করার সাহস নেই আমার, কিন্তু এর জন্যে অনুশোচনা করতে হবে আপনাকে।

বলে, সদর্পে বিদায় নিল আনোয়ার।

অপেক্ষা করে রইল আজিমুশ্বান।

রহিম খাঁর তাঁবুতে সন্ধির আলোচনা বুঝি শেষ হয় না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সেনাপতি খাজা আনোয়ার কি এখনও আলোচনা করছে রহিম খাঁর শিবিরে?

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল আজিমুশ্বান।

উৎকণ্ঠায় তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল দ্রুতপায়ে, দেখলে একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তার দিকেই।

অন্ধকারে চিনতে পারল না অশ্বারোহীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল লোকটির চেহারা। দেখলে, নবাবি সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

শিবিররক্ষী এসে খবর দিল, বিদ্রোহী দলের একজন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

—কি নাম তার? প্রশ্ন করলে আজিমুশ্বান।

হাবশি সুলেমান এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল ইতিমধ্যে। প্রকৃত নাম গোপন করে বললে, হামিদ খাঁ আমার নাম শাহজাদা, আপনার গোলাম।

এমন সময় গুপ্তচর এসে বললে, দুঃসংবাদ আছে শাহজাদা।

—কি খবর? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে আজিমুশ্বান।

উত্তর এল, সন্ধির শর্তের আলোচনা করার অভিনয় করে খাজা আনোয়ারকে হত্যা করেছে বিশ্বাসঘাতক রহিম খাঁ।

হতাশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল আজিমুশ্বান। খাজা আনোয়ারকে হত্যা করেছে রহিম খাঁ?

মনে পড়ল আনোয়ারের সাবধানবাণী। 'শাহজাদার হুকুম অমান্য করার সাহস আমার নেই, কিন্তু এর জন্যে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে শাহজাদা!'

অনুশোচনা নয়, সেনাপতির মৃত্যুতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল আজিমুশ্বান।

শুধু হাবশি সুলেমান বললে, ভয় নেই শাহজাদা, আনোয়ার নেই, কিন্তু আপনার নফর হামিদ খাঁ আছে।

সমগ্র রাঢ়ভূমিতে তখন লুণ্ঠন, অত্যাচার, অরাজকতা। সম্পদশীল বণিক, রাজকর্মচারী আর তালুকদারদের ধনরত্ন এবং জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। হুগলী-বর্ধমানের দরিদ্র গ্রামবাসীরা বিদ্রোহের মধ্যে নতুন এক আশার আলো দেখতে পেয়েছে, আস্বাদ পেয়েছে ঐশ্বর্যের। যুগ যুগ ধরে ধনীর বিরুদ্ধে, জমিদার আর তালুকদারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা যেন সুযোগ পেয়েছে বনবহ্নির মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার।

বিদেশী কুঠিয়ালরা দেখলে, বাংলার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত! মোগল বাদশাহদের চিরকাল তারা স্তবস্তুতি আর উপহার-উপচারে প্রীত করেছে, বিনিময়ে পেয়েছে শুধু বাণিজ্যের অধিকার। কিন্তু এই রত্নপ্রসূ মাটির লোভ জেগে উঠেছে তাদের মনেও। বাণিজ্য নয়, স্বামিত্ব পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে তারাও।

অরাজকতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের কুঠি আর জীবন বাঁচাবার নামে ইংরেজ বণিকরা অতি সহজেই অস্ত্রশস্ত্র আমদানির অনুমতি লাভ করল। অস্ত্রের নামে কামান আমদানি হল; কুঠির নামে গড়ে উঠল গোপন দুর্গ। জলদস্যুর অত্যাচারে বাধা দেবার নামে আমদানি হয়েছিল বিদেশী যুদ্ধজাহাজ, বিদ্রোহীদের বাধা দেবার নামে বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজের সুদৃঢ় কেল্লা। অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করতে শুরু করল সাম্রাজ্যলোভী বিদেশীরা।

দূরদৃষ্টির অভাবে মোগল সাম্রাজ্য তার নিজের কবর খোঁড়ার অনুমতি দিল ইংরেজ বণিকদের। শুধু দূরদৃষ্টির অভাব নয়, বিদেশী বণিকদের কুঠি ও জীবন রক্ষা করার শক্তিও হারিয়ে বসেছে তখন মোগল দরবার। তার চোখে তখন শুধুই বাণিজ্য শুল্কের লোভ। ফরাসি, দিনেমার আর ওলন্দাজরা সেই সুযোগে বাড়িয়ে তুলল তাদের নৌবহর।

বাংলার অধিবাসীরা বুঝতে পারল, এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে। মোগলের দিন শেষ হতে চলেছে।

সাম্রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বণিকশক্তির। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের যুদ্ধ অনিবার্য। ক্রমে ক্রমে হয়তো বিদেশী বণিকরাই সিংহাসন অধিকার করবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কার চেয়ে বর্তমানের লোভ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মোগল নবাবদের চোখে। আজিমুশ্বানের চোখেও সেই একই লোভ দেখা দিল।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই সওয়ানে-নেগারের গোপন পত্রে আজিমুশ্বান জানতে পেরেছিল, অনুমতির সীমা লঙ্ঘন করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে ইংরেজ আর ফরাসি বণিকরা। তবু সাবধান করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি শাহি ফৌজের অধিনায়ক।

বাংলাদেশ তখন সারা পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সারি সারি সমুদ্রজাহাজ তখন বাংলার পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে পাশ্চাত্যজগতে, পারস্যে, আরবে, জর্জিয়ায়, আর্মেনিয়ায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। সূক্ষ্ম বস্ত্র, গালিচা, নীল, রেশম, আফিং, চাল, আতর, চিনি, বিভিন্ন মশলা, মুক্তা, প্রবাল, তামাক। জাহাজের পর জাহাজ রপ্তানি হত, বিদেশী বণিকদের মারফত ফিরে আসত স্বর্ণমুদ্রার রাশি। রাজকোষ ভরে উঠত বাণিজ্যশুল্কে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় বহন করতে হলে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে আরও বেশি কর আদায় করতে হবে, সুতরাং তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে আপত্তি জানালে চলবে না। আজিমুশ্বান তার নিজেরই মনকে প্রবোধ দিলে, ইংরেজ আর ফরাসিদের সৈন্য নিয়োগের পিছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই, নিজেদের ধনসম্পদ রক্ষা করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু রহিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত হয়ে পড়ল আজিমুশ্বান। সেনাপতি খাজা আনোয়ারের উপর নির্ভর করে এত দূর এগিয়ে এসেছে সে। তার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই রহিম খাঁর হাতে নিহত হয়েছে আনোয়ার।

কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে ইংরেজ আর ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের সাহায্য চেয়ে পাঠাল আজিমুশ্বান। কিন্তু কোনও সাহায্যই এসে পৌঁছল না।

শুধু সুলেমান বললে, সময় নষ্ট করবেন না শাহজাদা, রহিম খাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করতে হবে এখনই।

আজিমুশ্বান অসহায় চোখ তুলে বললে, কিন্তু নবাবি সৈন্যের যদি পরাজয় ঘটে ধূর্ত রহিম খাঁর কাছে ?

সুলেমান বললে, মিথ্যা ভয় শাহজাদা। খবর এসেছে, বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের সৈন্য মেদিনীপুর আক্রমণ করেছে। সম্ভবত আলমগীরের অনুরোধেই রঘুনাথ বিদ্রোহীদের পলায়নের পথ বন্ধ করে আছে, আমাদের পক্ষে এই সুযোগ।

বাধ্য হয়েই শত্রুশিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিল আজিমুশ্বান। অন্ধকার রাত্রিতে

দামোদরের শত শত রণতরী থেকে হঠাৎ তোপধ্বনি উঠল। গোলাবর্ষণ শুরু হল রহিম খাঁর শিবির লক্ষ করে।

রহিম খাঁর শিবির থেকেও কামানের ধ্বনি উঠল। কয়েকটি রণতরী জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। কিন্তু নবাবি সৈন্য তখন রণোন্মত্ত! উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা রহিম খাঁর সৈন্যশিবিরে।

জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটে চলল রিসালহা সৈন্যের দল। আগুন আর আর্তনাদ! প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে উভয়পক্ষই খুঁজছে প্রতিপক্ষের নেতাকে।

রহিম খাঁ তন্নতন্ন করে খুঁজছে আজিমুশ্বানকে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মশালের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে বাদশাহি তাজ দেখতে পেল রহিম খাঁ। আজিমুশ্বানের দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রহিম খাঁ, হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

একটি মুহূর্ত।

হঠাৎ কে চিৎকার করে উঠল, রহিম খাঁ। আমি আজিমুশ্বান, সাহস থাকে তো...

লাগাম টেনে ধরল রহিম খাঁ। ফিরে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে একটি বর্শা এসে তার বক্ষ ভেদ করল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রহিম খাঁ!

অশ্বারোহী নেমে দাঁড়াল রহিম খাঁর পাশে। বাদশাহি তাজ খুলে অট্টহাসে হেসে উঠল হামিদ খাঁ। হামিদ খাঁ নয়, হাবশি সুলেমান।

বললে, আমার ইনাম পেয়ে গেছি বাদশাহ। আর তোমার ইনামও তুমি পেয়েছ!

বলেই সশব্দে আবার হেসে উঠল কালো চেহারার দৈত্যটা।

বাইশ

শান্তি নামল রাঢ়ভূমিতে। জয় হল নবাব আজিমুশ্বানের।

বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ তখন চিতোয়া-বরদার দুর্গ অবরোধ করেছে।

চন্দ্রপ্রভার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করল দুর্গরক্ষীরা।

রাজসিক সম্মানে রঘুনাথকে আমন্ত্রণ জানাল চন্দ্রপ্রভা, দুর্গপ্রাসাদের অলিন্দে গবাক্ষে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল।

সঙ্গদাসীর দল নৃত্যগীতে আহ্বান করল রঘুনাথকে। চিতোয়া-বরদার প্রজারা জয়ধ্বনি তুলল বিষ্ণুপুররাজের। প্রাসাদ সুসজ্জিত হল পত্রে-পুষ্পে, লক্ষ লক্ষ প্রদীপের মালা জ্বলে উঠল প্রাসাদের অলিন্দে, শীর্ষে, দুর্গ-প্রাকারের চতুর্দিকে।

রাজনগরের বিদ্রোহী সৈন্যের আত্মসমর্পণ নয়, যেন এক অপেক্ষিতা অভিসারিণীর দয়িতবক্ষে আত্মসমর্পণ। যুদ্ধজয়ের নিনাদ নয়, মিলনের সুমধুর বংশীধ্বনি।

সানাইয়ের আনন্দ-করুণ সুরে ভরে উঠল রাজনগরের আকাশ বাতাস। রঘুনাথের মনের তারেও প্রেমের সুর কাঁপল। একটি লজ্জারুণ সুন্দর মুখের ছবি বারংবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, হৃদয়ের গভীরে দীর্ঘশ্বাসের মত থমকে থাকে দীর্ঘ অপেক্ষার কামনা।

পরাজিত রাজদুর্গ নয়, বিবাহের আনন্দ-বাসর। পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত হল দুর্গ, প্রাসাদ, রংমহল। রক্তপট্টে সুশোভন নহবতখানায় আগমনীর সুর ফুটল কেঁপে কেঁপে। প্রতিটি গবাক্ষে শঙ্খধ্বনি তুলল সদ্যস্নাতা নারীর দল। শিলাময় বুরুজ ও মুরুচাও যেন আহ্বান জানাল রঘুনাথকে, কামানের গর্জনে। রক্ষীশিবিরে বেজে উঠল কাড়া-নাকাড়ার দামামা,

শুভ শিঙার প্রমোদসঙ্কেত।

বিজিত রাজনগর দুর্গ রূপান্তরিত হল আনন্দ-উদ্যানে।

শুঁড় তুলে অভিবাদন জানাল হাতির সারি, গলার ঘুঙুর বাজল ঝুমঝুম ঝুমঝুম। খোজা-থানার থানাদার সেলাম জানাল, ঢালি আর রায়বেঁশের দল কসরত শুরু করল প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

স্বর্ণমোহর পুরস্কার দিতে দিতে এগিয়ে চলল রঘুনাথের অশ্বমুখ পল্যঙ্কিকা। জমাদার আর বক্‌শির দল ভিড় করল পেসকসের লোভে।

প্রাসাদের সামনে এসে পালকি থেকে নামল রঘুনাথ। উলুধ্বনি আর শঙ্খসুরে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। উলু আর শঙ্খধ্বনিতেও সাতটি সুরের মূর্ছনা শুনে বিস্মিত হল রঘুনাথ। গীতরসিক রঘুনাথের মনে মুহূর্তের জন্যে বিষাদ দেখা দিল।

বাংলার গ্রামীণাদের লোকসঙ্গীতের ধারাই লুপ্ত হবার পথে এগিয়ে চলেছে—ভেবেছিল রঘুনাথ। জানত না উলুধ্বনির মাধ্যমেও সাতটি সুরের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, জানত না ঐকতান শঙ্খধ্বনির মধ্যেও লুকিয়ে আছে দুরূহতম রাগরাগিণী!

লোভ জেগে উঠল রঘুনাথের মনে। বিষ্ণুপুরের দরবার-দাসীদের শঙ্খধ্বনিতে এমন সুরময় মাধুর্য শোনেনি সে কোনও দিন। এই নতুন সম্পদকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে, রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে। নিজেকে প্রবোধ দিলে, বিজয়ী রাজার মত ধন-ঐশ্বর্য নারীলুণ্ঠন নয়, প্রায়-অবলুপ্ত শিল্প আর সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যেই দুর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য আর নারীদের বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে।

পুনরায় শঙ্খধ্বনি হল। তন্ময়তা ভাঙল রঘুনাথের।

মৃদু হেসে অভিবাদন জানালে সুরঙ্গাক্ষী। চটুল চোখের ইশারায় আহ্বান জানালে।

চন্দ্রপ্রভার কক্ষে এসে উপস্থিত হল রঘুনাথ। শরমে নত দুটি অপরূপ চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হল।

এ-রূপ বুঝি কবির কল্পনাতেই চিত্রিত হয়, আর প্রেমিকের বাসনারঙিন মনের পটে।

রঘুনাথ দেখলে, সারা কক্ষ পুষ্পে পুষ্পে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুবাসিত কুসুমের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। অগুরু-চন্দনের রাজটিকা, সুগন্ধির ধারাবর্ষণ। সুন্দরী দাসীদের পুষ্পিত বেণীর কলাকৌশল, চিকন চূড়া, মৃদুমধুর হাসি, মুগ্ধমধুর বাঁশির সুর। ভুরুর ভঙ্গিমায়, নয়নের ইঙ্গিতে যেন এক কল্পরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর তার মাঝে ইন্দ্রাণীর রূপ-ঐশ্বর্যে ভূষিতা চন্দ্রপ্রভার লাজনম্র হাসি।

রাজসিক সম্ভ্রমে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভা পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠে মাল্যদান করল। কৌতুকের হাসি হেসে বিদায় নিল সঙ্গদাসীর দল।

রাত ঘন হল। থামল উৎসবের হট্টগোল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিশ্চুপ। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছে রঘুনাথের। বিষ্ণুপুরের সৈনিকরা তখন রাজনগরের যাবতীয় রত্ন-ঐশ্বর্য, শিল্পকলার ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি নিয়ে চলেছে বিষ্ণুপুরের বজরায়। বাংলার নবাব কিংবা রহিম শাহ—কোনও পক্ষের হাতেই যেন এ ঐশ্বর্য না পড়ে। উভয়েই বিধর্মী, তাই চন্দ্রপ্রভা নির্দেশ দিয়েছে সমস্ত সম্পদ বিষ্ণুপুরে নিয়ে যেতে হবে।

প্রত্যূষের প্রথম ক্ষণেই রাজনগর ছেড়ে যাবে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভা! নবাবি সৈন্য এসে পৌঁছনোর আগেই।

তাই চন্দ্রপ্রভার চোখে ঘুম নামেনি। এক নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে চন্দ্রপ্রভা। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার। পিতার দুঃসাহসিক বিদ্রোহের মধ্যে যে-আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে তা যেন শোভা সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই

শেষ হয়ে না যায়। ধর্মের মুক্তিকেই দেশের স্বাধীনতা মনে করে চন্দ্রপ্রভা, তাই পিতার আদর্শকে পতির জীবনে জ্বালিয়ে তুলতে চায়।

নিদ্রিতা চন্দ্রপ্রভার গাঢ় বাহুবন্ধনে ঘুম ভেঙে গেল রঘুনাথের।

একটি করুণ সুর ভেসে আসছে তখন অদূরের অট্টালিকা থেকে।

বেহাগ রাগিণীর একটি বিষাদম্লান নারীকণ্ঠ শুনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল রঘুনাথ।

পুষ্পিত শয্যার ওপর উঠে বসল, কান পেতে রইল বাতাসে ভেসে আসা গানের সুরে।

ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে বাইরের অলিন্দে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ—জলপূর্ণ গড়ের ওপারের অট্টালিকার দিকে উদাস চোখ মেলে।

এমন স্নিগ্ধবিশুদ্ধ রাগমূর্ছনা বুঝি কোনও নারীকণ্ঠে সম্ভব নয়। তন্ময় হয়ে একাগ্রচিত্তে সেদিকে কান পেতে রইল রঘুনাথ।

শান্ত স্তব্ধ নিশীথের বুকে একটি উদাস ব্যর্থ সুর যেন তার প্রেমিককে খুঁজে ফিরছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙল রঘুনাথের। দেখলে, স্রস্তকেশ চন্দ্রপ্রভা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

মৃদুস্বরে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, কে গায় চন্দ্রপ্রভা? কে ওই সুকণ্ঠী গায়িকা?

চন্দ্রপ্রভার নিদ্রাজড়িত সুন্দর দুটি চোখের তারায় চোখ রেখে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কে ওই গায়িকা চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিল রঘুনাথের মুখে। বললে, বিধর্মী।

—বিধর্মী? চমকে উঠল রঘুনাথ। বললে, সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীতই একমাত্র ধর্ম চন্দ্রপ্রভা, শিল্পের জগতে ধর্মের ভেদাভেদ নেই।

চন্দ্রপ্রভা বুঝতে পারল না রঘুনাথের কথা। বললে, রহিম খাঁর বেগম বিধর্মী নয়?

মনে মনে হাসল রঘুনাথ। কিন্তু ভুলতে পারল না মুসলমানীর কণ্ঠসুর।

সৈনিকদের আদেশ দিল, রাজনগর দুর্গের বালাখানায় আছে রহিম খাঁর বেগম, তাকেও বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে বিষ্ণুপুরে।

মনকে প্রবোধ দিল, এ তো নারীলুণ্ঠন নয়, সুগায়িকার যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যই রহিম খাঁর বেগমকে নিয়ে চলেছি।

কিন্তু সৈনিকেরা খুঁজে পেল না কে রহিম খাঁর বেগম।

বললে, বালাখানায় রহিম খাঁর পত্নীর পরিচয় কেউই দিতে চায় না মহারাজ। গায়িকার সংখ্যাও নগণ্য নয়।

রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, তা হলে বালাখানার সকলকেই বন্দী করে নিয়ে চলো।

ময়ূরপঙ্খী বজরায় বসে অপেক্ষা করল রঘুনাথ।

পালকির সারি এসে নামল ঘাটে।

বোরখায় সমস্ত শরীর আবৃত মুসলমানীর দল অন্য একটি বজরায় গিয়ে উঠল সৈনিকদের নির্দেশে।

রহিম খাঁর বেগম। সেই সুকণ্ঠী গায়িকার মুখশ্রী দেখবার লোভে উন্মুখ হয়ে উঠল রঘুনাথ।

কিন্তু উপায় নেই।

দেখলে, একে একে পালকির পর্দা সরিয়ে নামল সকলে। আপাদমস্তক বোরখায় আবৃত করে।

সব শেষে থামল আরেকটি পালকি। পালকিবাহীর দল যথারীতি দূরে সরে দাঁড়াল।

হঠাৎ লাল মখমলের পর্দার ফাঁক থেকে একটি সুন্দর সুশুভ্র পা বেরিয়ে এসে মাটি স্পর্শ করল।

চমকে উঠল রঘুনাথ। গজদন্তের নিখুঁত কারুকার্যের মত সুগঠিত সুশুভ্র পায়ের পাতায় একটি কালো বান্দাছাপ দেখে শিউরে উঠল। এমন রূপময় পদপল্লবে কেউ জ্বলন্ত লৌহশলাকা স্পর্শ করিয়ে বান্দাছাপ দিতে পারে?

পরক্ষণেই একটি প্রায়-বিস্মৃত দৃশ্য মনের পটে উঁকি দিল। মনে পড়ল সেই বিবিবাজারের কালো বোরখায় ঢাকা এক রূপময়ী রহস্যময়ী বাঁদীকে।

বিবিবাজারের লোকও হঠাৎ সেদিন এমনি চমকে উঠেছিল সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে দেখে। প্রথমবার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সাদা ঘোড়ার সুদর্শন আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

বিবিবাজার তখন জমজমাট।

সারা ভারতের চতুর্দিক থেকে লোক এসে জমেছে। কেউ এসেছে সওদা বেচতে, কেউ বা সওদা করতে। পশ্চিমের মতিঝিল অবধি সারি সারি তাঁবু, একদিকে দূর সিন্ধু উপত্যকার বালুচ সওদাগরের দল। উট আর হাতি, আরবি ঘোড়া, বার্তাবাহী পারাবত। গালিচা দুলিচা, মসলিন মসলন্দ, হীরে জহরত...বাঈজী আর বারাঙ্গনা।

জানোয়ারবাগের পাশ দিয়ে রঘুনাথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নেমেছিল জ্যোতিষাচার্যের চবুতরার সামনে।

সারি সারি মশালের আলো ক্রমে নিবে আসছে তখন। থেমে আসছে বিবিবাজারের অস্পষ্ট গুঞ্জরন।

জ্যোতিষাচার্যের সামনে আসন নিয়ে আলাপ শুরু করতে যাচ্ছিল রঘুনাথ।

নারীকণ্ঠ শুনে চমকে উঠল। দেখলে, কালো বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটি মুসলমানী। বোরখা নয়, যেন রহস্যের মায়াস্খাল!

এগিয়ে এল সেই রহস্যময়ী।—ফকিরসাহেব!

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন জ্যোতিষাচার্য। প্রশ্ন করলেন, কি চাও মা?

উত্তর এল, নসিব জানতে চাই ফকিরসাহেব।

তারপর বোরখার ভেতর থেকে একটি সুডৌল সুন্দর হাত বেরিয়ে এল, করকোষ্ঠী বিচার করতে শুরু করলেন জ্যোতিষাচার্য।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুললেন তিনি। বললেন, রঘুনাথ, এমন অদ্ভুত কররেখা আমি কখনও দেখিনি।

সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে রঘুনাথের। সেই কৃষ্ণাম্বরে আবৃত রোমাঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার সুশুভ্র ছন্দোময় দুটি পায়ের দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠেছিল রঘুনাথ। মনে পড়ে, দুটি ছন্দোময় সুন্দর হাত ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে কালো বোরখার আবরণ তুলে ধরেছিল জ্যোতিষাচার্যের অনুরোধে।

মুগ্ধ হয়েছিল রঘুনাথ। এও কি সম্ভব! বোরখার আড়ালে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লুকিয়ে ছিল, কল্পনা করতে পারেনি রঘুনাথ। এই নিখুঁত তিলোত্তমার রূপ—এ-ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

ভবিষ্যৎ জেনে বিদায় নিয়েছিল সেই বাঁদী। পুনরায় বোরখায় মুখ ঢেকে চলে গিয়েছিল বাঁদীতল্লাটের দিকে।

সুশুভ্র পদপল্লবে কালো বান্দাছাপের দিকে পুনরায় দৃষ্টি পড়তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল রঘুনাথ। এমন রূপময়ী কন্যার জন্ম কি শুধু আজীবন দাসীবৃত্তির জন্যে?

তীব্র এক কামনায় রঘুনাথ দগ্ধ হয়েছিল সেদিন।

আজ আবার সেই বিস্মৃত দিনটির কথা মনে পড়ল রঘুনাথের।

পর্দায় ঢাকা পালকি এসে নামল ঘাটের পাড়ে। পালকিবাহীর দল দূরে সরে গেল সসম্ভ্রমে। আর পালকির লাল মখমলের পর্দা কাঁপল! পর্দার আড়াল থেকে একটি সুন্দর সুগৌর নর্তকীচরণ বেরিয়ে এসে মাটি স্পর্শ করল।

রঘুনাথের চোখে পড়ল বান্দাছাপের কলঙ্করেখা।

ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে বেরিয়ে এল লালবাঈ। দ্রুতপায়ে নির্দিষ্ট বজরায় গিয়ে উঠল।

রহিম খাঁর পরাজয়ে এতটুকু দুঃখ নেই তার মনে। কামনার সিঁড়ি যেন ধাপে ধাপে অতিক্রম করে চলেছে সে। জ্যোতিষাচার্যের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই তার জীবনের প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেম নয়, একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় চায় লালী, রাজ্য পরিচালনা করতে চায়।

আপন কক্ষে বসেই লালী শুনতে পেয়েছিল বিষ্ণুপুরের এক হিন্দু রাজা দুর্গ অবরোধ করে চন্দ্রপ্রভাকে জয় করে নিয়ে যেতে চান। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত কামনার শিখা জ্বলে উঠেছিল। গানের সুর ছুঁড়ে দিয়েছিল সে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায়। গানের সুরে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল রঘুনাথকে।

কিন্তু লালবাঈয়ের পরিচয় জানতে পারল না রঘুনাথ। দেখতে পেল না বোরখার আড়ালে কোন অপরূপ মুখসুষমা লুকিয়ে আছে। জানল না, যৌবনের মোহমুগ্ধক্ষণে বিবিবাজারের মশালের আলোয় যে অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখে মন হারিয়েছিল, সেই যবনকন্যাই লালবাঈ, সেই রহস্যময়ী রূপবতীকেই সে বন্দী করে নিয়ে চলেছে বিষ্ণুপুরে।

রঘুনাথের বজরার শ্রেণী এসে থামল বিড়াই নদীর ঘাটে। ভারবাহী শ্রমিকের সারি চিতোয়া-বরদার লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে চলল রাজপ্রাসাদে।

উৎসবে উচ্ছল হয়ে উঠল বিষ্ণুপুর। মল্লবংশের গৌরব রঘুনাথকে আহ্বান জানাল সভাসদরা। মঙ্গলশঙ্খ বাজল, বাজল যুদ্ধজয়ের রণদামামা। আর সানাই সুর ধরল আনন্দলগ্নের।

হরিনামে অষ্টপ্রহর মুখরিত হল। কীর্তনের আসর বসল বৈষ্ণবদের আখড়ায়। বিষ্ণুপুররাজের যুদ্ধজয় যেন বৈষ্ণবধর্মের জয়। সারা বিষ্ণুপুরের জয়।

প্রজারা মেতে উঠল উৎসবে অবগাহন করার জন্যে। স্বর্গতা রাজমাতার অভাব বোধ করে কেউ বা বিষণ্ণ হল।

এদিকে প্রদীপের মালায় সাজল রাজপ্রাসাদ। সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী আর রাজহংসে গা ভাসাল কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, গন্টনবাঁধের বুকে। পত্রে-পুষ্পে শিহরিত হল প্রাসাদের প্রতিটি অলিন্দ, গবাক্ষ, প্রাঙ্গণ।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল বিষ্ণুপুরের প্রজারা। খুশি হয়ে উঠল তারা। এবার বুঝি রাজ্যের দুর্দিন ঘুচল, লুণ্ঠিত ধন-ঐশ্বর্যে প্রজাদের মনে ভবিষ্যতের শুভদিনের আশ্বাস দেখা দিল।

শত-সহস্র নারী-পুরুষ ভিড় করে দাঁড়াল পথের দুপাশে, রাজপত্নীর দর্শন পাবার আগ্রহে।

এদিকে রাজপ্রাসাদে তখন সভাপণ্ডিত আর জ্যোতিষাচার্য চিন্তান্বিত। সভাসদরা বিব্রত।

যুদ্ধজয় করে চিতোয়া-বরদার ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরকে

করেছে ঐশ্বর্যশালী। মুখ্য অমাত্য, সভাপণ্ডিত এবং সভাসদরা তাই খুশি হয়েছে। কিন্তু...

জ্যোতিষাচার্য শঙ্কিতস্বরে বললেন, এই উৎসবের মধ্যেও আমি খুশি হতে পারছি না ভট্টাচার্য।

সভাপণ্ডিত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন দৈবজ্ঞ?

চিন্তার রেখা ফুটল জ্যোতিষাচার্যের কপালে। বললেন, আমাদের সম্মতি গ্রহণ না করেই শোভা সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেছে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভাকে বিষ্ণুপুরের পাটরানীর সম্মান দিয়েছে।

সভাপণ্ডিতও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন সে-কারণে। তবু তা প্রকাশ করতে চাইলেন না। বললেন, রাজাকে শুভ উপদেশ দেওয়াই আমাদের কাজ জ্যোতিষাচার্য, আর সে উপদেশের অপেক্ষা না রেখেই যখন বিবাহ করেছে রঘুনাথ, তখন কোনও দায়িত্বও আমাদের নেই।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন। —দায়িত্ব কি শুধু রাজার প্রতি? দেশের প্রতি, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যেও কি দায়িত্ব নেই আমাদের? রঘুনাথ আমার পুত্রতুল্য, তার অপরাধ আমি ক্ষমা করতাম, ভাবতাম যৌবনের উচ্ছ্বাসবশত চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করেছে রঘুনাথ, মুগ্ধ হয়েছে তার রূপযৌবনে। কিন্তু...

—কিন্তু কি জ্যোতিষাচার্য? এতখানি বিচলিত হওয়ার কি কারণ ঘটল?

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন, বিষণ্ন হাসি। বললেন, সামান্য এক ভৌমিক-কন্যা হবে বিষ্ণুপুরের পাটরানী? এ আমার কাছে অসহ্য, অসহ্য। আর তার চেয়েও বড় দুশ্চিন্তা এনেছে ওই যবনী গায়িকা।

কিন্তু এ অসন্তোষের কোনও খবরই রাখল না রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভাই তখন তার সারা মনপ্রাণ ঘিরে রেখেছে এক মুগ্ধ আবেশে।

পরক্ষণেই অনুজ গোপালের কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত দায়িত্ব রঘুনাথের হাতে অর্পণ করে গেছেন রাজমাতা।

কিশোর গোপালকে এনে চন্দ্রপ্রভার আলিঙ্গন-ক্রোড়ে তুলে দিল রঘুনাথ। বললে, মাতৃ-আদেশ পালন করার সমস্ত দায়িত্ব আজ থেকে তোমার হাতে তুলে দিলাম চন্দ্রপ্রভা।

স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হল চন্দ্রপ্রভার মুখ। মুগ্ধ কটাক্ষে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে গোপালকে বুকের কাছে টেনে নিল চন্দ্রপ্রভা। ধীরস্থির কণ্ঠে উচ্চারিত হল, আজ থেকে আমার স্বার্থের চেয়েও বড় হবে গোপালের স্বার্থ, তার মঙ্গল, তার ভবিষ্যৎ।

তেইশ

বিদ্রোহীদের পরাজিত করে আজিমুশ্বান তখন সুবে বাংলার নবাবের পদে অধিষ্ঠিত। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান সুবেদার নিযুক্ত হল ইব্রাহিম খাঁর পরিবর্তে। দাক্ষিণাত্যে দরবার করতে গিয়ে ব্যর্থ হল ইব্রাহিম খাঁ।

এ-সংবাদে সবচেয়ে বেশি আনন্দ প্রকাশ করল ইংরেজ কোম্পানি। আতসবাজি পুড়ল, হাউই ছুটল কোম্পানির কুঠি থেকে। সারারাত গান আর বাজনা। আর এ-খবর নবাবের কাছে অতিরঞ্জিত করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেও ভুলল না কুঠিয়ালরা।

বিলাসী নবাব খুশি হয়ে উঠল, অনুমতি দিল কোম্পানির গভর্নরকে দরবারে উপস্থিত হবার।

টুপি খুলে কুর্নিশ করে দাঁড়াল ইংরেজ গভর্নর চার্লস আয়ার। রাজসম্মানীর স্বর্ণথালে ষোল হাজার রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিয়ে আবার কুর্নিশ করলে জব চার্নকের জামাতা।

আজিমুশ্বান বললে, বহুত খুশ। ইংরেজ আমার দোস্ত, তোমাদের কোনও আকাঙ্ক্ষা আমি অপূর্ণ রাখব না।

চার্লস আয়ার বললে, হুজুর শান্তি এনেছেন সুবে বাংলায়, এবার বাণিজ্যের প্রসার করতে দিলে ঐশ্বর্যও বাড়বে আপনার সুবেদারিতে। বাণিজ্যের জন্যে তিনটি গ্রাম কিনতে চাই আমরা, অনুমতি দিন নবাব বাহাদুর।

মাত্র তিনটি গ্রাম! কিনতে চায়, উপহার নয়!

আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে মহামান্য আজিমুশ্বান বললে, তথাস্তু।

সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর!

নবাবকে ষোল হাজার টাকা নজরানা দিয়ে জমিক্রয়ের অনুমতি লাভ করল দূরদর্শী ইংরেজ কোম্পানি, আর মাত্র তেরশো টাকার বিনিময়ে জমিদারের কাছ থেকে তিনটি গ্রামের স্বামিত্ব ক্রয় করল তারা।

ইতিহাসের গতি ভিন্ন পথ নিল ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে। স্থায়ী এবং সুদৃঢ় আসন গ্রহণ করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

অভ্যুদয় ঘটল একটি নূতন শক্তির। জন্ম নিল একটি নূতন নগর। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে যে কলিকাতা ছিল একটি তুচ্ছ জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম, সপ্তগ্রামের একটি অতি সাধারণ মহল—নবাবের অনুমতি আর ইংরেজদের রাজ্যলিপ্সা তাকেই করে তুলল পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের কেন্দ্রভূমি।

বার্ষিক তেরশো টাকার নজরানার বিনিময়ে সুজার কাছ থেকে বাণিজ্যের অনুমতি পেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানি। কিন্তু মোগলের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেনি জব চার্নক। ১৬৮৬ সালে হুগলী লুট করেছিল আক্রোশের বশে। সুতানুটিতে কুঠি গেড়েছিল সর্বপ্রথম, হোগলার ছাউনিতে জমায়েত হয়েছিল বিদেশী শক্তি।

তারপর ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সর্বজাতির অধিবাসীদের আহ্বান জানাল চার্নক, সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতায় বাস করবার জন্যে। স্বপ্ন দেখল ঐশ্বর্যময় একটি শহর গড়ে তোলার।

১৬৯২ সালে মৃত্যু হল জব চার্নকের। তারপর গভর্নর এলিস, গভর্নর গোল্ডস্‌বরো, চার্নক-জামাতা চার্লস আয়ার। চার্লস আয়ার সর্বপ্রথম ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করল বাংলার মাটিতে, শোভা সিংহের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে। ভারতবর্ষ থেকে যে-ইংরেজের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন আওরঙ্গজেব, সেই ইংরেজ শক্তিবৃদ্ধির, দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পেল শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার নামে। দুর্গের আশেপাশে গড়ে উঠল একটি নূতন নগর।

ডিহি কলিকাতা। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক জব চার্নক প্রথম সোপান প্রতিষ্ঠা করেছিল, ইমারত গড়ে তুলল চার্লস আয়ার—চার্নকের জামাতা।

শুধুই কি একটি শহর গড়ে তুলতে শুরু করল ইংরেজ কোম্পানি? একটি নতুন শক্তি?

না। হাজার বছরের পঙ্কিল সমাজের অঙ্গে আঘাত হানল ইংরেজ। অর্থহীন সামাজিক অনুশাসন আর ধর্মের হৃদয়হীন নীচতাকে যুগ যুগ ধরে পরম সত্য মনে করে

আঁকড়ে ধরে ছিল সারা বাংলা। সমাজসংস্কারের ব্যর্থতাকে ভেবেছে দৈবের বিধান। প্রতিবেশী মুসলমান সমাজেও নারীর স্বাতন্ত্র্য আর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে ভেবেছে—আজীবন কারাবাস, পতিসেবা, সতীদাহ নারীর প্রকৃতিদত্ত বিধিলিপি।

ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্নক সর্বপ্রথম নাড়া দিয়েছিল হিন্দুর সমাজদেহে। সমাজপতিরা দেখল কোনও অঘটন ঘটল না, কোনও অনুশোচনা দুঃখ শোক ভাগ্যবিপর্যয় মসীলিপ্ত করল না জব চার্নক আর লীলাবতীর জীবনকে !

এ-কাহিনী অবিদিত থাকেনি সুদূর বিষ্ণুপুর রাজ্যেও।

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি যুগ যুগ সঞ্চিত আস্থায় ভাঙন ধরতে শুরু করেছিল।

দৈবজ্ঞের দল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ব্রাহ্মণ-কন্যা লীলাবতী পুনরায় তার স্বামীকে হারাবে। বৈধব্যই নাকি তার অদৃষ্ট। ললাটলিপি খণ্ডন করার শক্তি নেই মানুষের।

লীলা চার্নক ! যৌবন পূর্ণতা পেল গ্রামবধূর দেহে মনে। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণময় সংসারের স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে বৈধব্য নেমে এল লীলাবতীর জীবনে।

ভাগীরথীর তীরে চিতা সজ্জিত হল। রাত্রির শ্মশানভূমিতে জ্বলে উঠল শত শত মশাল। শঙ্খধ্বনিকে চাপা দিয়ে বেজে উঠল উচ্চনিনাদ কাড়া-নাকাড়া, ঢাক আর ঢোল।

স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন। আর পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন। লীলাবতী। অনিমেষ নয়নে মৃত স্বামীর আচ্ছাদিত শবদেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

চতুষ্পার্শের গ্রাম থেকে ভিড় ভেঙে পড়েছে শ্মশানঘাটে। সতী হবে যুবতীবধূ লীলাবতী। সতীদাহ দর্শনেও সতী হওয়ার সমান পুণ্য। সপ্ত সতীদাহ দর্শনে মোক্ষলাভ অনিবার্য।

পাটনা থেকে সুতানুটির কুঠিতে ফিরছে জব চার্নক। ইংরেজ কোম্পানির পণ্যে বোঝাই বজরা ভেসে চলেছে ভাগীরথীর স্রোত বেয়ে।

বজরা থেকেই শ্মশানভূমির দিকে চোখ পড়ল জব চার্নকের। ঢাকের বাদ্য, মশালের আলো আর ভিড় দেখেই ইংরেজ যুবক বুঝতে পারল সতীদাহ হবে শ্মশানভূমিতে।

সতীদাহ তখন ইংরেজ সৈন্যদের কাছে একাধারে চরম বীভৎস এবং পরম উপাদেয়।

ঘাটে বজরা বাঁধল চার্নক।

কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক কোণে। মনে শুধুই ঔৎসুক্য, আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না চার্নকের।

হঠাৎ লীলাবতীর দিকে চোখ গেল। মুগ্ধ হল চার্নক, মোহিত হয়ে গেল লীলাবতীর রূপে ! এমন এক পরমাসুন্দরী যুবতী বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে চলেছে কেন ?

মোহগ্রস্তের মত এগিয়ে গেল চার্নক। বীরোচিত আবেগে হাঁটু গেড়ে বসল লীলাবতীর সামনে। কি যেন বলতে চায় চার্নক, কি যেন ভিক্ষা।

কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই লীলাবতীর। নেশাগ্রস্ত নির্নিমেষ স্থির অচঞ্চল দুটি চোখের তারা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শুধু। পাষাণের মূর্তি যেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হঠাৎ লীলাবতীর পাদস্পর্শ করল চার্নক।

মুহূর্তপূর্বে যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়েও যার মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেনি, চার্নকের স্পর্শে তারই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

নত দৃষ্টিতে চার্নকের মুখের দিকে তাকাল লীলাবতী। আর চার্নক আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বললে, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই বিদেশিনী।

আশ্চর্য মৃদু হাসি ফুটল লীলাবতীর মুখে, যেন কি এক অসম্ভব অবাস্তব অর্থহীন অনুরোধ জানিয়েছে চার্নক।

মৃতের আত্মীয়-স্বজন হট্টগোল তুলল। জনতা ক্রুদ্ধ হল। চিৎকার করে উঠল তারা। সতীদেহ স্পর্শ করেছে ফিরিঙ্গি বণিক, শুচিতা নষ্ট করেছে। আর সদ্য বিধবাকে বিবাহ কবতে চেয়ে হিন্দুধর্মকে অসম্মান করেছে।

লাঠি, বল্লম, সড়কি হাতে জনতা এগিয়ে এল চার্নককে লক্ষ করে। শিউরে উঠল লীলাবতী। ছুটে এল চার্নকের দিকে। বুক পেতে দিল নিরপরাধ বিদেশীকে বাঁচাবার জন্যে।

পরমুহূর্তেই চার্নক আর ইংরেজ রক্ষীর দল বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। ছত্রভঙ্গ হল জনতা, ভয়ে পালাল মৃতের আত্মীয়-স্বজন।

চার্নক আবার তাকাল লীলাবতীর মুখের দিকে।—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও লীলাবতী।

—চলো। রহস্যময় হাসি হেসে ভিক্ষা মঞ্জুর করল ব্রাহ্মণকন্যা।

লীলাবতী নয়, ইংরেজবধূ লীলা চার্নক। নবজন্ম লাভ করল লীলাবতী।

কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পণ্ডিতকুল, উষ্মা প্রকাশ করল সমাজপতির দল। বাংলার নবাবের কাছে আরজি পেশ করল তারা, দরবার করল আলমগীরের কাছে। যে আওরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই কাছে।

আওরঙ্গজেব হেসে বললেন, কাফেরের এ নৃশংস আচার যত শীঘ্র উচ্ছেদ হয় ততই মঙ্গল। আর চার্নক মনুষ্যত্ব প্রকাশ করেছে, অন্যায় করেনি।

সতীদাহ নিরোধের জন্যে পুনরায় পরোয়ানা জারি করলেন আওরঙ্গজেব।

কিন্তু লুপ্ত হল না সতীদাহ। গোপনে রাজকর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে বশীভূত করে হিন্দু সমাজে চলতে লাগল এই নৃশংস আচার। কারণ, বিধিলিপি নাকি খণ্ডন করা যায় না। যে কন্যার অদৃষ্টে বৈধব্য আছে, শতবার বিবাহ দিলেও বৈধব্যপাপ তার মুছে যাবে না।

দৈবজ্ঞ আর সমাজপতিরা ভবিষ্যদ্বাণী করল, লীলাবতী পুনরায় তার স্বামীকে হারাবে। মৃত্যু হবে চার্নকের।

সব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হল। সুখে সমৃদ্ধিতে জীবন অতিবাহিত হল জব চার্নক আর লীলা চার্নকের। কন্যার বিবাহ দিল চার্নক, কোম্পানির বিচক্ষণ এক কর্মচারী চার্লস আয়ারের সঙ্গে।

ডিহি কলিকাতার বুকে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের প্রথম মিলনের স্মৃতিচিহ্ন দেখা দিল চার্নক আর চার্নক-পত্নীর কবরস্থানে।

ধর্মে ধর্মে যে কোনও ভেদ নেই, প্রেম-ভালবাসাই যে সারবস্তু, প্রমাণ করে গেল একজন ইংরেজ যুবক আর এক ভারতীয় যুবতী। জীবনের শেষ পর্যন্ত হিন্দু নারীর মতই হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে গেছে লীলা, খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করেছে জব চার্নক। কিন্তু পরস্পরের ভালবাসার মধ্যে কোনও ছন্দপতন ঘটেনি ধর্মকে কেন্দ্র করে। কারণ ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ছিল না কারও মনে।

এই বিচিত্র মিলনকাহিনী চাঞ্চল্য এনেছিল গ্রামে গ্রামে। সুদূর বিষ্ণুপুরেও পৌঁছেছিল এ-খবর।

ইংরেজ বণিকের সঙ্গে হিন্দুকন্যার মিলন নয়, যেন জ্ঞানতরুণ পাশ্চাত্যের সঙ্গে হৃতসর্বস্ব প্রাচ্যের বৈধব্যের মিলন। একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, যেন এক মহাসন্ধিক্ষণের রূপক। কে জানত, এই বিচিত্র বিজাতীয় মহাসন্ধি ডিহি কলিকাতার বুকে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল, রূপকের মূল সত্যকে অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে সেই ডিহি কলিকাতা কত সহস্র নব ভাবধারার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলবে সমগ্র ভারতবর্ষে।

সমাজপতিরা সেদিন আশঙ্কায় শিউরে উঠেছিল শত শতাব্দীর আধিপত্যের আসন টলতে দেখে। বুদ্ধিজীবীরা দেখতে পেয়েছিল শুধু নতুন আলো, দেখতে পায়নি অমঙ্গলের ছায়া। নবাব আজিমুশ্বান অর্থের লোভে দৃষ্টি হারিয়েছিল, স্বপ্ন দেখেছিল বাণিজ্যশুল্কে রাজকোষ ভরে উঠছে। বুঝতে পারেনি, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বাণিজ্যের আড়ালে যে শক্তির স্রোত বইতে শুরু হয়েছে তা একদিন প্লাবনের রূপ নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধুয়ে-মুছে নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলবে !

সুদূর বিষ্ণুপুরে রাজা রঘুনাথের মনেও হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল এ ঘটনা। তাই যে-জ্যোতিষশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে জানত সমগ্র বিষ্ণুপুর, রঘুনাথ সেই শাস্ত্রকেও হেসে উড়িয়ে দিল। জ্যোতিষাচার্যের প্রতিবাদকে বললে হাস্যকর।

জ্যোতিষাচার্য সাবধান করলেন। —আমাদের পরামর্শের অপেক্ষা না করে চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করেছ রঘুনাথ, তবু সে অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি, কিন্তু হিন্দুরাজ্যে ওই বিধর্মী কাঞ্চনীকে আশ্রয় দিয়ে এ কি অনাচার করতে চলেছ ?

রঘুনাথ বললে, কাঞ্চনী হোক্, যবনী হোক্, সুরসাধিকা সে !

জ্যোতিষাচার্য বললেন, যৌবনের উত্তেজনায় সত্যকে মিথ্যা মনে হয় রঘুনাথ, মিথ্যাকেই মনে হয় সত্য। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অভ্রান্ত রঘুনাথ। তোমার মঙ্গলের জন্যে, বিষ্ণুপুরের মঙ্গলের জন্যে, লালবাঈকে ত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য।

রঘুনাথ হেসে বললে, অদৃষ্ট যদি সত্য হয় তা হলে মানুষ কি চেষ্টা করে তাকে খণ্ডন করতে পারে ? সত্যাশ্রয়ী আমি, সত্য পালন করাই আমার ধর্ম। সত্যের চেয়ে স্বার্থ বড় নয় গুরুদেব !

প্রমাদ গণলেন জ্যোতিষাচার্য ও সভাপণ্ডিত, এবং তাঁদের অনুগত শাসকশ্রেণী। ধর্ম এবং জ্যোতিষশাস্ত্র সর্বকালেই শাসকশ্রেণীর হাতের অস্ত্র। তাকে উপেক্ষা করছে রঘুনাথ। এই উপেক্ষা ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও উপেক্ষা করতে শেখাবে।

সভাপণ্ডিত আর জ্যোতিষাচার্য বুঝলেন অন্য পথ গ্রহণ করতে হবে। তাই চন্দ্রপ্রভা মদনমোহন মন্দিরে আসতেই তাঁর কাছে তাঁর আশঙ্কার কথা নিবেদন করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, গণনা করে দেখেছি মা, কাঞ্চনী বিষ্ণুপুরের অলক্ষ্মী। কাঞ্চনীকে ত্যাগ না করলে বিষ্ণুপুরের মহা অমঙ্গল হবে।

শুনে শিউরে উঠল চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপালকে সন্তানস্নেহে জড়িয়ে ধরল বুকে।

তবু স্বামীর প্রতি অবিচল আস্থায় বললে, অদৃষ্টের ওপর হাত নেই গুরুদেব, কিন্তু আমার দেহমনের চালক আমি নিজেই। মিথ্যা আশঙ্কা আপনার, কাঞ্চনীকে আশ্রয় দেবার জন্যে কোনও দিন যদি অমঙ্গলের ছায়া নামে এ রাজ্যে, তা হলে পতিঘাতিনী হয়েও রাজ্যকে রক্ষা করব।

বলেই চমকে উঠল চন্দ্রপ্রভা। উচ্চারিত শব্দগুলি যেন বিভীষিকার মত ভেসে উঠল চোখের সামনে। এ কি সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হল সে ?

দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। মদনমোহনের মন্দিরের দিকে ছুটে গেল চন্দ্রপ্রভা। মন্দির প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে কাঁদল আর কাঁদল।

চব্বিশ

লালবাঈয়ের মনে তখন দুর্জয় বাসনা জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে বাঁদীজীবনের ক্ষণিক রোমাঞ্চের অতৃপ্ত কামনা।

রহিম খাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হয়েছিল লালবাঈয়ের। চিতোয়া-বরদার দুর্গে শোভা সিংহের রক্ষীদের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রপ্রভার আশ্রয়ে তাকে রেখে গিয়েছিল রহিম খাঁ। তাই রহিম খাঁর মৃত্যুতে সে নিরাশ্রয় মনে করেছিল নিজেকে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখল রঘুনাথ দুর্গ অবরোধ করেছে। যুদ্ধ আর হানাহানির ভয়ে শিউরে উঠেছিল লালবাঈ। বিধর্মী রাজার আক্রমণের খবর শুনে আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। ভেবেছিল প্রবল সংঘর্ষ হবে দুপক্ষের সৈনিকদের মধ্যে।

কিন্তু, না, কোনও হানাহানি হল না। শুনল, চন্দ্রপ্রভার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্গরক্ষীরা। আর আত্মসমর্পণ করেছে চন্দ্রপ্রভা। তবু আশা ছিল, বালাখানার মুসলমানীরা মুক্তি পাবে। কোনও অত্যাচার হবে না তাদের ওপর। নারীর প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা আর সম্মানের কথা অবিদিত ছিল না তার। কিন্তু মুক্তি চায় না লালী, সে চায় হাতের মুঠোয় একটি রাজ্যকে নিয়ে আসতে। আর সে-কামনা সার্থক করতে হলে আকর্ষণ করতে হবে রাজা রঘুনাথকে! তাই মধ্যরাতে সুরের শৃঙ্খল ছুঁড়ে দিয়েছিল লালী।

কিন্তু রঘুনাথ ছুটে এল না সে আকর্ষণে। সে শৃঙ্খল তার নিজেরই পায়ে জড়িয়ে গেল।

বালাখানার মুসলমানীদের বন্দী করার আদেশ এসেছে শুনেই বিস্মিত হয়েছিল লালবাঈ। সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকিয়েছিল হীরাবাঈয়ের দিকে। আর হীরাবাঈ মৃদু হেসে বলেছিল, রাজা আর নবাবে তফাত নেই লালী। হীরে-জহরত আসবাবের মতই জেনানাও তাদের চোখে লুটের সওদা। কিন্তু নবাবরা যার ইজ্জত নষ্ট করে তাকেই আবার বেগমের ইজ্জতও দিতে চায় লালী, আর হিন্দু রাজারা...

ঘৃণায় নাক বেঁকিয়েছিল হীরাবাঈ, ঝলমল করে উঠেছিল তার নাকছাবির বড় হীরেটা।

হীরাবাঈয়ের হিন্দুবিদ্বেষ দেখে কৌতুকে হেসেছিল লালী, লালবাঈ। তারপর হঠাৎ একসময়ে মনে পড়েছিল, প্রথম যৌবনের একটি রোমাঞ্চমধুর দৃশ্য।

নিজের ভবিষ্যৎ জানবার আকাঙ্ক্ষায় বাঁদীবাজার থেকে সেদিন লুকিয়ে এসেছিল লালী, এসে দাঁড়িয়েছিল ফকিরসাহেবের চবুতরার সামনে। আর চমকে উঠেছিল হঠাৎ একসময়।

ফকিরসাহেবের অনুরোধে ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে তুলে ধরেছিল কালো বোরখার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের জলুসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠেছিল সেই সুপুরুষ রাজকুমার।

কত দীর্ঘদিন সেই স্মৃতি মনের কোণে পুষে রেখেছিল লালী। ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। কিন্তু জানত না, বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথই তার জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ। জানত না, চিতোয়া-বরদা আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে এনেছে সেই সুদর্শন অশ্বারোহী।

বিড়াই নদীর ঘাটে বজরা ভিড়ল। ধনসম্পদ বয়ে নিয়ে গেল ভারবাহীর দল, রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভার সুসজ্জিত পালকি ঘুঙুরের ধ্বনি তুলে অদৃশ্য হল প্রাসাদের অভ্যন্তরে। আর লালী হীরাবাঈ অযোধ্যাপ্রসাদের তাঞ্জাম প্রবেশ করল সঙ্গীতভবনে।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স বিস্মিত হল হীরাবাঈকে দেখে, লালীর পরিচয় পেয়ে। বললে, রাজাবাহাদুর যুদ্ধে গিয়েও গান ভুলতে পারেননি বাঈসাহেবা। লুট করে এনেছেন সবচেয়ে সেরা জহরত, নয়া বুলবুল।

হীরাবাঈ হেসে বললে, বেশক বুলবুল। নাচে তাউসের পেখম ওড়ায় লালবাঈ, গানে বুলবুলকেও হার মানায়।

সত্যিই সে বুলবুলকে হার মানাবে, ভেবেছিল লালী।

ভেবেছিল আসরে বিষ্ণুপুরের রাজাবাহাদুরকে দেখতে পাবে, মন ভোলাতে পারবে তার গানে। রহিম খাঁর মৃত্যু হয়েছে, রঘুনাথকে জয় করবে লালী। জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে রহিম খাঁর বেগম হতে চেয়েছিল লালী, ভেবেছিল সারা হিন্দুস্থান জয় করে বাদশাহ্ হবে রহিম খাঁ। সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে তার, কিন্তু মনের গোপনে তার বেগম হবার দুরাশা লুকিয়ে আছে। রূপ আর গানের মোহে বন্দী করবে সে রঘুনাথকে।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার মোহেই বুঝি গানের আসরকেও ভুলে গেল রঘুনাথ।

প্রতিদিনের মতই সঙ্গীতভবনে জলসার আসর বসে। গোলাপি পেঁচদার পাগড়িটা মাথায় ভাল করে বসিয়ে নিয়ে তানপুরা টেনে নেয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। দু-এক কলি তানের ঝলক ছেড়ে কৃষ্ণমোহনকে বলে, আমি তো এক পা কবরে রেখেছি, তোমার গলার কাজ দেখাও বেটা।

প্রবীণ গদাধরের দিকে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে তাকায় কৃষ্ণমোহন। অনুমতি প্রার্থনা করে।

হাসে গদাধর। বলে, আমার অনুমতি চেয়ে আমাকে লজ্জা দিয়ো না কৃষ্ণমোহন। আমি তোমার গুরু নই, তুমিই আমার গুরু, সঙ্গীতগুরু তুমি।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৃদু স্বরে গান শুরু করে কৃষ্ণমোহন। —আওঅন কহ্গয়ে অজ হুঁ নহী আয়ে...

মৌজের আনন্দে হঠাৎ দ্রুতলয়ে মৃদঙ্গের ধ্বনি তুলে হেসে ওঠে পীর বক্স। হীরাবাঈ তার রক্তিম গালে সুললিত মুদ্রাভঙ্গিমায় অনামিকা স্পর্শ করে তন্ময় হয়ে শোনে।

ভাবে বিভোর হয়ে যায় অযোধ্যাপ্রসাদ, তবলার তালে তালে নেচে ওঠে তার শরীরের ছন্দ।

কিন্তু লালবাঈয়ের যেন ভাল লাগে না সে-গান। মনের গোপনে তার অসহ্য এক প্রতীক্ষার জ্বালা। রঘুনাথের অপেক্ষায় যেন দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকে সে।

রঘুনাথ, রঘুনাথ! মনের মধ্যে গুনগুন করে একটি নাম।

কৃষ্ণমোহনের গান শেষ হতেই বাহবা দিয়ে ওঠে সকলে। মাথা নেড়ে সাবাস দেয় বাহাদুর খাঁ।

আর লালবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এমন গান, তবু মেজাজ নেই মাইফেলের। রাজাবাহাদুর না থাকলে কি...

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সকলে। বলে, সত্যি, রাজাবাহাদুর না থাকলে জলসার মেজাজ আসে না। মনে হয় আসল সমঝদারই নেই।

সকলের মনই উড়ুউড়ু করে রঘুনাথের অভাবে।

বাহাদুর খাঁ হেসে বলে, ঠিক কথা। রানীজির সুরত দেখে ভুলে গেছেন রাজাবাহাদুর, গানকে বোধহয় তালাক দিয়ে দেবেন।

অন্দর-মহলের খবর অজানা নয় কারও। দাসীদের কাছে, জরিয়াদের কৌতুকে সকলেই জানতে পেরেছে রঘুনাথের কথা। একদিন যেমন গানের নেশায় সব ভুলে থাকত রঘুনাথ, বধূর রূপময় মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি সব ভুলে আছে বিষ্ণুপুররাজ।

রঘুনাথের আনন্দ কেড়ে নিতে চায় না কেউ। কিন্তু রাজাবাহাদুরের অনুপস্থিতিতে কেমন যেন জলসা জমে না, মৌজ আসে না মুজরার।

কৃষ্ণমোহন বলে, চলুন গুরুজি, প্রাসাদে গিয়ে তাঁর স্বপ্ন ভাঙিয়ে নিয়ে আসি আসরে।

গদাধর মৃদু হেসে নিষেধ করে। বলে, না না, জীবনের যৌবনের গানে মেতে আছেন তিনি, সে মেজাজ নষ্ট করে তাঁকে গলার গান শোনাতে আনবে ?

বাহাদুর খাঁ মাথা নেড়ে পাগড়ি ঠিক করতে করতে সায় দেয়। বলে, ঠিক বলেছ বেটা, জিন্দিগির গীত গলার গানের চেয়ে বড়।

রাজপ্রাসাদের অন্দর-মহলেই এদিকে দিনের পর দিন কেটে যায় রঘুনাথের। জীবনের গানেই মেতে থাকে বিষ্ণুপুররাজ।

সেদিনও এমনি প্রমোদরঙ্গে মেতে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে প্রমারা খেলছিল রঘুনাথ। সুরঞ্জাক্ষী এবং অন্যান্য সখিবৃন্দ রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার চারপাশে ঘন হয়ে বসে দেখছিল রাজা ও রাজপত্নীর খেলা। কৌতুক-রসিকতায় কখনও বা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

প্রমারার তাস বিলি করে চন্দ্রপ্রভা বললে, এবার আমার জিত হবে সুরঞ্জাক্ষী।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, তোমাকেই যিনি জয় করে এনেছেন তাঁর কাছে তোমার জিত হলেও তা হার।

চন্দ্রপ্রভা সলজ্জ হাসি হেসে তাস টিপে রাখল, উলটে দেখতে সাহস হল না। পাছে 'ফিগরু' সরে থাকে। বার বার রঘুনাথের কাছে হার হয়েছে তার, এবার জিততে না পারলে লজ্জা লুকোবার ঠাঁই হবে না। মনে মনে প্রার্থনা করলে, যেন তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরে থাকে।

চন্দ্রপ্রভা তাস তুললে। রঘুনাথও তাস তুলে দেখল। রঘুনাথের হাতে কাতুর, চন্দ্রপ্রভার হাতে মাছ।

হাসতে হাসতে লক্ষ টাকার মোহর তুলে নিয়ে ঋণ শোধ করে দিল চন্দ্রপ্রভা।

সুরঞ্জাক্ষী সহাস্যে বললে, চন্দ্রপ্রভা বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মী মহারাজ, ফিগরু ধরলে ফুরুস হয় ওর হাতে, ফুরুস পাচার করলে কোরেস্তা।

রঘুনাথ হেসে আবার তাস বিলি করতে যাচ্ছিল, চন্দ্রপ্রভা বললে, না, আর নয়।

—কেন ? মৃদু হেসে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে।

চন্দ্রপ্রভা সলজ্জ উত্তর দিলে, বহু কষ্টে ঋণ শোধ করেছি, আর ঋণ করতে চাই না !

রঘুনাথ কৌতুকে হেসে উঠল। তারপর আবার অনুরোধ করলে। চন্দ্রপ্রভা তবু রাজি হল না। দুশ্চিন্তায় সারা মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ মনে পড়ল সুরঞ্জাক্ষীর গোপন সাবধানবাণী। রূপের আকর্ষণকে ভুলতে পারেন রঘুনাথ, কিন্তু সুরের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সঙ্গীতভবনের রূপসী যে গায়িকাকে বন্দী করে এনেছে রঘুনাথ, তাকে ভয় পায় চন্দ্রপ্রভা। জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, সারা বিষ্ণুপুর সেই রূপসী কাঞ্চনীকে ভয় পায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা। কথা থমকে রইল তার চোখের আড়ালে। ধীরে ধীরে প্রাসাদের অলিন্দে এসে তাকাল সে যমুনাবাঁধের দিকে। মৃদু হেসে চন্দ্রপ্রভার পাশে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ।

সঙ্গীতভবনের গবাক্ষের দিকে চোখ গেল রঘুনাথের। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী।

এই অতুলনীয়া রূপসীকেই কি বন্দী করে এনেছে সে ?

কাছে যাবার আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে উঠল রঘুনাথ। গোপনে দ্বারীকে বললে, সঙ্গীতভবনে খবর পাঠাও, গানের আসর বসবে আজ।

বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ আসবেন ! খবর শুনেই উল্লসিত হয়ে উঠল বাহাদুর খাঁ আর পীর

বক্স। হীরাবাঈকে বললে, গান শুরু করো হীরা, এমন গান—যা শুনে মহলে ফিরতে চাইবে না রাজাবাহাদুর।

হীরাবাঈ হেসে বললে, আমি নই ওস্তাদজি, লালাবাঈ শোনাবে সে গান।

পীর বক্স বললে, হ্যাঁ, বুলবুলের গান হবে আজ।

খুশিতে উচ্ছ্বল হয়ে উঠল লালী। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও বিষ্ণুপুররাজের দর্শন পায়নি সে, জানতে পারেনি কে সেই বীরশ্রেষ্ঠ যিনি বন্দী করে এনেছেন তাকে।

গানের সুরে যেন প্রাণ ঢেলে দিল লালী। তন্ময় হয়ে গেল কৌশিকীর মূর্ছনায়। —সগুন শোহাওঅন আজু লায়ে সুখ ; নয়নন চয়নন সো ভাওএ। পিয়া অবহীঁ আওএজে বহোত চিহ্ন, প্রগট ভয় নিতহ উনকী...

হঠাৎ একসময় গান থেমে গেল লালীর।

রঘুনাথ প্রবেশ করল আসরে। না, কোনও রাজসিক বেশ নয়। গায়ে গরদের উড়নি, পরিধানে গরদের ধুতি। সৌম্য শান্ত সাধকের চেহারা।

তন্ময় হয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ রঘুনাথের দিকে চোখ গেল লালীর, আর সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল তার।

বিস্ময়ে আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেল লালবাঈ।

ইনিই বিষ্ণুপুররাজ ? এ যে বিবিবাজারের সেই সুপুরুষ অশ্বারোহী। যৌবনের সন্ধিক্ষণে লালী যে এরই পায়ে সমস্ত দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে !

কেউ বুঝল না কেন হঠাৎ গান থেমে গেল লালীর, কেনই বা এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রঘুনাথ।

হীরাবাঈ শুধু বললে, রাজাবাহাদুরকে তস্‌লিম দাও লালী।

লালীর কানে গেল না সে-কথা। অকস্মাৎ যেন একরাশ লজ্জা এসে জমা হল তার সুন্দর মুখে। শরমে রক্তিম হয়ে উঠল তার সারা মুখ।

তস্‌লিম দিতে পারল না লালী। লজ্জায় শুধু মাথা নুয়ে পড়ল তার।

প্রমারার নেশা নয়। নববধূর স্বপ্নরঙিন চোখের উদ্দামতায় সব ভুলে গিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে উচ্ছ্বল আনন্দে ডুবে গিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা। হাসি আর কৌতুকে, সঙ্গসুখের মুগ্ধপ্রেমে যেন অবগাহন করছিল। ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিল রঘুনাথের বলিষ্ঠ মুখকান্তি।

একসময় অকারণেই মনের পটে চকিতে খেলে গেল জ্যোতিষাচার্যের সাবধানবাণী। —বড় ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট মা তোমার ললাটে। রাজরানী হয়ে এসেছ তুমি সঙ্গে এক বিষধর নাগিনীকে নিয়ে। এক বিধর্মী পাপিষ্ঠা সুরের জাল ফেলে বসে আছে সঙ্গীত-উন্মাদ রঘুনাথের জন্যে।

কথাটা মনে পড়তেই সারা শরীর যেন কেঁপে উঠল চন্দ্রপ্রভার, শিউরে উঠল তার অসহায় বুক, মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

সব কৌতুক আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে নিবে গেল, শঙ্কিত আর্তনাদ গুমরে মরল তার মনের গোপনে। প্রমারার উচ্ছলতায় আর কোনও আনন্দ খুঁজে পেল না চন্দ্রপ্রভা, বিচলিত মনের একাগ্রতা ফিরিয়ে আনতে পারল না প্রমারার তাসে।

রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাতেও যেন ভয় পেল চন্দ্রপ্রভা, দুচোখের আড়ালে থমকে রইল অসহায় কান্না, বিমূঢ় ব্যথা।

বার বার অনুরোধ জানাল রঘুনাথ। চোখের কোণে কপট হাসি টেনে বার বার

অসম্মতি জানাল চন্দ্রপ্রভা।

তারপর রাজকার্যের অজুহাতে রঘুনাথ বিদায় নিয়ে গেল। অলিন্দে অপেক্ষা করে ছিল চন্দ্রপ্রভা। হঠাৎ দেখলে রাজপ্রতীক চিহ্নিত পতাকা তুলে প্রাসাদের পালকি গিয়ে থামল সঙ্গীতভবনের সামনে। বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রপ্রভা। গুমরে গুমরে কাঁদল ক্ষোভে আর দুঃখে।

আর কিশোর গোপাল কখন অলক্ষ্যে এসে ধীরে ধীরে একটি হাত রাখল চন্দ্রপ্রভার পিঠে। ফিরে তাকাল চন্দ্রপ্রভা। আর তার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুরঞ্জাক্ষী। বললে, কি হল চন্দ্রপ্রভা? বিষ্ণুপুরের বউরানীর চোখে জল শোভা পায় না সই, ওঠো।

সজল চোখ মেলে তাকাল চন্দ্রপ্রভা। গোপালকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অশ্রুসিক্ত মুখে হাসির প্রলেপ দেবার চেষ্টা করে চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিল, বড় দুঃখময় অদৃষ্ট আমার সুরঞ্জাক্ষী, বউরানী নই আমি, আমি...

সপ্রশ্ন চোখে তাকাল সুরঞ্জাক্ষী।

ধীরে ধীরে মাথা নুয়ে পড়ল চন্দ্রপ্রভার।

বললে, আমার জীবনের চেয়েও প্রিয় আমার স্বামী, তাকেই গ্রাস করবার জন্যে উন্মত্তা হয়েছে কাঞ্চনী গায়িকা।

শুনল সুরঞ্জাক্ষী। চুপ করে রইল। কথা খুঁজে পেল না, সান্ত্বনা খুঁজে পেল না। কি সান্ত্বনা দেবে সে নবপরিণীতা রাজপত্নীকে!

সজল চোখে সুরঞ্জাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা, উত্তরের অপেক্ষায়, সান্ত্বনা পাবার আকাঙ্ক্ষায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। নববধূর বেশ, বধূরানীর ঐশ্বর্য-উজ্জ্বল সাজপোশাক ফেলে দিয়ে চন্দ্রপ্রভা শরীরে জড়াল বৃন্দাবনী শাড়ি। মণিমুক্তার স্বর্ণালঙ্কার খুলে ফেলল। চন্দনের তিলক আঁকলে কপালে।

বৈষ্ণবীর বেশে সাজিয়ে দিল সুরঞ্জাক্ষী। ফুলমালায় জড়িয়ে দিল কালো কেশের বামঠাম কবরীর চূড়া। আঁকলে রসকলির রূপময় রেখা। আর গোপালকে সাজিয়ে দিল কিশোর গোপালের বেশে।

যৌবনদেহে নূপুরের ছন্দ বাজিয়ে শান্ত পায়ে মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা। সঙ্গে গোপাল।

সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শান্তি বাসনা করলে, জ্বালা জুড়োতে চাইলে বুকের।

তারপর ধীরে ধীরে গুনগুন করল স্নিগ্ধমধুর পদলহরী।

গান থামল। গানের রেশ মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুরঞ্জাক্ষী দেখলে চন্দ্রপ্রভার দুটি কপোল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে, চোখে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সুরঞ্জাক্ষী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। চোখ ভিজে এল সুরঞ্জাক্ষীর।

সূর্য নিবে গেল, সন্ধ্যা নেমে এল ক্রমশ।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, চলো চন্দ্রপ্রভা, বিষ্ণুপুররাজ হয়তো প্রাসাদে ফিরে এসেছেন।

উঠে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা। তারপর হঠাৎ সুরঞ্জাক্ষীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।—না, না সুরঞ্জাক্ষী, আমি পারব না, আমার প্রিয়কে এভাবে হারাতে আমি পারব না।

সুরঞ্জাক্ষী কোনও উত্তর দিল না, সান্ত্বনার দৃঢ় আলিঙ্গনে আরও কাছে জড়িয়ে ধরল চন্দ্রপ্রভাকে। বললে, মিথ্যা আশঙ্কা তোমার, বিষ্ণুপুররাজ সঙ্গীতের পূজারী, যবনীর রূপের পূজারী নন তিনি।

চন্দ্রপ্রভা প্রাসাদে ফিরে এল ধীর পায়ে। শয্যাকক্ষে।
সুরঞ্জাক্ষীর কথায় বুঝি সান্ত্বনা পেল চন্দ্রপ্রভা।
কিন্তু কই, রঘুনাথ তো ফিরে আসেননি এখনও।
ঝরোকায় দাঁড়িয়ে শ্যামবাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা, উদাস দৃষ্টি মেলে।
রাত ঘন হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। দীপমালা ফুটে উঠেছে প্রাসাদ ঘিরে, নগরের প্রতিটি সৌধে। আলোয় আলোকিত সারা নগরী। নিদ্রাচ্ছন্ন গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে যায়।
তবু দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে অপেক্ষা করে চন্দ্রপ্রভা। অভিসারিণীর ভীত বিস্মিত প্রতীক্ষায়।
দূর থেকে ধীরে ধীরে গানের সুর ভেসে আসে।
চকিত চোখে সঙ্গীতভবনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় চন্দ্রপ্রভা। ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় সঙ্গীতভবনের রহস্যে ঘেরা পৃথিবীটাকে স্বচক্ষে দেখে আসতে।
কি আছে ওই সঙ্গীতের সুরে, কি আছে সঙ্গীতভবনের স্বপ্নময় বাতাসে? কিসের নেশায় ছুটে গেছেন রঘুনাথ?
অপেক্ষা, অপেক্ষা।
পতিপ্রতীক্ষিতা এক যৌবনবতী নারীর অধীর বক্ষস্পন্দন যেন নিজেই শুনতে পায় চন্দ্রপ্রভা। অনিমেষ চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
তারপর এক সময় সঙ্গীতভবনের আলো নিবে যায় একটির পর একটি। আঠারো দাঁড়ের জলধ্বনি কানে আসে। চন্দ্রপ্রভা দেখতে পায়, রঘুনাথের ফেনশুভ্র বজরা এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভার মুখ।
গবাক্ষ থেকে সরে এসে শয্যার ওপর বসে চন্দ্রপ্রভা, আবার ছুটে যায় গবাক্ষে। সময়কে মনে হয় দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ। অধৈর্য হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভা।
বজরা এসে থামে প্রাসাদলগ্ন শ্বেতমর্মরের ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হয় চন্দ্রপ্রভার মুখে, রক্তিম হয়ে ওঠে তার কর্ণমূল।
ছুটে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কপট নিদ্রায় অভিভূত হয়ে যায়।
দুটি চোখ বুজে শুয়ে থাকে চন্দ্রপ্রভা, কানে আসে রঘুনাথের পদধ্বনি। সজাগ কান পেতে সে শব্দ শোনে চন্দ্রপ্রভা।
কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসে পরিচিত পায়ের শব্দ।
নিঃশ্বাস রোধ করে যেন নির্জীব পড়ে থাকে চন্দ্রপ্রভা। অগুরু কস্তুরির স্নিগ্ধ সুবাস ভেসে আসে। কল্পনার চোখে অনুভব করে চন্দ্রপ্রভা, রঘুনাথ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। হয়তো...
হ্যাঁ, একদৃষ্টে মোহময় চোখে চন্দ্রপ্রভার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথ। অনুসন্ধিৎসুর মতো চন্দ্রপ্রভার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে কি যেন খোঁজে রঘুনাথ, কি যেন দেখতে চায়। আপন গলার ফুলমালা খুলে কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠে পরিয়ে দেয় রঘুনাথ। নিজের মনেই হাসে।
তারপর দ্বারপ্রান্তের দীপ নিবিয়ে দেয়।
একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ে শয্যার ওপর।
নিঃশব্দে চন্দ্রপ্রভার পাশে শুয়ে পড়ে রঘুনাথ। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসে তার। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়ে।
চন্দ্রপ্রভা চোখ খোলে। লজ্জিত, উৎকণ্ঠিত চোখে ফিরে তাকায় রঘুনাথের মুখের দিকে। দেখে, জ্যোৎস্নার রুপালি আলো এসে পড়েছে রঘুনাথের মুখে। একদৃষ্টে

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের কণ্ঠে ফুলমালা দেখতে পায়।

আনন্দের, কৌতুকের মৃদু হাসি খেলে যায় তার অধরে ওষ্ঠে। সোহাগভরে ফুলের মালাটি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রপ্রভা, আঘ্রাণ নেয়, মুখের ওপর তার স্পর্শ নিয়ে যেন বিচিত্র এক পুলক অনুভব করে।

অকস্মাৎ নিজের কণ্ঠ থেকে ফুলমালা খুলে নিয়ে নিদ্রিত রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দেয়।

কিন্তু সঙ্গীতভবনের আকর্ষণকে তুচ্ছ করতে পারে না রঘুনাথ। সন্ধ্যার বাতাস যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। অন্ধকার নিশীথের নিঃশব্দতায় কি যেন এক নেশা।

ছুটে যাবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার শান্ত প্রেমের ধূপ-সুগন্ধে আনন্দ আছে, উদ্দামতা নেই। ফুর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দিতে চায় রঘুনাথ, ক্লান্ত বোধ করে চন্দ্রপ্রভার সংযত প্রেমালাপে।

ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতভবনই তার মনেকে অধিকার করে বসে।

গানের পর গান গেয়ে চলে লালবাঈ। দিনের পর দিন ভেসে চলে নাচের তরঙ্গে। রাজকার্য ভুলে যায় রঘুনাথ। প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়।

শয্যাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হঠাৎ তাই পথরোধ করে দাঁড়ায় চন্দ্রপ্রভা। বলে, কিসের নেশায় এভাবে প্রতিদিন তুমি ছুটে যাও ?

মৃদু হাসে রঘুনাথ।—ভয় নেই চন্দ্রপ্রভা, এ শুধুই গানের নেশা। ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি। সব সুখদুঃখ স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলিয়ে মানুষকে মহৎ করে তোলে এই গান, মর্ত্যের মানুষকে স্বর্গের স্বাদ এনে দেয়।

চন্দ্রপ্রভা বলে, স্বর্গের স্বাদ কি নারীর কাছে নিষিদ্ধ, প্রিয় ? কি এমন দুঃখ তোমার মনে লুকিয়ে আছে যে গানের নেশায় তাকে ভুলতে হয় ? সে-দুঃখ কি আমি দূর করতে পারি না ?

কৌতুকের হাসি হাসে রঘুনাথ। মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে দুটি সবল বাহুর আলিঙ্গনে তাকে বুকের নিবিড়ে টেনে নিয়ে বলে, কোনও দুঃখ নেই চন্দ্রপ্রভা, কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু সঙ্গীত আমার সাধনা। তোমার মদনমোহনকে তুমি ছাড়তে পারো চন্দ্রা ? ছাড়তে পারো তোমার পূজা-অর্চনা ?

চুপ করে থাকে চন্দ্রপ্রভা, উত্তর দিতে পারে না। কুণ্ঠিত স্বরে শুধু বলে, কিন্তু তোমার সাধনা কি প্রাসাদে হতে পারে না প্রিয় ? আমিও কি পেতে পারি না তার প্রসাদ ?

কৌতুকে হেসে ওঠে রঘুনাথ। বলে, মদনমোহনকে ডাকতে হলে দেবদেউলে ছুটে যাও কেন চন্দ্রপ্রভা, তোমার এই শয্যাকক্ষে কি মদনমোহন সাড়া দিতে পারে না ?

চন্দ্রপ্রভার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনে বলে, ভয় নেই চন্দ্রা, ভয় নেই। সঙ্গীতভবন আমার সঙ্গীত-সরস্বতীর দেবমন্দির।

ধীরে ধীরে আলিঙ্গন শিথিল করে বিদায় নেয় রঘুনাথ। এসে উপস্থিত হয় সঙ্গীতভবনে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। জলসা জমে ওঠে।

ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কেনা দুর্মূল্য ঝাড়লণ্ঠনের সারি শত শিখায় জ্বলে ওঠে, পারস্যের বহুবর্ণ গালিচায় ঝুমঝুম ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে চলে। কখনও বা নিঃসঙ্গবাদ্য সুকণ্ঠ সঙ্গীত।

সুরার পাত্র শেষ হয়, আবার ভরে ওঠে বিদেশী মদ্যের স্নিগ্ধ সৌরভে। সুগন্ধ কুসুমের মালা, চন্দনের রাজটিকা। 'জরিয়া' দাসীদের পরিচর্যায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় রঘুনাথ।

রাত ঘন হয়ে আসে। নিদ্রাক্লান্ত কণ্ঠে একে একে সঙ্গীদের বিদায় নিতে বলে রঘুনাথ। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, পীর বক্স, হীরাবাঈ, লালবাঈ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে আপন আপন কক্ষে ফিরে আসে তারা।

দাসীরা প্রশ্ন করে, প্রাসাদে ফিরবেন না মহারাজ ?

তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠের উত্তর আসে, না।

একে একে ঝাড়লণ্ঠনের শিখা নিবিয়ে দিয়ে যায় বাতিদার। ক্লান্ত হাতে দাসীর দল আভের পাখা নাড়ে।

লালবাঈ হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে তার আপন কক্ষে। পৃথিবী নিঃঝুম নিশ্চুপ।

মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ একসময় নিদ্রা ভেঙে যায় লালবাঈয়ের। নিঃশব্দতার মাঝে অন্ধকারে দুটি জাগর চোখ মেলে পড়ে থাকে। মনের কোণে প্রশ্ন জাগে, রঘুনাথ কি এখনও জলসা-মহলে নিদ্রিত ? প্রাসাদে ফিরে যাননি বিষ্ণুপুররাজ ?

ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ায় লালবাঈ। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দ, অন্ধকার। শুধু যুমনা-বাঁধের কালো জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব কাঁপে। চোখের দৃষ্টি তার ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ঘুরে এসে থমকে দাঁড়ায় রাজপ্রাসাদের একটি গবাক্ষে।

একটি কক্ষে এমন গভীর রাত্রিতেও উজ্জ্বল আলো দেখতে পায় লালবাঈ। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পায়, রাজপত্নী চন্দ্রপ্রভা গবাক্ষে দাঁড়িয়ে আছে উদাস দৃষ্টি মেলে। যেন কার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে লালবাঈয়ের কপালে। তবে কি প্রাসাদে ফেরেননি রঘুনাথ ?

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জলসা-মহলে নেমে আসে লালবাঈ।

ধীর পদক্ষেপে জলসামহলে প্রবেশ করে। দ্বারপ্রান্তের দীপশিখা থেকে জ্বালিয়ে তোলে কক্ষের একটি প্রদীপ। ক্ষীণ আলোকে দেখতে পায়, গালিচার ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ। অদূরে দাসী দুজনও নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

অনিমেষ নয়নে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লালবাঈ।

একটি উপাধান এনে রাখলে রঘুনাথের শিয়রে, নিজের শরীরে জড়ানো কোমল কাশ্মীরি শালখানিতে সাবধানে ঢেকে দিল রঘুনাথের নিদ্রিত দেহ।

এ এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। আপন দেহের শীতবস্ত্র রঘুনাথের শরীরের স্পর্শ পেল, আর লালবাঈয়ের মনে হল যেন রঘুনাথের আলিঙ্গন-স্পর্শে শিহরিত হল তার দেহ-মন। বহুক্ষণ একদৃষ্টে রঘুনাথের নিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লালবাঈ।

গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে।

তারপর দাসীদের ডেকে তুলল ধীর স্বরে। চমকে জেগে উঠল তারা, শঙ্কিত হল।

লালবাঈ মৃদু হেসে বললে, মহলে ফিরে যাও তোমরা। বউরানী অপেক্ষা করে আছেন, তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। বলবে, লালবাঈ থাকতে তাঁর স্বামীর কোনও অযত্ন হবে না।

রঘুনাথের আশায় বিনিদ্র রজনী অপেক্ষায় কেটে গেল চন্দ্রপ্রভার। তারপর একসময় জরিয়ার মুখে খবর শুনল। শুনল লালবাঈয়ের সান্ত্বনাবাণী। সান্ত্বনা নয়, ঈর্ষার তীর বিঁধল যেন বুকে। সন্দেহ দেখা দিল।

সঙ্গীতসাধনার নামে লালবাঈয়ের প্রমোদকক্ষেই কি নিশি যাপন করছেন রঘুনাথ ?

তুচ্ছ এক যবনী কিনা নিশ্চিন্ত হতে বলেছে বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মীকে ! বলেছে, লালবাঈ থাকতে তাঁর স্বামীর কোনও অযত্ন হবে না !

সান্ত্বনা নয়, লালবাঈয়ের কথায় যেন বিদ্রূপের বিষ দেখতে পেল চন্দ্রপ্রভা। সান্ত্বনা

নয়, যেন গর্বিতা এক নারী অহঙ্কারের কণ্ঠে বলছে, সে তার রূপের আকর্ষণে বিষ্ণুপুররাজকে চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

তা হোক, কোনও আপত্তি করবে না চন্দ্রপ্রভা, কোনও প্রশ্ন করবে না। নিজের অদৃষ্ট মেনে নিয়ে নিঃশব্দে সহ্য করে যাবে সব দুঃখ, সব বঞ্চনা।

জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল। —বড় ভয়াবহ অদৃষ্ট তোমার বউরানী!

সেদিন শিউরে উঠেছিল চন্দ্রপ্রভা। আজ আবার নতুন করে শিউরে উঠল মনের মধ্যে লালবাঈয়ের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখা দিতেই।

পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রবোধ দিল, সব মিথ্যা, মিথ্যা সন্দেহ। হিন্দুধর্মের, বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুর। সমগ্র ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছে, শিক্ষা সংস্কৃতি দর্শন, কখনও কখনও হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর দেবদেবী বিনষ্ট হয়েছে বিধর্মীর অত্যাচারে, তবু বিষ্ণুপুর কোনও দিন মোগলের পদানত হয়নি, হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই বিষ্ণুপুরের ভূস্বামী কখনও কাঞ্চনীর প্রণয়ে লুব্ধ হয়ে পাপের পথে নেমে যেতে পারে!

না, চন্দ্রপ্রভার সব সন্দেহ বুঝি মিথ্যা।

সঙ্গীত, সঙ্গীতের আকর্ষণই রঘুনাথকে টেনে নিয়ে যায়। রূপযৌবন নয়, শরীরের আসক্তি নয়।

সখীকে প্রশ্ন করে চন্দ্রপ্রভা, সঙ্গীতভবনের সব সঙ্গীতজ্ঞই কি বিধর্মী? হিন্দুর কণ্ঠে কি সুর নেই?

সুরঞ্জাক্ষী মৃদু হেসে বলে, আছে। একজনের কণ্ঠে সব রাগরাগিণী বন্দী হয়েছে, কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠে।

—কৃষ্ণমোহন? চন্দ্রপ্রভা বলে, গোপনে তাকে আমার কক্ষে আমন্ত্রণ জানাতে পারো?

বিস্মিত হয় সুরঞ্জাক্ষী। চন্দ্রপ্রভার চোখের তারায় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, কেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা কোনও উত্তর দেয় না।

সুরঞ্জাক্ষী বিচলিত বোধ করে। বলে, কৃষ্ণমোহন কি আমার আমন্ত্রণে এই নির্দিষ্ট কক্ষে দেখা দিতে সম্মত হবেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা কলমদান নিয়ে এসে ধীরে ধীরে একটি আমন্ত্রণ-লিপি লিখে বলে, এই চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছে দিলেই তিনি আসবেন। কিন্তু এ চিঠির কথা গোপন রাখতে বলবে তাঁকে, বলবে তাঁর ওপর শুধু বউরানীর ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র বিষ্ণুপুরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে নেয় চন্দ্রপ্রভা। মনকে প্রবোধ দিয়ে অন্ধ হয়ে থাকতে চায় না, পরীক্ষা করে দেখতে চায় কিসের আকর্ষণে ছুটে যায় রঘুনাথ।

বউরানীকে নিশ্চিন্ত হতে বলে এক তুচ্ছ সুরসাধিকা? 'লালবাঈ থাকতে বিষ্ণুপুররাজের কোনও অযত্ন হবে না', সান্ত্বনা দিয়েছে কাঞ্চনী!

অহঙ্কারের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছে চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈয়ের এই প্রবোধবাক্যে। সন্দেহ উঁকি দিয়েছে তার মনে। হয়তো বা ঈর্ষাও।

কখনও কোনও নিসঃঙ্গ দ্বিপ্রহরে হঠাৎ অনুশোচনার শিখা জ্বলে ওঠে চন্দ্রপ্রভার বুকে। মনের কোণে শৈশবের রঙিন মধুর স্মৃতিকে পুষে রেখেছিল চন্দ্রপ্রভা, যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাই চোখের সামনে হঠাৎ ঝলসে উঠেছিল হার্মাদ দস্যুর আক্রমণ আর রঘুনাথের দুঃসাহসিক প্রতিরক্ষার দৃশ্য।

উজ্জ্বল লাল রঙের শিরস্ত্রাণ, গাঢ় সবুজের আংরাখা। শত শত অশ্বারোহী হার্মাদ দস্যু

সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তীর্থযাত্রীদের ওপর। কিশোরী চন্দ্রপ্রভা সেদিন হয়তো প্রাণ হারাত পর্তুগীজ নৃশংসতার সম্মুখে, হয়তো বা বন্দী হত। অসীম শৌর্যের প্রতীক হয়েই যেন রঘুনাথ সেদিন প্রতিরোধ করেছিল দস্যুর আক্রমণ, রক্ষা করেছিল চন্দ্রপ্রভাকে। অপরিচিতা এক তীর্থকন্যার মনে বীজ বুনে দিয়েছিল গোপন প্রেমের।

তারপর সেই মধুস্নিগ্ধ অভিসার-লগ্ন। খড়্গেশ্বরী বিগ্রহের সামনে আত্মদানের শপথ গ্রহণ করেছিল চন্দ্রপ্রভা। পূজারীর দক্ষিণার রৌপ্যপাত্রে একটি স্বর্ণবিল্বপত্র প্রণামী দিয়েই চমকে উঠেছিল চন্দ্রপ্রভা, আরেকটি স্বর্ণপত্রের শব্দে। বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়ে খুঁজেছিল, কে এই রাজসিক প্রণামী নিবেদন করেছে। তারুণ্যের মৃদুহাস্যে উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল চন্দ্রপ্রভার উৎসুক দুটি নীলের সমুদ্রছায়া।

প্রাসাদের গোপন অভিসারকক্ষে রঘুনাথের কণ্ঠে শত বিনিদ্র রজনীর সুপ্তস্বপ্নে গাঁথা প্রণয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা। আর রঘুনাথ বিষ্ণুচক্র-অঙ্কিত অঙ্গুরীয় খুলে পরিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রপ্রভার অনামিকায়, শপথ গ্রহণ করেছিল, জীবনে কোনও দুর্বল মুহূর্তেও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না।

সে-প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিল চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথের ওপর এই অবিচল আস্থার ফলেই আহ্বান জানিয়েছিল আশঙ্কার মুহূর্তে, আত্মসমর্পণ করেছিল স্বেচ্ছায়, বিনাযুদ্ধে।

সব শপথ বুঝি ভুলে গেছে রঘুনাথ!

লালবাঈ!

রূপলাবণ্যময়ী এক যৌবনজীবিনীর আকর্ষণে বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ নাকি আত্মহারা। সঙ্গীত-সাধক রঘুনাথ তার সুকণ্ঠ সঙ্গীতের প্লাবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার ছন্দোময় শরীরনৃত্যের ঘূর্ণিতে সব প্রতিজ্ঞা বুঝি হারিয়ে গেছে।

পঁচিশ

বাঁদীবাজারের সামান্যা এক নারী ঐশ্বর্যের মোহে অতীতকে ভুলে গেছে। দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে তার জীবন থেকে।

ফকিরসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়লেই চঞ্চল হয়ে ওঠে লালী, লালবাঈ।—একটি রাজ্যপরিচালনার শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়।

রাজ্য নয় বিষ্ণুপুররাজকে হাতের মুঠোর আনতে চায় লালী। তার যৌবনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চায় রঘুনাথকে।

কিন্তু নারীর প্রতি যেন কোনও আকর্ষণ নেই রঘুনাথের। কাঞ্চনীর রূপযৌবন নয়, কণ্ঠসুরকেই ভালবেসেছে রঘুনাথ। সঙ্গীতের নেশাতেই ছুটে আসে, সঙ্গ পাবার নেশায় নয়।

নানান কৌশলের সাহায্য নেয় লালী, মসলিনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে হাতছানি দেয় দেহের যৌবনছন্দ, সুর্মাটানা চোখের কোণে ইঙ্গিতের বহ্নিশিখা—সব ব্যর্থ হয়।

গান, শুধু গান। গানের নেশাতেই তন্ময় হয়ে থাকে রঘুনাথ।

নতুন নতুন তানের পরীক্ষা চলে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সামনে।

কৃষ্ণমোহনকে বলে, কি নতুন গীত রচনা করেছ শোনাও কবিবন্ধু।

শোনায় কৃষ্ণমোহন। ধ্রুপদ-গাম্ভীর্যে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সাবাস দিয়ে ওঠে রঘুনাথ। সাবাস দেয় পীর বক্স। বাহবার ধ্বনি অনুরণিত হয় সকলের কণ্ঠে। কিন্তু লালবাঈকে বড় ম্লান দেখায়।

গোপন মনে যেন ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে লালবাঈ। তার কণ্ঠ শুধু সুরকে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিত্য নতুন গান ও তার সুর রচনা করার প্রতিভায় তার কণ্ঠকেও যেন অপমান করে কৃষ্ণমোহন।

যেদিনই কৃষ্ণমোহন নতুন কোনও গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এসে উপস্থিত হয়, সেদিন রঘুনাথের কোনও ভ্রূক্ষেপই থাকে না লালবাঈয়ের দিকে।

তন্ময় হয়ে গেয়ে চলে কৃষ্ণমোহন।

গান থেমে যায়। অপূর্ব এক স্তব্ধ মূর্ছনায় সে-গানের রেশ থেকে যায় সঙ্গীতভবনের অগুরু-সুগন্ধ বাতাসে।

রঘুনাথ আনন্দে অধীর হয়ে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণমোহনকে। বলে, সার্থক তোমার সাধনা কৃষ্ণমোহন, সার্থক এই বনবিষ্ণুপুর। তুমি একাধারে কবি, গীতিকার, সঙ্গীতগুরু। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেও তুমি বঙ্গভাষার বন্ধনে বন্দী করেছ, ভবিষ্যতের বঙ্গবাসীকে তুমি এক সম্পদ দিয়ে গেলে কৃষ্ণমোহন। একদিন হয়তো এই বাংলাই হয়ে উঠবে গীতময় দেশ।

লজ্জায় মাথা নত করে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহন। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে।

ওস্তাদ পীর বক্স মৃদু মৃদু হাসে তার অস্বস্তি দেখে। রঘুনাথের কথার প্রতিধ্বনি তোলে বাহাদুর খাঁ।

গদাধর বলে, আমি জানতাম কৃষ্ণমোহন, যেদিন অভিভূতের মতো প্রথম তানপুরা তুলে নিয়েছিলে, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম সঙ্গীতকে তুমি ফিরিয়ে আনবে, বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার স্রষ্টা হবে তুমি, সৃষ্টি করবে বাংলার নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

ঘরোয়ানার স্রষ্টা? মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে লালবাঈ। তার কণ্ঠের মাধুর্যকে বুলবুলের শিস্ বলেছে সকলে, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রতিভা কষ্ণমোহন?

গান দিয়েই রঘুনাথের মন ভোলাতে চেয়েছিল লালবাঈ। কিন্তু তার কণ্ঠ যেন পরাজিত হয়েছে কৃষ্ণমোহনের কাছে।

যৌবনজ্বালায় উন্মাদ হয়ে ওঠে লালবাঈ। সঙ্গীত নয়, রঘুনাথকে আপন আয়ত্তে আনার জন্যে কাঞ্চনীর সব ছলাকলা প্রয়োগ করবে সে। প্রেম দিয়ে প্রতিভাকে জয় করবে।

ক্রমে সঙ্গীতভবন থেকে একে একে বিদায় নেয় সকলে। একটি একটি করে জলসা-মহলের আলো নিবে যায়।

সকলকে বিদায় দিয়ে সঙ্গীতভবনের অলিন্দে এসে দাঁড়ায় রঘুনাথ, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধোয়া শ্যামবাঁধের নিথর জলের দিকে তাকিয়ে।

দূর থেকে লক্ষ করে লালবাঈ।

ধীরে ধীরে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়ায়।

লালবাঈয়ের দিকে চমকে ফিরে তাকিয়ে আবার উদাস দৃষ্টি মেলে দেয় রঘুনাথ।

প্রশ্ন করে। —কি দেখছ বুলবুল! কি ভাবছ?

লালবাঈ মৃদু হেসে বলে, দেখছি ওই শ্যামবাঁধ আর আপনার এই বহুমূল্য বজরা। এমন চাঁদনি রাতে ওই বজরায় নৌকাবিহারে যেতে ইচ্ছে হয় রাজাবাহাদুর।

বিস্মিত চোখে লালবাঈয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে রঘুনাথ।

কাঞ্চনীর সামান্য বাসনা শুনে কৌতুক বোধ করে। বলে, চলো বুলবুল, তোমার এই তুচ্ছ কামনা অপূর্ণ রাখতে চাই না।

জ্যোৎস্নাধৌত চন্দ্রাতপে নৌকাবিহারে বের হয় রঘুনাথ আর লালবাঈ। শ্যামবাঁধের জলে ভেসে চলে বারো দাঁড়ের বজরা।

ভাসমান বজরার মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বুলবুলের গান শোনে রঘুনাথ।

ধীরে ধীরে সুর ফুটে ওঠে লালবাঈয়ের কণ্ঠে। বিমুগ্ধ তন্ময়তায় গান শুনতে শুনতে উচ্ছ্বসিত আবেগে রঘুনাথ বলে ওঠে, সাবাস বুলবুল, তোমার এ অপূর্ব সঙ্গীত কোনও দিন ভুলব না আমি। একটি নির্জন রাত্রির এই অমূল্য উপহারের বিনিময়ে কি উপহার চাও তুমি, বলো কাঞ্চনী।

নত মস্তকে কপট লজ্জায় লালবাঈ অস্ফুটে উচ্চারণ করে, আপনার প্রেম মেহেরবান!

শিহরিত হয়ে ওঠে সারা শরীর। রঘুনাথ বিচলিত কণ্ঠে বলে, না না, এ কি অদ্ভুত কামনা তোমার?

সশব্দে হেসে ওঠে লালবাঈ। বলে, জানি রাজাবাহাদুর! মুসলমানী আপনার অস্পৃশ্য, মুসলমানীর প্রেম গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ।

রঘুনাথ প্রতিবাদ করে।—না কাঞ্চনী, আমার কাছে হিন্দু আর মুসলমানে কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রেমকে ভয় পাই আমি।

মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে লালবাঈ। সব ছলাকলা, কাঞ্চনীর সব কৌশল সে প্রয়োগ করবে আজ। রঘুনাথকে জয় করবে।

লীলায়িত ভঙ্গিমায় আপন দেহকে রঘুনাথের কাছে টেনে এনে অপূর্ব ভ্রূবিলাসের মোহ সৃজন করে লালবাঈ প্রশ্ন করে, তবে কেন আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে এভাবে ভেঙে দিতে চান রাজাবাহাদুর?

শুধু প্রেম, সেটুকু উপহার দিতেও কেন এমন কৃপণতা রঘুনাথের। শুধু প্রেমের কাঙাল কাঞ্চনী, তার রূপযৌবন, তার কণ্ঠের সুর উপঢৌকন দিতে এসে এভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে?

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রম দেখা দিল রঘুনাথের মনে। অকস্মাৎ তার শরীরের শিরা উপশিরায় যেন এক অনাস্বাদিত উন্মাদনা জেগে উঠল। ইচ্ছে হল দুটি বাহুর প্রবল আকর্ষণে লালবাঈকে বুকের নিবিড়ে টেনে নিতে। কিন্তু না। নিজেকে সংযত করল রঘুনাথ। যেভাবে এতকাল বাঁদীবাজারের কালো বোরখায় ঢাকা এই সুন্দর মুখের আকর্ষণকে বারংবার জয় করে এসেছে, সংযত করেছে নিজেকে। তবু অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল সে রূপময়ী যবনকন্যার লাস্যময় দুটি চোখের ঘন নীল তারার দিকে।

লালবাঈ রঘুনাথের সুপ্ত কামনার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। তাকে জয় করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠল লালবাঈ।

এদিকে প্রাসাদ-গবাক্ষে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে গুনে নিশীথ কেটে যায় চন্দ্রপ্রভার। দুশ্চিন্তার রেখা ফোটে কপালে।

ক্রমশ রঘুনাথের ব্যবহারেও যেন পরিবর্তন দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভা।

স্বপ্নময় দুটি চোখে আগামী দিনের রোমাঞ্চ বোনে, উদাস দৃষ্টি মেলে শ্যামবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন নিজের মনেই স্নিগ্ধ হাসি হাসে চন্দ্রপ্রভা। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার চোখ।

যেন ছোট্ট একটি শিশুর পদধ্বনি শুনতে পাবার আশায় কান পেতে থাকে। পরক্ষণেই সচকিত হয়ে ওঠে, তন্ময়তা ভেঙে যায়। দুচোখে অশ্রু নামে তার। সন্তানকামনার ব্যর্থতায় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের গভীর থেকে।

নির্জনে একাকিনী বসে বসে স্বপ্ন দেখে চন্দ্রপ্রভা, যেন তার কোলে এসেছে একটি সুরূপ শিশু। স্বপ্নশিশুর মুখের দিকে তাকিয়েই সব বেদনা ভুলতে চায় সে, ভুলতে চায় রঘুনাথের তাচ্ছিল্য অপমান আঘাত। কিন্তু মদনমোহনের আশীর্বাদ কি পাবে না সে?

রাজরানীর কোল আলো করে আসবে না কেউ ?

নিঃসন্তান চন্দ্রপ্রভার বেদনা ভোলাবার জন্যে রাজপুরোহিত বলেন, প্রজাই তোমার সান্ত্বনা মা, এত সন্তান তোমার, তুমি দুঃখ পাও কেন সন্তানের জন্যে ?

রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপাল ক্রীড়াসঙ্গীদের ছেড়ে হঠাৎ চন্দ্রপ্রভার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্তানস্বপ্ন ভুলে পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রপ্রভা। আর জ্যোতিষাচার্য বলেন, সন্তানস্নেহে পালন করো মা গোপালকে, বিষ্ণুপুরের ভবিষ্যৎ বংশধরকে।

সন্তানস্নেহে তাকে বুকের নিবিড়ে টেনে নেয় চন্দ্রপ্রভা।

না, শান্তি পেয়েছে চন্দ্রপ্রভা। কাঞ্চনী লালবাঈয়ের মোহে ডুবে থাক রঘুনাথ, ভুলে যাক রাজকার্য, সমাজ-সংস্কার, ভুলে যাক চন্দ্রপ্রভাকে। মদনমোহনের চরণে নিজেকে নিবেদন করেছে চন্দ্রপ্রভা, তাই হয়তো কিশোর গোপালের রূপ নিয়েই মদনমোহন এসে ধরা দিয়েছেন চন্দ্রপ্রভার কোলে।

সন্তানের স্বপ্ন ঘিরে একদিন কত বিনিদ্র আনন্দমুখর রাত কেটে গেছে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভার। পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রণয়কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে কত মধুর কল্পনার রাজ্য গড়েছে ভবিষ্যতের স্নেহলালিত সন্তানকে ঘিরে।

কিন্তু তারপরই একমসয় মিলনানন্দে যতি পড়েছে, আশঙ্কায় থমথম করে উঠেছে চন্দ্রপ্রভার বুক। মনে হয়েছে, বুঝি তার সন্তানকামনা সার্থক হবে না কোনও দিন।

আহত অভিমানে দূরে সরে গেছে চন্দ্রপ্রভা, মদনমোহনের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে, নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মাচরণের গভীরে, ভুলে থাকতে চেয়েছে, ভুলে থেকেছে রঘুনাথকেও।

এতদিন সঙ্গীতের মধ্যেই ডুবেছিল রঘুনাথ, নারীর প্রেম প্রীতি ভালবাসার স্পর্শে কি রোমাঞ্চ, জানত না। প্রণয়ের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে কোন অশুভ লগ্নে দূরে সরে গেছে চন্দ্রপ্রভা।

আর চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে লালবাঈ এসে জ্বালা ধরিয়েছে রঘুনাথের বুকে।

তবু সত্যাশ্রয়ী রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা ভুলতে চায়নি। লালবাঈয়ের সব ছলাকলা, যৌবনের সব লোভানি উপেক্ষা করে চলেছিল সে। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার আচরণ দুর্বোধ্য মনে হল তার। সন্দেহ উঁকি দিল গোপন মনে।

তবে কি চন্দ্রপ্রভার হৃদয়ের গভীরে কোনও ছায়া ফেলেনি রঘুনাথের প্রেম ?

কে জানে ! রঘুনাথ আহত অভিমানে ভাবলে, হয়তো আকস্মিক অবিবেচনার ফলেই তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রপ্রভা। হয়তো সে-ঘোর কেটে গেছে তার, তাই রঘুনাথের বাহুবন্ধনকে অসহ্য মনে হয়।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কিন্তু ক্রমশ যেন মদনমোহনের পায়েই আশ্রয় নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভা।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত মন বিষিয়ে ওঠে রঘুনাথের। চন্দ্রপ্রভাকে আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তোলবার জন্যে মন স্থির করে রঘুনাথ।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার বুঝি ঘুম ভাঙে না। বুঝতে পারে না কিসের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে রঘুনাথ।

সেদিনও এমনি পদাবলীর কলি গুনগুন করে প্রাসাদে ফিরে এল চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ গবাক্ষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল চন্দ্রপ্রভার জন্যে।

সহাস্য মুখে এগিয়ে এল রঘুনাথ।

মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে বৈষ্ণববেশে সজ্জিতা চন্দ্রপ্রভার শান্ত মধুর রূপের দিকে তাকিয়ে মৃদু

হাস্যে আহ্বান জানাল রঘুনাথ। অধৈর্য আবেগে ছুটে গেল তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্যে।

পরক্ষণেই রোষকষায়িত দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গেল চন্দ্রপ্রভা।

বিমূঢ় বিরক্তিতে, বিস্ময়ের চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল রঘুনাথ। তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল।

না, এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় রঘুনাথ। সত্যাশ্রয় নয়, শান্তি পেতে চায়।

সঙ্গীতভবনে লালবাঈয়ের কক্ষদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ।

চমকে ফিরে চাইল লালবাঈ। বিস্ময়ের আভাস মুছে যেতে না যেতেই মুখে তার ফুটে উঠল আনন্দের ছায়া।

রঘুনাথ এসেছেন। বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ আপনা থেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন তার বাসনার দ্বারে।

শত শত অভিনয়-কৌশলে যাকে আকর্ষণ করতে পারেনি লালবাঈ, জয় করতে পারেনি যে কামনার পাত্রকে, আজ নিজেই এসে ধরা দিয়েছে সেই অমূল্যনিধি।

ছুটে এসে মৃদু হেসে তসলিম্ করার জন্যে মাথা নিচু করলে লালবাঈ। কিন্তু তার পূর্বেই রঘুনাথের দুটি সবল বাহু তাকে টেনে নিল বুকের নিবিড়ে।

বললে, লালী, লালবাঈ, শান্তি পেতে চাই আমি, শুধুমাত্র শান্তি চাই তোমার কাছে।

রঘুনাথের দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। লালবাঈয়ের চোখেও দেখা দিল আনন্দের অশ্রু।

বললে, আমার এই কক্ষ থেকেও শান্তি উধাও হয়েছিল রাজাবাহাদুর। শান্তি পেতে চাই, আমিও শান্তি চাই আপনার কাছে।

রঘুনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে লালবাঈ ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে।

তারপর দিনে দিনে চন্দ্রপ্রভাকে ভুলে গেল রঘুনাথ। ডুবে গেল লালবাঈয়ের অবৈধ প্রণয়ে।

প্রণয় ? না। উচ্চাশার কামনাবহ্নিতে জ্বলে উঠল লালবাঈ। রাজাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে, রাজ্যকেও হাতের মুঠোয় আনতে চায়। শান্তি নয়, বিলাসের স্রোতে সুখ আহরণ করতে চায়।

অসন্তোষের গুঞ্জন ওঠে সঙ্গীতভবনে। গানের মেজাজ ফিরে পায় না কেউ।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর মনে ক্রোধ গুমরে মরে লালবাঈয়ের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনীর প্রেমকে অবহেলা করে না বাহাদুর খাঁ, কিন্তু এ কি দুর্বার বাসনা তার ? এ কি ভয়ঙ্কর উচ্চাশা ?

চোখের সামনে গদাধরও দেখতে পায়, লালবাঈয়ের বিলাসব্যসন চরিতার্থ করার জন্যে ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী হয়ে উঠছে রঘুনাথ। প্রজার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শত শত দরিদ্রের রক্তে বুঝি লালবাঈয়ের গাল রক্তিম হয়ে উঠেছে।

অসন্তোষ আর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে প্রজাকুল। অর্থাভাবে সঙ্গীতভবনের আয়ুও বুঝি ক্ষীণ হয়ে আসে।

গদাধর বলে, ওস্তাদজি, এভাবে মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতে দেবেন না রাজাবাহাদুরকে।

বাহাদুর খাঁর চোখেও বিষণ্নতা নামে। বলে, এ বড় দুর্জয় আকর্ষণ চক্রবর্তী। এ মৃত্যু থেকে রাজাবাহাদুরকে বাঁচাতে পারে একমাত্র লালবাঈ, তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তোলে হীরাবাঈ। বলে, লালীকে একদিন একশো

মোহর দিয়ে কিনে এনেছিলাম বাঁদীবাজার থেকে। মুক্তি দিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। আজ সকলের স্বার্থ ভেবে তার কাছে বাঁদীর মতই অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে হবে ওস্তাদজি ?

মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ছলছল চোখে সৌকত খাঁ বলে, তাই হোক বেটি, ভিখ্ চেয়ে নে রাজাবাহাদুরকে। লালীকে সন্তানের ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিস বেটি, তোর ভিক্ষাই মঞ্জুরি পাবে তার কাছে...

বিষ্ণুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে, সঙ্গীতভবনের ভবিষ্যৎ ভেবে লালবাঈয়ের সামনে গিয়ে হাজির হল হীরাবাঈ।

বললে, তোমার কুহকের ছায়া থেকে রঘুনাথকে মুক্তি দাও লালী, রাজ্যকে মুক্তি দাও।

অট্টহাসে হেসে উঠল লালী। বিদ্রূপের স্বরে বললে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও হীরাবাঈ, নিজের সুরতের দিকে তাকিয়ে দেখো।

চমকে উঠল হীরাবাঈ। এ কি অপমান ছিটিয়ে দিল লালী !

আবার সশব্দে হেসে উঠল লালবাঈ। বললে, কবরের ওপর পা রাখতে চলেছ হীরাবাঈ, এখনও যৌবনের জ্বালা ঘুচল না ?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে লালীর দিকে তাকিয়ে রইল হীরাবাঈ। দুচোখ ভরে জল জমে উঠল। আশ্চর্য। মানুষ বদলে গেছে লালী, মনুষ্যত্ব বুঝি হারিয়ে গেছে।

ব্যর্থ ব্যথায় হীরাবাঈ ছুটে পালিয়ে এল লালীর কাছ থেকে। কন্যার মত যাকে মানুষ করে তুলেছে তার কাছেই এমন ভাবে ইজ্জত হারাতে হবে, ভাবেনি সে।

বিদায় নিয়ে পালিয়ে এল হীরাবাঈ। কিন্তু লালী জ্বলে উঠল অন্ধ আক্রোশে।

রঘুনাথকে বললে, আমার কাছ থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিতে চায় হীরাবাঈ, আমাকে দূরে সরিয়ে আপনাকে গ্রাস করতে চায়, রাজাবাহাদুর।

সুরাপাত্র নামিয়ে রেখে রঘুনাথ হাসল, বিকৃত হাসি।

লালবাঈ বললে, আমাকে ঘিরেই যখন এত ষড়যন্ত্র, তখন আমাকেই বিদায় দিন রাজাবাহাদুর, যে-দিকে দুচোখ যায় চলে যাই আমি।

বিব্রত রঘুনাথ দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল লালবাঈকে, সুরাসক্ত কণ্ঠে বললে, না না, লালী, তোমাকে ছাড়তে পারব না আমি, ছেড়ে থাকতে পারব না। কি চাও তুমি বলো ?

লালবাঈ মৃদু হেসে বললে, গানের জলসায় হীরাবাঈকে অপমান করে এ অন্যায় বাসনার জবাব দিতে হবে রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ বললে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা লালী।

সত্যই বুঝি তাই। লালবাঈয়ের কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখতে চায় না রঘুনাথ।

রাজকোষের অবস্থা জানতে চায়নি রঘুনাথ, প্রজার দারিদ্র্যের খবর রাখতে চায়নি !

লালবাঈ বলেছে, সঙ্গীতভবনের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে রাজাবাহাদুর, আমাদের পৃথক আনন্দভবন নির্মাণের আদেশ দিন।

রঘুনাথ সায় দিয়ে আদেশ দিয়েছে খাজাঞ্চিকে।

লালবাঈ বলেছে, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধের পাশে আমাদের পৃথক একটি বাঁধ নির্মাণ করবার আদেশ দিন রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ আদেশ দিয়েছে। বলেছে, তোমাকে চিরস্মরণীয় করে রাখব লালী, এ-বাঁধের নাম হবে লালবাঁধ।

খুশি হয়ে উঠেছে লালবাঈ।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার মনের গোপন ব্যথা জানতে চায়নি রঘুনাথ। জানতে চায়নি তারই মঙ্গলের জন্যে কি এক অসহ্য বেদনা লুকিয়ে রেখেছে চন্দ্রপ্রভা।

মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে গুনগুন স্বরে গান গায় চন্দ্রপ্রভা, পদাবলীর রসমাধুর্যে

তন্ময় হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে শুধু সুরঞ্জাক্ষী এসে বাধা দেয়। আঘাতে আঘাতে জ্যোতিষাচার্য আর সভাপণ্ডিতের অনুরোধে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে চন্দ্রপ্রভাকে। বলে, পাটরানীর সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে, যবন-যুবতীর লালসার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে রঘুনাথকে।

তবু মন যেন বিশ্বাস করতে রাজি নয়। —না সুরঞ্জাক্ষী, সব সন্দেহ হয়তো বা মিথ্যা। সঙ্গীতের আকর্ষণই হয়তো বিষ্ণুপুররাজকে সঙ্গীতভবনে টেনে নিয়ে যায়, নারীর সৌন্দর্য নয়। সুরঞ্জাক্ষীর প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রপ্রভা নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দেয়।

সুরঞ্জাক্ষী বলে, না চন্দ্রপ্রভা, সত্যিই লালবাঈয়ের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন বিষ্ণুপুররাজ। তার প্রমাণ—

গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সুরঞ্জাক্ষী। তারপর ইশারায় ডাক দেয় চন্দ্রপ্রভাকে। বলে, ওই দেখো চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা দেখতে পায় শত শত শ্রমিক দল বেঁধে চলেছে। একটি সুদীর্ঘ দীঘি খনন করা হবে।

সুরঞ্জাক্ষী বলে, লালবাঈয়ের অনুরোধ রক্ষা করছেন মহারাজ, ওই দীঘির নামকরণ হবে লালবাঁধ। যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধের পাশে এই লালবাঁধ সৃষ্টি হচ্ছে লালবাঈকে বিষ্ণুপুরের বুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে। আর—

—আর ? আর কি সুরঞ্জাক্ষী ?

মৃদু হেসে সুরঞ্জাক্ষী উত্তর দেয়, ওই দেখো চন্দ্রপ্রভা, রাজমিস্ত্রির দল চলেছে। গড়ে তুলবে ওরা একটি নতুন ইমারত। লালবাঈয়ের আনন্দমহল, প্রজাদের মুখে 'নূতন মহল'।

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে চন্দ্রপ্রভার বুক নিঙড়ে। ব্যর্থ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সুরঞ্জাক্ষীর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রপ্রভা প্রশ্ন করে, কিন্তু এর কি কোনও প্রতিকার নেই সুরঞ্জাক্ষী ?

দুঃখের হাসি হেসে সুরঞ্জাক্ষী উত্তর দেয়, আছে ! কিন্তু সে বড় দুরূহ প্রতিকার।

ছাব্বিশ

আরেকজনের মনেও বিদ্বেষ জ্বালিয়ে তুলেছে লালবাঈ।

হীরাবাঈয়ের মনে।

দুচোখে তার অশ্রুর বন্যা নামল। এভাবে লালীর কাছে সে অপমানিত হবে কোনও দিন কল্পনাও করেনি !

মর্মর জাফরির পাশে দাঁড়িয়ে দূরের লালবাঁধের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল হীরাবাঈ।

এ যেন আপন সন্তানের কাছে অপমানিত হওয়া।

উদাস দৃষ্টিতে ঝরোকার পাশে দাঁড়িয়ে হীরাবাঈ দেখছিল ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠেছে লালবাঁধ।

ঐশ্বর্য, আনন্দের মোহে লালী আজ ভুলে গেছে হীরাবাঈকে। ভুলে গেছে তিল তিল করে যত্ন আর সাধনা দিয়ে এক মূল্যহীন বাঁদীকে বাঈসাহেবায় রূপান্তরিত করেছে হীরাবাঈ। আর আজ সেই লালবাঈয়ের মনে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই।

দুঃখে অনুশোচনায় লালবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার উদাস দৃষ্টির সামনে অকস্মাৎ ঝলসে উঠল অতীতের এক টুকরো স্মৃতি। মনে হল অযোধ্যাপ্রসাদের ওপর যে অবিচার করে এসেছে সে, এতদিনে তারই যেন প্রতিদান পেল লালীর কাছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ।

মনে পড়ল সেই গ্রাম্য নদীর ঘাট। সিঙ্কুকির নির্দেশে নবাবের গুপ্ত ফৌজ একদিন অযোধ্যাপ্রসাদের নববধূকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ঘাট থেকে।

তারপর গ্রাম্যবধূদের কাছে সে সংবাদ শুনে দুঃখে হতাশায় বুঝি ছুটে এসেছিল অযোধ্যাপ্রসাদ। অশ্রুঝরা দুচোখ মেলে ব্যর্থ দৃষ্টিতে নবাবের বজরা খুঁজেছিল। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাটের সিঁড়ি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল কয়েক টুকরো ভাঙা শাঁখা ; আর শূন্য কলস। মনের গোপনে নববধূর প্রেম লুকিয়ে রেখে দিন কেটেছিল তার। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হয়নি অযোধ্যাপ্রসাদের।

কলঙ্কের চিহ্ন নিয়ে একদিন ফিরে এল সেই গ্রাম্যবধূ। কিন্তু দুহাত বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানাতে পারল না অযোধ্যাপ্রসাদ।

নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হিন্দুসমাজ তাকে বিতাড়িত করল, নির্বাসিত করল।

সেইদিন থেকে শুরু হল এক হিন্দু গ্রাম্যবধূর নিরুদ্দেশ যাত্রা। স্বামীর প্রতি আক্রোশে তার দুচোখ জ্বলে উঠল পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করবার আগ্রহে।

কিন্তু একদিন সামাজিক অনুশাসনের চেয়েও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বড় হয়ে দেখা দিল অযোধ্যাপ্রসাদের মনে। পেয়ে-হারানো প্রেমের অগ্নিদাহে অশান্ত বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে বছরের পর বছর হীরাবাঈকে খুঁজে বেড়াল অযোধ্যাপ্রসাদ। শেষে দেখা পেল।

সন্ন্যাসী অযোধ্যাপ্রসাদ বারাণসীর ঘাট থেকে উঠে আসছিল গঙ্গাস্নান করে। হঠাৎ চোখোচোখি হল। দ্রুত পায়ে সরে যেতে গিয়েও মন থমকে দাঁড়াল হীরাবাঈয়ের।

অপমানে জর্জরিত করে সেদিন অযোধ্যাপ্রসাদকে লাঞ্ছিত করেছিল হীরাবাঈ।

আর অযোধ্যাপ্রাসাদ বলেছিল, তোমাকে ফিরে চাই না হীরা, তোমাকে ফিরে পাবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু তোমার দেখা পেতে চাই, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন তোমাকে কাছে পাই, এইটুকুই আমার অশান্ত হৃদয়ের কামনা।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল হীরাবাঈ এ ভিক্ষার কথা শুনে। হয়তো বা মায়া। হয়তো বা ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য। বেতনভুক সারেঙ্গিওয়ালাদের দলে নিয়োগ করেছিল সে অযোধ্যাপ্রসাদকে।

বলেছিল, কিন্তু অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে আমাদের সেদিনের সম্পর্ক। আর পৃথিবীর কোনও তৃতীয় প্রাণী যেন না জানতে পারে যে অযোধ্যাপ্রসাদ আর হীরাবাঈয়ের মধ্যে কোনও দিন কোনও নিকট-সম্পর্ক ছিল।

ভিক্ষা মঞ্জুর হয়েছিল অযোধ্যাপ্রসাদের, আর এইটুকু ভিক্ষা পেয়েই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার ব্যথা-কাতর দুটি চোখ। ওস্তাদ তবলাবাদকের কাছে তার তালিম নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল হীরাবাঈ।

অপেক্ষার অত্যাচারে যে-মানুষটির সমস্ত জীবন বিনষ্ট করেছে, আজ হীরাবাঈয়ের মনে হল সে-ই যেন তার প্রধান সম্বল। সব আশা ভরসা অবলম্বন শেষ হয়ে গেছে, মাটিতে মিশে গেছে সব সম্মান।

জল-থই-থই লালবাঁধ আর যমুনাবাঁধের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হীরাবাঈয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল অযোধ্যাপ্রসাদের দুটি সজল চোখের দৃষ্টি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়াল হীরাবাঈ, কিন্তু লজ্জায় অপমানে যেন ওস্তাদ সৌকত খাঁর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারল না।

বুড়ো সৌকত খাঁর চোখও ভিজে এল। মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, আফসোস করে লাভ নেই হীরা। জিন্দিগির মতই গলার কদরও চিরদিন থাকে না।

হীরাবাঈ সশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বললে, সব বরবাদ হয়ে গেল ওস্তাদজি, সব বরবাদ হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সৌকত খাঁ। কোনও কথা বললে না। কি বলবে সে! এ দুঃখ চাপা দেওয়া যায় না, লুকোনো যায় না এ অপমান। তা জানে ওস্তাদ সৌকত খাঁ।

বাঁদীবাজার থেকে একশো মোহর দিয়ে লালীকে কিনে এনেছিল হীরাবাঈ। নিজের স্বার্থ ভুলে দিনের পর দিন শ্রান্তদেহে মহড়া দিয়েছে নাচ আর গানের, লালীকে করে তুলেছে হিন্দুস্থানের সেরা বুলবুল। আপন সন্তানের জন্যেও কেউ বুঝি এমন ভাবে নিজেকে দান করে না। বাঈসাহেবাদের আদব শিখিয়েছে সযত্নে, তাকে মাইফেলে হাজির করেছে নিজের ইজ্জত নীচে নামিয়ে। সেই লালীর গান আজ তাকে এভাবে অপমানিত করবে, কে জানত।

প্রতিদিনের মতই সঙ্গীতভবনের আসরে গান শুরু করেছিল হীরাবাঈ। তন্ময় হয়ে শুনছিল বিষ্ণুপুরের সমঝদারের দল। সাবাস দিচ্ছিল ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স।

এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রঘুনাথ। সুরাসক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, কোয়েল নয়, কউয়া। গান বন্ধ করো হীরাবাঈ, এ গান শুনলে লালবাঈ বেবাক তান ভুলে যাবে।

বলেই লালীকে ইশারা করল রঘুনাথ।

সুরার নেশা মনে করে রঘুনাথকে হয়তো ক্ষমা করতো হীরাবাঈ। কিন্তু লালী?

রঘুনাথের ইশারা পেয়েই কৌতুকের হাসি হেসে তানপুরা তুলে নিল লালী, গান শুরু করল।

সেই একই গানের পদ গুনগুন করে গুঞ্জন তুলল জলসাঘরে। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল হীরাবাঈ। বাঈজীর কানুন ভুলে গেল নাকি লালী? রঘুনাথের কথার জবাবে হীরাবাঈয়ের তারিফ ফুটল না কেন লালীর মুখে! আর যে গান হীরাবাঈয়ের আপন ঘরোয়ানা, সেই গানই কিনা লালবাঈ গাইতে শুরু করল হীরাবাঈয়ের সামনে বসে।

বাঈজীর জীবনে এর চেয়ে বড় অপমান নেই, জানে সৌকত খাঁ। তাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না।

শুধু মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, জিন্দিগির মত গলার কদরও চিরদিন থাকে না হীরা।

হীরাবাঈ সশব্দে কেঁদে উঠল। বললে, সব বরবাদ হয়ে গেছে ওস্তাদজি, সব বরবাদ হয়ে গেল।

সৌকত খাঁ চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় উঠে গেল ধীরে ধীরে।

রাত নেমে এল ক্রমে ক্রমে।

উদাস দৃষ্টিতে লালবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক-সময় তন্ময়তা ভাঙল হীরাবাঈয়ের। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ওস্তাদজি চলে গেছেন।

দীর্ঘশ্বাস চেপে তানপুরাটার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল হীরাবাঈ। ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে তার ক্রোধ ফুটে উঠল। দুচোখে চমক দিল নৃশংস দৃষ্টি।

তানপুরাটার কাছে এগিয়ে এল হীরাবাঈ।

তারপর হঠাৎ একটার পর একটা তার ছিঁড়ে ফেললে। ককিয়ে কেঁদে উঠল যেন সারা ঘর। ছিন্নতন্ত্রীর সুরধ্বনি নয়, যেন এক ব্যর্থ জীবনের আশাভঙ্গের কান্না।

একটির পর একটি তার ছিঁড়ে ফেলল হীরাবাঈ, রক্তের রেখা ফুটে উঠল তার

আঙুলে।

সব তার ছিঁড়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে সব সুর।

অপরিসীম ক্রোধে তানপুরাটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলল হীরাবাঈ। সশব্দে ভেঙে পড়ল সেটা।

উন্মাদের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল হীরাবাঈ। নিঃশব্দ পায়ে এসে ঢুকল অযোধ্যাপ্রসাদের ঘরে।

ক্ষীণ আলোয় দেখলে তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে শুয়ে আছে অযোধ্যাপ্রসাদ।

কাছে এগিয়ে এল হীরাবাঈ। তবু চোখ খুলল না অযোধ্যাপ্রসাদের।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল হীরাবাঈ।

একটি কোমল হাত এসে স্পর্শ করল অযোধ্যাপ্রসাদের কপাল।

চমকে উঠে বসল অযোধ্যাপ্রসাদ। বিরহী জীবনে এই প্রথম সে হীরাবাঈয়ের স্পর্শ পেল।

মৃদু হাসি খেলে গেল হীরাবাঈয়ের চোখে। বললে, ওঠো। চলো।

—কোথায়?

—যে-দিকে তোমার ইচ্ছে হবে।

উঠে দাঁড়াল অযোধ্যাপ্রসাদ। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না হীরাবাঈয়ের কথা। বললে, কি বলছ হীরা?

—চলো। ধীর স্বরে হীরাবাঈ বললে, সমস্ত জীবন অপেক্ষা করেছ তুমি, আর অপেক্ষা নয়। চলো।

বিস্ময় কাটল না তবু।

অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, তুমি বোধহয় প্রকৃতিস্থ নও হীরা; যাও, বিশ্রাম করতে যাও।

—না। মনঃস্থির করেছি আমি, চলো যেদিকে খুশি, যেখানে গেলে শান্তি পাবে তুমি, সেখানেই যেতে চাই।

হঠাৎ সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অযোধ্যাপ্রসাদের।

বললে, ক্ষমা করেছ হীরা, ভুলতে পেরেছ?

মৃদু হাসি খেলে গেল হীরাবাঈয়ের অধরে ওষ্ঠে।

বললে, তুমি আমার স্বামী। তোমাকে ক্ষমা করব আমি? তোমার ধর্ম সমাজ কুসংস্কারের জন্যেই একদিন আমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলে তুমি, তা জানি। কিন্তু ভালবাসার টানেই তুমি সব ছেড়ে চলে এসেছ, অপেক্ষা করেছ এই দীর্ঘদিন। আর নয়—এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করব না আমি, না, না...

সশব্দে কেঁদে উঠে দুহাতে অযোধ্যাপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরল হীরাবাঈ।

কাঁদল দুজনেই। দুজনে দুজনের কাঁধে মুখ রেখে কান্না, কান্না।

তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের পথ ধরে দুটি ছায়াশরীর মিলিয়ে গেল পথের সীমান্তে।

বুড়ো সৌকত খাঁ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল। ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল তার চোখ বেয়ে।

সাতাশ

সুবে বাংলায় শান্তি নয়, যেন আতঙ্কের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে।

ডিহি কলক্যাতায় ভাগীরথীর তীরে সন্তর্পণে যে গোপন দুর্গ গড়ে তুলেছিল ইংরেজ বণিকের দল, এবার প্রকাশ্য ভাবেই তার নামকরণ হল ফোর্ট উইলিয়ম। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামে ইংরেজের কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হল।

দক্ষিণে ফরাসি পল্টন, উত্তরে ইংরেজ। শুধু বিদেশী সৈন্যের ভয়ই নয়, বনবিষ্ণুপুরের বাণিজ্যও ক্রমশ কুক্ষিগত হতে চলেছে তাদের। বাট্টাদার মহাজনদের গঞ্জে পাঠান আর পর্তু আসরফি, মোগল মোহর, মারাঠা রুপা আর বাংলার টঙ্ক মুদ্রার সঙ্গে বিদেশী স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় বৃদ্ধি পেল ক্রমে ক্রমে।

বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের দিকে প্রসারিত হল দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্বের বাহু।

নাম-মাত্র রাজস্বের বিনিময়ে যে বন্ধুত্বের পাশে বিষ্ণুপুরকে আবদ্ধ রেখেছিল মোগল বাদশাহেরা, মুর্শিদকুলি খাঁ সেই বন্ধুর রাজভাণ্ডারেও লোভের হাত বাড়াল।

আওরঙ্গজেব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার সুলতান আজিমুশ্বানের দেওয়ান নিযুক্ত করলেন মুর্শিদকুলি খাঁকে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আওরঙ্গজেবের সুনজরে পড়ে হায়দ্রাবাদ থেকে বাংলার দেওয়ানপদ নিয়ে ফিরে এল মুর্শিদকুলি। বাংলার জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে আলমগীরের প্রিয় হয়ে উঠল।

জমিদারের রাজস্বের ভার এসে পড়ল প্রজাদের ওপর। যে বিষ্ণুপুর শুধুমাত্র সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা উপভোগ করত, তাকেও করদ রাজ্যে পরিণত করতে চাইল মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্বের হাত বাড়াল সেদিকেও, বিক্ষোভ দেখা দিল বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের মনে।

মোগল বাদশাহদের অপেক্ষা ধর্মান্তরিত শাসকদের অত্যাচারই চিরকাল ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে হিন্দুর চোখে। মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচার তাই বিষ্ণুপুরের আশঙ্কা শতগুণ বাড়িয়ে তুলল। সকলেই আতঙ্কিত, হয়তো বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে তাকেও নবাবের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গোপনে রঘুনাথের নামকরণ করলে বিষ্ণুপুরের কালাপাহাড়।

বাঈজীর পায়ে সব ধর্ম-কর্ম ন্যায়-অন্যায় বিলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সুখে ডুবে আছে রঘুনাথ। লালবাঈয়ের প্রতিটি ইচ্ছাপূরণের জন্যেই যেন সমগ্র বিষ্ণুপুর অপেক্ষা করে আছে। রাজকোষ নিঃশেষ হতে চলেছে লালবাঈয়ের বিলাস চরিতার্থ করে। তাই প্রজাদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে।

মোগল আক্রমণের আতঙ্ক, রঘুনাথের আসক্তি এবং অত্যাচার এবার ইন্ধন জাগাল জ্যোতিষাচার্য, রাজপুরোহিত ও শাসকবর্গের ষড়যন্ত্রে। মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল রাজ-অন্তঃপুরে। কিশোর গোপালকে রাজবিদ্যায় দীক্ষিত করলেন প্রধান পুরোহিত। চন্দ্রপ্রভা নিঃসন্তান, সুতরাং উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসা করে রাখা প্রয়োজন বিষ্ণুপুরের স্বার্থে। কিন্তু রঘুনাথের কানে গেল না সে শঙ্খধ্বনি। প্রজারা আনন্দে জয়ধ্বনি করল, জ্যোতিষাচার্য ভবিষ্যৎ গণনা করে আনন্দ প্রকাশ করলেন ; সভাপণ্ডিত স্তোত্র উচ্চারণ করলেন রাজ্যের এবং গোপালের শুভায়ু প্রার্থনা করে।

প্রাসাদ ঘিরে দর্শন-ঝরোকার নীচে এসে জমায়েত হল প্রজারা। আন্তরিক উল্লাসে রঘুনাথের দর্শন কামনা করল। যুগ যুগ ধরে চিরন্তন রীতিতে এই দর্শন-ঝরোকার নীচে

এসে দাঁড়িয়েছে তারা প্রতি সূর্যোদয়ে। রাজদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করেছে রাজা হাম্বীর এবং রানী সুদক্ষিণাকে প্রণাম জানিয়ে, রাজা দুর্জন সিংহ এবং তাঁর পত্নীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, রাজা রঘুনাথ এবং রানী চন্দ্রপ্রভার যৌবনদিনের যুগলমূর্তিকে দেখে তুলনা করেছে মদনমোহন আর শ্রীরাধিকার যুগলমূর্তির সঙ্গে।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনুপস্থিতি ঘটেছে রঘুনাথের, লজ্জায় অসন্তোষে চন্দ্রপ্রভাও কুণ্ঠিত হয়েছে একাকিনী গবাক্ষে দাঁড়িয়ে প্রজাদের দর্শন দিতে।

তাই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। লালবাঈয়ের আলিঙ্গনে রঘুনাথ নাকি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, ভুলে গেছে প্রজাদের স্নেহ-ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর ঐকান্তিক কামনা।

দিনের পর দিন কেটে গেছে চন্দ্রপ্রভার, ব্যথা আর বিষাদ-ম্লান করে দিয়ে গেছে রূপোজ্জ্বল বধূরানীর মুখ। প্রজারা ব্যর্থ ব্যথাহত চোখের বিফল দৃষ্টি ফেলেছে রাজসমীপে, অনুশোচনার গুঞ্জন তুলে ফিরে গেছে তারা।

সব আঘাত সব অপমান সহ্য করেছে চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপালের দিকে ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সব নিরানন্দ মুছে ফেলতে চেয়েছে হৃদয়ের গভীর থেকে। সন্তানের অভাব দূর করেছে কিশোর গোপাল। রঘুনাথকে ভুলতে চেয়েছে তার মুখ চেয়ে।

কিন্তু লালবাঈ যেন রঘুনাথকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তৃপ্ত নয়। রাজ-সিংহাসনের দিকেও বুঝি লোভের হাত বাড়াতে চায় কাঞ্চনী।

গোপালের জন্মদিন উপলক্ষে রাজকোষ উন্মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন সভাপণ্ডিত। নিঃসন্তান রঘুনাথের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে গোপাল, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিত হল বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রতিটি প্রজা।

ভোজনতলার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ সজ্জিত হল মূল্যবান রং-ঝলমল চাঁদোয়ায়, আলোর মালা ফুটল লতাপুষ্পে সাজানো আম্রকুঞ্জে।

সুর ধরল রোশনচৌকির সানাই-বাদকের দল। সানাইয়ের সুর আনন্দে লহরা তুলল সিংহদ্বারের নহবতখানায়।

চন্দ্রপ্রভার সন্তানস্নেহ যে কিশোর গোপালকে কেন্দ্র করে, সেই গোপালের জন্মদিনে এই আনন্দের উল্লাসধ্বনি যেন অসহ্য মনে হল লালবাঈয়ের। কাম-মদির চোখের দৃষ্টিতে রঘুনাথকে অভিভূত করে কাঞ্চনীর অনুরোধ ফুটল।—আমাকে বিদায় দিন রাজাবাহাদুর, বিষ্ণুপুররাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি।

আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তুলে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, কেন কাঞ্চনী, আমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে কেন চলে যেতে চাও তুমি? না, না, লালবাঈয়ের রূপের সূর্য বিষ্ণুপুর থেকে অস্ত গেলে সমস্ত রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে।

কুটিল হাসিতে উদ্ভাসিত হল কাঞ্চনীর মুখ। বললে, শুধু মোহব্বতের জিঞ্জিরেই আশিককে বেঁধে রাখতে চান রাজাবাহাদুর!

—না লালী, শৃঙ্খলে নয়, আমার বাহুবন্ধনেই তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই। কি চাও তুমি বলো, কি পেলে তুমি খুশি হও?

মৃদু হেসে লালী উত্তর দেয়, লক্ষমুদ্রার একটি ময়ূরপঙ্খী চাই রাজাবাহাদুর, সে ময়ূরপঙ্খীতে শুধু তুমি আর আমি নৌকাবিহার করে বেড়াব লালবাঁধের স্রোতে।

রঘুনাথ সম্মতি জানিয়ে বলে, কিন্তু রাজকোষ হয়তো এ-অর্থ দিতে পারবে না লালী।

লালবাঈ অট্টহাসে হেসে ওঠে উন্মাদের মতো।

বলে, প্রজার অর্থই রাজার রাজকোষ। আদেশ দিন রাজাবাহাদুর, আপনার অনুজ গোপালের জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে আসার সময় রাজভাণ্ডারে যেন লক্ষ মুদ্রার

নজরানা জমা দিয়ে যায় প্রজার দল।

উদাস দৃষ্টি মেলে লালবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ নির্জীব ক্রীড়নকের মত বলে, তাই হবে লালী, তাই হবে।

খবর ছড়িয়ে পড়ল। দুঃস্থ দরিদ্র প্রজার দল শুনল, কিশোর গোপালের উদ্দেশে অর্পিত উপহার ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যয়িত হবে লালবাঈয়ের বিলাস-সামগ্রীর জন্যে।

নিরর্থক আক্রোশে জ্বলে উঠল চন্দ্রপ্রভা। উষ্মা প্রকাশ করলেন জ্যোতিষাচার্য আর সভাপণ্ডিত। দেওয়ানজি আর খাজাঞ্চি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকোষের সংগৃহীত অর্থ তুলে দিতে বাধ্য হলেন রঘুনাথের হাতে।

গজদন্তের কারুকার্যে শোভিত ময়ূরপঙ্খী লালবাঁধের জলে ভেসে উঠল। প্রজার রক্তমূল্যে কেনা দুর্মূল্য ময়ূরপঙ্খীতে গজল গানের রেশ ফুটে উঠল দূরের ভোজনতলার সানাইবাদ্যকে উপহাস করে।

সুরার পাত্র তুলে নিয়ে তন্দ্রাঘোরে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না লালী, ছেড়ে যেয়ো না। যা কামনা তোমার—সব, সব কিছু তোমার পায়ে তুলে দেব আমি।

কৌতুকের হাসি হেসে লালবাঈ প্রশ্ন করল, সম্মান ?

—হ্যাঁ, তাও পাবে কাঞ্চনী।

লালবাঈ বললে, অর্থ চাই না আমি রাজাবাহাদুর, ঐশ্বর্য চাই না। যে সম্মান আপনার পাটরানী চন্দ্রপ্রভার, সেই ইজ্জত পেতে চাই আমি।

—পাবে লালবাঈ, পাবে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে রঘুনাথ।

লালবাঈ প্রশ্ন করে, আপনার ভাই গোপাল সিংহের জন্মদিনে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছে, আপনার সন্তানের জন্যে কি সে আয়োজন হবে রাজাবাহাদুর ?

রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্তের মত লালবাঈয়ের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলল, হবে। নিশ্চয় হবে লালী।

ক্রমশই সন্দেহ ঘনীভূত হল প্রজাদের। আশঙ্কা দেখা দিল, রঘুনাথও হয়তো ইসলামধর্ম গ্রহণ করবে লালবাঈকে খুশি করবার জন্যে, হয়তো বা লালবাঈকে বিবাহ করে তাকেই বিষ্ণুপুরের পাটরানীর মর্যাদা দিতে চাইবে। তারপর কালাপাহাড়ের রূপ নিয়েই শুরু হবে রঘুনাথের অত্যাচার। হয়তো বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুর থেকে চিরতরে বৈষ্ণবধর্মই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

কালাপাহাড় !

মুর্শিদকুলি খাঁর মতই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়েছিল কালাচাঁদ রায়ের। একটাকিয়ার জমিদার বংশে। মাতৃকুল ছিল পরম বৈষ্ণব।

সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, অস্ত্রবিদ্যায় বীরোচিত গুণের অধিকারী।

গৌড় বাদশাহের দরবারে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল কালাচাঁদ। আর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাসভবন থেকে প্রতিদিন মহানন্দায় স্নান করতে যাবার সময় নবাবকন্যা দুলারী অপেক্ষা করত সুদর্শন সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবকের দর্শন পাবার আশায়।

বলিষ্ঠ রূপবান চেহারা, গলায় উপবীত, হাতে স্বর্ণময় কোষা, সুকণ্ঠে সঙ্গীতস্তোত্র। পিছনে চলত ছাতাবরদার।

বাদশাহ এবং বেগম বুঝলেন, এই রূপবান হিন্দু যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। একমাত্র কন্যাকে অসুখী করতে চাননি তাঁরা। তাই কালাচাঁদ

রায়কে বললেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দুলারীর পাণিগ্রহণ করো।

কালাচাঁদ অসম্মত হল।

বাদশাহ্ ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

জল্লাদ এগিয়ে এল কর্তব্যপালনের জন্যে।

আর সেই মুহূর্তে সপ্তদশী নবাবকন্যা মর্মর জাফরির আড়াল থেকে ছুটে এসে বললে, আগে আমায় হত্যা করো, তারপর আমার স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করবে।

মুগ্ধ হল কালাচাঁদ। বিস্মিত হল রূপবতী যবনীর দুঃসাহস দেখে।

দুলারীকে বিবাহ করতে সম্মত হল। কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে নয়। মুসলমানীকে বিবাহ করলেই বিধর্মী হতে হবে কেন, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না কালাচাঁদ। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে ধরনা দিল, দেবতার প্রত্যাদেশ জানবার জন্যে। শ্রীমন্দিরের পুরোহিতকুল, কালাচাঁদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই অপমানিত করল তাকে। সমাজপতিরা বললে, মুসলমানীকে বিবাহ করে ধর্মত্যাগী হয়েছে কালাচাঁদ।

সামাজিক অনুশাসনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কালাচাঁদ একদিন নিজেই অত্যাচারী হয়ে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ সাধন করবে।

স্বেচ্ছায় এবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল সে, নামকরণ হল মহম্মদ ফরমুলি। হিন্দু-ভারত কেঁপে উঠল কালাপাহাড়ের নামে।

জগন্নাথের প্রত্যাদেশ জানবার জন্যে একদিন পুরীধামে ধরনা দিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল কালাচাঁদ। তাই শাহি ফৌজের অধিনায়ক হয়ে প্রথমেই উৎকল ধ্বংস করতে এগিয়ে গেল কালাপাহাড়। দেবমূর্তি অপবিত্র করল, বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করল হিন্দু প্রজাদের। হিন্দু নারীর সতীত্ব আর কৌমার্যের অহঙ্কার টলে পড়ল লালসামত্ত শাহি ফৌজের আক্রমণে।

বনাগ্নির মতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাদের অত্যাচার। অভিযানের পর অভিযান। মুসলমান সমাজও শঙ্কিত হল, ব্যথায় কাতর হল হিন্দুর প্রতি কালাপাহাড়ের অত্যাচার দেখে।

কালাপাহাড়ের শাহী সৈন্য শুধু দেবমূর্তিই নয়, নারীলাঞ্ছনাতেও তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দুনারীর ধর্ম বিনষ্ট করার উৎসাহে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল শাহি ফৌজ।

মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করে অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়ে বারাণসীতে এসে পৌঁছল কালাপাহাড়। একটির পর একটি প্রাচীন দেবমন্দির ধ্বংস করে শেষে বারাণসীর কেদারেশ্বর-লিঙ্গ অপবিত্র করার নির্দেশ দিল।

বিধর্মীর চিৎকার তুলে ছুটে গেল সৈন্যরা।

এমন সময় রোরুদ্যমানা বৈধব্যের রূপ নিয়ে কালাপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল এক শুভ্রবাস বিধবা রমণী! কালাচাঁদ রায়ের মাতুলানী।

শ্বেতবসনা কাশীবাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল দেবদ্রোহী কালাচাঁদ। মনে পড়ল, এই মাতুলানীর স্নেহ আর মমতায় শৈশব কাটিয়েছে সে, মাতৃত্বে লালন করেছে তাকে এই বিধবার শুচিতা।

শুনল কালাচাঁদ। তারই লালসামত্ত সৈন্যের দল বিধবার ধর্ম বিনষ্ট করেছে।

অবলা এক নারীর উন্মাদ হতাশার দৃষ্টিতে বিবেক ফিরে পেল কালাপাহাড়। তার চোখের সামনে বিষপান করে অভিশাপ দিতে দিতে মৃত্যু বরণ করল বিধবা।

অনুশোচনা দেখা দিল তার মনে। অত্যাচার বন্ধ করার নির্দেশ দিল কালাপাহাড়। রক্ষা পেল কেদারেশ্বর-লিঙ্গ, রক্ষা পেল হিন্দুধর্ম। আর কালাপাহাড়?

পরদিন প্রত্যূষে শাহিরক্ষীর দল খুঁজে পেল না কালাপাহাড়কে। তন্নতন্ন করে, চতুর্দিকে

তল্লাসি পাঠিয়েও হদিস মিলল না।

হয়তো সন্ন্যাসী হয়েই হিমালয়ের কোনও অজ্ঞাত গুহায় প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টায় লোকচক্ষুর আড়ালেই মৃত্যু হল তার, হয়তো বা গঙ্গাগর্ভে আত্মহত্যা করল অনুশোচনায়।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত ইতিহাস কেউই জানে না। গ্রাম্য কিম্বদন্তীর মধ্যেই তা আবদ্ধ হয়ে আছে। সেই আতঙ্কই দেখা দিল প্রজাদের মনে।

এ-কাহিনী বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের অজানা নয়। আর গোপনে প্রজারা তার কালাপাহাড় নামকরণ করেছে, জানত রঘুনাথ।

আর সেজন্যই প্রজাদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ বেড়ে চলেছিল। আক্রোশ জ্যোতিষাচার্যের বিরুদ্ধে। সভাপণ্ডিতদের বিরুদ্ধে, উদবর্গ প্রজাদের বিরুদ্ধে।

তাই রঘুনাথের মন বলত, কালাপাহাড়ের একাদশ বর্ষের হিন্দুধর্মনাশের ব্রত হিন্দুরই সৃষ্টি। প্রেমের কাছে ধর্ম বড় নয়। মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় নয় সমাজ। প্রজাদের আক্রোশ নিরর্থক মনে হল রঘুনাথের কাছে।

সভাপণ্ডিতের সাবধানী শুনে হাসল রঘুনাথ। বললে, বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুরে কোনও দিন ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ছিল না। শ্রীচৈতন্য মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখিয়েছেন ; শৈশব থেকে শুনে এসেছি, সবার উপরে মানুষ সত্য। প্রেমই যদি সারবস্তু তবে ধর্মের প্রাচীর কেন তুলতে চান মানুষে মানুষে ?

—প্রেম আর ইন্দ্রিয়সুখ এক নয় রঘুনাথ।

কিন্তু রঘুনাথের মনে হয়েছে ইন্দ্রিয়সুখই প্রেম। লালবাঈয়ের লালসার আকর্ষণকে মনে হয়েছে অন্তরের আহ্বান। মনের দুর্বলতাকে মনে হয়েছে ন্যায়।

প্রজাদের মধ্যে প্রচারিত হতে শুরু হল নানা সংবাদ। তারা শুনল রাজা রঘুনাথের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই লালবাঈ নির্দেশের পর নির্দেশ দিয়েছে, ক্রীড়নকের মত লালবাঈয়ের ইঙ্গিতে রাজাদেশ উচ্চারণ করেছে রঘুনাথ। রাজকর্মচারীদের নামকরণ হয়েছে বাদশাহি নিয়মে, প্রাসাদের আদবকায়দা বদলেছে। সংস্কৃতশাস্ত্রের পণ্ডিতকুল নিষ্কর ভূসম্পত্তি হারিয়েছে অকারণে, পরিবর্তে রঘুনাথ ভূমিদান করেছে মুসলমান মৌলবিদের। ফারসিভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে রাজকোষের অর্থে, কিন্তু দেবভাষা শিক্ষাদানের জন্য বরাদ্দ সাহায্য বন্ধ হয়েছে।

শাসকমহলের প্রকৃত সংবাদ জানার উপায় ছিল না প্রজাদের পক্ষে। তারা বিশ্বাস করল সব গুজব।

রাস উৎসবের সময় রাজদরবারে সংকীর্তন হওয়ার ঐতিহ্য ছিল বিষ্ণুপুরের। সিংহাসন থেকে রাজা ও রানী নেমে আসতেন সভামধ্যে, কীর্তনে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে সদলে এগিয়ে যেতেন মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে। বীর হাম্বীর আর রানী সুদক্ষিণা এই প্রাচীন রীতি রক্ষা করে এসেছেন, দুর্জন সিংহ আর তাঁর পত্নী দরবারের আসন ত্যাগ করে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছেন কীর্তনের দলে।

প্রজাদের ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য ক্রোধে উন্মাদ করে তুলল রঘুনাথকে। জ্যোতিষাচার্য এবং সভাপণ্ডিতকেও অপমানিত করতে চাইল রঘুনাথ।

কিন্তু এমন হঠকারিতা কেউই বুঝি আশা করেনি রঘুনাথের কাছে। কেউই ভাবতে পারেনি, বধূরানী চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে রঘুনাথের পার্শ্বাসনে লালবাঈকে দেখতে পাবে।

রাস উৎসব উপলক্ষে দরবারে সমবেত প্রজারা ধিক্কার দিয়ে উঠল। ক্রোধে অপমানে অভিশাপ দিতে দিতে রঘুনাথ আর লালবাঈয়ের সামনেই সভা ত্যাগ করল তারা।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল লালবাঈ।

জানত না, রাজাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না রাজ্যকে। প্রজাদের, বিশেষ করে রাজকর্মচারীদের এ দুঃসাহস কল্পনাও করেনি সে।

শূন্য দরবারের মধ্যে হঠাৎ কুটিলহাস্যে হেসে উঠল লালবাঈ।

মনে মনে বললে, কাঞ্চনীর প্রতি প্রজাদের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ! বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাতে হবে এই অপমানিতা কাঞ্চনীরই পুত্রকে।

আঠাশ

রাস উৎসব উপলক্ষে বিষ্ণুপুর যে রীতি রক্ষা করে এসেছে যুগ যুগ ধরে, সেই রীতি লঙ্ঘন করল রঘুনাথ। অসম্মান দেখাল রানী চন্দ্রপ্রভাকে, অপবিত্র করল রাজসিংহাসন। তাই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে শঙ্কিত হয়ে উঠল প্রজাকুল। নিঃসন্তান রঘুনাথের সিংহাসনে একদিন হয়তো তার অবৈধ সন্তান এসে বসতে চাইবে। হয়তো রঘুনাথ নিজেই অনুজকে সরিয়ে সিংহাসনে বসাতে চাইবে লালবাঈয়ের সন্তানকে।

প্রতি বছরের মতই উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করে বসে ছিল চন্দ্রপ্রভা। গোপালকে সাজিয়েছিল মদনমোহনের বেশে। কিশোর গোপালের মাথায় ময়ূরপেখমের চূড়া, কপালে কপোলে চন্দনের টিকা, অঙ্গে পীতবাস।

দাসদাসী-পরিবৃত হয়ে গোপালকে কাছে নিয়ে রঘুনাথের অপেক্ষায় বসে ছিল চন্দ্রপ্রভা। মুগ্ধ দৃষ্টি তার গোপালের মুখের দিকে।

'সর্বত্র তাঁহার রূপ করে ঝলমল, সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল'। মৃদঙ্গ আর খোল-করতালের মৃদু মৃদু ধ্বনি আর গৌরচন্দ্রিকার নিঃসঙ্গ সঙ্গত ভেসে আসে মদনমোহনের মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে।

গোপালের মধুর মুখচন্দ্রের দিকে স্মিতহাসে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কল্পনার চোখে যেন আরাধ্যের কিশোররূপ দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভা। কৃষ্ণকেলি অঙ্গবাসে সুসজ্জিত দেহরূপ, চন্দন অগুরু কস্তুরির সুবাস, কণ্ঠে সুবর্ণ মাদুলি, বাহুবন্ধে মুক্তালহরী, ফুলমালায় জড়ানো কুঞ্চিত কেশ।

মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে সুকণ্ঠী বৈষ্ণবীদের পদলহরীর সুরমাধুর্য ভেসে আসে। 'পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ, ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত। ছলছল নয়নে কমল সুবিলাস, নব নব ভাব করত প্রকাশ। পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ, রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥'

এই রূপ দেখেই বুঝি শ্লথবসনা শচীদেবীর চক্ষে নেমেছিল অবিরল অশ্রুধারা, আলুলায়িত কেশে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে একবার ঘর আর একবার বাহিরে ছোটাছুটি করেছিলেন তিনি, জীবনমরণ জীবের অনন্যশরণ দেবতার পথ চেয়ে।

চন্দ্রপ্রভাও যেন তেমনই অপেক্ষা করে বসে আছে রঘুনাথের পথ চেয়ে। 'বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা। সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা ॥'

নিজের মনকে মান অপমানের উর্ধ্বে নিয়ে গেছে চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু গোপালের ভবিষ্যৎ ভুলবে কি করে!

বিষ্ণুপুররাজের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে মোহনবেশে সজ্জিত করে এই উৎসব-দিনে

রাজদরবারের সিংহাসনে বিষ্ণুপুরপতির পাশে বসে প্রজাদের দর্শন দেওয়া প্রাচীন রীতি।

কে জানত সে-রীতি লঙ্ঘন করবে রঘুনাথ !

দাসীরা ছুটে এল আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে। শুনল চন্দ্রপ্রভা।

শুনল, রাজদরবারে লালবাঈকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেছে রঘুনাথ ; সিংহাসনে বসেছে বিষ্ণুপুরের পাটরানী চন্দ্রপ্রভা নয়, সুরসাধিকা লালবাঈ।

রানী চন্দ্রপ্রভাকে কোনও দিন রঘুনাথ এভাবে অপমানিত করতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি প্রজাকুল।

সন্তানতুল্য গোপালের স্বার্থ ভেবে বিচলিত হয়ে উঠল চন্দ্রপ্রভা। দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামল।

ধীরে ধীরে উঠে এল চন্দ্রপ্রভা। দাসীদের দৃষ্টিও যেন অসহ্য মনে হল তার।

প্রসাধনকক্ষে দ্বার বন্ধ করে কাঁদল চন্দ্রপ্রভা।

তারপর বহুমূল্য বেশভূষা ত্যাগ করে শরীরে জড়াল বৃন্দাবনী দেহবাস, কৃষ্ণচূড়া কবরী বাঁধলে সযত্নে। গঙ্গা-মৃত্তিকার রসকলি আঁকলে রসপূর্ণ চাঁদ-ঢলঢল মুখে।

সুরঞ্জাক্ষীকে বললে, চলো, কীর্তনের আসরে চলো।

দাসী-পরিবৃতা হয়ে রাসমঞ্চে উপস্থিত হল চন্দ্রপ্রভা।

রানী চন্দ্রপ্রভার জয়ধ্বনি তুলল বিক্ষুব্ধ জনতা।

তারপর পুনরায় কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠল মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বিভোর আনন্দে কীর্তনদলের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দিল চন্দ্রপ্রভা। নারী-পুরুষের মিছিলে মিশে গেল।

সংকীর্তনের দলে রানী চন্দ্রপ্রভাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল প্রজারা।

ভারতবর্ষে কোনও দিনই নারীকে অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করতে হয়নি। রাজসভায় সকলের সম্মুখে সিংহাসনে আসীন হয়েছে বহু সম্রাজ্ঞী, সমান প্রভাব বিস্তার করেছে রাজকার্যে। ইন্দ্রিয়াসক্ত নবাব-বাদশাহ্ আর দস্যু ভুঁইয়াদের ভয়ে, মোগল সমাজের বোরখা-প্রথা আর মোগল হারেমের অনুকরণেই নারীকে অন্দর-মহলের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল এই সমাজ। অবগুণ্ঠন টেনে অসূর্যম্পশ্যা করে রেখেছিল তাকে। শাসকবর্গের আচার-বিচার অনুকরণ করা সাধারণের ধর্ম, তাই মোগলযুগে হিন্দুসমাজ তার নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলে অনুসরণ করেছে মোগল আচার, নবাবি অনাচার।

মোগলের অন্নপুষ্ট হিন্দু কর্মচারী আর ভূস্বামীরা উৎসাহ দিয়েছে এই অনুকরণে। অনুদার সমাজপতির দল আতঙ্কে শিউরে উঠে সমাজকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে, অন্যায়ের প্লাবনকে রোধ করতে চেয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর গেঁথে।

ফলে, শক্তি আর আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে হিন্দুধর্ম। অনুশাসনের অত্যাচারে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে হিন্দু প্রজারা।

শ্রীচৈতন্যের উদারতা, তাঁর ভেদাভেদ বিলোপের বাণী উদ্বুদ্ধ করেছিল সমগ্র মানুষের চিন্তাধারাকে, মুক্তির আলোক দেখিয়েছিল হিন্দুসমাজকে। বর্ণাশ্রমের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'আমার গোরা জাতের বিচার মানে না রে—দেখবি যদি আয় সকলে।'

বৈষ্ণবরাজ্যে বিষ্ণুপুর সেই বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল। মোগল-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের মত নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করেনি। তাই নারী-পুরুষের মিছিলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চন্দ্রপ্রভার সংকীর্তন গান অস্বাভাবিক মনে হয়নি সেদিন।

বিস্মিত নয়, মুগ্ধ হয়েছিল জনতা।

মুগ্ধ হয়েছিল কৃষ্ণমোহন।

ধূলি-ধূসরিত দেহ চন্দ্রপ্রভার। কণ্ঠে সুমধুর কীর্তন। সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশবাসে সজ্জিতা চন্দ্রপ্রভার দিকে আপনা থেকেই যেন আকৃষ্ট হল কৃষ্ণমোহন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে।

চন্দ্রপ্রভা তখনও ভাবে বিভোর। চোখের দৃষ্টি তার মোহাবিষ্ট। মুখে অস্ফুট পদগুঞ্জন।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল কৃষ্ণমোহন।

একে একে কীর্তনের ঐকতান থেমে গেল। নিস্তব্ধ হল মন্দির-প্রাঙ্গণ। কিন্তু তন্ময়তা ভাঙল না চন্দ্রপ্রভার।

কৃষ্ণমোহন একাগ্র মনে কান পেতে রইল। চন্দ্রপ্রভার সুমধুর ধীরস্বরের পদলহরীর দিকে।

শান্তস্বরে ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে গেয়ে চলে চন্দ্রপ্রভা : 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়। রাই এমন কেন বা হৈল ?'

মৃদু গুঞ্জন থেমে এল ক্রমশ। তন্ময়তা কাটল চন্দ্রপ্রভার। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল। যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে ফিরে এল জাগ্রত পৃথিবীতে। আর চোখ তুলে তাকাতেই দেখলে সুদর্শন এক যুবক অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে।

অস্ফুটে চন্দ্রপ্রভা বললে, কে তুমি ?

—আমি কৃষ্ণমোহন।

মৃদু তৃপ্তির হাসি খেলে গেল চন্দ্রপ্রভার চোখে।

বললে, এসো। আমার সঙ্গে চলো কৃষ্ণমোহন, আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছ এতদিন, আজ তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

চন্দ্রপ্রভাকে অনুসরণ করে প্রাসাদকক্ষে এসে পৌঁছল কৃষ্ণমোহন। মনে উৎকণ্ঠা। পদক্ষেপ শঙ্কিত।

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বললে, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে কৃষ্ণমোহন। বলো, সে ভিক্ষা তুমি মঞ্জুর করবে। এতদিন ভুল পথে চলেছিলাম, ভুল করে সব হারিয়ে ফেলেছি কৃষ্ণমোহন ! তাই একটি ভিক্ষা চাই তোমার কাছে।

কৃষ্ণমোহন বললে, বিষ্ণুপুরের রানী আপনি, দরিদ্র কৃষ্ণমোহন কি আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে ?

—পারে কৃষ্ণমোহন। চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিল। বললে, সব ঐশ্বর্য থেকেও আমার একটি ঐশ্বর্য নেই, কণ্ঠে সঙ্গীত নেই আমার। আমাকে গান শেখাতে পারো কৃষ্ণমোহন ?

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বললে, আপনি আমার সব অহঙ্কার ভেঙে দিয়েছেন আজ, আপনার কণ্ঠে পদাবলীর সুরমাধুর্য শুনে সব ভুল ভেঙে গেছে।

সত্যই বুঝি ভুল ভেঙে গেছে কৃষ্ণমোহনের। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেই এতদিন মর্যাদা দিয়ে এসেছে সে। আর সারা বাংলায় সেই সঙ্গীতের প্লাবন আনবার জন্যেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। দুরূহ রাগরাগিণীকে আয়ত্তে এনেছে, বিজাতীয় ভাষার বন্ধন থেকে সুরকে মুক্তি দিয়ে নিজেই রচনা করেছে বাংলার গান, বাংলা ভাষাতেও যে সুর-মাধুর্য ধরা দেয় তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু যে ভাবলোকে পৌঁছানোর জন্যে এই সঙ্গীতসাধনা, তা এত সহজভাবে এমন মধুর রূপ নিয়ে কখনও কানে বাজেনি।

চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠের সুরগুঞ্জন বুঝি সেই ভাবলোকে পৌঁছে দিল কৃষ্ণমোহনকে।

চন্দ্রপ্রভা বললে, আমাকে গান শেখাতে হবে কৃষ্ণমোহন, যে গান শুনে বিষ্ণুপুররাজ তন্ময় হয়ে থাকেন, লালবাঈয়ের কণ্ঠে যে গান শোনবার জন্যে ছুটে যান তিনি, সেই গান আমাকে শেখাতে হবে।

ব্যথায় ছলছল করে উঠল কৃষ্ণমোহনের দুটি চক্ষু। বুঝল কৃষ্ণমোহন, কোন ব্যর্থতাকে জয় করবার জন্য চন্দ্রপ্রভার এই দুর্জয় সাধনা।

সম্মতি জানাল কৃষ্ণমোহন। কিন্তু...

—কিন্তু?

—আপনার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধুর সঙ্গীত আমাকে শেখাবেন আপনি। সব রাগরাগিণীকে আয়ত্তে এনেও অনুরাগকে আয়ত্তে আনতে পারিনি, আজ প্রথম বুঝতে পেরেছি।

কৌতুকের হাসি হাসল চন্দ্রপ্রভা। তারপর মৃদঙ্গে মৃদুমধুর ধ্বনি তুলে ধীর-স্বরে গাইতে শুরু করল। গাইলে: 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে, মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে, বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে, আলিপন দেওব মোতিম হার, মঙ্গলকলস করব কুচভার॥'

তন্ময় হয়ে গেল কৃষ্ণমোহন এই অনাস্বাদিত গানের মূর্ছনায়। এ যে এক ভিন্ন জগতের পরিচয় পেয়েছে সে, স্পর্শ পেয়েছে ভিন্ন সুরলোকের।

ভাবাবেশে গেয়ে চলে চন্দ্রপ্রভা। মুখে মৃদু তৃপ্তির হাসি।

নিমীলিত আঁখির তন্ময় বিহ্বলতায় ডুবে থাকে কৃষ্ণমোহন।

কেউ লক্ষ করে না, একটি দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে কক্ষে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চন্দ্রপ্রভা আর কৃষ্ণমোহনের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথ। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে ফিরে যায়।

ফিরে এল রঘুনাথ।

যেমন নিঃশব্দ পায়ে চন্দ্রপ্রভার কক্ষদ্বার থেকে ফিরে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করলে লালবাঈয়ের প্রমোদভবনে।

গাঢ় লাল পারস্য-গালিচার ওপর উজ্জ্বল আলোর ঝলমলানি। ঝরোকার তারা-ঝিকমিক আকাশের দিকে তাকিয়ে রুপালি জরির ঝিলমিলে সাজানো বহুমূল্য পালঙ্কে শরীর এলিয়ে শুয়ে ছিল লালী।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে রঘুনাথ।

আনারের দানার মতো সুন্দর একটি মুখ, সুশুভ্র মসলিনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে গোলাপের পাপড়ির মত কমনীয় দেহবর্ণ। শরীরে যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গ। সুপুষ্ট বেণীর গা বেয়ে যেন অবহেলায় বুকের ওপর নেমে এসেছে চম্পাবরন ওড়নার প্রান্ত। উজ্জ্বল আলোয় চমক দিচ্ছে ওড়নার সলমা আর চুমকির সারি। মরালগ্রীবায় মুক্তার লহরী, মণিবন্ধে হীরে আর চুনী বসানো কঙ্কণ। ক্ষীণকটি ঘিরে বিচিত্র চন্দ্রহার। পায়ে কঙ্কাকৃতি মঞ্জরীবন্ধন।

মনে মনে যেন লালবাঈকে চন্দ্রপ্রভার রূপের সঙ্গে তুলনা করলে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার রূপ শান্ত স্নিগ্ধ। লালবাঈয়ের এই উদ্দাম যৌবনের বহ্নিশিখা নেই চন্দ্রপ্রভার দেহে। নেই কোনও কামনালুব্ধ আকর্ষণ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল রঘুনাথ। বললে, আসমানের গায়ে কাকে খুঁজছ লালী?

চমকে ফিরে তাকাল লালী। মৃদু হাসি খেলে গেল তার চোখের নীল তারায়।

কৌতুকে হেসে উঠল লালী। বললে, দেখছি আসমানের চাঁদ আমাকে দেখে শরমে

মরে কি না।

রঘুনাথ মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে কাছে এগিয়ে গেল, লালীর পায়ের কাছে বসল বিনীত ভৃত্যের মতো।

—কি ভাবছ লালী ? মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে রঘুনাথ।

মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসল লালী।

বললে, আমাকে চলে যেতে হবে, আমাকে মুক্তি দাও রাজাবাহাদুর।

—না, না। বিচলিত হয়ে উঠল রঘুনাথ। বললে, তুমি চলে গেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন, কেন চলে যেতে চাও তুমি ?

মনের গোপনে হাসল লালী। তার রূপের আকর্ষণে, তার কামনার আগুনে রঘুনাথকে দগ্ধ করতে চায় লালী। চলে যেতে চায় না, মুক্তি দিতে চায় না সে রঘুনাথকে।

তবু মাঝে মাঝে অনুরোধ করে, আমাকে চলে যেতে দাও, মুক্তি দাও রাজাবাহাদুর।

লালী জানে তার এই অভিনয়কে সত্য মনে করে শিউরে ওঠে রঘুনাথ। চঞ্চল হয়ে ওঠে লালীকে হারাবার ভয়ে।

বলে, তোমার কোনও ইচ্ছাই তো আমি অপূর্ণ রাখিনি, তবু কেন আমার জীবনকে অন্ধকার করে দিয়ে চলে যেতে চাও ? না, না, যেতে পাবে না তুমি।

মুখে বিপদের ছায়া টেনে আনে লালী। বলে, না রাজাবাহাদুর। আমার অনুরোধ রক্ষা করে রাজসিংহাসনেও আসন দিয়েছ, হোক একদিনের জন্যে, তবু সেই গর্বেই আমি সুখী। কিন্তু তোমার প্রজারা অপমান করেছে আমাকে, সভা ত্যাগ করেছে তোমার সামনেই। ম্লেচ্ছ বলে, কাঞ্চনী বলে উপহাস করেছে তারা আমাকে।

রঘুনাথ উত্তর দেয়, কিন্তু রাজদরবারের বাইরে তো তোমার কোনও অসম্মান হতে দিইনি প্রিয়া।

মৃদু হাসে লালী। বলে, আমি নিজের সম্মান চাই না—চাই...

—কি চাও, বলো ? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে রঘুনাথ।

উত্তরে আসে, আমি...আমি...

হঠাৎ লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে লালীর। কি যেন বলতে চায় সে, বলতে পারে না।

লালীর কোমল শরীরকে মৃদু আলিঙ্গনে কাছে টেনে নেয় রঘুনাথ। বলে, কি চাও লালী ? বলো, বলো তুমি...

ধীর লজ্জিত স্বরে লালী উত্তর দেয় চোখ না তুলেই। বলে, তোমার সন্তানের অপমান আমি সইতে পারব না, তোমার...

বিস্ময়ে লালীর মুখের দিকে তাকায় রঘুনাথ। বলে, না না, তার অসম্মান আমি হতে দেব না লালী, হতে দেব না।

—কিন্তু সামান্যা এক বাঈজীর সন্তানকে কে সম্মান দেবে রাজাবাহাদুর ? কোন্ ইজ্জত নিয়ে মুখ তুলে তাকাবে সে মানুষের দিকে ? তার চোখের সামনে গোপাল পাবে কুর্নিশের পর কুর্নিশ, আর সে পাবে শুধু উপহাস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঘুনাথ। বিষাদকরুণ কণ্ঠে বলে, কিন্তু কি উপায় আছে লালী ? কি করতে পারি আমি ? বিষ্ণুপুরের প্রজারা রাজপত্নী বলে স্বীকার করবে না কাঞ্চনী নারীকে। তার চেয়ে, চলো লালী, রাজ্যের লোভ নেই আমার, চলো বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যাই। কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না, কেউ...

অট্টহাসে হেসে উঠল লালী। বললে, এত দুর্বল তুমি ? এত ভয় তোমার প্রজাদের ? তা হলে আমিই চলে যাই রাজাবাহাদুর, নিষ্কণ্টক হবে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রপ্রভা শান্তি পাবে, তুমি শান্তি পাবে।

অনুরোধের উষ্ণ স্পর্শে লালীর দুটি কোমল হাত চেপে ধরল রঘুনাথ। বললে, না, না লালী। তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব, কি চাও তুমি বলো লালী, বলো।

পালঙ্ক থেকে ঘুমন্ত সন্তানকে তুলে এনে রঘুনাথের সামনে দাঁড়াল লালী। বললে, আমাদের সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে বসাতে চাই রাজাবাহাদুর। দৃঢ়কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল লালী। যেন অনুরোধ নয়, আদেশ।

ঊনত্রিশ

সুবে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হল মুর্শিদাবাদে। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর নাম থেকে পত্তন হল নতুন রাজধানীর।

হায়দ্রাবাদ থেকে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলায় এসেছিল মুর্শিদকুলি। এসে দেখলে, সম্রাটের স্নেহভাজন বলেই তার ওপর সম্রাটপৌত্র নবাব আজিমুশ্বান বিরূপ ভাব পোষণ করে আছে।

নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এই ভয়ে পদে পদে মুর্শিদকুলির কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলে আজিমুশ্বান।

দিল্লীশ্বরের চরিত্র অজ্ঞাত ছিল না মুর্শিদকুলির, জানত পিতা পুত্র আত্মীয় বান্ধবের সম্পর্ক বড় নয় তাঁর কাছে। বিধর্মীর প্রতি অত্যাচার আর রাজকোষের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই তাঁর কাছে জীবনের মূলমন্ত্র। তাই দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রাজস্ববৃদ্ধির জন্যে নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করল মুর্শিদকুলি, আর হিন্দু ভূস্বামীদের উত্যক্ত করে তুলল দিনের পর দিন।

শান্তিপ্রিয় আজিমুশ্বান বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠাল দেওয়ান মুর্শিদকুলি। আওরঙ্গজেব বুঝলেন, অপদার্থ আজিমুশ্বান বাধার সৃষ্টি করছে শাসনকার্যে। আদেশ দিলেন নবাবকে, বাংলা ছেড়ে বিহারে বাস করার। নিষ্কণ্টক হল মুর্শিদকুলি, পত্তন হল নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদ।

আজিমুশ্বান পাটনায় সরে গেল আলমগীরের আদেশে। হাবশি সুলেমান তখন সুবে বাংলার দো-হাজারি মনসবদার। রহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে আজিমুশ্বানের জীবন এবং সম্মান বাঁচানোর পুরস্কার হিসেবে নবাবের কাছ থেকে খেলাত পেয়েছিল হাবশি সুলেমান, মনসবদার নিযুক্ত হয়েছিল।

ক্রমশ মুর্শিদকুলিরও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল সুলেমান। মুর্শিদকুলি বুঝল, এমন ভয়ঙ্কর নৃশংসতা আর আজ্ঞাবহের বিশ্বস্ততা অন্য মনসবদারদের মধ্যে অনুপস্থিত।

তাই বিষ্ণুপুররাজের নামে রাজস্বের পরোয়ানা দিয়ে মুর্শিদকুলি বললে, এই পরোয়ানা নিয়ে বিষ্ণুপুরে যাও সুলেমান, আর সঙ্গে নিয়ে যাও পাঁচশো রিসাল্হা সৈন্য। প্রাচীন সন্ধিশর্ত অনুযায়ী বহুকাল থেকে সন্ধিমূল্য এসে জমা হয়নি রাজভাণ্ডারে, তাই সে শর্ত তামাদি হয়ে গেছে, বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে হবে বিষ্ণুপুরকেও।

পরোয়ানা নিয়ে বিষ্ণুপুর যাত্রা করল সুলেমান। পাঁচশো অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরের পথ ধরল। ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ধুলোর ঘূর্ণি উঠল রাঢ়ভূমির মাটিতে। বাংলার প্রজা এবং জমিদারের দল বিস্ময়ে আতঙ্কে চেয়ে রইল সেদিকে।

আর সুলেমানের মনে গুন গুন ধ্বনি তুলল এক নতুন আশা।

লালবাঈ! লালবাঈ!

বর্ধমানের যুদ্ধপ্রান্তে রহিম খাঁর মৃত্যু হওয়ার পর চিতোয়া-বরদা অভিমুখে যাত্রা

করেছিল সুলেমান। বিবিবাজারের সেই রূপসী বাঁদীকে বন্দী করে নিয়ে আসবে এই ছিল তার স্বপ্ন।

কিন্তু হতাশ হয়েছিল সুলেমান। বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ দুর্গ আক্রমণ করে শোভা সিংহের কন্যার সঙ্গে লালবাঈকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে, এ খবর শুনে নিরাশ মনে ফিরে এসেছিল। আলমগীরের সঙ্গে সন্ধিশর্তে আবদ্ধ বন-বিষ্ণুপুর, জানত সুলেমান। তাই বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে আক্রোশ পুষে রেখে ফিরে আসতে হয়েছিল সেদিন।

মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা পেয়ে সেই বিস্মৃত কামনা আবার নতুন করে জেগে উঠল মনে।

আর মুর্শিদকুলি উল্লসিত হল সুলেমানের আগ্রহ দেখে।

একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর সন্ধিশর্তে নামেমাত্র করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কোনওদিনই সম্রাটের সামান্য প্রাপ্য করও পাঠায়নি বিষ্ণুপুর। এবার দেওয়ানের পরোয়ানা কিন্তু তাকে সাধারণ ভূস্বামীতে পরিণত করতে চায়। একে একে সমগ্র বাংলার হিন্দু ভূম্যধিকারীদের শক্তি খর্ব করতে চায় মুর্শিদকুলি, খর্ব করতে চায় তাদের ধনবল ও বাহুবল।

কিন্তু মোগলরাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজার আক্রোশ শোভা সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়নি, মুর্শিদকুলি জানত। তাই দুজন ব্রাহ্মণ যুবককে সহকারী নিযুক্ত করল বাংলার দেওয়ান। ভূপতি রায় ও কেশরী রায়।

হিন্দুর শক্তি অপহরণের জন্যে হিন্দুকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করল মুর্শিদকুলি। দেওয়ান থেকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজস্ব বৃদ্ধি করেই তৃপ্ত রইল না। হিন্দু ভূমিপতিদের প্রায় সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল, জমির মালিকানা এল নবাবের হাতে, সরাসরি প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হল। উপস্বত্ব ভোগের অধিকার রইল না রাজা ও জমিদারের।

বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করল কোনও কোনও জমিদার। সৈন্য পাঠিয়ে তাদের বন্দী করে আনল নাজির আহমদ আর রেজা খাঁ—মুর্শিদকুলির বিশ্বস্ত কর্মচারী।

প্রকাশ্য পথের ধারে গাছের শাখায় পা বেঁধে বাদুড়ের মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হল জমিদারদের। হিন্দুধর্মকে উপহাস করার জন্যেই পুরীষকুণ্ডের নামকরণ হল 'বৈকুণ্ঠ'। কখনও বা এই ব্যঙ্গবৈকুণ্ঠে ফেলে দেওয়া হল তাদের।

দেবমন্দির ভেঙে গড়ে উঠল অসংখ্য মসজিদ।

সারা ভারতেই তখন এই অরাজকতা, এই অত্যাচার। তাঁর স্বপ্নের তাজমহল নির্মাণ করতে গিয়ে সাজাহান রাজকোষ নিঃস্ব করে দিয়ে গেছেন। অথচ দিকে দিকে তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে হিন্দু ও পাঠান। নিজের রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের উপরও আওরঙ্গজেবের আস্থা নেই। রাজকোষ পূর্ণ করার জন্যে সমস্ত প্রজার ওপর রাজস্ব চাপিয়ে দিলে মুসলমান সৈন্য ও রাজকর্মচারীরাও হয়তো বিরুদ্ধাচরণ করবে, সেই আতঙ্কে হিন্দু রাজা, ভূস্বামী, প্রজাদের শোষণ করাই তাঁর মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিলেন এভাবেই উচ্চবর্গের মুসলমানদের তুষ্ট করতে পারবেন। শুধু নিজের ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুবিদ্বেষের জন্যই নয়।

অত্যাচার থেকেই জন্ম হয়েছিল শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্যের—রাঢ়বাসীরা স্বপ্ন দেখেছিল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার। মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচারও তেমনি এক নতুন বিদ্রোহে প্রাণসঞ্চার করল। অথচ অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করতে না পারলে আলমগীরকে তুষ্ট করা যাবে না।

সেজন্যই অভ্যুদয় ঘটল সীতারাম রায়ের।

দস্যুপতি সীতারাম রায় বাংলার অধিবাসীদের মনে আশার সঞ্চার করল, যে আশার আলো দেখতে পেয়েছিল তারা শোভা সিংহের বিদ্রোহে। অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের প্যর্থক্য, রাজার সঙ্গে প্রজার যে বিভেদ তা স্পষ্ট চোখে দেখতে পায়নি সেদিনের অধিবাসীরা। আপন দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী করেনি সামন্ততন্ত্রকে। ভেবেছে, সব দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে ধর্মের ওপর বিধর্মীর জেহাদ। রাজশক্তির নামকরণ করেছে মুসলমান শক্তি। নবাব-বাদশাহরাও সেই একই ভুল করেছে। প্রজার কাতরোক্তিকে ভেবেছে ইসলামের প্রতি কাফেরের অভিশাপ।

স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভুঁইয়ারা একে একে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে, বিদ্রোহ দমন করেছেন আলমগীর। কিন্তু প্রজাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করতে পারেননি তিনি। দস্যুপতি, চরিত্রহীন, স্বার্থপর ভুঁইয়ারাও গৌরবের সম্মান পেয়েছে প্রজাদের কাছে—কারণ রাজাকে কোনও দিনই তারা ঋষিরূপে কল্পনা করেনি। রাজাকে দেখেছে দারিদ্র্যের একমাত্র উপাস্য দেবতা হিসেবে, দেখেছে ধর্মরক্ষকের ভূমিকায়! ধার্মিক হওয়া নয়, ধর্ম রক্ষা করাই ছিল রাজার কর্তব্য।

তাই সীতারাম রায়ের অভ্যুত্থানে গৌরব বোধ করেছে বিষ্ণুপুরের প্রজারাও। কিন্তু হতাশ হতে হল তাদের, হতাশ হতে হল রঘুনাথের আচরণে।

বিদ্রোহ নয়, রঘুনাথ নিজেই তখন বিধর্মী আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। লালবাঈয়ের নির্দেশে ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের রাজকার্যে তখন নিযুক্ত হচ্ছে বিদেশী মুসলমান কর্মচারী, সৈন্যবিভাগে প্রবেশাধিকার ঘটছে তাদের।

কারণ লালবাঈও ভেবেছে তার স্বধর্মের মানুষই তাকে আশ্রয় দিতে পারে, তাদের সাহায্যেই তার সন্তানকে সিংহাসনে বসাতে পারে।

তবু সহ্য করে চলেছিল বিষ্ণুপুরের প্রজারা। সহ্য করেছিল প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করে যেদিন লালবাঈকে দরবারে সম্মানের আসন দিয়েছিল রঘুনাথ। কিন্তু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তারা একটি মাত্র সংবাদে। বিচলিত বোধ করল সমগ্র বিষ্ণুপুর।

লালবাঈয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ গোপন রেখেছিল রঘুনাথ, গোপনে দিনের পর দিন তাকে সন্তানস্নেহে লালন করে চলেছিল। কিন্তু যথাসময়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল সে খবর। তবু এতখানি আতঙ্কিত বোধ করেনি প্রজারা।

অমঙ্গল দেখতে পেয়েছিলেন জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, উচ্চকোটি শাসকবর্গ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজারা শুনল, এই সন্তানকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে রঘুনাথ। আর শুনল মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা নিয়ে পাঁচশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক হয়ে এসেছে হাবশি সুলেমান। সুলেমানের আগমনকে তাই চক্রান্ত মনে করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সকলে।

এদিকে রঘুনাথ সসম্মানে অভিনন্দন জানাল সুলেমানকে। পরোয়ানা গ্রহণ করে দেওয়ানজিকে আদেশ দিল, নবাব-প্রতিনিধি সুলেমান খাঁর আতিথ্যে যেন ত্রুটি না ঘটে!

সুলেমানকে বললে, আমার রাজ্য থেকে যেন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ফিরে যাবেন না সুলেমান খাঁ। বিষ্ণুপুর কোনওদিন আতিথ্যের ত্রুটি দেখায়নি।

হাবশি সুলেমান সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসল।

বললে, কিন্তু আমার বাসনা হয়তো অতৃপ্তই থাকবে রাজাবাহাদুর।

বিস্ময়ের চোখে তাকাল রঘুনাথ। প্রশ্ন করলে, কি আপনার বাসনা সুলেমান খাঁ? ধন ঐশ্বর্য বা বাহুবলে যদি তা সম্ভব হয় তা হলে বিষ্ণুপুর আপনার ইচ্ছাপূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে!

সুলেমান সহাস্যে বললে চিতোয়া-বরদা থেকে যে হুরীকে বন্দী করে এনেছিলেন, সেই

লালবাঈয়ের গান আর নাচ আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাজাবাহাদুর।

চমকে উঠল রঘুনাথ। মুহূর্তের জন্য অপমানিত বোধ করলে। কিন্তু মুর্শিদকুলির প্রতিভূকে অসন্তুষ্ট করার সাহস হল না। প্রজার আস্থা হারিয়ে নিজেকে বড় দুর্বল বোধ করে রঘুনাথ।

তাই ধীরে ধীরে বললে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিষ্ণুপুরে এসেছেন, আপনার ক্লান্তি দূর করতে পারে একমাত্র লালবাঈয়ের গান। দুঃখের কারণ নেই সুলেমান খাঁ, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রেখে ফিরে যেতে হবে না আপনাকে।

লালবাঈয়ের কাছে এসে অনুনয়ে ভেঙে পড়ল রঘুনাথ। —মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা এনেছে সুলেমান, আমার রাজ্যের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে লালবাঈ। তোমার গান শুধু বাঁচাতে পারে আমার সম্মান।

হাসল লালবাঈ। —বিষ্ণুপুর রাজ্যের কিস্মত শুধু একটা গান?

ফরাসদের হুকুম দিল লালবাঈ।

ওলন্দাজ ঝাড়লণ্ঠনের সারি পুনরায় শতশিখায় জ্বলে উঠল জলসামহলে। রং-ঝলমল কাশ্মীরি গালিচায় আর মখমলের পর্দায় ঠিকরে পড়ল সে আলো। সারেঙ্গিবাদকের দল ভিড় করে এল। এল রূপসী জরিয়া দাসীর দল। সোনালি তবকে মোড়া কস্তুরিপান আর সুগন্ধ সিদ্ধির শরবত। অগুরু আতরের ধারাবর্ষণ।

গির্দায় হেলান দিয়ে বসল হাবশি সুলেমান। মসিকৃষ্ণ দৈত্যের মত চেহারা, মুখে বীভৎস হাসি।

রহিম খাঁর রংমহলে একদিন রহিম খাঁকে যেভাবে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতে দেখেছিল—বিবিবাজারের বাঁদীকে যার সামনে নাচের ঘূর্ণিতে ওড়না ওড়াতে দেখেছিল একদিন—ঠিক সেই বাদশাহি ভঙ্গিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে অপেক্ষা করল সুলেমান।

আজ আবার লালবাঈকে দেখতে পাবে সে, শুনতে পাবে তার গান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কামনা তার মনে। তার ধারণা, বিষ্ণুপুররাজের কাছে লালবাঈ শুধুই এক বেতনভুক কাঞ্চনী।

সুলেমান দেখতে চায়, আজ এই সম্মানের আসনে তাকে দেখে সেই তুচ্ছ কাঞ্চনীর চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে কিনা।

কিংখাবের পর্দায় জরির নকশা চিকচিক করে উঠল, বাজল মৃদু ঘুঙুরের বোল। গুঞ্জন উঠল জলসামহলে।

পর্দা সরিয়ে আসরে প্রবেশ করল লালবাঈ। নাচের ভঙ্গিতে তসলিম জানিয়ে তানপুরার কাছে এসে বসল।

রঘুনাথ পরিচয় দিল হাবশি সুলেমানের।

তসলিমের ভঙ্গিতে পুনরায় হাতের মুদ্রা সৃষ্টি করে চোখ তুললে লালবাঈ। আর সেই মুহূর্তে চোখোচোখি হল সুলেমানের সঙ্গে। স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল লালবাঈ।

তারপর বিস্ময় চাপা দিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি টানল লালবাঈ। যেন কতদিনের পরিচয়। চোখের ইশারায় ছুঁড়ে দিল মনমাতানো ভঙ্গিমা। কণ্ঠের সুরে দিল্-জখম-করা গজল গানের ছুটতান।

গানের সুরে বিভোর হয়ে গেল সুলেমান, বিভোর হয়ে গেল রঘুনাথ।

এদিকে ক্রমশই অস্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণমোহন। জলসামহলে বসে সুলেমানের প্রতি

রঘুনাথের ব্যবহার দেখে ক্ষুণ্ণ হল কৃষ্ণমোহন। আতিথেয়তা নয়, যেন বিনীত ভৃত্যের মত তোষামোদের ভঙ্গি রঘুনাথের। বুঝি চরিত্র হারিয়েছে বিষ্ণুপুররাজ।

অভিশাপের কালো ছায়া যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে বিষ্ণুপুরকে, দেখতে পায় কৃষ্ণমোহন। জলসামহল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রপ্রভার চোখে, জ্যোতিষাচার্য আর অমাত্যদের চক্রান্তে, রঘুনাথের হঠকারিতায় দুর্দিনের আভাস দেখতে পায়।

লালবাঈকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের গুঞ্জন কৃষ্ণমোহনের কানেও এসে পৌঁছেছে। তাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহন, দ্বন্দ্ব দ্বেষ হানাহানি থেকে দূরে সরে যেতে চায়। আরেক উচ্চাশা তার। বিষ্ণুপুর তাকে যেটুকু সঙ্গীতের শিক্ষা দিয়েছে তাই সব নয়। উত্তরভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ গায়কের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধনায় সিদ্ধি পেতে চায় কৃষ্ণমোহন। তার জন্য পদব্রজেও উত্তরভারত ভ্রমণ করতে ভয় পায় না। কিন্তু তখনই কল্পনার চোখে দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভার করুণ বিষণ্ণ মুখচ্ছবি। রাধামাধবের পায়ে জীবন উৎসর্গ করে জাগতিক সব সুখদুঃখ ভুলতে চায় চন্দ্রপ্রভা। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় চোখ বুজে থাকতে চায় গোপালের স্বার্থের দিকে।

লালবাঈয়ের পুত্রকে রঘুনাথ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে চান, এ গুজব চন্দ্রপ্রভারও অজানা নয়। তবু পথ খুঁজে পায় না সে। শুধু প্রার্থনা জানায় রাধামাধবের কাছে।

দিনের পর দিন কৃষ্ণমোহনের কাছে গানের তালিম নিয়েছে চন্দ্রপ্রভা, ভেবেছে সঙ্গীতের মোহেই রঘুনাথ পথ হারিয়েছে, সঙ্গীতের আকর্ষণেই চন্দ্রপ্রভার কাছে আবার ফিরে আসবে রঘুনাথ।

পথভ্রষ্ট রঘুনাথ যে সঙ্গীতকেও এভাবে অপমান করবে, চন্দ্রপ্রভাকে অপমানিত করবে, কে জানত!

পতির কাছে হয়তো এভাবে অপমানিত হয়নি কোনও রাজপত্নী।

সে-দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শিউরে উঠল চন্দ্রপ্রভা।

সুরার নেশায় টলতে টলতে সেদিন প্রাসাদে ফিরে এসেছিল রঘুনাথ, জরিয়া দাসীদের কাঁধে ভর দিয়ে।

দ্রুত ছুটে এসে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিল চন্দ্রপ্রভা। সযত্ন সেবার কোমল হাতে রঘুনাথের চুলে বিলি দিতে দিতে বললে, কেন নিজেকে সুরার নেশায় ভুলিয়ে রাখতে চাও তুমি, কেন ছুটে যাও লালবাঈয়ের কাছে?

বেহুঁশ রঘুনাথ কোনও উত্তর দিল না এ প্রশ্নের। হয়তো বা শুনতে পেল না।

গান। গানের নেশাতেই ছুটে যায় রঘুনাথ, চন্দ্রপ্রভার মন বললে। গান গেয়েই রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনবে সে অন্যায়ের পথ থেকে, পাপের পথ থেকে।

ধীরে ধীরে তানপুরা নিয়ে এসে রঘুনাথের পদপ্রান্তে বসল চন্দ্রপ্রভা।

শান্ত সুরের রেশ তুলল তানপুরায়। লালবাঈয়ের কণ্ঠে যে গান শুনে মুগ্ধ হন রঘুনাথ, সেই দুরূহ রাগরাগিণীকে গোপন প্রচেষ্টায় আপন কণ্ঠে বন্দী করেছে চন্দ্রপ্রভা। কৃষ্ণমোহনের শিষ্যাও আজ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে সঙ্গীতে।

ধীরে ধীরে বেহাগের রেশ বেজে ওঠে চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠে।

রোমাঞ্চের শিহরন খেলে যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন রঘুনাথের শরীরে!

নেশার চোখ মেলে অস্ফুট স্বরে বলে, সাবাস লালবাঈ, সাবাস।

কৌতুকের হাসি হেসে চন্দ্রপ্রভা বলে, আমি লালবাঈ নই প্রিয়, আমি চন্দ্রপ্রভা।

চমকে ওঠে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকেও

চিনতে পারে না।

প্রশ্ন করে, কে ? কে তুমি ?

—আমি চন্দ্রপ্রভা।

ধীরে ধীরে উঠে বসে রঘুনাথ। যেন বিশ্বাস হয় না তার।

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বলে, তোমাকে খুশি করার জন্যে এতদিন গোপনে সঙ্গীতসাধনা করেছি! কবি কৃষ্ণমোহনের শিষ্যা আজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে প্রিয়, বিষ্ণুপুররাজকে মুগ্ধ করেছে তার গানে।

মুহূর্তমাত্র বিস্ময়ের চোখে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চন্দ্রপ্রভার হাতের তানপুরায় পদাঘাত করে রঘুনাথ। চিৎকার করে ওঠে। —না না, গান বন্ধ করো, বন্ধ করো এ সুরের কলঙ্ক।

সশব্দ অট্টহাসে হেসে ওঠে রঘুনাথ। টলতে টলতে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ায়। বলে, কলঙ্কিত কোরো না তানপুরা, কলঙ্ক, কলঙ্ক...

দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রপ্রভার। কলঙ্ক ? চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠ সুরকে কলঙ্কিত করে ? না রঘুনাথের সন্দেহাতুর মন চন্দ্রপ্রভাকেই কলঙ্কিনী ভেবেছে ?

সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙে গেল চন্দ্রপ্রভার।

টলতে টলতে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে যায় রঘুনাথ।

—খাজাঞ্চি! চিৎকার করে ডাক দেয় রঘুনাথ।

উন্মত্ত রঘুনাথের চিৎকার শুনতে পায় চন্দ্রপ্রভা।

আর পরক্ষণেই একরাশ মোহর ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

ছুটে এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা, দেখলে খাজাঞ্চির হাত থেকে মোহরের থলিটা নিয়ে উন্মাদের মত দুহাতে মোহর ছড়াতে ছড়াতে চলেছে রঘুনাথ, নেশার ঝোঁকে। আর সেদিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে খাজাঞ্চি।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ নিশ্চুপ নিথর দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা, বুক নিঙড়ে বের হল ব্যথার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।

তারপর ধীরে ধীরে রাধামাধব-মন্দিরের পথ ধরল সে।

আড়াল থেকে সব লক্ষ করল সুরঙ্গাক্ষী। চন্দ্রপ্রভাকে রাধামাধব-মন্দিরের দিকে যেতে দেখেই ছুটে গেল জ্যোতিষাচার্যের কাছে। আর চন্দ্রপ্রভা হতাশায় লুটিয়ে পড়ল রাধামাধব বিগ্রহের সামনে।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে রাধামাধবের বিগ্রহের সামনে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রপ্রভা। নির্জন নিঃশব্দ মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে অশ্রুসজল চোখে সান্ত্বনা খুঁজল।

কান্নার বাষ্পে চন্দ্রপ্রভার আর্তস্বর কেঁপে উঠল।

—উপায় বলে দাও রাধামাধব, বলে দাও কি আমার কর্তব্য! কেঁদে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রপ্রভা।

আর সেই মুহূর্তে উদাত্ত কণ্ঠে দৈববাণী হল, ধর্ম-রক্ষাই প্রধান কর্তব্য রাজমহিষী, বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্য স্বামী-হত্যাও পাপ নয়।

শিহরন খেলে গেল চন্দ্রপ্রভার সারা শরীরে। চমকে চিৎকার করে উঠল, না না, এ কি আদেশ দিলে রাধামাধব! স্বামী-হত্যা ? না না, পত্নীর কাছে পতিই একমাত্র জাগ্রত দেবতা। প্রত্যাদেশ ফিরিয়ে নাও রাধামাধব। প্রত্যাদেশ ফিরিয়ে নাও।

রাধামাধবের বিগ্রহের কাছে ছুটে গেল চন্দ্রপ্রভা, পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল বিগ্রহের পদপ্রান্তে।

দেখতে পেল না, কখন দেববিগ্রহের পিছন থেকে জ্যোতিষাচার্য গোপনে বেরিয়ে

গেলেন ধীরে ধীরে।

নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন জ্যোতিষাচার্য, এ প্রবঞ্চনা ছাড়া রক্ষা পাবার উপায় নেই বিষ্ণুপুরের। না না, প্রবঞ্চনা নয়। সত্যের চেয়ে কর্তব্য বড় তাঁর কাছে। একটি জীবনের চেয়ে একটি রাজ্য অনেক বড়। রাজার প্রাণ হরণ করে রাজ্যের আয়ু বর্ধিত করা অকল্যাণ নয়। রাজধর্ম, প্রজাধর্মের জন্যে চন্দ্রপ্রভা যদি স্বামীকে হত্যা করে, তা পাপ নয়। মঙ্গল, পরম মঙ্গল।

একমাত্র রাজপত্নীর হাতে রঘুনাথের মৃত্যু হলেই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না। তাঁদের চক্রান্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না। যে রঘুনাথ অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, যে রঘুনাথ তাঁদের সামান্য সম্মানটুকুও দেয় না, সে অপসৃত হবে। কিশোর গোপালকে সিংহাসনে বসাতে পারলে তাঁরাই আবার ক্ষমতা ফিরে পাবেন, রাজ্যশাসন করতে পারবেন নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী।

এদিকে চেতনা ফিরে এল চন্দ্রপ্রভার। বিস্ময়ে ভাবাবিষ্টের মত নিশ্চুপ তাকিয়ে রইল সে রাধামাধবের বিগ্রহের দিকে, তারপর প্রাসাদকক্ষে ফিরে এল চিন্তার জাল নিয়ে।

ধর্মের জন্য স্বামী-হত্যা পাপ নয় ? নিজেকে প্রশ্ন করল মনে মনে।

কৃষ্ণমোহনের কাছে সঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছে চন্দ্রপ্রভা, স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু সে-সঙ্গীত তাকে ক্রমশই দূরে ছিনিয়ে এনেছে রঘুনাথের কাছ থেকে।

রঘুনাথ নয়, অনুরাগের দৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রভা বারংবার দেখতে পেয়েছে রাধামাধবের মূর্তি।

তবে কি জীবন-মরণের পতি রাধামাধব ? রঘুনাথ নয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না চন্দ্রপ্রভা।

সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে প্রতিদিনের মতই অপেক্ষা করে চন্দ্রপ্রভা। চম্পা চামেলি রজনীগন্ধার পুষ্পালঙ্কারে সাজিয়ে দেয় সুরঙ্গাক্ষী, উদ্যানের পোষা হরিণী আর ময়ূর ঘুরে বেড়ায় চন্দ্রপ্রভার কাছে কাছে, কিন্তু অন্যদিনের মত তাদের নিয়ে কৌতুকে হাসতে পারে না চন্দ্রপ্রভা। তীর-ধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে জরিয়া দাসী ও শবরী নারীরক্ষীর দল। কিন্তু অন্যদিনের মত চন্দ্রপ্রভা যোগ দিতে পারে না লক্ষ্যভেদের খেলায়।

অপেক্ষা, অপেক্ষা।

একসময় সন্ন্যাসীর বেশে কৃষ্ণমোহন এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তবু অন্যদিনের মত উল্লসিত হয়ে উঠতে পারে না চন্দ্রপ্রভা। কথা খুঁজে পায় না। কি করে সে প্রকাশ করবে আপন গ্লানির কথা! রঘুনাথ অনাচারী হলেও তার স্বামী। স্বামীর কলঙ্ক কি করে প্রকাশ করবে সে! কি করে জানাবে কৃষ্ণমোহনের শিক্ষাকে অসম্মান দেখিয়েছে রঘুনাথ!

কৃষ্ণমোহন হঠাৎ বলে, আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি!

—কেন কৃষ্ণমোহন ? উৎকণ্ঠার প্রশ্ন ফোটে চন্দ্রপ্রভার মুখে।

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বলে, সব রাগরাগিণী আয়ত্তে এনেও বুঝেছি অনুরাগকে অনুভব করতে পারিনি। তাই আমার সঙ্গীত আজও অসম্পূর্ণ, তাকে পূর্ণ করার ব্রত নিয়ে পরিব্রাজকের পথ বেছে নিতে চলেছি। সঙ্গীতের পথে চলেছি আমি। সঙ্গীতসাধনার শেষ সোপানে যদি কোনও দিন পৌঁছতে পারি তবেই ফিরে আসব।

চন্দ্রপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে, যাও কৃষ্ণমোহন। যে-সাধনার পিছনে ছুটতে গিয়ে বিষ্ণুপুররাজ পথ হারিয়েছেন, সে-সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ করো, রাধামাধবের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

বিদায় নিয়ে চলে যায় কৃষ্ণমোহন। মনের মধ্যে তার গুঞ্জন তোলে শতসহস্র প্রশ্ন।

জগৎ মনে হয় শুধুই মায়াময়। চন্দ্রপ্রভার গোপন মনের ব্যথা, বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্বার্থ, লালবাঈয়ের যৌবনোচ্ছল নৃত্য ভঙ্গিমার লুব্ধতা, সব তুচ্ছ হয়ে যায় কৃষ্ণমোহনের চোখে।

মায়ার স্পর্শে রস হয় বিকৃত। প্রীতিই একমাত্র আদর্শ। সেখানে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ নেই, স্বার্থের নেই দ্বন্দ্ব। রতি আর উল্লাসে প্রীতির জন্ম। প্রীতি থেকে প্রেম। প্রেম আর আত্মবিশ্বাসেই প্রণয়। প্রণয় ও অধিকারজ্ঞান মিলিত হলেই জন্ম নেয় মান-অভিমান। প্রেম আর আত্মবিলুপ্তিতে স্নেহ। স্নেহ আর কামনা থেকে রাগের জন্ম। রাগের রম্যতা অনুরাগ। এই রাগই উন্মাদনার স্পর্শে রূপান্তরিত হয় মহাভাবে। সঙ্গীতের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার করে এই মহাভাব লাভ করতে চায় কৃষ্ণমোহন, সাধনায় সিদ্ধি পেতে চায়। বিদায় নিয়ে চলে যায় কৃষ্ণমোহন।

আর চন্দ্রপ্রভা নিজেকে হঠাৎ যেন নিঃস্ব বোধ করে। যেন জীবনের শেষ আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে সুরঙ্গাক্ষীর কাছে রাধামাধব-প্রাঙ্গণের দৈববাণীর কথা প্রকাশ করে চন্দ্রপ্রভা।

সুরঙ্গাক্ষী উত্তর দেয়, দৈববাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। দেবতার প্রত্যাদেশই মানুষকে পথ দেখায় চন্দ্রপ্রভা।

এই প্রত্যাদেশ পাবার জন্যেই বুঝি পরিব্রাজক কৃষ্ণমোহন অন্ধকার পথ হেঁটে চলে। দেশ থেকে দেশান্তরে, সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে চলে নিরুদ্দেশের পথে।

আওরঙ্গজেবের ভারতবর্ষে সঙ্গীত আত্মগোপন করে আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। পথ দেখানোর জন্য যদি কোনও গুণী সঙ্গীতজ্ঞের দেখা মেলে। কিংবা নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে নিজের পথ।

মানুষকে জানতে হবে, হৃদয়ে অনুভব করতে হবে প্রেম।

তালমাত্রা,রাগরাগিণী,সপ্তসুরের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে সঙ্গীতকে। সত্য দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণমোহন, বুঝতে পেরেছে সঙ্গীতশাস্ত্রই সাধনার সিদ্ধির পথ-নয়। সঙ্গীতকে ভারতবর্ষে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রাণের সঞ্জীবনী-স্পর্শ দিতে হবে। অনুরাগের ব্যথা ব্যর্থতা আনন্দ উল্লাস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সুর হয়ে প্রকাশ হলেই সঙ্গীতের সার্থকতা ; জানতে পেরেছে কৃষ্ণমোহন, মনকে প্রকাশ করতে হলে মানুষকে জানতে হবে। রাজসিক জলসামহলে মানুষ নেই, আছে শুধু বিলাস।

নারীর প্রতি অনুরাগ নয়। জীবনের প্রতি। মানুষের ওপর প্রীতির স্নেহাশিস না নামলে মুক্তির উপায় নেই। শান্তি চাই, শান্তির বারিধারাই সুখ আর সমৃদ্ধি দিতে পারে। তাই প্রীতির প্রয়োজন। ধর্মে ধর্মে হানাহানি নয়, ক্ষমা আর সখ্যসন্ধি। হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করতে হয় প্রেম আর ক্ষমা দিয়ে। তাই মানুষকে খুঁজতে বেরিয়েছে কৃষ্ণমোহন। মানুষকে জানতে, জানাতে।

অন্ধকার পথ অতিক্রম করে চলে কৃষ্ণমোহন।

চতুর্দিকে শুধু দুঃখ আর দুর্দশা। দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখতে পায় চতুষ্পার্শে। কপটাচার আর আত্মাবমাননা। সত্যকার মানুষ নেই যেন সারা ভারতে। মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে মানুষ ধর্মের হানাহানিতে। কুসংস্কারের মোহে।

দূরে হঠাৎ একসারি মশালের আলো দেখতে পায় কৃষ্ণমোহন।

পান্থশালায় আশ্রয় পাবার আশায় দ্রুত সেদিকে এগিয়ে চলে। মনের মধ্যে গুঞ্জরন তোলে একটি সুর।

পথ চলতে চলতেই কৃষ্ণমোহন গুনগুন করে গাইতে শুরু করে :

সাঁই তো ন আবে আজ, আঁধিরাত মাঝ মাঝ
সিংহিনী জগাবে সিংহ কানন পুকার—

তন্ময় হয়ে গান গাইতে গাইতে পান্থশালার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণমোহন। মশালের আলোয় দেখতে পায় পান্থশালার সামনে একটি তরুণীকে ঘিরে একদল ফিরিঙ্গি দস্যু সুরাপানে উন্মত্ত। দেখে বুঝতে পারে, বিদেশী দস্যুদের আদেশে বিষণ্ণ মুখে তাউস বাজিয়ে চলেছে তরুণী।

মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে দস্যুদল। আবার সুরাপাত্র ভরে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে উল্লাসে।

এ-দৃশ্য দেখে ঘৃণায় সর্বশরীর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহনের। কিন্তু মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিরে যেতে ভরসা হয় না।

ধীরে ধীরে পান্থশালার কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করে।

কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠস্বর শুনে চোখ তুলে তাকায় তরুণী। তার করুণ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় কৃষ্ণমোহন।

তরুণী ইশারায় একটি কক্ষ দেখিয়ে দেয়।

ক্লান্তিতে পান্থশালার শয্যায় শুয়ে পড়ে কৃষ্ণমোহন। শ্রান্ত চোখে ঘুম নেমে আসে। তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পায় ফিরিঙ্গিদের অট্টহাস। আর তাউস-বাদ্যের মধুর ধ্বনি। এক সময় নিদ্রায় চেতনা লুপ্ত হয়ে যায় কৃষ্ণমোহনের।

তারপর নিস্তব্ধ রাত্রিতে হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে যায়।

অনুভবে বুঝতে পারে, কে যেন তার শিয়রের কাছে বসে আছে। কৃষ্ণমোহন বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে, কে ?

একটি কোমল হাত এসে মুখ চাপা দেয় কৃষ্ণমোহনের।

তারপর ধীরে ধীরে নারীকণ্ঠের অনুরোধ আসে, দস্যুদের হাত থেকে বাঁচান দরবেশ, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

তার পরিচয় জানতে চায় কৃষ্ণমোহন।

—প্রয়োজন কি পরিচয়ের চেয়ে বড় নয়, দরবেশ !

বিস্ময়ে বিমূঢ় কৃষ্ণমোহন শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলো।

দুজনে নিঃশব্দে পান্থশালা ত্যাগ করে ছুটে চলে অন্ধকার পথ ধরে। বহু দূর এসে থমকে দাঁড়ায় মেয়েটি। বলে, আমি ক্লান্ত দরবেশ, বিশ্রাম করতে দিন আমাকে।

ভোর হয়ে আসছে তখন। কৃষ্ণমোহন বলে, কিন্তু দস্যুর দল যে এখনই তোমার সন্ধানে বের হবে মা, এখন তো বিশ্রাম করা চলে না।

—আমি ক্লান্ত, দরবেশ ! অনুনয়ের কাতর স্বরে উত্তর দেয় মেয়েটি। বলে, দস্যুদের কাছে বন্দীজীবন কাটানোই হয়তো আমার নসিব...

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বলে, দুঃসময়ে সাহায্য চেয়ে আমাকে সত্যে আবদ্ধ করেছ, তোমাকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।

নিরাপদ দূরত্বে তাকে পৌঁছে দেয় কৃষ্ণমোহন। প্রশ্ন করে, কে তুমি, কি তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে হয়।

উত্তর আসে, আমি জুলেখা। বাংলার ভূতপূর্ব নবাব ইব্রাহিম খাঁর আত্মীয়কন্যা আমি, বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগমের কন্যা।

শিহরন খেলে গেল কৃষ্ণমোহনের সর্ব শরীরে।

এতদিন জেনে এসেছে মোগল শাসনে হিন্দু নারীই শুধু অত্যাচারিতা, হিন্দু নারীই

অসহায়।

কৃষ্ণমোহনের হঠাৎ মনে হল, ধর্ম নয়, অর্থ নয়, সারা ভারতবর্ষের নারীমাত্রেই অত্যাচারিতা, অসহায়।

ধর্ম তাদের মুক্তি দিতে পারে না, দিতে পারেনি।

কারণ পুরুষ একটি মাত্র ধর্মে বিশ্বাস করে—লালসা।

তিরিশ

শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে আলমগীরের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল ইব্রাহিম খাঁ।

বিলাসব্যসনে আসক্ত অলস আর অকর্মণ্য ইব্রাহিম খাঁর কোনও যুক্তিতেই কান দিলেন না আওরঙ্গজেব।

বললেন, বৃদ্ধ হয়েছ ইব্রাহিম। জীবনে অনেক পাপ করেছ, মক্কায় গিয়ে বেহেস্তে যাবার আরজি দেবে যাও।

বলে আদেশ দিলেন তাকে সপরিবারে মক্কা যাবার।

সুরাট থেকে মক্কাযাত্রী সমুদ্র-জাহাজের অধিনায়ক করে ইব্রাহিম খাঁকে আদেশ দিলেন যাত্রীদের তীর্থে নিয়ে যাওয়ার।

ফিরে আসার পথে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল ইব্রাহিম খাঁর।

প্রত্যাবর্তনের পথে মক্কাযাত্রীদের কাছে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার হীরে জহরত থাকে—এ সংবাদ অজানা ছিল না জলদস্যুদের।

সমুদ্রপথে ইব্রাহিম খাঁর জাহাজ আক্রমণ করল ইংরেজ জলদস্যু।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে ডিহি কলকাতায় যখন ইংরেজ বণিকের দল বাণিজ্যের আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে, তখন পশ্চিম প্রান্তে সুরাট অঞ্চলে, আরব সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে দস্যুর শক্তি নিয়ে বিচরণ করছে আরেক দল ইংরেজ।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ শক্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন। স্বাধীন রাজ্যের মতই বন্দর-সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম স্থাপন করেছে তারা, বিচারক নিয়োগ করে শাসন আর বিচারের ভার গ্রহণ করেছে নিজেদের হাতে। একদিকে আরবি জাহাজ লুণ্ঠন কিংবা বাণিজ্য, অন্যদিকে পাদ্রীদের সহায়তায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করে খ্রীস্টানদের সংখ্যাবৃদ্ধি—দুটি মাত্র লক্ষ্য তখন পর্তুগীজদের!

পূর্বভারতে পর্তুগীজ ছিল দস্যু, পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ বোম্বেটের উৎপাত।

কিন্তু পশ্চিম উপকূলের পর্তুগীজদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রীস্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; সৈয়দ হোক বা ব্রাহ্মণ হোক, পিতৃমাতৃহীন শিশুদের গির্জায় নিয়ে গিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়োগ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সুরাটের পনেরো ক্রোশ দূরে ছিল পর্তুগীজ-পত্তন, সুদূর বোম্বাই দ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ছিল তাদের অধিকৃত এলাকা। তার পাশেই হাবশি-রাজ্য নিমাজশাহি কোকান, অন্যদিকে ইংরেজ।

বাংলাদেশে যখন বণিকের বা দস্যুর ছদ্মবেশে বিদেশী শক্তির আগমন ঘটছে, তার বহু পূর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদেশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে। দমন, বাসি এবং আরও দুটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে তখন পর্তুগীজরা। 'আসরফি' রৌপ্য মুদ্রার, 'বুজুর্গ' আর 'ফুলুস' মুদ্রার প্রচলন শুরু করেছে পর্তুগীজ বন্দর।

প্রবল প্রতাপ আওরঙ্গজেবের আইনের কোনও মূল্যই ছিল না এই অঞ্চলে। ইংরেজ

জলদস্যুর দলও তাই সমুদ্রজাহাজ লুণ্ঠন করত, চেষ্টা করত পর্তুগীজদের মতই একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার।

আরব সাগরে পণ্য-জাহাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইংরেজ বোম্বেটেরা খবর পেল, সুরাট বন্দরের সর্ববৃহৎ শাহি জাহাজ গঞ্জ-ই-সাওয়াই তীর্থযাত্রীদের নিয়ে মক্কা থেকে ফিরে আসছে। খবর শুনে লোভ জেগে উঠল তাদের। প্রধান তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে আসে বহুমূল্য ধনরত্ন, নিখাদ স্বর্ণের তাল এবং অসংখ্য রূপসী বাঁদী—এ সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না বোম্বেটেদের কাছে।

সম্রাট-আদেশে অধিনায়ক হয়ে ইব্রাহিম খাঁ মক্কা থেকে ফিরে আসছিল এই জাহাজে। সঙ্গে শত শত তীর্থযাত্রী এবং ইব্রাহিম খাঁর আত্মীয়স্বজন। সাকিনা, দিলরুস্ বেগম, দিলরস্-কন্যা জুলেখা।

ইংরেজ জলদস্যুদের কাছে খবর এসে পৌঁছল—প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের সোনা আর রুপা নিয়ে আসছে ইব্রাহিম খাঁ। আর অসংখ্য রূপসী তুরানি বাঁদী। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে দস্যুপোতের সারি ছুটে এল তীব্র গতিতে, ঘিরে ফেলল গঞ্জ-ই-সাওয়াই।

সমুদ্রপথেই ইব্রাহিম খাঁ দেখতে পেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যুপোত এগিয়ে আসছে। রক্তলাল পতাকা উড়ছে দস্যুদের জাহাজে।

গঞ্জ-ই-সাওয়াইয়ের নাবিকরা আদেশ চাইল দস্যুপোত আক্রমণ করার। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ কর্তব্য ঠিক করতে পারল না। ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল আকস্মিক আক্রমণে। চারশত দুঃসাহসী ধর্মসৈন্য আর আশিটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও চুপ করে রইল ইব্রাহিম খাঁ। আক্রমণ করলে জলদস্যুদের আক্রোশ বাড়তে পারে এই ভয়ে।

ধর্মসৈন্যরা বললে, হুকুম দিন খাঁ বাহাদুর! এখনও সময় আছে, তোপের মুখে উড়িয়ে দিই কাফের ইংরেজকে।

বিব্রত ইব্রাহিম খাঁ সারা জাহাজ ছুটে বেড়াতে বেড়াতে বললে, না, না। হয়তো তীর্থযাত্রী বলে নির্বিবাদে ছেড়ে দেবে দস্যুরা, কিন্তু আক্রমণ করলে...

সুরাট তখন মাত্র এক সপ্তাহের পথ।

দস্যুপোত কাছে এগিয়ে এল।

ইব্রাহিম খাঁ আদেশ দিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইব্রাহিম খাঁর। সাহস এবং বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন ধর্মসৈন্যরা। শাহি বন্দুকের গুলিতে স্বপক্ষেরই সৈন্যহানি ঘটল। আর্ত চিৎকারে কলরব তুলল তীর্থযাত্রী বৃদ্ধা আর নারীর দল।

এদিকে দস্যুপোতের আগুন এসে ধ্বংস করল গঞ্জ-ই-সাওয়াইয়ের প্রধান মাস্তুল।

আর বুঝি পথ নেই রক্ষা পাবার, সম্মান বাঁচাবার উপায় নেই। তাই দিল্‌রস বললে, চলো সাকিনা, দরিয়ায় ঝাঁপ দিই। মৃত্যুই এখন ইজ্জত বাঁচাতে পারে।

সাকিনা হাসল। বললে, এত স্বার্থপর তুমি দিল্‌রস বেগম? মালিকের ইজ্জত আমার ইজ্জত। তাকে ফেলে পালাতে চাও?

দিল্‌রস উপহাসের স্বরে বললে, বুঝেছি সাকিনা। মৃত্যুর ভয়ে নিজেকে বেচে দিতে চাও কাফের ইংরেজের কাছে?

—হ্যাঁ দিলরস। বেচে দিতে চাই। বলে হঠাৎ একজন ধর্মসৈন্যের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল সাকিনা।

উন্মুক্ত তরবারি হাতে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজ দস্যুরা। সে-দৃশ্য দেখে আতঙ্কে জাহাজের একটি কক্ষের ভেতর আত্মগোপন করল ইব্রাহিম খাঁ।

তুরানি ক্রীতদাসীদের মাথায় পাগড়ি আর হাতে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য পিছন থেকে উৎসাহ দিল তাদের।

অতি সহজেই জাহাজ দখল করল বোম্বেটের দল, বন্দী করল রূপসী বাঁদী আর বেগমদের।

তারপর তন্নতন্ন করে ইব্রাহিম খাঁকে খুঁজল তারা। গোপন কক্ষের হদিস পেয়ে তরবারি হাতে তারা উল্লাসধ্বনি করতে করতে এগিয়ে এল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল তাদের চিৎকার।

বীরাঙ্গনার মত তরবারি হাতে দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। সাকিনা বেগম।

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ নয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইব্রাহিম খাঁকে রক্ষা করতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। বাঁদী থেকে তাকে বেগমের আসনে বসিয়েছিল ইব্রাহিম খাঁ। তবু যৌবনের ভ্রান্ত মোহে পথভ্রষ্ট হয়েছিল সাকিনা। কিন্তু তার প্রতি একদা যে বিশ্বাস, যে নিঃসন্দিগ্ধ ভালবাসার নির্দশন দেখিয়েছিল ইব্রাহিম খাঁ, তার প্রতিদান দেবে না সে?

যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হল শরীর। মৃত্যুবরণ করল সাকিনা, ইব্রাহিম খাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে।

আশ্চর্য নারীচরিত্র! স্বামীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে যে অসতী নারী, কোন্ মহান কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে সে আত্মবিসর্জন দিয়ে!

বন্দী হবার ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করল বহু নারী, আত্মহত্যা করল দিল্‌রস বেগম। কিন্তু সাকিনা, অসতী সাকিনা বেগম একদিন কৌতুকে হাসতে হাসতে যেভাবে গোপন প্রণয়পাত্র জাফর খাঁকে কোতলঘরে পাঠিয়ে নিজের সম্মান বাঁচিয়েছিল, তেমনি হাসতে হাসতেই প্রাণ বিসর্জন দিল ইব্রাহিম খাঁকে বাঁচাবার জন্যে।

আর ষোড়শী জুলেখা?

সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপদেশ দিয়ে নিজেই ঝাঁপ দিল দিল্‌রস।

কিন্তু জুলেখার সাহস হল না।

মৃত্যু? ভয়ে শিউরে উঠল জুলেখা সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। না। বাঁচতে চায় জুলেখা, জীবন তার কাছে মনে হল ইজ্জতের চেয়ে বড়। ইংরেজ দস্যুদের হাতে বন্দী হল সে।

যথাসময়ে দুর্ঘটনার সংবাদ এসে পৌঁছল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে। সংবাদ এল, শুধু দস্যুবৃত্তি করেই ক্ষান্ত নেই ইংরেজরা। সুরাট বন্দরে ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ামের নামাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন শুরু করেছে তারা। বোম্বাইয়ের ইংরেজ দুর্গকে সুদৃঢ় করে তুলেছে রাজ্য বিস্তারের লোভে।

ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব। তীর্থযাত্রী জাহাজ লুণ্ঠনের খবর শুনেই আদেশ দিলেন বোম্বাইয়েব ইংরেজ দুর্গ অধিকার করতে।

কিন্তু পূর্বাহ্ণেই তার গোপন সংবাদ এসে পৌঁছল ইংরেজ দুর্গে। দস্যুর দল লুণ্ঠিত ধনরত্ন আর নারীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের চতুর্দিকে আত্মগোপন করল, গঞ্জ-ই-সাওয়াই লুণ্ঠনের দায়িত্ব অস্বীকার করল দুর্গের ইংরেজ সৈন্যরা।

সুদূর উড়িষ্যায় আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই গভীর অরণ্যের পান্থশালায় আশ্রয় নিয়েছিল ফিরিঙ্গি দস্যুদল। আর দিল্‌রস বেগমের কন্যা জুলেখাকে নিয়ে এসেছিল বাঁদী হিসেবে।

সেই জুলেখাকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করে পান্থশালা থেকে বহুক্রোশ হেঁটে অরণ্য পার হল কৃষ্ণমোহন। ক্লান্ত জুলেখাকে বিপন্মুক্ত করল। নগরের প্রান্তে পৌঁছে দিল তাকে।

অদূরে মসজিদের চূড়া দেখতে পেল কৃষ্ণমোহন, আজান শুনতে পেল সেখান থেকেই।

পথ-নির্দেশ করে কৃষ্ণমোহন বললে, এই পথে যাও জুলেখা, মসজিদে আশ্রয় পাবে।

কিন্তু ধর্মের আশ্রয় চায় না জুলেখা। ধর্মের বীভৎস হানাহানি দেখতে পেয়েছে সে ইব্রাহিম খাঁ নবাবি তখ্‌ত হারাবার পর।

তাই সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল জুলেখা। —আপনি?

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বললে, আমি ভিন্ন পথের যাত্রী। জুলেখা, সঙ্গীতের সাধনায়, জীবনের সাধনায় পথ খুঁজে চলেছি আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলেখা, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে। বললে, আমাকেও সঙ্গে নিন দরবেশ, আমাকেও সেই সাধনার পথে নিয়ে চলুন।

কৃষ্ণমোহন হাসল। —তা সম্ভব নয় জুলেখা, তা সম্ভব নয়।

একত্রিশ

বিষ্ণুপুরের বিষাক্ত বাতাস থেকে মুক্তি পাবার আগ্রহেই হয়তো পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিল কৃষ্ণমোহন। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গোপন চক্রান্তের বিষনিঃশ্বাস কলুষিত করে তুলছিল প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ, বিদ্বেষের গরলে নীল হয়ে উঠছিল কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, গণ্টনবাধঁ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, লালবাঁধের জলস্রোত। মুক্তির আলোবাতাস পাবার জন্যেই হয়তো বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে গেল কৃষ্ণমোহন।

কিন্তু দিনের পর দিন চোখের সামনে রঘুনাথের হঠকারিতা আর লালবাঈয়ের লুব্ধতা দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না জ্যোতিষাচার্য।

অথচ উপায় নেই। ধীরে ধীরে রাজকার্যে মোগল কর্মচারী নিয়োগ করে বিষ্ণুপুরের একতায় বিভেদের প্রাচীর গেঁথে তুলেছে লালবাঈ। সে জানে, কাঞ্চনীর সন্তানকে সিংহাসন দেবে না রাজ্যের পুরাতন কর্মচারীর দল। তাই ধীরে ধীরে তার অনুরোধে ফৌজদার, থানাদার, রিসাল্‌হা, নাওয়ারা সব ক্ষেত্রেই ভিনদেশী মোগল এবং আফগান নিযুক্ত হয়েছে। আমিন, কানুনগো, রাহাদার, ঘাটোয়ালদের মধ্যেও বিধর্মীর সংখ্যা কম নয়।

সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে দুটি দল গড়ে উঠেছে তখন। একদিকে লালবাঈ-নিযুক্ত ফৌজ আর কর্মচারী, অন্যদিকে হিন্দু প্রজা, হিন্দু সৈন্য, জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, মুখ্য অমাত্য, দেওয়ানজি।

খাজাঞ্চির গোপন কক্ষে পরামর্শ করেন জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, দেওয়ানজি এবং অন্যান্য কর্মচারীর দল।

চন্দ্রপ্রভার বিশ্বস্ত সখী সুরঙ্গাক্ষীও এসে যোগ দেয় চক্রান্তে।

বলে, রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গীত নয়, লালবাঈয়ের প্রতি লালসায় মত্ত বিষ্ণুপুররাজ। লালবাঈকে খুশি করার জন্যে চন্দ্রপ্রভাকে পদাঘাত করতেও লজ্জা বোধ করেননি তিনি।

চন্দ্রপ্রভাকে, রানী চন্দ্রপ্রভাকে পদাঘাত করেছে রঘুনাথ!

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সভাপণ্ডিত। এ তো চন্দ্রপ্রভার অপমান নয়, সমগ্র বিষ্ণুপুরের অপমান।

দেওয়ানজি প্রশ্ন করলেন, উপায়?

পরস্পর চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন জ্যোতিষাচার্য আর দেওয়ানজি। সত্যিই তো, উপায় কি ? কি পথ আছে রঘুনাথের এই ম্লেচ্ছ অনাচার বন্ধ করার ?

সুরঞ্জাক্ষী ধীরে ধীরে বললে, উপায় আছে। গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে লালবাঈকে হত্যা করতে হবে।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, না, না। সে-পথ বড় সাংঘাতিক।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সুরঞ্জাক্ষী ! উষ্মার স্বরে বললে, সাংঘাতিক সমস্যার সমাধানও সাংঘাতিক হতে বাধ্য গুরুদেব। বৈষ্ণবধর্মের নামে বিষ্ণুপুর আজ সাহস হারিয়েছে, শক্তি হারিয়েছে, ভীরু কাপুরুষতাকে তাই ধর্ম বলে চালাতে চাইছেন, জ্যোতিষাচার্য। চন্দ্রপ্রভা চিতোয়া-বরদার কন্যা, খড়্গেশ্বরীর উপাসক। সেও আজ এই বৈষ্ণবধর্মের কাপুরুষতায় সাহস হারিয়েছে। আজ আর কোনও পথ নেই, শান্তি আর শৃঙ্খলাই যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে লালবাঈ আর রঘুনাথের অবৈধ সন্তানের অধিকারই স্বীকার করে নিন।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন, কৌতুকের হাসি !

বললেন, পাপপুণ্যের বিচার নয় সুরঞ্জাক্ষী। সৈন্যবিভাগে আজ লালবাঈয়েরই আধিপত্য, লালবাঈয়ের পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চায় তারা। এ-ক্ষেত্রে লালবাঈকে হত্যা করলে, তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে !

জ্যোতিষাচার্যের যুক্তি সমর্থন করলেন দেওয়ানজি। বললেন, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মনসবদার সুলেমান খাঁ এখন বিষ্ণুপুরের অতিথি হয়ে রয়েছেন। এ সময় লালবাঈকে হত্যা করলে বিধর্মী সৈন্যরা তাঁর সাহায্য পাবে, হয়তো এই বিভেদের সুযোগ নিয়েই বিষ্ণুপুরকে গ্রাস করবে মুর্শিদকুলি।

সুরঞ্জাক্ষী বললে তবে কি কোনও পথ নেই ?

—আছে। দৃঢ় গলায় গলায় উত্তর দিলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, প্রজার শক্তিই রাজশক্তি। কিন্তু আমাদের নির্দেশ হয়তো তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। বিষ্ণুপুরের রানী চন্দ্রপ্রভার নির্দেশ পেলে এই প্রজাশক্তিই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী সৈন্যদের ধ্বংস করতে পারবে, সিংহাসনে বসাতে পারবে গোপালকে, সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে।

সুরঞ্জাক্ষী সন্দেহের স্বরে বলে, কিন্তু চন্দ্রপ্রভা কি এই নির্দেশ দিতে পারবে ? বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছে চন্দ্রপ্রভা, কৃষ্ণপ্রেমের গান তার কণ্ঠে, লালবাঈকে হত্যা করার নির্দেশ কি চন্দ্রপ্রভা কোনও দিন উচ্চারণ করতে পারবে ?

—পারবে। জ্যোতিষাচার্য উত্তর দেন, সে ভার তোমার ওপর সুরঞ্জাক্ষী। তুমি তার আশৈশব সখী, তার সবচেয়ে বড় আস্থা তোমার ওপর, তাকে শক্তি তার সাহস জোগাবার দায়িত্ব তোমার।

উপদেশ শুনে ফিরে এল সুরঞ্জাক্ষী।

প্রাসাদে ফিরে এল। নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভার কক্ষদ্বারে।

মিষ্টি মধুর একটি সুরের গুঞ্জন শুনতে পেল সুরঞ্জাক্ষী। দেখলে স্বর্ণপালঙ্কের কোমল শয্যায় শুয়ে আছে কিশোর গোপাল, আর ধীর স্বরে গান গাইছে চন্দ্রপ্রভা তার চোখে ঘুম নামাবার চেষ্টায়।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে সুরঞ্জাক্ষী, দেখলে তৃপ্তির আবেশ চন্দ্রপ্রভার চোখে, মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য ঠিক করে নিল সুরঞ্জাক্ষী, যেন হঠাৎ তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল চন্দ্রপ্রভার দুর্বলতা।

দ্রুত এগিয়ে এল সে চন্দ্রপ্রভার কাছে। বললে, গোপন সংবাদ আছে চন্দ্রপ্রভা।

ভীতত্রস্ত ভাবে চোখ তুলে তাকাল চন্দ্রপ্রভা, বিস্ময়ের উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন ফুটে উঠল তার

চোখে। প্রশ্ন করলে, কি সংবাদ সুরঞ্জাক্ষী ?

সুরঞ্জাক্ষী কাছে এগিয়ে এল। ফিসফিস করে বললে, বড় আতঙ্কের সংবাদ চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈ গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেছে গোপালের জীবননাশ করবার জন্যে। লালবাঈয়ের সন্তানের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যে।

উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল চন্দ্রপ্রভা, পরক্ষণেই গোপালকে বুকে চেপে ধরল। বললে, না না সুরঞ্জাক্ষী, এ কি অভিশাপ নিয়ে এসেছে লালবাঈ। আমার প্রাণের গোপালকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে প্রাণ দিয়ে। আমি ঐশ্বর্য চাই না সুরঞ্জাক্ষী, রাজ্য চাই না। চলো, গোপালকে নিয়ে এ অভিশপ্ত রাজ্য থেকে চলে যাই আমরা !

চন্দ্রপ্রভার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। গোপালকে আরও গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরল সে।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, না চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈয়ের বিষদৃষ্টি থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে না। ভীরুতা দিয়ে পাপকে জয় করতে চাও তুমি ? শক্ত হয়ে দাঁড়াও চন্দ্রপ্রভা, তার এই অন্যায়কে রোধ করো।

—আমি ? আমি রোধ করব লালবাঈয়ের অন্যায়, কতটুকু শক্তি আমার সুরঞ্জাক্ষী ? স্বামীর পদাঘাত যার জীবনের একমাত্র সম্বল, তার যে নিজেরই দাঁড়াবার স্থান নেই সুরঞ্জাক্ষী। দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রপ্রভা বললে।

সুরঞ্জাক্ষী হেসে বললে, তোমার চেয়ে বেশি শক্তি আজ আর কারও নেই চন্দ্রপ্রভা। খড়্গেশ্বরীর উপাসক ছিলে, বিশালাক্ষীর উপাসক, তাঁর শক্তি লুকিয়ে আছে তোমার শরীরে। তাঁরই আশীর্বাদে একদিন তরবারি হাতে হার্মাদদের আক্রমণ প্রতিহত করার সাহস জুটেছিল তোমার, সেই সাহস আজ কোথায় চন্দ্রপ্রভা ?

চন্দ্রপ্রভা হতাশার চোখ চেয়ে বললে, কিন্তু আজ যে আমার সব শক্তি হারিয়ে গেছে সুরঞ্জাক্ষী।

সুরঞ্জাক্ষী মৃদু হেসে বললে, না চন্দ্রপ্রভা। তোমার প্রজারাই তোমার শক্তি। একবার তোমার বিপদের কথা নিজের মুখে তাদের শুনিয়ে দাও তুমি, দেখবে লালবাঈয়ের সব চক্রান্ত মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা। বললে, তাই হবে সুরঞ্জাক্ষী, তাই হবে। দরবার আহ্বান করার ব্যবস্থা করো, আমার গোপালকে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরে আমার বিপদের কথা জানাব তাদের। গোপালের মঙ্গলের জন্যে যদি স্বামীর অমঙ্গল ডেকে আনতে হয় তবু ভয় পাব না আমি।

খবর অজ্ঞাত রইল না লালবাঈয়ের কাছে।

শুনল সে, দরবারে হিন্দু প্রজা আর রাজকর্মচারীদের কাছে চন্দ্রপ্রভা নিজেই দর্শন দিয়েছে, জানিয়েছে তার বিপদ-সম্ভাবনার কথা। শুনল, হিংস্র উত্তেজনায় প্রজারা চন্দ্রপ্রভার জয়ধ্বনি তুলে, গোপালের জয়ধ্বনি তুলে প্রতিজ্ঞা করেছে লালবাঈকে হত্যা করে বিষ্ণুপুরকে নিষ্কণ্টক করবে।

একবার মনে হল, নিজেই গিয়ে সে সাক্ষাৎ করবে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে ! জানিয়ে আসবে, এ গুজব মিথ্যা। গোপালের জীবন তো সে চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মিথ্যা চেষ্টা। চন্দ্রপ্রভা কি তার ওপর আস্থা রাখবে ? কখনওই না।

নিঃশব্দে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লালবাঈ। ফিরে তাকাল রঘুনাথের দিকে। দেখলে, সুরার নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ। ঘৃণার দৃষ্টিতে রঘুনাথের ঘুমন্ত

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল লালবাঈয়ের চোখে।

ধীরে ধীরে জাফরির পাশে ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়াল লালবাঈ। আকাশে দু-একটি তারার ঝিকিমিকি। লালবাঁধের জলে রাজহংসের মত জলবিহার-নৌকার সারি। আর অদূরে বিষ্ণুপুর রাজের অতিথিশালার কক্ষে স্তিমিত আলো। কি করবে সে? কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে কি যেন চিন্তা করল।

সুলেমান! হাবশি সুলেমানের কথা চকিতে মনে পড়ল লালবাঈয়ের।

আজীবন যাকে ঘৃণা করে এসেছে, জীবনের অদম্য উচ্চাশাকে সার্থক করে তুলতে হলে তার কাছেই ছুটে যেতে হবে।

সুলেমান খাঁ আজ তার একমাত্র ভরসা। ছলেবলে, যে-কোনও উপায়ে তাকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করতে হবে। প্রণয়পাত্র আজ ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে, কার্যসিদ্ধির জন্যে ঘৃণার পাত্রকে আজ প্রণয়পাত্রে রূপান্তরিত করতে হবে। সুলেমানকে জয় করতে পারলে বিষ্ণুপুরের সৈন্যসামন্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে সে। একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় পাবে, রাজ্যপরিচালনা করবে সে নিজে। আর তার সন্তানকে বসাবে রাজ্যের সিংহাসনে।

নিজের মনেই হাসল লালবাঈ। দুর্বলচিত্ত কামগ্রস্ত রঘুনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলে। প্রেম? না, রঘুনাথকে কোনওদিনই বোধ হয় মনেপ্রাণে ভালবাসেনি সে। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সোপান ভেবেছে তাকে।

ঘৃণা নয়, সুলেমান খাঁর সঙ্গে আজ প্রেমের অভিনয় করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় আত্মদানেও লজ্জা বোধ করবে না।

মনে মনে উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে তোশাখানায় বেশ বদল করতে ঢুকল লালবাঈ।

রক্তলাল রেশমি ঘাগরায় নূতন করে সাজালে সে নিজেকে। বুকের উল্লাস প্রলুব্ধি জাগাল লাল মখমলের কাঁচুলির বন্ধনে। সোনালি জরি আর হীরে-জহরতে ফুলদার লাল কাঁচুলির আগুন ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের আয়নায়। সলমা আর চুমকি চমক দিল আবরোয়ানের ওড়নায়। বেণীতে বাঁধলে চম্পা চামেলি। সুর্মা টানলে চোখের কোণে। সিঁথি বেয়ে কপালে নামল হীরের টায়রা। অধরে ওষ্ঠে কুঙ্কুম। কানে কস্তুরির সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে, বেশবাসে উগ্র আতর, নাকে পরলে বেশর, বাহুতে গজদন্তের বাজুবন্ধ। মণিবন্ধে নীলচুড়ি, হীরক বসানো কঙ্কণ। গলায় দুলিয়ে দিলে মুক্তার কণ্ঠমালা। পায়ে পাসুলি পাঁয়জোড়।

আলপাকার বোরখায় সারা শরীর ঢেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল লালবাঈ।

সমস্ত পৃথিবী নিঃঝুম। দু-একটা রাত-পাখির ডাক। লালবাঁধের পাড়ে ঝিঁঝির ঝিল্লিরব।

অতিথিশালার সামনে এসে দাঁড়াল লালবাঈ, একটা থামের আড়ালে। দ্বাররক্ষী মোগল বরকন্দাজ ঘুমে ঢুলছে তখন সিদ্ধির নেশায়।

এক ফাঁকে তাকে দ্রুত অতিক্রম করে গেল লালবাঈ। দেখলে ভিতরের প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে আরেকজন রক্ষী।

হঠাৎ যেন চমকে ফিরে তাকাল রক্ষী, টহল দিতে দিতে।

এপাশ ওপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজলে। তারপর নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে এগিয়ে গেল।

সুযোগ পেয়েই কিংখাবের পর্দা সরিয়ে সুলেমান খাঁর কক্ষে প্রবেশ করল লালবাঈ।

শ্বেতশুভ্র শয্যায় অর্ধশয়ান অবস্থায় বসে বসে একমনে তলোয়ার পরিষ্কার করছিল হাবশি সুলেমান।

লালবাঈয়ের মনে হল বিরাটকায় একটা দৈত্য যেন পালঙ্কের গির্দায় পিঠ আর মর্মরের

মেঝেতে পা রেখে আয়েশে বসে আছে। মসিকৃষ্ণ অসুরের হাতে ধারালো তরবারি।

মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল লালবাঈয়ের।

মনে পড়ল, বিবিবাজারের সেই ঘটনা।

ফকিরসাহেবের চবুতরা থেকে নসিব জেনে ফিরে আসছিল লালী। বাঁদী তল্লাটের তাঁবুতে প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্তে আসুরিক শক্তিতে দুটি হাত সেদিন এই জিনের বুকে বন্দী করেছিল লালীকে, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল লালী।

নিলামদার মনিবের আদেশে সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিল হাবশির পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিল।

তারপর নিলামদারের আদেশেই খোজা বান্দার দল বাঁধন খুলে দিয়েছিল তার। আর অদ্ভুত এক বিকৃত কুটিল হাসি হেসে তর্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিল হাবশি সুলেমান।

নিয়তির বিচিত্র পথ সেই সুলেমানকেই বারংবার এনে দিয়েছে লালীর জীবনে।

রহিম খাঁর মজলিসের দৃশ্যটা মনে পড়ল লালীর।

হঠাৎ নাচ থেমে গিয়েছিল সেদিন, তাল কেটে গিয়েছিল এই হাবশি সুলেমান পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই।

ভীরু কবুতরের মত সেদিন নাচ থামিয়ে ধীরে ধীরে হীরাবাঈয়ের কাছে এসে বসে পড়েছিল লালী। আর তার চোখে আতঙ্ক দেখে হাবশি সুলেমানের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ।

আশ্চর্য! নিয়তির নির্দেশেই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড় আতঙ্কটা আজ জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল লালবাঈ।

এক ফালি আলো এসে ঠিকরে পড়ল সুলেমানের তরবারিতে।

চমকে চোখ তুলল সুলেমান। আলপাকার বোরখায় ঢাকা রহস্যের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কৌন?

উত্তর দিল না লালবাঈ। ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে বোরখাব আবরণ তুলে ধরল।

বিস্ময় ফুটল সুলেমানের কণ্ঠে। অস্ফুটে বললে, লালবাঈ!

দুটি ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে লালবাঈ ইশারায় চুপ করতে বললে সুলেমানকে। তারপর বোরখা খুলে রেখে কাছে এগিয়ে গেল।

সুলেমান চাপা গলায় বললে, লালবাঈ, তুমি?

দ্বাররক্ষী টহল দিতে দিতে সুলেমানের গলা শুনতে পেল। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিকে দেখল। সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল তার।

পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে চঞ্চল ভাবে টহল দিতে শুরু করল সে আবার।

লালবাঈ সুলেমান খাঁর শরীর স্পর্শ করে বসল পালঙ্কের বাজুতে ঠেস দিয়ে।

সুর্মাটানা চোখে কটাক্ষ হেনে কামনার মৃদু হাসি দোলালে সে ঠোঁটের কোণে। বললে, আরজি আছে খাঁ বাহাদুর।

—আরজি?

উত্তর এল, বিষ্ণুপুরের তখ্‌তে আমার সন্তানকে বসাতে চাই খাঁ বাহাদুর।

হেসে উঠল সুলেমান। বললে, আর রঘুনাথের ভ্রাতা গোপালকে গোপনে হত্যা করতে চাও, এই তো?

লালবাঈ ঢলে পড়ল সুলেমানের বুকে। ফিসফিস করে বললে, না, খাঁ সাহেব। গোপালকে হত্যা করলেও বাঈজীর ছেলেকে সিংহাসন দেবে না হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর।

—তবে ?

হাসল লালবাঈ। মোহময় দৃষ্টিতে সুলেমানের দিকে তাকিয়ে দুটি কোমল বাহুর আলিঙ্গনে হাবশি মনসবদারের কণ্ঠলগ্না হল।

নেশা জেগে উঠল বুঝি সুলেমানের রক্তে। কিন্তু লালবাঈয়ের এই আকস্মিক ব্যবহার কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয় সুলেমানের। কেমন যেন রহস্যময়।

লালবাঈয়ের কামনামদির উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে অবশ হয়ে আসে সুলেমানের সব চেতনা।

কুহকিনীর সহস্রবাহু মরীচিকার বন্ধনে যেন সুলেমানকে নিস্তেজ করে দিতে চায় লালবাঈ।

অস্ফুটে সুলেমান প্রশ্ন করে, কি চাও তুমি লালবাঈ, কি চাও আমার কাছে ?

কৌতুকের মৃদু কটাক্ষ হেনে লালবাঈ ফিসফিস করে বলে, তোমাকে ! তোমাকে সুলেমান খাঁ।

নিঃশ্বাস রোধ করে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায় সুলেমান।

লালবাঈ তার দেহের যৌবনছন্দের লোভানি জ্বেলে আরও কাছে এগিয়ে আসে। বলে, শুধু সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়েই তৃপ্ত হতে চাই না খাঁ বাহাদুর, বিষ্ণুপুরের ইজ্জত চাই আমি, বেগম হতে চাই।

চুপ করে থাকে সুলেমান। এ কি অসম্ভব বাসনা ? এ কি অসম্ভব উচ্চাশা এক তুচ্ছ কাঞ্চনীর ?

লালবাঈ ফিসফিস করে বলে, রঘুনাথ আমার খেলার পুতুল খাঁ বাহাদুর, আমার হুকুমের গোলাম বানিয়েছি তাকে। কিন্তু তার প্রজাদের বশ করবার মতো শক্তি নেই আমার। আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনে রাজ্যের সব প্রজা, সব কর্মচারী আব ফৌজ ভোজনতলায় আসবে আমার নফর রঘুনাথের হুকুমে।

—তারপর ?

সুলেমানের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনে লালবাঈ। বলে, সেই সময় তোমার রিসালহা সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করবে তুমি, জয় করে নেবে বিষ্ণুপুর রাজ্য।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকায় সুলেমান। উত্তর দিতে পারে না লালবাঈয়ের কথার।

লালবাঈ আবার ফিসফিস করে বলে, বাদশাহ হতে চাও না তুমি, রাজত্ব চাও না ? ভেবে দেখো মেহের, তুমি হবে বিষ্ণুপুরের বাদশাহ, আর আমি...আমি তোমার বেগম।

সুলেমানের দিকে কামমদির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে লালবাঈ।

মনে মনে যেন শিউরে ওঠে সুলেমান। বেহেস্তের হুরীর মত এই রূপের আড়ালে এ কি নৃশংসতা, এ কি অচিন্তনীয় বিশ্বাসঘাতকতা ?

ধীরে ধীরে লালবাঈয়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায় সুলেমান।

বলে, ফিরে যাও তুমি লালবাঈ, ফিরে যাও। আমাকে ভাবতে দাও, আমাকে ভাবতে দাও।

বারে বারে নিজের মূল্য যাচাই করেছে লালবাঈ। অনুরোধে অনুরাগে যা কিছু কামনা জানিয়েছে সে, রঘুনাথ আদেশ বলেই গ্রহণ করেছে।

রঘুনাথ-অনুজ গোপাল সিংহের জন্মদিন উপলক্ষে সমস্ত বিষ্ণুপুর-অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ভোজনতলায়। উৎসবের অনুষ্ঠানে সপ্তাহব্যাপী উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিল। দেওদার পাতায়, আমের শাখায়, লতায় কুসুমে সাজানো হয়েছিল সারা নগর।

সিংহদরজার রোশনচৌকি নানা বর্ণের রেশমবস্ত্রে, রঙিন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেদিন। নহবত সুর ধরেছিল সুখের, আনন্দের।

আর, এই দৃশ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেছিল লালবাঈ।

আদরে ঢলে পড়ে অভিমানের সুরে বলেছিল, চন্দ্রপ্রভাকেই তুমি ভালবাসো রাজাবাহাদুর, আর গোপালকে। তোমার কাছে কানাকড়িরও কিম্মত নেই লালবাঈয়ের।

সোহাগের স্পর্শে লালবাঈকে কাছে টেনে নিয়ে রঘুনাথ মৃদু হেসে বলেছিল, কেন লালী ?

—আমার পুত্রের জন্যও কি এমনি উৎসবের ব্যবস্থা হবে ? প্রশ্ন করেছিল লালবাঈ।

—হবে, এর চেয়েও অনেকগুণ বেশি হবে লালী।

—কিন্তু আজ তোমার প্রজারা যে উৎসাহ নিয়ে এসে জমা হয়েছে ভোজনতলায়, কাঞ্চনীর নিমন্ত্রণও কি তারা সেদিন এভাবে রক্ষা করবে ?

রঘুনাথ ক্রোধের স্বরে বলেছিল, লালবাঈয়ের অসম্মান ঘটলে কোনও প্রজা রঘুনাথের কাছে ক্ষমা পাবে না লালী, তোমার অপমানে আমার অপমান। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখালে প্রাণদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হব না আমি।

সেই দিনের এই প্রতিশ্রুতিই স্মরণ করিয়ে দিল লালবাঈ। আর রঘুনাথ বললে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা লালী।

নিজের মনকে যুক্তির সাহায্যে প্রবোধ দিতে চায় রঘুনাথ। লালবাঈয়ের সন্তানই তার একমাত্র সন্তান। কাঞ্চনী হোক, বিধর্মী হোক, এই শিশুর দেহে রঘুনাথের রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তা হলে সিংহাসনের মর্যাদা কেন পাবে না সে ! শুধু তাদের প্রণয়ে মন্ত্রোচ্চারণের স্বাক্ষর নেই বলে !

ক্রুদ্ধ স্বরে হুকুম জানিয়ে দিল রঘুনাথ।

ঢোলশোহরত খবর ছড়িয়ে দিল চতুর্দিকে। হিন্দু রাজকর্মচারী আর বিশিষ্ট প্রজাদের নামে নিমন্ত্রণ পাঠাল রঘুনাথ।

লালবাঈয়ের পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভোজনতলায় আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণ নয়, হুকুমনামা ! নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে, শাস্তি প্রাণদণ্ড। ঢোলশোহরত ছড়িয়ে দিল এই আদেশ।

প্রজারা অসন্তুষ্ট হল, রাজকর্মচারীরা ক্রুদ্ধ হল। মল্লবংশ কোনও দিন উপপত্নীর সন্তানের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করেনি এভাবে, প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানায়নি প্রজাবর্গকে। আর রঘুনাথ বিষ্ণুপুর রাজ্যের সব সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায় এক কাঞ্চনী উপপত্নীর নির্দেশে।

তবু নিমন্ত্রণ অস্বীকার করার সাহস হল না কারও। সুবাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজা রঘুনাথের অত্যাচার বড় নৃশংস, যুক্তিহীন। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

কেউই জানল না রাজপ্রাসাদের নিমন্ত্রণের পিছনে লালবাঈয়ের কি অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে।

জ্যোতিষাচার্য ভাবলেন, ভোজনতলায় কাঞ্চনীর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা, কর্মচারী, সৈন্যদের নিমন্ত্রণ করার পিছনে কি কোনও উদ্দেশ্য নেই ?

নিশ্চয় কোনও অভিসন্ধি আছে এর পিছনে।

দেওয়ানজিকে গোপনে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছি দেওয়ানজি, এই নিমন্ত্রণের আড়ালে।

—কি ষড়যন্ত্র গুরুদেব ?—প্রশ্ন করলেন দেওয়ানজি।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন।—হিন্দু বিষ্ণুপুররাজ্যকে বিধর্মীর রাজ্যে পরিণত করতে চায়

লালবাঈ। ভোজনতলায় সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করাতে চায়। কাঞ্চনী জানে ধর্মই হিন্দুর মেরুদণ্ড, তাই ধর্মনাশ করতে চায় যবনী।

চমকে উঠলেন দেওয়ানজি। দেওয়ানজির কাছ থেকে এ সংবাদ শুনে চমকে উঠলেন সভাপণ্ডিত।

বললেন, এর প্রতিকার ?

মনে মনে হাসলেন, জ্যোতিষাচার্য।

জ্যোতিষাচার্য জানেন, চন্দ্রপ্রভার কাছে ধর্মের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, ধর্মের স্বার্থে নিজের স্বার্থকেও বলি দিতে পারে চন্দ্রপ্রভা।

শুধু এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পৌঁছে দিতে হবে চন্দ্রপ্রভার কানে।

লালবাঈ বিদায় নিতেই সারা ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল সুলেমান।

ঢোলশোহরতের খবর শুনে চিন্তিত হয়ে উঠল।

জরিয়ার হাতে গোপন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল চন্দ্রপ্রভার। যে লালবাঈকে পাবার বাসনায় সারা জীবন ছুটে চলেছিল সুলেমান, আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও বুঝি-বা ছুঁড়ে ফেলতে চায়।

সুলেমান নিজেই বুঝতে পারে না, কেন এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেল তার মনে। বাসনা চরিতার্থ করার আগ্রহেই বড় হতে চেয়েছে বাঁদীবাজারের হাবশি প্রহরী ; ঐশ্বর্যের পুরস্কারকে তুচ্ছ করেছে, রহিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে, নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এই যত্নলালিত কামনা পূরণের আশাতেই মুর্শিদকুলির পরোয়ানা নিয়ে ছুটে এসেছে সে।

কিন্তু এমন অযাচিতভাবে উপযাচিকার অর্ঘ্য নিয়ে লালবাঈ নিজেই ধরা দিতে চাইবে তার লালসার বন্ধনে, কোনও দিন কল্পনাও করেনি সুলেমান।

আপন শক্তিতে অধিকার করা নয়, যেন আপন আত্মাকে শয়তানের হাতে বেচে দেওয়া। এমনভাবে তো লালবাঈকে চায়নি সে !

উপযাচিকা লালবাঈ যেন তার অহঙ্কারের গায়ে আঘাত হেনে দিয়ে গেছে। যেন তাচ্ছিল্যের হাসিতে বলে গেছে, লালবাঈ আপন ইচ্ছায় ধরা না দিলে কোনও শক্তি দিয়েই তাকে অধিকার করা যায় না, কেনা যায় না তাকে রাজৈশ্বর্য দিয়েও।

হতাশা দেখা দিল সুলেমানের চোখে। এই মিথ্যা মরীচিকার পিছনেই কি সারাজীবন ছুটে চলেছে সে ! এই নৃশংস, হীন, অবিশ্বাসিনীর রূপের পিছনে ?

নিজের মনেই হাসল সুলেমান। নারীর সুন্দর মুখের আড়ালে অবিশ্বাসিনীর মূর্তি এমনভাবে লুকিয়ে থাকে জানত না। কল্পনাও করেনি, আকাঙ্ক্ষার সর্পিল দৃষ্টিতে এভাবে প্রণয়পাত্রের জীবন বিষাক্ত করে তুলতে চাইবে রঘুনাথের প্রণয়িনী।

হঠাৎ তাই কর্তব্য বড় হয়ে দেখা দিল সুলেমানের চোখে।

গোপনে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে সুলেমান।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নত হয়ে তরবারি রাখলে সে চন্দ্রপ্রভার পদপ্রান্তে। লালবাঈয়ের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সুলেমান, আর স্বচ্ছ পর্দার আবরণের ওপারে এই ভিন্ন রূপ দেখে শ্রদ্ধায় নত হল সে।

বীরাঙ্গনার মূর্তি যেন ! মুখে মাতৃস্নেহের অপূর্ব হাস্য, সুধাবর্ষী চোখে কমনীয় রূপ।

সুলেমান বললে, মুর্শিদকুলি খাঁর যে পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলাম রাজমহিষী, সে

পরোয়ানা ফিরে নিয়ে চলেছি। যে স্বাধীনতা হরণ করতে এসেছিলাম, বিষ্ণুপুর সে স্বাধীনতা হারিয়ে বসে আছে এক তুচ্ছ কাঞ্চনীর কাছে।

চুপ করে রইল চন্দ্রপ্রভা। কি উত্তর দেবে সে এ সত্য উক্তির !

সুলেমান বললে, কাঞ্চনীর চক্রান্ত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করুন রানীসাহেবা। রক্ষা করুন আপনার সন্তানতুল্য গোপালের ভবিষ্যৎ সিংহাসন।

লালবাঈয়ের চক্রান্তের আভাস পেয়ে ক্রোধের দৃষ্টি ফুটে উঠল চন্দ্রপ্রভার চোখে।

দৃঢ় গলায় জ্যোতিষাচার্যকে উদ্দেশ করে বললে, আর নয়, অনেক সহ্য করেছি আমি। বিহিত করুন গুরুদেব।

চন্দ্রপ্রভাকে কুর্নিশ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল সুলেমান। না, রঘুনাথকেও লালবাঈয়ের কুটিলতার আভাস দিয়ে যাবে সে। যে রূপের কাছে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়েছে তারা মাথা, তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করে যাবে।

বিদায় নিয়ে সুলেমান চলে যেতেই জ্যোতিষাচার্য বললেন, মিথ্যা নয় মা সুলেমান খাঁর কথা। কিন্তু শত্রু আজ লালবাঈ নয়, শত্রু রঘুনাথ। প্রবঞ্চনা করে সমগ্র বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের ধর্মনাশ করতে চায় রঘুনাথ। কারণ হিন্দুর ধর্ম ওই বিধর্মী কাঞ্চনীর সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহকে স্বীকৃতি দেবে না, তার সন্তানকে বৈধ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করবে না।

চুপ করে রইল চন্দ্রপ্রভা, উত্তর দিতে পারল না জ্যোতিষাচার্যের অনুচ্চারিত প্রশ্নের। ধর্মনাশ ? ধর্মের জন্যেই তো জীবন, মনে হল চন্দ্রপ্রভার। সেই ধর্ম হারাবে বিষ্ণুপুর ?

জ্যোতিষাচার্য পুনরায় বললেন, স্বহস্তে বিষপ্রয়োগ করে রঘুনাথ গোপালকে হত্যা করতে চায়, গুপ্তচরের কাছে এ-সংবাদ পেয়েছি মা !

উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি তুলে জ্যোতিষাচার্যের মুখের দিকে তাকাল চন্দ্রপ্রভা, দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার চোখ বেয়ে।

পরমুহূর্তেই ছুটে পালিয়ে এল চন্দ্রপ্রভা।

কক্ষে ফিরে এসে নিদ্রিত গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরল। না, না, সব অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে তাকে ভ্রাতৃহন্তার হাত থেকে।

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদের প্রতিটি পাথরে যেন সেই পুরনো দিনের অভিশাপ বিষনিঃশ্বাস ফেলছে। বীর সিংহের অভিশপ্ত বংশে পুনরায় বুঝি সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

নৃশংস বীর সিংহ আপন ভ্রাতাকে বিষপ্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়নি। একটির পর একটি সন্তানকে হত্যা করেছিল রাজসিক অহঙ্কারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্জন সিংহকেও হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল সামান্য কারণে। রানী শিরোমণির কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করেনি সেদিন।

জল্লাদের মায়া-মমতাই গোপনে রক্ষা করেছিল দুর্জন সিংহকে। সেই দুর্জন সিংহের পুত্র রঘুনাথের জীবনেও আজ বীর সিংহের নৃশংসতা নেমে এসেছে। কিন্তু গোপাল তো শুধু একটি কিশোর নয়, সে আজ বিষ্ণুপুরের ধর্মের প্রতীক। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

কিশোর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সজল চোখে গবাক্ষে এসে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা।

দেখলে, নবাবি রিসাল্‌হা সৈন্যের দল নগরদ্বার অতিক্রম করার জন্য তৈরি হচ্ছে বিদায়-নহবত বাজিয়ে। ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে বাতাসে।

উদাসভাবে রাজোদ্যানের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা। দেখলে, প্রাসাদের শবরী দেহরক্ষী নারীর দল প্রতিদিনের মতই তীর-ধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছে।

অসহ্য এ দুশ্চিন্তা। হঠাৎ যেন দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার পথ খুঁজে পেল চন্দ্রপ্রভা।

সুরঞ্জাক্ষীকে ডেকে তার হাতে গোপালের ভার দিয়ে শয্যাকক্ষ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে চন্দ্রপ্রভাও উদ্যানে নেমে এল। শবরী দেহরক্ষীদের সঙ্গে লক্ষ্যভেদ-ক্রীড়ায় নিজেও মেতে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মনের মধ্যে তবু একটি কথাই বারংবার ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ চোখে পড়ল রঘুনাথ কক্ষের দিকে চলেছে।

ক্লান্তদেহে উদ্যানের খেলা সাঙ্গ করে দ্রুত ফিরে এল চন্দ্রপ্রভা, হাতে তীর-ধনুক। কিন্তু শয্যাকক্ষে প্রবেশ করার পূর্বেই দূরের অলিন্দে থমকে দাঁড়াল।

দেখলে, সুরঞ্জাক্ষী অদূরে অপেক্ষা করছে, আর রঘুনাথ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শয্যায় জাগ্রত গোপালের দিকে। কিশোর গোপালও সহাস্যমুখে তাকিয়ে আছে রঘুনাথের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রঘুনাথের দিকে হঠাৎ দুটি হাত বাড়াল গোপাল।

রঘুনাথের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিল। গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ভুল বুঝতে পেরেছে রঘুনাথ। নাকি সুলেমান খাঁর সাবধানবাণী শুনেই সচেতন হয়ে উঠেছে।

এ কি করতে চলেছে সে! এমন দেবতুল্য ভ্রাতাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে উপপত্নীর সন্তানকে উত্তরাধিকার দিতে চলেছে?

অনুশোচনা দেখা দিল রঘুনাথের মনে।

বললে, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সুরঞ্জাক্ষী! চন্দ্রপ্রভার ওপর, অনুজের ওপর যে অবিচার করেছি তার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই?

ভুল, ভুল।

দুহাত বাড়িয়ে ছুটে এল রঘুনাথ, গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরার আগ্রহে। আর দূরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় শিউরে উঠল চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা বুঝল না। দূর থেকে রঘুনাথকে লক্ষ করতে করতে শিউরে উঠল, ভাবলে, দুহাতে কণ্ঠরোধ করে গোপালকে হত্যা করতে চলেছে রঘুনাথ।

সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ল চন্দ্রপ্রভা।

বিষাক্ত তীর এসে বিঁধল রঘুনাথের পিঠে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল রঘুনাথ।

ছুটে এল চন্দ্রপ্রভা।

বিষের যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতে করতে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে, চন্দ্রা, তুমি! তুমি হত্যা করলে আমাকে?

বিচিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত হল চন্দ্রপ্রভার মুখ। বললে, যে ভ্রাতা সহোদরের জীবননাশ করতে উদ্যত হয় তাকে হত্যা করা পাপ নয়।

অস্ফুটে কি যেন বলতে গিয়ে বিষের যন্ত্রণায় নিশ্চুপ হল রঘুনাথের কণ্ঠ।

সুরঞ্জাক্ষীর চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল।

বললে, ভুল করেছ চন্দ্রা, ভুল। রাজা রঘুনাথ ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন তোমার কাছে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপন সহোদর গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিলেন।

বিস্ময়ের চোখে উদাসভাবে সুরঞ্জাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রপ্রভা। দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামল!

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠে চন্দ্রপ্রভা রঘনাথের মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ল।

বত্রিশ

বার্তা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

ধর্মের জন্য পতিঘাতিনী হয়েছে চন্দ্রপ্রভা, প্রজার স্বার্থের জন্য আপন হাতে মুছে ফেলেছে তার সীমন্তের সিঁদুর। ধর্ম রক্ষা পেয়েছে, রাজ্য রক্ষা পেয়েছে রঘুনাথের অনাচারের হাত থেকে।

উল্লাসের ধ্বনি তুলে ছুটে এল বিষ্ণুপুর-অধিবাসীরা। ভিড় করে এল। রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশে জয়ধ্বনি উঠল রানী চন্দ্রপ্রভার।

জনতার আনন্দের উন্মত্ত চিৎকারে চন্দ্রপ্রভার দর্শন পাবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল।

দর্শন-গবাক্ষে অশ্রুসিক্ত চোখে এসে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা।

প্রত্যূষে রাজদর্শন অতীব শুভকর বলেই প্রজারা ভিড় করে আসত এই দর্শন-ঝরোকার নীচে। বীর হাম্বীর আর রানী সুদক্ষিণা, বীর সিংহ আর রানী শিরোমণি, দুর্জন সিংহ আর তার পত্নী প্রতিদিন এসে দাঁড়াত এই গবাক্ষে, এসে দাঁড়াত রাজা রঘুনাথ আর রানী চন্দ্রপ্রভা। রাজদর্শন লাভ করে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যেত প্রজারা।

কিন্তু এই প্রাচীন রীতিকেও বিনষ্ট করেছিল রঘুনাথ। লালবাঈয়ের প্রমোদভবনে সুরার নেশায় ডুবে থেকে ভুলে গিয়েছিল, কত আন্তরিক আগ্রহে প্রজার দল এসে ভিড় করে রাজদর্শনের লোভে।

বহুদিন পরে আজ আবার নতুন করে দর্শন-গবাক্ষে এসে দাঁড়াল চন্দ্রপ্রভা, সঙ্গে গোপাল।

চন্দ্রপ্রভার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে, গোপালের মুখচন্দ্রিমায় মুগ্ধ হয়ে হিংস্র উত্তেজনায় লালবাঈয়ের মৃত্যুকামনা করে চিৎকার করে উঠল জনতা। পরমুহূর্তে হাতের সড়কি, বর্শা, বিষাক্ত তীর আর ধনুক তুলে ধরে ছুটে গেল তারা লালবাঁধের দিকে। লালবাঈয়ের অট্টালিকা নূতনমহলের দিকে।

লালবাঁধের নামকরণ সার্থক করে তুলতে চায় তারা। লালবাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে চায় লালবাঁধের স্ফটিকস্বচ্ছ জল।

আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল লালবাঈ।

রাজা রঘুনাথকে হত্যা করেছে রানী চন্দ্রপ্রভা—এ খবর শুনে লালবাঈ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মণিবানু ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, উন্মত্ত আক্রোশে জনতা ছুটে আসছে লালবাঈকে হত্যা করবার জন্যে, লালবাঁধের জলধারা লালবাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে।

আপন শিশুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল লালবাঈ। ভয়ে কেঁপে উঠল উচ্ছৃঙ্খল জনতার হিংস্র উত্তেজনার দিকে তাকিয়ে।

তার বিমূঢ় বিভ্রান্ত চোখের সামনে যেন পথ নেই, উপায় নেই।

তবু বাঁচতে চায় লালবাঈ, বাঁচাতে চায় তার আপন সন্তানকে।

হঠাৎ যেন ভরসার স্থল খুঁজে পেল লালী। আজ আর চক্রান্ত নয়, এখন আত্মরক্ষা করতে চায়। সন্তানকে বাঁচাতে চায়। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় চিরতরে হাবশি সুলেমান খাঁর শয্যাসঙ্গিনী হতেও দ্বিধা করবে না।

রিসাল্‌হা সৈন্যদের বিদায় দিয়ে রাজ-অতিথিশালায় অপেক্ষা করছে সুলেমান খাঁ। দরবারের কাছে বিদায় নেবার জন্যে।

বিষ্ণুপুরের গৃহবিদ্রোহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায়নি সুলেমান। কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে রঘুনাথের মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছবে কল্পনাও করেনি।

সুলেমান দেখতে পেল সমগ্র জনতা ছুটে আসছে লালবাঈয়ের প্রমোদভবনের দিকে।

জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল লালবাঈ। বিবিবাজারের একশো মোহর কিম্মতের এই বাঁদীকে বেগম করার দুঃস্বপ্নে সারা জীবন ছুটে বেড়িয়েছে হাবশি সুলেমান। প্রতিবারেই লালবাঈয়ের চোখে দেখেছে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

কাঞ্চনী লালবাঈয়ের প্রেম চেয়েছে সুলেমান। ভালবাসতে চেয়েছে তাকে। পরিবর্তে উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লালবাঈ। ভালবাসা নয়, তার দেহরূপ উপঢৌকন দিতে চেয়েছে চক্রান্তের বিনিময়ে। তাই সারাজীবনের অন্ধ কামনায় যাকে স্বপ্ন দেখেছিল সুলেমান, তাকেই ঘৃণা করেছে সে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসে।

চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই রাজা রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে সে। বলেছে, অবিশ্বাসিনী এই তুচ্ছ তয়ফার হাত থেকে নিজেকে বাঁচান রাজাবাহাদুর। রাজ্য রক্ষা করুন।

আর লালবাঈয়ের চক্রান্তের কথা শুনে চমকে উঠেছে রঘুনাথ। জীবনের সব ভুল ভেঙে গেছে তার। তাই ছুটে গেছে সে চন্দ্রপ্রভার কাছে। তার শেষ সান্ত্বনার কাছে।

সে-কথা ভাবতে ভাবতেই অতিথিশালার ঝরোকায় এসে দাঁড়াল সুলেমান। সশস্ত্র জনতার আক্রোশধ্বনি শুনে হঠাৎ উল্লাসে সশব্দে হেসে উঠল। মসিকৃষ্ণ দৈত্য-চেহারার হাবশি সুলেমান খুশিতে হেসে উঠল সাদা সাদা দাঁত বের করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল তার সারা মুখ। এ কি বিশ্বাসঘাতকতা, এ কি অন্যায় করেছে সে। একটি অবলা নারীকে কেন সে নৃশংস জল্লাদের মত হত্যা করতে চলেছে। সুলেমান বুঝতে পারল, চন্দ্রপ্রভার কাছে চক্রান্তের আভাস দিয়ে এসেছে বলেই লালবাঈকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসছে জনতা। গোপন বিশ্বাসে যে তার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তাকেই এভাবে যূপকাষ্ঠে তুলে দিল সুলেমান? অনুশোচনায় দগ্ধ হল হাবশি সুলেমানের মন। চন্দ্রপ্রভাকে বাঁচাতে চেয়েছে সে, বাঁচাতে চেয়েছে বিষ্ণুপুর রাজ্যকে।

কিন্তু লালবাঈয়ের মৃত্যু তো সে চায়নি। কোনও প্রতিহিংসার আগুন আজ আর তার বুকে জ্বলছে না। তবে? পদধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়াল সে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লালবাঈয়ের দিকে।

যাকে আজীবন ঘৃণা করেছে লালবাঈ, যে তার চক্রান্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রেখে তার রূপযৌবনকে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে, বেদনার অশ্রুসিক্ত চোখে তারই কাছে আজ সে ছুটে এসেছে শেষ ভরসাস্থল ভেবে।

হাবশি সুলেমান একদিন লালবাঈকে ইনাম চেয়ে তাকে অপমানিত করেছিল রহিম খাঁর জলসামহলে। আর সেই অপমানের প্রতিশোধ চেয়ে লালবাঈ কোতল করতে চেয়েছিল হাবশি সুলেমানকে।

যার জীবন নিতে চেয়েছিল একদিন রহিম খাঁর আসরে, তারই কাছে জীবন ফিরে পাবার আগ্রহে ছুটে এসেছে লালবাঈ:

দুহাতে শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে লালবাঈ কান্নার স্বরে ভেঙে পড়ল। কথা নয়, শুধু দৃষ্টি দিয়েই যেন জীবন ভিক্ষা চাইলে।

মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেল হাবশি সুলেমানের মনের গভীরে। দুটি মসিকৃষ্ণ সবল হাত বাড়িয়ে লালবাঈয়ের সন্তানকে কোলে তুলে নিল সুলেমান।

বললে, ভয় নেই, ভয় নেই লালবাঈ। নিজের জীবন দিয়েও তোমাকে রক্ষা করব।

দ্রুত নেমে এল সুলেমান, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সুলেমানের বিস্তৃত পিঠের আড়ালে ভয়ে মুখ লুকোল লালবাঈ।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সুলেমান।

কিন্তু তার আগেই খবর পৌঁছে গেল জনতার কাছে।

দামামার সঙ্কেত বেজে উঠল। নগরদ্বার সিংহ দরজা বন্ধ হয়ে গেল সুলেমানের ঘোড়ার সামনে। জনতা ছুটে এল পলাতকা লালবাঈয়ের দিকে।

তলোয়ার উঁচিয়ে ফিরে দাঁড়াল সুলেমান। জীবন থাকতে লালবাঈয়ের অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না সে জনতাকে।

কিন্তু তীরের বিরুদ্ধে তরবারি অসহায়।

ঝাঁক ঝাঁক বিষাক্ত তীর এসে পড়ে চতুষ্পার্শ্বে। বুক দিয়ে লালবাঈকে রক্ষা করতে চায় সুলেমান।

হঠাৎ একটি তীর এসে বিঁধল সুলেমানের বুকে।

লালবাঈয়ের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ দিল সুলেমান। রক্তাক্ত একটি অসুরের শরীর লুটিয়ে পড়ল রূপময়ী লালবাঈয়ের পায়ের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষাচার্য ইশারায় তীর ছুঁড়তে নিষেধ করলেন জনতাকে। এভাবে দ্রুত মৃত্যুর আশীর্বাদ দিতে চান না তিনি কাঞ্চনীকে। তিল তিল করে যেভাবে দুঃখ দারিদ্র্য অনাচার অত্যাচারে বিষ্ণুপুরকে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছিল লালবাঈ, তেমনি তিল তিল করেই মৃত্যু বরণ করতে হবে তাকে।

তবু আপন শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে রইল কাঞ্চনী। তার প্রাণ না নিয়ে তার সন্তানের প্রাণ নিতে পারবে না কেউ। কিন্তু লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হল লালবাঈ। জনতার আক্রমণে তার বুকের শিশুপুত্র ছিটকে পড়ল মাটিতে।

লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন জ্যোতিষাচার্য।

প্রজার রক্ত শোষণ করে তৈরি হয়েছে এই লালবাঁধ, এক কাঞ্চনীর নৌবিলাসের ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে আজীবন দারিদ্র্য-অনাহার-মত্যু বরণ করতে হয়েছে শত শত অধিবাসীকে। ঘাতকের অস্ত্র নয়, তিল তিল করে যেভাবে বনবিষ্ণুপুর অত্যাচারিত হয়েছে লালবাঈয়ের অদম্য উচ্চাশা আর রাজসিক বিলাসব্যসন চরিতার্থ করে, তেমনি তিল তিল করে দুঃসহ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হবে লালবাঈকে।

যে সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীতে রঘুনাথের সঙ্গে নৌকাবিহারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হত লালবাঈয়ের, সেই সুখস্মৃতি বিজড়িত ময়ূরপঙ্খীতে নিয়ে যাওয়া হল বন্দিনী লালবাঈকে।

সন্তানের জন্যেই একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ চেয়েছিল লালবাঈ। নিঃসন্তান নয় রঘুনাথ, তার সন্তানই রঘুনাথের সন্তান। তবু তাকে বঞ্চিত করে কেন গোপাল সিংহাসন পাবে বুঝতে পারে না সে। এ কেমন যুক্তি! একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহই কি পরম সত্য? শুধু ধর্ম? জীবনের সত্য কি প্রকৃত সত্য নয়?

লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা রূপময়ী কাঞ্চনীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। ময়ূরপঙ্খী তখন ধীরে ধীরে লালবাঁধের মাঝদরিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, আর অদূরে মাটিতে লুটিয়ে পড়া শিশুসন্তানকে দেখে, শিশু সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিতে চাইল শৃঙ্খলিত লালবাঈ। তার আকুল কান্না দেখে হেসে উঠল কয়েকজন প্রজা।

জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গরবিনীর লাঞ্ছনায়।

ধীরে ধীরে ময়ূরপঙ্খী এসে থামল লালবাঁধের মাঝ দরিয়ায়।

পাটাতনের নির্দিষ্ট ছিদ্র খুলে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ আক্রোশে যেন লালবাঁধের জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল লালবাঈয়ের দিকে। আর মাঝিমাল্লারা ময়ূরপঙ্খী ত্যাগ করে চলে এল নিমজ্জমান নৌকোর মধ্যে শৃঙ্খলে বাঁধা লালবাঈকে ফেলে রেখে। সেই ময়ূরপঙ্খীর মধ্যে লালবাঈ একা নিঃসঙ্গ। যে ময়ূরপঙ্খী তারই বিলাসবাসনা চরিতার্থ

করার জন্য তৈরি করিয়েছিল রঘুনাথ।

শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লালবাঈ। অনুনয়ের কাতরোক্তি ভেসে এল—আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও মাথা পেতে নেব। নিরপরাধ ওই শিশুকে বাঁচাও।

কেউ কর্ণপাত করল না তার অনুরোধে। সহানুভূতি দেখাল না কেউ।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নিমজ্জমান বজরা ত্যাগ করে চলে গেল তারা।

জ্যোতিষাচার্য তখনও দাঁড়িয়ে আছেন পথের একপাশে। বিষ্ণুপুর রাজ্য রক্ষা পেয়েছে, রক্ষা পেয়েছে ধর্ম। কিন্তু হঠাৎ শোকে ব্যথিত হয়ে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য রঘুনাথের জন্য। লালবাঈয়ের জন্য এবং ভূলুণ্ঠিত লালবাঈ ও রঘুনাথের সন্তানের জন্য। সস্নেহে মাটি থেকে তুলে নিলেন তিনি লালবাঈয়ের সন্তানকে। স্থিরদৃষ্টিতে রোরুদ্যমান শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুঃখে ব্যথায় সমবেদনায় মুখের ভাব বদলে গেল তাঁর। দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু নামল। মাতার অপরাধে শিশুকে শাস্তি দিতে চান না তিনি। যে যবনকন্যার প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণা, যাকে স্পর্শ করলেও ধর্মচ্যুত হবার ভয় করেন, তারই শিশুসন্তানকে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন। সকলের অলক্ষ্যে।

উত্তেজিত জনতা লালবাঈয়ের দিকেই ছুটে গিয়েছিল, তার এই ভূলুণ্ঠিত সন্তানকে কেউ লক্ষই করেনি।

জ্যোতিষাচার্য মনে মনে অঙ্গীকার করলেন, এই সন্তানকে তিনি স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন, সঙ্গোপনে। কারণ, এই সন্তান রঘুনাথ ও লালবাঈয়ের ভালবাসারই সন্তান।

ওদিকে ধীরে ধীরে লালবাঁধের গভীরতায় ডুবে গেল শৃঙ্খলিত লালবাঈয়ের যৌবন রূপ, তার উদ্ধত কামনা, বিষাক্ত বিলাস।

অদৃশ্য হল বহুমূল্য ময়ূরপঙ্খী। লালবাঁধের অতলে তলিয়ে গেল একটি অসামান্যা নারীর দেহ। এক অতি সামান্যা নারীর অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

তেত্রিশ

নৃশংস উল্লাসে আত্মহারা জনতা ফিরে এল দরবারভবনে।

শান্তি-স্তোত্র গাইলেন সভাপণ্ডিত—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপস্যতঃ॥

সর্বভূতই যখন আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?

রঘুনাথের মৃত্যুশোক আর ধর্মরক্ষার আনন্দ—দুটি অনুভূতির সমন্বয়ে সমাহিত হবার জন্যে জনতাকে উপদেশ দিলেন সভাপণ্ডিত।

নিষ্কণ্টক হয়েছে বিষ্ণুপুর, শান্তি ফিরে পেয়েছে। শূন্য সিংহাসনে বসাতে হবে রঘুনাথ-অনুজ গোপাল সিংহকে। তৈরি হতে হবে অভিষেক উৎসবের জন্যে।

তাই তৎপর হয়ে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, কিশোর গোপাল সিংহের আড়ালে থেকে শাসনকার্য চালাবেন রানী চন্দ্রপ্রভা—যিনি বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছেন অনাচারের

হাত থেকে।
দেওয়ানজি এবং অমাত্যের দল সম্মতি জানালেন জ্যোতিষাচার্যের অভিমত শুনে। উল্লসিত হল প্রজাবর্গ।
অভিষেকের সুর বেজে উঠল নহবতখানায়।
প্রজারা ছুটে গেল রাজপ্রাসাদে রানী চন্দ্রপ্রভার কাছে, শুভ সংবাদ জানিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে।
কিন্তু প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে চিৎকার থেমে গেল তাদের। হরিনাম-সংকীর্তনে আকাশ বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে।
শ্যামবাঁধের পাড়ের শ্মশানভূমিতে রঘুনাথের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এল প্রজারা। পিছনে পিছনে সম্রাজ্ঞীর রত্নভূষণে অলঙ্কৃতা চন্দ্রপ্রভা। চোখের কোণে অশ্রু নেই, অনুশোচনার চিহ্ন নেই মুখে।
চন্দন কাঠে চিতা সাজানো হল। জরিয়া দাসীর দল সুগন্ধি আতর অগুরু অঙ্গরাগ ঢেলে দিল চন্দনের শয্যায়।
ক্রমে ক্রমে মৃদু মধুর তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল চন্দ্রপ্রভার মুখে। সম্রাজ্ঞীর বসনভূষণে সজ্জিতা রানী চন্দ্রপ্রভা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা রানী চন্দ্রপ্রভা। সীমন্তে সিন্দুর, হাতে শঙ্খবলয়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেশমবস্ত্রের ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখচন্দ্রমায় হঠাৎ যেন তৃপ্তির হাসি দেখা দিল।
সুরঞ্জাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে অপাঙ্গের ইশারায় হাতছানি দিল চন্দ্রপ্রভা।
গোপালকে চুম্বন করে সুরঞ্জাক্ষীর হাতে তুলে দিল তাকে। বললে, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম সখী।
দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সুরঞ্জাক্ষীর। বললে, কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে যেতে চাই চন্দ্রপ্রভা!
—না না, তা হয় না সুরঞ্জাক্ষী। বাধা দিয়ে উঠল চন্দ্রপ্রভা।
তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল রঘুনাথের চিতাশয্যার সামনে।
ভিড় ভেঙে পড়ল শ্মশানভূমিতে। মুহূর্তের মধ্যে খবর রটে গেল চতুর্দিকে। বালবৃদ্ধবনিতার দল ছুটে এল এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার লোভে।
সতী হবে চন্দ্রপ্রভা। সহমৃতা হবে পতিঘাতিনী এক নারী।
সতীদাহ নয়, সহমরণ নয়। জন্মজন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পতি আর পত্নীর পুনর্বিবাহ যেন। তাই নববধূর বেশে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে চন্দ্রপ্রভা, মুখে টেনেছে লাজনম্র তৃপ্তির আবেশ।
জ্যোতিষাচার্য বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। —এ কি ভুল করতে চলেছ মা! বিষ্ণুপুরের শাসনভার হাতে নিতে হবে তোমাকে, মানুষ করে তুলতে হবে তোমার গোপালকে।
হাসল চন্দ্রপ্রভা। বললে, আপনারা তো রইলেন গুরুদেব, সে ভার আপনাদের ওপরই দিয়ে গেলাম।
বিস্ময়ে নিশ্চুপ হলেন জ্যোতিষাচার্য, নিশ্চুপ হলেন সভাপণ্ডিত আর দেওয়ানজি। যে নারী নিজের হাতে পতিহত্যা করতে পারে, স্বেচ্ছায় সে এগিয়ে যেতে পারে স্বামীর চিতায়?
বোঝাবার চেষ্টা করল প্রজারা, দাসদাসীর দল।
তবু সঙ্কল্পে দৃঢ় চন্দ্রপ্রভা। কৌতুকের হাসিতে যেন স্তব্ধ করে দিতে চায় সব অনুরোধ, সব বাধা-নিষেধ।
রঘুনাথকে হত্যা করার পর, লালবাঈয়ের নৃশংস মৃত্যুর পর চন্দ্রপ্রভার চোখের সামনে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক গোপন চক্রান্ত। সেই চক্রান্তে ধর্মকে করা হয়েছে অস্ত্র।

তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছে যেন চন্দ্রপ্রভা।

হরিদ্রা চন্দনের প্রলেপ দিল চন্দ্রপ্রভা নিজের কপালে। মন্ত্রপাঠ করতে করতে চক্র দিতে শুরু করলে রঘুনাথের চিতার চতুষ্পার্শে। দুহাতের ধীর স্থির মুষ্টিতে ফুলমালা।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করে চন্দ্রপ্রভা—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হোক। হে চিন্তাশীল মন, তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ করো।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥

হে অগ্নি, তুমি আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। হে দেব, তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জানো। আমাদের পাপ বিদূরণ করো। তোমাকে নমস্কার।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

মন্ত্রপাঠ শেষ করে ধীরে ধীরে করধৃত ফুলমালা রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিল চন্দ্রপ্রভা।

তারপর যজ্ঞকুণ্ডে ফিরে এল।

যজ্ঞপুরোহিতের হাত থেকে আম্রশাখা নিয়ে দৃঢ় সংযত পায়ে চিতায় আরোহণ করল চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথের মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় শয়ন করল সহাস্য মুখে।

যজ্ঞপুরোহিতের নির্দেশে অগ্নি সংযোগ করা হল। চন্দনকাঠের চিতাশয্যা দাউ দাউ করে শত শিখায় জ্বলে উঠল। উচ্চনিনাদে বেজে উঠল সতীশঙ্খ, বাদ্যধ্বনি হল চতুর্দিকে।

চন্দ্রপ্রভার প্রিয় জরিয়া দাসীর দল পরস্পরের হাত ধরে চিতার চতুষ্পার্শে অগ্নি পরিক্রমা শুরু করল নৃত্যের তালে তালে।

ঘৃত হরিদ্রা চন্দন আহুতি দিল প্রজারা। লেলিহান শিখার আগুনে নিষ্প্রভ হয়ে গেল রূপবতী চন্দ্রপ্রভার হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠল কিশোর গোপাল।

অনিমেষ দৃষ্টিতে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল সুরঞ্জাক্ষী।

তার শরীরেও যেন এক বিচিত্র উন্মাদনা জেগে উঠেছে। আজ আর বুঝি সুরঞ্জাক্ষীর জীবনে কোনও উদ্দেশ্য নেই, কর্তব্য নেই কোনও। হঠাৎ মনঃস্থির করে ফেলল সুরঞ্জাক্ষী। অন্য এক দাসীর কোলে গোপালকে রেখে অকস্মাৎ সে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে গেল।

চিৎকার হট্টগোল করে উঠল বিভ্রান্ত জনতা। সুরঞ্জাক্ষীকে বাধা দিল তারা।

সুরঞ্জাক্ষী নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে, ভস্মীভূত হল চন্দ্রপ্রভার জীবন্ত দেহ, ভস্মীভূত হল পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভার যৌবনশরীর।

যজ্ঞপুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে তখনও বেজে চলেছে :

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

উপসংহার

মুঠো মুঠো করে সেদিন সতীকুণ্ডের ছাই নিয়ে গিয়েছিল পুরাঙ্গনার দল। পতিঘাতিনী সতীর ভস্মাবশেষ দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও তা রূপ নিয়েছিল দেববিগ্রহের, কোথাও বা ধর্মঠাকুর হয়ে বেঁচে আছে তা আজও।

কে জানে, বহু অতীতে হয়তো এমনই কোনও গরীয়সী সতীর ভস্মাবশেষই ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের দিকে দিকে. দক্ষকন্যা সতীর পীঠস্থান হয়ে তা আজও বেঁচে আছে । ভক্তের কল্পনা এমনই কোনও পতিপ্রাণা নারীকে গড়ে তুলেছে দেবীর মহিমায়।

শ্যামবাঁধের জোয়ার-জলে, বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সেই সতীকুণ্ডের চিতাবশেষ। কিন্তু মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে তার স্মৃতি।

বহু বছর পরে একদিন বুঝি কৃষ্ণমোহনের বজরাও এসে থেমেছিল বন-বিষ্ণুপুরের বিড়াই নদীর ঘাটে। সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধির গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছিল কৃষ্ণমোহন।

এই সতীকুণ্ডের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষকান্তি। আকাশে ছিল জ্যোৎস্নার প্লাবন, শ্যামবাঁধের নিথর কালো জলে চাঁদের ছায়া।

আর কৃষ্ণমোহনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক রহস্যময়ী। কণ্ঠে তার সুমধুর সঙ্গীত, হৃদয়ে উজ্জ্বল সাধনা।

তার মুখের দিকে বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল কৃষ্ণমোহন।

প্রশ্ন করেছিল, কে তুমি ?

—আপনার শিষ্যা, সঙ্গীতগুরু। উত্তর দিয়েছিল সেই ছায়াশরীর।

—তোমার ধর্ম ?

—সঙ্গীত।

মৃদুহাস্যে কৃষ্ণমোহন বলেছিল, না শিষ্যা, সঙ্গীত নয়। রাগরাগিণী শুধুই পথ দেখায়। ধর্ম এক, ধর্ম মানবতা—প্রেম প্রীতি অনুরাগ। স্নেহ, প্রীতি-ভালবাসাই একমাত্র ধর্ম।

তারপর উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিল :

মূঢ়ানামেষ ভবতি ক্রোধা জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥

হায় মূঢ়, যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে তার শরীরে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ নেই। কেউ কাউকে হত্যা করে না, হিংসা করে না অন্যকে। সকলেই কৃতকর্ম ভোগ করে চলেছে।

কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেক মানুষের মন। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ অকারণ জন্ম নেয়নি, আর হিন্দুর মুসলমানবিদ্বেষও অকারণ নয়। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে ভেদবিভেদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আগুন ছড়িয়েছে চতুর্দিকে, বঞ্চিতা নারী সম্মান খুঁজেছে ধর্মের আড়ালে, বিধর্মীর অন্যায়কে মানুষ বিচার করেছে সমাজনীতির নিয়মে নয়, ধর্মের যূপকাষ্ঠে।

ধর্ম নেই ধনীর, দরিদ্রের ধর্ম শুধুই ন্যায়বোধ। মোগল শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, অজ্ঞানতা তাকে পরিণত করেছিল মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষে। মুসলমান প্রজা পরিণত হয়েছিল মোগল শাসকের ক্রীড়নকে। উভয়পক্ষকেই চালিত করেছে যে রাজনীতির অস্ত্র—তার নাম ধর্ম। প্রজারা ভেবেছে ধর্মই ঐক্য দিতে পারে, দারিদ্র্য দূর করতে পারে। রোধ করতে পারে অপশাসন। আর এভাবে উভয়েই হয়েছে অত্যাচারিত।

ভুল বুঝেছে মানুষ। ভুলে গেছে, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম।

রঘুনাথ বুঝি সে-সত্য দেখতে পেয়েছিল। সমাজের সঙ্কীর্ণতা তুচ্ছ করে তাই সঙ্গীতকেই সাধনা করেছিল সে। সঙ্গীতের জন্যই লালবাঈকে ভালবেসেছিল রঘুনাথ, তারপর একদিন লালবাঈয়ের মোহেই ডুবে রইল, ভুলে গেল সঙ্গীতকে। সন্ন্যাসী যেমন গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালবাসে, সমাজ যেমন মানুষকে ভুলে আঁকড়ে ধরে ধর্মকে, প্রেম যেমন অনুরাগকে ভুলে যায় ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণে।

আর চন্দ্রপ্রভা ? নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছে, ত্যাগের মহিমার জন্যে ত্যাগ নয়, বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে যে ত্যাগ তার মূল্য আছে মানুষের সমাজে। উপায়হীনের আত্মত্যাগ সেও চরম স্বার্থপরতা ! আপন মৃত্যু দিয়ে সে বোধহয় বিষ্ণুপুরকে শান্তি দিতে চেয়েছিল।

সতীকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণমোহন বললে, রঘুনাথ ভুল করেছিলেন, আর এই ভুলটাই হয়তো বেঁচে থাকবে মানুষের মনে। কিন্তু ভগীরথের মতই যে গঙ্গাকে তিনি ডেকে এনেছেন বাংলার মাটিতে, একদিন এই গঙ্গার স্রোতধারায় সারা ভারতের পাপ ধুয়ে যাবে। আওরঙ্গজেব যে সঙ্গীতকে চিরতরে কবর দিতে চেয়েছিলেন, নতুন করে বেঁচে উঠবে সেই ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলাকে গৌরবান্বিত করবে বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা। আর এই ঐতিহ্যময় বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব গীতধারা। যা শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর মনে জাগিয়ে তুলবে উপনিষদের আলো আর পদাবলীর প্রেম মাধুর্য।

রহস্যময়ী বললে, কে আনবে সেই সার্থকতা, কার প্রতিভা সফল করে তুলবে রঘুনাথের ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সার্থক সাধনাকে ?

হাসল কৃষ্ণমোহন। বললে, সাফল্য তো একজনের কৃতিত্ব নয়, সে যত বড় প্রতিভাই হোক। প্রত্যেকটি সিদ্ধির পিছনে আছে যুগযুগসঞ্চিত বহু সাধকের কর্মফল। এক দীপ থেকে আরেক দীপে আলোকসঞ্চার হয়। এক প্রতিভার হাত থেকে আরেক প্রতিভা সেই যোগসূত্র তুলে নেয়। তেমনি এক প্রতিভাকেই খুঁজে চলেছি সারা জীবন, সেই সাধনা গ্রহণ করার যোগ্য প্রতিভাকেই খুঁজে চলেছি।

ইতিহাস সেই প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছে।

সার্থক হয়েছিল কৃষ্ণমোহনের অনুসন্ধান, সার্থক হয়েছিল রঘুনাথের সঙ্গীতসাধনার আদর্শ।

বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার জন্মকাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হয় সেই অজ্ঞাত অধ্যায়ে। তানসেন ঘরানার বংশদীপ বাহাদুর খাঁর তানের ঝলক গদাধর চক্রবর্তীর মনে সঙ্গীতের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। গদাধর চক্রবর্তীর দীপ থেকে সঙ্গীতের আলোক জ্বালিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণমোহন, কৃষ্ণমোহনের দীপশিখা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিভায়। কবি ভট্টাচার্যের সাধনায় গৌরবান্বিত হয়েছিল বাংলার সঙ্গীত।

বহু পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন এক দেশবিখ্যাত শাস্ত্রবিশারদ্। তাঁরই পুত্র রামশঙ্কর একদিন সঙ্গীতকে শতহস্ত দূরে রেখে চলেছিল। আর ধর্মকর্ম ভুলে গানের আবেগে ডুবে ছিল গীতরসিক কৃষ্ণমোহন।

সেদিন রামশঙ্কর ভেবেছে, সঙ্গীত জীবনের বিঘ্ন শুধু, নেশার ঘোরে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখাই তার কাজ। তাই, গানকে ঘৃণার চোখে দেখেছে রামশঙ্কর। নিজেকে সংযত রেখেছে শুধু পুঁথিপত্রের আবেষ্টনে, একাগ্র মনে শুধুই দিন কাটিয়েছে নীরস শাস্ত্রপাঠে, তত্ত্বের তর্কে।

তারপর একদিন শাস্ত্রালোচনার জন্যেই রাজদরবারে আসাযাওয়া শুরু হয়েছে তার।

পুঁথিপত্রেই পেয়েছে আনন্দ, কোনওদিন সঙ্গীতের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তার সমগ্র মনের পটে আলোড়ন দেখা দিল। গভীর নিশীথে রাজসভার অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ফিরে চলেছিল রামশঙ্কর। পরজন্ম, মনুর অনুশাসন, দেবতার অস্তিত্ব—নানান অমীমাংসিত প্রশ্নের রহস্যচিন্তায় মন ডুবে ছিল। নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রিতে ফিরে চলেছিল রামশঙ্কর। তারপর কালিন্দীবাঁধের কালো জলের পাড়ে হঠাৎ কখন নিজেরই অজান্তে থেমে পড়তে হল।

রাজপ্রাসাদ থেকে তখন একটি করুণ সুর ভেসে আসছে। বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রাসাদ-গবাক্ষের দিকে উৎসুক দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রামশঙ্কর। হৃদয় মন্থন করে যেন একটি নৈসর্গিক সুরের প্রবাহ এসে রামশঙ্করের প্রতিটি রোমকূপে এক অপূর্ব শিহরন খেলে গেল। নিষ্পলক চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল রামশঙ্কর। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা উন্মুখ আগ্রহে এক অজানা রোমাঞ্চের আস্বাদ নিল সেই প্রথম।

সঙ্গীতের মূর্ছনায় যেন সেই অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান পেল রামশঙ্কর, খুঁজে পেল তার নিরুদ্দেশ আত্মাকে। দুঃসহ সাধনার মধ্য দিয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির যে কল্পনাতীত মাধুর্যের স্বপ্ন দেখে এসেছে সে, সঙ্গীতের মধ্যে সেই অপার্থিব পুলকের আস্বাদ পেল। ঈশ্বর নয়, রামশঙ্কর বুঝল, পৃথিবী ভুলিয়ে, জাগতিক সব সুখদুঃখের ওপরে যে মুক্ত হৃদয়ের মূক বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে থাকে, তাকে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র সঙ্গীত। মানুষকে মহৎ করে তুলতে পারে! সব ক্ষুদ্রতা ভেদবিভেদের উর্ধ্বে পৌঁছে দিতে পারে মানুষের মনকে।

শাস্ত্রচর্চা ভুলে গেল রামশঙ্কর। অনুশোচনা হল, এতদিন সঙ্গীতপ্রিয়তাকে অর্থহীন আলস্য মনে করেছিল বলে।

ধীরে ধীরে একদিন কৃষ্ণমোহনের নির্জন সঙ্গীতকক্ষে এসে ঢুকল রামশঙ্কর, ভীত লজ্জিত পায়ে।

নিতান্ত ঔৎসুক্যের বশেই গোপনে কৃষ্ণমোহনের তানপুরা তুলে নিয়েছিল সে, অনভিজ্ঞ হাতে তানপুরার তারে সুরের রেশ তুলেছিল।

কৃষ্ণমোহন সে-শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল সেদিন, বিস্মিত চোখ চেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল রামশঙ্করকে।

কৃষ্ণমোহনের জীবনের খেদ মিটে গিয়েছিল সেদিন, মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল—আমি জানতাম রামশঙ্কর, আমি জানতাম। আর কোনও দুঃখ নেই আমার, সঙ্গীত তার শত্রুকে জয় করেছে। সঙ্গীতকে কোনও মর্যাদাই দাওনি রামশঙ্কর, কিন্তু তোমার কণ্ঠে একদিন বাংলার সঙ্গীত মর্যাদা ফিরে পাবে।

ঠিক এই কথাই একদিন কৃষ্ণমোহনকে বলেছিলেন রঘুনাথ, বলেছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। সে-দৃশ্য মনের পটে ভেসে ওঠে, অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহনের দুচোখ।

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, সুরকে আয়ত্তে আনাই তোমার একমাত্র আদর্শ নয় রামশঙ্কর। বিষ্ণুপুর তোমার মুখ চেয়ে আছে, সারা ভারতবর্ষ তোমার কাছে এক নতুন ঘরোয়ানা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

সেদিন থেকেই নতুন এক জীবন শুরু হল রামশঙ্করের।

এক নতুন আদর্শ খুঁজে পেয়েছে রামশঙ্কর, হদিস পেয়েছে সাধনার, সিদ্ধির। স্বার্থপরের মত ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা নয়, নিজের আত্মার মুক্তি নয়। সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে যায় রামশঙ্কর। অর্জন নয়, বিসর্জন। নিজের উপলব্ধিকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ব্রত।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে যায় সঙ্গীতসাধনায়।

কৃষ্ণমোহনের উৎসাহ পেয়ে মৃদু মৃদু লজ্জার হাসি হাসে রামশঙ্কর, কুণ্ঠিত স্বরে ধীরে

ধীরে বলে, একটি নতুন গীত রচনা করেছি আচার্য।

—শোনাও কবি রামশঙ্কর, শোনাও তোমার গান। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠে গুরু কৃষ্ণমোহন।

গান শুরু করে রামশঙ্কর। ধ্রুপদের পদ গুনগুন করে— মাতঃ সুরেশি ত্রিপথগামিনী ভব-ভয়-হারিণী-গঙ্গে। ত্রিদশ-বন্দিনী অঘনাশিনী পতিতপাবনী ভীষ্মজননী, হের পতিত অপাঙ্গে ॥

ভৈরব চৌতাল, বাহার গীতাঙ্গী, রাজবিজয় তেওরা, ভূপালী ব্রহ্মতাল, সরফর্দা ঝাঁপতাল, ইমন আড়াঠেকা, শঙ্করাভরণ চৌতাল—গানের পর গান রচনা করে রামশঙ্কর, তালিম দেয় কৃষ্ণমোহনের সামনে।

সাবাস দিয়ে ওঠে আচার্য কৃষ্ণমোহন। বলে, আর আমি আচার্য নই রামশঙ্কর, তুমিই এখন বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের আচার্য হয়ে গিয়েছ।

সত্যই সফল হয়েছিল কৃষ্ণমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী।

পৃথিবীর মাটি থেকে তখন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, চলে গেছেন গদাধর চক্রবর্তী। কৃষ্ণমোহনও একদিন চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁদের সাধনার সূত্র হারিয়ে গেল না। প্রদীপের শিখা অম্লান রইল চিরতরে। কৃষ্ণমোহনের তানপুরার তারে নতুন গত ফুটে উঠল রামশঙ্করের অঙ্গুলিস্পর্শে।

বাংলাদেশকে এক নিজস্ব ঘরোয়ানার অধিকারী করে গেলেন রামশঙ্কর। কবি রামশঙ্কর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে উত্তর ভারতীয় ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, দিয়ে গেলেন বাংলার আপন ভাষার সুরমাধুর্য।

আজও বুঝি সঙ্গীতমহলের আশেপাশে রামশঙ্করের সুর ভাসে : 'তারিণী-তনয়-ত্রাসে কম্পিত কলেবর...'

রামশঙ্করের স্বরচিত ধ্রুপদগাম্ভীর্যে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।—কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষিকেশ, বৃন্দা বিপিন পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ। মাধব মুকুন্দ মধু মথন যজ্ঞেশ, রাধিকা-রমণ রসরাজ নটবেশ ॥

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে বঙ্গভাষার বন্ধনে বন্দী করে ভবিষ্যতের বঙ্গবাসীকে নতুন এক সম্পদ দিয়ে গেলেন রামশঙ্কর।—'নন্দ-সুত নীল-নলিনাভ ভুবনেশ। কেশী-মুর কংসহা যাদব মহেশ। তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ, রামশঙ্কর সুদীনে কুরু কৃপালেশ ॥'

যুগের পর যুগ কেটে গেছে। সঙ্গীতের সুর তবু কাটেনি।

এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়েই একদিন জোড়াসাঁকোয় এসে পৌঁছেছিলেন যদু ভট্ট। আর সেখানেই জন্ম নিয়েছিলেন সেই প্রতিভা, ভারতবর্ষকে যিনি সেই অমূল্য সঙ্গীত দিয়ে গেছেন। যা শুধু বিষ্ণুপুরের নয়, সমগ্র ভারতের।

এদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কত না উত্থানপতন।

মৃত্যু হল দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের। দিল্লির সিংহাসনে বসলেন সম্রাট ফেরোকসায়ের। বিবাহ স্থির হল তাঁর রাজসিংহ-কন্যা রাজপুতনন্দিনীর সঙ্গে।

ইতিহাসই বুঝি বারে বারে সুযোগ এনে দিয়েছে বণিক ইংরেজের কাছে। বাণিজ্য নয়, বাহুবল নয়, নয় কোনও রাজনীতির কৌশল।

সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যে ইংরেজের আধিপত্য এনেছে ইংরেজের চিকিৎসাশাস্ত্র, আওরঙ্গজেবের জেহাদ, আর হিন্দু ভূস্বামীদের গৃহবিদ্রোহ।

সম্রাট ফেরোকসায়েরের বিবাহ-উৎসবে নহবত বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর পীড়ায়

শয্যাশায়ী হতে হল তাঁকে। অস্ত্রোপচার করে সম্রাটকে বাঁচিয়ে তুলল ডাক্তার হ্যামিলটন।

খুশি হয়ে সম্রাট বললেন, কি চাও তুমি ইংরেজ বন্ধু, তোমার প্রার্থনাই আমার মঞ্জুরি।

হ্যামিলটন টুপি খুলে কুর্নিশ করে বললে, ইংরেজ কোম্পানিকে বাণিজ্যশুল্ক থেকে রেহাই দিন সম্রাট, আর ডিহি কলকাতার সংলগ্ন আটত্রিশটি নগর কেনবার অধিকার দিন।

সাজাহান-কন্যাকে সারিয়ে তুলে স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি পেয়েছিল ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বাউটন ; কেল্লা প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলেছিল শোভা সিংহের বিদ্রোহের সুযোগে, ইব্রাহিম খাঁ আর আজিমুশ্বানের ব্যর্থতায় ; শক্তিবৃদ্ধি ঘটল সম্রাট ফেরোকসায়েরের বাদশাহি উপঢৌকনে।

ভিন্নধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ আর অত্যাচার, নারীর প্রতি অসম্মান—দুটি মাত্র অভিশাপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এল।

মোগল নবাবের দল জানত না, বাইরের ব্যভিচারের বিষাক্ত নিঃশ্বাস অন্দর-মহলে প্রবেশের পথ খুঁজে নেয়। জানত না, ইতিহাসের গতিকে আওরঙ্গজেব যে পথে চালিত করে গেছেন, সেই আত্মহত্যার পথ থেকে ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করতে হলে প্রয়োজন ছিল ত্যাগের, মহত্ত্বের, দৃঢ়তার।

দুর্বলচরিত্র বিলাসলুব্ধ সিরাজের শক্তি ছিল না ইতিহাসের গতিকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার। তাই অনাচারের প্লাবনগতিতেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তারপরও বহু যুগ কেটে গেছে। নির্বিষ হয়েছে মোগল শক্তি, থেমে গেছে বর্গী দস্যুর নৃশংসতা। কালের কলঙ্ক থেকে সরে থাকতে পারেনি হিন্দু ভূস্বামীরা।

ধীরে ধীরে রাজ্যবিস্তার করেছে ইংরেজ। প্রজাপালনের পরিবর্তে শুরু হয়েছে প্রজাশাসন। শোষণের অভিশাপ নিয়ে এসেছে, নতুন করে বুনে দিয়েছে বিভেদের বীজ ; কিন্তু জ্ঞানকে নিষেধের অন্ধকারে ঠেলে দেয়নি।

তাই সুদূর বন-বিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশেষেও একদিন ইতিহাস খুঁজে বের করতে এসেছে ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক। এসে থেমেছে লালবাঁধের পাড়ে।

১৮৯৬ সাল।

লালবাঁধ দীঘি খনন করে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ-কাহিনী।

পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আজও বোধহয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্ন-প্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন কাঞ্চনীর প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।



এই পৃথিবী পান্থনিবাস



হাবেভাবে, কথায়-বার্তায়, এমনকি চেহারাতেও কোনও রসের পরিচয় নেই। তবু ভদ্রলোক যে রসিক তার প্রমাণ হোটেলটির নামকরণে। বড় বড় চৌকো পাথরের দেয়াল বাড়িটার। এ অঞ্চলের অন্য সব বাড়ির মতই। ইটের দাম এখানে বেশি, পাথর শস্তা, পাথুরে-শরীর লোকগুলোর মজুরি। তাই কাছাকাছি টিলার ঢল কেটে, যাকে এখানকার লোকেরা বলে পাথরের খনি, সেই খনি থেকে পাথর এনে বাড়ি বানায় সকলে। এখান থেকে সমুদ্র খুব বেশি দূরে নয়, ইট তো দূরের কথা, লোহাতেও নোনা ধরে। পাথরের বাড়িগুলো কিন্তু টেকে অনেকদিন। টেকসই অথচ শস্তা বলেই হিমাদ্রিবাবুর হোটেলটাও পাথরের তৈরি।

মজবুত হলেও বাড়িটার শ্রী নেই। লম্বা ব্যারাকের মত। সারি সারি ঘর, সারি সারি জানালা ওপরে নীচে। নীচে পাঁচখানা ছোট ছোট ঘর, দোতলায় আটখানা। প্রতিটি ঘরের সামনে ক্যালেন্ডারের তারিখ কেটে বসিয়ে নম্বর আঁটা হয়েছে। ওদিকে দরমার দেয়াল আর টিনের ছাউনি দেওয়া রান্নাঘর, জলঘর, আরও কি কি। তারও ওপাশে দুখানা ঘরে হিমাদ্রিবাবুর সংসার।

হোটেলটার সামনে খানিকটা বাগান। বাগানে পনেরো আনা গাঁদা ফুলের গাছ। সারি সারি হলুদ রঙের, গেরুয়া রঙের গাঁদা ফুল ফুটে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে রজনীগন্ধা, গোলাপ, জুঁই আর পাতাবাহার।

স্টেশন থেকে যে বড় রাস্তাটা মন্দিরের দিকে গেছে, তার পাশেই হিমাদ্রিবাবুর হোটেল। রাস্তা থেকেই দেখা যায় পাথরের দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'পান্থপাদপ'।

'পান্থপাদপ' যিনি হোটেলের নাম দিয়েছেন, তিনি অন্তত একটি ক্ষেত্রে রসিক, কিন্তু যাঁদের জন্যে এ হোটেল, তাঁরা সকলেই রসজ্ঞ নাও হতে পারেন এই আশঙ্কায় নামটার নীচেই বড় বড় হরফে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা আছে 'স্বাস্থ্যসম্মত হোটেল'।

নানা লোকের আনাগোনা হয় এখানে। কেউ আসে পুরনো দিনের অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন ওই আকাশচুম্বী মন্দিরটা দেখতে, কেউ তীর্থ করতে, কেউ বা কুণ্ডের জল খেয়ে শরীর সারাতে। হ্যাঁ, মন্দিরের কাছেই একটা কুণ্ড আছে, দুধের মত তার জলের রং, দুধের চেয়েও নাকি উপকারী তার জল। গুজব ছড়াতে ছড়াতে এতদূর গিয়ে পৌঁছেছে যে ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকেই হতাশ-রুগীর দল একবার না একবার আসবেই এখানে।

সম্প্রতি ব্যবসা জেঁকে উঠছে হিমাদ্রিবাবুর, আরও একটা কারণে। এই কুচালি গাছের জঙ্গল আর পাথুরে টিলার অঞ্চলটুকু একটা বড় শহর হয়ে উঠছে। শহর হয়ে উঠছে বলেই ব্যবসার টানে নিত্যদিনই লোকজনের আগমন ঘটছে। দুদিনই থাক, দশদিনই থাক, হিমাদ্রিবাবুকে কিছু দিয়ে যেতেই হবে। কারণ এখানে আর কোনও হোটেল নেই। নেই বলেই 'পান্থপাদপ'কেও হোটেল বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় সকলে।

'পান্থপাদপে'র মালিক হিমাদ্রিবাবুও হোটেলটির মতই জরাজীর্ণ। দীর্ঘ অথচ শীর্ণ কালো চেহারা, মাথার চুল বয়সের আগেই সব সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো পুরু চশমার আড়ালে আরও ঘোলাটে দেখায়। সব মিলে চেহারাটা কেমন যেন খেজুর গাছের মত রুক্ষ।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খেয়ে বাগানে ঢোকেন হিমাদ্রিবাবু। না, ফুলের বাগানটায় নয়। পিছন দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বেগুনের চারা বসিয়েছেন, দুটো লাউ গাছ উঠেছে রান্নাঘরের চালায়, খুরপি হাতে সেগুলোরই তদারক করেন, ঝারায় করে জল দেন। তারপর এটা সেটা সারতে সাতটা বাজে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এক বান্ডিল ছাপানো হ্যান্ডবিল থাকে হাতে, একখানা বাঁধানো খাতাও।

হ্যান্ডবিলে হোটেলের গুণগানে ভরা নানা ভণিতা, দরদাম, সকালে কি খেতে দেওয়া হয়, চা ক-বার। জ্ঞাতব্য বিষয় সবই লেখা আছে হ্যান্ডবিলে। আর বাঁধানো খাতাটায় পাতার পর পাতা জুড়ে খ্যাত, অল্পখ্যাত, অখ্যাত ব্যক্তিদের মন্তব্য। এ হোটেলে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই দুচার লাইন লিখে দিয়ে গেছেন প্রশংসা করে।

স্টেশনে পৌঁছে সাইকেলটা তারের বেড়ায় ঠেসিয়ে রেখে প্লাটফর্মে ঢোকেন হিমাদ্রিবাবু। তারপর কলকাতার গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

প্রতিদিনই দু-চারজন নামেন এখানে। হিমাদ্রিবাবু নতুন লোক দেখলেই এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেন, হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিয়ে পুরো হ্যান্ডবিলটাই প্রায় মুখস্থ বলে যান। তারপর বাঁধানো খাতাটা মেলে ধরেন : দেখুন না কে কি বলেছেন।

দেখবার দরকার করে না, সারা রাত ট্রেন-দুর্ভোগের পর যাত্রীরা তখনকার মত একটা আস্তানা পেলেই বেঁচে যায়। এক কথাতেই রাজি হয়ে যায় অনেকে।

হিমাদ্রিবাবু নিজেই কুলি ডাকেন, রিক্‌শা ঠিক করে দেন। তারপর রিক্‌শার পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে এনে হাজির করেন তাদের এই 'পান্থপাদপে'।

সেদিনও এমনি নতুন যাত্রী খুঁজতেই এসেছিলেন।

ট্রেনটা তখনও পুরোপুরি থামেনি।

হিমাদ্রিবাবু দেখলেন, চলন্ত ট্রেনেরই একটা কামরার দরজা খুলে এক ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন।

এ-চোখ হিমাদ্রিবাবুর চেনা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছেন, এমনভাবে তাকানোর অর্থ, ফাঁপরে পড়েছি, উদ্ধার করো।

খদ্দের বেছে নিতে জানেন হিমাদ্রিবাবু, খুচরো যাত্রীর চেয়ে লাভ বেশি 'ফ্যামিলি' পেলে। অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি খদ্দের পাবার সম্ভাবনা থাকলে সেদিকেই ছুটে যান। তাই ট্রেন থামতেই ভদ্রলোকের কাছে ছুটে গেলেন তিনি।

নমস্কার করে বললেন, কোথায় উঠবেন, হোটেলে তো ?

আগন্তুক ভদ্রলোকের এমনিতে রাশভারী চেহারা। গায়ে ওভারকোট, হাতে ছড়ি, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ফ্লাস্ক।

হিমাদ্রিবাবুকে দেখে, তাঁর কথা শুনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন, হোটেল আছে এখানে ভাল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটাই আছে। দি পান্থপাদপ হোটেল। মাথাপিছু চার টাকা, ছোটদের হাফ চার্জ ..এই দেখুন না হ্যান্ডবিল....

ভদ্রলোক হ্যান্ডবিলটা নিলেন হাত বাড়িয়ে, কিন্তু পড়ে দেখলেন না। বললেন, চলুন দেখি তো আগে।

হিমাদ্রিবাবু সকলের কাছেই ওই এক কথা শোনেন। জানেন তিনি, দেখে পছন্দ হোক্ আর না হোক্ তাঁর হোটেলেই থাকতে হবে, যদি ধর্মশালায় না যায়।

কুলি দুটো ততক্ষণে মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। ট্রেনের কামরা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন বর্ষীয়সী এক মহিলা, কুড়ি বাইশ বছর বয়সের একটি আধুনিকা মেয়ে, আর

দশ বারো বছর বয়সের একটি ফুলপ্যান্ট পরা ছেলে।

কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক-বেডিং, সুটকেস, বেতের বাক্স, কুঁজো, টিফিন-ক্যারিয়ার, আরও পাঁচটা টুকিটাকি তুলে দিয়ে হিমাদ্রিবাবু স্টেশনের বাইরে এসে রিক্‌শা ঠিক করে দিলেন। নির্দেশ দিয়ে দিলেন রিক্‌শাওয়ালাদের। না দিলেও চলত, কারণ হিমাদ্রিবাবুকে তারা সকলেই চেনে। যেদিন হিমাদ্রিবাবুর স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে যায়, সেদিন নতুন আগন্তুকদের তারাই নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় পান্থপাদপে। হিমাদ্রিবাবুর কাছ থেকে যাত্রী প্রতি চার আনা বক্‌শিস পায় তার জন্য।

ভদ্রলোককে সপরিবারে রিক্‌শায় তুলে দিয়ে নমস্কার করলেন হিমাদ্রিবাবু। বললেন, চলুন আপনারা, আমি যাচ্ছি পিছনে পিছনে।

বলেই আবার স্টেশনের দিকে ছুটলেন তিনি। আরও কেউ নতুন যাত্রী আছে কিনা দেখতে। এবারের মরসুমটা ভাল, ভিড় লেগেই আছে। যদি দু-চারজন আরও পাওয়া যায়, এই আশায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন হিমাদ্রিবাবু। ওপর-নীচে পাঁচখানা ঘর এখনও খালি পড়ে আছে, তিন নম্বরের ছোকরাটি আজকালের মধ্যেই হয়তো চলে যাবে।

না, সব মুখ-চেনা লোক। নতুন কেউ নেই। বেশির ভাগই নতুন শহরের সরকারি চাকুরে, দু-চারজন পাণ্ডা, আর সব স্থানীয় কুলিমজুর চাষাভুশো।

বাঁধানো খাতার মধ্যে হ্যাণ্ডবিলগুলো রেখে সাইকেলে উঠলেন হিমাদ্রিবাবু। মনে মনে অঙ্ক কষলেন, তিন জন অ্যাডাল্ট, তিন চারে বারো ; হাফচার্জ একটা, বারো আর দুই চোদ্দ টাকা দিনে। ভদ্রলোক ক-দিন থাকবেন কে জানে। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, না চেঞ্জার ? বাবা সিদ্ধেশ্বর, যেন চেঞ্জারই হয়। স্যানিটারি স্যানিটারি করে চেঁচায় সকলে, এবারটা যদি ভাল যায়, স্যানিটারিই করে দেব পরের বার।

নিজের মনেই সাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে একটা হাত কপালে ঠেকালেন হিমাদ্রিবাবু।

সিদ্ধেশ্বরের উদ্দেশে, না স্যানিটারির উদ্দেশে, কে জানে !

হাওয়া বদল করতে এসেছেন অনেকেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে বাড়িগুলো সারা বছর নির্জন পড়ে থাকে, এ সময়টা সেগুলোই কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ-ছাড়া মন্দিরের কাছ-ঘেঁসে আছে ধর্মশালা, কিন্তু তীর্থযাত্রীর ভিড়ে সেখানে আর তিলধারণের স্থান নেই।

যাঁরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় প্রাতঃভ্রমণে বের হন সূর্য ওঠবার আগেই। ফেরেন, কলকাতার ট্রেন শিস দিয়ে চলে যাবার পর।

সরু রাস্তার দুপাশে সরে গেল চেঞ্জারের দল, সাইকেল-রিক্‌শার ঘন্টি শুনে ! ফিরে তাকালেন কেউ, তাকিয়ে কেউ খুশি হলেন, কেউ মুচকি হাসলেন। কেউ বা বিরক্ত হলেন।

অজয় সেনের পরিবার এ আধা-জংলা জায়গায় ঠিক যেন খাপ খায় না।

কোনও একটা আমেরিকান আপিসের মোটা মাইনের অফিসার অজয়বাবু। অজয়বাবু বললে উনি অবশ্য চটে যান। বলেন, বাবুটাবু আমি পছন্দ করি না।

অর্থাৎ মিস্টার সেন বললে উনি খুশি হন।

মিস্টার সেনের স্ত্রীর বয়স যদিও চল্লিশোর্ধ্বে, তবু তাঁর শরীরের গড়ন, আর বেশবাস প্রসাধনের কৃতিত্বে দেখায় যেন মেয়ে রুমার দিদির বয়সী। অচেনা অনেকে এমন ভুল করে, এবং ভুল যে করে সে কথাটা রুমার মা শ্রীলেখাদেবী নিজেই সকলকে বলে বেড়ান। কিন্তু তা বলে প্রসাধনের দিকটা খাটো করার পক্ষপাতী নন তিনি। রীতিমত আধুনিকা সাজতে দ্বিধা নেই তাঁর।

তবু এই অচেনা জায়গাতেও, স্বামীর সঙ্গে এক রিক্‌শাতে চড়তে রাজি হলেন না তিনি। দুটো রিক্‌শাতেই বাক্স বেডিং উঠল। আর বেডিঙের ওপর পা তুলে একটায় বসলেন শ্রীলেখা দেবী, মেয়ে রুমাকে নিয়ে, আরেকটায় অজয়বাবু, তাঁর ছেলে রেশমকে নিয়ে।

ধীরে ধীরে স্টেশনের ভিড় থেকে ছিটকে এসে হোটেলের রাস্তায় নামতেই রুমার মনটাই সবচেয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

এই প্রথম সে কলকাতার বাইরে এল।

রুমার সমস্ত মন যেন ঝুমঝুমি বাজাল। কি সুন্দর, কি সুন্দর!

বেডিঙের ওপর পা তুলে এভাবে বসতে রুমার যদিও অস্বস্তি হচ্ছিল, বিশেষ করে রাস্তার লোকগুলোর চোখের সামনে দিয়ে এভাবে যেতে, তবু তার মনের ভেতরটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়।

এই নতুন জায়গার, না-দেখা জায়গার সবটুকু যেন একসঙ্গে দেখে নিতে চায় সে। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় মানুষ যেমন ধীরেসুস্থে খেতে পারে না, একগ্রাসে, না চিবিয়ে, স্বাদ না নিয়ে শুধু গিলে ফেলতে পেলেই তৃপ্তি পায়, তেমনি রুমার চোখ দুটোও যেন এতকাল ক্ষুধার্ত ছিল। এই ঠাণ্ডা হাওয়া, সবুজ প্রান্তর, দূরে দূরে খাটো মাপের টিলা, রাস্তার দুপাশে কেয়ার ঝোপ, কেয়া আর বেতের, সরু সরু কচি-সবুজ বেতের স্ফুলিঙ্গ, কুচালি গাছের জঙ্গল, দূরে দূরে মন্দিরের চূড়া।

পিছনে পিছনে চলেছে দুখানা রিক্‌শা।

মায়ের কাছ থেকে শুনে ডাক দেয় রুমা—এই রেশম, ওই দেখ্ বেত গাছ। আর ওগুলো কেয়া, ফুল গজায়নি এখনও।

বাপের কাছ থেকে শুনে রেশম পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করে, এই দিদি এগুলো নাক্স-ভমিকার গাছ।

একটার পর একটা নতুন তথ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রুমা আর রেশম। কিন্তু রাস্তার বাঁক ঘুরতেই রুমার মন হঠাৎ যেন চুপসে গেল।

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা পাথরের ছোট ছোট বাড়িগুলো চোখে পড়েছে এতক্ষণ, ভালও লেগেছে, কিন্তু এমনি একখানা বাড়িই যে পান্থপাদপ হোটেল তা কল্পনাও করেনি।

লম্বা ব্যারাকের মত দোতলা বাড়িটার সারি সারি জানালার ওপর পাথরের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা নামটা চোখে পড়তেই কেমন যেন মুষড়ে গেল রুমা—এই!

রিক্‌শা থামতে না থামতেই হিমাদ্রিবাবুর সাইকেলও এসে পৌঁছোল। হিমাদ্রিবাবু এগিয়ে এলেন। চিৎকার করে ঝি-চাকরদের ডাকলেন, বললেন, মালপত্র ছ-নম্বরে তুলে নিয়ে চল।

মিস্টার সেনের ইচ্ছে ছিল, হোটেলটা আগে একবার দেখে নেবেন। দেখে পছন্দ হলে তবেই, কিন্তু শরীর আর মনের শ্রান্তিতে হাল ছেড়ে দিলেন তিনি।

হোটেলের সামনে একটুকরো গাঁদা ফুলের বাগান। পিছনের দিকে লাউ কুমড়ো বেগুনের। দরমার আড়াল দেওয়া রান্নাঘর, ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, দরজা জানালার পাটাগুলোর পরস্পরের সঙ্গে যেন সতীন সম্পর্ক, কিছুতেই মিলেমিশে থাকতে চায় না, কড়া মেজাজের স্বামীর চড়চাপড় খেয়ে পাশাপাশি বন্ধ হয় বটে, কিন্তু দুজনের মাঝখানে ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি।

আর দরজার পর্দাটা যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। দেখেশুনে মনে মনে বিরক্ত এবং হতাশ হলেও মিস্টার সেন পাইপে দেশলাইয়ের কাঠি খুঁচিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে করতে

বললেন, ঠিক আছে।

ছ-নম্বর আর সাত নম্বর পাশাপাশি দুখানা ঘর একেবারে এক কোণের দিকে। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা, ইচ্ছা করলে খুলে দু-ঘরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চলে। আর কোণের ঘরটায় চার চারটে জানালা, আলো-হাওয়া-রোদ কোনওটারই কমতি নেই। সুতরাং এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করা যেতে পারে।

হোটেলের চেহারা দেখে, ঘর দেখে, মেয়ের সঙ্গে চোখোচোখি করে হাসলেন শ্রীলেখাদেবী।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে হাঁকডাক শুরু করেছেন।—যৌতুকী, ও যৌতুকী। জিনিসগুলো ছ-নম্বরে দিয়ে যা।

নারীকণ্ঠের উত্তর এল নীচে থেকে।—যাউছি বাবু!

হিমাদ্রিবাবু বললেন, ব্রেকফাস্ট দিতে বলব?

'ব্রেকফাস্ট' কথাটা সাধারণত হিমাদ্রিবাবু ব্যবহার করেন না। বলেন, চা-জলখাবার। কিন্তু মিস্টার সেনের পোশাক পরিচ্ছদ, হাতের পাইপ, সাহেবি মেজাজ দেখে মুখ ফস্কে 'ব্রেকফাস্ট' কথাটা বেরিয়ে গেল।

অজয়বাবু সায় দিতেই হিমাদ্রিবাবু ঠাকুরের উদ্দেশে হাঁকডাক করতে করতে নেমে গেলেন।

আর রুমা চাপা স্বরে বললে, কি ছিরি হোটেলের!

রেশম কিন্তু দিদির মত গলার স্বরটা চেপে রাখতে পারল না। প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠল, ধর্মশালা মা, ধর্মশালা!

মিস্টার সেনও হাসলেন।

ইতিমধ্যে একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বেডিং ঘাড়ে করে যে এসে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল চারজনেই। একাধারে স্তম্ভিত আর বিরক্ত।

এই নাকি যৌতুকী? দেবদত্ত যৌতুক সত্যি তার চেহারার কোন্ জায়গায় তা কেউই খুঁজে পেল না। বরং বলা চলে এ যেন ভগবানের কৌতুক।

এমন কুৎসিত চেহারা কোনও নারীর হতে পারে বিশ্বাস হয় না যেন। কালো শরীরের যতটুকু নিরাবরণ—হাত, গলা, চিবুক—সর্বত্র কদর্য উল্কির নক্শা। শ্রীহীন মুখখানা উল্কির কলঙ্কে যেন আরও বীভৎস, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিস্ময় মানতে হয় তার শক্তি দেখে। যে ট্রাঙ্ক আর বেডিং মাথায় তুলতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল স্টেশনের কুলি, যৌতুকী অবলীলায় সে দুটোকে বয়ে নিয়ে এসেছে সিঁড়ি ভেঙে।

ঘরে দুখানা ছোট ছোট তক্তপোশ, একখানা ছোট টেবিল, একটা নড়বড়ে চেয়ার।

বাক্স আর বেডিং তক্তপোশের ওপর নামিয়ে রাখল যৌতুকী। ক্রমে ক্রমে বাকি মালপত্তরও নিয়ে এল।

তারপর যা বললে তার অর্থ হল, কুঁজোয় জল এনে দিচ্ছি, যখন যা দরকার আমাকে ডাকবেন।

রুমা ফিসফিস করে মাকে শুনিয়ে বললে, তাই যাও বাবা, বেশিক্ষণ থাকলে গা বমি বমি করবে।

রুমার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল, আর যৌতুকী কি বুঝল সে-ই জানে, সেও হেসে উঠল অপরিষ্কার হলদে ছোপধরা দাঁত বের করে।

ঠাকুর ট্রে হাতে চা-খাবার নিয়ে ঢুকতেই যৌতুকী চলে যাচ্ছিল। রুমা ডাকলে, যৌতুকী, হাত পা ধোবো কোথায়? জল?

যৌতুকী হেসে বললে, আস, দেখাই দিব।

সুতরাং তার পিছনে পিছনে গিয়ে জলঘরে পৌঁছোল রুমা।

যেমন হোটেল তেমনি বাথরুম।

বাথরুমের পাশেই একটা কুয়ো। এ অঞ্চলের কুয়ো যেমন হয়। হাত পাঁচেক নীচেই জল, কিন্তু কুয়োর চারপাশে দেয়াল দেওয়া নেই। একটু পা পিছলে গেলেই একেবারে কুয়োর মধ্যে পড়তে হবে।

সেই কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে শুরু করল যৌতুকী। আর এই দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রুমা শুনতে পেল, হোটেলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি সব ঘর থেকেই মাঝে মাঝে ডাক আসছে যৌতুকীর উদ্দেশে।

—যৌতুকী, জল দিয়ে যা।

—যৌতুকী, কাপড় কাচি দিলা ?

—যৌতুকী, কাপ প্লেটগুলো নিয়ে যা।

—যৌতুকী, আমারো বাচ্চারো কাঁথা শুকাই কিরি কোঁয়ারে রাখিলা ?

শোনে আর যৌতুকী সাড়া দেয়। —যাউছি, যাউছি !

পেটের ভেতর একটা চাপা হাসি যেন ফেটে পড়তে চায়। কোনও রকমে হাসি চেপে কাপড় বদলে রুমা বেরিয়ে এল কাঁধে গোলাপি তোয়ালেটা ফেলে।

ভিজে শাড়িটা তুলতে যাচ্ছিল রুমা, একরকম তার হাত থেকেই কেড়ে নিল যৌতুকী।

রুমা হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এল। আর উঠে আসতে আসতে দেখল, আট নম্বরের বৃদ্ধ লোকটি পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে রুমার শরীরটা তন্ন তন্ন করে দেখছেন।

বিশ্রী একটা অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একরকম ছুটতে ছুটতেই রুমা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

আট নম্বরের লোকটি বৃদ্ধ হলেও রসিক। দেহের যৌবন বহুকাল আগেই কেটে গেলেও মনের যৌবন তাঁর বোধহয় কাটেনি। নামটাও তাঁর সার্থক, অন্তত তাঁর ধারণা।

রমণীরঞ্জন দত্ত।

বছর আষ্টেকের হাফ-প্যান্ট পরা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন তিনি। এসেছেন দুধকুণ্ডের জল খেয়ে নিজের পেটের গোলমাল সারাতে। কিন্তু সেটা স্বীকার করেন না। বলেন, এসেছি ছোট ছেলেটার জন্যে।

সকাল বিকেল বেড়াতে বেরিয়ে সেই দিকটাতেই যান, যেদিকে চেঞ্জারদের ভিড়। অর্থাৎ যেদিকে আধুনিকা মেয়েদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে তাঁর। শ্যেন দৃষ্টিতে কোনও মেয়ের দিকে যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তখন চট্ করে কেউ ধরতে পারে না। ধরতে পারে না আরেকটা কারণে। তাঁর চশমার লেন্স এত পুরু যে, অন্য লোকে তাঁর চোখের তারা দেখতেই পায় না। আর রমণীবাবু নিজেও যে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তা নয়। আসলে. চোখে একটু ঝাপসা দেখেন বলেই অমন ঝুঁকে পড়ে দেখতে হয় তাঁকে।

আরেকটা রোগ আছে রমণীবাবুর।

প্রতিদিন অন্য অনেকের মতই গৌরীকুণ্ডে স্নান করতে যান তিনি। স্নান অবশ্য অনেকেই করতে যায়, কেউ কেউ সাঁতারও কাটে, কিন্তু রমণীবাবু কাঁধে গামছা আর হাতে

তেলের শিশি নিয়ে গিয়ে বসেন গৌরীকুণ্ডের ধারে, তেল মাখেন আধ ঘণ্টা ধরে, গল্পগুজব করেন এর ওর সঙ্গে, তারপর দুমিনিটে স্নান সেরে নিয়ে কিছুক্ষণ রোদ পোয়ান।

আসলে স্নানটা তাঁর উপলক্ষ।

গৌরীকুণ্ডের দুটো ঘাট পাশাপাশি। বেশ কাছাকাছি। একটা পুরুষদের, অন্যটা মেয়েদের। আর রমণীবাবু স্নান করতে এসে ভুলে যান যে, তাঁর সঙ্গে আট বছরের একটি ছেলে আছে। যতক্ষণ পারেন মেয়েদের সিক্তবসন জলকেলি দেখেন তিনি, কখনও আড় চোখে, কখনও বা সোজা চোখেই।

তাই রুমাকে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন রমণীবাবু।

কিন্তু খুশি হয়েছেন এমন ভাব দেখাতে তিনি রাজি নন। 'কালে কালে মেয়েগুলো হল কি' গোছের মুখের ভাব এনে ন-নম্বরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিলেন।

—সুপ্রিয়বাবু!

সিগারেট ধরিয়ে ইংরেজি একটা নভেলের পাতায় মুখ ডুবিয়ে বসেছে সুপ্রিয়, হঠাৎ ডাক শুনে চমকে চোখ ফেরাল।

রমণীবাবু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে বললেন, ও পড়ছিলেন? স্টাডি? থাক্। ভাবলাম, চুপচাপ বসে আছেন বুঝি একা একা...এলোনলি।

—না, না, না, আসুন আসুন। সম্ভ্রমের সঙ্গে বিছানার চাদরটা ভাল করে টেনে দিয়ে বসতে বললে সুপ্রিয়।

ভরসা পেয়ে বসলেন রমণীবাবু, বিছানার এক কোণ ঘেঁসে। তারপর মিটি মিটি হেসে বললেন, ইয়ংম্যান আপনারা সারা দিন ঘরে বসে থাকেন কি করে?

সুপ্রিয় হেসে বললে, কোথায় আর যাব!

রমণীবাবু মাথা নাড়লেন।—তা ঠিক। তা ঠিক। কোথায় আর যাবেন। এখানেই তো এসে হাজির হয়েছে।

—কে? চমকে উঠল সুপ্রিয়।

রমণীবাবু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, বিদুষী মশাই, বিদুষী। দেখেননি, ছ-নম্বরে যে এসে গেছে।

—ও। বলে নিরুৎসাহ করে দিল সুপ্রিয়।

কিন্তু নিজে নিরুৎসাহ হতে পারল না। দোষ নেই তার। সবে কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে এসেছে। দু-বেলা সেফটি রেজর বুলিয়ে দাড়ি গোঁফ কড়া করবার চেষ্টা কি অকারণ!

রমণীবাবু বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে যেতেই টুথ ব্রাশ নিয়ে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়!

অন্যদিন অবশ্য আরও দেরিতে দাঁত মাজে সে, আর এত সময়ও লাগে না। কিন্তু রমণীবাবুর কাছ থেকে খবরটা পাওযার পর থেকেই বিদুষী মেয়েটিকে একটি বার দেখার জন্যে তার মনের মধ্যে যেন আকুলিবিকুলি শুরু হয়ে গেল।

দাঁত মাজতে মাজতে বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি শুরু করে দিল সুপ্রিয়। যদি বেরিয়ে আসে একটিবার মেয়েটি।

পায়চারি করতে করতে ছ-নম্বরের সামনে এসে একবার করে উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কিন্তু না, মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না। আর দেখতে না পেয়েই অধৈর্য হয়ে ওঠে সুপ্রিয়। স্বাভাবিক অপেক্ষায় দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে ব্রাশটা, মাড়ির ওপরে নীচে ভিতরে বাইরে। টুথ ব্রাশ নয়, যেন মেল ইঞ্জিনের পিস্টন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন রুমার দেখা পাওয়া গেল না, তখন বিরক্ত হয়েই সুপ্রিয় হাঁক ছাড়ল। —গৌতমবাবু!

গৌতম ওদিকের ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে ক্যারম খেলছিল। সে উঠে আসতেই সুপ্রিয় বললে, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।

গৌতম সুপ্রিয়রই সমবয়সী। আলাপ ছিল না। মাত্র আগের দিন এসেছে সে। এসে উঠেছে সুপ্রিয়র রুম-মেট হয়ে। অর্থাৎ ন-নম্বরের দু-খানা তক্তপোশের একখানা গৌতমের। শরীর সারাতে নয়, ব্যবসার ধান্দায় এসেছে সে।

কিন্তু এসেই বড় আপনজন হয়ে গেছে হোটেলসুদ্ধ লোকের। বিশেষ করে সুপ্রিয়র। দু-জনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব, যেন কতকালের ভাব।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল গৌতম। বললে, চলুন।

দুজনেই বেরিয়ে গেল। একজন মনের ক্ষোভে, আরেকজন গোপন লোভে। শুধু বের হবার মুখে গৌতম একবার জিগ্যেস করলে, ক-টা বাজল সুপ্রিয়বাবু!

দশ নম্বরের ঘরে ব্রজমাধব ভট্চাজ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। মুখে বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গের ভাষা। কোনও একটা সওদাগরি আপিসে কাজ করেন, ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন...না, বরং তিনিই এসেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

স্ত্রীর চেহারাও স্বামীর চেয়ে খাটো নয় কোনও দিকে। মেজাজটা স্বামীর চেয়ে কড়া। কোনও একটা মেয়েদের ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বয়স যদিও তাঁর চল্লিশের ওপরে, তবু পাঁচ বছরের ছেলেটিকে দেখে বোঝা যায়, বিবাহ করেছেন যৌবনকে বিদায় দিয়ে।

হিমাদ্রিবাবু থেকে শুরু করে হোটেলের সকলেই তাঁকে মিসেস ভট্চার্য বলেন।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বেলা নটার সময় ফিরে আসতেই আট নম্বরের রমণীরঞ্জন দত্ত এগিয়ে গেলেন।

একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, মর্নিং ওয়াক সেরে এলেন নাকি? লজ্জিত হবার চেষ্টা করে মিসেস ভটচাজ বললেন, বেলা নয়টার সময় বাইরাইলে কি তারে আর মর্নিং ওয়াক কয়?

রমণীবাবু হেসে বললেন, তা বেলা বারোটা অবধি তো মর্নিংই—এ. এম বলে না?

ব্রজমাধববাবু ততক্ষণে তালাচাবি খুলে ঘরে ঢুকেছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে বোধ হয় তাঁর শরীর জ্বালা করে। তাই মিনিট দুইয়ের মধ্যেই লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আর বাচ্চা ছেলেটা মায়ের হাঁটু ধরে ঝুলে রইল।

ব্রজমাধববাবু বেরিয়ে আসতেই রমণীবাবু বললেন, ওদিকে সব নবাগতরা এসে গেছেন. ছ-নম্বর সাত নম্বর ফুলফিল্ড়।

অকারণে ইংরেজি বলা এবং হাস্যকর ইংরেজি বলাটা যে রমণীবাবুর রোগ তা সকলেই জেনে গেছে। তাই মিসেস ভট্চাজকে আর হাসি চাপতে হয় না।

নতুন খবর শুনে তিনি শুধু বললেন, আবার কাগো জবাই কইরা আইলেন হিমাদ্রিবাবু?

রমণীবাবু ফিসফিস করে মিসেস ভট্চাজের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, সাহেব, সাহেব। মেমসাহেব মিসিবাবাও আছে।

মিসেস ভট্চাজ প্রথমটা বুঝতে পারেননি। আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু রমণীবাবুর হাসি দেখে, আর ছ-নম্বর ঘর থেকে কয়েকটা ভেসে আসা কথা শুনে

নিশ্চিন্ত হলেন।

বললেন, যাই গিয়া আলাপ কইরা আসি।

পর্দাটির্দার ধার ধারেন না মিসেস ভট্‌চাজ। ছেলে টমকে সঙ্গে নিয়ে এ-পাশ থেকে বার তিনেক উঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত পর্দা ঠেলে ঢুকেই পড়লেন।

সামনে রুমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আইজই আইলেন বুঝি ?

রুমার সঙ্গে শ্রীলেখাদেবী তখন হোল্ড-অল খুলে তক্তপোশের ওপর বিছানা পাতবার চেষ্টা করছেন। এভাবে, বলা নেই কওয়া নেই, এক ভদ্রমহিলাকে ঢুকে পড়তে দেখে শ্রীলেখাদেবী বিরক্ত হলেন, রুমা স্তম্ভিত।

তবু সৌজন্যের হাসি হেসে রুমা বললে, হ্যাঁ।

—ক্যান যে আইলেন এই হোটেলে। খাইতে দেয় না, খাইতে দেয় না।

হিমাদ্রিবাবু আদর আপ্যায়ন করে লোক আনেন বটে, কিন্তু খেতে দেন না পেট ভরে—এইটেই মিসেস ভট্‌চাজের সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আরেকটা অভিযোগ হল, হোটেলের রান্না ভাল নয়। ঝাল দেয় না, তেল দেয় না, শুধু সেদ্ধ, আর সেদ্ধ।

শুনে আশ্বস্ত হল রুমা। হোটেলের রান্নাকে তার ভয় শুধু ঝাল আর তেলের জন্যে। তবু সে-কথাটা চেপে গেল সে।

প্রশ্ন করল, আপনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

—না, না, প্যাটের গোলমাল আছে, তা শোনলাম, এইখানকার দুধকুণ্ডের জল খাইলে রোগ সারে। কিছু না, কিছু না।

রুমার মা হেসে বললেন, আমরাও তো সেইজন্যেই এসেছি। কাজ হয় না কিছু ? কি বুঝছেন ?

—আরে না দিদি, ওইসব কিছুই না।

বলে চলে গেলেন মিসেস ভট্‌চাজ। বোধহয় মিস্টারের ডাক শুনতে পেয়ে।

আর মা-মেয়ে আধখোলা হোল্ড-অলের ওপর হেসে লুটোপুটি খেল !—এসেছেন পেটের রোগ সারাতে, ঝাল দেয় না, তেল দেয় না বলে রাগ !

হাসি সামলে সবে আবার বিছানা পাতায় মন দিয়েছে রুমা, হিমাদ্রিবাবু এসে হাজির হলেন।—ও কি করছেন ? যৌতুকীকে ডাকলে তো ও-ই করে দিত।—যৌতুকী, যৌতুকী।

সারা না পেয়ে হিমাদ্রিবাবু আবার ডাকলেন, ও হরতুকী।

—যাউছি বাবু। উত্তর এল নীচে থেকে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, যৌতুকী আসছে, ও করে দেবে সব। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের ?

অসুবিধে হলেও কে আর মুখের ওপর বলে।

শ্রীলেখাদেবী বলে উঠলেন, না না, অসুবিধে কেন হবে।

—হলে বলবেন কিন্তু। বলেই চলে গেলেন হিমাদ্রিবাবু। আর যৌতুকী এসে ঘরে ঢুকল।

রুমা আতঙ্কগ্রস্তের মত বলে উঠল, না না, তুমি যাও, আমরাই ক'রে নিচ্ছি।

আসলে যৌতুকীর ওই চেহারাটা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছে না রুমা। ওকে বিছানাপত্তর ছুঁতে দিতেও রাজি নয়।

রুমা আর শ্রীলেখাদেবী কাজ সারতে না সারতে নীচে থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলেন মিস্টার সেন।

বললেন, একটু সামনের রাস্তাটায় ঘুরে আসি। শীত করছে। একটু রোদ লাগিয়ে

আসি গায়ে।

রুমা আর রেশম বললে, আমরাও যাব।

শ্রীলেখাদেবীকে রেখে তিনজন সবে সিঁড়িতে পা দিয়েছে, পিছন থেকে রমণীবাবু বললেন, কোথায় চললেন? চলুন, আমিও যাচ্ছি। বলে পিছনে পিছনে বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর মিস্টার সেনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আজ এলেন বুঝি? নিউকামার, অ্যাঁ?

দশটা পনেরো মিনিটে কলকাতাগামী একখানা ট্রেন আসে। যখন আসে, 'পান্থপাদপ' থেকে দেখতে পাওয়া যায়, শব্দ শোনা যায়। কারণ পান্থপাদপের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক একেবারে ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু-চারটে গাছ, দূরে একটা নাম-না-জানা মন্দির, আর বাকিটা শুধুই ধানজমি। সেই ধানজমিরই ওপার দিয়ে রেল লাইনটা এসেছে।

মাঝখানে আর কোনও ব্যবধান নেই, কোনও আড়াল নেই, তাই চোখেও দেখা যায়, ঝকমক আওয়াজও কানে আসে। কিন্তু তারপরই আরেকটা আওয়াজ শুরু হয়, যা শুধু কানে আসে নয়, কান ঝালাপালা করে দেয় স্যানাটোরিয়ামের প্রতিটি বাসিন্দের।

ইঞ্জিনের হুইস্‌ল শুনতে পেলেই দশ নম্বর থেকে ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের ছেলে টম আর এগারো নম্বরের বাদল ছুটে বেরিয়ে আসে। তারপর হোটেলের লম্বা বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি দুজনে ছোটাছুটি শুরু করে ইঞ্জিনের বিভিন্ন শব্দের অনুকরণে বিচিত্র সব মৌখিক আওয়াজ তুলে। ঝিকঝিক, ঝুকঝুক ঝমঝম, খনখন, ঢংঢং—আরও নানা অভিধান বহির্ভূত শব্দ করতে করতে দুটি বাচ্চা ছেলে ছোটাছুটি শুরু করে। আর যতক্ষণ ট্রেনটা দেখা যায় ততক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দুজনে সুর করে করে একনাগাড়ে চিৎকার করে চলে : রেলগাড়ি চলল, রেলগাড়ি চলল।

তাদের 'রেলগাড়ি চলল'র জ্বালায় সারা হোটেল অতিষ্ঠ। আর এই জ্বালা একবার দুবার নয়, দিনে অন্তত দশবার। কারণ দিনে আপ ডাউন গুনে দশটা ট্রেন আসে যায়।

সকলেই বিরক্ত হয়, আবার সকলেই হাসে। ছেলেমানুষ—যদি এই চিৎকারে একটু আনন্দ পায়, বাধা দেবে কেন।

আজকেই ধমক দিতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন শিবনাথবাবু। বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিতে ইচ্ছে হয়নি।

টমের মুখে বাপ-মায়ের মত অতটা পূর্ববঙ্গীয় টান নেই, কিন্তু তেজ আছে, উগ্রতা আছে। বাদল ঠিক তার বিপরীত।

মুখখানাও মিষ্টি, স্বভাবটাও মধুর। তার বাপ মায়ের মতই। বাপ সুশান্ত রেজ টাটার ইঞ্জিনিয়ার। বয়স তিরিশ পার হয়েছে সবে। যেমন মিশুকে তেমনি ভদ্র। বাদলের মা আরও মিশুকে, আরও মিষ্টি তার ব্যবহার। সব সময়েই মুখে চোখে একটা কৌতুকের ভাব, হাসিখুশি। হোটেলের মালিক হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু থেকে শুরু করে সকলেই ডাকে গৌরীদি বলে।

কুণ্ডের জলে স্নান করতে গিয়েছিলেন তিনি, গোলাপি তুর্কি তোয়ালেটা বুকের ওপর দিয়ে দু-কাঁধে ছড়িয়ে নিয়ে ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরছিলেন।

পান্থপাদপে স্নানের ঘরটা যেমন ছোট তেমনি নোংরা। রোদ ঢোকে না একরত্তি। দিনের বেলাও আলো জ্বালতে হয়। তাই প্রতিদিন তিনি কুণ্ডের জলে স্নান করতে যান।

হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু পোষা বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দূর থেকে

তাঁকে ফিরতে দেখেই ছুটে গেল। —গৌরীদি, গৌরীদি!

শীতে কাঁপতে কাঁপতে একমুখ হাসলেন গৌরীদি। —কি ব্যাপার, ইস্কুল নেই আজ?

—না গৌরীদি। আজ কিন্তু দুপুরে ঘুমোলে চলবে না, ক্যারম খেলব আজ।

—কেন, আবার আমাকে কেন ভাই? তোমার সুপ্রিয়দা, শিখিনী, তারপর মিসেস ভট্‌চাজ...

বেলু হেসে বললে, ও মা আরেকজন এসে গেছেন, দেখেননি?

—কই না তো। কে?

বেলু হাসল। —ফ্যামিলি।

বাবার কাছে শুনে শুনে কথাটা সেও রপ্ত করে ফেলেছে। বললে, বড় ফ্যামিলি। অজয়বাবু, অজয় সেন—খুব বড় চাকরি করেন কলকাতায়। রুমাদি তাঁর মেয়ে, আর রেশম...কি সুন্দর দেখতে রুমাদিকে।

দ্রুত হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিলেন গৌরীদেবী, স্নানের ঘরের সামনে পৌঁছে বললেন, যাই কাপড়টা ছেড়ে আসি।

বলেই যৌতুকীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন, যৌতুকী, ও যৌতুকী আমার কাপড়টা দিয়ে যাও।

—যাউছি মা। ছাইয়ের গাদায় বসে ওদিকের ডোবার ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে সাড়া দিল যৌতুকী।

যৌতুকী শুকনো শাড়িটা এনে দিতেই স্নানের ঘরে কপাট লাগালেন গৌরীদেবী।

কাপড় ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলেন, একটি সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার মত সুন্দর দেখাল তাঁকে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরটির দিকে যেতে যেতে মাঝপথে বাদল এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরল তাঁর।

—কি রে? সস্নেহে জিগ্যেস করলেন ছেলেকে।

বাদল মিঠে মিঠে হাসি হেসে বললে, মা, কি সুন্দর লাগছে তোমাকে।

হেসে উঠেই গৌরীদেবী এপাশ ওপাশ তাকালেন। এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন বারো নম্বরের শিবনাথবাবু। রোদ পোয়াচ্ছেন। ওদিকে সুপ্রিয় আর গৌতম—নিজেদের মধ্যে গৌরীদেবী যে দুটি ছেলের নামকরণ করেছেন জগাই মাধাই।

বাদলের কথায় তাই লজ্জিত হয়ে উঠলেন গৌরীদেবী। অস্বস্তিতে অপ্রতিভ হাসি হেসে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

তেরো নম্বর, অর্থাৎ বারান্দার একেবারে ও-প্রান্তের ঘরটিতে দিনকয়েক আগে এসেছে মেয়েটি। জাতি পাঞ্জাবি, কিন্তু কলকাতায় বছর দশেক ছিল বলে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বয়েস বোধহয় আঠারোও পার হয়নি। একটি আঁটোসাঁটো গোলাপ কুঁড়ির পাপড়িগুলো যখন সবে খুলতে শুরু করে ঠিক তেমনি রূপ মেয়েটির। যেমন রং, তেমনি গড়ন। উগ্র যৌবনের প্রলেপ আছে সুঠাম দেহের প্রতিটি রেখায়। লাবণ্য নেই, কিন্তু নবনীর মত অন্য এক কোমলতা আছে মুখেচোখে। সবে মিলে কি এক মাদকতা, যে মাদকতা তার দেহের চেয়ে দেহবাসই বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। ছন্দোময় বুকের তরঙ্গ সুদৃঢ় উরজবন্ধনে বন্দি, সুডোল জঙ্ঘা আর সুন্দর বাহু ঘিরে ফিকে কমলা রঙের নাইলনের শাড়ি।

প্রথম থেকেই পান্থপাদপের নারী পুরুষ উভয়বিধ বাসিন্দেরই চোখ পড়েছিল তার ওপর। পাঞ্জাবি শিখের মেয়ে বলেই সকলে তার নামকরণ করেছিল 'শিখিনী'।

মেয়েটি দিব্যি মিশুকে কিন্তু। হবে না কেন। যে মেয়ে আঠারো বসন্তের যৌবন

নিয়ে একা একা বেড়াতে এসেছে, লজ্জা আর ভয় এ-দুটো তার কাছে অজানা।

তেরো নম্বরের ঘরখানি নিয়ে একাই আছে শিখিনী। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় এ-মন্দির, সে-মন্দির, কখনও পথে পথে, আর দুপুরে বা সন্ধ্যায় ক্যারম-বোর্ড পেতে খেলতে বসে হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলুর সঙ্গে, গৌরীদেবীর সঙ্গে, এমনকি সুপ্রিয়র সঙ্গেও।

আগের দিন রাত্রে তার পাশের খালি ঘরটায় দুটি লোককে বাক্স-বেডিং নিয়ে আসতে দেখেছিল শিখিনী। তাদেরই একজন শিবনাথবাবু।

প্রকৃতিটা মিশুকে বলেই শিবনাথবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল সে। সুযোগ জুটছিল না।

রোদ পোয়াতে শিবনাথবাবু বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই শিখিনীও ঘর থেকে বেরিয়ে এল—আপনি কাল রাতমে এলেন বাবুজি ?

চমকে উঠে ফিরে তাকালেন শিবনাথবাবু। ফিরে তাকিয়ে আরেকবার চমকে উঠলেন।

কোনও রকমে বললেন, হাঁ, আপ ?

মেয়েটি যে বাঙালি নয়, তার চেহারার দিকে তাকিয়েই শিবনাথবাবু বুঝতে পেরেছেন।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আমি বাংলা জানে। কলকাত্তায় ছিলাম বহুত দিন।

—তাই নাকি ? বাঃ ! সত্যি তো, বেশ ভাল বাংলা জানেন। বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

শিখিনী হেসে বললে, নাহি। ইন্টারভিউ দিতে। মেয়েদের স্কুলের নোকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি, ভাবলাম দু-চার রোজ দেখে যাই শাহারটা। আপনি ? চেঞ্জার ?

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, না। আমি এসেছি ব্যবসার জন্যে। রোজলার কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি, আর সঙ্গে এসেছে আমার মেকানিক। আশিটা ফ্যান দিয়েছিলাম গরমেন্টকে, ষাটটা খারাপ হয়ে গেছে—তাই...

—আশিটার ভিতর ষাটটা খারাব ? খিলখিল করে হেসে উঠল শিখিনী।

হাসিটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল বলেই পছন্দ হল না শিবনাথবাবুর। বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দোষ তাঁর কোম্পানির নয়। আসলে এখানকার লোক সব জংলি, পাখা চালাতে জানে না।

শিখিনী হেসে বললে, পাংখা তো বাবুজি সুইচ্ টিপলেই চলে, ও তো এরোপ্লেন না আছে, কি পাইলট হতে হবে চালাতে হলে।

তর্ক এমনিতেই পছন্দ করেন না শিবনাথবাবু, আর এ তো সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে তর্ক। হার মানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু দীর্ঘদিনের পেশায় নিজের কোম্পানির গুণগান করে এসেছেন, রোজলার কোম্পানির পাখার ত্রুটি আছে এ-কথা স্বীকার করে নিয়ে কোম্পানির সুনাম খর্ব করতে মন রাজি হল না।

তাই বললেন, বিশ বছর আমি রোজলারকে রিপ্রেজেন্ট করছি—ইন্ডিয়াজ বিগেস্ট ফ্যান-ম্যানুফ্যাকচারার্স—কোনও দিন কোনও কমপ্লেন হয়নি।

শিখিনী খিলখিল করে হেসে উঠল শিবনাথবাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে।

শিবনাথবাবু এবার আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না, সহ্য করার শক্তি হারালেন। বললেন, হাসবেন না, হাসবার কথা নয়। যাঁরা পাখার খোঁজ রাখেন তাঁদের জিগ্যেস করবেন রোজলারের কথা। কথায় বলে, ইউ ক্যান রেকমেন্ড রোজলার টু ইওর ফাদার।

এবার শিখিনী হাসল না। নাটুকে ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বললে, মাফ কিজিয়ে। আপনার কোম্পানির বদনাম করব না আর।

বলেই লম্বা প্যাসেজের ও-প্রান্তে চলে গেল, যেদিকে ছ-নম্বর আর সাত-নম্বর ঘর—যে ঘরে আজই একটি ফ্যামিলি এসে উঠেছে—মিস্টার এ. কে. সেন, তদীয় পত্নী, রুমা আর রেশম।

শিবনাথবাবু একটু আহত হয়েই চিৎকার শুরু করলেন, মিস্ত্রি, ও মিস্ত্রি!

লুঙ্গি পরে গেঞ্জির ওপর একটা তুশের চাদর জড়িয়ে যে বাইরে এল তাকে শিবনাথবাবু নিজে মিস্ত্রি বলে ডাকেন, কিন্তু অন্য লোকের কাছে পরিচয় দিতে হলেই বলেন, আমার মেকানিক।

মিস্ত্রি তা শুনে খুশিই হয়। নিজে সে অশিক্ষিত হলেও শব্দ দুটোয় যে সম্মানের পার্থক্য অনেকখানি তা বোঝে। গাড়োয়ান কি কোচোয়ানের সঙ্গে ড্রাইভার, আর ড্রাইভারের সঙ্গে প্লেনের পাইলটের পার্থক্যের মতই।

কিন্তু শিবনাথবাবু চিৎকার করে 'মিস্ত্রি' বলে ডাক দেওয়ায় সে মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হল। এমন একটা ছিমছাম রূপসী মেয়ের শ্রবণশক্তির নাগালের মধ্যে 'মিস্ত্রি' বলে না ডাকলে কি চলত না!

তবু কোম্পানি যখন তাকে শিবনাথবাবুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে তখন মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হবে। তা না হলে দালাল ব্যাটাকে....

বিরক্তির মুখে মিস্ত্রি বেরিয়ে আসতেই শিবনাথবাবুর আহত বিষণ্ণ মুখখানা সহৃদয় হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—কি খাবে বলো মিস্ত্রি, স্পেশাল চার্জ দিয়ে অর্ডার দিই। আগে এসেছি তো এখানে, যা খেতে দেবে, পেট ভরবে না।

খাবার কথায় মিস্ত্রি খুশি হয়ে উঠল। বললে, তা মুরগি-টুরগি হলে...

—বেশ তো, তাই বলি। ফাউল কারি আর রুটি? খেয়ে নাও মিস্ত্রি। খেয়ে নাও, খরচ তো কোম্পানির। আর ও শালারা আমাদের যা ঠকায়...

—'আমাদের' কেন বলছেন? প্রতিবাদ করে মিস্ত্রি। হেসে বলে, খরিদ্দারকে ঠকায় না? নাম হয়ে গেছে বলে যত রাবিশ মাল ছাড়ছে বাজারে....

শিবনাথবাবু এক মুখ হেসে বললেন, তা যা বলেছ মিস্ত্রি, যেখানে একবার পাখা বিক্রি করে আসি, সেখানে আর দ্বিতীয়বার যেতে সাহস হয় না, ঠ্যাঙানি দেবে এই ভয়ে। নেহাত এটা গরমেন্টের ব্যাপার, তাই আসতে হল। তা, ক-দিন লাগবে সারাতে?

মিস্ত্রি হেসে বলল, তাড়া কিসের বাবু, সাত দিনের টি. এ. তো নেবেন...

শিবনাথবাবু তাড়াতাড়ি শুধরে দেন, আহা হা, তা বলছি না, টি.এ. সাতদিন কেন দশদিন নেব, কিন্তু দু-তিন দিনের মধ্যে সারানো হয়ে গেলে এদিক-ওদিক একটু বেড়ানো যেত এই পয়সায়।

মিস্ত্রি চালাক লোক, কোনও কথা দিল না। বললে, দেখি তো আগে পাখাগুলোর অবস্থা।

কিন্তু মনে মনে বলল, শালা দালালি করে কমিশন খেয়েছে, আবার সারাবার নাম করে টি. এ. খাবে। বেশ আছে।

সকালে সেই যে সেন পরিবারকে হোটেলে তুলে এনে প্রাথমিক ব্যবস্থার নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে হিমাদ্রিবাবু নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, তারপর তাঁর দেখা পাওয়া গেল বারোটার সময়।

এই সময়টায় তিনি বাজার করেন প্রথমে। বাজার মাইলখানেক দূরে। সেখানে গিয়ে নিজে দেখেশুনে জিনিসপত্র কেনেন। শুকনো কপি, পচা আলু, বাসি মাংস, চালানি মাছ ইত্যাদি যা কিছু শস্তায় পাওয়া যায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে রীতিমত কম দামে কিনে না আনলে স্যানিটারির ব্যবস্থা হবে কোন টাকায়!

আসলে হিমাদ্রিবাবু কৃপণ নন, পান্থপাদপের সুনাম তিনিও চান। এবং সে জন্যে একসময় তিনি এত ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, সুনাম যে ভাবে বাড়তে শুরু করেছিল ঠিক সেইভাবেই লাভের অঙ্ক কমতে শুরু হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোভ জয় করে পান্থপাদপের সুখ্যাতির দিকেই নজর রেখেছিলেন। ইদানীং দুটি কারণে নীতি বদলাতে শুরু করেছেন—বুঝেছেন যে খ্যাতির চেয়ে অর্থটা অনেক বড় জিনিস। কারণ দুটোর একটা হল যাত্রীদের প্রশংসাবাক্যে কার্পণ্য। শত চেষ্টা করেও তাদের পুরোপুরি খুশি করতে পারেননি হিমাদ্রিবাবু। শেষ পর্যন্ত সবাই বলেছে, স্যানিটারি ব্যবস্থা নেই...। আর স্যানিটারির ব্যবস্থা করতে হলে লাভের অঙ্ক বাড়াতেই হবে। এ ছাড়া আরেকটা চাপে পড়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন হিমাদ্রিবাবু। তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের চাহিদা মেটাবার দায়িত্বে। সারা বছরে শীতের মরসুমে মাস দুই তিন চলে এই পান্থনিবাস, অন্য সময়ে দু'একজন ব্যবসাদার কচিৎ দেখা দেয়। সুতরাং, এই সময়ের মধ্যেই যা কিছু রুজি-রোজগার।

পরিবারটিও ছোট নয় তাঁর। ছেলেটি বাউণ্ডুলে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, থিয়েটার করে, পুজোমণ্ডপে ভলেন্টিয়ার হয়। কিন্তু বাপের ব্যবসায় কুটোটি কেটে দুটো করবে না। বাজার করতে দিয়ে দেখেছেন হিমাদ্রিবাবু, টাকায় দু আনা অন্তত সরিয়ে রাখে সে। যাত্রীদের দেখাশোনার ভার দিয়ে উল্টো বিপত্তি। মেয়েদের এত বেশি যত্নআত্তি শুরু করে যে তারা পালাবার পথ খোঁজে। এরপর আছে মেয়ে বেলু এবং যার পরেও আরও তিনটি। এত বড় পরিবারের খরচ চালানো তো সহজ নয়।

তাই সকালে বাজারটা নিজেই করেন। তারপর সেগুলো হোটেলে পৌঁছে দিয়েই চলে যান দু-মাইল দূরের নতুন শহরে। সেখানে একটা দর্জির দোকান খুলেছেন সম্প্রতি।

এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়েন দোকান থেকে। ফিরে এসে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করেন নিজে সামনে দাঁড়িয়ে। আর সেই সময়েই হিমাদ্রিবাবুর হাঁকডাক চিৎকার শুনতে পায় সকলে।

সেদিনও ঠাকুর চাকরদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই সামনে পড়ে গেল সুপ্রিয় আর গৌতম।

সদ্য বেড়িয়ে ফিরছে তখন দুজনে।

হিমাদ্রিবাবু হঠাৎ থেমে পড়েই বললেন, এই যে সুপ্রিয়বাবু, খেতে দেবে নাকি?

—আরে থামুন মশায়। ট্রাউজার্সের ক্রিজ ঠিক করতে করতে সুপ্রিয় জবাব দিলে, এখানেও যদি তাড়াহুড়ো করে খেতে হবে তো বাড়িতে থাকলেই হত। বেড়াতে এসেছি ছুটি নিয়ে, যখন খুশি হয় খাব বেড়াব ঘুমোব।

কড়া জবাবে একটু অপ্রতিভ দেখল হিমাদ্রিবাবুকে। কোনও রকমে সামলে নিয়ে বললেন, বেশ বেশ, যখন ইচ্ছে হবে বলবেন। বলে দ্রুত পায়ে ছ-নম্বরের দিকে চলে গেলেন। নতুন এসেছে পরিবারটা, তার ওপর চারজন মেম্বার, সুতরাং প্রথম প্রথম যত্নআত্তি একটু বেশিই পাওনা।

সুপ্রিয় হেসে বললে, এঁর শুধু খাইয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি, বুঝলেন গৌতমবাবু।

গৌতম সায় দিল, বললে, যা বলেছেন।

আসলে গৌতমের তখনও রীতিনীতিগুলো রপ্ত হয়নি। সবে ক'টা দিন আগে এসেছে

সে। তবে ভাগ্য ভাল যে এসেই সুপ্রিয়র মত রুম-মেট পেয়েছে। তার জন্যে মনে মনে সে খুশিও হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এদিকে সূর্য মাথার ওপরে উঠেছে, গরম কাপড়ের নীচে সারা গা চিড়বিড় করছে। স্নানের সময়ও যে হয়নি তা নয়।

গৌতম জিগ্যেস করলে, ক'টা বাজল সুপ্রিয়বাবু ?

হঠাৎ যেন চটে গেল সুপ্রিয়।—আপনি কি মশাই, কেবল ক'টা বাজল আর ক'টা বাজল !

গৌতম মুখ কাচুমাচু করে বললে, না, মানে আসবার সময় ভুলে ঘড়িটা ফেলে এসেছি কিনা।

সুপ্রিয় হেসে বললে, আহা, ঘড়ির সঙ্গে স্বভাবটাও ফেলে আসেননি কেন তাই তো জিগ্যেস করছি। নিন—

বলে হাত থেকে ঘড়িটা গৌতমকে দিয়ে সুপ্রিয় বললে, বাঁধুন, আপনার হাতেই বাঁধুন, বারবার আর ক'টা বাজল জিগ্যেস করবেন না। এসেছি ছুটি উপভোগ করতে...

সুপ্রিয়র অবশ্য বিরক্ত হবার যথেষ্ট কারণ যে ছিল না তা নয়। গৌতমের এই স্বভাবটা একরকম মুদ্রাদোষ। পাঁচ মিনিট অন্তর জিগ্যেস করবে, ক'টা বাজল সুপ্রিয়বাবু। প্রথম যেদিন এল গৌতম, সেদিন রাত্রে, সুপ্রিয় তখন শুয়ে পড়েছে। ঘড়িটা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে সবে আলো নিবোতে যাবে, অমনি ওপাশের খাট থেকে গৌতম প্রশ্ন করল, ক'টা বাজল সুপ্রিয়বাবু। নিরুপায় অবস্থা। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করে ক'টা বাজল জানাতে হল। তারপর আলো নিবিয়ে ঘড়িটা নতুন করে লুকিয়ে রাখতে হল পায়ের দিকে।

দোষ ছিল না অবশ্য সুপ্রিয়র। অজ্ঞাতকুলশীল রুম-মেট, সেদিনই এসেছে, চট্ করে বিশ্বাস করাও তো উচিত নয়।

একটা আতঙ্ক নিয়েই ঘুমিয়েছিল। আর ঘুম থেকে উঠেই দেখেছিল জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কিনা, ঘড়ি ঠিক আছে কিনা।

সব ঠিক আছে দেখে যত না লজ্জা পেয়েছিল সে, তার চেয়ে বেশি লজ্জা পেয়েছিল গৌতমের সঙ্গে আলাপ জমে উঠতেই। চমৎকার মিশুকে লোক, শুধু সুপ্রিয়র সঙ্গেই নয়, পান্থপাদপের প্রত্যেকটি বাসিন্দের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। ও-প্রান্তের পাঞ্জাবি মেয়েটি থেকে শুরু করে হিমাদ্রিবাবুর ফ্রক পরা মেয়ে বেলু পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই। কখনও এর সঙ্গে ক্যারম খেলছে, কখনও ওর সঙ্গে লুডো খেলছে।

গৌতমকে প্রথম দিন সন্দেহের চোখে দেখেছিল বলেই হয়তো মনে মনে একটু অনুতপ্ত বোধ করছিল সুপ্রিয়। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই ঘড়িটা খুলে এগিয়ে দিল গৌতমের দিকে।

গৌতম ঘড়িটা নিল হাত বাড়িয়ে. কব্জিতে বাঁধল। তারপর হেসে বললে, ভালই হল, হোটেলের টাকা কম পড়ে যায় তো এটা বেচে দিয়ে যাব।

কৌতুকটা উপভোগ করল সুপ্রিয়। বললে, তা করবেন, কিন্তু কম দামে বেচে দেবেন না যেন। নগদ দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছি মাসখানেক আগে।

একে একে সকলেই স্নান সেরে আসে, কেউ পান্থপাদপের জলঘরে, কেউ বা গৌরীকুণ্ডে। তারপরই আহারপর্ব।

মিনিট কয়েকের জন্যে হিমাদ্রিবাবুর হাঁকডাকে, ঠাকুর-চাকরের আনাগোনায়,

থালা-বাসনের ঝনঝন আওয়াজে সারা হোটেল গমগম করে ওঠে।

তারপরই নিঃঝুম দুপুর। নির্জন, নিঃশব্দ, শান্ত দুপুর।

শুধু শিবনাথবাবু তাঁর মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান দূরের নতুন শহরটার উদ্দেশে। আশিটা পাখার মধ্যে ষাটটা বিকল হয়ে পড়ে আছে, তাই সারাতে এনেছেন মিস্ত্রিকে। নিজে এসেছেন সম্ভবত স্তোকবাক্য দিয়ে সরকারি আপিসকে শান্ত করতে।

শিবনাথবাবু বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পাঞ্জাবি মেয়েটিও রিক্শা ডাকল। ইস্কুলের চাকরিটার ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে সে, কি ফল হল যদি জানা যায় কেরানিবাবুদের সঙ্গে দু'চারটে মিঠে কথা বলে।

আট নম্বরের রমণীরঞ্জন দত্ত কুতকুতে চোখে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলেন। বারান্দাটা নির্জন, কেউ কোথাও নেই। দশ আর এগারো নম্বরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। না গৌরীদেবী, না মিসেস ভট্চাজ—কারও দেখা পাওয়া যাবে না এখন আর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন রমণীবাবু, শুয়ে পড়বেন কিনা ভাবলেন। ছ' নম্বর থেকে হই-হল্লা হাসি-হুল্লোড় ভেসে আসছে রুমা আর রেশমের।

আর একবার আশায় আশায় চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে ফিরে তাকালেন। দেখলেন ছেলে তার কপাল অবধি লেপ ঢাকা দিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে বাপের দিকে। দেখেই চটে গেলেন।

ধমক দিয়ে বললেন, ঘুমো, ঘুমো।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্যন্ত লেপটা টেনে দিল তাঁর সুবোধ ছেলে।

কিন্তু চোখ বুজল না। আসলে রমণীবাবু কখন চোখ বোজেন সেই অপেক্ষাতেই চুপচাপ পড়ে রইল। বাবাকে ঘুমোতে দেখলেই ছোটে সে হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে, ক্যারম বোর্ড নিয়ে বেলুর সঙ্গে বসে যায়। কোনওদিন বা বাদল আর টমকে নিয়ে খেলতে বসে শিখিনীর সঙ্গে।

আজ রুমাদি বলে রেখেছে দুপুরে খেলবে। তাই চোখ বুজে পড়ে রইল ও।

রুমাদের অবশ্য দুপুরে ঘুম দেওয়ার বালাই নেই। দুপুরে ঘুমোনো রীতিমত দিশি ব্যাপার, তাই মিস্টার সেন সেটা পছন্দ করেন না। পছন্দ না করলেও স্ত্রী শ্রীলেখাদেবী একবার গড়িয়ে না নিয়ে পারেন না। আজ নয় মিস্টার সেন সাহেব হয়েছেন, কিন্তু শ্রীলেখাদেবীকে ঠিকুজি-কোষ্ঠী মিলিয়েই বিয়ে করেছিলেন, যখন মাইনে পেতেন দেড়শো টাকা। তাই সেদিনের দিশি অভ্যাসগুলোর অনেক কিছুই শ্রীলেখাদেবীর একেবারে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ছেলেমেয়েদের জ্ঞান হওয়ার আগেই অবশ্য মিস্টার সেনের উন্নতি হয়ে গেছে দ্রুত, সিঁড়ি ভেঙে নয়, যেন লিফ্‌টে চড়ে চাকরির চার তলায় উঠেছেন প্রত্যেক ফ্লোরে অল্পক্ষণের জন্যে থেমে থেমে, তাই স্ত্রীকে যেমনটি গড়তে চেয়েছিলেন ঠিক তেমন করেই গড়ে তুলেছেন মেয়ে রুমাকে।

রুমা সারা দুপুর কখনও উল বোনে ইংরেজি বই দেখে, কখনও পিয়ানো বাজায়, কখনও বা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা সিনেমার পত্রিকা পড়ে।

এখানে পিয়ানো নেই, তাই উল নিয়েই বসেছিল।

একটা দমকা বাতাস ঢুকতেই আলনা থেকে রেশমের প্যান্টটা পড়ে গেল।

এই এক বিপদ এখানে। দেয়ালে ব্রাকেট লাগানো আলনা। ভারী কাপড়-চোপড় এমনিতেই ঠিক করে রাখা যায় না। তার ওপর বাতাস এলে তো রক্ষে নেই।

রেশম বিছানায় বসে, 'মেকানো' নিয়ে নিজের মনেই খেলা করছিল।

নিজের মনে খেলতে খেলতেই বললে, ট্রাউজারটা তুলে রাখ না দিদি।

এক মনে উল বুনছিল রুমা ইংরেজি বই দেখে, ক'টা সোজার পর ক'ঘর উল্টো মিলিয়ে দেখছিল।

রেশমের কথা শুনেই ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকাল। তারপর বললে, আবার ট্রাউজার ?

রেশম ততক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছে, সংশোধন করে বললে, ট্রাউজার্স, ট্রাউজার্স।

রুমার চোখের কোণের রাগটুকু ঠোঁটের কোণের হাসিতে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। কাঁটা আর উল রংচঙে থলেটার মধ্যে ভরে রেখে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে রুমা বললে, কই রে, ছেলেটা তো এল না ক্যারম খেলতে ?

—যাব দিদি ? ডেকে আনব ? উঠে দাঁড়াল রেশম। খেলার শখ যত না, তার চেয়ে ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমানোর ইচ্ছে।

এখানে এসে সে বেচারাই সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছে। সমবয়সী ওই একটিই, তার সঙ্গে ভাবটা এখনও বিশেষ জমেনি। ক্যারম খেলার নামে যদি বন্ধুত্বটা হয়ে যায় !

রুমা হেসে বললে, যা না, দেখে আয়।

রেশম এক লাফে তক্তপোশ থেকে নামল, আরেক লাফে বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে উঁকি দিল আট নম্বর ঘরে। ও মা, ছেলেটা দিব্যি লেপ ঢাকা দিয়ে ঘুম মারছে !

ডাকবে কিনা ঠিক করতে না পেরে বারান্দার রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়াল রেশম। কানে এল গুনগুন স্বরে কে যেন গান গাইছে।

গুনগুন করে গান গাইছিল যৌতুকী। কুয়োর ধারে বসেছে ডজন তিন চার থালা-বাসন আর ছাইয়ের রাশ সামনে নিয়ে। পোষা বেড়ালটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া মাছের কাঁটা চিবোচ্ছে পরমানন্দে।

আর যৌতুকী বাসন মাজতে মাজতে গুনগুন করছে।

শুধু কাজ আর কাজ। সেই ভোরবেলায় উঠেছে, উনোনে আঁচ দিয়েছে, চায়ের কাপ, জলখাবারের প্লেট ধুয়েছে, তারপর একে একে সব কটি ঘর ঝাঁট দিয়ে, ঘরে ঘরে কুঁজোর জল ভরে দিয়েছে, স্নানের জল তুলে দিয়েছে বালতি বালতি, কাপড় কেচে দিয়েছে সকলের। এখন বসেছে বাসন মাজতে।

আশ্চর্য মানুষ এই যৌতুকী। এত কাজ, তবু এতটুকু বিরক্তি নেই, অভিযোগ নেই। বোর্ডারিদের কাউকে কোনও কাজ করতে দেখলেই কেড়ে নেবে

কাজ ছাড়া যেন দু-দণ্ডও থাকতে পারে না।

রেশমের মতই ওদিক থেকে আরও একজন লক্ষ করছিল যৌতুকীকে। শিখিনী সেই পাঞ্জাবি মেয়েটি।

স্বচ্ছ ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল সে, যৌতুকীর গান শুনে ফিক করে হাসল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে দাঁড়াল যৌতুকীর কাছে।

বললে, গানা হচ্ছে যৌতুকী ?

যৌতুকী দাঁত বের করে হাসল। জবাব দিল না।

শিখিনীও হাসল। বললে, আমার দেশ যায়গি ?

যৌতুকী ঘাড় নাড়ল। —উঁহু।

—কাহে নেই ? কত মাহিনা মিলছে এখানে ?

—পাঁচো টঙ্কা।

পাঁচ টাকা মাত্র ? বিস্মিত না হয়ে পারে না শিখিনী। সকলেই বিস্মিত হয়। মাত্র পাঁচ টাকা মাইনে, তবু এ হোটেল ছেড়ে যেতে চায় না যৌতুকী।

তবে কি বকশিসের লোভে ? কেউ কেউ জিগ্যেস করে।

যৌতুকী হাসে আর ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু।

এ এক রহস্যময় চরিত্র। সারা হোটেলের আলোচনার একমাত্র বিষয়। যারই সঙ্গে কথা হোক যৌতুকীর, যে-কথাই হোক, বোর্ডারদের জানতে বাকি থাকে না।

সবাই বিস্মিত হয় তার কাজ দেখে, বিস্মিত হয় কথা শুনে।

সত্যি, হাসিমুখে সারাটা দিন এমনভাবে কেউ কাজ করতে পারে ? এত কাজ, না দেখলে যেন বিশ্বাসও হয় না।

যৌতুকীর সঙ্গে গল্পগুজব করে ওপরে উঠে আসতেই শিখিনী দেখলে বারান্দার ও কোণে রুমা দাঁড়িয়ে আছে। রুমা আর রেশম।

শিখিনী হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। —যৌতুকী গানা গাইছিল, শুনেছেন ?

না তো ! কৌতুকে হেসে উঠল রুমা। —গান গাইছিল ?

—হাঁ। পাঁচ রুপেয়া মাহিনা পায় এখানে। পনেরো রুপেয়া দেব বললাম, তও ভি যাবে না আমার সাথ।

—সে কি ? বিস্মিত হল রুমা।

শিখিনী হেসে বললে, হোটেলের কাম না করলে ওর হাত পায়েরমে বাত হয়ে যাবে। সেই ডরসে যাবে না, বাড়িতে আমার যদি এত কাম না থাকে !

খিলখিল করে হেসে উঠল রুমা।

বেলা গড়িয়ে পড়েছে তখন। রোদের তাপ কমে এসেছে, বাতাস দিচ্ছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। একে একে বোর্ডাররা দুপুরের ঘুম থেকে উঠছে।

এগারো নম্বরের ভদ্রমহিলাও উঠে এলেন বাদলকে নিয়ে।

বাদলের চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আঁচলে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে তিনিও এসে দাঁড়ালেন রুমা আর শিখিনীর কাছে।

শিখিনীর কথাটা কানে গিয়েছিল গৌরীদেবীর, জের টেনে প্রশ্ন করলেন, যৌতুকীর কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—সত্যি, আশ্চর্য হবারই কথা। প্রথম যেদিন এলাম, দেখে রুচি হয়নি, কিন্তু যত দেখছি ততই যেন ভালবেসে ফেলছি।

শিখিনী বললে, জানেন, এখানে আছে সে কত দিন ? বাইশ বরষ, একদিন ভি ছুটি নাই।

সত্যিই তাই, সবাই ছুটি পায়, সবাই ছুটি নেয়। কিন্তু যৌতুকী যেন অক্লান্ত, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। ক্লান্তি নেই, একঘেয়েমি নেই, অবসাদ নেই, অবকাশ নেই।

বিকেলে রৌদ্রের তাপ কমতে একে একে সকলেই জেগে ওঠে। নিঃস্তব্ধ পান্থনিবাস মুখর হয়ে ওঠে আবার। পাণ্ডাদের ছড়িদাররা এসে খবর নেয় কেউ মন্দির-দর্শনে যাবে কিনা। একটা কমবয়সী বিধবা মেয়ে চকচকে পিতলের ঘটি হাতে দুধ দিতে আসে ছোট্ট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাঁকের দু-পাশে ডেকচির সারি ঝুলিয়ে মিঠাই বিক্রি করতে আসে কেউ কেউ। হোটেলের চাকর-ঠাকুর-ঝিদের কলহ-কোলাহলও শোনা যায়। শিখিনী রিক্শা ডেকে ক্যাপিটেলের দিকে পাড়ি দেয়।

রাঁধুনি বামুন দুটোর মুখ দেখা যায় না সচরাচর, শুধু গলার স্বর শোনা যায়। রান্নাঘর থেকেই চিৎকার করে কখনও কখনও তারা ফরমাশ করে। চৈতন্য আর সুলোচন—দুটো চাকর, একটা ঠিকে ঝি—লক্ষ্মীবউ।

লক্ষ্মীবউ সকাল-বিকেলে নিজের কাজটুকু করে দিয়েই চলে যায়, বাড়তি কোনও

কাজের কথা বললেও শুনতে পায়নি এমন ভান করে। কিন্তু চৈতন্য আর সুলোচন এক নম্বরের ফাঁকিবাজ—ডাকলেও সাড়া দেবে না। কোথায় আছে জানবারও উপায় নেই। হিমাদ্রিবাবু ধমক দিলে বলে বসে, ন নম্বরের বাবু বললেন...

সত্যিই সে ন নম্বরে ছিল কিনা, বা তার নির্দেশে কোনও কাজ করছিল কিনা তা তো হিমাদ্রিবাবু জিগ্যেস করতে পারেন না!

তাই চৈতন্য আর সুলোচনের নাম ধরে একবার ডাক দিয়েই সকলে বিরক্ত হয়ে ডাকে যৌতুকীকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় যৌতুকী।—যাউছি, যাউছি।

কাজে বিরক্তি নেই যৌতুকীর, কাজ পেলেই যেন বেঁচে যায়। পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্মই বোধ হয় চলছে যৌতুকীদের জন্যে। আপিস-আদালত, কলকারখানা, এমন কি চাষবাসও চলছে হাজার হাজার চৈতন্য আর সুলোচনের মধ্যে একটি করে যৌতুকী আছে বলেই। যারা কাজ ভালবাসে, কাজ না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। অন্যে ফাঁকি দিচ্ছে, নিজে ফাঁকে পড়ছে জেনেও যারা অন্যের কাজকেও নিজের কাজ মনে করে।

ঠাকুরের ডাকে বৈকালিক জলযোগের থালা গেলাস চায়ের পেয়ালা ধুয়ে এনে জোগাড়যন্ত্র করে দেয় যৌতুকী, ঠাকুর খাবার সাজিয়ে দেয়, চা ঢেলে দেয়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির হয় চৈতন্য আর সুলোচন। সারা দিনে ওই একটি কাজ তাদের, খাবারটি বাবুদের টেবিলে পৌঁছে দেওয়া, কিন্তু এমন একটা ভাব দেখায়, যেন সব কাজটুকুই তারা করেছে। আপিসের বড়বাবু যেমন ভাব দেখায় বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে। চা ভাল হলে কৃতিত্ব নেয়, খারাপ হলে বলে, ঠাকুর বানিয়েছে আজ। কাজে ফাঁকি দিয়েও বাবুদের কাছে এত প্রিয় হবার চেষ্টা তাদের কেন তা প্রথম কেউই বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে বিদায়লগ্নে।

কেউ কেউ অবশ্য দুদিন আগে থেকেই বুঝতে পারেন, আদর আপ্যায়নটা হঠাৎ একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় মনে মনে হাসেন, ভাবেন, যাবার সময় যৌতুকী ছাড়া আর কাউকে বকশিস দেবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঠাকুর দুটোও এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে যৌতুকীর ভাগ্যে চার আনা পয়সাও বেশি জোটে না। সব সময় আবার বকশিসটা তার হাতে পৌঁছয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সে সব চিন্তা করার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে সকলেই উদগ্রীব।

সেজেগুজে সকলেই একে একে বেরিয়ে পড়ে। মিস্টার সেন, রুমা, রুমার মা, রেশম।

রমণীবাবু কুতকুতে চোখে তাকান রুমার দিকে, তাকান ছেলের দিকে, তারপর তাকে তাড়া দিয়ে গৌতমের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেন, ধন্য বাপ-মা মশাই! ননথিঙ্কেবল্।

কেন, বাবা মা কি দোষ করল? গৌতম সুপ্রিয়র ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে হাসল।

রমণীবাবু বললেন, মেয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা দেখুন একবার, উলঙ্গবাহার শাড়ি পরে বাপ মার সঙ্গে বেড়াতে চলেছেন বিদ্যেধরী।

তাঁর কথা শেষ হতে ওদিক থেকে বেরুলেন ব্রজমাধববাবু, মিসেস ভট্চাজ, সঙ্গে ছেলে টম।

মিসেস ভট্চাজ একটু মিশুকে হবার চেষ্টা করেন সব সময়। তাই কথাটা শুনতে না পেলেও নাক ঢোকাবার ইচ্ছে দমল না তাঁর। বললেন, কার কথা কইতেছেন, শুনি।

অপ্রস্তুত বোধ করলেন রমণীবাবু।

আরও অপ্রস্তুত করে দিল সুপ্রিয়। বললে, রুমার সাজপোশাক দেখে চটে গেছেন

রমণীবাবু।

হো হো করে হেসে উঠলেন মিসেস ভট্চাজ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, হ, তা তো বোঝলাম, কিন্তু সুপ্রিয়বাবু আপনি না যাব যাব করতে আছিলেন অ্যাদ্দিন, এখন তো দেহি নড়তে চান না।

সুপ্রিয় তবু বুঝতে না পারার ভান করে বলে, দেখি আর কয়েকদিন, দুধকুণ্ডের জল খেয়ে।

—জল কইবেন না মধু মধু—সুন্দরীদের চক্ষের মধু। বুঝি না কি, আমাদের চক্ষে ধুলা দিতে পাইরবেন না।

বলে নিজেই হাসতে শুরু করেন মিসেস ভট্চাজ আর সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবু গৌতম ব্রজমাধববাবু সকলেই সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েন।

সুপ্রিয় চেহারায় ব্যবহারে অতিরিক্ত স্মার্ট হলেও এই একটি ব্যাপারে কেমন লাজুক লাজুক। বিশেষ করে মনের মধ্যে রুমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা প্রচণ্ড বলেই সেটা চাপা দেবার চেষ্টা তার সবচেয়ে বেশি।

তাই একসঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেও কেদারগৌরীর দিকে পা বাড়াতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করল সে। কারণ একটু আগে সে জানালা থেকে লক্ষ করে দেখেছে রুমারা কেদারগৌরীর দিকেই যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সুপ্রিয় যখন জানালা থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে, রুমাও সেই মুহূর্তে রাস্তা থেকে ফিরে তাকিয়েছিল সুপ্রিয়র দিকে। চোখোচোখি হয়েছে, আর সেই দৃষ্টিবিনিময়ে যেন অপ্রকাশিত আমন্ত্রণ দেখতে পেয়েছে সুপ্রিয়।

কিন্তু মিসেস ভট্চাজ কিছু মনে করতে পারেন ভেবেই সুপ্রিয় বললে, আমরা ক্যাপিটেলের দিকে যাব।

অর্থাৎ নতুন শহর গড়ে উঠছে যে দিকটায়, সেদিকে।

মিসেস ভট্চাজ ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি হাসলেন। তারপর পথ ধরলেন। রমণীবাবুও গেলেন তাদের সঙ্গে।

সুপ্রিয় ক্যাপিটেলের দিকে যেতে যেতে গৌতমের পিঠে হঠাৎ একটা থাপ্পড় মেরে বললে, বুড়োটার মুখে ওই-সব, কিন্তু রস কম নেই প্রাণে। ওদিকে গেল রুমা গেছে বলেই।

গৌতম হেসে বললে, ওর ওপরও জেলাসি? ও আপনার কম্পিটিটর নয়।

—কম্পিটিটর কে তা বেশ বুঝি।

—কে?

—আপনি।

গৌতম জিভ কাটল।—ছিঃ ছিঃ, ও কথা ভাববেন না। যখনই বুঝেছি আপনার একটু কেমন কেমন, অমনি অ্যাবাউটটার্ন করেছি।....

সুপ্রিয় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।—দূর মশাই, ক্যাপিটেলে গিয়ে কি ছাইপাঁশ করব।

—সে কি, আপনিই তো বললেন ক্যাপিটেলে যাব।

—আপনিও যেমন। রুমারা গিয়ে বসবে মুক্তেশ্বরের বাগানটায়, আর আমরা ক্যাপিটেলের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই!

দু-জনেই হেসে উঠল।

দু-জনেই বাঁক নিল। না, রাস্তা ধরে নয়। পাঁচিল দেওয়া পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে, ঘাসে ঢাকা মাঠ পার হয়ে।

মাঠের মাঝখানে একটা গভীর খাদ, যাকে পাথরের খনি বলে এদিকের লোক। বাড়ি

তৈরির জন্যে পাথর কেটে কেটে নিয়ে গেছে, পড়ে আছে নোংরা জলে ভরা খাদটা। তার পাশেই একটা ভাঙা পুরনো মন্দির, যে ধরনের মন্দির প্রতি দুশো গজ অন্তর এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

সুপ্রিয় আর গৌতম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে মন্দিরের গায়ের মূর্তিগুলো।

তারপর হাঁটতে শুরু করল পুরী রোডের পিচ-ঢালা রাস্তার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে গৌতম বললে, কোনারক যাবেন না ?

—যাব, যাব, দুদিন সবুর করুন না, দেখি, রুমাদের দলে নেওয়া যায় কিনা।

রোজলার রিপ্রেজেন্টেটিভ শিবনাথবাবুর সঙ্গে শিখিনী এসে বসেছে মুক্তেশ্বরের বাগানে, কোণের দিকে একটা বেঞ্চিতে।

হাত-পা নেড়ে অনর্গল কথা বলছে সে, আর মুগ্ধ হয়ে শুনছেন শিবনাথবাবু।

আজ এখানে কাল সেখানে, সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়ান তিনি। জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেছে হোটেলে, বাকি অর্ধেকটা কলকাতার নোংরা মেসে।

চমৎকার মজবুত স্বাস্থ্য শিবনাথবাবুর, চেহারা দেখে চট করে বোঝা যায় না যে চল্লিশ পার হয়েছেন। দেখতেও সুশ্রী। বাংলাদেশে এমন পাত্রের জন্যে মেয়ের অভাব হত না, কিন্তু বিয়ে করেননি শিবনাথবাবু। না, বিয়ে করবেন না এমন কোনও প্রতিজ্ঞা ছিল না। কিন্তু করব করব করে কখন যে চল্লিশ পার হয়ে গেছে নিজেই টের পাননি।

অবশ্য তার জন্যে তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ আছে বলে মনে হয় না। মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ জমাতে তিনি ওস্তাদ। আলাপ জমানোই তাঁর কাজ। কোন্ লোকটা কখন কাজে দেবে, কে বলতে পারে।

প্রথম আলাপের পর শিখিনী চলে যেতেই তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়েটার সঙ্গে একটু জমিয়ে নিতে হবে।

দুপুরে রিক্শায় যেতে যেতে মিস্ত্রিকে বলেছিলেন, বিকেলে ফিরে এসে পাঞ্জাবি মেয়েটার সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করে রাখতে হবে মিস্ত্রি।

মিস্ত্রি সাদাসিধে মানুষ, অতশত বোঝেনি, শুধু বলেছিল, বিদেশ বিভুঁয়ে এসে ওসব কি ভাল স্যার !

কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন শিবনাথবাবু। বলেছিলেন, তুমি একটু বোকা মিস্ত্রি। সে-আলাপ নয়, সে সবের বয়েস আর আছে নাকি। বলছিলাম কি, দেখে মনে হয় বেশ বড় ঘরের মেয়ে, চেহারা সাজপোশাক দেখোনি। আলাপ করে রাখলে হয়তো কোথাও অর্ডার টর্ডার বাগানো যাবে।

শুনে হেসে উঠেছে মিস্ত্রি।—তাই বলুন। তা স্যার আলাপ যদি জমাতেই হয় তো ওই ছ নম্বরের মিস্টার সেনের সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবু বলছিলেন কোথাকার যেন বড় অফিসার...

—উঁহু। ঘাড় নাড়েন শিবনাথবাবু। বলেন, মুশকিল আছে।

—মুশকিল ?

—হ্যাঁ, মিস্ত্রি হ্যাঁ। একে বাঙালি তায় সঙ্গে যুবতী মেয়ে আছে, ভাববে মেয়েটার জন্যেই আলাপ করছি।

বলে সশব্দে হেসে ওঠেন শিবনাথবাবু ! আর সচকিত হয়ে দেখেন রিক্শা থেমে গেছে আপিসের সামনে।

তারপর সারাটা দুপুর পাখা মেরামত করেছে মিস্ত্রি, আর শিবনাথবাবু আলাপ

জমিয়েছেন এ সেকশনে ও সেকশনে। রোদটা একটু কমে আসতেই মিস্ত্রিকে তাড়া দিয়েছেন। কে জানে দেরি হলে পাঞ্জাবি মেয়েটা হয়তো বেড়াতে বেরিয়ে যাবে।

মিস্ত্রি উত্তর দিয়েছে, একটা টাকা দিন স্যার, দিয়ে আপনি চলে যান। আমি একটু গলাটা ভিজিয়ে যাব।

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা নিকেলের টাকা বের করে দিয়েছেন শিবনাথবাবু, তারপর হোটেলের পথ ধরেছেন।

রোদের তাপ কমলেও হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। তাই এদিক ওদিক তাকিয়ে রিক্শা খুঁজলেন। পেলেন না। বাধ্য হয়ে হাঁটতেই শুরু করলেন।

অনেকখানি আসার পর হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন শিবনাথবাবু।

---বাবুজি! বাবুজি!

রিক্শা থেকেই ডাকছে শিখিনী।

রিক্শাটা কাছে আসতেই সে ডাকলে, চলে আইয়ে।

দু-জনে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল রিক্শায়! রিক্শা চলতে শুরু করল।

আজেবাজে নানা কথা, অনর্গল কথা বলে শিখিনী।

হোটেলে ফিরে গা হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে নিজে থেকেই বললে, চলুন বাবুজি, মন্দির যাব, ঘুম্‌নে।

খুশি হলেন শিবনাথবাবু। একটু সাজগোজও করে নিলেন তাড়াতাড়ি। আয়নায় মুখ দেখলেন। চেহারাটা তাঁর ভালই, তা না হলে পাঞ্জাবি মেয়েটা এমন গায়ে পড়া ভাব করে। নির্ঘাত চোখে লেগেছে তার।

মনে মনে হাসলেন শিবনাথবাবু। তা একটু প্রেম-প্রেম ভাব করলে দোষ কি। আলাপের ফাঁকে আসলে জেনে নিতে হবে বাপ দাদারা কি করে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড়সড় কেউ আছে কিনা! বলা তো যায় না, হয়তো মিনিস্টার টিনিস্টারও থাকতে পারে।

অভ্যাস নেই তাঁর, তবু বেশ চেষ্টা করেই মেয়েটির রূপের প্রশংসা করলেন। বললেন আপনার মত খুবসুরত মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

খিলখিল করে হেসে উঠল শিখিনী। আরেকটু হলেই হয়তো রাস্তায় লুটিয়ে পড়ত, শিবনাথবাবুর শক্ত হাতে ভর দিয়ে কোনও রকমে সামলে নিল।

তারপর হাসি চেপে বললে, আমি সুন্দার?

শিবনাথবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, আলবত।

এবার যেন বিশ্বাস হল শিখিনীর। বললে, আপনার মত মজবুত আদমিও রেয়ার।

মুক্তেশ্বরের বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছেন তখন শিবনাথবাবু। এক-কোণের বেঞ্চিটা দেখিয়ে এগিয়ে গেল শিখিনী। ছেলেমানুষের মত স্কিপিং করার ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে ছুটে গেল সে।

ফটফট করে রুমাল দিয়ে বেঞ্চের একটা দিক ঝেড়ে দিয়ে বললে, বৈঠিয়ে।

পাশের জায়গাটুকু পরিষ্কার করে নিজে বসল।

তারপর অনর্গল কথা আর হাসি, হাসি আর কথা। তারই ফাঁকে ফাঁকে শিবনাথবাবু জেনে নেন, কি নাম তার, কোথায় বাড়ি, বাপ কি করে...

হঠাৎ শিখিনী চুপ করে গেল। চুপ করে থাকতে থাকতে বললে, বাবুজি মোহান্তিবাবুর সাথ আপনার তো বহুত দোস্তি। আজ আপিসে দেখেছি।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন শিবনাথবাবু।

শিখিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বললে, একটা কাম বাবুজি আপনাকে করে দিতে হবে।

—কি কাজ ? সহাস্যে জিগ্যেস করলেন শিবনাথবাবু।

শিখিনী ধীরে ধীরে বললে, টিচারের চাকরিটা বাবুজি মোহান্তিবাবু বলে দিলেই মিলে যাবে। আপনি বাবুজি মেহেরবানি করে...

বিকেল থেকেই মন খারাপ বাদলের। দুপুরে শুয়ে শুয়ে শুনেছে সে, পরের দিন সকালেই নাকি চলে যাবে তারা।

শুনে থেকে বেচারার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। টম থাকবে, মাসিমা থাকবে, বেলুদি থাকবে, এমনকি রুমাদি, রেশমদাও থাকবে, আর তাকেই চলে যেতে হবে। বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেছে।

বিকেলে মা যখন কপাট বন্ধ করে কাপড় ছাড়ছিল তখন বাবা হিমাদ্রিবাবুকে ডেকে বলেছে রাত্তিরে হিসেবপত্র মিটিয়ে নিতে।

শুনতে পেয়ে বেলু ছুটে এসেছে, মা দরজা খুলতেই বলেছে, গৌরীদি, চলে যাবেন কাল ?

—হ্যাঁ ভাই, ছুটি ফুরিয়ে গেছে।

বেলুরও খুব খারাপ লেগেছে শুনে।

আর বাদল বিষণ্ণ মুখে ছ নম্বরের ঘর থেকে শুরু করে তেরো নম্বর পর্যন্ত সব ঘরের সামনে থামতে থামতে কি যেন গুনেছে আঙুলের কড়ায়।

তারপর মা বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে একসময়।

গৌরীকুণ্ডের দিকে যাননি সুশান্তবাবু। সুশান্ত রেজ, টাটার ইঞ্জিনিয়ার, একটু ছিমছাম প্রকৃতির মানুষ, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন। তাই বিন্দুসরোবর পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের দিকের নোংরা বাজারটায় কোনওদিন যাননি। শেষ দিনটায় কিন্তু মন্দিরে পুজো দিতে যেতে চাইলেন গৌরীদেবী।

পাণ্ডার ছোকরা ছড়িদারটাকে বলাই ছিল, সে সন্ধের সময় এসে হাজির হল, আর তার সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন ওঁরা।

মন্দিরে পুজো দিয়ে, মন্দিরের গায়ের মূর্তিগুলো দেখে দু-জনে হাসাহাসি করতে করতে বেরিয়ে এলেন, আর তখনই বেঁকে বসল বাদল।

লজেন্স কিনে দিতে হবে।

সুশান্তবাবু পকেট থেকে ব্যাগ বের করে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, চারো পয়সারো লজেন্স দিও।

—না। না। চিৎকার করে উঠল বাদল।

গৌরীদেবী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, তবে কি নিবি ?

বাদল ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে বললে, চার পয়সার নয়, কুড়িটা।

—অত কী হবে ? ধমক দিলেন সুশান্তবাবু।

কিন্তু উত্তর নেই, চার পয়সার লজেন্স সে কিছুতেই নেবে না।

ধমক দিয়ে, রাগারাগি করে, আদর দিয়ে কোনও ক্রমেই যখন ভোলানো গেল না তখন গুনে গুনে কুড়িটা লজেন্সই কিনে দিলেন সুশান্তবাবু।

গৌরীদেবী বললেন, কি একগুঁয়ে ছেলে বাপু।

বাদলের মুখে কিন্তু তখন হাসি ফুটেছে। লজেন্সের ঠোঙাটা সযত্নে পকেটে পুরে ফেলেছে সে।

শুনে শুনে কুড়িটা লজেন্স কেন চেয়েছিল বাদল গৌরীদেবী বুঝতে পারলেন পরের দিন ভোরে।

তখনও বেশ একটু অন্ধকার আছে। গৌরীদেবী উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে, স্বামীকে ডেকে তুললেন।

সবই প্রায় গোছগাছ করা আছে। টুকিটাকি দু চারটে জিনিস যা বাইরে আছে সুটকেসে ট্রাঙ্কে ভরে নিতে হবে, বিছানা বাঁধতে হবে।

বাদল ঘুমোচ্ছে এখনও। ঘুমোক, প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে ওকে ডাকলেই হবে।

সুশান্তবাবু, গৌরীদেবী দু-জনেই টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে, গায়ে র‍্যাপার জড়িয়ে চলে গেলেন দাঁত মাজতে। বেশ শীত-শীত করছে, রোদ উঠতে দেরি আছে।

ওদিকে শিবনাথবাবুও উঠেছেন। সশব্দে হাত মুখ প্রক্ষালন করছেন। এমন শব্দ করে কুলকুচি করছেন, হয়তো বাদলের ঘুম ভেঙে যাবে।

সকালের কাজ একে একে সারা হল। টুথব্রাশ, পেস্টের টিউব, জিবছোলা সুটকেসে ভরে দিলেন গৌরীদেবী।

এদিকে একটু একটু করে সকালের আলো উঁকি দিচ্ছে।

গৌরীদেবী বললেন, এবার তুমি জামা কাপড় ছেড়ে নাও, ট্রাঙ্কে ভরে দিই।

গৌরীদেবী নিজেও কাপড় বদলালেন। তারপর ডেকে তুললেন বাদলকে। হুড়মুড় করে উঠে পড়ল বাদল, তারপর জিগ্যেস করলে, আমার লজেন্স ?

আছে, পকেটেই আছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হল বাদল।

ধোয়ানো শার্ট আর হাফপ্যান্ট বের করে দিয়ে গৌরীদেবী বললেন, পরে নাও।

দু মিনিটের মধ্যেই বাদল তৈরি হয়ে নিল। তারপর ঘর থেকে বের হল গরম কোটটা গায়ে দিয়ে।

গৌরীদেবী বিছানার তলা থেকে হোল্ড অলটা টেনে বের করলেন, সুশান্তবাবু এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে।

—ময়লা কাপড়গুলো হোল্ড অলে দিলে হত, না ?

—তাই দাও।

—বালিশটা এদিকে দাও না।

—ক'টা বাজল ?

—পাঁচটা সতেরো।

—চা দেবে তো ?

—কে জানে। আজকের দিনটা তো বিনা পয়সায়, দেবে কি ?

—তেলের শিশিটা এখানে দাও।

—না, ছিপি আঁটা আছে ভাল করে। ট্রাঙ্কেই নেব।

—ফিরে গিয়ে কি হাল যে দেখব ঘরদোরের।

—চাকর পেলে হয়।

চাপা গলায় টুকরো-টুকরো কথাবার্তা, আর তারই ফাঁকে বিছানাপত্তর বাঁধা হয়, ট্রাঙ্ক গোছানো হয়।

ব্যস। আর শুধু আয়না চিরুনি, পাউডার কেসটা সুটকেসে ভরে নিলেই চলবে।

ইতিমধ্যে এক ফালি ঠাণ্ডারোদ মাখা আলো ঢুকছে জানালার ফাঁক দিয়ে, দু-চারজন বোর্ডার উঠেছে বিছানা ছেড়ে।

গৌরীদেবী বেরিয়ে এসে ডাকলেন, বাদল ! বাদল !

—যাচ্ছি।

সাড়া দিল বাদল, হিমাদ্রিবাবুর বাড়ি থেকে। তারপর সেখান থেকে এসে চলে গেল তেরো নম্বরে পাঞ্জাবি মেয়েটির কাছে।

দশ নম্বরে এসে দেখলে, টম তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঠিক আছে, পরে হবে।

নয়, আর আট নম্বর সেরে চলে গেল ছ্ নম্বরে।

—রুমাদি!

রুমারা অনেকক্ষণ উঠেছে, কিন্তু চোখে তখনও ঘুমের জড়তা।

রুমা সাড়া দিল, কে, এসো।

বাদল কাগজের ঠোঙা থেকে লজেন্স বের করে একটি একটি করে দিল রুমাকে, রেশমকে, মিস্টার সেনকে, শ্রীলেখাদেবীকে।

—কি ব্যাপার? হাসলেন মিস্টার সেন।

বাদল লজ্জায় মুখ নিচু করে বললে, আমরা আজ চলে যাব কিনা।

কখন? রুমা জিগ্যেস করল।

—এখনই, সকালের গাড়িতে।

বাঃ, বেশ মিষ্টি ছেলেটি তো। জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলে রুমা, আর বাদল আরও লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাল।

বেরিয়ে এসে দেখলে, টম ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দিচ্ছে।

বাদল এবার লুকিয়ে দুটো লজেন্স বের করে টমকে বললে, হাত পাতো।

—কেন? টম বুঝতে না পেরে বললে।

—হাত পাতো না।

হাত পাতল টম, আর তার হাতে দুটো লজেন্স দিয়ে হাতটা মুঠো করিয়ে দিল বাদল। হেসে বললে, শুধু তোমার জন্যে দুটো।

সকলকে দেওয়া হয়েছে। বাদল ফিরে এল নিজের ঘরে। এবার বাবাকে একটা, মাকে একটা।

বাবা-মা দু-জনেই হেসে উঠল। কিন্তু—

—তোমার কই? অতগুলো লজেন্স খেয়েছ? গৌরীদেবী প্রশ্ন করলেন।

বাদল হেসে বললে, না। সব্বাইকে দিয়েছি। আর আমার এই একটা।

—ও হরি, এই জন্যে কুড়িটা লজেন্সের বায়না ধরেছিল?

সুশান্তবাবু, গৌরীদেবী দু-জনেই খুশি হলেন।

চা-জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে তখন, যৌতুকী এসে দাঁড়াল সামনে।

হিমাদ্রিবাবু নীচে থেকে হাঁকলেন, রিক্‌শা এসে গেছে।

আর যৌতুকী বললে, লই যিব?

ঘাড় নাড়লেন গৌরীদেবী।

বেডিং আর সুটকেসটা নীচে রিক্‌শায় তুলে দিয়ে এসে ট্রাঙ্কটা কাঁধে তুলে নিল যৌতুকী।

প্রথম যেদিন এসেছিলেন গৌরীদেবী, স্তম্ভিত হয়েছিলেন যৌতুকীর শক্তি দেখে, বিরক্ত হয়েছিলেন কুৎসিত চেহারাটা দেখে।

আজ তার চেহারাটাকে বেশ ভাল লাগল। মনে হল, যেন ওই কুৎসিত চেহারাটাকে এক-দিনে ভালবেসে ফেলেছেন। আর শক্তি? না, স্তম্ভিত হবার কিছু নেই।

এ তো যৌতুকীর পক্ষে স্বাভাবিক।

রুমা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। গৌরীদেবী হেসে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুখানা

মাঝপথ পর্যন্ত তুলে বললেন, চললাম ভাই, ভাল করে আলাপটাও হল না।

রুমাও হাসল, কাছে এগিয়ে এল।

মিসেস ভট্চাজ গৌরীদেবীর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে শেষবারের মত অনর্গল অনেক কথা বলে নিলেন।

বাদল হাসল। বললে, আমাদের গাড়ি যখন যাবে এদিক দিয়ে, 'রেলগাড়ি চলল' বোলো কিন্তু।

টম গাঢ় গলায় বললে, তুমি তো শুনতে পাবে না।

—হ্যাঁ পাব। তুমি রুমাল নাড়বে বরং। আমি ঠিক এদিকে তাকিয়ে থাকব।

টম বললে, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। তাকিয়ে থেকো কিন্তু।

টম আর বাদলের কথা শুনছিলেন গৌরীদেবী, হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন, আর থতমত খেয়ে গেল টম।

এবার বিদায়ের পালা। সুশান্তবাবু আর গৌরীদেবী নীচে নেমে গেলেন ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে।

জিনিসপত্তর সব রিক্শায় তোলা হয়ে গেছে। এসে দেখলেন, সারা হোটেলের ঠাকুর-চাকর এমনকি লক্ষ্মীবউও এসে দাঁড়িয়েছে বকশিসের লোভে।

—যৌতুকী কই ? যৌতুকী ?

ডাক শুনে বেরিয়ে এল যৌতুকী, এক মুখ কুমড়োর বীচির মত বড়বড় হলদে হলদে দাঁত বের করে হাসল সে।

যৌতুকীকে কিছু বেশি দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দেখায় খারাপ। লোকগুলোর সামনে একজনকে বেশি দিতে যাওয়া কেমন যেন লাগে।

ব্যাগ থেকে তিনটি টাকা বের করে স্ত্রীর হাতে দিলেন সুশান্তবাবু। গৌরীদেবী টাকা তিনটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন তোমরা সবাই ভাগ করে নিয়ো।

রিক্শা চলতে শুরু করেছে তখন।

বাদল হঠাৎ বলে উঠল, বাঃ রে, বকশিসের বেলায় সমান ভাগ, কাজের বেলায় সব যৌতুকী।

সুশান্তবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমাদের আপিসেও তাই।

ঠিক এমন একটা ঘটনা ঘটবে সকলেই যেন জানত। কিন্তু কেউই আগে থেকে সাবধান করে দেয়নি।

সুশান্তবাবুরা চলে যাবার পর এক বাণ্ডিল হ্যান্ডবিল আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বাজিয়ে হিমাদ্রিবাবুও চলে গেলেন স্টেশনের দিকে। দুটো সিট খালি হয়ে গেল, নতুন খদ্দের যদি পাওয়া যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাঠের ধার দিয়ে হুইস্‌ল বাজিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ঝিকমিক ঝিকমিক শব্দ তুলে ট্রেনটা যেতে দেখা গেল। কিন্তু সমস্ত হোটেল কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সাড়াশব্দ নেই, চিৎকার নেই। প্রতিদিনের মত 'রেলগাড়ি চলল' 'রেলগাড়ি চলল' সেই বিদঘুটে কান ঝালাপালা করা হট্টগোল নেই। অন্যদিনের তুলনায় কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়।

ব্যতিক্রমটা সকলেই বুঝি লক্ষ করেছিল। বিশেষ করে সুপ্রিয় আর গৌতম।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনেই। এসে দেখলে, বারান্দার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে টম। চুপচাপ তাকিয়ে আছে চলন্ত ট্রেনটার দিকে। রুমাল আছে হাতে, কিন্তু নাড়তে ভুলে গেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু।

টমকে ডাকতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়, ডাকল না। তার মনটাও কেমন যেন খারাপ লাগছে।

শুধু বাদলের জন্যেই নয়, গৌরীদেবীর জন্যে, সুশান্তবাবুর জন্যে। যেন প্রতিবেশী কোনও পরিবার পাশের কোনও বাড়ি খালি করে দিয়ে চলে গেছেন এইমাত্র।

সুপ্রিয় ধীরে ধীরে বললে, গৌতমবাবু, চলে যাবার জন্যেই সকলে এসেছে এখানে জানি, তবু কেউ চলে গেলেই খারাপ লাগে কেন বলুন তো?

গৌতম হাসল।—মায়া। মায়া। মায়াময় জগৎ না কি বলে যেন, তাই। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

সুপ্রিয় হেসে চাপা গলায় বললে, আপনার অভিধানে শুধু মেয়েময় জগৎ, তাই না?

হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল দুজনেই।

তারপর সকালের চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনেই।

স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসেছে। কে রইল আর কে গেল, তার হিসেব মেলাতে তো আসেনি।

ব্যাপারটা ঘটল কিন্তু বেড়িয়ে ফিরে আসার পর।

ফিরল যখন দু-বন্ধুতে তখন এগারোটা বেজে গেছে। ফিরে এসেই সুপ্রিয় চটপট তেল মেখে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে গৌরীকুণ্ডে স্নানের জন্যে তৈরি হল। তৈরি হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল গৌতম বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

—কি ব্যাপার, যাবেন না স্নান করতে?

—না, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

সুপ্রিয় হাসল।—কি যে শরীর আপনাদের বুঝি না। বলে বেরিয়ে গেল সে গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে।

রমণীবাবু, মিসেস ভট্‌চাজ, শিবনাথবাবুও একে একে বেরিয়ে পড়লেন। গৌরীকুণ্ডের জলে স্নান না করলে আর দুধকুণ্ডের জল না খেলে, এখানে চেঞ্জে এসে কি লাভ।

ঘণ্টাখানেক পরেই স্নান সেরে একে একে ফিরে এলেন সকলে। সকলের হাতেই একটা করে ছোট্ট কলসি কিংবা অ্যালুমিনিয়মের জায়গা। ফিরতি মুখে দুধকুণ্ডের জল নিয়ে এসেছেন। সুপ্রিয়ও ফিরে এল। কাঁধে তোয়ালে, হাতে ওয়াটার বট্‌ল্, পরনে ভিজে কাপড়। ফিরে এসে দেখলে, ঘরে তালা ঝুলছে।

গেলেন কোথায় গৌতমবাবু!

বিরক্ত হল সুপ্রিয়। গৌতমের শরীর খারাপ, ঘরেই থাকবে ভেবে চাবিটা নিয়ে যায়নি। এখন হাঙ্গামা দেখো। ভিজে কাপড়ে কাঁধে তোয়ালে নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে? গেলই বা কোথায়?

বারকয়েক চিৎকার করে ডাকলে সুপ্রিয়।—গৌতমবাবু, ও গৌতমবাবু!

কোনও সাড়া শব্দ নেই।

তবে কি অন্য ঘরের কারও কাছে রেখে গেছে চাবিটা?

না, ব্রজমাধববাবুর কাছে রেখে যায়নি, হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলুর কাছে রেখে যায়নি। তবে কি রুমাদের কাছে? কিন্তু এই ভিজে কাপড়ে বেচারা ও-ঘরের সামনে যায়ই বা কি করে?

যেতে হল না, হাঁকডাক শুনে রুমা আর অজয়বাবু দু-জনেই বেরিয়ে এলেন।

সুপ্রিয় জিগ্যেস করলে, গৌতমবাবু কি চাবিটা রেখে গেছেন আপনাদের কাছে?

—না তো।

সুপ্রিয় আবার কি বলতে যাচ্ছিল, দেখলে উঁচু হিল জুতোর খট খট শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে শিখিনী।

শিখিনীও একটু বিস্মিত হল। সারা হোটেলের লোকগুলো এখানে জটলা পাকিয়ে

কেন ?

বিস্মিত চোখেই তাকাল সে, আর সুপ্রিয় বললে, গৌতমবাবুকে দেখেছেন ?

—গৌতমবাবু ? আপকা রুম-মেট ? হাঁ, কটকের বাসে চলে গেলেন তো আভি ।

—বাসে ? চলে গেলেন ?

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত একেই বলে । চিৎকার হট্টগোল করে ঠাকুর চাকরদের ডাকল সুপ্রিয়, তালা ভাঙতে বলল ।

তালা ভাঙার পর দেখা গেল, যা সন্দেহ হয়েছিল তাই । সুপ্রিয়র দেওয়া শুধু সেই রিস্ট-ওয়াচই নয়, দামি ক্যামেরাটা এবং নগদ সত্তরটা টাকাও নিয়ে সরে পড়েছে গৌতম । ফেলে গেছে তার নিজের নতুন কেনা ফাইবারের সুটকেস আর পুরনো তোশক-বালিশ ।

একে একে সকলেই বললে, এমন যে হবে আমরা আগেই জানতাম । সকলেই দোষ দিল সুপ্রিয়কে । তারপর একে একে সকলেই সরে গেল, রইল শুধু রুমা আর রেশম ।

সহানুভূতির, সমবেদনার দুটি বড় বড় চোখ মেলে রুমা এবার তাকাল সুপ্রিয়র বিভ্রান্ত মুখখানার দিকে । বেচারা ! কাঁধে এখনও তোয়ালে, পরনে ভিজে কাপড় । কেমন যেন বোকা বনে গেছে ।

সুটকেস-ট্রাঙ্ক উলটাল করে এতক্ষণ তল্লাস চালাচ্ছিল সুপ্রিয়, আর কিছু চুরি গেছে কিনা । না, আর বোধ হয় কিছু যায়নি ।

এইবার রুমার দিকে ফিরে তাকাল সুপ্রিয়, চোখোচোখি হতেই কেমন অপ্রতিভ হাসি হাসলে ।

রুমা শান্ত শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, লোকটা আপনার বন্ধু নয় ?

—না, না । আমার মতই বেড়াতে এসেছে, ভেবেছিলাম । এখানেই আলাপ ।

রুমা সুটকেস থেকে একখানা ধুতি বের করে দিল সুপ্রিয়র হাতে, বললে, ভিজে কাপড়ে থাকবেন না, ছেড়ে ফেলুন । আয় রেশম । বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রুমা ।

বেরিয়ে এসে রেশমকে বললে, দেখ তো, সাইকেলের বেল মনে হল, হিমাদ্রিবাবু ফিরলেন বোধ হয় ।

রেশম বারান্দা থেকে নীচে উঁকি দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে দিদি ।

রুমাও রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ।—ও হিমাদ্রিবাবু, হিমাদ্রিবাবু ! শুনে যান একবার ।

হিমাদ্রিবাবু সাইকেল থেকে নেমেই খবর পেয়েছিলেন, ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এলেন ।

আর হিমাদ্রিবাবুর নাম শুনে সুপ্রিয় বেরিয়ে এল ধোপদুরস্ত ধুতিটা লুঙির মত করে পরে চুলে চিরুনি টানতে টানতে । নতুন ঘড়ি, দামি ক্যামেরা এবং নগদ সত্তর টাকা চুরি যাবার বিমর্ষ ভাবটা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে সুপ্রিয়র মুখ থেকে । চুরি গেছে বটে অনেক কিছু, কিন্তু লাভও হয়েছে তার । যে রুমাকে শুধুই চোখে চোখে অন্তরঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করেছিল, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়াটা তো কম লাভ নয় ।

তাই দুঃখ দূর হয়ে ক্রোধ দেখা দিল তার চোখে । বিরক্ত হয়ে হিমাদ্রিবাবুকে বললে, কি মশাই, যত সব চোর ছ্যাঁচোড় ঢুকিয়ে দেন ঘরে ?

হিমাদ্রিবাবু কাজের লোক । কথাটায় কান দিলেন না । বললেন, পুলিশে খবর দিয়েছেন ?

—না । ঠিকানা আপনার রেজিস্টারে লেখেনি ?

হাসলেন হিমাদ্রিবাবু ।—যে চুরি করে পালাবে, সে কি তার সত্যিকারের নাম ঠিকানা দেয় মশাই । বলুন, কি কি গেছে, থানায় খবর দিয়ে আসি । আপনাকেও বলি মশাই,

একটু সাবধান হবেন না ? অচেনা লোকের সঙ্গে এত দহরম-মহরমই বা কেন, এত বিশ্বাস করতেই বা গেলেন কেন ?

সুপ্রিয় এবার চটে গেল। —এ কথা আগে বলেননি কেন ? তা হলে তো সাবধান হতাম।

হাসলেন হিমাদ্রিবাবু। —সুপ্রিয়বাবু, হোটেল আমার ব্যবসা। এর আগে একবার এমনি সাবধান করতে গিয়ে কি হল জানেন ? দু-ভদ্রলোকই চটে গিয়ে ওই রয়াল হোটেলে চলে গেলেন। বোর্ডারিকে অবিশ্বাস করি আমি, তারা থাকবে কেন !

হিমাদ্রিবাবু আর কথা বাড়ালেন না। চলে গেলেন পুলিশকে খবর দিতে।

আর রুমা বললে, ভেবে আর কি করবেন, একটা বেজে গেছে, খেয়ে নিন আপনি।

নিজের ঘরেই টেবিল-চেয়ারে খেতে বসল সুপ্রিয়। ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল। আর রুমা দাঁড়িয়ে রইল চৌকাঠের কাছে।

সুপ্রিয় খেতে খেতে বললে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন না এখানে। বলে তক্তপোশটা দেখিয়ে দিল।

রুমা প্রথমটা একটু কিন্তু-কিন্তু করল। তারপর তক্তপোশের এক পাশ থেকে বিছানাটা গুটিয়ে দিয়ে সেখানেই বসল।

বললে, সত্যি, আপনার কিন্তু অত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।

সুপ্রিয় হাসলে। —যাক্‌গে, এখন টেলিগ্রাম করে কিছু টাকা আনিয়ে নিতে হবে। চেহারা দেখে তো বুঝিনি...

রুমা মৃদু হেসে বললে, চেহারা দেখে কি কাউকে ধরা যায় নাকি। সত্যি আপনার জন্যে আমার এত কষ্ট হচ্ছে !

রেশম এতক্ষণ বারান্দায় ঘুরঘুর করছিল। আর ফিরে ফিরে উঁকি দিচ্ছিল ঘরের মধ্যে। দিদির এই বেহায়াপনা ওর মোটেই ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে সুপ্রিয়কে ওর একেবারেই পছন্দ নয়।

রুমা সুপ্রিয়র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ফিসফিস করে রেশম বললে, যেমন চালবাজি দেখায় দিনরাত, ঠিক হয়েছে।

রুমা চটে গেল। —ছিঃ, ভদ্রলোকের কত লোকসান হয়ে গেল বল তো ! খুব ভালমানুষ, তা না হলে এত বিশ্বাস করে চোরটাকে। নিজের হাতের ঘড়ি খুলে পরতে দিয়েছিলেন। এত কষ্ট হচ্ছে আমার...

খবরটা তখন রীতিমত রটে গেছে। চুরি হয়েছে, হোটেলে চুরি। যে শোনে সে-ই ছুটে আসে, আর সে-ই উপদেশ দেয়।

মিসেস ভট্‌চাজ আর ব্রজমাধববাবুও খাওয়াদাওয়া সেরে উঁকি দিলেন সুপ্রিয়র ঘরে। —আপনার নাকি যথাসর্বস্ব চুরি কইরা লইয়া গেছে। সত্য নাকি সুপ্রিয়বাবু ?

সুপ্রিয় কি আর উত্তর দেবে এ-প্রশ্নের, কত জনকে উত্তর দেবে। হেসে বললে, হ্যাঁ, সব ফাঁক করে দিয়ে চলে গেছে। ব্যাটার নামের বাহার কত, গৌতম, সাক্ষাৎ গৌতম বুদ্ধ। পাই ব্যাটাকে একবার...

মিসেস ভট্‌চাজ উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, অর ত অখনই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। আপনারেও কই সুপ্রিয়বাবু, বন্ধুর লগে অতটা বাড়াবাড়ি উচিত হয় নাই আপনার।

রমণীবাবু এসে ঢুকলেন হট্টগোল শুনে। —আমি অনেক আগেই ভেবেছিলাম সুপ্রিয়বাবু, এমন একটা কিছু হবে। হোটেলে-চেনা লোকেরা সবচেয়ে আনবিলিভেব্‌ল। বিলিভ করেছেন কি ঠকেছেন।

রমণীবাবুর ইংরেজি শুনে মুখে রুমাল চাপা দিলেন মিসেস ভট্‌চাজ। আর সুপ্রিয়

ভাবলে, যা গেছে তা তো গেছেই, এই সুযোগে আলাপটা হয়ে গেল রুমার সঙ্গে। লোকগুলো এখন বিদায় হয় না কেন। তা হলে রুমা হয়তো আবার আসত!

হঠাৎ এই চুরিটা হয়ে সুপ্রিয় আর রুমার সুবিধে হয়েছে, দু-জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তা লক্ষ করছে সবাই। বিশেষ করে শিবনাথবাবু।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শিবনাথবাবু তাঁর মেকানিককে সে-কথা বললেন। —বুঝলে মিস্ত্রি, ও ছোকরা চুরি করে পালিয়েছে বলে গালাগালি দিচ্ছে সবাই। কিন্তু খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে তার পকেট কাটায় সবাই তো বাবা ওস্তাদ। এই আমি, এত আলাপ করি লোকের সঙ্গে, উদ্দেশ্য তো সেই পকেট কাটা, কি বলো! কিংবা ধরো ওই সুপ্রিয়বাবু এত যে মিশছে মিস্টার সেনের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রীকে মাসিমা বলছে, আসলে পকেট কাটবে ও। দেখে নিয়ো। ওই রূপবতী যুবতী মেয়েটিকে...

রূপবতী যুবতী মেয়েটির দিকেই যে সুপ্রিয়র দৃষ্টি তা বুঝতে পারেন না মিস্টার সেন। এমনকি শ্রীলেখাদেবীও বুঝতে পারেন না।

চুরিটা হয়ে যাবার পর থেকে সুপ্রিয়কে কেমন যেন করুণার চোখে, স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন তিনি। আহা, বেচারি বিদেশে বিভুঁইয়ে বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়েছে!

বিকেলের রোদ নরম হতেই ভ্রমণে বের হচ্ছিলেন শ্রীলেখাদেবী। সামনে সুপ্রিয়কে দেখে ডাকলেন। —ও ছেলে, হদিস পেলে কিছু।

—না মাসিমা। সত্যি এমন বিপদে পড়েছি, একটা পয়সা নেই হাতে। টেলিগ্রাম করেছি বাড়িতে, কখন যে টাকা এসে পৌঁছবে।

শ্রীলেখাদেবীর মন ভিজে গেল। —সে কি। কিছু নেই তোমার হাতে? তা দু-পাঁচ টাকা দরকার হয় তো...

মিস্টার সেনও সায় দিলেন। আমরাও এমন কিছু বেশি নিয়ে আসিনি, তবু আপনার যদি প্রয়োজন হয় সামান্য কিছু নিয়ে রাখতে পারেন। ও রুমা—

সুপ্রিয় বাধা দেবার আগেই একমুখ হেসে উঠলেন শ্রীলেখাদেবী। স্বামীকে বললেন, ওকে আর আপনি বলো না তুমি, কতই বা বড় আমাদের পশমের চেয়ে।

সুপ্রিয় হাসল। —হ্যাঁ, আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

মিস্টার সেন হেসে বললেন, বেশ তাই হবে, তাই হবে।

অর্থাৎ এড়িয়ে গেলেন। সোজাসুজি 'তুমি' বলতে বাধল।

শ্রীলেখাদেবী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। নামতে নামতে বললেন, রুমা, রেশম রইল, দরকার হয়তো চেয়ে নিয়ো, 'কিন্তু' করো না।

বলে নীচে নেমে গেলেন দু-জনেই। একে একে অন্য সকলেও বেরিয়ে গেলেন বৈকালিক ভ্রমণে।

ঘরের জানালা থেকে সুপ্রিয় উঁকি দিয়ে দেখল শিবনাথবাবু আর পাঞ্জাবি মেয়েটি খুব মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে চলেছে গৌরীকুণ্ডের দিকে। রমণীবাবুও সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিলেন, সময় হিসেব করে ঘরে তালা দিয়েছিলেন যাতে মিস্টার সেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে একই পথে যাওয়া যায়, কিন্তু মুখের ভাব তাঁর বদলে গেল রুমাকে বের হতে না দেখে। অথচ তখন আর উপায় নেই। বাধ্য হয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হল তাঁকে।

রমণীবাবু বেরিয়ে যেতেই বারান্দার রেলিং ঘেঁসে এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়। সেই যে দুপুরে

এসেছিল রুমা, তারপর আর দেখা পায়নি, কথা বলেনি।

ক্রমে ক্রমে মেঘের ফাঁক থেকে এক টুকরো ভাঙা চাঁদ উঁকি দিল। নির্জন অন্ধকার বারান্দায় পড়ল ফিকে চন্দ্রালোক। মাধবীলতার ছায়া দুলল হাল্কা বাতাসে। নীচের-তলায় কুয়োতলা থেকে থামের গা জড়িয়ে উঠেছে মাধবীলতার ঝাড়, দোতলার বারান্দার থামের গায়ে গায়ে দুলছে তার কচি কচি ডগা। আর থোপা থোপা ফুল ফুটেছে। লাল আর সাদা ফুল। সাদা ফুলগুলো একটু একটু করে লাল হয়ে উঠছে। এই একটু আগেও এত লাল ছিল না। নাকি রান্নাঘরের আলোটা এসে পড়েছে বলেই এত সুন্দর দেখাচ্ছে।

সারা বারান্দাটা কেমন রোমাঞ্চ-মধুর, আলো-অন্ধকারে রহস্যময়। রহস্যময় আর নির্জন। সকলেই বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে শুধু শিবনাথবাবুর মেকানিক, যাকে শিবনাথবাবু নিজে বলেন মিস্ত্রি। লোকটা সারাদিন খাটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে, খায় পেটভরে, আর বিকেলে ফিরে এসেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নেহাত শিবনাথবাবুর পাল্লায় না পড়লে বেড়াতে বের হয় না, ক্লান্তিতে দুর্বল না বোধ করলে শস্তা মদের দোকানে গিয়ে গলা ভেজায় না।

ওদিকে হিমাদ্রিবাবুর বাসায় অবশ্য লোকজন আছে। রেডিও চলছিল, ক্ষণেকের জন্যে থামতেই বেলুর গলা কানে এল রুমার। চিৎকার করে পড়া মুখস্থ করছে বেলু। পড়ছে ভারতের শাসন-পদ্ধতি : 'ভারতের জেলাশাসককে সরকারের চক্ষু কর্ণ মুখ ও হস্ত বলা হয়। তিনি সর্বদাই সফরে বাহির হন এবং নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন। কোথায় কতখানি বৃষ্টিপাত হইল, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইবে কিনা, চাষীরা চাষ ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সরকারকে অবহিত করেন...'

বারবার এই কয়েকটা লাইনই পড়ছে বেলু। ছ-নম্বরের তক্তপোশের এক কোণে বসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একমনে উল বুনতে বুনতে হঠাৎ চোখ কান সজাগ করে শুনল রুমা। নিজের মনেই হাসল।

রেশম ওদিকে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছে। ঠাকুর চাকরের উদ্দেশে ধমক দিচ্ছেন হিমাদ্রিবাবু।

হঠাৎ হাওয়ায় পর্দাটা দুলে উঠতেই রুমার চোখ গেল বারান্দার দিকে। বুকটা ছমছম করে উঠল। কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়? আবছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই বুঝতে পারল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আরও বারকয়েক পর্দাটা দুলে উঠতেই দেখতে পেল।

সুপ্রিয়বাবু না? হ্যাঁ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে।

তা হলে উনিও কি বেড়াতে যাননি?

আবার উল বোনায় মন দিল রুমা, আর তার নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে একটু কৌতুকের হাসি দুলে গেল।

না, একমনে আর উল বুনতে পারছে না রুমা। বারবার সুপ্রিয়র দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাকালেও বারকয়েক। কিন্তু সুপ্রিয় তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের দিকে।

জ্যোৎস্না রাতে বেশ দেখায় কিন্তু মন্দিরটা। দিনের বেলায় দশ মাইল দূর থেকেও ভাল দেখা যায়—এত উঁচু। গড়নটাও বেশ নিটোল। রাত্রে, শুক্লপক্ষের চাঁদ থাকলে মাটি আর আকাশের গায়ে মন্দিরটার ছায়া ছায়া রূপ বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, আর কোথাও কিছু নেই, শুধু একা একা আকাশে হেলান দিয়ে পৃথিবীকে পাহারা দিচ্ছে যেন।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল রুমা। যাবে, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে? দেখবে এই সুন্দর ছায়াছবি? না, কক্ষনো না, সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি বারান্দায়

এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে তার ? কক্ষনো না। মাধবীলতার ফুলগুলো ফুটে আছে থোকা থোকা হয়ে, সেগুলো তুলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। মন্দিরটা চাঁদের আলোয় কেমন লাগে দেখতে সুপ্রিয় না থাকলেও বেরিয়ে আসত রুমা। সুপ্রিয় না থাকলে বরং বেরিয়ে আসা সহজ হত।

সুপ্রিয় থাকলেই বা। মানুষ তো। জন্তু-জানোয়ারও নয়, চোর ডাকাতও নয়। আর আমি কি যথেষ্ট বড় হইনি ? ভেবেচিন্তে চলতে শিখেছি, নিজেকে নিজেই শাসন করতেও শিখেছি—ভাবল রুমা।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উলের বল, বোনার কাঁটা থলির মধ্যে ভরে একপাশে সরিয়ে রাখল রুমা। একবার তাকাল রেশমের দিকে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

পায়ের শব্দে চকিত একবার তাকাল সুপ্রিয়। সমস্ত শরীরে যেন তার সেতার শিহরনের ঝঙ্কার বেজে উঠল। কিন্তু কথা বলতে পারল না।

একটু দূরত্ব রেখে রুমাও এসে দাঁড়াল বারান্দায়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটার দিকে তাকাল একবার, মাধবীলতার দিকে। উপযাচিকা প্রণয়ীর মত মাধবীশাখার ডগাগুলো যেন দুঃসাহসের উঁকি দিচ্ছে বারান্দার জানালায়।

সেগুলির ওপর স্নেহের মত নরম হাত বুলিয়ে গেল রুমা। তারপর থোকা থোকা ফুল ছিঁড়তে শুরু করল।

না, ওই বড় থোকাটার কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না রুমা। বারবার চেষ্টা করেও পারল না। রেলিং থেকে অতখানি ঝুঁকে পড়তে ভয় হচ্ছে।

সুপ্রিয় দেখছিল তার কাণ্ডকারখানা। দেখছিল আর নিঃশব্দে হাসছিল। এবার সে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে থোকাটা ছিঁড়ে আনল। হাত বাড়িয়ে থোকাটা দিল রুমাকে।

—কি সুন্দর ! ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল রুমা। খোঁপায় পরল।

সুপ্রিয় বললে, বেড়াতে যাননি ?

—না। আপনি যাননি কেন ?

—ভাল লাগল না।

খিলখিল করে হাসল রুমা। —এখনও চুরির কথা ভাবছেন বুঝি ?

হাসির সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালে রুমা, আর ফুলের গুচ্ছ খুলে পড়ে গেল খোঁপা থেকে।

কুড়িয়ে নিল সুপ্রিয়, নিজেই খোঁপায় গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছ-নম্বর ঘরের দরজায় চোখ যেতেই হাত থেমে গেল তার।

রেশম এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। চোখে তার বিরক্তির কিংবা অপছন্দের দৃষ্টি।

রেশম ডাকলে, দিদি !

—কি রে ? সহজভাবেই ফিরে তাকাল রুমা।

—জিওগ্রাফিটা একটু বুঝিয়ে দিবি আয়।

ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি হেসে রুমা বললে, যাচ্ছি। তুই তো এতক্ষণ গল্প পড়ছিলি।

এখন জিওগ্রাফি পড়ব। তেমনি রুষ্ট স্বরেই বলল রেশম।

রুমা অন্য সময় হলে বলত, জিওগ্রাফি নয়, জ্যোগ্রাফি। এখন মৃদু হেসে বললে, চল যাচ্ছি।

চলে গেল রুমা। বিষুবরেখা আর কর্কটরেখা বোঝাতে। সুপ্রিয়র আশা আকাঙক্ষার গায়ে কর্কট-দংশনের জ্বালা রেখে।

বুড়ো রমণীরঞ্জন দত্ত তিনখানা ট্যারাবাঁকা দাঁতের ফাঁক থেকে মুচকি হেসে কাপড়ের খুঁটে পুরু লেন্সের চশমার কাচ ঘষে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন বারো নম্বর ঘরের সামনে।

—ও শিবনাথবাবু, আটটা না বাজতেই যে শুয়ে পড়লেন। আপনাদের কি বলুন, জোয়ান বয়েস, আমাদের মত স্লিপনেসলেসে ভুগতে হয় না।

শিবনাথবাবু উঠে বসলেন তক্তপোশের ওপর। বললেন, আসুন, আসুন, কি খবর?

—আরে মশাই, খবর আছে বলেই তো এলাম। জবর খবর। আর ওঁদেরও বলি মশাই, অমন একটা ধিঙ্গি মেয়েকে রেখে নিজেরা গেলেন লভ-মেকিং করতে। আমি তখনই বুঝেছি...

শিবনাথবাবু হেসে উঠে বললেন, কার কথা বলছেন?

রমণীবাবুর কুতকুতে চোখজোড়া এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয় একবার। তারপর মুখটা কাছে এনে ফিসফিস করে বলেন, ওই সেন-দম্পতির কথা বলছি মশাই। বেরুবার সময় দেখি কি, বাপ-মার সঙ্গে বেড়াতে গেল না মেয়েটি, 'মাথা ধরেছে'...

'মাথা ধরেছে' কথাটা ব্যঙ্গের স্বরে বিকৃত করে উচ্চারণ করলেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন শিবনাথবাবু।—তা হয়েছে কি তাতে?

—কি হয়েছে? তার চেয়ে বলুন না, কি হয়নি। আরে মশাই, মেয়েটি বেরুল না দেখেই তো কেমন সন্দেহ হল। বাইরে এসে রাস্তা থেকে উঁকি দিয়ে দেখি কি সুপ্রিয়বাবুও বেরোননি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পমেটম করছেন।

দিল্-খোলা মানুষ শিবনাথ, হাসেন প্রাণ খুলে। এ-কথায় তাই সশব্দে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। আর তা শুনতে পেয়ে বারান্দা থেকে শিবনাথবাবুর মেকানিক ওরফে মিস্ত্রি কৌতূহলী হয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

তাকে দেখেই রমণীবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কুঁকড়ে গেলেন যেন। বললেন, না, তাই বলছিলাম।

রমণীবাবু আমতা আমতা করছেন দেখে শিবনাথবাবু হেসে ফেললেন আবার।—এ আমার মেকানিক, নিজের লোক, বলুন না কি বলছিলেন।

—বলব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

রমণীবাবু আবার শুরু করলেন।— আমি তো মশাই সন্দেহ করেছিলাম প্রথম থেকেই। চুরি গেল সুপ্রিয়বাবুর অত সব জিনিসপত্র, টাকা, সে সব ভুলে দুপুরে কেমন জমিয়েছিল দুটিতে দেখেননি তো। তা আমিও বাবা কম যাই না, ছেলেটিকে বিন্দু-সরোবরের বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখে চলে এলাম আবার, এসে রান্নাঘরের পাশের ওই বাগানটায় ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলাম। সে কি ফুল তোলা নিয়ে হুড়োহুড়ি দুটিতে, সুপ্রিয়বাবু মেয়েটির খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতে গেল, আর উনি লজ্জায় মুখ বেঁকিয়ে সরে গেলেন। তা আপনি কি বলেন, বাপটাকে বলে দেব? আমাদেরও তো একটা ডিউটি আছে। নেবারলি ডিউটি...

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, ছি ছি, তা কেন বলতে যাবেন! আরে মশাই, এই আমাকে দেখে ভাবছেন, একজন সেল্‌স্‌ম্যান—রোজলার কোম্পানির—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, দি বিগেস্ট কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া—আর রোজলারের পাখা মানে ইউ মে রেকমেন্ড রোজলার টু ইওর ফাদার—সেই কোম্পানির সেল্‌স্‌ম্যান আমি। সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, বুঝলেন?

তাই নাকি ? রমণীবাবু আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৃন্দাবন গিয়েছেন ? দ্বারকা ?

—সব, সব। শিবনাথবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন না এতটুকু। যদিও অন্য সময় হলে বলতেন, ওসব তিথ্যিটিথ্যি নিয়ে কারবার নয় মশাই আমাদের।

রমণীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দুঃখের সুরে বললেন, আমার ভাগ্যে আর ও দুটো হল না, এত ইচ্ছে ঘুরে আসার।

শিবনাথবাবু বললেন, তা যে পয়েন্টে বলছিলাম। মশাই সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলাম কি জানেন ? শুধু আমি নই, সবাই সেল্‌স্‌ম্যান। সব, সব। ওই সুপ্রিয়বাবুও সেল্‌স্‌ম্যান, আর মিস্টার সেনের মেয়ে ওই রুমাদেবী—উনিও সেল্‌স্...মানে সেল্‌স্‌ওম্যান।

দুটো হাতের বিচিত্র ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্র'গ করলেন শিবনাথবাবু। বললেন, তারা যদি নিজে নিজে কেনাবেচা করে, আমাদের কি ?

মেকানিক এতক্ষণ চুপচাপ লুঙি পরে শুয়েছিল তক্তপোশের ওপর। এবার কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল।—সব সেল্‌স্‌ম্যান নয় স্যার। কিছু কিছু মেকানিকও আছে। একটু ভাঙাচোরা হলে কল বিগড়ে গেলে রিপেয়ার করে দেয়।

হো হো করে অট্টহাসে ফেটে পড়লেন শিবনাথবাবু।—ঠিক বলেছ মিস্ত্রি...ইয়ে মেকানিক...

দু-জনে যখন একলা থাকেন তখনই 'মিস্ত্রি' বলেন শিবনাথবাবু, রমণীবাবু যে সামনে বসে আছেন সেটা খেয়াল ছিল না তাঁর।

সামলে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছ, দরকার হয় রিপেয়ার করে দেব, তা না আপনি রমণীবাবু, চাইছেন কল বিগড়ে দিতে। কি করতেন আগে ? স্কুল মাস্টারি ?

রমণীবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল।—কি করে বুঝলেন ?

—তা আর বুঝব না। মনুষ্যচরিত্র না বুঝতে শিখলে কি রোজলার কোম্পানির সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারতাম ? রোজলার—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, দি বিগেস্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। গান্ধী আর রোজলার—দুটো নাম জানে সারা ভারতবর্ষের লোক।

রমণীবাবু বললেন, বুঝেছি, এই চওড়া কপাল দেখে অনেকেই বলে...

—ফুত। একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন শিবনাথবাবু। বললেন, ওসব ঠিকুজি-কোষ্ঠী, হাত দেখা, বগল দেখার বিদ্যেতে আমার বিশ্বাস নেই। স্রেফ এই গার্জেনি করার স্বভাব দেখলেই বুঝি।

রমণীবাবুর গায়ে লাগল কথাটা। একটু অপমানিত বোধ করলেন, রাগলেন তার চেয়ে বেশি। তাই উঠে পড়ে বললেন, যাই খাবার দিয়ে গেছে হয়তো।

উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। নাকটা কুঁচকে কিসের যেন ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলেন দু-বার। তারপর বললেন, মদ্যপানের গন্ধ পাচ্ছি যেন।

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার মেকানিক একটু-আধটু পান করেন।

—মদ্য ? ওয়াইন ?

মেকানিক একটা চোখ কুঁচকে বললে, নেশা কার নেই স্যার ? আমরা কাজও করি, নেশাও করি। আপনাদের তো স্যার স্রেফ নেশাটুকুই আছে।

কথাটা বোধহয় বুঝলেন না শিবনাথবাবু। ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে সটান চলে এলেন তিনি ন-নম্বর ঘরে সুপ্রিয়বাবুর কাছে।

সুপ্রিয় ডিটেকটিভ বইটা নামিয়ে রেখে উঠে বসল।

রমণীবাবু একটা চোখ টিপে হেসে বললেন, গেঁথে তুলুন, গেঁথে তুলুন।

সুপ্রিয় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঠাকুর এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। ভাত দিবো বাবু ?

রাতো নয়টা বাজি গলা।

সুপ্রিয় ধমক দিয়ে উঠল।—শুধু খেতেই এসেছি নাকি এখানে ? কাজ সারতে পারলেই হল। আর ঘড়িটা চুরি গেল কিনা, ব্যাটা বলে কিনা ন-টা বাজল।

—বটা কউছি কাঁহি। রাগটা দেখিয়ে ফিরে দাঁড়াল ঠাকুর। তারপর পোষা বেড়ালটাকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে একটা চেলা কাঠ ছুঁড়ে দিল তার দিকে। রাগটা গিয়ে পড়ল বেড়ালটার ওপর।

ভোরবেলায় হিমাদ্রিবাবুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল রমণীবাবুর। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। দেখলেন, রান্নাঘরের পিছনে, যেখানে বেগুনের চারা, লাউ, কুমড়ো লাগিয়েছেন হিমাদ্রিবাবু, প্রতিদিন খুরপি হাতে নিজেই যেগুলোর তদারক করেন, সেইখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন হিমাদ্রিবাবু, আর চৈতন্য, সুলোচন, যৌতুকী সবাই মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুপ্রিয়ও চিৎকার শুনে বেরিয়ে এল। জিগ্যেস করলে, কি, হল কি হিমাদ্রিবাবু ?

হিমাদ্রিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার সব্বনাশ করে দিয়ে গেছে মশাই, সব্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

—কেন, কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে! ম্যাডান নার্সারি থেকে ইয়া পাঁচ-সেরি বেগুনের বীজ আনিয়ে লাগিয়েছিলাম মশাই, কি সুন্দর হলহলে চারা হয়েছিল, সব মাড়িয়ে দিয়ে গেছে ঠাকুর-চাকরগুলো।

ঠাকুর-চাকরের দল সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে উঠল।—না বাবু, মুই না করুছি।

সুপ্রিয়ও নেমে এল। এসে পায়ের ছাপগুলো দেখে বললে, উঁহু, ওরা নয়।

—আপনি বললেই হবে ? ওরা ছাড়া আর কার দায় পড়েছে আমার পাকা ধানে মই দিতে আসবে ?

সুপ্রিয় তখনও পায়ের ছাপগুলো ভাল করে দেখছে। দেখতে দেখতে বললে, দেখছেন না, জুতো পরে মাড়িয়েছে। জুতোর ছাপ। বোর্ডারিদের সবারই এক পাটি করে জুতো নিয়ে আসুন, কে বলে দিচ্ছি। ডিটেকটিভ বই মশাই আমার একটাও বাকি নেই।

—বোর্ডারি ? হতাশ দেখাল হিমাদ্রিবাবুকে। বললেন, যাক্ যা হয়েছে, কেউ তো আর ইচ্ছে করে করেনি। বলে হাতের মাটি ধুয়ে ঘরে চলে গেলেন।

বোর্ডারি লক্ষ্মী। বোর্ডারিদের কি চটাতে পারেন।

রমণীবাবু প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। নেমে আসতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের জুতো জোড়াটার দিকে তাকিয়ে সাহস পেলেন না। কেউ কোথাও দেখছে কিনা এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘটির জল ঢেলে ঢেলে ধুয়ে নিলেন জুতোর তলাটা। কাদা লেগে আছে এখনও।

না ধুলেও চলত। কারণ, হিমাদ্রিবাবুর অভিধানে বোর্ডারি কোনও অন্যায় করতে পারে না।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে মুড়ি-গুড়ের জলযোগ সেরে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে ছাপানো হ্যান্ডবিল আর বাঁধানো খাতাখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। গৌরীদেবী আর সুশান্ত রেজ চলে যাবার পর থেকে এগারো নম্বরটা খালি পড়ে আছে। তার ওপর চোরটা পালিয়েছে, সেখানেও একটা সিট। নতুন অতিথি না এলেই নয়। যেমন করে হোক ধরতে হবে আজ। রিগ্যাল হোটেলের মালিক রিক্‌শওয়ালাগুলোকে বকশিসের লোভ দেখিয়ে সেবার এমন হাত করেছিল যে, ট্রেন থেকে লোক নামতে না নামতে গিয়ে ধরত তারা, বলত, এখানে নাকি একটাই ভাল

হোটেল আছে—রিগ্যাল হোটেল। ভুলেও তারা পান্থপাদপ হোটেলের নাম করত না।

মনে মনে ভাবেন হিমাদ্রিবাবু। তেমনি বকশিসের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।

স্টেশনে পৌঁছে সাইকেলটায় তালা ঝুলিয়ে তারের বেড়ায় ঠেসিয়ে রেখে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন হিমাদ্রিবাবু।

কলকাতার গাড়ি আসতে এখনও দেরি আছে কয়েক মিনিট।

তবু স্টেশন-মাস্টারের ঘরে ঢুকলেন একবার, ট্রেন ল্যেট আছে কিনা জেনে নেওয়াই ভাল। বেশিক্ষণ ল্যেট থাকে তো এই সময় বাজারটা সেরে রাখতে পারবেন।

স্টেশন-ঘরে ঢুকতেই মাস্টারবাবু বলে উঠলেন, এই যে হিমাদ্রিবাবু, আসুন আসুন। আপনি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলেন, দেখাই পাই না আজকাল।

হিমাদ্রিবাবু হাসলেন।—স্টেশনে তো দু-বেলাই আসছি মাস্টারমশাই। আপনার দরজায় কপাল ঠুকে যাচ্ছি না এমন দিন তো দেখি না।

ছোটবাবু অর্থাৎ এ. এস. এম মল্লিকের ছোকরা বয়েস, সব সময়েই একটু ইয়ার্কির ঢঙে কথা বলে।

সে বললে, কপাল ঠুকতেই আসেন, পদধূলি তো দেন না। এ ঘরে ঢোকেন না কেন, মুরগির মাংস খেতে চাইব বলে?

মাস্টারবাবু হেসে ওঠেন হো হো করে।—তা মল্লিক ঠিকই বলেছে। মুরগির মাংস কিন্তু অনেক দিন খাওয়াননি।

এই ভয়েই স্টেশন-ঘরে ঢোকেন না হিমাদ্রিবাবু। সে দিনকাল কি আর আছে? একটা মুরগির দাম এখন আড়াই টাকা। এত বড় একটা হোটেল থেকে সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, কথায় কথায় আগেকার মত মাংস খাওয়ানোর বাতিক ঢুকলে তো ফতুর হয়ে যাবেন। এঁদের কি। এঁরা ভাবেন, লাখ লাখ টাকা লাভ করছেন হিমাদ্রিবাবু।

তা হলে তো স্যানিটারি বাথরুমের ব্যবস্থাও করে ফেলতে পারতেন।

তবু মুখে হাসি টেনে হিমাদ্রিবাবুকে বলতে হল, খাওয়াব, খাওয়াব। ভাল মুরগি-টুরগি পাচ্ছি না কিনা আজকাল।

স্টেশনের লোকজনদের একটু হাতে রেখেই চলতে হয় তাঁকে। কে জানে কখন কি কাজে লাগে। তাছাড়া, তরি-তরকারি, মাছ-টাছ এখানকার বাজারে না মিললে প্রায়ই কটক থেকে আনাতে হয়। তখন মালের ওজন বেড়ে গেলেও কিছু বলেন না মাস্টারবাবু, এমনকি ডবলু-টিতে যাতায়াত করতেও দেন কখনও কখনও।

হিমাদ্রিবাবু তাই একটু তোষামুদে হাসি হেসেই জবাব দিলেন, খাওয়াব, খাওয়াব। কিন্তু ট্রেন ল্যেট আছে নাকি আজ?

—না, রাইট টাইম। টেলিগ্রাফের যন্ত্রে টরে টক্কা টরে টক্কা করতে করতে এ. এস. এম মল্লিক উত্তর দিলে—ওই এল বলে...এই বদ্রিনাথ...

চিৎকার করে খালাসিকে ডাক দিলে মল্লিক।—ঘন্টি বাজিয়ে দিয়ে আয়।

আরও দু-চারটে গল্পগুজব হল মাস্টারবাবুর সঙ্গে। হোটেল কেমন চলছে, স্টেশনের কাজ কত বেড়ে গেছে, 'এই নোংরা শহরটা বালিগঞ্জ হয়ে উঠল', 'ক্যাপিটেলের মেয়েগুলোর কি চেহারা, যেমন রূপ, তেমনি ফ্যাশন, এ-সব আমাদের যৌবনকালে কোথায় ছিল মশাই', এমনি সব রং আর রসের কথা।

দেখতে দেখতে ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল, হিমাদ্রিবাবু বেরিয়ে এলেন, পিছনে পিছনে মাস্টারবাবু, কালো কোটে পিতলের বোতাম আঁটতে আঁটতে।

মুহূর্তের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠল সারা প্ল্যাটফর্ম। দেহাতি লোকের ভিড়, পচা মাছের ঝুড়ি, গুড়ের বোড়া, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মানুষ। কেউ নামবার জন্যে

ব্যস্ত, কেউ কামরায় উঠে একটু জায়গা পাবার জন্যে।

হিমাদ্রিবাবু তারই ফাঁকে ছুটে বেড়ান। নতুন আগন্তুকদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যান। ক্যাপিটেলের লোকেরা সবাই মুখচেনা, সুতরাং তাদের ধারে কাছেও যান না। ভুল হয় ক্যাপিটেলের চাকুরে বাবুদের আত্মীয়স্বজনদের বেলায়। তাদের চেঞ্জার ভেবে এগিয়ে যান, হালের হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিতে দিতে মুখস্থ কবিতার মত বলে যান, 'একটাই ভাল হোটেল স্যার এখানে, দি পান্থপাদপ হোটেল। দেখুন না, কে কি বলেছেন, হাইকোর্টের জজ...'

কথার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো খাতার পাতা খুলে সার্টিফিকেটগুলো মেলে ধরেন।

যাঁরা ক্যাপিটেলে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন, তাঁরা প্রথম দফাতেই হাত দিয়ে খাতাটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, না, হোটেলে উঠব না।

হিমাদ্রিবাবু আবার নতুন খদ্দের খোঁজেন।

সেদিনও এমনি দু-চারবার ভুল করে তারপর এগিয়ে গেলেন থার্ড-ক্লাস থেকে যে ভদ্রলোক নামলেন তার দিকে। মুখটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। আগে এসেছিলেন হয়তো তাঁর হোটেলে। দিব্যি লম্বা চওড়া চেহারা, গেরুয়া রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি, খদ্দরের ধুতি, কাঁধে একটা ঝোলা।

থার্ড ক্লাসের দিকে সাধারণত যান না হিমাদ্রিবাবু, কারণ তাঁর ভাষায় ওরা সব 'রয়াল হোটেল' অর্থাৎ ধর্মশালার খদ্দের।

কুলি-দুটো জিনিসপত্র নামাল। তিনটি বড় বড় ট্রাঙ্ক। একটা বেডিং, একটা সুটকেস।

ট্রাঙ্ক নামাতে গিয়ে কুলি দুটো বললে, বহুত ভারী হ্যায় বাবুজি! কেয়া হ্যায় ইসমে, বর্তন?

হাসলেন ভদ্রলোক। উত্তর দিলেন না।

হিমাদ্রিবাবু এইবার এগিয়ে গেলেন।—হোটেলে উঠবেন তো?

—রিগ্যাল হোটেলের লোক আপনি?

হিমাদ্রিবাবু চুপসে গেলেন এক মুহূর্তে। তবে কি রিগ্যাল হোটেল আবার চালু হল নাকি?

মিছে কথা তো বলতে পারেন না, হিমাদ্রিবাবু বললেন, আজ্ঞে না, আমাদের দি পান্থপাদপ হোটেল অ্যান্ড...

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে চলুন। রিগ্যালে মশাই আর যাচ্ছি না, এর আগের বার এসে সে-যে কি হাল হয়েছিল...

হিমাদ্রিবাবু হেসে বললেন, সে হোটেল কবে উঠে গেছে। এখন পান্থপাদপ বাদ দিলে আছে রয়াল হোটেল—ধর্মশালা।

মালপত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা, রিকশা ঠিক করা সব কিছুর হিমাদ্রিবাবুই ভার নিলেন। ভার নেন।

তিনটে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতে আসতে হিমাদ্রিবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন।—আমাদের হোটেল স্যার ভালই, দেখুন না গোবরডাঙার ম্যালেরিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর কি লিখেছেন, আর এই দেখুন হাইকোর্টের জজ...

ভদ্রলোককে একটা রিক্‌শায় চড়ালেন হিমাদ্রিবাবু, আরেকটায় মালপত্র। তারপর সাইকেলের তালা খুলে ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে হোটেলের পথ ধরলেন।

মাঝপথে একবার শুধু কয়লার দোকানটা ঘুরে গেলেন তিনি। কিন্তু গিয়ে পৌঁছলেন যখন হোটেলে, রিক্‌শা দুটোও তখনই এসে দাঁড়িয়েছে।

হাঁকডাক শুরু করলেন হিমাদ্রিবাবু। যৌতুকী, ও যৌতুকী!

নারীকণ্ঠের উত্তর এল। যাউছি বাবু।

তারপরই যৌতুকী এসে দাঁড়াল। সেই কালো কুৎসিত বিশ্রী চেহারার মানুষটা। হলদে দাঁতের সারি বের করে হাসল সে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে, তারপর অবলীলায় একটা ট্রাঙ্ক তুলে নিল কাঁধের ওপর।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কি আশ্চর্য! স্টেশনের কুলিগুলো যা তুলতে হিমসিম খেয়ে গেল, এই অবলা জীবটি তা এমন অবহেলায় তুলে ফেললে?

হিমাদ্রিবাবুর পিছন পিছনেই ন-নম্বর ঘরে এসে ঢুকলেন ভদ্রলোক। সুপ্রিয় শুয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছিল, ভদ্রলোককে দেখে একটু বিরক্ত হয়েই উঠে বসল। ভাবলে, বেশ ছিলাম একা একা। আবার এক চোর-ছ্যাঁচোড় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বুঝি।

এমনিতেই ভদ্রলোককে একটু সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল সুপ্রিয়, যৌতুকী পরপর তিনটি ভারী ভারী ট্রাঙ্ক এনে ঘর বোঝাই করতেই সুপ্রিয়র গোয়েন্দা-মনটা উৎসুক হয়ে উঠল, ট্রাঙ্কে কি আছে জানবার জন্যে। এসেছিস তো বাপু একটা লোক। এত জিনিসপত্র কিসের জন্যে।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে তাঁর পুলিস-খাতা নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন।

নতুন কোনও আগন্তুক এলেই এই-খাতায় তার নাম ধাম, উদ্দেশ্য, বাড়ির ঠিকানা, পরিচয় সব লিখে দেওয়ার নিয়ম। আর এই খাতাটা নিয়মিত থানা-আপিসে দেখিয়ে আনার কথা।

হিমাদ্রিবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে। আগে এ-কাজটা চা-জলখাবার দেওয়ার পরই সারতেন, কিন্তু সদ্য সদ্য একটা চুরি হয়ে গেছে বলেই খাতাটা আনতে দেরি করেননি।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-চাকরদের হাঁকডাক করে চা-খাবার দিতে বলেছেন ন-নম্বরে, যৌতুকীকে বলেছেন জল দিতে।

যৌতুকীকে বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ, ততক্ষণে সে কুঁজোয় করে এক কুঁজো জল রেখে দিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক নাম ঠিকানা লিখতে শুরু করলেন, আর হিমাদ্রিবাবু ঝুঁকে পড়লেন ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানবার জন্যে। তাঁর কাছে সব খদ্দেরই সমান, সকলেই সমান টাকা দেয়। তবু বিখ্যাত লোক কিংবা বড় চাকুরে-টাকুরে হলে খুশি হন তিনি বেশি। গর্বিত বোধ করেন।

খাতাটা সই করিয়ে নিয়েই দু-চারটে কথা বলে বেরিয়ে এলেন হিমাদ্রিবাবু। গিয়ে ঢুকলেন একেবারে বারো নম্বরে।

—ও শিবনাথবাবু, হোটেলে আজ কে এসেছেন জানেন? প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ন-নম্বরে উঠেছেন, বললেন, আগে যে রিগ্যাল হোটেলটা ছিল, একেবারে যাচ্ছেতাই।

শিবনাথবাবু একটু আগ্রহ দেখালেন। মনে মনে ভাবলেন, আলাপ করতে হয়। প্রফেসর মানুষ, কলেজে-টলেজে পাখা তো কম লাগে না, যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

হিমাদ্রিবাবু বারো নম্বর থেকে দশ, দশ থেকে আট এবং তারপর ছ-নম্বরে এসে মিস্টার সেনকে খবরটা দিলেন।

রুম্মাও এগিয়ে এল খবর শুনে। তার প্রথম আগ্রহটা ছিল বিরক্তি মেশানো। সুপ্রিয়র

ঘরে আবার অন্য লোক ঢুকল শুনে। পরে যখন শুনল প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, তখন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, প্রফেসর ঘোষ মানে ওই আর্কেওলজির প্রফেসর। মন্দির-টন্দিরের ওপর যাঁর সব অথরিটেটিভ বই আছে? তিনি?

মিস্টার সেনও আগ্রহ দেখালেন। —প্রফেসর ঘোষ, কমলকুমার ঘোষ?

এত সব পরিচয় অবশ্য হিমাদ্রিবাবু জানতেন না। তবু ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

বলে বেরিয়ে এসেই আবার হাঁকডাক শুরু করলেন, লক্ষ্মীবউ, যৌতুকী, এমনকি ঠাকুর-চাকরদের উদ্দেশ্যও। প্রফেসর শুনেই হিমাদ্রিবাবু গর্ববোধ করেছিলেন, অন্যান্য বোর্ডারদের সে-খবর জানিয়ে নিজের হোটেল সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটা যাতে একটু ভাল হয় তার চেষ্টা করেছিলেন, জানতেন না নবাগত ভদ্রলোক শুধু প্রফেসরই নন, বিখ্যাত ব্যক্তি, সুপণ্ডিত। মিস্টার সেন আর তাঁর মেয়ে রুমার কাছ থেকে এ-খবর জানতে পেরেই যেন হিমাদ্রিবাবু বুঝতে পারলেন ভদ্রলোককে আরও বেশি করে সমাদর দেখানো উচিত।

হাঁকডাক করে ঝি-চাকরগুলোকে এনে জড়ো করলেন তিনি ন-নম্বরে। কাউকে বললেন তক্তপোশটা পরিষ্কার করে দিতে, কাউকে বললেন বিছানা পেতে দিতে, আর ঠাকুরকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেই জিগ্যেস করলেন, আপনার জন্যে কি কি রান্না হবে স্যার? যেমন ঝাল গরম মশলা দিয়ে হয়, না সেদ্ধ শুধু? মাংস খাবেন, না মাছ?

সুপ্রিয় আড়চোখে একবার হিমাদ্রিবাবুকে, একবার প্রফেসর ঘোষকে দেখে নিল। অর্থাৎ, কি ব্যাপার, এত খাতির কেন? ব্যাপারটা ঠিক ঠাওর করতে না পেরে একটা সিগারেট ধরাল সুপ্রিয়। কি যেন ভাবল এক মুহূর্ত। নাঃ, এমনিই হয়তো, প্রথম দিনে এমন তো হামেশাই করেন হিমাদ্রিবাবু।

সুপ্রিয় যে ভদ্রলোককে যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছে না, তা লক্ষ করেছিলেন হিমাদ্রিবাবু। তাই বললেন, এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো সুপ্রিয়বাবু?

সুপ্রিয় তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এক ঘরে থাকতে হবে যখন, আলাপ নিশ্চয়ই হবে।

—হবে কি মশাই, এখনও আলাপ করেননি? ইনি কে জানেন? এ হোটেলের সৌভাগ্য যে এমন লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এখানে। প্রফেসর কমলকুমার ঘোষের নাম শোনেননি? কত সব দামি দামি বই লিখেছেন।

সুপ্রিয় উঠে বসল। —আপনি লেখক?

ভদ্রলোক হাসলেন। —না, অধ্যাপক।

সুপ্রিয় হেসে বললে, আহা তা তো বুঝলাম, কিন্তু গল্প-উপন্যাসও লেখেন আপনি?

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন। বললেন, না, দু-চারখানা বই অবশ্য লিখেছি এই সব পাথর-টাথর নিয়ে, তা সে পাথরের মতই কঠিন।

—পাথর নিয়ে? তাই বলুন, তখন থেকে ভাবছি, ট্রাঙ্কগুলো এত ভারী কেন? সব পাথর বোঝাই করা আছে বুঝি?

প্রফেসর ঘোষ সকৌতুকে হেসে বললেন, না, ওতে সব বই আছে।

—বই? এত বই? ডিটেকটিভ বই আছে আপনার কাছে?

প্রফেসর ঘোষ এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না।

অধ্যাপক শুনে রমণীবাবু বিশেষ আমল দেননি। সারা জীবন ইস্কুল মাস্টারি করে অমন অনেক অধ্যাপক তিনি বানিয়েছেন। সংস্কৃতের মাস্টার ছিলেন তিনি, ছাত্ররা ডিগ্রি নিয়ে যখন কোনও কলেজে চাকরি পেয়ে রমণীবাবুকে প্রণাম করতে আসত খবরটা জানাবার জন্যে, তখন হাসতেন রমণীবাবু। বলতেন, অর্ধপক্ক থাকলে তো চলবে না হে,

এইবার পড়াশুনো করে পূর্ণপক্ক হবার চেষ্টা করো।

হিমাদ্রিবাবুকেও সেই কথাই বললেন। —অর্ধপক্ক উনি ?

কিন্তু মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখান না কেন, মনে মনে ঈর্ষা জাগল, যখন দেখলেন, রুমা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রফেসর ঘোষের সামনে।

প্রফেসর ঘোষ তখন ছোট আয়নাটা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছেন। রুমা এসে দাঁড়াল কপাট ধরে চৌকাঠের ওপর।

দুটি হাত বুকের ওপর জড়ো করে মিষ্টি করে বললে, নমস্কার।

প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন প্রফেসর ঘোষ। এমন একটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হল, আর হঠাৎ সে তাঁকে নমস্কারই বা করছে কেন, বুঝতে পারলেন না। তাঁর পরিচয়টা যে হিমাদ্রিবাবু রাষ্ট্র করে দিয়েছে, আর তাঁর পরিচয়টা যে এ পাণ্ডববর্জিত দেশে কারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করেননি।

ততক্ষণে রুমা মৃদু হেসে এগিয়ে এসেছে।

অপরূপ শ্রদ্ধাপ্লুত এক ভঙ্গিতে প্রফেসর ঘোষের দিকে তাকিয়ে রুমা বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—বেশ, বেশ, বোসো এইখানে। বলে তক্তপোশটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। তারপর দাড়ি কামাতে কামাতেই বললেন, আলাপ পরে হবে, পরিচয়টা আগে হোক।

রুমা হাসল, সপ্রতিভ হল। বললে, বাঃ রে, 'আলাপ-পরিচয়' বলে। আগে আলাপ, তবে তো পরিচয়।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, আলাপ তো হয়েই গেল, বলো এবার...এখানেই থাকো তো তোমরা ?

—না, না। দুটো হাত নেড়ে উঠল রুমা। বললে, আমরা চেঞ্জে এসেছি। আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম। আমার কিন্তু ধারণা ছিল আপনি বুড়োসুড়ো মানুষ।

—তাই নাকি ?

রুমা হাসল।... কি ভাগ্য দেখুন, এতকাল শুধু নামই শুনেছি, বেড়াতে এসে আলাপ হয়ে গেল। কোনারক, শিশুপালগড়—সব যাব যাব ভাবছিলাম, বাবা বললেন, ভালই হয়েছে, প্রফেসর ঘোষকে বলিস আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, সব বুঝিয়ে দেবেন। আপনার বই পড়ে বোঝবার মত বিদ্যে তো নেই আমার।

যাক্, এতক্ষণে স্বস্তি পেলেন প্রফেসর ঘোষ। মেয়েটি তা হলে তাঁকে গল্প উপন্যাসের লেখক ভাবেনি, প্রকৃত পরিচয়টা জেনেছে।

রুমা হেসে বললে, আমি কিন্তু নাম শুনেই হিমাদ্রিবাবুকে বলেছি, ইনি নিশ্চয়ই আর্কেওলজির প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ।

খুশিতে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ। —কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি ?

—বি-এ দিয়েছি এবার।

—তাই নাকি ? বাঃ, দেখে তো মনে হয় ইস্কুলে পড়ো।

রুমা নাক কোঁচকাল। —ওমা, খুব ছোট দেখায় বুঝি আমাকে। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল সে অপাঙ্গে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে। বললে, আমার কিন্তু অনেক বয়েস।

সুপ্রিয় রসিকতাটা উপভোগ করল না। তার চোখে একটা চাপা ভর্ৎসনা দেখতে পেল রুমা। বুঝতে পারল, প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে তার এত অন্তরঙ্গতা সে যেন পছন্দ করছে না। আর তা বুঝতে পেরেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠল রুমা।

পরক্ষণেই বললে, আপনি চা-টা খেয়ে নিন, তারপর বাবাকে নিয়ে আসব। আপনার সাবজেক্টে বাবারও খুব উৎসাহ।

বলেই পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল রুমা, একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলে সুপ্রিয়কে, তারপর ফিরে এল ছ-নম্বরে।

রুমা ফিরে আসতেই শ্রীলেখাদেবী ধমক দিলেন। —কোথায় গিয়েছিলে ?

—কোথায় আবার, বা রে। আমি তো প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে...

শ্রীলেখাদেবী হেসে ফেললেন। এ মেয়েকে কি বলবেন তিনি। নতুন যে বোর্ডারটি এল, তিনি যে প্রফেসর ঘোষ, তা শ্রীলেখাদেবীও শুনেছেন। কিন্তু যিনিই হোন, অপরিচিত এই লোকটির কাছে রুমা ছুটে গেছে, রেশমের কাছ থেকে এ খবর শুনেই চটে গিয়েছিলেন। লোকটিকে ওঁর সুবিধের মনে হয়নি। একে বয়স তেমন বেশি নয়, তার ওপর চেহারাটাও বেশ ভাল।

ভেবেছিলেন, মা কলঘরে গেছে দেখেই বুঝি রুমা আলাপ করতে ছুটেছে। আলাপ করুক তাতে যে খুব একটা আপত্তি আছে তা নয়। তবে মেয়ের এই বয়সটাকে বিশ্বাস করেন না। তাই ভেবেছিলেন, রুমা নিশ্চয়ই বলবে, আমি তো বাঙাল-বউয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম, কিংবা এমনি কিছু।

তার বদলে রুমা কিনা পস্টাপস্টি বললে, বা রে, আমি তো প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম !

না, মেয়ে তাঁর এত সরল, এর মধ্যে কিছু আপত্তির থাকতে পারে ভাবতেই পারে না। তবু তাকেই কিনা চোখে চোখে রাখতে চান।

শ্রীলেখাদেবী তাই রুমার জবাব শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, প্রফেসর তো বুঝলাম, কিন্তু এখানে চেঞ্জে এসেছি, বাপ আর মেয়েতে মিলে যেন শেষকালে কলেজ খুলে বোসো না।

হাল্কাভাবে বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশি মিশতে দেবেন না রুমাকে। মোট কথা, প্রফেসরই হোন আর যাই হোন উনি, শ্রীলেখাদেবীর ভাল লাগেনি ওঁকে। মিশতে দেবেন না কেন, ওই তো সুপ্রিয় ছেলেটি রয়েছে, ওকে তো বেশ ভালই লেগেছে। কেমন একটু লাজুক লাজুক মিষ্টি মুখখানা। ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে রুমা গল্প করুক, মেলামেশা করুক ভয় নেই। ও তো একেবারে ছেলেমানুষ। কিন্তু এই প্রফেসর ঘোষ।—

—চল রে রুমা, তোদের প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে আলাপ করে আসি। লম্বা-হাত সোয়েটারটা মাথায় গলাতে গলাতে বললেন মিস্টার সেন। কাগজ পড়ছিলেন, এত-সব আলোচনা কানেই যায়নি।

রুমা হাসল। —চলো, তোমাকে ডাকতেই তো এলাম, ওঁকে বলে এসেছি।

বলে মায়ের দিকে ফিরে ঠোঁট উল্টে একটা ভঙ্গি করেই বেরিয়ে গেল সে। মিস্টার সেন দেখতে পেলেন, হাসলেন। আর শ্রীলেখাদেবী পিছন ফিরে ছিলেন, তাই দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে রুমার ওপর রাগতেন না, রাগতেন স্বামীর ওপর। বলতেন তোমার আদরেই ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হল না।

আধখানা বোনা সোয়েটারটা রেশমের কাঁধের ওপর রেখে মাপ নিয়ে দেখছিলেন শ্রীলেখাদেবী, আশি ঘরে ঠিক হবে কিনা।

মিসেস ভট্চাজ এসে ঢুকলেন সেই মুহূর্তে। —দেখেন মিসেস স্যান, একটা কথা কইতে আইছি।

—আসুন। বলে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন শ্রীলেখাদেবী।

মিসেস ভট্চাজ বসলেন গ্যাঁট হয়ে। তারপর হেসে বললেন, আসব ভাবছি তখন থিকা, তা কর্তা ছিলেন, কি জানি কি কথা হয়, তাই আসি নাই।

শ্রীলেখাদেবী হেসে তাকালেন রেশমের দিকে, বললেন, যা তো রেশম, দেখ ওঁরা কি করছেন।

অর্থাৎ রেশমকে সরিয়ে দিলেন। আগল নেই ভদ্রমহিলার মুখে, কি জানি কি রসিকতা করে বসেন আরও।

মিসেস ভট্‌চাজ বললেন, কথাটা আইল আপনাগো এই নতুন বোর্ডাররে লইয়া। এ হোটেলে ত থাইকবার ইচ্ছা হয় না। মাছ মাংস যদি খাইবারে না দেয়, কি চেঞ্জ অইব কন ?

শ্রীলেখাদেবী উত্তর দিলেন, কেন মাংস তো দেয় ?

—হঃ, আপনিও এই কথা কইছেন ? দুইটা হাড়ের টুকরা ফেইলা দিলেই মাংস খাওয়া অইব ? আর মাছ ত...

শ্রীলেখাদেবী হেসে বললেন, এখানে মাছ পাওয়া যায় না তো, কি করবে বলুন।

মিসেস ভট্‌চাজের গলায় উষ্মা দেখা দিল !—ত হোটেল খুইলবার কি কাম ছিল ?

শ্রীলেখাদেবী ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হলেন। তাঁর হাসি দেখে না ভদ্রমহিলা আরও রেগে যান।

কোনও জবাব না পেয়ে, মিসেস ভট্‌চাজ একটু উসখুস করলেন। তারপর নিজেই বললেন, জবাই কইরা টাকা নেন হিমাদ্রিবাবু। কিছু কই না। কিন্তু খাইতে দিব না, দুধকুণ্ডের জলের সাথে ওই কুয়ার জল পাইল করব, আর নিজের হোটেলের প্রশংসা করব দিন রাত, তা সহ্য হয় না।

শ্রীলেখাদেবী হেসে বললেন, নিজের হোটেলের প্রশংসা করবে না ? সে তো সকলেই করে।

—কথাটা ঠিকই কইছেন। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ভট্‌চাজ। বললেন, হিমাদ্রিবাবুরে ত দোষ দেই না। কিন্তু ওই কে এক প্রফেসর আইছেন আজ, উনি নাকি কইছেন, এই হোটেলটা দি রিগাল হোটেলের থিকা ভাল। এই কথা কইলে হিমাদ্রিবাবু ত বাইগন পুইড়্যা খাওয়াইবেন।

কি আর বলেন শ্রীলেখাদেবী। হোটেলের ঘরগুলো নোংরা, খাওয়াদাওয়া যে ভাল নয়, চার্জ বেশি এসব তাঁরাও নিজেদের মধ্যে বলাকওয়া করেছেন। ভাতের থালায় প্রতিদিন পেঁপে সেদ্ধর দৃশ্য খুব উপাদেয় লাগেনি। কিন্তু সেটুকু নিয়ে অন্যান্য বোর্ডারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে রুচিতে বেধেছে।

তবু সায় দিয়ে বললেন, তা যা বলেছেন ভাই, ঠিক কথাই।

মিসেস ভট্‌চাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, যাই। আবার যাই শিবনাথবাবুর ঘরে, সকল বোর্ডারগো ইউনাইট করতে অইব। হোটেলটা হিমাদ্রিবাবুর অইতে পারে, কিন্তু তাঁর যা ইচ্ছা কইরবার অধিকার ত নাই।

বলেই অধিকার ঘোষণার সদম্ভ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ভট্‌চাজ। যাবার সময় হাতের এক ঝটকায় পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে গেলেন।

তারপরই ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কর্তারে কইবেন কথাটা। আমাগো দুই-একজনের কথায় কান দিব না হিমাদ্রিবাবু, সক্কলে না কইলে...

শ্রীলেখাদেবী রেহাই পাবার জন্যে বললেন, বলব ওঁকে।

কিন্তু মনে মনে বললেন, দায় পড়েছে। দু-দিনের জন্যে চেঞ্জে এসেছি, কোথায় শান্তিতে থাকব, তা নয় হোটেলওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করি আর কি।

মিসেস ভট্‌চাজ কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গেলেন শিবনাথবাবুর ঘরে, বারো নম্বরে। গিয়ে দেখলেন রীতিমত একটা মিটিং বসে গেছে সেখানে ব্রজমাধব ভট্‌চাজকে কেন্দ্র

করে।

স্বামীকে দেখতে পেয়ে মিসেস ভট্চাজ বলে উঠলেন, কইয়া আইলাম স্যান-পরিবাররে। ওনারাও ওই্ একই্ কথা কইলেন।

শিবনাথবাবু তক্তপোশের ধারে একটু জায়গা করে দিলেন মিসেস ভট্চাজকে। এদিকে রমণীরঞ্জন দত্ত, শিখিনী, মিস্ত্রি সকলেই আলোচনায় উত্তেজিত।

শিখিনী বুঝি বলেছে, বাবুজি, হোটেল্ তো হোটেলওয়ালার, খানা ভাল না দেবে তো কহ্নার কি আছে। পসন্দ না হয় তো দুস্রা কিধার চলে যাও, ধরমশালায় চলে যাও।

সেই কথাতেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন শিবনাথবাবু।—না, না, মিস্ সিং, যা খুশি আজকালকার দিনে করা যায় না। কারখানার মালিকরাও তো বলত, এই্ মাইনেতে না পোষায় তো চাকরি ছেড়ে দাও। এখন তো তাদেরই্ বেশি মাইনে দিতে বাধ্য করা হয়। আমার কারখানা, আমি যা খুশি করব। তা তো বলতে পারে না।

মিস্ত্রি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ছিল, হঠাৎ বলে উঠল, ঠিক কথা, কিন্তু দেয় আমাদের রোজগার?

কথা শেষ হল না, শিবনাথবাবু ক্রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাতেই।

শিখিনী হেসে বললে, লেকিন এ তো হোটেল আছে বাবুজি, কারখানা নেহি্ আছে।

—উহুঁ। ও একই। আমাদের টাকাতেই হোটেল। আমাদের সুখ-সুবিধে দেখবে না, কেবল প্রফিট করবে?

উত্তেজিত আলোচনা চলতে লাগল, এবং তারপর একটু একটু করে তাপ কমতে কমতে যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, সেই সময় হিমাদ্রিবাবুর ফ্রক-পরা মেয়ে বেলু পোষা বেড়ালটা কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল।—পাঞ্জাবিদি, পাঞ্জাবিদি।

—কি বহিন? হেসে ফিরে তাকাল শিখিনী।

অন্য সকলে তখন তটস্থ হয়ে পড়েছে, চোখে চোখে ইশারা করছে। অর্থাৎ বেলুর সামনে যেন আলোচনার ঘুণাক্ষরও না প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বেলু কিন্তু ওসবের কোনও খবরই্ রাখে না।

হাসতে হাসতে তাই বললে, মজার খবর আছে। বাবার কাছে এক্ষুনি চিঠি এসেছে, গায়ত্রীদেবী আসছে, গায়ত্রীদেবী। ঘর রিজার্ভ করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে।

—গায়ত্রীদেবী? চোখ কপালে তুললেন রমণীরঞ্জন দত্ত।...গায়ত্রীদেবীটা কে আবার?

বেলু খিলখিল করে হেসে উঠল।...গায়ত্রীদেবীর নাম শোনেননি? ফিল্মস্টার গায়ত্রীদেবী।

সকলেই যেন চমকে উঠল। কারণ, কেউই্ আশা করেনি গায়ত্রীদেবী সেই বিখ্যাত অভিনেত্রী। গায়ত্রীদেবীর নাম আবার শোনেনি, সকলের মুখে মুখে তার নাম, দেয়ালে দেয়ালে ছবি, চোখে চোখে স্বপ্ন। সেই্ গায়ত্রীদেবী কিনা এই বিশ্রী হোটেলটায় আসছে?

শিবনাথবাবুর যেন বিশ্বাস হল না। বললেন, সেই গায়ত্রীদেবী? জানো ঠিক।

—হ্যাঁ, বাবা তো এইমাত্র চিঠি পেলেন।

মিসেস ভট্চাজের চোখ দুটোও চকচক করে উঠল।

শুধু রমণীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, এরপর আর এ-হোটেলে থাকা যাবে না। ছি ছি, শেষে ফিলিম-স্টার এনে ঢুকিয়ে দেবে!

মিসেস ভট্চাজের ষড়যন্ত্রটা ক্রমশ বেশ ঘোঁট পাকিয়ে উঠল। কারণ এ ষড়যন্ত্রে প্রায়

সকলেই আপনা থেকেই নাম লেখাতে এগিয়ে এল। সত্যিই তো, হিমাদ্রিবাবু গলা কাটা চার্জ নেবেন, অথচ হোটেলে এতটুকু সুবন্দোবস্ত রাখবেন না, এ কেমন কথা।

সুপ্রিয় এমনিতেই চটে ছিল হিমাদ্রিবাবুর ওপর। গৌতম না কি নাম, ভগবান জানেন, সেই ছোকরাটি তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে পালিয়েছে ঘড়ি-ক্যামেরা-টাকা নিয়ে, তারপর থেকে কথায় কথায় খোঁটা দিত ও হিমাদ্রিবাবুকে। বলত, আপনাকে মশাই বিশ্বাস নেই, কোত্থেকে কোন চোর-ছ্যাঁচোড় এনে ঘরে ঢুকিয়ে দেন, চুরি গেলে তখন ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকেন।

টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে বাপের কাছ থেকে আবার কিছু টাকা এসে পৌঁছনোর পর মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছিল তার, কিন্তু তা বরফ হতে পেল না মিসেস ভট্‌চাজের উস্কানিতে।

ঠিক কথা। এত এত টাকা নেবেন হিমাদ্রিবাবু, অথচ হোটেলে না আছে স্যানিটারি ব্যবস্থা, না আছে ভাল খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, খাঁটি জলটুকুও দেন না হিমাদ্রিবাবু। ঘিয়ে ভেজাল চলে, দুধে জল মেশায়, কিন্তু জলে পাইল দেবে কেন?

ব্যাপারটা গুরুতর। এখানে লোকে চেঞ্জে আসে এই জলের লোভেই। দুধকুণ্ডের জল খেলে পেটের রোগ সেরে যায় এ-কথা শুনেই সকলে আসে, ভিড় করে হিমাদ্রিবাবুর হোটেলে। আর হিমাদ্রিবাবু প্রতিদিন যে হ্যান্ডবিলগুলো নিয়ে স্টেশনে ছোটেন যাত্রী ধরবার জন্যে, সেই হ্যান্ডবিলে স্পষ্ট করে লেখা আছে দুধকুণ্ডের জল দু-বেলা সরবরাহ করার ব্যবস্থার কথা।

প্রথম প্রথম সকলেই বিশ্বাস করত, যৌতুকী যে-জল কুঁজোয় ভরে এনে দেয় তা দুধকুণ্ডের বিশুদ্ধ জল মনে করে প্রাণভরে পান করত সবাই। কিন্তু মিসেস ভটচাজ নাকি আবিষ্কার করেছেন, দুধকুণ্ড থেকে মাত্র এক কলসি জল আসে. তারপর কুয়োর জলের সঙ্গে তা মিশিয়ে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শিবনাথবাবুর ঘরে জোর মিটিং বসেছিল আবার। সুপ্রিয় তক্তপোশের উপর চটাং করে একটা চড় বসিয়ে বললে, ঠিক ধরেছেন মিসেস ভট্‌চাজ, তাই বলি এতদিন রয়েছি, ইমপ্রুভমেন্ট হয় না কেন!

দুদিন আগেই যে সুপ্রিয় স্টেশনে মাল ওজনের যন্ত্রে দু-পাউন্ড ওজন বাড়ার প্রমাণ পেয়ে এসেছে এবং স্নান করতে গিয়ে সে যে নিজেও অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে কুণ্ডের জল নিয়ে এসেছে প্রতিদিন, সে-কথা যেন বেমালুম ভুলেই গেল।

বললে, না, শিবনাথবাবু, এমন অন্যায়ভাবে টাকা নিতে দেব না ব্যাটাকে। কাল আমরা এগারোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব, যৌতুকীকে ওই এক কলসি জল নিয়ে আসতে দেখলেই হিমাদ্রিবাবুকে ডেকে এনে জবাবদিহি চাইব।

রমণীবাবু বললেন, তার চেয়ে বললে হয় না যে দু-পিস করে মাছ না খাওয়ালে...

হঠাৎ হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠলেন শিবনাথবাবু।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, ও-সব কিচ্ছু না, ও-সব কিচ্ছু না। ইমপ্রুভমেন্ট যদি করতে হয়, গোড়া থেকে শুরু করতে হবে মশাই। হোটেল তো আমি কম দেখলাম না, হোল ইন্ডিয়া টুর দিয়ে বেড়াই, হোটেল দেখতে আমার বাকি নেই। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি আছে অথচ ঘরে ঘরে ফ্যান নেই, এ মশাই আর কোথাও দেখিনি।

রমণীবাবু সায় দিলেন, ঠিক কথা। তবে হ্যাঁ, এখন ওটা লার্জেস্ট প্রবলেম নয়। কারণ, এই শীতে তো ফ্যান চালাতাম না।

আবার সশব্দে হাসলেন শিবনাথবাবু। —কি বলছেন রমণীবাবু। এই জন্যেই দেখুন আমাদের গভর্নমেন্টের সব প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে। ইউ মাস্ট বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং।

হোটেল শুধু চেঞ্জারদের জন্যে নয়, গরমের দিনেও তো—এই আমিই তো আসি গরমের দিনে। তাছাড়া, দরকার হোক না হোক, এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে ফ্যান থাকবে না হোটেলে, ভাবাই যায় না।

রমণীবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে এলেন 'কাজ আছে' বলে। একটু পরে সুপ্রিয় আর ব্রজমাধব ভট্টাচার্যও। এসে তিনজনে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বারান্দায় টোপ-ফেলা রোদটুকুতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে বলাবলি করল।—যে যার নিজের তালে আছে। ওঁর বিগেস্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারারের রোজলার পাখা ডজন কয়েক গছিয়ে দিতে পেলে বাঁচেন আর কি।

কিন্তু শিবনাথবাবু একটু স্বার্থ টেনে কথা বলছেন বলেই তো বিপ্লবটাকে মিইয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

শীতুরে হাওয়া আর আমেজি রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কথাবার্তায় অসুবিধে হচ্ছে দেখে তিনজনেই বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। হোটেলের সামনে গাঁদা আর সিজন ফ্লাওয়ারের ছোট্ট এক টুকরো বাগান। সেই বাগানে পায়চারি করতে করতে বেশ মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে।

রোদে-ভেজা বাগানটায় এসে সুপ্রিয় বুঝল রমণীবাবু কেন এ প্রস্তাব করেছেন। আসলে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে শিখিনীকে একটু আগে নেমে আসতে সুপ্রিয়ও দেখেছিল ! কিন্তু সে যে এই বাগানে এসেছে রোদ পোয়াতে, তা সুপ্রিয়র মনে হয়নি। না, রমণীবাবু নির্ঘাত হাত গুনতে পারে।

সুপ্রিয়র অবশ্য এতে কোনও উৎসাহ নেই। শিখিনী না হয়ে রুমা যদি আসত সে সুখী হতে পারত। কিন্তু রুমা সেই যে কিছুক্ষণ আগে জানালাটা বন্ধ করে গেছে, খোলবার আর নাম নেই।

বারকয়েক দৃষ্টিটা বন্ধ জানালার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে আশা ছেড়ে দিল সুপ্রিয়।

শিখিনী ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাছের গাছটা থেকে পটাপট গোটাকতক গাঁদা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে একটা তোড়া বানাতে শুরু করেছে সে তখন।

সুপ্রিয় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল রুমার উপর, কিন্তু রাগটা গিয়ে পড়ল হিমাদ্রিবাবুর ওপর। বললে, টেস্ট বটে একখানা আমাদের হোটেলওয়ালার। দুটো রজনীগন্ধা লাগিয়েছে, আর বাগানভর্তি গাঁদা ফুল—যাচ্ছেতাই।

শিখিনী চমকে ফিরে তাকাল।—কাহে বাবুজি। এ তো আচ্ছা ফুল আছে, ছাগ ভি খাবে, শোভা ভি হবে।

ঠিক ! সুপ্রিয় বুঝল ব্যাপারটা। হিমাদ্রিবাবুর ঘরের ওপাশে একপাল ছাগল আছে, হিমাদ্রিবাবু পুষছেন। ছাগলকে খাওয়াবার জন্যেই বোধহয় গাঁদা লাগিয়েছেন এত।

কিন্তু লোকটাকে জব্দ করা যায় কি করে ! একটা কিছু তো করা দরকার। চুপচাপ সব সহ্য করে যাওয়া যায় না। সুপ্রিয় তাই বললে, একটা দিন মশাই মুরগির মাংস খাওয়াল না !

শিখিনী হেসে বললে, দো দিনের তো ঝামেলা বাবুজি, ছোড় দিজিয়ে।

ব্রজমাধববাবু মুখ খুললেন।—এই দুটো দিনই বা ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করবে না কেন মিস সিং ?

রমণীবাবুও সায় দিলেন—জীবনটাও তো দু-দিনের।

সুতরাং—

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়, কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়ল হোটেলের ফটকের দিকে। না

ফটকের দু-পাশের পাথরের থাম দুটোর দিকে নয়। ও দুটোর দিকে সেই প্রথম দিনই চোখ পড়েছিল, ভাল লেগেছিল—এই পাথর গাঁথা হোটেল আর এখানকার পাথর দিয়ে বানানো বাড়িগুলোর মতো। নতুনত্বের বৈচিত্র্যে সেদিন জায়গাটাকেই মনোহারী মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন এ-দৃশ্য যেন চোখের ওপর ঝামা ঘষে দেয়। একঘেয়ে লাগে।

সুপ্রিয়র চোখ পড়ল পাথরের থাম দুটোর পাশে—পাথুরে শরীর যৌতুকীর দিকে। মাথায় পর পর তিনটে মাটির কলসি নিয়েছে, অথচ হাত দুটো দুলছে নীচে।

রাস্তা ধরে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল যৌতুকী, মাথার কলসিতে হাত না ছুঁইয়েই। আর সুপ্রিয়ও মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার কারসাজি।

পরক্ষণেই সচেতন হল সে। ডাকল, এই যৌতুকী!

ফিরে তাকাল যৌতুকী, হলদে দাঁত বের করে হাসল, তরতর করে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করলে, আমারে কউচ্ছন্তি ?

—হ্যাঁ। দুধকুণ্ডের জল আনতে যাচ্ছিস ?

—হুঁ।

সুপ্রিয় জেরা করার ভঙ্গিতে বললে, দিনে ক-কলসি জল আনিস ?

যৌতুকী হাসল, হঠাৎ ভয় পেল, তারপর বললে, হোটেল-বাবু কইবারে পারিব। মুই গনিবারে পারিব নাই।

—হুঁ। বেশ, যা। সুপ্রিয় ক্রুদ্ধস্বরে বললে।

যৌতুকী হেসে উঠে তরতর করে চলে গেল।

সুপ্রিয় হঠাৎ একটা রজনীগন্ধার ডাঁটি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বললে, গনিবারে না পারিব। মাইনে নেবার সময় তো গুনতে পারিস। বুঝলেন রমণীবাবু, ওই তিন কলসিই আনে সারা দিনে, দু-কলসি যায় হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে, আর এক কলসি জল কুয়োর জলের সঙ্গে পাইল করে—মিসেস ভট্চাজ ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু গোয়েন্দা-গল্প পড়তে একটাও বাকি নেই সুপ্রিয়র। জুতোর ছাপ দেখে যে আবিষ্কার করতে পারে কে হিমাদ্রিবাবুর বাগানে ঢুকে বেগুনের চারাগুলো নষ্ট করে গেছে, সে অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না সে। দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না যৌতুকী ফিরে আসে, তারপর দেখবে....

রমণীবাবু বললেন, সে মশাই দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চলুন ফেরা যাক। ও কি আর আপনার চোখের সামনে মেশাবে ?

—রমণীবাবু, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে ওই যৌতুকী ? আমি মশাই জুতোর ছাপ দেখে বলে দিয়েছি কে ঢুকেছিল হিমাদ্রিবাবুর—

—অ্যাঁ ? চমকে উঠলেন রমণীবাবু। চোখ দুটো তাঁর বিস্ফারিত হল পুরু লেন্সের আড়ালে। পরক্ষণেই অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, চলি, আজ একটু রোদে বসে তেল মাখতে হবে।

হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন রমণীবাবু। আর সুপ্রিয় এতক্ষণে লক্ষ করল, শিখিনী কখন ফুল তুলতে তুলতে চলে গেছে।

নিজের মনে হাসল সুপ্রিয়, হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই ছ-নম্বরের জানালার দিকে তাকাল। জানালাটা কখন খুলে গেছে। কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে—রুমা নয়, রুমার মা শ্রীলেখাদেবী।

তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই অস্বস্তিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে, আর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে গিয়ে চোখ পড়ল নিজের ঘরটির জানালায়। কি আশ্চর্য, রুমা তো তার ঘরে। আর সে কিনা এখানে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে। নিজের বোকামিতে নিজেকেই ধিক্কার দিতে

যাচ্ছিল সে, কিন্তু এবার জানালার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট অভ্যন্তরটুকু চোখে পড়তেই মনটা বিষিয়ে উঠল।

নির্লজ্জ কোথাকার। প্রফেসর ঘোষটার সঙ্গে এত হেসে হেসে কথা বলবার কি দরকার শুনি? না, মেয়ে জাতটাকে এতটুকু বিশ্বাস করা যায় না। পুরুষ জাতটাকেও না।

ওই যে প্রফেসর ঘোষ না কি যেন, প্রফেসর মানুষ, মাস্টারি করিস কলেজে। ছাত্ররা সম্মান করে। অথচ সুযোগ পেয়েছে কি রুমার সঙ্গে দিব্যি গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, যেন কতকালের চেনা। আর মেয়েটার মা-বাপও তেমনি, যার-তার সঙ্গে আলাপ করার, গল্প করার স্বাধীনতা দিচ্ছে যে রুমাকে, একটু ন্যায়-অন্যায় ভাবে না? অত বড় মেয়েকে একটু চোখে চোখে রাখবে না?

সেদিন সন্ধের কথা অন্য।

এক থোকা মাধবীলতা ফুল ছিঁড়ে দেওয়া, কি দুটো কথা বলা—

সুপ্রিয়র মনে তা বলে কোনও উদ্দেশ্য ছিল নাকি? আর মাসিমা তাকে বিশ্বাস করেন বলে প্রফেসর ঘোষকেও—

প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, চলনে-বলনে রীতিমত স্মার্ট, পোশাক-পরিচ্ছদে জাতীয়তাবাদী। আজানুলম্বিত খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেন—পাঞ্জাবির রংটা গেরুয়া বরণ। কাঁধ থেকে সবসময়েই একটা নক্‌শাকাটা কাপড়ের থলে ঝুলছে, আর তার মধ্যে একরাশ কাগজপত্তর।

তিনি রিগ্যাল হোটেলের নিন্দে করেছেন, হিমাদ্রিবাবু সেটাকে পান্থপাদপ হোটেলের প্রশংসা বলে চালিয়েছেন, এ-খবরও যেমন তাঁর অজানা, তেমনি আবার মিসেস ভট্‌চাজের উষ্মা কিংবা রুম-মেট সুপ্রিয়র ঈর্ষার খবরও তিনি রাখেন না।

ভোর না হতেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। বেরিয়ে পড়লেন। উঁচুনিচু মাঠ পার হয়ে পুরী রোডে এসে পড়লেন, তারপর পুরী রোড থেকে নামলেন মাঠে। রাজারানীর মন্দিরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

হুঁ, মন্দিরটার চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে। মেরামতের কাজ চলছে।

মনটা খুশি হয়ে উঠল তাঁর। গতবার এসে যা অবস্থা দেখেছিলেন মন্দিরটার, মনে হয়েছিল যে-কোনওদিন বুঝি ভেঙে পড়বে। চটে গিয়ে একটা কড়া চিঠি লিখেছিলেন গভর্নমেন্টকে।

তাই দূর থেকে মন্দিরের চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে দেখে বেশ খুশি হলেন, ভাবলেন তাঁর চিঠিতে কাজ হয়েছে।

কিন্তু কাছে এসেই হতাশ হলেন। দেখলেন জনকয়েক কুলি-মজুর কাজ করছে। ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো সরিয়ে, কোথাও কোথাও দেয়ালের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিগুলো সরিয়ে চাঁছাছোলা পাথর বসানো হচ্ছে, কোথাও বা মূর্তির গায়ে গেরুয়া বুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রফেসর ঘোষ ভুরু কুঁচকে তাকালেন খাকি কোট পরিহিত ওভারসিয়র গোছের লোকটির দিকে। তারপর এক কোণে এসে বসলেন একটা খাটো পাঁচিলের ওপর। থলি থেকে বের করলেন একরাশ কাগজপত্তর। একটা পেন্সিল।

ধীরে ধীরে একটা মূর্তির স্কেচ আঁকতে শুরু করলেন।

গতবারে এসে সব কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। কয়েকটা স্কেচ বাকি ছিল, আর কয়েকটা তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে।

বারো বছর ধরে এই তিন চারটি মন্দির নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর ধারণাকে এবার বোধ হয় একটা যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণের ওপর দাঁড় করাতে পারবেন। নাগর আর বেশরের

মধ্যে স্থাপত্যগত পার্থক্য যতই হোক, ভাস্কর্যের দিক থেকে যে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ছিল—এ-কথা প্রমাণ করতে হবে। আর সেইজন্যেই স্কেচগুলির প্রয়োজন।

প্রফেসর ঘোষকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এক মনে ছবি আঁকতে দেখে খাকি কুর্তার ওভারসিয়র এগিয়ে এল। বললে, সেলাম সাহেব।

চোখ তুলে তাকালেন প্রফেসর ঘোষ। বললেন, কি ব্যাপার হে, হঠাৎ গভর্নমেন্ট এত নজর দিয়েছে কেন এদিকে ?

প্রশ্নটা করে মনে মনে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ। ভাবলেন এ বেচারা আর কি জানবে যে তাঁর কড়া চিঠি পেয়েই টনক নড়েছে। তা না জানুক, টনক যে নড়েছে তাতেই খুশি তিনি।

তবু বললেন, কিন্তু ও রকম বিশ্রী রং করছ কেন ?

—গারমেন্টের হুকুম সাহেব।

—হুকুম অমনি রং করার ?

খাকি কুর্তা হাসল।—হ্যাঁ হুজুর। আংরেজ আমেরিকান টুরিস্ট আসছে বাবুজি, ক্যামেরা নিয়ে পটাপট ছবি তুলছে, তাই রং করার হুকুম। রং না করলে ভাল ছবি উঠবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর ঘোষ। তাই বলো। টুরিস্টদের জন্যে ? এ-সবের ওপর এত মায়া-দয়ার আর কোনও কারণ নেই ?

রীতিমত ক্ষেপে গেলেন তিনি। নাঃ, এ গভর্নমেন্টকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। যেটুকু আপনা থেকে রক্ষা পেয়েছে সেটুকুও নষ্ট করে ছাড়বে।

এইসব মন্দিরগুলোই তো দেশের গৌরব—প্রাচীন ঐতিহ্য। এগুলোকেও টাকা রোজগারের কল বানিয়েছে ? অর্থাৎ যেদিন টুরিস্ট আসবে না, সেদিন আর নজরও দেবে না এদিকে।

কথাগুলো কাউকে না শুনিয়ে যেন শান্তি পাচ্ছেন না প্রফেসর ঘোষ। তাই খাকি-কুর্তা-পরা লোকটাকেই হয়তো বলতেন, তার আগেই চোখ গিয়ে পড়ল দূরের পিচঢালা রাস্তাটার দিকে।

হ্যাঁ হোটেলের সেই ভদ্রলোকই। রমণীরঞ্জন দত্ত। লাঠি হাতে খটখট করে হেঁটে আসছেন এদিকেই। বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, কিন্তু এখনও বেশ শক্তসমর্থ ভাবে হাঁটতে পারেন তো !

প্রফেসর ঘোষকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করলেন রমণীবাবু।—ও কমলবাবু, কমলবাবু !

—আসুন, আসুন। দু-হাত তুলে প্রফেসর ঘোষও জবাব দিলেন। দু-দশ পা এগিয়েও গেলেন রমণীবাবুকে লক্ষ করে।

তড়বড় তড়বড় করে চোরকাঁটা ডিঙিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলেন রমণীবাবু। তারপর খাটো পাঁচিলটার ওপর লাঠিটা নামিয়ে রেখে ধুতির কোঁচা থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, কতক্ষণ এসেছেন ?

—তা অনেকক্ষণ। এদিকে আপনিও আসেন নাকি ?

রমণীবাবু হাসলেন।—আসতে আর পাই কই মশাই। ছেলেটা যে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তা আজ তাকে ঘরে রেখেই চলে এলাম।

প্রফেসর ঘোষ বললেন, কেন, সঙ্গে আনলেন না কেন ?

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করলেন রমণীবাবু।—এখানে ? বলেন কি, এই

মন্দিরটন্দিরের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেওয়া যায় ওই বাচ্চা ছেলেকে ?

প্রফেসর ঘোষ গম্ভীর হয়ে গেলেন। সারামুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল রাগে, বিরক্তিতে। কোনও কথা না বলে আবার নিজের পুরনো আসনটিতে গিয়ে বসলেন, কাগজ পেন্সিল বের করে স্কেচ করতে শুরু করলেন।

রমণীবাবু কিন্তু বুঝতে পারলেন না যে প্রফেসর ঘোষ তাঁর কথায় রেগে গেছেন। তিনি তখন একমনে মন্দিরটাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন মূর্তিগুলো। যেন কত বড় সমঝদার, শিল্পের একমাত্র গুণগ্রাহী। এক একটা যৌবনোদ্দীপ্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একবার বাঁদিক থেকে দেখেন, একবার ডানদিক থেকে, কখনও দু-পা পিছিয়ে গিয়ে দেখেন, কখনও এগিয়ে এসে।

প্রতিটি মূর্তি, না দেবমূর্তি নয়, নগ্ন মূর্তিগুলোই দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মন্দিরটাকে চক্র দিচ্ছিলেন। একটা পাক সেরে এসে প্রফেসর ঘোষের সামনে দাঁড়ালেন কোমরে হাত দিয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্কেচটার দিকে।

প্রফেসর ঘোষ পেন্সিলের আঁচড় টানতে টানতে বারকয়েক দেখে নিয়েছেন রমণীবাবুর কার্যকলাপ। মনে মনে যত না ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি হেসেছেন রমণীবাবুর শিল্প পর্যবেক্ষণের হাবভাব দেখে।

দেখছিস তো বাপু উলঙ্গ মূর্তি, তার আবার অত কায়দা কেন। সোজাসুজি দেখলেই হয়।

রমণীবাবু অতশত খবর রাখেন না। তাই স্কেচটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, বাঃ, বেশ আঁকেন তো আপনি। দেখি আর কি কি এঁকেছেন।

প্রফেসর ঘোষ চোখ তুললেন না, নীচের একখানা স্কেচ টেনে বের করে রমণীবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর আবার স্কেচ আঁকায় মন দিলেন।

রমণীবাবু ছবিটা প্রথমে উলটো করে ধরেছিলেন, সোজা করে নিতেই মুখের হাসি দপ্ করে নিবে গেল। এ কি, এ যে রমণীবাবুরই ছবি ; চশমা-পরা কুতকুতে দুটো চোখ দিয়ে একটা নগ্নমূর্তি দেখছেন রমণীবাবু—তারই স্কেচ। তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—'সমঝদার'।

সমঝদার! ঠাট্টাটা বুঝতে পারলেও নীচের নামকরণটা দেখে রমণীবাবু ভাবলেন, কি জানি, নিছক ঠাট্টা নাও হতে পারে।

তাই বললেন, কি জিনিসই ছিল আমাদের দেশে, দেখলে দুঃখ হয়, কি বলেন ?

প্রফেসর ঘোষ উপহাসের গলায় বললেন, কেন ?

—দুঃখ হয় না ? কি বলছেন মশাই। এমন সব পেন্টার কোথায় হারিয়ে গেল...

প্রফেসর ঘোষ সায় দিলেন। —তা যা বলেছেন। বেঁচে থাকলে পছন্দসই একটা মূর্তি করিয়ে নিয়ে বাড়িতে রাখতে পারতেন।

—ছি ছি, কি যে বলেন, ছি ছি ছি। এই জিনিস আবার বাড়িতে রাখা যায়। তবে হ্যাঁ, মূর্তিগুলো খারাপ হলে কি হবে, উঁচুদরের আর্ট।

প্রফেসর ঘোষ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নাঃ, লোকটা কাজ এগোতে দেবে না আজ আর।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন ফেরা যাক।

—চলুন।

চোরকাঁটার মাঠ পার হয়ে দু-জনে পুরী রোড ধরলেন। এবং পুরী রোড থেকে বাঁক নিলেন মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকে।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ রমণীবাবুরই বেশি। আকর্ষণটা অবশ্য

মন্দিরের নয়, গৌরীকুণ্ডের।

রোদ উঠতেই স্নানার্থীদের ভিড় লেগে যায় গৌরীকুণ্ডের ঘাটে। কেদারগৌরীর মন্দিরের পিছনেই গৌরীকুণ্ড, পাশে দুধকুণ্ড—যার জলের টানে চেঞ্জারদের ভিড় এখানে।

নির্জন নিঃশব্দ এই অঞ্চলটুক। কেদারগৌরী, মুক্তেশ্বর আর সিদ্ধেশ্বর তিনটি মন্দির পাশাপাশি। বড় বড় গাছের ছায়ায় ভেজা ঠাণ্ডা থমথমে ভাব। ফাঁকে ফাঁকে নরম রোদ উঁকি দেয়।

সেই নির্জন নিঃশব্দতাও হঠাৎ চমকে ওঠে। আগন্তুকরা কেউ আসে পুজো দিতে, কেউ গৌরীকুণ্ডের জলে স্নান করতে। কেউ বা দুধকুণ্ডের জল নিতে। দুচারজন সাহেব-মেম টুরিস্টও এসে হাজির হয় এক এক সময়। পাণ্ডার দল ছুটে যায়। কারুকার্য দেখিয়ে দেবার জন্যে। কারণ, মন্দিরের গায়ের কিংবা ভিতরের মূর্তিগুলোই দেখতে আসে বেশির ভাগ লোক।

রমণীবাবু এসে দাঁড়ালেন গৌরীকুণ্ডের ঘাটে।

কাছাকাছি, পাশাপাশি দুটো ঘাট। একটা মেয়েদের, একটা ছেলেদের।

এর মধ্যেই অনেকে স্নান করতে শুরু করেছে, সাঁতার কাটছে একটি মারাঠি তরুণী। সুঠাম শরীর, সুন্দর গঠন।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন রমণীবাবু, বেশ খুশি খুশি ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখেচোখে। তন্ময়তা ভাঙতেই কি যেন বলতে গেলেন প্রফেসর ঘোষকে, তিনি পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মনে করে।

কিন্তু কই, প্রফেসর ঘোষ গেলেন কোথায়?

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে রমণীবাবুর নজরে পড়ল, প্রফেসর ঘোষ কেদারগৌরীর মন্দিরের এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসে একটা ছোট্ট মূর্তি ঘষে ঘষে কি যেন দেখছেন।

রমণীবাবু কাছে এগিয়ে এলেন। দেখলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের এই সব আর্টফার্টের মানে বুঝি না মশাই। অমন জীবন্ত অর্ধনগ্ন মূর্তি রয়েছে গৌরীকুণ্ডে, সাঁতার কাটছে—তা না দেখে এই পাথরের মধ্যে যে কি রস পান!

প্রফেসর ঘোষ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, রাগে সর্বশরীর যেন জ্বলে গেল তাঁর, কঠিন রুক্ষ চোখের দৃষ্টিতে রমণীবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, ছি ছি এ কি অশ্লীল মন আপনার। বুড়ো হয়েছেন, এই বয়সে লজ্জা করে না আপনার ঘাটে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকাতে?

রমণীবাবু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষের হাবভাব দেখে। তবু নিজের মনেই বললেন, ভাল রে ভাল, আসলটা হবে অবসিনারি, আর নকলটা হাই ক্লাস স্কালপ্‌টিওর?

অর্থাৎ বলতে চাইলেন যে রক্তমাংসের হলেই অশ্লীল, আর পাথরের হলেই উচ্চস্তরের ভাস্কর্য।

এর আগে ভাস্করকে পেন্টার বলায় খটকা লেগেছিল, এবার রমণীবাবুর বিচিত্র ইংরেজি শুনে প্রফেসর ঘোষ তাই এত ক্রোধের মধ্যেও অট্টহাস্যে হেসে উঠলেন হো হো করে।

কিন্তু হোটেলে ফেরার পথে প্রফেসর ঘোষের মনের মধ্যে প্রশ্নটা বারবার জেগে উঠল। তাই তো। আসলটা অশ্লীল, অথচ নকলটা আর্ট?

হোটেলে ঢোকবার আগেই চিৎকারটা কানে গিয়েছিল প্রফেসর ঘোষের। গাঁদা ফুলের বাগানটা পার হয়ে সবে উই-ধরা দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েছেন অমনি থতমত খেয়ে গেলেন।

ভিতরের উঠোনে রীতিমত একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। যৌতুকী কাঁদতে কাঁদতে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে, আর হিমাদ্রিবাবু লম্ফঝম্ফ করে চিৎকার করছেন: বেইমান, মিথ্যেবাদী, বেরিয়ে যা তুই, বেরিয়ে যা এক্ষুনি।

প্রফেসর ঘোষ যৌতুকীর দিকে তাকালেন একবার, একবার হিমাদ্রিবাবুর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে। দেখলেন যৌতুকীর দু-গাল বেয়ে জল ঝরছে, আর কাঁদো কাঁদো গলায় কি বলছে সে। কিন্তু তার কথার এক বর্ণও কানে যাচ্ছে না হিমাদ্রিবাবুর।

প্রফেসর ঘোষ দু-পা এগিয়ে এলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কি, হয়েছে কি হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রিবাবু যেন সচকিত হলেন, এগিয়ে এলেন যাত্রার আসরের অর্জুনের মত, তীর-ধনুকের অভাবে হাত দু-খানাকেই বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালনে নাচাতে নাচাতে এসে বললেন, হাড়-বদমাশ মশাই, হাড়-বদমাশ। আমারই খাবে আমারই নিন্দে করবে?

হিমাদ্রিবাবুর আস্ফালন দেখে প্রফেসর ঘোষ হেসে ফেললেন।—আপনার খাবে কেন? ও তো খেটে খায়, হকের পাওনা। তা কি হয়েছে বলুন না!

হিমাদ্রিবাবু যেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা শুনতেই পেলেন না, প্রফেসর ঘোষের কথার প্রথমাংশের জবাবেই যেন বললেন, খেটে খেলে তো বলবার ছিল না। কেবল ফাঁকি। কেবল ফাঁকি। তাও সহ্য হত, কিন্তু বোর্ডারদের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াবে আর ওকে মাইনে দিয়ে খেতে দিয়ে রাখব?

সুপ্রিয় বোধ হয় এতক্ষণ দোতলার বারান্দা থেকে শুনছিল সব, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললে, শুনুন হিমাদ্রিবাবু, শুনুন। ও কিছু বলেনি। আমাদের কি চোখ নেই নাকি? দেখতে পাই না?

সুপ্রিয়কে নামতে দেখে শিবনাথবাবু, ব্রজমাধববাবু, মিসেস ভট্চাজ এবং রেশম নেমে এল। ভিড় জমে গেল উঠোনটায়।

এবং শুরু হল কথা কাটাকাটি।

প্রফেসর ঘোষ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলেন ব্যাপারটা। কুরুক্ষেত্র শুরু হয়েছে দুধকুণ্ডের জল নিয়ে। সুপ্রিয় এবং মিসেস ভট্চাজের অনুযোগ: দুধকুণ্ডের জল বলে সকলকে দু-বেলা দু-কুঁজো করে কুয়োর জল দেওয়া হয়। আর হিমাদ্রিবাবুর চিৎকার সে জন্যেই। তাঁর ধারণা যৌতুকীই ফাঁকি দেয়, কুণ্ডের জল এনে দেয় না।

প্রফেসর ঘোষ সব কথা শুনে বললেন, শুনুন হিমাদ্রিবাবু, ও বেচারির ওপর রাগ করছেন কেন। আপনার বক্তব্যটা কি তাই বলুন।

সুপ্রিয় বললে, বুঝছেন না স্যার, উনি বলছেন, জল ঠিকই আনবার কথা, না দিয়ে থাকলে যৌতুকীই ফাঁকি দিয়েছে। যেন কিছুই বুঝি না আমরা। এই যে আপনি এলেন দুটো ভারী ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে, তা ট্রাঙ্কে যে বই বোঝাই করা আছে তা কি বুঝতে পারিনি আমি? বলে দিতে হয়েছে? দেখুন হিমাদ্রিবাবু, ডিটেকটিভ বই যাদের পড়া আছে তাদের কোনও কথা বলে দিতে হয় না।

বোর্ডাররা সব নেমে এসেছে দেখেই দমে গিয়েছিলেন হিমাদ্রিবাবু, সুপ্রিয় এবং প্রফেসর ঘোষের কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে যেন বদলে গেলেন তিনি। তাঁর অভিধানে বোর্ডার কোনও দোষ করতে পারে না। তাই নরম সুরে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দুধকুণ্ডের জলই নিয়মিত দেওয়া হয়।

প্রফেসর ঘোষ শেষ পর্যন্ত একটা রায় দিলেন। বললেন, এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করে কি হবে, সকলের তো দুধকুণ্ডের জল দরকার নেই। যাঁরা চেঞ্জার, যৌতুকীর ওপর বিশ্বাস না থাকে তাঁরা বরং স্নান করতে যাওয়ার সময় একটা কোনও

পাত্রটাত্র নিয়ে গিয়ে নিজেরাই নিয়ে আসবেন।

রায়টা হিমাদ্রিবাবুর খুবই মনঃপূত হল, কিন্তু বোর্ডাররা কেউই খুশি হল না এ-কথায়। এক কলসি জল কি বয়ে আনা যায় নাকি! আর আনবেই বা কেন, হিমাদ্রিবাবুর হ্যান্ডবিলে তো লেখাই আছে দুধকুণ্ডের জল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

রমণীবাবুও কখন এক ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্নানরতা মারাঠি মেয়েটির দিকে তাকানোর জন্য কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে খোঁটা খেতে হয়েছে বলে প্রফেসর ঘোষের ওপর চটেই ছিলেন তিনি।

তাই সুপ্রিয়র পিছনে পিছনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে আসতে ফিসফিস করে বললেন, মুনসেফ কোর্টের হাকিমের রায় শুনলেন!

সুপ্রিয় হেসে সায় দিল। —ঠিকই বলেন আপনি। অধ্যাপক নয়। অর্ধপক্ক।

শিবনাথবাবু কিন্তু একটি কথাও বলেননি এতক্ষণ, চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষের পাশটিতে। প্রফেসর ঘোষ তাঁর কাঁধে ঝোলানো থলেটা বাঁ-কাঁধ থেকে ডান-কাঁধে বদলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠতে শুরু করতেই শিবনাথবাবু তাঁর পিছনে পিছনে উঠে এলেন। তারপর সুপ্রিয়রা না শুনতে পায় এমন ফিসফিসে গলায় বললেন, ঠিকই বলেছেন প্রফেসর ঘোষ, এ জাজমেন্ট!

প্রফেসর ঘোষ খুশির হাসি হাসলেন। —এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ঝামেলা করার কোনও মানে হয়?

শিবনাথবাবু সায় দিলেন। —সত্যিই তো, এসেছি দু-দিনের জন্যে...তা আপনার পরিচয়টা তো পেয়ে গেছি, কলকাতায় থাকেন কোথায় জানতে পারি?

ঠিকানা দিলেন প্রফেসর ঘোষ। কিন্তু শিবনাথবাবু শুনেই ক্ষান্ত নন, পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে লিখে নিলেন।

প্রফেসর ঘোষ বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্ন করলেন, আপনিও কলকাতায় থাকেন তো!

—হেডকোয়ার্টার্স কলকাতায়, কিন্তু থাকা আর হয় কই। আজ দিল্লি, কাল বোম্বে...রোজলারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, রোজলার ফ্যান? দি বিগেস্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ইন্ডিয়া—আমি তার সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ।

প্রফেসর ঘোষ নিরুৎসাহভাবে বললেন, ও।

কিন্তু শিবনাথবাবু নিরুৎসাহ হলেন না। হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, 'আপনাদের তো কলেজে অনেক ফ্যানট্যান লাগে' গোছের কিছু একটা. কিন্তু তার আগেই সুপ্রিয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে চুপ করে গেলেন।

সুপ্রিয় অবশ্য কান দিত না ওঁর কথায়। ছ-নম্বরের সামনে গিয়ে সে তখন নরম গলায় ডাকতে শুরু করেছে, মাসিমা, মাসিমা!

ডাকটা রুমাই প্রথম শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে বাবার জুতো পালিশ করতে করতে এক মুহূর্ত থেমেই আবার ব্রাশ চালাতে লাগল জোরে জোরে, যেন ডাকটা শুনতেই পায়নি।

দ্বিতীয়বার ডাক শুনেই শ্রীলেখাদেবী বেরিয়ে এলেন।

সুপ্রিয় এক মুখ হেসে বললে, মাসিমা, ছুঁচসুতো আছে আপনার কাছে?

—আছে। কেন?

সুপ্রিয় হাসল। —হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে বোতামটা ছিঁড়ে গেল, তাই...

—ওমা তাই নাকি? ওসব ঝগড়া-ঝাটি করতে কেন যাও বাবা। বলেই রুমাকে ডাক দিলেন, ও রুমা, রুমি, ছুঁচসুতোটা দেখ তো কোথায় আছে।

এবার আর জুতো পালিশ নিয়ে বসে থাকতে পারল না রুমা। উঠে দাঁড়াল, ভেতর থেকে বললে, কি হবে মা ছুঁচসুতোয় ?

সুপ্রিয়র জামার বোতামটা ছিঁড়ে গেছে, দে না মা খুঁজে, লাগিয়ে দিই।

রুমা কি যেন ভাবলে এক পলক, নিজের মনেই মুচকি হাসলে, তারপর দেরাজ টেনে সুটকেস খুলে উলের থলেটা টেনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলে। না কোথাও তো নেই। কই, পাচ্ছি না তো। কোথায় রেখেছিলে কোথায় ?

—পেলি না। রাখব আর কোথায়, দেরাজেই তো ছিল। দাঁড়া দেখছি। বলে শ্রীলেখাদেবী নিজেই এলেন, খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

দেরি দেখে সুপ্রিয় বললে, থাক মাসিমা, তাড়া নেই আমার, পরে দিলেও চলবে।

শ্রীলেখাদেবী রেগে গেলেন।—কোথায় যে রাখিস সব, কাজের সময় পাওয়া যাবে না।

জিনিসটা খুঁজে না পাওয়ার জন্যে রাগ নয়, আসলে এই সময়ে খুঁজে না পাওয়ার জন্যেই রাগ। সুপ্রিয়কে তিনি ছেলের মত স্নেহ করেন, তার একটা কিছু উপকার করতে পেলে যেন খুশি হন, এমন কি ছেলেটিকে সেই চুরির পর যদি পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারতেন তা হলেও কথা ছিল, অথচ সুপ্রিয় কখনও কিছু চায়নি। আজ হঠাৎ যদি বা এল ছুঁচসুতো চাইতে, জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না। রাগ হয় কিনা মেয়ের ওপর।

অগত্যা বলতে হল, খুঁজে দেখছি বাবা, কোথায় যে উলঢাল করে রাখে মেয়ে !

সুপ্রিয় বললে, না, যখন হোক পেলেই চলবে, এত তাড়া নেই আমার। বলে চলে এল

আর সুপ্রিয় তার ঘরে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচসুতোটা খুঁজে পেল রুমা। একটা বইয়ের ভেতর ছিল।

শ্রীলেখাদেবী বললেন, যা দিয়ে আয় সুপ্রিয়কে।

রুমা ছুঁচসুতো নিয়ে বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে, শ্রীলেখাদেবী বললেন, বোতামটা লাগিয়ে দিয়ে আসিস।

—বয়ে গেছে। কে না কে, আমি তার বোতাম লাগাতে যাব...

—তবে ডেকে দে, আমি লাগিয়ে দেব ! বিদেশ বিভুঁইয়ে এসেছে বেচারি একা, ছুঁচে সুতো পরাতে জানে কিনা সন্দেহ...

রুমা হেসে ফেলে বললে, বেশ লাগিয়ে দেব। বলে চলে গেল।

গিয়ে দেখলে সুপ্রিয় চেয়ারে বসে ঘাড় কাত করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিং তৈরি করছে। আর প্রফেসর ঘোষের তক্তপোশের ওপর একরাশ বইখাতা ছড়ানো।

রুমা ছুঁচসুতো হাতে নিয়ে ঢুকল, আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে প্রফেসর ঘোষ নেই কাছেপিঠে। রুমা এবার সুপ্রিয়র দিকে তাকালে, চোখোচোখি হল, হাসল। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ার ঘ্রাণ নেবার ভঙ্গি করে চাপা গলায় বললে, এঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ !

সুপ্রিয় হেসে সিগারেটটা ছাইদানিতে টিপে নিবিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, দাও।

—না।

—বাঃ রে, তা হলে আনলে কেন !

রুমা হেসে বললে, কই দেখি বোতামটা।

সুপ্রিয় বোতামটা দিল।

—কোথায় ?

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। বুকের যে জায়গাটা থেকে বোতামটা খসে পড়েছে, দেখাল।

রুমা ছুঁচসুতো নিয়ে বোতামটা লাগিয়ে দিতে দিতে মুখ তুলে তাকাল সুপ্রিয়র দিকে।

সুপ্রিয় বলে উঠল, এই সাবধান, বুকে ফুঁড়ে দিয়ো না যেন।

ছুঁচটা নিয়ে সুপ্রিয়র চোখে খুঁচিয়ে দেওয়ার ভান করে হাসল রুমা। আর সঙ্গে সঙ্গে কপট ভয়ে চমকে উঠে রুমার হাতখানা ধরে ফেলল সুপ্রিয়।

এক মুহূর্ত ! হাত ছাড়ল না সুপ্রিয়, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না রুমা।

পর মুহূর্ত। হাত ছেড়ে দিল সুপ্রিয়, হাত ছাড়া পেয়ে বোতামটায় আরও দুটো সেলাই দিয়ে বোতামের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুতোটা দাঁতে কেটে দিল রুমা।

আর সেই মুহূর্তেই প্রফেসর ঘোষ ঢুকলেন ঘরে।

রুমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বললেন, কি খবর, বেড়াতে যাওনি আজ ?

রুমা কাছে এগিয়ে গেল, গিয়ে বসল প্রফেসর ঘোষের তক্তপোশের একধারে, একটু দূরত্ব রেখে। তারপর সহাস্যে বললে, ঘুম ভাঙতেই আটটা বেজে গেল ! আপনি কিন্তু খুব ভোরে ওঠেন, তাই না ?

জানলে কি করে ? তুমি তো আটটায় উঠেছ।

রুমা বললে, বাঃ রে, চোখেমুখে জল দিয়ে এসে দেখলাম আপনার ঘরে তালা ঝুলছে।

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন। হ্যাঁ, রাজারানীর মন্দিরে গিয়েছিলাম, কয়েকটা স্কেচ বাকি ছিল...

—ও মা। কপট অভিমানে ঠোঁট ওলটাল রুমা। আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন ?

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। আর সুপ্রিয় ডিটেকটিভ বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে একবার পিছন ফিরে তাকাল। তাকাল দুটো ঝাঁঝালো চোখে।

সেই ঝাঁঝালো দৃষ্টির সঙ্গে চোখোচোখি হল রুমার। আর কৌতুকে ফিক করে হেসে ফেলেই ঠোঁট টিপল রুমা, তারপর সুপ্রিয়কে আরও রাগাবার জন্যেই বোধহয় প্রফেসর ঘোষের কাছ ঘেঁসে বসল। তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে প্রায় আধশোয়া ভঙ্গিতে মোটা-সোটা একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করলে।

পাতা ওলটাতে ওলটাতেই বললে, এই মোটা মোটা বই, সব পড়েছেন আপনি ? কি করে এত পড়েন, বলুন না ?

—লিখতে পারি মোটা মোটা বই আর পড়তে পারব না ? হাসলেন প্রফেসর ঘোষ।

রুমা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পর্দার ফাঁক থেকে হঠাৎ মাকে উঁকি মারতে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

রুমা ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে দেখেই প্রথমটা বিরক্ত, তারপর চিন্তিত হতে শুরু করেছিলেন শ্রীলেখাদেবী। শেষে সন্দেহ জেগে উঠতেই বেরিয়ে এলেন, এসে দাঁড়ালেন ন-নম্বর ঘরের সামনে। পর্দাটা হাওয়ায় দুলে উঠতেই উঁকি দিলেন, আর উঁকি দিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর শরীর জ্বলে উঠল।

যা ভেবেছিলেন তাই ! কোথায় সুপ্রিয়র শার্টের বোতামটা লাগিয়ে দিতে পাঠালেন মেয়েকে, আর সে কিনা ওই প্রফেসর ঘোষ লোকটার খাটে শুয়ে দিব্যি গল্প করছে। আর যে ভাবে গল্প করতে দেখলেন তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই একফোঁটা মেয়ের ভেতরে ভেতরে এত ! সেদিন মেয়ের কথা শুনে সরল ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন রুমার মনে দোষ নেই। এত চালাক তাঁর চোখকেও ফাঁকি দেয় !

রুমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই ছুঁচসুতোটা হাতে নিয়ে তখনই ফিরে এল।

শ্রীলেখাদেবী অপেক্ষা করছিলেন। রুমা চৌকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতে গম্ভীর গলায় ডাক এল—রুমি !

রুমা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শ্রীলেখাদেবী ধমকের সুরে বললেন, ওই লোকটার সঙ্গে আর কোনওদিন যদি কথা বলতে দেখি তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

রুমা মাথা হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সিমেন্টের মেঝেতে মাটি খোঁড়বার চেষ্ট করল, জবাব দিল না।

শ্রীলেখাদেবী ক্রুদ্ধ চোখজোড়া মেয়ের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বললেন, যাও। মনে থাকে যেন।

রুমা ভরসা পেয়ে বললে, সুপ্রিয়র সঙ্গেও না?

হেসে ফেললেন শ্রীলেখাদেবী।—ওর সঙ্গে কথা বলবি না কেন, কিন্তু ওই প্রফেসর না হাতি, ওই বদমাশটার সঙ্গে যদি দেখি...

রুমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।—হ্যাঁ মা, সত্যি, এক নম্বরের পাজি ওই প্রফেসর ঘোষ, দিনরাত কেবল মন্দিরের ওই অসভ্য ছবিগুলো নিয়ে বসে থাকে। ঠিক বলেছ, আর একদিনও কথা বলব না।

শ্রীলেখাদেবী আবার রেগে গেলেন।—ন্যাকামি কোরো না।

কথাটা বলেই ছ-নম্বর আর সাত নম্বর ঘরের মাঝখানের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন, যেখানে খাটের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আপন মনে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন মিস্টার সেন।

এদিকে ছ-নম্বর ঘরের টেবিল-চেয়ারে বসে রেশম পরীক্ষার পড়া করছিল ; আমাদের পরিবারের একজন—এ মেম্বার অফ আওয়ার ফেমিলি...

—ফেমিলি নয়, ফ্যামিলি! ধমকের সুরে বললে রুমা—মায়ের ওপর যত রাগ সবটুকু রেশমের ট্র্যানস্লেশনের খাতার ওপর ঢেলে দিয়ে।

দিদিটা সব সময় ওর ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে খোঁটা দেয় বলে মনে মনে বিরক্ত কম হয় না রেশম। তাই রুমার কথায় চটে গেল ও, বলে উঠল, যা যা—অত মেমসাহেব হতে হবে না, মেমসাহেবরা মায়ের কাছে বকুনি খায় না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শিখিনী তার খাটে শুয়ে পায়ে পা জড়াতে জড়াতে এক মনে একটা ইংরেজি ফ্যাশন পত্রিকার ছবি দেখছিল। তার ফুটানি-কি-থলিয়ার অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগের টাকা শেষ হয়ে আসছে। আর দু-একদিনের মধ্যেই সরে পড়তে হবে, ইন্টারভিউয়ের ফল জানতে পারুক চাই না পারুক। আরেকবার ওই ফ্যানওয়ালাবাবুকে বলতে হবে মিস্টার মহান্তির সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলবার জন্যে। ইংরেজি পত্রিকার ছবি দেখতে দেখতে এমনি সাত পাঁচ ভাবছিল সে। এমন সময় ক্যারমবোর্ডটা টানতে টানতে এসে হাজির হল বেলু।

বললে, পাঞ্জাবিদি!

—বেলু বহিন? দেড় হাত বাই এক হাত পত্রিকার আড়াল থেকে মুখটা বের করে শিখিনী তাকাল।

বেলু আদুরে সুরে বললে, উঠুন উঠুন, ক্যারম খেলব।

উঠে বসল শিখিনী, আর তক্তপোশের ওপর ক্যারমবোর্ডটা বসিয়ে বিস্কুটের টিন থেকে কাগজে মোড়া খানিকটা গায়ে-মাখার ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে দিল বেলু, তারপর ঘুঁটি সাজাতে বসল।

স্ট্রাইকার নিয়ে দুটো এলোপাথাড়ি রিবাউণ্ড করে শিখিনী বললে, দুজনে খেলা জমবে

না বেলু, রোজলারবাবুকে বুলাও।

বেলু বললে, শিবনাথবাবু ? তিনি তো কখন বেরিয়ে গেছেন। সুপ্রিয়দাকে ডাকব ?

দুজনে খেল জমবে কি না জমবে সে বিষয়ে শিখিনীর কোনও চিন্তাই ছিল না, আসলে শিবনাথবাবুকে খেলতে ডাকলে এক ফাঁকে চাকরির কথাটা পাড়তে পারত সে। তা যখন হচ্ছে না, তখন সুপ্রিয় এল কি রুমা এল, শিখিনীর কিছু যায় আসে না।

তাই বললে, বুলাও যাকে খুশি।

বেলু ছুটে গেল, গিয়ে ডেকে নিয়ে এল সুপ্রিয়কে। ডেকে নয়, রীতিমত সুপ্রিয়কে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

বেলুর ডাক শুনেই বুঝেছিল সুপ্রিয়, ক্যারম খেলতে হবে। এর আগেও সে ক্যারম খেলছে শিখিনীর সঙ্গে। কিন্তু গৌরীদেবী চলে যাওয়ার পর ক্যারমের পাট দিনকয়েক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ বেলুর চেয়ে গৌরীদেবীর উৎসাহই ছিল বেশি। বেলু আর গৌরীদেবী হতেন পার্টনার, আর শিখিনী এবং সুপ্রিয় প্রতিপক্ষ।

ক্যারমের নেশাটা সুপ্রিয়র কেন যে হঠাৎ উবে গেল বলা দুষ্কর। গৌরীদেবী চলে গেছেন তাই, না রুমা এসেছে বলে !

বেলু ধরে নিয়ে এলেও খেলতে বসার ইচ্ছে ছিল না সুপ্রিয়র। ছিল না দুটো কারণে। প্রথমত, আজকেই—এই কিছুক্ষণ আগে রুমাকে বড় বেশি কাছে পেয়েছিল সে। শুধু কাছে নয়, প্রায় বুকের কাছে।সত্যি, শার্টটা খুলে দিতেও বলেনি রুমা। সুপ্রিয়র বুকের কাছটিতে দাঁড়িয়ে শার্টের বুকে বোতাম লাগাতে লাগাতে সেই যে রুমার বাঁ হাতখানা সুপ্রিয়র বুক ছুঁয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, তার স্বাদটুকু যেন এখনও লেগে আছে।

তাই নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে বসে একটা পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল সুপ্রিয়, আর চোখ বুজে সেই দৃশ্যটা বারবার রোমন্থন করছিল। শুধু সেই দৃশ্যটা নয়, মনে মনে আরও অনেক দৃশ্য নিশ্চয়ই গড়ে তুলছিল। মানুষ প্রেমে পড়লে যেমন করে থাকে।

মানে, নিজের মনকেই বলছিল—মনে করো হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে পৃথিবীর সব লোক মরে ভূত হয়ে গেল—শুধু আমি আর রুমা বেঁচে আছি, রুমার বাবা-মাও মরে গেছেন —না, মাসিমা অবশ্য তাকে রীতিমত স্নেহ করেন...মনে করো তার চেয়ে সবাই হোটেল থেকে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে সেদিনের মত, এমনকি ওই বিচ্ছু রেশমটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন মাসিমা, আমি শুয়ে আছি, রুমা এসে বললে...আমি উত্তর দিলাম...রুমা তখন বললে...আমি তখন বললাম...রুমা বললে, বেশ যাব আমি, যেখানে নিয়ে যাবে, আমি বললাম, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি যেখানেই যাই রুমা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব ভাবতে ভাবতে কল্পনায় নানারকম চটকদার ভাল ভাল কথা বলছিল সুপ্রিয়, আর কল্পনার চোখে রুমার হাসি দেখছিল, রুমার সুন্দর চোখের ভুরুবিলাস দেখছিল, আর নিজের মনেই মুচকি মুচকি হাসছিল।

বেলুর ডাকে ওর স্বপ্নভঙ্গ হল। আর তেরো নম্বরে এসে যখন দেখলে স্রেফ শিখিনী ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বিরক্তি থেকে ভয় দেখা দিল ওর চোখে।

শিখিনী বললে, আরে সুপ্রিয়বাবু বৈঠ যান, বৈঠ যান।

এর আগে অবশ্য শিখিনী না বললেও বসে পড়ত ও, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বসতে হয়। কারণ সুপ্রিয়র ভয়, ও যদি খেলতে বসে শিখিনীর সঙ্গে, আর রুমা হঠাৎ এসে হাজির হয়, তা হলে হয়তো সন্দেহ করবে যে সুপ্রিয় রুমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখছে না। হয়তো ভাববে শিখিনীর প্রতি ওর কোনও দুর্বলতা আছে।

কিন্তু শিখিনী পাঞ্জাবি হলেও মহিলা। একজন মহিলার অনুরোধ না রাখাও মুশকিল।

শেষ পর্যন্ত বেলুর টানাটানি আর শিখিনীর অনুরোধে বসতেই হল সুপ্রিয়কে।

আর যদিও 'এক দান খেলেই উঠব' বলে বসল সে, তবু খেলতে খেলতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে লক্ষই করেনি সুপ্রিয়। ঘোর কাটল শ্রীলেখাদেবীর ডাকে।

—ও ছেলে! হাসলেন শ্রীলেখাদেবী।

আর সুপ্রিয় চমকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলে শ্রীলেখাদেবী সাজগোজ সেরে এসে দাঁড়িয়েছেন চৌকাঠে।

শ্রীলেখাদেবী হাসলেন। —তোমাকেই তো খুঁজছি। বেড়াতে বেরিয়ে যাবে না তো?

সুপ্রিয়র হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন শিঙি মাছের মত ঝাপটা দিয়ে উঠল আনন্দে।

বললে, না মাসিমা, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—যাক, বাঁচলাম। আসছি দাঁড়াও।

বলেই চলে গেলেন তিনি ছ-নম্বরের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে অধৈর্য হয়ে ক্যারম ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। বেরিয়ে এসেই মুখোমুখি পড়ল। শ্রীলেখাদেবীর পিছনেই রুমা।

সুপ্রিয়কে সামনে পেয়ে বললেন, উনি রইলেন, ঠাণ্ডা লেগেছে বলে বেরুবেন না, আর রেশম রইল। তুমি একুট দেখো বাবা, রেশমটা যেন বেরিয়ে না যায়।

খানিকটা এগিয়ে রুমাকে বললেন, তুই এগো।

বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়কে বললেন, উনি এত কম আলোয় পড়তে পারেন না, তুমি বাবা ওঁকে একটু খবরের কাগজটা পড়ে শুনিয়ো।

সুপ্রিয় একবার রুমার অপস্রিয়মান চেহারাটার দিকে তাকাল, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা।

আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, রুমা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খিলখিল করে হাসছে আর বলছে, মা, মোরগটা কি রকম হাঁটছে দেখো!

সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠল সুপ্রিয়র। মোরগ মোরগের মত হাঁটবে তা দেখে এমন খিলখিল করে হাসবার কি আছে!

রুমা ততক্ষণে রাস্তায় পৌঁছে হাসি থামিয়ে মাকে ধমক দিতে শুরু করেছে, তুমি কি যে পাড়াগেঁয়েদের মত বাবা বাছা করো, 'ছেলে ছেলে' বলো কেন ওকে?

শ্রীলেখাদেবী তা শুনে হেসে বললেন, দেখ রুমি, আমাকে সভ্যতা শেখাস না। তোর বাবা নয় অফিসার, আমার বাবা তো অফিসার ছিল না।

বোর্ডারদের ফিসফাস যে হিমাদ্রিবাবুর কানে যায়নি একেবারে তা নয়। তাঁর সামনে যদিও তেমন ভাবে কেউ বলেনি, তবু ঠাকুর-চাকরদের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছেন তিনি। দু-বেলা ভাতের থালা নামিয়ে দেওয়ার পরেই নাকি সকলের মুখ ব্যাজার হয়। কেউ কেউ দু-একটা রসিকতাও করে। কিন্তু সে-সবকে এত দিন আমল দেননি হিমাদ্রিবাবু। আমল দিলে চলেও না। পান্থপাদপ হোটেল অ্যান্ড স্যানাটোরিয়ামের বাড়িটা তো তার নিজের নয়। ভাড়া গুনতে হয় সারা বছর। অথচ বোর্ডার যা-কিছু জোটে তা তো এই শীতের সময়টুকুতে। এদিকে দিনকয়েক হল শীতও কমে আসছে। তা মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়ি পড়ি, শীত তো কমছেই। যা রুজি রোজগার এখনই করে নিতে হবে। এত কম চার্জে যা খেতে দিচ্ছি এই যথেষ্ট, হিমাদ্রিবাবু মনে মনেই বললেন, তোরাই ভার নিয়ে দেখ না।

মনটা ভাল ছিল না হিমাদ্রিবাবুর। বিশেষ করে দুধকুণ্ডের জল আনা নিয়ে যৌতুকীকে দু-কথা শোনানোর পর থেকে। সত্যিই তো, বেচারির দোষ নেই। নিজের চোখেই তো

দেখেছেন হিমাদ্রিবাবু, কি খাটাই না খাটে ও। তার বদলে মাইনে তো একরকম দেন না বলতে গেলে। দিতে পারেন না। তবু সারাটা জীবনই তো ও কাটিয়ে দিল এই হোটেলে। স্বামী ছেলে মারা যাওয়ার পর কবে সেই বিধবা মেয়েটি এসে ঢুকেছিল, একটা দিনের জন্যে ছুটি নেয়নি। হোটেলই যেন ওর সর্বস্ব।

অনুশোচনা হল হিমাদ্রিবাবুর। বেচারিকে অত কথা না শোনালেই হত। বোর্ডাররা না চটে যায় আবার। দু-দিনের জন্যে আসে সব, ঝি-চাকরের ওপর কত দরদ! নিজেরা তো বাপু বাড়ির ঝি-চাকরের সঙ্গে এর চেয়ে খারাপ ব্যবহার করিস, কাজ ছেড়ে চলে যাব না-বললে একটা টাকা মাইনে বাড়াস না।

কিন্তু চোরের ওপর রাগ করে তো মাটিতে ভাত খাওয়া যায় না। অতএব বোর্ডারি রাগ করলেও তাকে খুশি করতে হবে। সিনেমা অভিনেত্রী গায়ত্রীদেবী আর তাঁর মা এসে পৌঁছলে এগারো নম্বরটা খুলে দেওয়া যাবে, সুশান্তবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে ঘরটা খালিই আছে। সুশান্ত রেজ, গৌরীদেবী আর ছেলে বাদল—বেশ একটা ফ্যামিলি পেয়েছিলেন। বেশ ক-দিন ছিল।

এদিকে তেরো নম্বরে একটা সিট খালি পড়ে আছে—অন্য সিটটায় থাকে ওই পাঞ্জাবি মেয়েটা। ক-দিন থাকবে কে জানে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা একটু ভাল করলে সকলেই হয়তো থাকবে কিছুদিন। তাই দুপুরের ট্রেনে কটক চলে গিয়েছিলেন হিমাদ্রিবাবু। ফুলকপি, টমাটো, মটরশুঁটি আর একটা সেরপাঁচেকের রুইমাছ কিনে বিকেলের বাসে ফিরছিলেন।

বাসটা সোজা ক্যাপিটেল অর্থাৎ নতুন শহর অবধি যায়, তারপর সেখান থেকে পুরীর দিকে।

হিমাদ্রিবাবুর হোটেলের সামনে দিয়েই যেতে হয় বাসটাকে, মালপত্র নামানো সুবিধে। আর বাসের ড্রাইভারও চেনাজানা লোক, ভাড়া লাগে না। তাই ট্রেনের বদলে বাসে ফিরছিলেন।

ভগবান যখন দেন তখন বুঝি এমনি করেই দেন।

হিমাদ্রিবাবু বাসের মাথায় ঝুড়ি দুটো তুলে দিয়ে সবে এসে বসেছেন সিটে, বাস ধুলো উড়িয়ে চলতে শুরু করেছে, অমনি পিছন থেকে এক বুড়ির গলা শুনতে পেলেন। —হ্যাঁ গা, ডাইভার, ঠিক যাবে তো ভুবনেশ্বর?

কণ্ডাক্টর বললে, যাবে বুড়ি মা, যাবে। আপনি বসুন তো চুপ করে।

হিমাদ্রিবাবু ফিরে তাকিয়ে বুড়িকে এক চোখ দেখে নিয়েই আবার মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করলেন।

হিসেবই কষছিলেন, কত খরচ হল মোট। আর দৈনিক বরাদ্দের চেয়ে কত টাকা বাড়তি খরচ।

খানিক পরেই আবার গলা শুনলেন বুড়ির। —ও ডাইভার, ভুবনেশ্বর ছেড়ে গেলে নাকি, নামিয়ে দিতে বললাম যে।

বাসসুদ্ধ লোক হেসে উঠল বুড়ির কথায়। আর কণ্ডাক্টর বললে, সে এখন অনেক দেরি।

হিমাদ্রিবাবুও হেসেছিলেন। এবার জানালা দিয়ে আশপাশটা দেখে নিলেন। বাসটা জোর ছুটছে পিচের রাস্তা ধরে।

আবার মিনিট কয়েক কাটল, তারপরই বুড়ি আবার বললে, আমি ভুবনেশ্বর যাব, মনে আছে তো, ও ডাইভার।

হিমাদ্রিবাবু এবার আর থাকতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনি বসুন চুপ

করে। আমিও ভুবনেশ্বর যাব, নামিয়ে দেব আপনাকে।

বুড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। হাতের সুটকেস আর বিরাট পুঁটলিটা টেনে নিল কোলের কাছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বাসটা দৌড়তে দৌড়তে এসে হঠাৎ মাঝপথের একটা বাজারের কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি সুটকেস আর পুঁটুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। —ও ডাইভার, একটু দাঁড়াও। বললাম না ভুবনেশ্বরে নামব।

হিমাদ্রিবাবু এবার উঠে এলেন বুড়ির কাছে, বললেন, বসুন আপনি, এটা ভুবনেশ্বর নয়।

—নয় ? হতাশ হয়ে ধুপ করে বসে পড়ল বুড়ি।

হিমাদ্রিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় উঠবেন আপনি ?

বুড়ি ফোকলা মাড়ি বের করে হাসল। —আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। কোথায় উঠব তা কি আমি জানি বাবা, সিদ্ধেশ্বর যেখানে ওঠাবেন।

বুড়ির কথাবার্তা আর চেহারা দেখে হিমাদ্রিবাবু ধরেই নিয়েছিলেন, এ নির্ঘাত তীর্থযাত্রী, তাই বললেন, ধর্মশালায় জায়গা পেলে হয়, যা ভিড় এখন।

—ধর্মশালায় ? চোখ কপালে তুলল বুড়ি। —না বাবা, ধর্মশালায় থাকতে পারব না, মুচি মুদ্দোফরাশ হাজার জাত আসছে যাচ্ছে...

হিমাদ্রিবাবু বললেন, আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন বুঝি ভুবনেশ্বরে ?

—না বাবা, সে-সব ঘুচিয়ে এয়েছি বলেই তো আজ সঙ্গে কেউ নেই। আমার কি কম ছিল গা। বিন্দে বলত, কুমি, তোর সোয়ামি তো নয়, লাখটাকার জমিদার। জোয়ান জোয়ান পাঁচ বেটা, এক এক বেটা আমার পাঁচ-শো বিঘে লাখেরাজ। ভগমান সব নিয়ে নিলে বাবা, সব নিয়ে নিলে...কথায় বলে, দুঃখীর মুখে জল তো দেয়ই না, চোখে জল দেখলেও ভগমান জ্বলে মরে। ভগমান আমার এ কি করলে গো...

বলতে বলতে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে শুরু করল বুড়ি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

হিমাদ্রিবাবু বড় অস্বস্তি বোধ করলেন। স্বামী আর পাঁচ ছেলে মারা গেছে, তার ব্যথার জায়গায় কখন অজান্তে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন।

হিমাদ্রিবাবুর ব্যবসায়ী মনটা হঠাৎ একটু ভিজে এল। সারাজীবন তো কেবল বোর্ডার খুঁজে এলাম। আজ এই দীন দুঃখী বিধবা বুড়িটিকে নয় একটু আশ্রয় দিলাম বাড়িতে। দু-এক দিনের বেশি নিশ্চয়ই থাকবে না।

তাই বললেন, মা, আপনার কোনও ব্যবস্থা না থাকে তো আমার বাড়িতেই নয়...

সজোরে হাত নেড়ে অসম্মতি জানাল বুড়ি। —না বাবা, আমরা হলাম গিয়ে আমড়ার আঁটি, ফেলাও যায় না, গেলাও যায় না, তা কি আর জানি না বাবা। আমি বাবা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব।

—ঘর কোথায় পাবেন এখন। হাসলেন হিমাদ্রিবাবু।

আর বুড়ি বললে, কেন ওরা যে বললে পান্তোভাত হোটেলে ঘর আছে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, পান্তোভাত নয়, পান্থপাদপ। আমারই হোটেল।

—অ্যাঁ, তোমার ? বেশ বেশ, তা বাছা কত ভাড়া নেবে বলো।

হিমাদ্রিবাবু মুশকিলে পড়লেন। কি বলবেন বুড়িকে। শুধু ঘর তো ভাড়া দেন না।

বুড়ি ঠায় তাকিয়ে রইল হিমাদ্রিবাবুর মুখের দিকে, উত্তরের আশায়। তারপর বললে, শস্তা চাই না, যা নাও তাই বলো। তবে বাছা, তোমার ও পান্তোভাত আমি তো খাব না, বিধবা মানুষ, নিজে রান্না করে খাব। চাল ডাল তুমিই দিয়ো। কত নেবে বলো ?

হিমাদ্রিবাবু কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষল।

ধাক্কা সামলে নিয়ে হিমাদ্রিবাবু দেখলেন লিঙ্গরাজ মন্দিরের পাশের বাজারে এসে দাঁড়িয়েছে বাস।

জনকয়েক যাত্রী নেমে গেল মোটগাঁট নিয়ে। বুড়িও নামতে যাচ্ছিল কণ্ডাক্টরের 'ভুবনেশ্বর, ভুবনেশ্বর' হাঁক শুনে, হিমাদ্রিবাবু বাধা দিলেন।

বললেন, আমার হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে বাস।

—তাই বলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুড়ি। তারপর বললে, কত নেবে বলো বাছা, আগেভাগে পরিষ্কার হয়েনি, পরে যে বলবে, এত টাকা কথা হয়েছিল, অত টাকা কথা হয়েছিল...হোটেলআলাদের আমি চিনি। হাড়বজ্জাত লোক সব...তা তুমি লোকটি ভাল, তেমন কিছু করবে না জানি...

হিমাদ্রিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, মা, আপনি যা খুশি দেবেন।

—উঁহুঁ। কত করে নাও তুমি তাই বলো কেনে।

—সে অনেক। আপনি যা খুশি দেবেন।

বুড়ি তবু ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ অবধি রফা হল তিন টাকা দিনে।

ইতিমধ্যে বাসটা এসে দাঁড়াল হিমাদ্রিবাবুর হোটেলের সামনে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, নামুন মা, ওই আমার হোটেল।

বলেই নীচে নেমে পড়ে হাঁকডাক করতে লাগলেন যৌতুকীর উদ্দেশে। —যৌতুকী! যৌতুকী ম, মালগুলা নামাই লই যা তর্ করি।

যৌতুকী ডাক শুনেই বেরিয়ে এল হাসিমুখে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, চঞ্চর, চঞ্চর।

ওড়িয়া ভাষাটা ভালই জানেন, জানবার কথাও। সারাটা জীবনই তো কেটে গেল এখানে। বাঙালিদের নিয়ে তাঁর কারবার, কিন্তু এখানকার ওড়িয়াভাষী লোকদের বেশি আপন মনে করেন। তবু মনটা যেদিন বেশি প্রফুল্ল থাকে, সেদিন ইচ্ছে করেই ওড়িয়া ভাষাটাকে বিকৃত করে কথা বলেন নবাগত বোর্ডারদের মত।

তা শুনে যৌতুকী, ত্রিলোচন, চৈতন্য—এরা সব হাসে। হাসে, আবার বোর্ডারদের সঙ্গেও এমনি বিকৃত ভাষাতেই কথা বলে। বাংলা আর ওড়িয়ার মাঝামাঝি একটা ভাষায়। কারণ, ওদের মুখের আসল ভাষাটা অনেকেই বুঝতে পারে না।

এতক্ষণ বুড়ির দিকে মন দিতে পারেননি হিমাদ্রিবাবু। এবার ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, কণ্ডাক্টরের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে বুড়ি। —ও ডাইভার, বলি মটরটা ভেতরে নিয়ে চলো না। হোটলের দরজার কাছে নিয়ে চলো।

কণ্ডাক্টর হাসে আর বলে, না বুড়ি মা, এখানেই নামতে হবে, ভিতরে যাবে না, এ তো ট্যাক্সি নয় যে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেবে।

বুড়ি সকলের মুখের দিকে তাকায় আর বলে, এ কি অত্যেচার বাপু। ভাড়া নিলে গুনে গুনে আর দরজা অবধি পৌঁছে দেবে না? এই তো এইটুকু পথ, ও হোটেলআলা—

বাসসুদ্ধ সকলেই হেসে উঠল, আর হিমাদ্রিবাবু এগিয়ে এসে বুড়ির মালপত্র তুলতে গেলেন।

বুড়ি অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল। —ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না! বিধবা মানুষের চাল-চিঁড়ে বাঁধা আছে...

বলে নিজেই মোটগুলো সামলেসুমলে নেমে পড়ল, আর বাসটা স্টার্ট দিতেই একটা ফাজিল গোছের ছোকরা যাত্রী সুর করে গেয়ে উঠল, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো,...

বুড়ি তা শুনতে পেল না, শুনলেও ঠাট্টা বলে বুঝতে পারত না।

হিমাদ্রিবাবুর পিছনে পিছনে বুড়ি উঠে এল দোতলায়। তেরো নম্বর ঘরের সামনে।

শিখিনী সান্ধ্যভ্রমণে বের হবার জন্যে সাজগোজ করছিল। আর শিখিনীর সাজগোজ! একে বয়েসটাই তার পুরো যৌবন, তার ওপর সাজসজ্জার বহরটাও বেশি। নাইলনের শাড়ি, চুমকি-বসানো লাল টকটকে চোলির নীচে বিঘতখানেক ফর্সা ধবধবে পেট, মায় নাভিকুণ্ড পর্যন্ত, গালে রুজ, ঠোঁটে রং...শিখিনী আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে বুড়িকে।

হিমাদ্রিবাবু পাশের তক্তপোশটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই আপনার সিট। আর এই নিন চাবি।

বুড়ির দিকে তাকিয়ে, তার হাতের পুঁটলি আর রঙচটা সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে, শিখিনী নাক সিঁটকোল। মনে মনে চটল হিমাদ্রিবাবুর ওপর। বিরক্তিতে চেয়ারটার ওপর ধুপ করে বসে পড়ল একবার, উঠে দাঁড়াল, হতাশার একটা অস্ফুট শব্দ বের হল তার গলা থেকে, তারপর হিমাদ্রিবাবুকে বললে, তো তালা খোল রেখে ঘুমনে যাব?

হিমাদ্রিবাবু বললে, মা, যখন বাইরে বেরুবেন ভাল করে চাবি দিয়ে যাবেন। একটা চাবি আপনার কাছে রইল, আরেকটা ওঁর কাছে।

শিখিনী বুড়িকে তার দিকে কটমট করে তাকাতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

শিখিনী বেরিয়ে যেতেই বুড়ি বললে, কোথায় এনে ফেললে বাছা, বাঈজি নাকিন?

—না, না, পাঞ্জাবি। ও থাকবে না বেশিদিন...

বুড়ি জানালা দিয়ে থক্ করে থুতু ফেলে বললে, ঘেন্নায় মরে যাই, লাজলজ্জাও নেই বাপু। ধিঙ্গি মেয়ে...তা কার সঙ্গে এয়েছে এখানে?

—একাই।

—একা? দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল বুড়ির। একা? ও বাপু তা হলে নিঘ্যাত নষ্ট মেয়ে। এখানে ওকে জায়গা দিয়ে ঠিক করোনি বাছা। তোমার পান্তোভাত হোটেলের দুন্নামের একশেষ করে ছাড়বে ও মেয়ে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।

হিমাদ্রিবাবু শুনেও শুনলেন না। ছুটলেন তরিতরকারির ঝুড়ি ভাঁড়ারে ঢুকিয়ে চাবি দেবার জন্যে। ঠাকুর-চাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই এতটুকু, এখনই হয়তো সরিয়ে ফেলবে। আর মাছটাও নিজের চোখের সামনে কাটতে বলবেন। মাংসের টুকরো গুনে দেন রোজ, মাছের খান হিসেবমতো করে দেবেন না? কিন্তু হিসাবমতো করে দিলেই বা কি হবে, রাঁধুনি বামুনটা কি চালাক কম। স্রেফ খুন্তিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা খানকে দুটো করে ছাড়বে।

মাছ কোটবার জন্যেই হাঁক পাড়লেন যৌতুকীর উদ্দেশে।—ও যৌতুকী, যৌতুকী, হরতুকী! ও ভৌতুকী!

মনটা যেদিন খুব খুশি-খুশি থাকে সেদিন যৌতুকীর নামের সঙ্গে মিল রেখে যতগুলি শব্দ মনে পড়ে একনাগাড়ে ডেকে যান হিমাদ্রিবাবু। পদ্য লেখার মত। হাজার হোক, রসকষ কি তাঁর মনে ছিল না কোনওদিন? তা হলে পান্থপাদপ নাম রেখেছিলেন কেন এ

মনটা বেশ ভালই ছিল বোর্ডারদেরও। বিশেষ করে মিসেস ভট্‌চাজ আর তাঁর স্বামী ব্রজমাধববাবুর। রাত্রির আহারটা বেশ জুতসই হয়েছে। দু-তিনটে তরকারি ছাড়াও বড় বড় দুটো করে খান দিয়েছে মাছের। মাছটাও ভাল।

ভূরিভোজনের পর ঢেকুর তুলতে তুলতে ঘরে ঘরে একবার করে উঁকি দিয়ে এসেছেন

মিসেস ভট্চাজ, বলেছেন, দেখেন আপনারা, ইউনাইট করলে কাজ অয় কি না অয়। হিমাদ্রিবাবু যে হিমাদ্রিবাবু, হাড় কঞ্জুস, মাছ খাওয়াইল কিনা।

সুপ্রিয়র সারা মন বিরক্তিতে বিষিয়ে ছিল। সন্ধেটা নষ্ট হয়েছে তার, বাইরে একবারও বেরোতে পায়নি। মিস্টার সেনকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে শোনাতে হয়েছে। রুমারা ফিরেছে রাত ন-টায়। ক্যাপিটেলের দোকান থেকে একরাশ জিনিসপত্তর কেনাকাটা করে। তারপর ছুটি পেয়েছে সুপ্রিয়।

তাই মিসেস ভট্চাজের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বললে, মাছ খাওয়াটাই কি সব ? সেই জন্যেই এসেছি এখানে ?

মিসেস ভট্চাজ হাসলেন।—কি খাওয়নের বাসনা আপনাগো তা জানি, আইবুড়া বয়সের খিদা আর...

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস ভট্চাজ, প্রফেসর ঘোষ অপছন্দের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে কথাটা শুধু অর্থপূর্ণ হাসিতেই শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হতে দেবেন কেন মিসেস ভট্চাজ, রাত্রির আহারটা ভাল হওয়ার জন্য বোর্ডাররা না হিমাদ্রিবাবুকে প্রশংসা করে বসে। তা হলে আর তাঁর কৃতিত্বটা কি। তাদের বোঝাতে হবে যে, তিনি যদি অগ্রণী হয়ে কথাটা না তুলতেন, রীতিমত একটা আন্দোলন না গড়ে তুলতেন, তা হলে কৃপণ হিমাদ্রিবাবু খাওয়ার ব্যবস্থাটা ভাল করতেন না কিছুতেই। মিসেস ভট্চাজের মুভমেন্টের ভয়েই না টনক নড়েছে হোটেলওয়ালার! তবে হ্যাঁ, তাঁর কথা হিমাদ্রিবাবু শুনবেন, যদি বোর্ডাররা সব এক জোট হয়ে তাঁর পিছনে থাকেন।

তাই শিবনাথবাবুর ঘরের দিকে ছুটলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, শিবনাথবাবু টেবিল চেয়ারে বসে একরাশ কাগজপত্র নিয়ে কি সব লেখাজোখা করছেন, সামনে একটা পোর্টেবল্ টাইপরাইটার খোলা।

টাইপরাইটারের শব্দটা অভ্যাস হয়ে গেছে বোর্ডারদের। প্রথম প্রথম অসহ্য লাগত, ঘুম ভেঙে যেত, ঘুম আসত না। মিসেস ভট্চাজের ছেলে টম শিবনাথবাবুর নামই দিয়েছিল টাইপবাবু। শুনে হেসেছিলেন মিসেস ভট্চাজ, আবার বিস্মিত হয়েছিলেন লোকটাকে দেখে।

সত্যি, আশ্চর্য মানুষ এই শিবনাথবাবু। সারা দুপুর ক্যাপিটেলের আপিসে আপিসে টহল দিয়ে বেড়ান, গল্পগুজব করেন অফিসার আর বাবুদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে শুধু মিস্ত্রির কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, চা খাবে কিনা—দুটো সিঙাড়া আনিয়ে দেব ?

মিস্ত্রি ওরফে মেকানিক সারা দুপুর খারাপ হয়ে-যাওয়া ফ্যানগুলো মেরামত করে আর শিবনাথবাবু এর-ওর-তার কাছ থেকে নতুন নতুন ঠিকানা জোগাড় করেন, ইন্ট্রোডাকশনের চিঠি নেন, চিঠি লেখেন, কোটেশন পাঠান। চিঠি লেখা আর কোটেশন পাঠানোর কাজটা করেন রাত্তিরে।

রাত সাড়ে-এগারোটা বারোটা অবধি টাইপ করেন খটাখট খটাখট, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েন চিঠিটা। আশেপাশে আরও যে ঘর আছে, আরও বোর্ডার আছে, এবং তাদের অসুবিধে হতে পারে, সে-কথা মনেই হয় না তাঁর।

এদিকে রাত বারোটা, ওদিকে ভোর চারটে। সাক্ষাৎ নেপোলিয়ন। চার ঘণ্টাও ঘুমোন কিনা সন্দেহ। ভোর না হতেই এপাশে শিখিনীর ঘুম ভেঙে যায়, রেজাইয়ের মধ্যে হাত পা কুঁকড়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে সে, শীতের ভয়ে বেরোয় না ঘর থেকে। ওপাশের ঘরটা এখন খালি, আগে ছিলেন সুশান্তবাবু, গৌরীদেবী, ছেলে বাদল। আরও দিন কয়েক তাঁরা হয়তো থাকতেন, কিন্তু শিবনাথবাবুর টাইপরাইটারের দৌরাত্ম্যে ঘুমোতে

না পেয়েই বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি পালালেন।

শিবনাথবাবুর ওসব হুঁশ নেই। রাত বারোটা অবধি এক নাগাড়ে টাইপ করে গেলেন তিনি, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন টাইপ করা কথাগুলো। পাশের ঘর থেকে শুনলে মনে হবে যেন শিবনাথবাবু ডিক্‌টেশন দিচ্ছেন আর টাইপিস্ট সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করছেন।

বুড়ি নতুন এসেছে পাশের ঘরে, শিখিনীর পাশের তক্তপোশে। টাইপরাইটার বস্তুটা কি তা সে জানেও না।

এমনিতেই বুড়ো মানুষ, শীত বেশি লাগে, ঘুম আসতে চায় না, তার ওপর পাশের সিটে এমন এক বেহায়া নির্লজ্জ মেয়ে, যার চরিত্রের নষ্টামি সম্পর্কে বুড়ি একেবারে নিঃসন্দেহ। এমনিতেই গা ঘিনঘিন করে বুড়ির—তার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে। কেবল ভয়, কাপড়চোপড় বিছানাপত্তর না ছুঁয়ে দেয়।

এখন আবার কি একটা খটাখট খটাখট শব্দ!

প্রথমটা বুড়ি চমকে উঠেছিল। রেতের বেলায় এ আবার কিসের উৎপাত?

পুঁটুলির মধ্যে চাল চিঁড়ের সঙ্গে একটি পাতলা কাঁথা আর খুদে বালিশ সম্বল করে এসেছে বুড়ি তীর্থ করতে। তা শুনে হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী বেলুকে দিয়ে সন্ধেবেলায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন বুড়িকে। চিক দিয়ে আড়াল করা নিজেদের ঘরটিতে।

তারপর একখানা তোশক, একটা বালিশ আর একটা কম্বল দিয়েছিলেন। —আপত্তি না থাকে তো যে-কদিন আছ মা, এগুলো ব্যবহার করো। যা শীত এখানে!

বুড়ি হেসেছিল সে-কথা শুনে। বলেছিল, আমাকে কি শয্যাসুখ দেবে গো এই লেপ তোশক? গায়ে বাজবে কাঠের তক্তায় শুতে, তাই তোশক দিচ্ছ মা, কিন্তু বুকের ভেতর যে দিনরাত বিঁধছে তার তোশক কে দেবে বাছা! জোয়ান-জোয়ান পাঁচ বেটা আমার, এক এক বেটা পাঁচশো বিঘে লাখেরাজ। তাই যখন ভগমান নিয়ে নিলেন...

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল বুড়ি স্বামী-পুত্রের শোকে। কিন্তু তোশক কম্বল নিতে রাজি হয়েছিল শেষ অবধি।

নিতে রাজি না হলে কি মুখ্যুমিই না হত, মনে মনে ভাবলে বুড়ি, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কম্বলে মাথা অবধি ঢেকে দিয়ে।

ঘুম এলে তবু শীতের কাঁপুনি কমত। কিন্তু বুড়ো বয়সে এমনিতেই ঘুম আসতে চায় না, তার ওপর এ আবার কি উৎপাত! যতবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে বুড়ি, তন্দ্রা আসে, অমনি পাশের ঘর থেকে আওয়াজ আসে খটাখট খটাখট!

শব্দটা কিসের বুঝতে না পেরে বুড়ি এপাশ ওপাশ করল। একবার উঠে বসল, আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ভয় গেল না, কান পেতে রইল শব্দটা শোনার জন্যে। প্রথমটা ভেবেছিল ইঁদুর ঢুকেছে ঘরে হয়তো, পুঁটুলির চাল চিঁড়ে টানাটানি করছে। না, তেমন শব্দ তো নয়। তবে কি ছাদের ওপর প্যাঁচা নয় তো চামচিকে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুড়ি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, গলা শুকিয়ে এল। ব্রহ্মদৈত্য নাকি? হ্যাঁ, খড়ম পরে হাঁটছে যেন ছাদের ওপর—খটাখট খটাখট শব্দ যখন, খড়মের শব্দই হবে হয়তো।

ভয়টা আরও বেড়ে গেল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়ছে যেন ব্রহ্মদৈত্যটা! এই তো খটাখট হাঁটছে কয়েক পা, তারপরই বিড়বিড় করে কি বলছে।

ভয়ে আতঙ্কে দাঁত কপাটি লেগে গেল বুড়ির, চোখ বুজে পড়ে রইল মড়ার মত, আর চুপচাপ নির্জীবের মত পড়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখনও আকাশ ফরসা হয়নি। চারিদিক অন্ধকার। ওদিকের তক্তপোশে মশারি খাটিয়ে ঘুমোচ্ছে শিখিনী।

সারা শরীরে ব্যথা, সারা শরীর টনটন করছে। একে ঘুম হয়নি, তার ওপর ভয়।

শুয়ে শুয়েই বুড়ি শুনতে পেল পাশের ঘরে কে যেন চেঁচাচ্ছে। —মিস্ত্রি, ও মিস্ত্রি! আরে সকাল হয়ে গেছে, উঠে পড়ো ব্রাদার!

কিছুক্ষণ পরেই বুঝল, লোকটা মুখ ধুচ্ছে। জিবছোলার পর কেমন একটা বিচ্ছিরি অক্ অক্ শব্দ করছে।

তা করুক, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, ভোররাতে ঘুমটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করল বুড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই খটাখট খটাখট শব্দ।

ও হরি, ব্রহ্মদৈত্যটৈত্য নয়! ওই পাশের ঘরের লোকটাই কি যেন করছে। খটাখট খটাখট শব্দ করছে, আর কি পড়ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে!

বুড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। না, ঘুমোতে দেবে না লোকটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। দেখল, রাত ফরসা হচ্ছে।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় এসে বসল বুড়ি, হিমাদ্রিবাবুর দেওয়া তোলা-উনোনটার সামনে। বিধবা মানুষ, স্বপাক খাবার ব্যবস্থা তো নিজেকেই করতে হবে।

ঘুঁটে, দেশলাই, 'ক্রাচিন' সব আছে। যৌতুকী গতরাত্রেই দিয়ে গেছে।

উনোন পরিষ্কার করতে বসল বুড়ি। গতরাত্রের রান্নার পর ছাইগুলো কাড়া হয়নি।

উনোন পরিষ্কার করে ছাইগুলো নিয়ে গিয়ে কলতলার কাছে ডাঁই করে রেখে এল বুড়ি। তারপর তিনখানা ঘুঁটে আড়াআড়ি করে উনোনে বসিয়ে কেরোসিন ছিটিয়ে দিলে। দেশলাইটা জ্বেলে দিতেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল, ছোট ছোট কয়লার টুকরোগুলো চাপিয়ে দিল বুড়ি। ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠল, আর দমকা হাওয়ায় বুড়ি যত কাঁপে, ধোঁয়াও তত কাঁপে। বুড়ি বড় বড় দুটো কয়লার চাঙড় নিয়ে টুক টুক করে আবার কলতলায় গিয়ে একটা কাটারি তুলে নিয়ে কয়লা ভাঙতে বসল। ঠুকঠুক, ঠুকঠুক।

যৌতুকী কোথায় ছিল, বেরিয়ে এসে বুড়িকে দেখে হাসল। তারপর হাত থেকে দা-টা কেড়ে নিয়ে বললে, বুড়া মানুষ তুমি কোইলা ভাঙিব কাঁই, যৌতুকী কি মরি গলা?

বুড়ি বুঝল কি বুঝল না, যৌতুকীর ওপর কয়লা ভাঙার ভার দিয়ে চলে এল আবার ওপরে। নিজের ঘরটির সামনে। আসবার সময় একবার উঁকি দিয়ে দেখল বারো নম্বর ঘরে।

একটা মিনসে ঘুমোচ্ছে মড়ার মত, আরেকটা টেবিলের সামনে বসে কি একটা যন্ত্রের ওপর আঙুল খোঁচাচ্ছে বারবার।

বুড়ি রেগেই ছিল শিবনাথবাবুর ওপর, লোকটা ঘুমোতে দেয়নি সারারাত। তাই দরজার এপাশ থেকেই টাইপরাইটারের চাবিতে আঙুল খোঁচানোর ভঙ্গিতে ভেংচি কেটেই সরে গেল।

শিবনাথবাবু টাইপ করতেই ব্যস্ত ছিলেন, কে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল, কে তাঁকে অঙ্গভঙ্গি করে বিদ্রূপ করে গেল, দেখতে পেলেন না কিন্তু হাতটা কাজে ব্যস্ত থাকলেও নাকে তো ছিপি আঁটা ছিল না!

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন। নাক টানছিলেন, আর গন্ধটা কিসের তা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। এবার চোখ দুটো একটু জ্বালা করে উঠতেই ফিরে তাকালেন।

ভাঙা বাতাসে এক-দমকা ধোঁয়া ঘরে ঢুকছে তখন।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথবাবু। বাইরে বেরিয়ে এলেন, এবং তারপর তাঁর ঘরের পাশেই বারান্দায় উনোন ধরানো দেখে চোখ কপালে

উঠল তাঁর।

চেঁচাতে শুরু করলেন সঙ্গে সঙ্গে। —হিমাদ্রিবাবু, ও হিমাদ্রিবাবু!

খুরপি দিয়ে বেগুনের চারাগুলোর নীচে মাটি ঢিলে করে দিচ্ছিলেন হিমাদ্রিবাবু, যেমন প্রতিদিন করেন এ-সময়ে। ডাক শুনে খুরপি ফেলে এগিয়ে এলেন, ভাবলেন, চায়ের জন্যেই বুঝি হাঁকডাক।

বললেন, চা হয়ে গেছে, দিচ্ছে। এক মিনিট।

রাগে ফেটে পড়লেন শিবনাথবাবু। —রাখুন আপনার চা। এটা কি হোটেল না ধরমশালা, তাই বলুন। কি ভেবেছেন কি আপনি? গলা-কাটা চার্জ নেবেন আর পাণ্ডাদের মত যেখানে সেখানে যাত্রী বসিয়ে দেবেন!

হিমাদ্রিবাবু বুঝতে না পেরে নীচের উঠোন থেকেই প্রশ্ন করলেন, কেন কি হল কি স্যার?

—কি হতে বাকি আছে তাই বলুন। ধোঁয়ায় ঘর যে ভরে গেল। এটা কি রান্নার জায়গা, না উনুন ধরাবার জায়গা!

চিৎকার হট্টগোল শুনে শিখিনী, সুপ্রিয়, মিসেস ভট্টাচার্য, রুমা, রেশম—সব এসে জড়ো হল বারান্দায়। আর সকলেই বুড়ির কীর্তি দেখে হেসে লুটোপুটি খেল।

বেচারা বুড়ি তখনও ভয়ে বিস্ময়ে এর ওর মুখের দিকে চাইছে আর ঠকঠক করে কাঁপছে। কি অন্যায় সে করেছে বুঝতে না পেরে তালপাতার পাখার বাতাস করে ধোঁয়াটাকে বাইরের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে বুড়ি যাতে ঘরের দিকে না যায়। আর বোকার মত তাকায়।

শিখিনীও রেগে ছিল বুড়ির ওপর। এমন একটা নোংরা অসভ্য গেঁয়ো বুড়িকে তার রুম-মেট করে দেওয়ার জন্য হিমাদ্রিবাবুর ওপরও।

সে বললে; এ বুডটি, চুল্লি নীচে লে যাও।

শিবনাথবাবুর চিৎকার শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল বুড়ি। কি করবে খুঁজে পাচ্ছিল না। উনোনটা হাতে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, পারেনি। কারণ ততক্ষণে উনোনের হাতল দুটো তেতে উঠেছে।

কিন্তু নষ্টা মেয়েটার কথা শুনেই রাগে সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠল বুড়ির। রুখে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, কেন রে নাচুনি, তোর কথায় সরাব?

হোটেল-আলা বলেছে তবে তো এখেনে রান্না করছি। শুনে শুনে টাকা নেয়নি হোটেল-আলা? বলুক কেনে।

শিবনাথবাবু আবার চিৎকার করলেন। —ও হিমাদ্রিবাবু। আপনি তো মশাই মানুষ মারতে পারেন দেখছি। বলেছেন এখানে উনুন ধরাতে?

হিমাদ্রিবাবুও ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছেন। সব দেখে বললেন, না উনুন তো যৌতুকীকে ধরিয়ে এনে দিতে বলেছিলাম, উনি স্বপাক খাবেন বলে শুধু রান্নাটা ওখানেই করতে বলেছিলাম।

শিবনাথবাবু এবার বুড়ির দিকে ফিরলেন। —এত বয়স হল আর এটুকু মাথায় ঢুকল না আপনার, যে এখানে উনুন ধরালে ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাবে?

বুড়ি তেতেছিল, বললে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সবারই সব মাথায় ঢোকে!

শিবনাথবাবু কথাটার গূঢ়ার্থ বুঝলেন না, বললেন, হোটেলে থাকতে হলে আর পাঁচজনের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হয়!

বুড়ি এবার ফেটে পড়ল রাগে। —মেলা বকাস না। অন্যের কথা তুই ভাবিস হতচ্ছাড়া? সারা রাত যে খটখট খটখট করে ঘুমোতে দিলি না, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লি,

বুড়ো মানুষটা পাশের ঘরে ঘুমোতে পারছে না, ভেবেছিলি ? সারারাত শুধু খটখট খটখট...

বলতে বলতে বুড়ি আঙুলটাকে টাইপরাইটারে চাবি টেপার মত করে এমন অঙ্গভঙ্গি করল যে, হোহো করে হেসে উঠল সকলেই।

বুড়ি নিজেও।

চিৎকার হট্টগোল, ঝগড়াঝাঁটি মিটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। যৌতুকী একটা সাঁড়াশি নিয়ে এসে উনোনটা নিয়ে গেল নীচে, রান্নাঘরের ওপাশে। আর হিমাদ্রিবাবু শান্ত করলেন দু-জনকেই—শিবনাথবাবু আর বুড়ি দু-জনকেই শুনিয়ে বললেন, এবার থেকে যৌতুকীই উনোন ধরিয়ে এনে দেবে, তেরো নম্বর ঘরেরও ওপাশে বারান্দার এককোণে বসে ভাতে ভাত সেদ্দ করে নেবে বুড়ি। হাজার হোক, বাঙালি ঘরের বিধবা, তার ওপর সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধা, একটু সহ্য করে নিন শিবনাথবাবু !

রান্নার জন্য অবশ্য আপত্তি নেই শিবনাথবাবুর, আপত্তি ধোঁয়ার জন্য। তা যৌতুকী যদি উনোনটা ধরে যাবার পর এনে দেয়...

আসলে আপত্তি করবার মত মনের জোরও আর ছিল না শিবনাথবাবুর। তাঁর টাইপরাইটারের দৌরাত্ম্যে যে বুড়ির ঘুম হয়নি, এবং অন্য বোর্ডারদেরও ঘুম হয় না, তা তাদের অট্টহাস্য শুনেই টের পেয়েছিলেন।

তাই মনমরা হয়ে ঘরে এসে বললেন, আজকের দিনটাই খারাপ যাবে, বুঝলে মিস্ত্রি ! সকালে উঠেই চেঁচামিচি, দিনটা এখন ভালয় ভালয় গেলে বাঁচি।

মিস্ত্রি হেসে বললে, কল থাকলে একটু বিগড়ে যাবে বইকি মাঝে মাঝে, তা বলে মন খারাপ করবেন কেন স্যার ! ওই পাখা আপনার যেমন কখনও টিকটিক করে, ঢকঢক করে, স্পার্ক দেয়, তেমনি স্যার আমাদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকা। মন খারাপ করে সময় নষ্ট, তার চেয়ে একটু শিরিষ কাগজ ঘসে দিন, নয়তো কার্বনটা দেখুন পুড়ে গেছে কিনা, আর নয়তো অয়েল করে নিন, আবার ঠিক হয়ে যাবে।

শিবনাথবাবু হেসে ফেললেন। —মানে ! মানুষও মেশিন নাকি তোমার কাছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ও দু-ই এক। অয়েল করে নেবেন একটু ? বলে চোখের ইশারা করে তোশক তুললে মিস্ত্রি, একটি চ্যাপটা বোতল বের করলে।

—তাই বলো। বসে পড়লেন শিবনাথবাবু। বললেন, কাল বেশ গরম লাগছিল, আজ আবার যা ঠাণ্ডা পড়ে গেছে...তা দাও একটু। এই একরত্তি—বলে দু-আঙুলে এমন একটা পরিমাণ দেখালেন যা হোমিওপ্যাথির ডোজকেও হার মানায়।

মিস্ত্রি একটা হাতল-ভাঙা কাপে সামান্য একটু ঢেলে দিয়ে ঢকঢক করে নিজেও খানিকটা গিলে নিল।

শিবনাথবাবুও কাপটা সবে নামিয়ে রেখে ঠোঁট চাটছেন, শিখিনী এসে ঢুকল।

—আরে শিউনাথবাবু, এ বুড্‌টি তো আমাকে হয়রান করছে দিনরাত। বিলকুল জংলি, বিলকুল জংলি।

শিবনাথবাবু তাড়াতাড়ি কাপটা সরিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি হল আবার ?

চোখে-জল-আনা হতাশার সুরে শিখিনী বললে, আমার ঘর তো বুড্‌টি রসুইখানা বানিয়ে দিল। ইধার চাবল, উধার মিরচা, আর দিনরাত পানি ঢালছে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। বুড়ি যত না রান্না করছে তার চেয়ে বেশি জল ঢালছে। সারা বারান্দা, সারা ঘর ধুচ্ছে বারবার। আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। বিধবা মানুষ, নিজে রেঁধে খাব দুটি, তা এ নষ্ট মেয়েটা দেবে না কিছুতে। যতবার ধুচ্ছি জল

দিয়ে, ততবারই ছুঁয়ে দিচ্ছে। ছোঁয়া হচ্ছে না ? দু-গজ দূর দিয়ে যাতায়াত করলেও জলে জলে ছোঁয়াচ লাগছে যে।

শিখিনীর কথা শুনে হাসলেন শিবনাথবাবু, খানিকটা সান্ত্বনাও পেলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কারণ বুড়ির স্পষ্ট কথা এবং বোর্ডারদের অট্টহাস্য শুনে শিবনাথবাবু একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন।

শিখিনী বুঝে নিল, আড্ডা জমবে না। তাই চটি চটচট করে আবার বেরিয়ে এল। তারপর ধোয়া বারান্দার ওপর দিয়ে চটির গোড়ালিতে জল ছিটোতে ছিটোতে বুড়ির উনোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁড়িতে উঁকি দিল বুড়িকে চটাবার জন্যেই।

বুড়ি চটেই ছিল। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল।—তুমি বাছা আমাকে রাগিয়ো না বলে দিচ্ছি, বেজাতের ছোঁয়া আমি খাব না, না খেয়ে উপোস করে মরব, তবু খাব না।

শিখিনী প্রতিবাদে শুধু খিলখিল করে হেসে উঠল, আর বুড়ি তা দেখে আরও রেগে গেল।

চেঁচামেচি শুনে রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেই শিখিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হল তার। আর শিখিনী হাসতে হাসতে লম্বা বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে রুমাকে বললে, আজব চিজ এ বুড়ি। খালি পানি ঢালছে বারান্দায়।

রুমা ফিক করে একটু হাসল, তারপর বললে, বিধবা মানুষ, কারও ছোঁয়া তো খায় না ; কি দরকার ভাই রাগিয়ে ?

শিখিনী বললে, বিধবা নয় জংলি। আমি কি অচ্ছুত আছি ? 'অরোরা' আছি না আমি ?

অরোরা বোরিয়ালিসের খবর তবু রাখে রুমা, কিন্তু অরোরা বংশের গৌরব কি করে জানবে ! তবু সেটুকু গোপন করে বললে, অত সব কি বুড়ি জানে ভাই ?

শিখিনীর গোপন উষ্মা এবার প্রকাশ হয়ে পড়ল। বললে, ও সব সমঝাবার বাত তো বলছি না বহেন, লেকিন আইন তো জানতে হবে। অচ্ছুতকে ভি অচ্ছুত বললে জেল হয়ে যাবে আজকাল। বিলকুল জংলি, স্রিফ এক টুকরা ময়লা কাপড় পরবে, না চোলি, না ব্লাউজ, আধা নাঙ্গা জংলি তো ও বুড়ি। খালি বকবক করে, আর পানি ঢালে।

রুমারও চোখে বুড়ির হাবভাব কথাবার্তা বেখাপ্পা লেগেছিল। বিশেষ করে এই হোটেলের পরিবেশে। কারণ সকলেরই এখানে মোটামুটি সভ্যভব্য চালচলন। বুড়িকে এ হোটেলের চেয়ে ধর্মশালাতেই যেন মানাত। তবু শিখিনীর কথাগুলো ভাল লাগল না রুমার। বেশবাশ ধরনধারণে শিখিনীর সঙ্গে ও নিজেকে প্রায় এক গোত্রের মনে করলেও হঠাৎ ওর মনে হল, শিখিনী পাঞ্জাবি আর বুড়ি বাঙালি। একটুক্ষণের জন্য হলেও ও বুড়ির সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেল। মনে হল, একজন পাঞ্জাবি একটি বাঙালিকে উপহাস করছে 'জংলি' বলে।

রুমার চোখ দেখেই শিখিনী বুঝতে পারল। বুঝল, তার কথাগুলো রুমার কাছে খুব উপাদেয় ঠেকছে না। তাই টা টা করার ভঙ্গিতে হাতটাকে প্রজাপতি নাচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল শিখিনী, হয়তো বাগানের গাঁদা ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজতে।

ওপরের বারান্দা থেকে শিখিনীকে হেলে দুলে চলে যেতে দেখে রুমা নিজের মনেই বললে, কি আমার সভ্য রে !

বলে ধীরে ধীরে ছ-নম্বরের এ-প্রান্ত থেকে তেরো নম্বরের ও-প্রান্তে গিয়ে হাজির হল।

তারপর চটিজোড়া খুলে রেখে জিগ্যেস করলে, যাব ঠাকুমা ? বেশ মিষ্টি করেই বললে।

বুড়ি ফিরে তাকাল, ফোকলা মাড়ি বের করে হাসল। তারপর বললে, আয় মা আয়। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, কোন ঘরে আছ মা তোমরা ?

রুমা আদুরে গলায় বললে, ওই শেষ ঘরটায়, ছ-সাত নম্বরে। ঠাকুমা সব ছুঁয়ে দিলাম তো আপনার ?

—না মা, না। অত দূরে রয়েছ, ছোঁয়া হবে কেন ?

রুমা বললে, বাঃ রে, জল শুকোয়নি যে বারান্দার !

বুড়ি হাসল, সরল হাসি। —দেখো মা, তবেই দেখো ভদ্দর ঘরের বাছবিচার। তা তুমি মা ভদ্দর ঘরের মেয়ে, ছুঁলেও দোষ নেব কেনে ! কিন্তু ওই যে ধিঙ্গি মেয়েটা, কি জাত কে জানে, কথাবার্তা তো বলে কাঠখোট্টা ধরনের, তা খাবার জিনিস মা, রান্নার হাঁড়িতে ছটছট করে জুতোর জল ছিটিয়ে দিলে, জ্ঞানগম্যি নেই এতটুকু ?

রুমা সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, ওদের কথা ধরতে নেই, বাঙালি তো নয়, পাঞ্জাবি।

—পাঞ্জাবি ? চোখ কপালে তুলল বুড়ি। ওই যাদের মরদগুলো মেয়েদের মত চুল রাখে ? ইয়া ইয়া দাড়ি রাখে ? শুশোর মত শরীর হয় ?

রুমা হেসে ফেলল। বললে, হ্যাঁ।

বুড়ির কপালে এমনিতেই ভাঁজ পড়েছে অসংখ্য, সেই কপালও কুঁচকে উঠল। বললে, তা সে যাই হোক মা, ও মেয়ে তোমার ভাল নয়, দেখে নিয়ো। ও নষ্ট মেয়ে।

রুমা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকাল বুড়ির মুখের দিকে।

বুড়ি তার ছানি পড়া চালশে ধরা চোখে কেমন একটা সবজান্তা ভঙ্গি করল। বললে, ও আমি প্রথম দেখেই বুঝেছি। ছি ছি ছি, বেহায়ার মত সাজসজ্জা কি ? লজ্জাশরম নেই মা এতটুকু ? একা একা এসেছিস, ধিঙ্গির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, হোটেল বলে জায়গা, সেখানে একা থাকছিস কি করে ? নষ্ট মেয়ে না হলে এমন কেউ পারে, তুমিই বলো তো মা ?

সায় পাবার আশায় বুড়ি তাকাল রুমার দিকে। কিন্তু একথায় সায় দিতে পারল না রুমা। সেই শিখিনী যখন বুড়িকে জংলি বলেছিল তখন যেমন আহত বোধ করেছিল সে, অস্বস্তি লেগেছিল, রাগ হয়েছিল, ঠিক তেমনি। এ আবার কি কথা ? বুড়ি নিজেও তো একা একাই এসেছে। শিখিনী না-হয় পেট খোলা চোলি পরেছে, কিন্তু শিখিনীর কথাও তো ফেলনা নয়, বুড়ি যে তাও পরেনি। পাড়াগাঁয়ের কত মেয়ে তো কম বয়সেও সায়া ব্লাউজ পরে না, পরত না। অথচ সেটা অসভ্যতা নয় ?

রুমা আপত্তি করে বললে, ও-কথা কেন বলছেন ? মেয়েটা ভাল।

—ভাল মেয়ে অমনি বাঈজীদের মত সাজগোজ করে ? রং মাখে ?

রুমা কথাটা শুনেই আড়চোখে একবার নিজের পোশাকটা দেখে নিল। যাক, যথেষ্ট আধুনিক হলেও শিখিনীর মত অতখানি উগ্র সাজ নয় তার। হলে না জানি কি বলত বুড়ি !

রুমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বুড়ি মুখটা রুমার কানের কাছে নিয়ে এসে চাপা গলায় বলে উঠল, দেখো মেয়ে, আমার চোখ এড়িয়ে চলা শক্ত। ভাল যদি, তো ওই মিনসেটা, ওই যে সারারাত কি একটা যন্তর নিয়ে খট্‌খট্ খট্‌খট্ করে—ওর সঙ্গে এত ফস্টিনস্টি কেন বাপু তার।

শিবনাথবাবু শুনতে পেলেন কিনা এই আতঙ্কে ফিরে তাকাল রুমা। আর ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল বারান্দার ও-প্রান্তে মা বেরিয়েছে ঘর থেকে।

দেখতে পেয়েই রুমা বললে, ডাকছ মা ? যাচ্ছি, যাচ্ছি। বলে ছুটে পালাল।

শ্রীলেখাদেবী মেয়েকে ডাকবার জন্য বোরোননি ঘর থেকে, ডাকেননি। তিনি শুধু

বেরিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলেন রুমা গেল কোথায়। মেয়ের ওপর তাঁর যে অটল বিশ্বাস ছিল তা ভেঙে গেছে, এখন সারাক্ষণ চোখেচোখে রাখতে চান। প্রফেসর ঘোষ লোকটাকে তাঁর প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়নি। আর প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছে এ লোকটার যা চেহারা আর বয়স, রুমা না জানি কি করে বসে।

সুপ্রিয়র কথা অবশ্য ভাবেন না শ্রীলেখাদেবী। ছেলেটি ভাল, বেশ বিনয়ী, মিশুকে। কিন্তু ওর চেহারাটা তেমন কিছু আহা-মরি নয়। বয়সও প্রায় রুমার সমান সমান। তা ছাড়া খবর নিয়ে জেনেছেন, ছেলেটি বি-এ পাশও করেনি। সুতরাং ওদিক থেকে ভয় নেই। সুপ্রিয়কে নিশ্চয় রুমার মত মেয়ে মন দিয়ে বসবে না। অত বোকা নয় রুমা। কথাটা মনে হতেই ফিক করে হেসে ফেললেন শ্রীলেখাদেবী। সুপ্রিয়কে ভালবেসে ফেলবে রুমা ? রুমার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে ? অসম্ভব !

রুমা অবশ্য অতশত মায়ের মনের খবর জানত না। মাকে দেখে সে বুড়ির কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এসে হাসতে হাসতে বললে, জানো মা, বুড়ির ধারণা সাজগোজ করলেই সে খারাপ মেয়ে। বলে কি, ওই শিখিনী, পাঞ্জাবি মেয়েটা, ও নাকি খারাপ মেয়ে, পেট খোলা ব্লাউজ পরেছে কিনা।

শ্রীলেখাদেবী হেসে বললেন, বুড়ো মানুষ, বলবেই তো। তা ওর ওই সাজগোজ আমারও খারাপ লাগে।

রুমা হেসে উঠল খিলখিল করে।—তুমি মা হোপলেস। তুমিও পাড়াগেঁয়ে রয়ে গেলে।

শ্রীলেখাদেবী হাসলেন।—কি করব বল। আমি যে আধাশহুরেই ছিলাম, আমার বাবা তো অফিসর ছিল না। তোর বাবার পাল্লায় পড়েই না বদলেছি আর তোর পাল্লায় পড়ে এত সাজগোজ।

—তা বলে নাইলন পরলেই খারাপ বলবে ? আমারও তো আছে একটা।

শ্রীলেখাদেবী মুচকি হেসে বললেন, যখনকার যা। বিয়ের পর আমি হাতায় ফুল দেওয়া পুরো হাতা ব্লাউজ পরতাম, সেমিজ পরতাম, তাই শাশুড়ির কথা শুনেছি। মেম সাহেব। ফিরিঙ্গিয়ানা বেহায়া—এমনি কত কি বলতেন।

রুমা হেসে হাততালি দিয়ে উঠল।—বাঃ রে, বেশ তো। গা ঢাকলেও বেহায়া, না ঢাকলেও বেহায়া ? আসলে আমার কি মনে হয় জানো মা ? বুড়িগুলো আমাদের দেখতে পারে না।

শ্রীলেখাদেবী বললেন, আর ছুঁড়িগুলোও তো বুড়িদের দেখতে পারে না।

—মা ! গর্জন করে উঠল বললেই ঠিক বলা হয়। রুমা বেশ বিরক্তির কণ্ঠে বললে, ছুঁড়ি আবার কি কথা ? তোমার ওই পাড়াগেঁয়ে কথাবার্তা শোধরানো গেল না।

শ্রীলেখাদেবী হেসে বললেন, বেশ বাপু, আর বলব না।

কথাটা তিনি যেন চাপা দিতে চাইলেন। এবং মনে হল, রুমা তাকে যতখানি ভয় করে, তিনিও যেন রুমাকে তার চেয়ে কম ভয় পান না। পাছে রুমা তাঁর এই অ-শহুরে উক্তিটা বাপের কানেও তোলে, পাছে মিস্টার সেনের কাছে একটা তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হয়, এই ভয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করলেন শ্রীলেখাদেবী। এবং সে-কারণেই জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, কোনারক যাবার কি হল ? যাবি না ?

সকালের স্নান-খাওয়া সেরে প্রতিদিনের মতই শিবনাথবাবু তাঁর মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে

রিক্‌শায় চেপে বসলেন। বললেন, চলো ক্যাপিটেল।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে রিক্‌শাওয়ালা নতুন শহরের উদ্দেশে প্যাডেল চালাতেই শিবনাথবাবু মিস্ত্রিকে বললেন, যা-কাজ একটু-আধটু বাকি আছে আজকেই শেষ করে নাও মিস্ত্রি।

মিস্ত্রি চমকে উঠল। —সে কি স্যার, টি-এ খাবেন না আর দিনকয়েক?

শিবনাথবাবু বললেন, টি-এ তোমার খাতাকলমে বাড়িয়ে নিলেই হবে, এখানে আর থাকছি না। দেখছ না, হোটেলওলা ব্যাটাচ্ছেলে হোটেলটাকে ধর্মশালা করে তুলছে। কি এক ন্যাস্টি বুড়িকে এনে তুললে বলো তো।

মিস্ত্রি সায় দিল, তা ঠিক বলেছেন। বেশ, আজকেই সব কাজ সেরে ফেলব তা হলে। কিন্তু দেখবেন স্যার, টি-এ যেন তিনটে দিন বাড়িয়ে নেবেন।

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ কলকাতায় ফিরে তিনটে দিন ঘাপটি মেরে বসে থাকব, আপিস না গেলেই হল।

বলেই কেউ শুনতে পেল কিনা দেখবার জন্যে ফিরে তাকালেন। ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল, শিখিনীও একটা রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তবে ক্যাপিটেলের দিকে নয়। মন্দিরের দিকে।

পুজো-পাগল মেয়ে এই শিখিনী। এদিকে পুরোদস্তুর আপ-টু-ডেট, পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাব আধুনিক। কিন্তু প্রায়ই ছোটে মন্দিরে পুজো দিতে। চ্যাঙারি ভর্তি প্রসাদ নিয়ে এসে বিতরণ করে হোটেলের সকলকে।

নাঃ, মোহান্তি সাহেবের কাছে ওর চাকরির কথাটা পাড়লে ভালই হত ভাবলেন শিবনাথবাবু। এত পুজোআর্চা নিশ্চয় চাকরির জন্যেই। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, শিখিনীর কথা মোহান্তিকে বলবেন কখন! নিজের কথাই যে বলতে পারেননি এখনও। একটা নতুন অর্ডারের জন্য ধরতে হবে, দু-তিনটে পাখা মেরামতের পরও টিকটিক করছে, সেগুলোকে ও-কে করাতে হবে, আর গতবারের অর্ডারের শেষ লটের বিলটাও যাতে তাড়াতাড়ি পাশ হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এত সবের পর কি শিখিনীর কথা বলা যায়? নিজের কিছু বলবার না থাকলে অবশ্য শিখিনীর একটা ব্যবস্থা তিনি করিয়ে দিতেন মোহান্তি সাহেবকে বলে।

শিখিনী নিজেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, মোহান্তি সাহেবকে বলবার সুযোগই পায়নি! শিবনাথবাবুকেও বহুবার মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশাভরসা ছেড়েই দিয়েছে বোধ হয়।

আশাভরসা অবশ্য সুপ্রিয়ও ছেড়ে দিয়েছিল। কোনারক যাবার আশাভরসা।

প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল ও। আট দশজন প্যাসেঞ্জার জোগাড় করতে পারলেই একটা স্টেশন ওয়াগন ভাড়া পাওয়া যায়। যাতায়াত মাথাপিছু দশ টাকা।

রুমারা চারজন, সুপ্রিয় নিজে, তাছাড়া শিখিনী, রমণীবাবু—সাতজন ঠিকই ছিল। রাজি করাতে পারেনি শুধু শিবনাথবাবু এবং ভট্‌চাজ দম্পতিকে।

তাই রুমা যখন তাগাদা দিয়েছিল, সুপ্রিয় বলেছিল, আর একজন কেউ আসুক, তা হলেই যাওয়া যাবে!

প্রফেসর ঘোষ আসার পর সেই সমস্যাটা দূর হয়েছে—এ কথা রুমা মনে পড়িয়ে দিতেই সুপ্রিয় বুঝল, সমস্যাটা আসলে বেড়ে গেছে।

কারণ ভাড়ার টাকাটা যাতে মাথা পিছু দশ টাকার বেশি না পড়ে তাই আরও একজন চেয়েছিল সুপ্রিয়। বিশেষ-জন তো চায়নি। আর প্রফেসর ঘোষই যদি যান, তাহলে আর সুপ্রিয়র কি লাভ কোনারক গিয়ে।

মনে মনে নানারকম হিসেবনিকেশ করে রেখেছিল সুপ্রিয়। শ্রীলেখাদেবী আর রুমার বাবা নিশ্চয় কোনারক মন্দিরের চূড়ায় উঠবেন না। রমণীবাবু বুড়ো মানুষ, চোখে দেখে না ভাল করে, দু-পাক দিয়েই থেমে পড়বে কিংবা নেমে পড়বে। এক শিখিনী, তা সে অন্য জাত। তাকেও লজ্জা নেই। আর রেশম ? শ্রীলেখাদেবীর যেমন ছেলে-অন্ত প্রাণ, রেশমকে নিশ্চয়ই ওপরে উঠতে দেবেন না, পাছে পা পিছলে পড়ে যায়।

সুতরাং কোনারক মন্দিরের চূড়ায় শুধু সুপ্রিয় আর রুমা, রুমা আর সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় তখন বলবে...রুমা উত্তর দেবে...। সুপ্রিয় অভিমান দেখাবে...রুমা অভিমান ভাঙাবে। সুপ্রিয় চূড়া থেকে লাফ দিতে যাবে, আর রুমা দু-হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলবে...। কান্নায় দু-চোখ ভেসে যাবে রুমার। আর সুপ্রিয়ও তখন তাকে আলিঙ্গন করে বলবে...ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু কল্পনা করে রেখেছিল সুপ্রিয়।

কিন্তু প্রফেসর ঘোষ সঙ্গে যাবেন শুনেই তার সব উৎসাহ উবে গেল। কারণ, এই কাঠখোট্টা চেহারার, অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান চেহারার মানুষটার যখন শিল্পটিল্প নিয়ে এত আগ্রহ, ও চূড়া পর্যন্ত উঠবেই। আর শুধু তাই নয়, এ সব সম্পর্কে লেকচারও দেবে অনর্গল। লেকচারকে সুপ্রিয়র ভয় নয়, না শুনলেই হল। কিন্তু সে না শুনলে কি হবে, রুমা নিশ্চয়ই শুনবে, আর যতই শুনবে ততই ভাববে না-জানি কত পণ্ডিত ওই প্রফেসর ঘোষ। মেয়েগুলোও এমন বোকা, তিনখানা বই মুখস্থ করেছে হয়তো কেউ, অমনি তাকে পণ্ডিত ভেবে বসবে। ইচ্ছে থাকলে কি সুপ্রিয়ও মুখস্থ করতে পারত না দু-চারখানা বই। ছোটবেলায় মুখস্থ করেনি সেই রবীন্দ্রনাথের : আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে ঢুকিল প্রাণের ভিতর।

চোখ বুজে এমনি সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন অস্ফুটে কবিতাটা গুনগুন করে উচ্চারণ করে ফেলেছে সুপ্রিয়, সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি।

চমকে ফিরে তাকাল সুপ্রিয়। দেখলে চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে রুমা দাঁড়িয়ে হাসছে।

—হাসছ যে ! রীতিমত উষ্মা তার কথায়।

রুমা আরও হেসে বললে, কবিতা আবৃত্তি করছেন অথচ...

রুমার কথা শেষ হওয়ার আগেই কপট ক্রোধে তাকাল সুপ্রিয়, রুমার মুখের দিকে। বললে, আবার ?

রুমা ফিক করে হাসল। —বেশ, বেশ। করছেন নয়, করছ !

এবার খুশি হল সুপ্রিয়। প্রশ্ন করলে, আবৃত্তি ভুল হয়েছে ?

রুমা হঠাৎ কথার সুতো ছিঁড়ে দিয়ে বললে, এই ! কোনারক যাওয়ার কি হল ? তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। তখন তো রোজ তাড়া দিচ্ছিলে।

সুপ্রিয় কিন্তু কিন্তু করে বলল, আরেকজন না হলে....

বাঃ রে, আরেকজন তো হয়েই গেছে। প্রফেসর ঘোষ তো যাবেন বলেছেন।

প্রফেসর ঘোষ ! নামটা শুনলেই সারা শরীর চিড়বিড় করে ওঠে সুপ্রিয়র।

রেগে গিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়। তার আগেই দাঁতে পাইপ চেপে গলায় মাফলার জড়িয়ে রুমার বাবা এসে হাজির হলেন। —তা হলে কবে ঠিক করা হল, কোনারক ?

সুপ্রিয় বয়সে রেশমের মাসতুতো দাদা পশমের চেয়েও ছোট, এ-কথা একবার শ্রীলেখাদেবী যদিও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও সরাসরি তাকে তুমি বলতে বাধে মিস্টার সেনের। আবার 'আপনি' বলতেও ভয়, পাছে রুমা গিয়ে চুকলি কাটে তার মায়ের কাছে, আর শ্রীলেখাদেবী নাক কুঁচকে 'লজ্জা করে না' গোছের কিছু একটা বলে বসেন।

এই জন্যেই যথাসম্ভব ভাববাচ্যে কাজ সারেন মিস্টার সেন। সেদিন সারা সন্ধেটা যে-ভাবে বার বার বলেছিলেন, 'এবার খেলার খবরটা শোনা যাক' কিংবা 'লিডারটা পড়া হোক', সেইভাবেই বললেন, 'তা হলে কবে ঠিক করা হল, কোনারক ?'

সুতরাং আপত্তি টিকল না সুপ্রিয়র। বেরিয়ে পড়তে হল ট্যাক্সির খোঁজে।

ট্যাক্সি বলতে একটাই স্টেশন-ওয়াগন। আট দশটা লোক ঠাসাঠাসি করে বসে, ড্রাইভারের পাশে একজন মিস্ত্রি। কারণ ট্যাক্সিটাও নড়বড়ে, পথও যেতে আসতে একশো মাইলের বেশি। আর তাও প্রথম দিকে পিচঢালা হলেও পরে রাস্তা আর মাঠ এক এক জায়গায় একাকার। মাঝে মাঝে আবার রাস্তা কেটে ওদিকের চাষের খেতের জল এদিকে পার করানো হয়েছে। কোথাও বা নদীর ওপর কাঠের পুল।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে গিয়ে ট্যাক্সিটা দেখতে পেল সুপ্রিয়, কিন্তু ড্রাইভারের পাত্তা নেই। দু-পাঁচজনকে জিগ্যেস করে শেষ অবধি লোকটাকে পাকড়াও করলে একটা ভাতের হোটেলে। হোটেল নয়, আসলে মিষ্টির দোকান একটা। দুপুরবেলায় ভাত খেতে আসে ড্রাইভার মিস্ত্রি ধরনের কিছু লোক।

তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরের দিন সকালে পান্থপাদপে হাজির হবার ব্যবস্থা করে সুপ্রিয় যখন ফিরল তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

সুপ্রিয় ফিরে আসতেই রমণীবাবু ছুটে এলেন। —আরে মশাই, আপনাকে তখন থেকে গরুখোঁজা খুঁজছি।

হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে মিসেস ভট্‌চাজের সঙ্গে কথা বলছিল রুমা। রমণীবাবুর কথাটা কানে যেতেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর তা শুনে সুপ্রিয় বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল, গরুর মত খুঁজলে পাবেন কি করে। আমি তো আপনাদের জন্যে কোনারকের ট্যাক্সি ঠিক করতে গিয়েছিলাম।

—আর কোনারক! গালাগালটা গায়ে মাখলেন না রমণীবাবু। বললেন, এদিকে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে মশাই।

—কি হল আবার ? সুপ্রিয় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রমণীবাবুর চশমার ঘসা কাচের আড়ালের অস্পষ্ট চোখ দুটির দিকে।

রমণীবাবু মুখটা সুপ্রিয়র কানের কাছে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, পুলিস, পুলিস।

—পুলিস ? দুর্বোধ বিস্ময়ে তাকাল সুপ্রিয়।

রমণীবাবু চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। দু দুবার এসেছিল আপনার খোঁজে।

—আমার খোঁজে ? ভয়টা যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে সুপ্রিয় আবার জিগ্যেস করল। যেন ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

রমণীবাবু বললেন, কি জানি কি ব্যাপার। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে তখন, মচমচ শব্দ শুনে উঠে এসে দেখি পুলিস। আপানার খোঁজ করলে। বললাম, নেই তিনি, বেরিয়ে গেছেন। তা সে হাজার প্রশ্ন। চলে গেল, ভাবলাম চলেই গেল। তা নয়, ঘণ্টাখানেক পরেই আবার ফিরে এল। আর সে কি চোটপাট। ফিরে এলেই আপনাকে থানায় যেতে বলেছে।

—থানা ? সুপ্রিয়ও এবার চাপা গলায় বললে, পাছে থানা পুলিস ইত্যাদি কথাগুলো রুমার কানে যায়।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সুপ্রিয় ফিসফিস করে আবার জিগ্যেস করল, কেন খোঁজ করছিল জেনে নিলেন না ?

—জেনে নেব কি মশাই, জানতে চাওয়াতেই তো খেঁকিয়ে উঠল ?

—খেঁকিয়ে উঠল ? কেন বলুন তো ? কেমন যেন বিমর্ষ দেখাল সুপ্রিয়কে। বেচারার গলা শুকিয়ে এল, পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল।

নিজের ঘরে এসে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ল সে। তারপরই আবার উঠে দাঁড়াল। কি জানি, যেতে দেরি হচ্ছে দেখে দারোগা নিজেই যদি আবার এসে পড়ে। ছি ছি, রুমার সামনে, মাসিমার সামনে, এতগুলো বোর্ডারের সামনে কি লজ্জাতেই না পড়বে সুপ্রিয়!

হুঁ, নির্ঘাত সেই জন্যেই। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা কে জানত।

গতকাল সকালে ক্যাপিটেলের দিকে গিয়েছিল সে দু-টিন সিগারেট কিনে আনতে। আর সেই সময় বচসা হয়েছিল দোকানির সঙ্গে। লোকটা অবশ্য শাসিয়েছিল ওকে, কিন্তু সেটা যে এতদূর গড়াবে......

হ্যাঁ, নির্ঘাত সেই জন্যেই।

ট্যাক্সির খবরটা সকলকে জানিয়ে দিয়েই থানার উদ্দেশে ছুটল সুপ্রিয়।

সন্ধেবেলায় ফিরে এসেই শিবনাথবাবু হাঁক পাড়লেন, ও হিমাদ্রিবাবু, হিমাদ্রিবাবু!

হোটেলের অনেকেই তখন বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন, নিঃঝুম হয়ে আছে এদিকটা। শুধু ওদিকে চিকের আড়াল দেওয়া হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে রেডিওয় বাংলা গান।

রেডিওটা আসলে চালানো হয় বেলু কিংবা বেলুর মায়ের মর্জিমত। শুধু নতুন বোর্ডার এলে একবার চালিয়ে দেন হিমাদ্রিবাবু। আগন্তুকদের খুশি করার জন্য। তবে পুরনো বোর্ডারদের কেউ অনুরোধ করলে যে খুলে দেন না রেডিওটা, এমন নয়।

রেডিওতে গান হচ্ছিল বলেই হয়তো শিবনাথবাবুর ডাকটা ওদিকে গিয়ে পৌঁছল না। আর পৌঁছল না বলেই শিবনাথবাবু ডাক ছাড়লেন যৌতুকীর উদ্দেশে।

সজাগ কান যৌতুকীর, সাড়া দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে। —যাউছি বাবু। যাউছি।

কালোকুলো উল্কি-আঁকা মুখটা তুলে তাকাল সে দোতলার বারান্দার দিকে, সাদা সাদা দাঁতের হাসি দেখা গেল আবছা অন্ধকারেও।

শিবনাথবাবু বললেন, বাবুকে পাঠিয়ে দে যৌতুকী। হিসেব মিটিয়ে নেবে, কাল সকালের ট্রেনে চলে যাব আমরা।

—চলি যিব ? যৌতুকীর গলার স্বরে কেমন একটা বেদনার্ত ভাব ফুটে উঠল। পরমুহূর্তে সে হিমাদ্রিবাবুকে গিয়ে খবরটা দিয়ে এল।

এসে দাঁড়াল শিবনাথবাবুর ঘরে।

শিবনাথবাবু ততক্ষণে নিজের ঘরে এসে হিসেব কষতে বসেছেন।

যৌতুকী বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, আর দুটো দিন রহিবনি ?

—উঁহু। ঠোঁট ফাঁক না করে শুধু নাকের ভেতর দিয়েই জবাব দিলেন শিবনাথবাবু। একটু থেমে বললেন, আবার নতুন লোক আসবে, দুঃখ কিসের!

বললেন, কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলেন যৌতুকীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে। তার মুখের দিকে, চোখের দিকে ফিরে তাকালেন। কি আশ্চর্য! যৌতুকীর চোখ দুটো কেমন যেন ছলছল করছে!

হোটেলের ঝি, কত লোক আসছে যাচ্ছে, নিত্য নতুন লোকের আগমন—তবু কিনা তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে কেউ চলে যাবে শুনলেই।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন শিবনাথবাবু, তার আগেই হিমাদ্রিবাবু খাতাপত্র নিয়ে হাজির হলেন।

বললেন, এর মধ্যেই চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ। কাজ তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চলে যাব শুনে আপনার যৌতুকীর যে চোখ ছলছল করে উঠল!

বলে যৌতুকীর মুখের দিকে সহাস্যে তাকালেন শিবনাথবাবু, আর যৌতুকী সঙ্গে সঙ্গে তার ময়লা শাড়ির প্রান্তটা চোখে ঘষতে ঘষতে হেসে পালাল। হাসি তো নয়, দুঃখ চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

হিমাদ্রিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সাংঘাতিক মায়া ওর বোর্ডারদের ওপর।

শিবনাথবাবু হাসলেন। —শুধু ওর ওপর মায়া দেখাবার কেউ নেই।

কথাটা নিছক কথার কথা, কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হিমাদ্রিবাবু ভাবলেন, তাঁর ওপর বুঝিবা কটাক্ষ করছেন শিবনাথবাবু। তাই উত্তর না দিয়ে খাতা খুলে হিসেব মেলাতে বসলেন।

খানিক পরেই টাকাকড়ি নিয়ে রসিদ দিয়ে চলে গেলেন তিনি, আর শিবনাথবাবু বললেন, ওঠো মিস্ত্রি, গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও, সকালে সময় পাবে না।

বলে, নিজেও সুটকেস গোছাতে লাগলেন। চিরুনি, আয়না, টুথপেস্ট, জুতোর কালি, ব্রাশ, টুকিটাকি।

সব গোছানোর পর হঠাৎ খেয়াল হল, বললেন, আমার ভিজিটিং কার্ড ?

সুটকেস খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, বিছানাটার তলা, পোর্টফোলিও।

শেষ পর্যন্ত সুটকেসের এক কোণেই পাওয়া গেল প্যাকেটটা।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মনে মনে কি যেন হিসেব করলেন। হিমাদ্রিবাবু, মিস্টার সেন, আট নম্বরের রমণীবাবু, ন-নম্বরের সুপ্রিয়বাবু এবং প্রোফেসর ঘোষ। দশ নম্বরে মিস্টার ভট্টাচার্য, তেরো নম্বরে শিখিনী।

গুনে গুনে সাতটা কার্ড বের করলেন প্যাকেট থেকে। আইভরি কার্ডে সুন্দর অক্ষরে ছাপা নিজের নামটা পড়লেন একবার। নীচের লাইনটাও—সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেণ্টেটিভ, রোজলার ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, তারপর ঠিকানা, ফোন নম্বর।

গোছগাছ সেরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন শিবনাথবাবু। বুড়ির দাঁত খিঁচুনির জন্যেও হতে পারে, কিংবা টাইপ করার মত চিঠিপত্র আর ছিল না বলেও হতে পারে।

উঠলেন একেবারে ভোরবেলায়। টুথব্রাশ ঘষলেম দাঁতে, মুখ ধুলেন, এ-ও-তা কাজ সারলেন, তারপর হোল্‌ড়-অল বিছিয়ে বিছানা বাঁধতে শুরু করলেন।

তৈরি হতে হতেই রোদ উঠল, আর অন্যান্য বোর্ডাররাও।

চা নিয়ে এসে হাজির হল চৈতন্য। ঠাকুরচাকরগুলো ছুতোনাতা করে একবার দেখা দিয়ে গেল। সবাই উদ্‌গ্রীব, যাতে পান থেকে চুন না খসে। সবারই চেষ্টা শিবনাথবাবুকে খুশি করার।

মনে মনে হাসলেন শিবনাথবাবু। সারা জীবন হোটেলে হোটেলে কাটল আর এটুকু বুঝবেন না।

আসলে সবাই মুখ দেখিয়ে যাচ্ছে, যাতে বকশিসটা না বাদ পড়ে যায় তার ভাগ্যে।

হাতঘড়িটা একবার দেখলেন শিবনাথবাবু।

হ্যাঁ, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই।

সুলোচনকে রিক্‌শা ডাকতে বলে বেরিয়ে এলেন। পকেট থেকে গুনে গুনে সাতখানা ভিজিটিং কার্ড বের করলেন।

তারপর হঠাৎ মুখে অদ্ভুত একটা মিষ্টি অমায়িক হাসি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার সেনের ঘরের সামনে।

দরজা বন্ধ ছিল। টুকটুক করে কপাটে তর্জনীর গাঁট ঠুকে আওয়াজ করে ডাকলেন ধীরে ধীরে। —মিস্টার সেন!

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার সেন।

শিবনাথবাবু হাত দুটো জুড়ে নমস্কার করলেন, কিন্তু মিস্টার সেনের হাতে চায়ের পেয়ালা থাকায় নমস্কার করতে না পেরে একটু নড় করলেন তিনি।

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, ভাল করে আলাপই হল না আপনার সঙ্গে, আজ চলে যাচ্ছি।

—তাই নাকি! কোথায় যাচ্ছেন এখন? পুরী?

শিবনাথবাবু হাসলেন। —না, বেড়ানোর সময় কি আর আমাদের হবে কখনও। কাজ, কাজ আর কাজ। এই তো এসেছিলাম, গভর্নমেন্টকে আশিটা ফ্যান সাপ্লাই করেছিলাম তাই...বাই দি বাই, রোজলারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? রোজলার ফ্যান? আমি তার সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ। তা আপনার যদি কখনও ফ্যানট্যানের দরকার হয়......

বলে একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। —আমার ঠিকানাটা বরং রেখে দিন, ফ্যান তো আপনার কখনও না কখনও লাগবেই...

ছ-নম্বর থেকে বেরিয়ে আট নম্বরে রমণীবাবুকে একখানা কার্ড দিয়ে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকলেন শিবনাথবাবু। একখানা কার্ড দিলেন সুপ্রিয়কে, আরেকখানা প্রফেসর ঘোষকে।

তারপর প্রফেসর ঘোষকে উদ্দেশ করে বললেন, চললাম স্যার, মনে রাখবেন নামটা। কলকাতায় গিয়ে দেখা করব একদিন।

—কেন বলুন তো? বুঝতে না পেরে প্রফেসর ঘোষ জিগ্যেস করলেন।

শিবনাথবাবু হাসলেন। —তা দেখুন এখানে যখন আত্মীয়তাই হয়ে গেছে, তখন আপনার রেকমেনডেশনে যদি উপকার হয়...মানে কলেজে-টলেজে পাখা তো লাগেই, আর রোজলারের চেয়ে ভাল ফ্যানও যখন এদেশে হয় না...রোজলারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন...আপনি তো নিশ্চয়ই, সারা ভারতবর্ষের লোকও শুনেছে। যেখানেই যাই, দুটো নাম—গান্ধী আর রোজলার। রোজলার আর গান্ধী!

প্রফেসর ঘোষ হেসে ফেললেন। তারপর রেহাই পাবার জন্যে বললেন, বেশ, বেশ, যাবেন আপনি...তা হলে ঠিকানাটা আমার নিয়ে রাখুন...

হাত নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন শিবনাথবাবু। —কিচ্ছু দরকার নেই স্যার, আপনার আবার ঠিকানা! মখ্যুসুখ্য মানুষ আমরা, তা বলে আপনার পরিচয় জানি না ভাবছেন? প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, ইণ্ডিয়া লিখে চিঠি দিলে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

প্রফেসর ঘোষ খুশি হলেন। —তা কিন্তু মিথ্যে বলেননি। বিলেত থেকে চিঠি আসে মাঝে মাঝে, ক্যালকাটা লেখা...

আরও খানিকটা তোষামোদের ভাষা ব্যবহার করে উঠে এলেন শিবনাথবাবু। মনে মনে বললেন, ল্যাজ বাবা সবারই আছে। যত বড় পণ্ডিতই হও, চালাকই হও। একটু মোচড় দিলেই তিড়িং তিড়িং করে লাফ দেবে! বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন মনে মনে। তারপর...

না, দশ নম্বরে ঢুকতে হয় না। কারণ ততক্ষণে ভট্চাজ দম্পতি ছেলে টমকে বাঁদুরে টুপি জুতো মোজা পরিয়ে তৈরি হয়েছেন বেড়াতে যাওয়ার জন্যে। তাই বারান্দাতেই দেখা হয়ে যায়।

কার্ডটা ব্রজমাধব ভট্চাজকে দিয়ে বিদায় জানাতেই মিসেস ভট্চাজ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে বলে ওঠেন, কি কথা কন শিবনাথবাবু, আমাগো পথে বসাইয়া চইলা যাইবেন? বোর্ডারিগো সব ইউনাইট করা অইল না, হিমাদ্রিবাবুরে উচিত শিক্ষা দেওয়া

অইল না...

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, আপনি তো রইলেন, আপনি একাই একশো। তবে হ্যাঁ, হিমাদ্রিবাবুকে বোঝাবেন যে, হোটেলে মডার্ন এমেনিটিজ না দিলে, এই যেমন ফ্যান...

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন শিবনাথবাবু, কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পেলেন শিখিনী সেজেগুজে বেড়াতে বের হচ্ছে। তাই কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই ছুটলেন তিনি শিখিনীর দিকে।

আর শিবনাথবাবু চলে যেতেই টম বললে, বাবা, কি দিল তোমারে, কি দিল ও, কও না ?

—কিছু না তো ! ব্রজমাধব ভট্‌চাজ বিস্মিত হয়ে তাকালেন ছেলের দিকে।

—বাঃ রে। ওই যে দিল কি একটা ?

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তিনি, শিবনাথবাবুর দেওয়া ভিজিটিং কার্ডটা ছেলের হাতে দিলেন।

আর টম সেটা দেখে ফেরত দিয়ে ঠোঁট উল্‌টে বললে, ছাই। বাদল যাইবার দিনে সবারে লজেন্স দিয়া গেল, আমারে দুইটা দিল। আর এ লোকটা কেবল একটা কাগজ দিল ! ছাই !

শুনে হোহো করে হেসে উঠলেন ভট্‌চাজ দম্পতি।

ওদিকে তখন শিবনাথবাবু শিখিনীকে রোজলার কোম্পানির গুণগান শুনিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন।

যৌতুকী তৈরিই ছিল। রিক্‌শা এসে গেছে শুনেই বাক্স বিছানা কাঁধে নিয়ে নীচে নেমে গেল সে, পিছনে পিছনে শিবনাথবাবু আর মিস্ত্রি।

গাঁদা ফুলের বাগানের পাশটিতে দাঁড়িয়েছিলেন হিমাদ্রিবাবু।

শিবনাথবাবু তাঁকেও একটা কার্ড দিলেন, তারপর ঝি-চাকরদের বকশিস মিটিয়ে রিক্‌শায় চেপে বসলেন। পাশে মিস্ত্রি।

ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে রিক্‌শা চলতে শুরু করল, আর সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রিবাবু বললেন, আরেকটা দিন থেকে গেলেন না শিবনাথবাবু, গায়ত্রীদেবী তো আজকেই আসছেন, কলকাতার ট্রেনটা এলেই দেখা হয়ে যেত। এত বড় একজন ফিল্‌ম অ্যাকট্রেস...

শিবনাথবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। ফিরেও তাকালেন না একবার হোটেলের দিকে। সারা জীবন তো তিনি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ এখানে, কাল ওখানে। কোনওদিন ফিরে তাকাননি। ফিরে তাকানো তাঁর স্বভাব নয়। দু-দিনের জন্যে আসা, তার ওপর মায়া-মমতা দেখাতে গেলে স্বভাবটাকে বদলাতে হয়। আর স্বভাবই যদি বদলানো যাবে, তা হলে তো কবে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসে পড়তেন। রোজলার পাখার মত বনবন করে ঘুরতেন না কেবল।

যৌতুকীর মত কার্বন পুড়ে গেছে যাদের তারাই থেমে থাকতে পারে, পড়ে থাকতে পারে।

শিবনাথবাবুর রিক্‌শা স্টেশনের পথ ধরতে না ধরতে কোনারক যাবার ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে শুরু করল।

এত তাড়াতাড়ি আসবার কথা নয়। কেউই তখনও তৈরি হয়নি। সাজপোশাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সকলে, আর তাড়া দিল ঠাকুর-চাকরদের, কারণ দুপুরের আহারটা কোনারকেই সারতে হবে বলে হোটেল থেকেই লুচি মাংস করে নিয়ে যাবার কথা।

ঠাকুর সাড়া দিয়ে জানাল লুচি ভাজা হচ্ছে। লুচি যে ভাজা হচ্ছে তা অবশ্য টের পাওয়া যাচ্ছিল ঘিয়ের গন্ধে।

শুধু সুপ্রিয় বললে, হ্যাঁ মশাই রমণীবাবু, গন্ধটা কেমন লাগছে যেন, বাদাম তেল দিয়ে ভাজছে নাকি। বনস্পতি বলে তো মনে হচ্ছে না।

রমণীবাবু হেসে বললেন, কত বয়স হল আপনার ?

—কেন বলুন তো ? বয়স কম বলেই বয়সের কথায় চটে গেল সুপ্রিয়।

রমণীবাবু বললেন, গন্ধটা পাচ্ছেন ওটাই খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ, আপনারা তো ঘি দেখেননি কিনা, তাই গন্ধটা খারাপ লাগে।

কথাটা প্রায় সত্যি বলেই সুপ্রিয় চটে গেল না, বললে, তা ঠিক। কত ভাল ভাল জিনিস খেয়েছেন আপনারা, বুড়োরা অনেক ভাগ্যবান।

বয়সটা একটু বেশি বলেই এবার রমণীবাবু চটে গেলেন বয়সের কথায়। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। মানুষকে কম বয়সে বয়স কম বললে চটে, বেশি বয়সে বয়স বেশি বললে চটে। তাই রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি আসবে তা তো বলেননি আপনি !

একা রমণীবাবু নয়, রুমা রেশম থেকে শিখিনী এবং প্রফেসর ঘোষ পর্যন্ত সকলেই একে একে ওই কথা বলে গেল। আর সুপ্রিয় বেরিয়ে গিয়ে ধমক দিল ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার অমায়িক হেসে বললে, এ তো আর রেলগাড়ি নয় দাদা যে সিটি বাজিয়ে ছেড়ে যাবে। এসেছি খবরটা দেবার জন্যে হর্ন দিচ্ছি। আপনারা রাইট-টাইমে বেরোবেন। তা ঘড়িটা দেখুন তো স্যার, কটা বাজল।

ঘড়ি ?

ড্রাইভারের কথা শুনে রিস্টের দিকে তাকিয়েও ছিল সুপ্রিয়। পরমুহূর্তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

গৌতমকে মনে পড়ে গেল, আর সেই সূত্রে থানা পুলিসের কথাও।

ফিরে এসে রমণীবাবুকে বললে, আপনার সেই দারোগার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—তাই নাকি। জিগ্যেস করতে ভুলেই গেছি। কি ব্যাপার বলুন তো। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন রমণীবাবু।

সুপ্রিয় হেসে বললে, এক ব্যাটা চোর ধরা পড়েছে, আমাদের সেই গৌতমবাবু কিনা দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল দারোগাটা।

—গৌতমবাবু নয় ?

সুপ্রিয় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুমারা বেরিয়ে পড়ল সদলবলে, সেজেগুজে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

শিখিনী, প্রফেসর ঘোষ, রমণীবাবু এবং সুপ্রিয়ও ঘরে চাবি লাগিয়ে একে একে এসে বসল ট্যাক্সি ওরফে স্টেশন ওয়াগনে। কারও হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, কারও কাঁধে ক্যামেরা। লুচি মাংসের টিফিন কেরিয়ার আর জলের কলসি দিয়ে গেল যৌতুকী।

আটজন বসবার মত জায়গা নেই গাড়িতে। কিন্তু সে কথা বলতেই চিৎকার করে উঠল ড্রাইভার। —দিনে দুটো করে শিফ্‌ট দিচ্ছি দশজন প্যাসেঞ্জার আর একজন মেরামত নিয়ে। বলেন কিনা আটজনের জায়গা হবে না। *ঠেসেঠুসে* বসুন না একটু, দুটো জার্ক দিলেই দেখবেন জায়গা হয়ে গেছে।

একেবারে পিছনের সিটে মিস্টার সেন বসেছিলেন সপরিবারে। এতক্ষণ একটা কথা বলেননি। পাইপ মুখে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মাফলারটা কান ঢেকে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে অলস্টারের বুকের ফোঁকরে গুঁজে দিয়ে তিনি এতক্ষণে গুছিয়ে বসে বললেন, জার্ক দিতে হবে না ইচ্ছে করে, যা গাড়ি তোমার, জার্ক দিতে দিতেই চলবে।

মাঝ রাস্তায় না খারাপ হয়ে যায়।

—সে ভয় করবেন না স্যার। ড্রাইভার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে বললে, পাশেই তো মেরামত বসে রয়েছে।

'মেরামত' যে মিস্ত্রির প্রতিশব্দ তা প্রথমটা বুঝতে পারেননি মিস্টার সেন। যখন বুঝতে পেরে লোকটার দিকে তাকাতে গেলেন তখন আর সে পাশে নেই। সেল্ফ্ স্টার্টারের ব্যাটারি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে তাকে তখন নেমে পড়তে হয়েছে হ্যাণ্ডল মারার জন্য।

তা দেখে হোহো করে হেসে উঠল রেশম। বললে, এই রে, স্টার্ট নিচ্ছে না।

ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল, চেষ্টা করছিল স্টার্ট ধরাবার জন্য, রেশমের হাসি শুনে খেপে গেল সে। বললে, ঠাণ্ডায় মানুষ জমে যাচ্ছে, আর মোটর জমে যাবে না। দেখুন না...

বলতে বলতেই ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে স্টার্ট নিল ট্যাক্সিটা, এবং পরমুহূর্তেই পিচ-ঢালা পুরী রোড ধরে ছুটতে শুরু করল।

আঃ। উল্লাস দেখা দিল সবারই মুখে-চোখে।

ঠাণ্ডা হাওয়া। দূরে সূর্য উঠেছে, দু-পাশে কেয়ার ঝোপ, বেত ঝোপ। বেতের স্ফুলিঙ্গ ঝোপের মাথা থেকে উঠে নুয়ে পড়ছে প্রণতা নর্তকীর ভঙ্গিতে। রাস্তার ধারে সারি সারি মহানিম আর নাক্সভমিকার গাছ। নিমগাছে নতুন পাতা—লালচে কচি পাতা সিরসির করে কাঁপছে। সকালবেলাকার রোদ লেগে মেটে রঙের পাতাগুলো মনে হচ্ছে যেন কোনও অচেনা ফুলের গুচ্ছ। দূরে ক্রমশ পিছনে সরে যাচ্ছে লিঙ্গরাজের মন্দির। পথের দু-ধারে কলাইয়ের খেত, ধানখেত।

মাঝখানের সিটের একপ্রান্তে, জানালার ধারটিতে বসেছে শিখিনী, তার পাশে প্রফেসর ঘোষ। তারপর রমণীবাবু, সুপ্রিয়।

হঠাৎ গলা খুলে গান শুরু করল সুপ্রিয়, সুরে সুর মেলাল রেশম। রুমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, কারণ সুরটা তার জানা কিন্তু সিনেমার ডুয়েটের মত শোনাবে এই ভয়ে চুপচাপ শুধু মুচকি মুচকি হাসল সে।

দীর্ঘ পথ। ট্যাক্সি ছুটছে পিচের রাস্তা ধরে। পিচের রাস্তা থেকে লাল ধুলোর রাস্তায় বাঁক নিল এবার। এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলল। কখনও রাস্তা বেয়ে, কখনও রাস্তা থেকে নেমে মেঠো পথ পার হয়ে।

ট্যাক্সিটা হঠাৎ স্পিড কমিয়ে দিতেই গান থেমে গেল।

রাস্তার মাঝখানের খানিকটা কেটে ওপাশের খেতের জল এদিকে খেতে পার করা হয়েছে।

ট্যাক্সি নামল মাঠের ওপর, জলকাদা ডিঙিয়ে আবার উঠল পাকা রাস্তায়।

ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে সিরসির করে। দু-ধারে বড় বড় গাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা ঝাউ। তারই ফাঁক দিয়ে মিষ্টি রোদ উঁকি দিচ্ছে।

সবাই চুপচাপ

মিস্টার সেন নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, কি রাস্তা রে বাবা।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, এখন তো তবু রাস্তা ভাল হয়েছে, আগেরবার যা দেখেছিলাম।

রুমা জিগ্যেস করলে, আপনি প্রায়ই আসেন বুঝি!

তা কয়েকবারই এসেছি। প্রফেসর ঘোষ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন।

রমণীবাবু তোষামোদের ভঙ্গিতে বললেন—তা হলে তো রাস্তা-ঘাট আপনার চেনা।

তা নিমাপাড়া না কি বলছিলেন হিমাদ্রিবাবু, সে কদ্দূর মশাই।

ড্রাইভার শুনতে পেয়ে বললে, নিমাপাড়ার বাজার তো সামনেই, রসগোল্লা কিনে নেবেন।

রসগোল্লা? এখানে রসগোল্লা? রেশম খবরটা জানত না বলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।

ড্রাইভার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ফাস্ট ক্লাশ। এক আনায় এই এত বড় বড়।

মিস্টার সেন বললেন, তুমি বাবু সাইজ দেখাবার জন্যে স্টিয়ারিং ছেড়ো না, যা রাস্তাঘাট...

রমণীবাবু দেখলেন আলোচনার বিষয়টা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে, তাই বলে উঠলেন—হিমাদ্রিবাবুও বলছিলেন, এখনও নাকি নিমাপাড়ায় টাকায় আট সের দুধ।

শ্রীলেখাদেবী এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার রুমার কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, তা হলে পাঁচ টাকার রসগোল্লা নিয়ে যেতে বল না।

অর্থাৎ মিস্টার সেনকে বলতে বললেন। কারণ তাঁর পাশে বসেছিল রুমা, তারপর রেশম, তারপর মিস্টার সেন।

রুমা নাক সিঁটকে বললে, কি যে বলো! কোথায় কোনারক দেখতে যাচ্ছি, এখন রসগোল্লা।

রমণীবাবুর কথাটা শিখিনীর কানেও গিয়েছিল। সে বললে, স্রিপ রসগুল্লা? পেড়া, লাড্ডু মিলবে না?

প্রশ্নটা বিশেষ কারও উদ্দেশে নয় বলেই কেউ উত্তর দিল না।

শুধু রমণীবাবু বললেন, ড্রাইভার নিমাপাড়ায় থেমো একবার। ছেলেটার জন্যে দুটো রসগোল্লা নিয়ে যাব।

ড্রাইভার এ-কথার কোনও উত্তর দিল না, কারণ ততক্ষণে ট্যাক্সিটা একটা বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু-পাশে দোকানের সারি। সবই মিষ্টির দোকান। প্রতিটি দোকানের সামনে বড় বড় উনোন। উনোনে বড় বড় কড়াই আর কড়াইয়ে মণ মণ দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে।

ট্যাক্সি থামিয়েই ড্রাইভার আর 'মেরামত' বললে, নিমাপাড়া। রসগোল্লা নিয়ে নিন আপনারা।

তারপর তারা চলে গেল কোথায় যেন। বোধহয় জলযোগ করতে।

একে একে সকলেই নামল। কেউ আট আনার, কেউ চার আনার রসগোল্লা নিল।

শিখিনী বললে, পেড়া নেই? লাড্ডু? কুছ নেই? স্রিফ রসগুল্লা?

মিস্টার সেন সপরিবারে এসে দাঁড়ালেন দোকানের সামনে।

বললেন, পাঁচ টাকার রসগোল্লা দাও।

দোকানদার হাঁ করে তাকাল মিস্টার সেনের মুখের দিকে। তারপর বললে, বাবু, পাঁচো টঙ্কার পাত্রো নাই অছি।

শেষ পর্যন্ত দু-টাকার নিলেন ওঁরা। ভাবতেই পারেননি এক আনায় এত বড় বড় রসগোল্লা। ওরই মধ্যে রমণীবাবু গোটা চারেক খেয়ে নিলেন আর হাঁড়িতে ছেলেটার নাম করে কিছু নিয়ে নিলেন।

একে একে গাড়িতে এসে উঠলেন সকলে। ড্রাইভার আর মেরামতও।

ট্যাক্সি আবার ছুটতে শুরু করলে রমণীবাবু বললেন, তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু, এক আনায় এত বড় রসগোল্লা?

সুপ্রিয় বললে, রাজভোগ বলুন।

রুমা বললে, সম্রাটভোগ।

শ্রীলেখাদেবী বললেন, দুধ এত শস্তা যখন ঘি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিলে হত।

রসগোল্লার আলোচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল ধুলোর রাস্তা ছেড়ে এবার কাঁচা মাটির রাস্তায় নামল ট্যাক্সি। তারপর টলতে টলতে উঁচুনিচু মেঠো পথ বেয়ে একটা নদীর ধারে।

সামনে তাকিয়ে সবাই আঁতকে উঠল। এ আবার কেমন পুল। রাস্তা থেকে বড় জোর দু-হাত উঁচু লেভেলে শালবল্লি দিয়ে বানানো একটা পুল নদীর ওপর। দু-পাশে তার কোনও রেলিং নেই, দু-পাশই খোলা। এমনিতেই মনে হয় ট্যাক্সির চাকা বুঝি জল ছুঁয়ে যাবে তার ওপর একটু বেচাল হলেই একেবারে নদীগর্ভে।

গাড়ির ভারে পুলটা যেন নড়ে উঠল।

আর রেশম হেসে হাততালি দিল। —এ কি ব্রিজ রে বাবা।

রুমা বললে, সাবধানে ড্রাইভার।

সাবধান সে এমনিতেই। শাল কাঠের সরু পুল, কোনওরকমে একটা গাড়ি পার হতে পারে।

রমণীবাবু তাঁর রসগোল্লার হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বসলেন। মনে হল একটু যেন ভয় পেয়েছেন। কিন্তু নিজের জীবনের চেয়েও বোধহয় হাঁড়িটা হারাবার ভয়ই তাঁর বেশি।

শিখিনী জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে জল ছোঁবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

সুপ্রিয় বেপরোয়া ভাব দেখাল, বোধ হয় রুমার কাছে নিজেকে দুঃসাহসী হিরো প্রতিপন্ন করার জন্যেই বললে, স্পিড বাড়াও ড্রাইভার, স্পিড বাড়াও।

শ্রীলেখাদেবী বললেন, চুপ করো সুপ্রিয়। এখন বেচারিকে ঘাবড়ে দিয়ো না।

ঘাবড়ে যাবার লোক অবশ্য নয় ড্রাইভার। কতবার তো সে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এ পুল পারাপার করেছে। তাই মেরামতের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল সে।

পুল পার হয়ে দুপাশে ঘন ঝোপ। মাটি ক্রমশ বালিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এবার মসৃণ উঁচু রাস্তা। সিধে চলে গেছে অনেক দূর অবধি। রাস্তার দুপাশে ঝাউ গাছ, আকাশচুম্বী বড় বড় ঝাউ।

রেশম গোল গোল বড় বড় চোখ করে তাকাল রুমার মুখের দিকে।

বললে, দিদি! দিদি! কত বড় বড় ঝাউ দেখ্‌।

রুমারও বিস্ময়ের সীমা নেই। কলকাতায় রুমা তার কলেজের এক বান্ধবীর বাড়িতে ঝাউগাছ দেখেছে বটে, কিন্তু সে তো ছোট ছোট। আর এখানে অযত্নে বালির ওপর এত বড় বড় ঝাউ? সারি সারি অসংখ্য ঝাউ।

মনটা ফুর্তিতে নেচে উঠল। কি সুন্দর, কি সুন্দর! উঁচুনিচু বালির ঢেউ, বালি আর বালি। তার ওপর ঝাউয়ের শাখা দুলছে হাওয়ায়। যেন চামর দোলাচ্ছে কেউ।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সুপ্রিয়। —কোনারক! কোনারক!

ছবিতে দেখা সেই মন্দিরটা অনেক দূর থেকে দেখা গেল। একেবারে নাকের সোজা! রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে মন্দিরের গায়ে।

একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, একটু একটু করে মন্দিরটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালো, ঘন কালো রঙের অপূর্ব সুন্দর একটি মন্দির।

রুদ্ধশ্বাসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। যেন এক গুপ্তধনের সুড়ঙ্গপথে এসে দাঁড়িয়েছে তারা, এখনই সরে যাবে বদ্ধ কপাট।

নির্জন রাস্তা পেয়ে স্পিড বেড়ে গেছে ট্যাক্সির।

আর পাঁচ মিনিট, তিন মিনিট, দুই, এক...একেবারে মন্দিরের পাঁচিলের গায়ে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি।

নামল সকলে।

পাশেই একটা চায়ের দোকান। চিকের দেয়াল, টিনের ছাদ।

আশেপাশে জনকয়েক লোক বসে আছে কাঁদি কাঁদি ডাব নিয়ে।

—এই শীতে ডাব কে খাবে রে বাবা! রেশম হেসে উঠে বললে।

প্রফেসর ঘোষ কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে নেমে পড়লেন। তা দেখে বুকের ভেতরটা জ্বলে গেল সুপ্রিয়র। ব্যাটা গৌতম ক্যামেরাটা চুরি না করলে আজ রুমার গোটাকয়েক ছবি তো তুলতে পারত সে!

দল বেঁধে সকলে ছুটে গেল মন্দিরের দিকে। এত এত প্রশস্তি পড়েছে কাগজে কাগজে, ছবি দেখেছে...এবার নিজের চোখে দেখতে হবে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে মাঝপথ থেকেই ফিরে এলেন রমণীবাবু।

—দূর দূর, এর জন্য এতদূর আসা? ওই একই, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজও যা, এও তাই। চেহারাটা অন্যরকম, এই যা।

বলেই ফিরে এসে ট্যাক্সিতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন রমণীবাবু। ড্রাইভারকে বললেন দশটা টাকা ঠকিয়ে নিলে বাবা, এর জন্য এতদূর আসার কোনও মানে হয়!

শিখিনী এদিকে মন্দিরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। যাকে দেখে তাকেই জিগ্যেস করে ভেতরে যাবার রাস্তা কোন্‌টা।

একজন গাইড় জুটে গেল। মন্দির সারানোর কাজ দেখছিল ওভারসিয়র গোছের একটা লোক। খাকি কুর্তা গায়ে।

সমস্ত দলকে সঙ্গে করে মন্দিরের ভেতরে একজায়গায় নিয়ে গেল সে। কিন্তু ভেতরে তো কিছু নেই, পাথর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শিখিনী হতাশ হয়ে বললে, শিউজি নেই। পূজা চড়াবার কুছ নেই। তো এ কোন কিসমের মন্দির বাবুজি।

খানিকটা ঘুরে সেও ট্যাক্সিতে ফিরে গেল। গিয়ে রমণীবাবুকে বললে, শিউজি নেই, পার্বতী নেই, এ কোন মন্দির বাবুজি।

বাকি দল তখন গাইডের পিছনে পিছনে চলেছে মন্দির চক্র দিয়ে। আর এক একটা পাক দিয়ে.ওপরে উঠতে থাকে সকলেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

শ্রীলেখাদেবী আর মিস্টার সেন থেমে পড়লেন এক জায়গায়।

না, এতটা যেতে পারবেন না, উঠতে পারবেন না।

রুমা, রেশম, প্রফেসর ঘোষ আর সুপ্রিয় চলে যেতেই শ্রীলেখাদেবী বয়স্ক গালে টোল ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন. তোমার যেমন বুদ্ধি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে আসে!

মিস্টার সেনও হাসলেন।—এতখানি কি ভেবেছিলাম! আমার ধারণা ছিল ছোট ছোট, অত চোখে পড়বে না।

—রেশমকে বরং হাঁক দিয়ে ডাকো।

—বেশ তো নিরিবিলিতে বসেছি দু-জনে, আবার কেন। হাসলেন মিস্টার সেন। চোখে চোখে চাইলেন। বয়েসটা যদি কম থাকত!

—অসভ্য এমন। খিলখিল করে হেসে উঠলেন শ্রীলেখাদেবী, যেন আঠারো বছরের তরুণী। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে তাকালেন রুমাদের দিকে।

রুমারা তখন পাক দিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেছে।

—রেশম। ডাকলেন শ্রীলেখাদেবী।

রেশম ফিরে তাকাল।

—নেমে এসো।

থমকে দাঁড়াল রেশম, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামতে হল তাকে। আর রেশম ফিরে আসছে অথচ রুমা ফিরছে না দেখে শ্রীলেখাদেবী তাকেও ডাকলেন।

—রুমা। ফিরে আয়।

—আমি ওপরে উঠব। উত্তর দিল রুমা।

—না, নেমে আয়।

—না, যাব না। দুটো হাতকে মুখের সামনে চোঙার মত করে চেঁচিয়ে জবাব দিল রুমা, তারপর গাইডের পিছনে পিছনে তরতর করে পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল।

বেশ খানিকটা উঠে যাবার পর, রুমার বাবা-মা আড়াল হতেই সুপ্রিয় বললে, এখানে একটু বসি।

—বাঃ রে, উঠবে না।

—উঠব, একটু পরে।

দু জনেই বসে পড়ল একজায়গায়। প্রফেসর ঘোষ আর গাইড ওদের ছেড়ে আরও ওপরে উঠে গেল।

রুমা আর সুপ্রিয়। চুপচাপ বসে রইল দু-জনে। পাশাপাশি নয়, একটু দূরে দূরে।

সুপ্রিয়র মনের মধ্যে তখন অসংখ্য শানানো বানানো কথার আকুলিবিকুলি। কত কি বলবে বলে ঠিক করে রেখেছে সে।

রুমা হঠাৎ বললে, সত্যি, এখানে এসে মনটা এত ভাল লাগছে। কি মনে হচ্ছে জানো।

—কি ? কি ? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়।

—মনে হচ্ছে ঘর-সংসার সব মিছে। কত কি আশা করি, স্বপ্ন দেখি আমরা, সবই মোহ।

—ফুত। একটা অদ্ভুত শব্দ করল সুপ্রিয়। অর্থাৎ কত কি গূঢ় কথা শুনবে আশা করেছিল সে, কত কি বলবে, তা নয় যত সব দর্শন আওড়াচ্ছে।

সুপ্রিয় বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো।

—কি ? হাঁটুর ওপর কনুই আর ছড়ানো পাঁচটা আঙুলের ওপর গাল রেখে ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকাল রুমা, মনে হল ও যেন হাসি চাপছে। হাসি চেপেই সে সুর করে প্রশ্ন করল, কি ?

সুপ্রিয় গম্ভীর হয়ে বললে, মনে হচ্ছে ওই প্রফেসর না কি যেন, ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিই।

চমকে উঠলে রুমা। —কেন ?

—কেন তা তুমি ভাল করেই জানো। বলেই উঠে পড়ল সুপ্রিয়। তারপর তরতর করে নামতে শুরু করল। আর নামতে নামতে হঠাৎ একটা পাথর কুড়িয়ে নিল, কাকে যেন ছুঁড়ে মারবে এমনি ভঙ্গিতে।

রুমাও তখন তরতর করে নামছে পিছু পিছু, আর চিৎকার করছে, এই শুনুন না। এই, শোনো, শোনো বলছি।

ট্যাক্সিটা হোটেলে ফিরল যখন তখন তিনটে বেজে গেছে। এতখানি পথ যাওয়া আসা, তার ওপর মন্দিরের চূড়ায় ওঠার ক্লান্তিতে রুমা এবং প্রফেসর ঘোষের চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে। অন্য সকলেও ক্লান্ত।

অক্লান্ত শুধু রমণীবাবু। ফেরার পথে আরও আট আনার রসগোল্লা কিনে এনেছেন তিনি ছেলের জন্যে।

হাঁড়িটা হাতে দুলিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মিসেস ভট্চাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললেন, কোনারক ঘুরে এলাম। গেলেন না তো মিসেস ভট্চাজ, এইটপ্ ওয়ানডারফুল নিয়ে এলাম নিমাপাড়া থেকে, এক আনায় এই বড় বড়...

প্রফেসর ঘোষ ভাবছিলেন কোনও রকমে নিজের ঘরটিতে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে পারলে হয়, তারপর দু-চোখ বুজে ঘুম, ঘুম। কিন্তু রমণীবাবুর কথাটা কানে যেতেই সুপ্রিয়র দিকে ফিরে বললেন, রাবিশ্। কোনারকে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে কিছু দেখবার পেলেন না, রসগোল্লা আর রসগোল্লা।

এদিকে শিখিনীকে ততক্ষণে ধরে বসেছে হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু।—কেমন দেখলে পাণ্ডাবিদি।

—আরে ছিঃ। না আছে পাণ্ডা, না পূজা চড়াবার বন্দোবস্ত্। এ কোন্ কিসমের মন্দির বুঝলাম না।

মিস্টার সেনের কানে গেল কথাটা, ফিরে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। আর শ্রীলেখাদেবী ডাকলেন বেলুকে। বললেন, এগারো নম্বরে কে এল ?

—ও মা, জানেন না বুঝি। বলেই ফিসফিস করে খবরটা দিল বেলু।

—গায়ত্রীদেবী ? সেই যে বলেছিলাম...

গায়ত্রীদেবী। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা রটে গেল সারা হোটেলে। প্রায় সকলেই একবার করে ঘরটার সামনে দিয়ে অকারণে পায়চারি করে গেল। কারণ দরজায় তখন একটি রীতিমত ঝকমকে দামি পর্দা ঝুলছে আর সকলেই আশা করেছিল পর্দাটা হাওয়ায় দুলে উঠলেই এক ফাঁকে হয়তো গায়ত্রীদেবীকে সশরীরে দেখতে পাবে। যার অশরীরী চেহারাটা এতবার দেখেছে তারা, এতবার দেখেছে, তাকে রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হতে দেখবে তা কেউ কোনওদিন কল্পনাই করেনি। সেই গায়ত্রীদেবী কিনা এই একই হোটেলে পাশাপাশি ঘরে।

কিন্তু এগারো নম্বরের দরজায় টাঙানো ভারী পর্দাটা নড়ল না। ভেতর থেকে এক টুকরো কথাও ভেসে এল না।

রুমা আর রেশম সেদিকে দু বার ব্যর্থ উঁকি দিয়ে বলাবলি করল, বোধহয় মেক-আপ নিচ্ছে।

মেক-আপ নয়। সারা রাত্রির ট্রেন জার্নিতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন গায়ত্রীদেবী। উঠলেন যখন সন্ধে হয় হয়।

পর্দা ঠেলে গায়ত্রীদেবী বেরিয়ে এলেন, বেরিয়ে এলেন এমন ভঙ্গিতে যেন পৃথিবীর সবকিছু তাচ্ছিল্য করবার। কিংবা বলা যায় কোনও এক সম্রাজ্ঞী যেন এক রাজ্যে দরবার সেরে আরেক রাজ্যের সিংহাসনে যাচ্ছেন। আর হাঁটাচলার ধরনই বা কি ! যেন একটি চওড়া ডানাওয়ালা পাখি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, ডানা দুটো স্থির হয়ে আছে, দু-দিকে এতটুকু কাঁপছে না।

সাদা সিল্কের শাড়িখানা একেবারে হাল ফ্যাশনের হলেও রুচিসম্মত। পরার ধরনটা আরও। আঁটসাঁট ছন্দোময় শরীর গায়ত্রীদেবীর, কিন্তু রংটা ঈষৎ চাপা। মুখের গড়ন খুব একটা আহামরি গোছের না হলেও চোখে যেন চটক আছে। একটা সুপুষ্ট সাদা সারসের মত টানটান নরম শরীরের আড়ে-পিঠে আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সেটা মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা না করে বরং কেমন একটা শ্লথ বিস্রস্ত ভাব করে বেরিয়ে এলেন গায়ত্রীদেবী, চোখে মুখে জল দিলেন। তারপর পরনের শাড়িটার আঁচলেই মুখের জল

স্পঞ্জ করতে করতে নিজের ঘরটিতে ফিরে গেলেন। দেখতে পেলেন না ওদিকে বারান্দার থামের গায়ে মিসেস ভট্‌চাজ দাঁড়িয়ে আছেন।

গায়ত্রীদেবী দেখতে না পেলেও রুমা দেখতে পেল তাঁকে।

আর রুমা এগিয়ে আসতেই মিসেস ভট্‌চাজ একমুখ হাসি হেসে বললেন, দ্যাখলেন সিনেমা স্টাররে। দ্যামাকে পা পড়ে না মাটিতে, আমাগোর সাথে কথা কইলে য্যান মুখ্‌খানা ব্যাঁকা অইয়া যাইব।

রুমা হাসল। বললে, হুঁঃ, ভারী তো চেহারা। রং তো আমার থেকেও কালো, নেহাত ক্যামেরা ফেস আছে তাই।

—ক্যামেরা ফেইস কইবেন না। প্রতিবাদ করে উঠলেন মিসেস ভট্‌চাজ। বললেন, ক্যামেরা ফেইস—আমার পিসাত ননদের ত দ্যাখেন নাই। আসল অইল এই কপাল...ভাইগ্যটা...বলে নিজের কপালেই একটা টোকা মারলেন।

আর রুমাও সায় দিল নাক কুঁচকে একটি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে।

বললে, পর্দাটা দেখেছেন। এই হোটেলে এত দামি পর্দা দেওয়ার কোনও মানে হয়?

অর্থাৎ পর্দাটা সকলেই লক্ষ করেছে। আর লক্ষ করবার মতই। দামি পর্দা তার ওপর নানা রঙের সূক্ষ্ম কারুকার্য। সারা হোটেলের চেহারাটা যেন বদলে গেছে ওই একটা পর্দারি জন্য।

মিসেস ভট্‌চাজ রুমার কথা শুনে হাসলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সায় দিতে পারলেন না। কারণ, আজ রুমা এ হোটেলে দামি পর্দা টাঙানোর কোনও অর্থ না পেলে কি হবে, রুমারা যেদিন প্রথম এল এখানে এবং তাদের দরজা থেকে যখন হোটেলের পুরনো রংচটা পর্দাটা সরে গিয়ে রুমাদের একটু রংচঙে আর ভাল পর্দাটা ঝুলল, সেদিন মিসেস ভট্‌চাজও তো এই কথাই ভেবেছিলেন।

তাই মনে মনে বরং খুশিই হলেন তিনি, মনে মনেই বললেন, এবার দেখো মা ঠাকরুন, সেদিন তোমরা যে বড় নাকের সামনে পর্দা দেখিয়েছিলে।

রুমা তার মনের গভীরে ঢুকবে কি করে, তাই সরলভাবেই প্রশ্ন করলে, একা এসেছে নাকি?

—না না, একা আইব ক্যান্! বুড়ি মা আছেন, একটা বাচ্চা মাইয়া আছে, চাকর আছে।

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। একে একে সকলেই ঘুম থেকে উঠলেন। সকলেই ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলেন বারান্দায়। অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীকে দেখে চক্ষু সার্থক করতে চায় সকলেই। অথচ তারই ফাঁকে পরস্পরের মধ্যে নানা আলোচনা চলতে লাগল, নানান কটুকাটব্য।

রমণীবাবু বললেন, এদের সঙ্গে এক হোটেলে থাকলেও মশাই বদনাম।

ব্রজমাধব ভট্‌চাজ বললেন, নামেই ফিলিম-স্টার আপনাগো গায়ত্রীদেবী, অ্যাক্‌টিং-এর জানে কচু। খালি ফ্যাশন দেখাইয়া...

মিস্টার সেন বললেন, তা যা বলেছেন, আজকালকার স্টার মানে অ্যাক্‌টিং-এর এ-বি-সিও জানে না। হ্যাঁ, আগেকার দিনে তাদের কত বড় একটা আদর্শ ছিল!

রমণীবাবু আর ব্রজমাধব ভট্‌চাজ একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিস্টার সেনের কথায়। সায়টা বক্তব্যের জন্যে ততখানি নয় যতটা বক্তার জন্যে। এ-কদিন তাঁরা লক্ষ করে দেখেছেন, মিস্টার সেন কেমন যেন তাঁদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন, যেন একটা আত্মম্ভরিতার আড়ালে রাখেন সব সময়। সেই সেন সাহেব কিনা আজ তাঁদের সঙ্গে এমন একটা রসালো আলাপে একাত্ম হয়ে গেছেন। মনে মনে খুশি হলেন দুজনেই।

খুশি হলেন না শুধু শ্রীলেখাদেবী। ছ-নম্বরে মিস্টার সেন ফিরে আসতেই তিনি বলে বসলেন, তোমার কি লজ্জাও করে না, ওদের সঙ্গে সিনেমা অ্যাকট্রেস নিয়ে গল্প করছ?

মিস্টার সেন প্রতিবাদ করতে গেলেন, বোঝাতে গেলেন যে আজকালকার ফিল্ম-স্টারদের কোনও দাম নেই একথাই তিনি বলছিলেন, কিন্তু তার আগেই শ্রীলেখাদেবী বলে উঠলেন, বাজে বোকো না, তোমরা সবাই ঘুরঘুর করছ ওকে দেখবার জন্য।

—দেখবার জন্যে? কেন, আছে কি, কি দেখবার? বলে ধপাস করে বসে পড়লেন তিনি বিছানার ওপর, হতাশ অসহায় ঈষৎ অভিমানের ভঙ্গিতে।

আর শ্রীলেখাদেবী হাসি চাপার চেষ্টা করে রুমাকে ইশারায় ডেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, চল রুমা, আলাপ করে আসি, যাবি?

রুমা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। তারপর বললে, যদি কিছু মনে করে? যদি আলাপ না করে?

—চল না। বলে শ্রীলেখাদেবী হাঁটি হাঁটি পা পা এগিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে রুমা।

গায়ত্রীদেবীর চাকর ততক্ষণে জলটেরি কেটে এগারো নম্বরের দরজার সামনে হাজির হয়েছে। বোধহয় ছিল নীচের তলার কোনও একটা ঘরে। সিনেমার হিরোর মত সাজগোজ তার, পায়ে হাওয়াই স্যান্ডেল, পরনে থ্রি কোয়ার্টার্রি প্যান্ট আর গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গায়ত্রীদেবীর হুকুম তামিল করার অপেক্ষায়।

শ্রীলেখাদেবী সাহসে ভর করে এগারো নম্বরের দরজা পর্যন্ত এলেন বটে, কিন্তু চাকরটাকে দেখে ভরসা করে গায়ত্রীদেবীকে ডাকতে পারলেন না।

ফিরে যাচ্ছিলেন তাই। মিসেস ভট্‌চাজ পথ আগলে দাঁড়ালেন। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, চাকর না নাগর, মা ভবানীই জানেন!

শ্রীলেখাদেবীও হেসে ফেললেন। বললেন, বিধবা তো শুনেছি, পোশাকআশাকটা একবার দেখতাম!

রুমা বললে, আচ্ছা মা, ফিল্মস্টার কি থান পরে থাকবে? তুমি কি?

রুমার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন শ্রীলেখাদেবী আর মিসেস ভট্‌চাজ। রুমাও।

সঙ্গে সঙ্গে এগারো নম্বরের পর্দা ফাঁক হল। বছর পাঁচেকের একটা সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মুখ ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল বাইরে। তারপর ফিসফিস করে কি যেন বললে চাকরটাকে। চাকরটা মাথা নাড়ল। বাচ্চা মেয়েটা আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই ঘরের ভেতরে একটা চাপা স্বর শোনা গেল।—যা না লক্ষ্মীটি, চেয়ে আন। যা না...

আবার বাইরে উঁকি দিল মেয়েটা। লজ্জা লজ্জা ভাব করে এদিকে ওদিকে চাইল, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল রুমাদের দিকে।

রুমা ডাকল—শোনো।

শ্রীলেখাদেবী—কি নাম তোমার?

—তুতুন।

—তোমার মা কি করছেন? তোমার মা হন তো গায়ত্রীদেবী?

মেয়েটি লজ্জা পেল যেন। বললে, হ্যাঁ। মা তো আসতে বলল তোমাদের কাছে। বলল, একটু কাজল চেয়ে আন না লক্ষ্মীটি, আনতে ভুলে গেছি।

—কাজল?

তুতুন ঘাড় নাড়লে।—হ্যাঁ, মা যে কাজল আনতে ভুলে গেছে।

রুমা বললে, এসো তুমি আমার সঙ্গে, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

—না। তুতুন সুর করে টেনে টেনে বললে, মা পরবে। কাজল নেই বলেই তো মা বেরুতে পাচ্ছে না।

রুমা আর শ্রীলেখাদেবীর মুখ চাওয়াচাওয়ি হল। মিসেস ভট্চাজ হাসি চাপলেন।

তারপর রুমা বললে, চলো দিচ্ছি।

রুমার পিছনে পিছনে শ্রীলেখাদেবী আর মিসেস ভট্চাজও এগিয়ে গেলেন ছ-নম্বরের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমাধববাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

স্ত্রীর ভয়েই হয়তো এতক্ষণ ঔৎসুক্য চেপে রেখেছিলেন।

মিসেস ভট্চাজ ততক্ষণে ছ-নম্বরে গিয়ে ঢুকেছেন। আর শ্রীলেখাদেবীর সঙ্গে তাঁকে ঢুকতে দেখেই মিস্টার সেন ছ-নম্বর আর সাত-নম্বরের মাঝের দরজা দিয়ে সুড়ুত করে ওপাশে চলে গেলেন।

রুমা জিগ্যেস করলে, তোমার মা একা এসেছেন ?

তুতুন পাকা মেয়ের মত বললে, একা আসবে মা ? আমার দিদা এসেছে না সঙ্গে। অর্জুন এসেছে।

—অর্জুন কে ?

তুতুন হাসল।—ও একটা চাকর।

অর্থাৎ একমাত্র চাকর নয়। শ্রীলেখাদেবী আর মিসেস ভট্চাজ চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলেন। অবশ্য বোঝা গেল না, চাকরের নাম শুনে, না মেয়েটার পাকা পাকা কথা শুনে।

রুমা ততক্ষণে কাজললতাটা বের করে দিয়েছে তুতুনের হাতে। আর সেটা নিয়েই তুতুন বললে, যাই এখন, কেমন ? প্লেনে উঠে থেকে মা কেবল ভাবছে কাজল আনতে ভুলে গেছে বলে।

শ্রীলেখাদেবী বললেন, তোমরা প্লেনে এসেছ বুঝি ?

—বাবাঃ, ট্রেনে আর কোথাও যাচ্ছি না। মাকে দেখলেই স্টেশনে লোকগুলো এত ভিড় করে। অটোগ্রাফ দিন, অটোগ্রাফ দিন...মা বলেছে আর কখনও ট্রেনে যাবে না।

মেয়েটার কথাগুলো এতক্ষণ মন্দ লাগছিল না। এবার কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ইচ্ছা হল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলেই বললেন, যাও, তোমার মা কাজল না পেলে বাইরে বেরুতে পারবে না।

—যাই। বলেই মেয়েটা টা-টার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পালাল।

মিসেস ভট্চাজ মন্তব্য করলেন, ফুল অইতে না অইতেই পাইক্যা কাঠাল হইয়া গেছে।

রাত্রির আহারের সময় হিমাদ্রিবাবু এসে হাজির হন প্রতিদিন। হাঁকডাক করেন চাকর ঠাকুরদের। বোর্ডারদের ঘরে ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করেন, আর কিছু দেবে কিনা, রান্না কেমন হয়েছে। পেটের গোলমাল থাকে তো জানাতে, ঝাল বা তেল না দিয়ে স্রেফ আলু পেঁপে কাঁচকলার সেদ্ধ ঝোলের ব্যবস্থা করে দেবেন, ইত্যাদি। আর যদিও ঘরে ঘরে গিয়ে সকলের সঙ্গেই বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেন, তবু দু-একজনের ক্ষেত্রে যেন একটু বেশি নজরই দিচ্ছিলেন এ-কদিন। মিস্টার সেনের প্রতি একটু বেশি দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য অন্যায় নয়। তিনি পুরো একটা ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন, মোটা টাকাই দিয়ে যাবেন। আর প্রফেসর ঘোষ যদিও একা, এমন কিছু মোটা অঙ্কের লাভ হবে না তাঁর ওপর দিয়ে, তবু তিনি বিখ্যাত মানুষ, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাজানা, হয়তো খুশি হলে আরও

খদ্দের জুটিয়ে দেবেন। ওদিকে তেরো নম্বরের বুড়ি-মার খবরও নিতে হয়। কারণ বুড়ো মানুষটার ওপর প্রথম থেকেই কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ব্যতিক্রম দেখা গেল তাঁর ব্যবহারে।

ঘরে ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এসেই ঢুকলেন এগারো নম্বরে। গায়ত্রীদেবীর ঘরে। গায়ত্রীদেবীদের ঘরে তখন ভাত দেওয়া হচ্ছে।

সে কি হাঁকডাক। সে কি তদ্বির তদারক।

পাশের ঘর থেকে কেউ শুনে হাসল, কেউ বা কিছু একটা মন্তব্য করল। কিন্তু চটলেন মিস্টার সেন। প্রফেসর ঘোষও ক্ষুণ্ণ হলেন। হিমাদ্রিবাবুর কাছ থেকে এ-কদিন বিশেষ দৃষ্টি পাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বলেই নিজেদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে বেশ একটা আত্মগর্ব অনুভব করেছিলেন তাঁরা। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে চটে গেলেন।

একই টেবিলের দু-ধারে প্রফেসর ঘোষ আর সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়র মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, সারাটা দিন কাছে কাছে থাকতে পেয়ে। তাই এগারো নম্বর ঘরের নতুন বোর্ডারদের হিমাদ্রিবাবু তদ্বির করছেন কি না করছেন তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।

কিন্তু প্রফেসর ঘোষের কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগল না। সুপ্রিয়কে বলেই ফেললেন।—হিমাদ্রিবাবুও দেখছি ওই সিনেমা-স্টারকে নিয়েই মেতেছেন।

সুপ্রিয় হেসে বললে, অনেক টাকা বাগাতে পারবেন তো! আর টাকা তো আজকাল ওদেরই, একটা ছবিতে নামলেই...

প্রফেসর ঘোষ গম্ভীর মুখে বললেন, হ্যাঁ, নামতেই হয়, ওঠবার রাস্তা নেই। আর টাকাই কি সব নাকি?

—তা অত টাকা পেলে বলতাম টাকাই সব, সারা জীবনে একজন ব্যবসাদারও যা রোজগার করতে পারে না, ওরা একটা ছবিতেই...

প্রফেসর ঘোষের কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল এবার।—জীবনটা কি শুধু টাকা? একটা কালচার, আর্ট...জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে যে-সব আদর্শ, তার কিছুই তো নেই ওদের।

সুপ্রিয় প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না, সায় দিয়ে বসল প্রফেসর ঘোষের কথায়।

আর প্রফেসর ঘোষ উৎসাহ পেয়ে বললেন, সিনেমা! এই যে কি এক হুজুক হয়েছে, দেশের সর্বনাশ করছে। এই যে সারা ভারতবর্ষে এত সব মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে, কত সব প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্য, সে-সবের দিকে চোখ নেই কারও, যত লাফালাফি...

কথা শেষ করলেন না প্রফেসর ঘোষ, কারণ ততক্ষণে আরেক-জনের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। বললেন, যাও বা দু-একজন আসে, শিল্পের দিকে চোখ নেই তাদের, শিল্পরুচিই নেই। দেখলেন না, পাঞ্জাবি মেয়েটাকে, কোনারকের মন্দিরে পুজো দিতে পেল না বলে আফসোস তার। শেষ পর্যন্ত ওই নবগ্রহের পুজো দিয়েও এল।

আরও হয়তো কিছু বলতেন প্রফেসর ঘোষ, কিন্তু তার আগেই সুপ্রিয়র খাওয়া হয়ে গেছে, তাই উঠে পড়ল সে। কিংবা আরও লেকচার শুনতে হবে এই ভয়ে।

আর বাইরে আঁচাতে এসে একেবারে গায়ত্রীদেবীর সামনা-সামনি পড়ে গেল। গায়ত্রীদেবীও তখন আহার শেষ করে আঁচাতে এসেছেন।

সে কি! সিনেমা-স্টারও খাওয়ার পর আঁচায়? কিংবা এই ধরনের কিছু একটা ভেবেই কেমন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল সুপ্রিয়। তারপর সামলে নিয়ে বললে, আপনি নিন।

গায়ত্রীদেবী মধুর করে হাসলেন, আপনি নিন না আগে।

—না, আপনি আগে নিন। এমনভাবে বলল সুপ্রিয়, যেন বিনয়ে সত্যিই বিগলিত হয়ে গেছে সে।

গায়ত্রীদেবী হেসে এগিয়ে গেলেন, ড্রামের জলে ঘটি ডুবিয়ে জল নিলেন, হাত ধুলেন, কুলকুচি করলেন, আর সুপ্রিয় বিমুগ্ধ তন্ময়তায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, মনে হল, গায়ত্রীদেবীর ভাবে-ভঙ্গিতে, চলনে-বলনে, হাসিতে কটাক্ষে যেন এক-একটি মুদ্রা ফুটে উঠছে। যে-মুদ্রা মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্যে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর ঘোষ।

সুপ্রিয়র হাত মুখ ধোয়া হতেই গায়ত্রীদেবী জিগ্যেস করলেন, আপনি কতদিন এসেছেন এখানে ?

সুপ্রিয় উত্তর দিল।

প্রশ্ন এল, এখানকার জলে উপকার পেয়েছেন কিছু ? মাকে নিয়ে এলাম ডাক্তারের পরামর্শে, হবে কিছু উপকার ?

সুপ্রিয় হেসে বললেন, কারও হয়, কারও হয় না।

এরপরই গায়ত্রীদেবী যা বলে বসলেন, সুপ্রিয় তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

গায়ত্রীদেবী মৃদু হেসে বললেন, আসুন না ঘরে। একটু গল্প-গুজব করা যাবে।

সুপ্রিয় ঘাড় নাড়ল। তারপর গায়ত্রীদেবীর পিছনে পিছনে গিয়ে ঢুকল এগারো নম্বরে। আর চৌকাঠ ডিঙোবার আগের মুহূর্তে ফিরে তাকাল সে ছ-নম্বরের দিকে, হয়তো অকারণেই। আর ফিরে তাকাতেই রুমার সঙ্গে চোখোচোখি হল। চোখ নয়, একজোড়া অগ্নিগোলক। ক্রুদ্ধ একজোড়া চোখ !

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। গায়ত্রীদেবীর পিছনে পিছনে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়তে হল তাকে।

গায়ত্রীদেবীর মা বাতের ব্যথায় পড়েছিলেন একটা তক্তপোশে। অন্যটায় বসে একটা বড় আকারের ইংরেজি ছবির কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল তুতুন।

গায়ত্রীদেবী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। তারপর হোটেলের খবরাখবর নিতে শুরু করলেন। বেশ বোঝা গেল, হোটেল সম্পর্কে তিনি হতাশ হয়েছেন। হতাশ হবারই কথা। কারণ যে-সব হোটেলে তিনি এর আগে উঠেছেন সেগুলো সবই বড় বড় শহুরে হোটেল। তার তুলনায়...

গায়ত্রীদেবী বললেন, বাড়ি পেলাম না বলেই হোটেলে উঠতে হল, দূর থেকে তো বুঝতে পারিনি এমন হোটেল !

সুপ্রিয় বললে, তবু এ হোটেল নাকি রিগ্যাল হোটেলের চেয়ে ভাল।

—রিগ্যাল ? সেটা কোথায় ?

সুপ্রিয় বললে, উঠে গেছে। আগে ছিল।

ক্রমশ কথাবার্তা ঘরোয়া হয়ে উঠল। সুপ্রিয় জিগ্যেস করল, এখন কি ছবি করছেন ?

গায়ত্রীদেবী জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা দল বেঁধে ?

সুপ্রিয় হেসে বললে, কয়েকটা দিন আগে এলে কোনারকটা একসঙ্গে ঘুরে আসতে পারতেন।

—আমার যে শুটিং ছিল।

ব্যস্। একটা ক্ষীণ সূত্র জুটে যেতেই আলাপ জমে গেল, আলোচনা সিনেমার দিকে মোড় নিল। সুপ্রিয় এতক্ষণ দু-একটা টুকরো টুকরো কথা বলছিল, প্রশ্ন করছিল, কিন্তু সারাক্ষণই বুকের ভেতরটা খচখচ করছিল তার। ক্ষণে ক্ষণেই মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিংবা বলা যায় মনের চোখে পড়ছিল রুমার সেই অগ্নিক্রুদ্ধ চোখ-জোড়া ! না জানি, কি ভেবেছে রুমা, সুপ্রিয়কে গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে এগারো নম্বরে ঢুকতে দেখে। সারাক্ষণ আতঙ্ক, রুমা না ভুল বোঝে। অভিমানে কিংবা রাগে রুমা না সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। রুমা যত

কাছে আসছে তার, যত বেশি অন্তরঙ্গ হচ্ছে সে, দিনে-দিনে ততই যেন ভয় বাড়ছে সুপ্রিয়র। রুমাকে হারাবার ভয়। না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোর ব্যথাটা বেশি বলেই হয়তো। কিন্তু সিনেমার কথা এসে পড়তেই সুপ্রিয় গল্পগুজবে এমন মশগুল হয়ে গেল যে বুকের খচখচ কাঁটাটাকে ঘড়ির কাঁটার মতই উপেক্ষা করল।

শুধু সুপ্রিয়ই নয়, গায়ত্রীদেবীও ভুলে গেলেন যে সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁর সদ্য আলাপ। এত ঘনিষ্ঠ হবার মত বা এত প্রাণ খুলে কথা বলার মত কেউ নয়।

গায়ত্রীদেবীর মা বাতের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে দু-একটা কথা বলছিলেন, ঘুমে চোখ বুজে এল তাঁর।

বললেন, রাত অনেক হয়েছে রে!

—তুমি শোও না, তোমার ঘুম পাচ্ছে বলে কি আমাকেও শুতে হবে নাকি! চেঁচিয়ে উঠলেন গায়ত্রীদেবী।

সুপ্রিয় চমকে উঠেছিল গায়ত্রীদেবীর ব্যবহারে। এত সুন্দর করে যে কথা বলে, এত ভদ্র ব্যবহার যার, সে কিনা মাকে এমন বিশ্রী ধমক দিয়ে বসল!

গায়ত্রীদেবীর মা চুপ করে গেলেন। মুখটা দেখে বোঝা গেল সুপ্রিয়র উপস্থিতিতে এ ধরনের ধমক খেয়ে তিনি যেন লজ্জা পেলেন।

তবু মেয়েকে প্রায় তোষামোদের সুরে বললেন, আহা, রাগিস কেন, বুড়ো মানুষ, বললাম না হয় একটা অন্যায় কথা!

কথাটা অন্যায় কেন আর এমন ভঙ্গিতেই বা তিনি তোষামোদ করছেন কেন বুঝতে বাকি রইল না সুপ্রিয়র। মেয়ের রোজগারে নির্ভর করতে হয় তাঁকে, সেইজন্যেই কি?

তুতুন ছবি দেখছিল পত্রিকাটার পাতা উল্টে, সে একবার মার দিকে তাকাল, একবার দিদিমার দিকে, তারপর শুয়ে পড়ল। মায়ের মেজাজ দেখে বোধহয় কিছু বলতে সাহস পেল না।

গায়ত্রীদেবী যেন স্বগতোক্তি করেই বললেন, আপনারা তো ভাবেন কত সুখের জীবন আমাদের। কত টাকা!

—নয়?

—মোটেই না। ঘরে এতটুকু শান্তি নেই মা আর মেয়েকে নিয়ে। বাইরে বের হবার উপায় নেই লোকে ভিড় করে আসবে। অভিনয় কি একটা যে-সে ব্যাপার, একটা আর্ট, সাধনা দরকার তার জন্যে।

সুপ্রিয় বললে, তা তো বটেই।

—তবেই বলুন, শান্তি না পেলে অ্যাকটিং করব কি করে? তার জন্যে ভাবতে হয় না? চিন্তা করতে হয় না? সাধনা করতে হয় না? জানেন, যখন এক-একটা রোল করি, দিনরাত ওই ভাবনা, কেমন করে ঠিকমতো করতে পারব। এও তো সৃষ্টি! অথচ কোনও সম্মান দেন না আপনারা, শুধু ভাবেন, অনেক টাকা রোজগার করছে।

সুপ্রিয় সায় দিল।—তা সত্যি! এই তো আমার রুম-মেট প্রফেসর ঘোষ—যাচ্ছেতাই বললেন আপনাদের সম্পর্কে।

—প্রফেসর ঘোষ?

—হ্যাঁ, ওই সব মন্দির-টন্দির নিয়ে কি সব আর্টের বইটই লেখেন।

—আর্ট? হঠাৎ সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠলেন গায়ত্রীদেবী। বললেন, মন্দিরে আর্ট? ওই সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি মূর্তিগুলো? তবেই বলুন, একজন প্রফেসর, শিক্ষিতও হবেন হয়তো, অথচ অভিনয়ের কিছু বোঝেন না। অভিনয়কে মর্যাদা দেন না, হুজুগে মাতেন শুধু মূর্তি নিয়ে।

সুপ্রিয় বললে, মূর্তিটুর্তির মধ্যেও অবশ্য আর্ট আছে।

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ওসব আমরা বুঝি, ওই আর্ট বলে যাচ্ছেতাই ছবি ছাপেন সব বইয়ের মধ্যে। বইয়ের কাটতি বাড়াবার জন্যে। আর্ট না ছাই, দেখুন—কি নাম যেন আপনার ?

—সুপ্রিয়।

—হ্যাঁ। সুপ্রিয়বাবু শুনুন, এই লোকগুলো দেশের কালচারের শত্রু। এরাই লোকের টেস্ট নষ্ট করেছে। এ সব ছবি দেখে লোকে, আর চায় যে সিনেমাতেও এমনি সব...

কথা শেষ হল না। তার আগেই গায়ত্রীদেবীর মা তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে উঠে বললেন, ঘুমোবি না পানু ?

মুখে চোখে একটা হিংস্র ভঙ্গি করে মার দিকে তাকালেন গায়ত্রীদেবী, আর সেই মুহূর্তেই সুপ্রিয় উঠে পড়ল। বললে, আজ চলি এখন !

সুপ্রিয় সবে পর্দা সরিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসেছে অমনি শুনল তুতুন বলছে, বাবা বাবা, তখন থেকে ভ্যাজ ভ্যাজ, ভ্যাজ ভ্যাজ...

পরক্ষণেই আরেকটা শব্দ শুনল সুপ্রিয়। না কথা নয়, একটা শব্দ। তুতুনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসালেন, না, মশা মারলেন গায়ত্রীদেবী, সুপ্রিয় বুঝতে পারল না।

ও শুধু অন্যমনস্কভাবে নিজের গালে হাত দিল। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে সুপ্রিয় দেখতে পেল এবং বুঝল যে ওদিকের বারান্দায় মাধবীলতার সেই দোদুল্যমান উঁকিঝুঁকির আড়ালে আবছা অন্ধকারে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রুমা। সুপ্রিয় সেইদিকে তাকাতেই বোঁ করে ঘুরে দপদপ করে পা ফেলে ছ-নম্বর ঘরে ঢুকে পড়ল রুমা এবং পরক্ষণেই দড়াম করে কপাট বন্ধ করে সশব্দে খিল দিয়ে দিল।

সকালের কাগজ পড়েই চক্ষু চড়কগাছ মিসেস ভট্চাজের। রেলের কর্মচারীরা নাকি ধর্মঘট করবে বলে শাসিয়েছে। সর্বনাশ। আর মাত্র একটা সপ্তাহ ছুটি ব্রজমাধববাবুর, এর মধ্যে যদি স্ট্রাইক করে বসে রেলের লোক, তাহলে ফিরতে পারবেন না তিনি, চাকরিতে জয়েন করতে পারবেন না ! শুধু কি তাই, মিসেস ভট্চাজ মনে মনে একটা হিসেবও করে নিলেন প্রতিদিনের জন্য কত বাড়তি টাকা তুলে দিতে হবে হিমাদ্রিবাবুর হাতে। হোটেলওয়ালা তো শুনবে না যে ট্রেন বন্ধ আছে বলে যেতে পারছেন না।

ব্রজমাধববাবু নীচের উঠোনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিব ছুলছিলেন।

তিনি ফিরে আসতেই মিসেস ভট্চাজ বললেন, সংবাদ ভাল না, র‍্যালে ধর্মঘট অইব খবরের কাগজে ল্যাখছে।

—ক্যান ? চমকে উঠলেন ব্রজমাধববাবু।

আর মিসেস ভট্চাজ দৈনিক পত্রিকাখানা এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে।

পড়ে চক্ষু চড়কগাছ। —তাইলে, তাইলে...

বসে পড়লেন তক্তপোশের ওপর। নানা রকম জল্পনাকল্পনা চলল। তারপর ঠিক করে ফেললেন, রিস্ক লওয়াটা বুদ্ধির কাজ অইব না।

অতএব পরের দিনই চলে যাবেন ঠিক করলেন ব্রজমাধববাবু। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এখন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচেন।

নিজের মনেই বললেন, র‍্যালের লোকগুলার হুজুগ পাইলেই অইল। একটা কিছু অইলেই সব ইউনাইট্ করব, সরকাররে থ্রেটন করব। সরকারও অইছে এমন, ইউনিয়ানগুলারে ভাইঙ্গা দিতে পারে না ?

ব্রজমাধববাবুও বিরক্ত হয়েছিলেন খবরটা পড়ে। বললেন, ক্যাবল ডিমাণ্ড আর ডিমাণ্ড। একবার ভাববে না গভরমেন্ট টাকাটা দিব কোন ভাণ্ডার থিকা। এডারে ডিমক্রেসি কয় না, কয় মবরুল। দশটা লোক এক জোট অইলেই কি অন্যায়টা ন্যায় হইয়া যাইব!

স্বামীর কাছ থেকে আরও কিছু বলার কথা পেয়ে গেলেন মিসেস ভট্চাজ। তাই আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, বেরিয়ে পড়লেন খবরটা রাষ্ট্র করবার জন্যে।

কিন্তু কেউই যেন কান দিল না তাঁর কথায়। কেউই চিন্তিত হয়ে উঠল না। একে একে সকলেই বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

মিস্টার সেন বললেন, স্ট্রাইকের কথা হামেশাই হচ্ছে। সত্যি সত্যি কি আর স্ট্রাইক হবে!

আর শিখিনী স্নান সেরে উঠে আসছিল, খবর শুনে সে হেসে উঠে বললে, হরতাল তো হরদিন লেগে আছে, আর আমি তো আজ দুফেরের বাসে চলে যাব। পুরী যাব, পুরী থেকে কাল যাব হরদোয়ার।

বলেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। সাজগোজ করে বেরিয়ে এল, ঘরে তালা লাগাল। বুড়ি এই ভোর সকালেই গেছে বিন্দুসরোবরে ডুব দিতে।

বুড়ির উনোনটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললে, জংলি। তারপর মুখ বিকৃত করে সেদিকে একটুকরো ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেল ওদিকের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে।

শিবনাথবাবু যদ্দিন ছিল, তবু একটা আশা ছিল, হয়তো মোহান্তি সাহেবকে বলে চাকরিটা বাগাতে পারবে। কিন্তু এখন থেকে লাভ নেই, শুধু টাকা খরচ। আর শান্তিতে থাকারও উপায় নেই বুড়ি আসার পর থেকে। দিনরাত এমন একটা বিরক্তিকর রুম-মেট নিয়ে কি শান্তিতে থাকা যায়! ওদিকে কে এক বাঙালি ফিল্ম-স্টার এসেছে, তাকে নিয়েই ব্যস্ত হোটেলওয়ালা। খেতে বসার পর আর রোটি লাগবে কি না, দু-বার জিগ্যেস করতে আসে না নোকর-ঠাকুর।

তাই লিঙ্গরাজ মন্দিরের উদ্দেশে পা বাড়াল শিখিনী। যাবার আগে পুজো চড়িয়ে যাবে, যদি চাকরিটা পাওয়া যায়। দেওতা খুশি হলে সবই সম্ভব।

বিন্দুসরোবরের পাশ দিয়ে রাস্তা। এদিকে কয়েকটি পুরনো ঘিঞ্জি বাড়ি, ধর্মশালা, দোকানপাট, আর ওদিকে বিরাট সরোবর, পানা আর পাঁকে জলের রং সবুজ হয়ে গেছে। তারই চারপাশে বাঁধানো ঘাট। ঘাটে তীর্থযাত্রীদের ভিড়, স্নান করছে সকলে।

যাত্রীদের মধ্যে বুড়িকে দেখতে পেল শিখিনী, পাণ্ডার ছড়িদারটা মন্ত্র পড়াচ্ছে, বুড়ি স্তব করার ভঙ্গিতে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে চোখ বুজে!

সেদিকে তাকিয়ে শিখিনী আবার মনে মনে বললে, জংলি।

তারপর চক পার হয়ে লিঙ্গরাজের মন্দিরে ঢুকল স্যান্ডেল খুলে।

একদল পাণ্ডা পিছু নিল তার। শিখিনী তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিল। ফুল বেলপাতা পুজোর সন্দেশ কিনল একটা দোকান থেকে। ভিড় ঠেলে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল মন্দিরের ভেতর, বিগ্রহের সামনে।

কি আশ্চর্য! সেই বিগ্রহের সামনে অন্ধকারের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে। আর তন্ময়তা থেকে ভক্তিভাব।

চাকরিটা যাতে হয়, সংসারের আর্থিক টানাটানি থেকে যাতে পরিত্রাণ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই পুজো দিতে এসেছিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে প্রদীপের ঈষৎ আলোয় বিগ্রহের যেটুকু দেখতে পেল, বড় বড় ধুনুচি থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে যে বিগ্রহ দেখতে পেল, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত মন কেমন যেন প্রসন্ন

হয়ে উঠল।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল শিখিনী, অনেকক্ষণ পড়ে রইল, আর উঠল যখন, দু-চোখ বেয়ে দরদর ধারায় জল পড়ছে।

বিন্দুসরোবরে স্নান সেরে বুড়ি কখন যে সিঁদুর আর বাতাসার চুবড়ি হাতে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করেনি শিখিনী। আর বুড়িও প্রথমটা চিনতে পারেনি তাকে অন্ধকারে।

একটা মেয়েমানুষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে, এই দেখে অপেক্ষা করছিল বুড়ি। আহা, এমন ভক্তি যে মেয়ের, জীবন তার সার্থক। তাই বুড়ির বড় ইচ্ছে হল, পুজো দেওয়া প্রসাদি চুবড়ি থেকে বেলপাতায় মুছে নেওয়া সিঁদুর মেয়েটির সিঁথিতে দিয়ে দিতে। এত ভক্তি যখন, নিশ্চয়ই এয়োস্ত্রী। সধবা মেয়ে, রঙিন কাপড় পরেছে যখন।

তাই শিখিনী উঠে দাঁড়াতেই বুড়ি বললে, দাঁড়াও মা, দাঁড়াও, একটু সিঁদুর দিয়ে নি, এ জন্মে তো সব হারিয়েছি, বিন্দে বলত, কুমি তোর সোয়ামি নয়, লাখ টাকার জমিদারি, তাও হারালাম মা গত জন্মের পাপে, তা তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে জীবন ধন্য করব। পরের জন্মে যাতে....

শিখিনী ততক্ষণে চিনতে পেরেছে বুড়িকে। কিন্তু বুড়ি এমন স্নেহের চোখে তাকাল, শিখিনীর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটি তুলে ধরল যে আপত্তি করতে পারল না। কেমন যেন ভাল লাগল ওর। তাই শুধু বললে, বুড়ি মাঈ ?

—তুমি বাছা ! মুখ দেখে আর গলা শুনে বুড়িও চিনতে পেরেছে ততক্ষণে। বুড়ির চোখেও জল এসে গেল। বললে, ভুল করেছিলাম মা, ভুল করেছিলাম। তোমার মা অনেক পুণ্য। এত ভক্তি তোমার যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে...

বলে কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলে বুড়ি। —কুমারী মেয়ে, ফোঁটা দিলাম তাই। ফোকলা দাঁতে হাসল বুড়ি।

আর শিখিনীর কি হল কে জানে, বাঙালিদের মতই পায়ে হাত দিয়ে বুড়িকে প্রণাম করল সে। মনটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। শুধু বলতে পারল না, আমরা তো সিঁথিতে সিঁদুর দিই না বুড়ি মাঈ, বিয়ের পর আমরা কপালে টিপ দিই।

বুড়ির দেওয়া সিঁদুরের ফোঁটাটায় সুখের ভবিষ্যৎ দেখতে পেল যেন শিখিনী।

তবু বলতে পারল না, চোখের জল তার ভক্তিতে নয়, ধুনোর ধোঁয়ায়।

—ভগমান তোমার ভাল করবেন। বুড়ি তখনও বলে চলেছে। বললে, বাইরেটা দেখে লোক চিনতে যাই মা, কি ভুলই করি। তোমার মত মেয়েকে কত অকথা-কুকথাই না বলেছি। নাও, হাঁ করো...

বলে শিখিনীর মুখের কাছে এক টুকরো বাতাসা তুলে ধরল, আর শিখিনী মুখব্যাদান করতেই সেটা টুপ করে তার মুখে ফেলে দিল।

দু-জনেই একসঙ্গে ফিরল পান্থপাদপে। সিঁড়ির নীচে চোখ গেল ওপরে উঠতে গিয়ে। দু-জনেই ঠায় তাকিয়ে রইল। পোষা বেড়ালটা শুয়ে আছে, আর তাকে ঘিরে চার-পাঁচটা বেড়ালছানা। চোখ ফোটেনি এখনও। সদ্য হয়েছে। শিখিনী আর বুড়ি সেদিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল।

হাতে চুবড়ি নিয়ে হোটেলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি প্রসাদ বিলি করতে শুরু করল বুড়ি।

বারো নম্বরে খালি ঘরখানার সামনে একমুহূর্ত দাঁড়াল, ঘরটার ভেতর উঁকি দিল একবার। একটু যেন ভিজে এল মনটা। আহা, মানুষটাকে অমন করে গালাগালি না দিলেই হত। কাজের লোক, না হয় সারারাত খটাখট খটাখট করেছে। বুড়ি ভাবলে, তার

বড় ছেলে বেঁচে থাকলে ওই শিবনাথবাবুর মতই বয়স হত হয়তো। লোকটা কি রেগেমেগেই চলে গেল, না লজ্জায় ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু-পা এগিয়ে গেল এবার। দরজার কড়া নাড়ল।

মিসেস ভটচাজ বেরিয়ে এলেন।—ডাকতে আছেন আমারে !

বুড়ি হাসল, বেলপাতায় মুছে আনা পুজোর সিঁদুর টেনে দিল মিসেস ভট্‌চাজের সিঁথিতে। তারপর বললে, হাঁ করো তো মা !

প্রসাদের কণিকা মিসেস ভট্‌চাজের মুখে ফেলে দিতেই তিনি বুড়িকে প্রণাম করলেন।

—কই, ছেলে কই ?

মিসেস ভট্‌চাজ ডাকলেন, টম !

টম বেরিয়ে আসতেই বুড়ি বললে, হাঁ করো তো বাবা !

টম লজ্জা পেয়ে মার হাঁটু জড়িয়ে ধরল।

—লজ্জা কেন গো, হাঁ করো। আমার পাঁচ বেটা বেঁচে থাকলে ঘরভরা নাতি-নাতনি থাকত তোমার বয়সের। নাও, হাঁ করো...

হাত ধুয়ে শুদ্ধ না হলে তো প্রসাদ দেওয়া যায় না, তাই একটার পর একটা ঘরে যায় বুড়ি আর বলে হাঁ করো।

প্রফেসর ঘোষ, সুপ্রিয়, শ্রীলেখাদেবী, রুমা, রেশম, মিস্টার সেন সকলকেই প্রসাদ দিল বুড়ি, দিল না শুধু বুড়ো রমণীরঞ্জন দত্তকে। কেমন লজ্জা পেল, বয়সের জন্যেই হয়তো।

তাই রমণীবাবুর ছেলেকে ডেকে বললে, হাঁ করো তো বাবা।

তাকে প্রসাদ দিয়ে তার হাতেই রমণীবাবুর প্রসাদটা পাঠিয়ে দিলে। আর রমণীবাবু যদি তাকে দেখতে পান, এই ভয়ে ঘোমটাটা একটু বেশি করে টেনে দিল বুড়ি।

তারপর ফিরে এসে শিখিনীকে বললে, দুপুরের বাসে পুরী যাচ্ছি মা, কটুকথা বলেছি বলে কিছু মনে করো না।

শিখিনী বিস্মিত হয়ে বললে, তাজ্জব বাত, দুফেরের বাসে তো আমিও পুরী যাব। এক সাথে যাব তা হলে !

বুড়ি খুশি হল। বললে, জগন্নাথ দর্শন না করে কেউ ফেরে এখান থেকে ! বেশ হবে, একসঙ্গেই যাব। তুমি মেয়ে সত্যি ভাল, ধর্ম আছে, ভক্তি আছে তোমার। যা ভক্তি দেখলাম তোমার আজ, চক্ষু সাত্থক হল। গালাগাল দিয়েছি কতবার। কিছু মনে কোরো না মা। বুড়ো মানুষ, ক্ষ্যামা করো।

শুধু শিখিনীকে বলেই ক্ষান্ত হল না, হোটেলের যাকেই সামনে পায় তাকেই বলে, পাঞ্জাবি হলে কি হবে, মেয়েটা সত্যিই ভাল। আর শিখিনী বলে, বুড়ি মাঈ বহুত ভাল, দিল্ সাচ্চা আছে বুড়ি মাঈয়ের। যারা শুনল, হাসল তারা, আবার বিস্মিত হল। রহস্যটা কেউই ধরতে পারল না।

এক সঙ্গেই চলে গেল দু-জনে দুপুরের বাসে। শিখিনী আর বুড়ি। হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল বাসটা, ক্যাপিটেল থেকে ফিরে পুরী যাওয়ার পথে।

হিমাদ্রিবাবু পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিলেন। যৌতুকী মালপত্র তুলে দিল। টুকিটাকি দু-একটা সুটকেস পুঁটলি যা ছিল।

রুমা ছ-নম্বরের জানালা থেকে দেখছিল ওদের। দেখলে, তাড়াহুড়ো করে শিখিনী বুড়ির পুঁটলিটা বাসে তুলে দিল আর বুড়ি শিখিনীর বেতের ব্যাগটা তুলে দিল গাড়িতে।

তারপর শিখিনী বুড়িকে ধরে ধরে বাসে তুলল আর তা দেখে রুমা হেসে উঠে ডাকলে, রেশম, শিগগির শিগগির মজা দেখবি আয়।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল। অস্ফুটে বললে, কাণ্ড!

সকালের ট্রেন চলে যেতেই হ্যান্ডবিলের রাশি আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে ব্যর্থ বিষণ্ণ মনে প্যাড্‌ল করছিলেন হিমাদ্রিবাবু।

এবারের মরসুমটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি। ব্রজমাধব ভট্টাচার্যও চলে গেলেন রেলের ধর্মঘট হতে পারে এই ভয়ে। ওদিকে টেলিগ্রাফ এসেছে রমণীবাবুর কাছে, তাঁর ছোট ভাইয়ের মরণাপন্ন অসুখ। একে একে সব ঘরগুলোই খালি হয়ে যাচ্ছে, অথচ নতুন বোর্ডারের দেখা মিলছে না। এই শীতের সময়টুকু যা কিছু রোজগার, এদিকে কাল থেকে আবার হঠাৎ গরম পড়ে গেছে। লক্ষ্মীবউ আসছে না কদিন থেকে, তার ছেলের নাকি মায়ের দয়া হয়েছে। খবরটা চেপে রেখেছেন, বোর্ডাররা শুনলে সব একদিনে পালাবে। ফেরার পথে ডাক্তারখানায় একবার বলে গেলেন, হোটেলে টিকে দেবার লোক পাঠাতে।

সাইকেল চালিয়ে পান্থপাদপে ফিরে আসতে আসতে হিমাদ্রিবাবু ভাবলেন, এ-বছর আর তেমন বোর্ডার এল না, সুতরাং স্যানিটারি আর হল না। অথচ স্যানিটারি না হলে বোর্ডার আসবে না।

সিদ্ধেশ্বর মিথ্যে। হাজার হাজার লোক সিদ্ধেশ্বরের পুজো দিতে আসছে, অথচ হিমাদ্রিবাবু জানেন, সিদ্ধেশ্বরের পুজো দিয়ে যদি কিছু হত, তাহলে পান্থপাদপের আজ পাঁচতলা বাড়ি হয়ে যেত, স্যানিটারি তো সহজ কথা।

সাইকেলটা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়তেই বাগানের দিকে চোখ গেল। বাঃ বাঃ! সুপ্রিয়বাবু বাগানে আর মিস্টার সেনের মেয়ে রুমা ছ-নম্বরের জানালায়। এক পলকে দেখে নিলেন হিমাদ্রিবাবু, সুপ্রিয় ইশারায় ডাকছে রুমাকে, আর রুমা অভিমানভরে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাচ্ছে। কৌতুকের হাসি হাসলেন হিমাদ্রিবাবু। নতুন কিছু নয়। এমন কত দেখেছেন তিনি, কতবার দেখেছেন। ক-টা দিনের জন্যে আসে, আর তারই মধ্যে দিব্যি ভাব জমিয়ে নেয়। মনে হয়, এই বুঝি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু তার সময় হয় না, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। একজন আরেকজনকে ছেড়ে চলে যায়। মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকে দ্বিতীয় জন। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। স্লেটের লেখা দুফোঁটা চোখের জলেই মুছে যায়। অবশ্য সব সময়ই মুছে যায় না। কেউ কেউ ফিরে গিয়েও লাটাইয়ের সুতো গুটোতে চেষ্টা করে। পারেও।

একবার মনে আছে, পুলিস তাঁর হোটেলেও খবর নিতে এসেছিল। এখানেই আলাপ হয়েছিল ছেলেটির আর মেয়েটির। হিমাদ্রিবাবু তখন অবশ্য সন্দেহ করেননি। একদিন তারা চলেও গেল, দু-দিন আগে পিছে। তারপর প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তাদের কথা। মাস কয়েক পরে হঠাৎ খবর পেলেন, তারা নাকি বাপ-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে, বিয়ে করে ঘর ছেড়েছে। তাঁর হোটেলেও খোঁজ নিতে এসেছিল পুলিস।

না, হিমাদ্রিবাবু এসব দিকে চোখ দেন না। উনি শুধু দেখে যান, দেখেন আর হাসেন মনে মনে। সুপ্রিয়কে যেমন গৌতম সম্পর্কে সাবধান হতে বলেননি, তেমনি মিস্টার সেনকেও কিছু বলবেন না। জানেন আগে থেকে সাবধান করতে গেলেই দু-পক্ষের এক পক্ষ চটে যাবে। চলে যাবে বাক্স বেডিং গুছিয়ে নিয়ে। তার চেয়ে নিঃশব্দে দেখে যাওয়াই ভাল।

নিঃশব্দে দেখে যায় সকলে, দেখে আর মনে মনে হাসে। কেউ কিছু বলে না। টের পেয়েছে সকলেই, কিন্তু টের পেয়েও চুপ করে থাকে। শুধু রমণীবাবু প্রথম প্রথম একটু

চটতেন, আবার সুপ্রিয়কে উৎসাহও দিতেন। ইদানীং শিখিনীর দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলেন তিনি। তাই চটতেন না, আলোচনাও করতেন না সুপ্রিয়র সঙ্গে। এবার গায়ত্রীদেবী আসায় শিখিনীর অভাবটুকু অনুভব করেননি।

গায়ত্রীদেবী যখনই ঘরের বাইরে আসেন, রমণীবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। গায়ত্রীদেবীর সাজপোশাক দেখেন, না তাঁর রূপযৌবন, গায়ত্রীদেবী নিজেও বুঝতে পারেন না। কি করে বুঝবেন! পুরু লেন্সের চশমার ফাঁকে রমণীবাবুর চোখের তারা দুটো ঘোলাটে দেখায়।

গায়ত্রীদেবী বেড়াতে বেরোন না বড় একটা, বিশেষ করে সকালের দিকে, সন্ধের পর একবার মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যান, গিয়ে বসেন বিন্দুসরোবরের ধারে। কংক্রিটের বেঞ্চিতে, আবছা আলোয়। নিথর কালো জলের দিকে তাকিয়ে, ব্যাঙের ভয়ে পা তুলে বসে তুতুনের সঙ্গে গল্প করেন কখনও, কখনও চুপচাপ।

সুপ্রিয় জিগ্যেস করছিল, বেড়াতে যান না সকালে?

গায়ত্রীদেবী হেসেছিলেন।—আমাদের কি শান্তি আছে বেরিয়ে! দেখতে পেলেই লোকে ভিড় করে আসবে। বিখ্যাত হওয়ার যে কি জ্বালা!

রমণীবাবুর কানেও গিয়েছে সে-কথা। তাই অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রফেসর ঘোষকে উদ্দেশ করে বললেন, ফিলিম-স্টারও ভাবে সে বিখ্যাত, বুঝলেন প্রফেসর। দিনের বেলা বেরোতে পারেন না, লোকে ওঁকে দেখবার জন্যে ভিড় করবে বলে। আরে বাপু, ভিড়কে তো তোমার ভয় নেই, ভয় তাদের বাক্যবাণকে। যা সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে—

প্রফেসর ঘোষ কোনও সায় দিলেন না দেখে তাঁকে রাগাবার জন্যেই সুপ্রিয় বললে, বিখ্যাত নয়তো কি, ভিড় হোক তো দেখি আর কাউকে দেখে! ওঁরা হলেন আর্টিস্ট, অভিনয়কে সাধনা মনে করে সারা জীবন...

প্রফেসর ঘোষ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না!—অভিনয়ও আর্ট! হেসে উঠলেন সশব্দে।

আর রমণীবাবু টিপ্পনী কাটলেন, চামচিকেও পাখি!

সুপ্রিয় রাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজেই রেগে গেল। হাজার হোক, গায়ত্রীদেবী তার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন, উচ্ছ্বাসের স্বরে বলেছেন, তাঁদের সাধনার দাম দেয় না কেউ।

তাই সুপ্রিয় বললে, আর্ট নয় কেন? একটা চরিত্রকে অভিনয় করে যিনি জীবন্ত করে তুলতে পারেন...

—শাড়ি ব্লাউজ পরার কায়দাকানুন আর্ট? নাকি-নাকি সুরে প্রেমের কথা বলা আর্ট? রমণীবাবু টিপ্পনী কাটলেন।

আর প্রফেসর ঘোষ বললেন, অশালীন অঙ্গভঙ্গি করাই যাদের একমাত্র মূলধন...

চটে গেল সুপ্রিয়।—তবে যে বড় সেদিন বলছিলেন, কোনারকে ভুবনেশ্বরে বেশির ভাগ লোক শুধু ওই মূর্তিগুলোর মধ্যে অশ্লীলতাই দেখতে পায়, শিল্প দেখতে পায় না। আপনিও তো মশাই ফিল্ম-স্টারদের অঙ্গভঙ্গিই দেখেন, অভিনয় দেখতে পান না।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখোচোখি হলো রুমার সঙ্গে। এতক্ষণ লক্ষই করেনি সে, রুমা ঘরের সামনে পায়চারি করছিল। আর চোখোচোখি হতেই দেখল, রুমা একঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল। তবে কি তার কথাগুলো শুনেছে রুমা?

সুপ্রিয় এতক্ষণ রাগে গরগর করছিল প্রফেসর ঘোষের ওপর, কিন্তু রুমাকে দেখতে পেয়েই রাগ চুপসে গেল, বরং ভয়ে কেঁপে উঠল তার বুক। গতকাল রাত্তিরে তাকে

গায়ত্রীদেবীর ঘরে ঢুকতে দেখে রুমা একবারও বলেনি, ফিরে তাকায়নি, এমনকি বাগান থেকে যখন ইশারায় ডেকেছে, সাড়া দেয়নি। এখন আবার যদি শুনে থাকে যে গায়ত্রীদেবীর হয়ে সে ওকালতি করছিল...

সর্বনাশ।

রুমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই তাই সুপ্রিয় বললে, আপনারা যাই বলুন প্রফেসর ঘোষ, সিনেমাকে আর্ট বলা যায় না, আর অভিনয় জিনিসটা রীতিমত নিচু দরের আর্ট। ও একটা নোংরা ব্যাপার !

প্রফেসর ঘোষ আর রমণীবাবু চমকে উঠলেন, ফিরে তাকালেন, তারপর আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলেন, আমরা তো তাই...আপনিই তো...

—চুপ করুন মশাই, আপনি তো পৃথিবীর সব-কিছুর মধ্যেই আর্ট দেখছেন। বলে এক ধমকে প্রফেসর ঘোষকে থামিয়ে দিল সে।

প্রফেসর ঘোষ আর রমণীবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আর সুপ্রিয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল ওষুধে কাজ হয়েছে।

তবে পুরোপুরি মানভঞ্জন করতে সন্ধে পর্যন্ত সময় লাগল।

শেষ পর্যন্ত রুমা বেড়াতে বেরোবার সময় ফিসফিস করে বলে গেল, বেড়াতে চললাম মশাই, তর্ক করুন বসে বসে।

হোটেল থেকে বিন্দুসরোবর দূরে নয় মোটেই। কোনও কোনও দিন সেখানে একা একাই কাটিয়ে এসেছে রুমা।

সন্ধের সময় যখন মিস্টার সেন সপরিবারে বেড়িয়ে ফিরছেন বিন্দুসরোবরের পাশ দিয়ে, রুমা বললে, আজ যা গরম পড়েছে !

শ্রীলেখাদেবী বললেন, সত্যি, তা এসো না একটু বসেই যাই।

মিস্টার সেন আর শ্রীলেখাদেবী এগিয়ে গেলেন, আর রেশমও দিদির পিছনে পিছনে এসে বসল কংক্রিটের বেঞ্চিটাতে।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল গল্পগুজবে, চুপচাপ বসে। তারপর একসময়ে শ্রীলেখাদেবী ও মিস্টার সেন উঠলেন।

রুমা বললে, বোসো না আরেকটু।

তোরা বোস্ না।...দেরি করিস না তা বলে। বলে চলে গেলেন দু-জনেই।

শ্রীলেখাদেবী অবশ্য বহুবচনের সম্বোধনটা বিশেষ কিছু ভেবে বলেননি, তবু তাঁর ওপর রুমা রেগে গেল। মা চলে যেতেই রাগটা গিয়ে পড়ল রেশমের ওপর। কি দরকার ছিল তার রুমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকার। ছায়া তবু শুধু মাত্র দিনের আলোয় লেগে থাকে, রাতের অন্ধকারে সেও মানুষকে ছেড়ে যায়। অথচ রেশমটা হয়েছে এমন, দিনরাত কোনও সময়েই ছাড়বে না, পায়ে পায়ে লেগে আছে।

সুপ্রিয় এখনই এসে পড়বে নিশ্চয়। ওদের ঘরটিতে আলো জ্বলতে দেখলেই বুঝবে বাবা মা ফিরে গেছে। রেশমটা যে সেঁটে আছে আমার সঙ্গে তা কি আর বুঝতে পারবে !

রুমা চুপচাপ বসে বসে রেশমের আজেবাজে প্রশ্নের পিঠে অনিচ্ছার সাড়া দেয় আর এদিক ওদিক তাকায়। দূরে দূরে ইলেকট্রিকের আলো, এদিকটা তাই স্পষ্ট দেখাও যায় না, চেনা যায় না লোকগুলোকে। কত লোকই তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে।

কিছুটা আশায় আর কিছুটা ভয়ে তাকাতে তাকাতে দূর থেকে হঠাৎ সুপ্রিয়কে ছায়া ছায়া দেখতে পেয়েই রুমা উঠে দাঁড়াল চট করে।—এই রেশম, সুপ্রিয়বাবু যাচ্ছেন রে !

রেশম সুপ্রিয়কে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে দিদি যখন তার সঙ্গে যেচে কথা বলে। তাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, তা কি এমন অষ্টম আশ্চর্য ঘটল।

বেড়াতেই তো এসেছেন, বেড়াতে যাবেন না ?

রুমা একটু ঘা খেল, অপ্রতিভ হল, তারপর বলল, না, তাই বলছি।

সুপ্রিয়কেও কেমন হতাশ দেখাল। বিচ্ছুটা যে রুমার কাছে কাছেই থাকবে তা একবারও ভাবেনি সুপ্রিয়।

তাই আবছা অন্ধকারে রুমাকে খুঁজতে খুঁজতে রেশমকে চিনতে পেরেই আমতা আমতা করে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই ভয়ে আঁতকে উঠে তিড়িংবিড়িং করে লাফ দিয়ে একেবারে সুপ্রিয়র ঘাড়ের ওপর পড়ল রুমা।—কি রে একটা, পায়ের ওপর দিয়ে গেল।

টর্চের আলোটা মাটিতে ফেলে সুপ্রিয় বললে, ব্যাঙ, ব্যাঙ লাফাচ্ছে।

বলে রুমার শরীরটা এক পলকের জন্যে স্পর্শ করেই সরে গেল। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তেই সুপ্রিয়র হাতের ওপর একটা চিমটি কেটে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেছে রুমা।

রুমা মরিয়া হয়ে সুপ্রিয়কে বললে, বসুন না এখানে, কোথায় আর যাবেন।

—তাই বসি। বলে বসল সুপ্রিয়। প্রশ্ন করলে, বেড়াতে যাননি আপনারা ?

—গিয়েছিলাম। আচ্ছা সুপ্রিয়বাবু...

ধেত, কেবল সুপ্রিয়বাবু, সুপ্রিয়বাবু। দিদিটা যেন কি।

আজেবাজে কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে রেশম উঠে পড়ল। ব্যাঙ দেখে ওর বোধহয় সেই ব্যাঙের গল্পটা মনে পড়ে গেল। সেই যে একটা ছেলে খোলামকুচি ছুঁড়ে ছুড়ে ব্যাঙ মারত।

বেঞ্চি থেকে উঠে বিন্দুসরোবরের আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল রেশম। পাড় থেকে দু-মুঠো পাথরকুচি তুলে নিয়ে জলের দিকে টিপ করে ছুঁড়তে শুরু করল।

আর রেশম একটু দূরে সরে গেছে দেখেই সুপ্রিয়...ফিসফিস করে বললে, ওকে সঙ্গে আনার কি দরকার ছিল ?

—আরে, আমি এনেছি নাকি, ও নিজেই তো থেকে গেল।

বলেই রুমা ডাক দিল, এই রেশম, সরে আয়, ওদিকে যাস না।

সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয় বিরক্তিতে দন্ত্য 'চিঃচিঃ' শব্দ করল, আর রুমা তা শুনে ফুর্তিতে মূর্ধণ্য 'ট্টঃ ট্টঃ' শব্দ করল।

রেশম কিন্তু ফিরল না, ফিরে তাকালও না।

রুমা ফিসফিস করে বললে, হোটেলের সবাই কিন্তু আমাদের লক্ষ করে, দেখেছ ?

—করুক গে।

আবার কি বলতে যাচ্ছিল রুমা, হঠাৎ রেশমকে ফিরে আসতে দেখে চুপ করে গেল ও।

রেশম বললে, দিদি চল, রাত হয়েছে।

রুমা আর রেশম হোটেলের পথ ধরল, আর সেদিকে তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়। বেশ খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকাল রুমা, আর সেই মুহূর্তে তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলল সুপ্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে রুমাও টর্চের আলো ফেলল সুপ্রিয়র মুখে। পরক্ষণেই দুটো টর্চই নিবে গেল। দুটো আলোই! জ্বলে রইল শুধু দু-জনের বুকের ভেতর।

ভোর হতেই হিমাদ্রিবাবু প্রতিদিনের মতই খুরপি হাতে গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরের পিছনের বাগানটিতে। পায়ে মাড়ানো বেগুনের চারাগুলো আবার হলহলে হয়ে উঠেছে,

ফুল ধরতে শুরু করেছে দু-একটা। কুমড়ো গাছটাও লতিয়ে লতিয়ে রান্নাঘরের টিনের চালায় উঠেছে। কুমড়ো ধরতে শুরু করেছে। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুর মনে আনন্দ নেই। শুধু দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। এত বড় পরিবারটার খাওয়া-পরা চালাতে হয় এই কটা মাসের রোজগারে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এই সিজন্‌টায় অনেক লাভ হবে। কিন্তু কপালে না থাকলে হবে কি করে।

বুড়ি চলে গেছে। আর পাঞ্জাবি মেয়েটাও। ছোট ভাইয়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে রমণীবাবুও চলে গেলেন। অবশ্য টেলিগ্রাম পেয়েও রমণীবাবুকে বিচলিত হতে দেখেননি। যেন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রমণীবাবুর। তবু চলে যেতে হল তাঁকে। একে একে সকলেই চলে যাবে। মিস্টার সেনের পরিবার, গায়ত্রীদেবী, প্রফেসর ঘোষ, সুপ্রিয় ছোকরা—এরাও চলে যাবে, আজ হোক কাল হোক। তারপর আবার শ্মশান হয়ে যাবে পান্থপাদপ হোটেল অ্যান্ড স্যানাটোরিয়াম।

খুরপি ফেলে হাত পা ধুয়ে হ্যান্ডবিলের তাড়াটা আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে সাইকেলে উঠলেন হিমাদ্রিবাবু। সকালের ট্রেনটা দেখতে হবে, যদি নতুন কেউ এসে পড়ে।

হিমাদ্রিবাবু যাবার পর গায়ত্রীদেবী মেয়েকে নিয়ে গাঁদা ফুলের বাগানে ঢুকলেন। আর ছ-নম্বরের জানালা থেকে তাদের দেখে রুমাও নেমে এল।

এসে এক মুখ হেসে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করব করব ভাবি, আপনার দেখাই পাই না।

গায়ত্রীদেবী ওজন করে হাসলেন, তারপর নাকি সুরে বললেন, কি করে দেখবেন বলুন, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বের হতে পারিনে। লোকগুলো এমন ভিড় করে।

রুমা বললে, কত নাম আপনার, ভিড় তো করবেই।

—আমার কিন্তু, জানেন, একটুও ভিড় ভাল লাগে না। সেই জন্যে তো প্লেনে এলাম। তাছাড়া সময়ও বাঁচে, ফিরে গিয়ে তো আবার শুটিং-এর ডেট আছে।

—ও! আচ্ছা, এখন কি ছবি করছেন?

গায়ত্রীদেবী চোখ কপালে তুললেন, ওমা, একটা নাকি? পেপারে দেখেননি। আমি একসঙ্গে ছ-টা ছবিতে সই করেছি। আজকাল অবশ্য নতুন অনেক আসছে। কিন্তু কেউ অভিনয়ও জানে না, আর প্রেজেন্টেব্‌ল্‌ চেহারাও নেই। আমাদের হয়েছে বিপদ, সব প্রোডিউসরই ধরে বসে, আমার ছবিতে নামতেই হবে, তা না হলে বই ফ্লপ করবে। কি করি বলুন...

এ-সব কথা শুনতে অবশ্য ভাল লাগে না রুমার। কেবল বড় বড় কথা। আর এই সব শুনেই হিমাদ্রিবাবু এত আদর-যত্ন করেন গায়ত্রীদেবীর। প্রথম প্রথম রুমাদের সুখ-সুবিধের দিকেই চোখ ছিল হিমাদ্রিবাবুর। অন্যান্য বোর্ডাররাও কত সমীহ করত মিস্টার সেনকে। বড় অফিসার, বাড়ি আছে বালিগঞ্জে, শিক্ষিত মেয়ে রুমা...এসবের কথা সকলেই ভুলে গেল গায়ত্রীদেবী আসতেই। মিস্টার সেনের সঙ্গে যেন কোন তফাত নেই বুড়ো রমণীবাবুর, যিনি চলে গেলেন ছোট ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে কিংবা ওই শিবনাথবাবু, সারাদিন যিনি রোদ্দুরে রোদ্দুরে টহল দিয়ে বেড়াতেন আর সারা রাত টাইপরাইটার খটখট করতেন।

রুমাদের যতদিন পর্যন্ত বিশেষ মর্যাদা দিত সকলে, ততদিন কোনও অভিযোগ ছিল না রুমার। অন্যায় বলে মনে হত না। কিন্তু গায়ত্রীদেবী আসার পর রুমারা যেই অন্য সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেল, তখন থেকেই রুমাদের মনে হয়েছে, সবাই যখন সমান টাকা দেয় তখন একজনকে এত তোয়াজ করা হিমাদ্রিবাবুর উচিত নয়।

উচিত নয় জেনেও তুতুনকে কাছে ডেকে একটু আদর করে ফেলল রুমা। বললে,

তুমি বড় হয়ে কি হবে তুতুন ?

—আমি পুলিস হব।

—পুলিস ? সশব্দে হেসে উঠল রুমা। গায়ত্রীদেবীও।

রুমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হর্ন শুনতে পেল। একটা গাড়ি, ধুলো উড়িয়ে এসে দাঁড়াল গ্যেটের সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন স্যুট পরা এক ভদ্রলোক।

এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ এখানে এসেছেন কিনা বলতে পারেন ?

রুমা এগিয়ে এল।—হ্যাঁ, আছেন। ন-নম্বর ঘরে।

ভদ্রলোক তরতর করে ওপরে চলে গেলেন, আর কৌতূহল চাপা দিতে না পেরে রুমাও পিছনে পিছনে গেল।

ন-নম্বরের সামনে এসে আর উঁকি দিতে হল না। আগন্তুক ভদ্রলোক তখন রীতিমত ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন।—না না, কমলবাবু। এখুনি যেতে হবে। এ আপনার অন্যায়।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, বেশ তো, হিমাদ্রিবাবু আসুন. হিসেব মেটাই...

নবাগত ভদ্রলোক ততক্ষণে একটা ট্রাঙ্ক টানতে শুরু করেছেন।—না, না কমলবাবু। আপনি এখানে এসেছেন অথচ আমাকে খবর দিলেন না। ক্যাপিটেলে আমার বাড়ি থাকতে আপনি কিনা এই হোটেলে...

প্রফেসর ঘোষ কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু ভদ্রলোক শুনলেন না কিছু। বললেন, হিমাদ্রিবাবু আমাদের বহুকালের চেনা, টাকাপয়সা পরে মেটালেও চলবে, চলুন আপনি।

হিমাদ্রিবাবু না এলেও হয়তো চলে যেতে বাধ্য হতেন প্রফেসর ঘোষ, কিন্তু ভাগ্যক্রমে হিমাদ্রিবাবু ফিরে এলেন তখনই, টিকে দেবার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যাপারটা যখন শুনলেন, তখন মুখে হাসি টেনে তাঁকেও বলতে হল, তা প্রফেসর ঘোষ, বিজনবাবুর সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্ব যখন...

টাকা পয়সা মিটিয়ে নিয়ে যৌতুকীকে ডেকে দিলেন হিমাদ্রিবাবু। যৌতুকী এল, তেমনি হলদে দাঁত বের করে হাসল, মালপত্র নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

আর প্রফেসর ঘোষ যখন বকশিস দিতে গেলেন তাকে, দেখলেন ঠাকুর চাকরের দলও সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকলের হাতে বকশিস দিয়ে প্রফেসর ঘোষ বললেন, লক্ষ্মীবউ কই ?

যৌতুকী চোখ ছলছল করে বললে, লক্ষ্মীবহুর পিলাটা মরি গলা।

—মারা গেছে ? ছেলে ? কেন ?

—গুটি হইছিলা, মরি গলা।

অর্থাৎ বসন্ত। প্রফেসর এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। যাক, হোটেলটা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ভালই করলেন। লক্ষ্মীবউ দুধ দিয়ে গেছে সেদিনও—ঘর মুছে দিয়ে গেছে। অথচ বসন্ত হয়েছে ছেলের, বলেনি তো !

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন প্রফেসর ঘোষ, হিমাদ্রিবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন বাঁধানো খাতাটা নিয়ে। সামনে সেটা মেলে ধরে বললেন, একটা কিছু লিখে দিয়ে যাবেন না ?

প্রফেসর ঘোষ খসখস করে খানিকটা লিখে সই করে দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিল।

রেশম অনেক আগেই লক্ষ করছিল যৌতুকী প্রফেসর ঘোষের মালপত্র নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তা দেখে ছুটে এসে খবর দিয়েছিল।

মিস্টার সেন তাড়াতাড়ি নেমে এলেন, রুমা এবং রেশমও।

—চলে যাচ্ছেন নাকি প্রফেসর ঘোষ ?

—না, বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হচ্ছে। হোটেলে থাকতে দেবেন না উনি। বলে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

গাড়িটা চলে যেতেই রেশম বলে উঠল, প্রফেসরটা কি রে দিদি, যাওয়ার সময় দেখা করেও যায় না। এর চেয়ে রমণীবাবু বুড়োটা ভাল ছিল, সবারই সঙ্গে দেখা করে গেছে।

মিস্টার সেন হাসলেন ছেলের কথায় সায় দিয়ে। ব্যাপারটা সত্যি তাঁরও খারাপ লেগেছিল। পাশাপাশি একসঙ্গে রইলেন ভদ্রলোক, কোনারক গেলেন এক গাড়িতে, অথচ যাবার সময় একটা কথাও না বলে চোরের মত চলে যাচ্ছিলেন, এই বা কিরকম! শ্রীলেখাদেবী বারবার বলেছেন, লোকটা ভাল মনে হচ্ছে না। তা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন মিস্টার সেন। এবার যেন স্ত্রীর বুদ্ধিকে আর স্ত্রীবুদ্ধি মনে হল না।

রুমা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বললে, বাবা রিক্‌শা ডাকতে বলবে না? উদয়গিরি খণ্ডগিরি যেতে হলে...

হ্যাঁ, ডাকতে বলি। বলে ঠাকুর-চাকরদের উদ্দেশে হাঁক দিলেন।

তারপর তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন চারজনেই। যাবার সময় রুমা একবার উঁকি দিল ন-নম্বর ঘরে। দেখলে, সুপ্রিয় ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

সন্ধের একটু আগেই ফিরল রুমারা। সিঁড়ি বেয়ে হইহই করতে করতে উঠছিল হঠাৎ, গলায় স্টেথ্‌সকোপ, হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে একজন ডাক্তারকে নামতে দেখে রুমা আর রেশম চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। কার অসুখ? সুপ্রিয়র?

না। গায়ত্রীদেবীর মেয়ে তুতুনের। সকাল থেকেই তুতুনের জ্বরজ্বর হয়েছিল, তাই চিন্তিত দেখাচ্ছিল গায়ত্রীদেবীকে। শ্রীলেখাদেবী বলেছিলেন, ছোট ছেলেমেয়েদের অমন হয় মাঝে মাঝে, ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন দাঁড়াবে কেউ ভাবেনি। দুপুর থেকেই নাকি তুতুনের জ্বর বাড়তে আরম্ভ করে। প্রলাপ বকতে শুরু করে মেয়েটা। ভয় পেয়েই তাই হিমাদ্রিবাবুকে ডাক্তার ডাকতে বলেছিলেন গায়ত্রীদেবী।

বৃদ্ধা মা, বাতের রুগি। এদিকে মেয়ের অসুখ। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

চাকরটাকে ক্যাপিটেলের দোকান থেকে বরফ আর আইসব্যাগ আনতে পাঠিয়ে মেয়ের কাছে এসে বসলেন গায়ত্রীদেবী। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন একবার।

সকাল থেকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাঁকে। চুলে চিরুনি পড়েনি, মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। কি করবেন কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কত বড় বড় ডিরেক্টর বলেছেন, গায়ত্রীদেবীর মত নার্ভ নাকি খুব কম অভিনেত্রীর আছে। টেক্‌নিশিয়ান আর অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে কত দুরূহ চরিত্র অভিনয় করেছেন তিনি। থিয়েটারও করেছেন হাজার হাজার দর্শকের সামনে। এতটুকু নার্ভাস দেখায়নি তাঁকে। অথচ আজ যখন স্টেথ্‌সকোপ হাতে ডাক্তার এসে দাঁড়াল তুতুনের কাছে, বুক দুরদুর করে উঠল গায়ত্রীদেবীর, পা কেঁপে উঠল।

ডাক্তার ভরসা দিয়ে গেল, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ভরসা পেয়েই যেন ভয় বেড়ে গেল। চোখে জল এসে গেল তুতুনের কষ্ট দেখে। ডাক্তারকে বলে দিলেন, সন্ধের সময় আবার এসে খোঁজ নিয়ে যেতে।

বিছানায় ছটফট করে তুতুন, মাঝে মাঝে অস্ফুটে কি যেন বলে, আর মা মা বলে

ডাকে।

গায়ত্রীদেবী তুতুনের কাছে আধশোয়া অবস্থায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কষ্ট হচ্ছে মা ? তুতুন। ও তুতুন।

তুতুন সাড়া দিল না, সে তখন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে আছে।

গায়ত্রীদেবী সজল চোখে তাকালেন তাঁর মার দিকে।—কি করব মা তুতুনের জ্বর যে বাড়ছে। কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না।

মার কাছ থেকে বোধহয় একটু সাহস খুঁজলেন।

বাতের শরীরটাকে সোজা করতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন তিনি। তারপর ধমক দিলেন।—দ্যাখ পানু, অত ভাবিস না।

গায়ত্রীদেবী হতাশ সুরে বললেন, বিদেশে বিভুঁই জায়গা...

মার ধমক খেয়ে রাগে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে হল। মনে হল, মা কি স্বার্থপর, কি স্বার্থপর ! এতটুকু সহানুভূতি নেই তাঁর জন্যে, এতটুকু ভালবাসা নেই তুতুনের জন্য। তুতুনকে ওরা যেন কেউ দেখতে পারে না। একফোঁটা মেয়ে, ওর কষ্ট দেখে মার মনে কষ্ট নেই এতটুকু, অথচ দুর্ভাবনায় ঘুম নেই গায়ত্রীদেবীর চোখে।

গায়ত্রীদেবীর মা তাঁর মেয়ের মনের কথা অতশত বুঝলেন না, তাই আবার মুখ বিকৃত করলেন।—মেয়েও বাপু সবারই আছে, অসুখবিসুখও সবারই হয়। তোর মত এত আদিখ্যেতা...

—কি বললে ! আদিখ্যেতা ? হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন গায়ত্রীদেবী।—মেয়ের জন্য বাড়াবাড়ি করি আমি ? কি করেছি আমি ? একটা দিন কাছে থাকতে পাই না, একটু আদর যত্ন করতে পাইনি কোনওদিন, কেন, কেন ? তোমাদের জন্য, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য টাকা রোজগারের কল বানিয়ে দিয়েছ আমাকে। নিজের মেয়ের অসুখবিসুখে কাছে বসলেও হিংসে করো...

কান্নায় রাগে দুঃখে ভেঙে পড়লেন গায়ত্রীদেবী। দু-চোখ ঠেলে জল এল তাঁর। আর চোখের জল লুকোবার জন্য তুতুনের গালের উপর মুখ ঘষলেন। ছ্যাঁক করে উঠল তুতুনের গাল স্পর্শ করতেই।

গায়ত্রীদেবীর মা ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। মেয়েকে তিনি রীতিমত ভয় পান, তবু মা বলেই দু-একটা সাহসের কথা বলে ফেলেন। মেয়ের রোজগারেই তাঁর অন্য দুটি ছেলেমেয়েরও মুখে অন্ন জোটে সত্যি। কিন্তু পানু বলে কিনা তিনি ওকে টাকা রোজগারের কল বানিয়েছেন ?

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, পানু, এত বড় মিথ্যেটা তুই বললি ? ফিলিমে তুই নিজে নামতে চাসনি ? নিজেই সব ব্যবস্থা করিসনি ? আমি একদিনও বলেছিলাম ? বরং বাধাই দিয়েছি, তুই জোর করে ঢুকেছিস তখন। আর মানুর যে বিয়ে দিতে পারলাম না, সে তো তোর বদনামের জন্যেই। তুই সিনেমায় নামলি বলেই তো মানুর বিয়ে হল না। এখন তুই তাদের দেখবি না তো কে দেখবে শুনি ?

গায়ত্রীদেবীর সারা শরীর জ্বলে গেল রাগে। নিমকহারাম, সব নিমকহারাম। ভাই বোন, মা, বাপ, সব—সব সমান। তা না হলে দিনরাত তুতুনের কথা তুলে খোঁটা দেবে কেন ওরা। হিংসে, তুতুনের জন্যে এতটুকু ভাবতে দেখলেও হিংসে হয় ওদের।

গায়ত্রীদেবী আর কোনও কথা বললেন না। চাকরটা বরফ আর আইস ব্যাগ নিয়ে এসেছে ততক্ষণে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বরফ গুঁড়ো করে নিজেই নিয়ে গেলেন। গিয়ে বসলেন মেয়ের মাথার কাছে।

সন্ধের সময় ডাক্তার এল আবার। নাড়ি দেখে বললে, ভয়ের কিছু নেই, জ্বর কমে

আসছে।

কিন্তু জ্বর একেবারে ছাড়ল না।

রাত্রে রুমা আর শ্রীলেখাদেবী যতবার এসেছেন, উঁকি দিয়েছেন, ততবারই দেখেছেন তুতুনের মাথায় আইস ব্যাগ ধরে বসে আছেন গায়ত্রীদেবী। চোখে ঘুম নেই।

শ্রীলেখাদেবী কাছে এসে দাঁড়ান এক একবার। ফিসফিস করে জিগ্যেস করেন, তুতুন কেমন আছে। জ্বর কমছে কিনা।

ফিসফিস করে উত্তর দেন গায়ত্রীদেবী, পাছে কথা শুনে তুতুনের ঘুম ভেঙে যায়।

নিজের ঘরটিতে ফিরে এসে শ্রীলেখাদেবী স্বামীকে উদ্দেশ করে বলেন, শুনছ, মেয়েটার অসুখ নিয়ে বেচারি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে। সারা রাত বোধহয় ঘুমোতে পাবে না।

মিস্টার সেন হেসে বলেন, রেশমটা কি সেবার কম ভুগিয়েছিল। একবার তুমি আইস ব্যাগ ধরছ, একবার আমি...

শ্রীলেখাদেবী সস্নেহে হাসির চোখে রেশমের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টিটা যেন সাদর আশীর্বাদের মত রেশমের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে চাইল। শ্রীলেখাদেবী বললেন, তাই বলছি, লোকে কত ভুল বোঝে। ফিল্ম্-স্টাররা যেন মা নয়, বউ নয়, শুধু ফিল্ম্-স্টার, মায়া-দয়া নেই শরীরে। আমিও তাইই ভাবতাম, ভুল ভেঙে গেল আজ গায়ত্রীদেবীকে দেখে।

রুমা বললে, কাল সকালেই নাকি টেলিগ্রাম করবেন, বড় ডাক্তার আনবার জন্যে। সত্যি, একটা দিনে গায়ত্রীদেবীর চেহারাটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ!

—হুঁ। শ্রীলেখাদেবী কি যেন ভাবলেন একমুহূর্ত। তারপর বললেন, আমাদের আর থেকে কাজ নেই। যদি টাইফয়েড হয়, বলা তো যায় না, ছোঁয়াচে রোগ...রেশম সেবারে যা ভোগান ভুগিয়েছিল?

মিস্টার সেন বললেন, না, টাইফয়েড নয় বোধহয়।

খাওয়াদাওয়ার পর আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েও কথাবার্তা চলল। কিন্তু শ্রীলেখাদেবীর ইচ্ছে নেই থাকার। কি থেকে কি হয় কে বলতে পারে।

মিস্টার সেন শুধু বলছেন, এতদিন পরে ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলাম, তাও দু-দিন যেতে না যেতেই পালাব?

শেষ পর্যন্ত মিস্টার সেনের মতটাই রইল, কারণ তাঁর কথার উত্তরে শ্রীলেখাদেবী কি প্রতিবাদ করলেন তা শুনতে পেলেন না মিস্টার সেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠলেন যখন, তখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে সুপ্রিয়র ঘরের সামনে। চাকর-ঠাকুর, যৌতুকী, হিমাদ্রিবাবু।

কি ব্যাপার!

ব্যাপারটা জানবার জন্যেই মিস্টার সেন পাইপ মুখে দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই ওদিকের ঘর থেকে গায়ত্রীদেবী ডাক দিলেন।

এ কি চেহারা হয়েছে গায়ত্রীদেবীর? মিস্টার সেনও চমকে উঠলেন। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, সারারাত না ঘুমোনোর জন্যে মানুষের চেহারা কি এতখানি বদলে যায়! চুলে যেন জট পড়ে গেছে, শুকনো মুখে বয়সের রেখা।

গায়ত্রীদেবী এগিয়ে এলেন—হিমাদ্রিবাবু। ভেবেছিলাম বড় ডাক্তার পাঠাবার জন্যে টেলিগ্রাম করে দেব কলকাতায়, কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। আমাকে আজ বিকেলের প্লেনেই টিকিট জোগাড় করে দিন চারখানা।

মিস্টার সেন বললেন, জ্বর কমেনি তুতুনের?

—না, দেখুন তো কি মুশকিল, আমি একা মানুষ, ভাল ডাক্তার নেই...

হিমাদ্রিবাবু সান্ত্বনা দিলেন। —ডাক্তার এনে দিচ্ছি, ক্যাপিটেলের ভাল ডাক্তার, এত ভয় পাবেন না।

—না, না, প্লেনের টিকিট এনে দিন। আমি আজই চলে যাব। কলকাতায় না গেলে ও সারবে না।

মিস্টার সেনও সায় দিলেন। —হ্যাঁ, কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল, বলা তো যায় না, যদি বাড়াবাড়ি কিছু একটা হয়।

বাধ্য হয়েই হিমাদ্রিবাবুকে বেরিয়ে পড়তে হল সাইকেল নিয়ে। আর হিমাদ্রিবাবু বেরিয়ে যেতেই যৌতুকী এসে ঢুকল ছ-নম্বর ঘরে।

শ্রীলেখাদেবী তখন মৌজ করে সকালের চা-খাবার খাচ্ছেন। রুমা দাঁত মাজছে।

যৌতুকী এসে ফিসফিস করে বললে, নয় নম্বরেরো অঙ্গে দরদ হউছি।

ন-নম্বর, অর্থাৎ সুপ্রিয়।

রুমা বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে ?

—দরদ। ব্যথা হউছি।

রুমা খিলখিল করে হেসে উঠল। —গায়ে ব্যথা হয়েছে ? তা হলই বা।

যৌতুকী রুমার মুখের দিকে একবার, শ্রীলেখাদেবীর মুখের দিকে একবার তাকাল। বিস্মিত হল রুমাকে হাসতে দেখে। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

ব্যথা হউছি। নিজের মনে আবার হেসে উঠল রুমা। বাতের ব্যথা না ফিক ব্যথা ; দেখতে হবে তো ব্যাপারটা কি। একটু ঠাট্টাও করা যাবে। ঠাট্টা করলে অবশ্য রেগে যাবে সুপ্রিয়। যা রাগ মহাপুরুষের। মন রেখে চলা দায়। পান থেকে চুন খসলেই বাতাবি লেবুর মত মুখ করে থাকবে।

মুখ হাত ধুয়ে, ব্রাশটা সেলফে তুলে রেখে আঁচলে ভিজে মুখ মুছতে মুছতে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকল রুমা। ঠাট্টার সুরে কি বলবে, তাও বোধহয় ঠিক করেই এসেছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। কি ব্যাপার। এমন ছটফট করছে কেন সুপ্রিয় বিছানায় পড়ে পড়ে। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল সুপ্রিয়। তবু ওর মুখের ভাবটুকু দেখে রুমা বুঝতে পারল অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

রুমা কাছে এসে দাঁড়াল। —এই ! কি হয়েছে ? অমন করছ কেন ?

বালিশ থেকে মুখ তুলে অনেক কষ্টে যেন তাকাল সুপ্রিয়। আর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়র চোখের কোণ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বালিশের ওপর।

সুপ্রিয়র কপালে হাত রাখল রুমা। উঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। মাথার কাছে বসে পড়ল।

সুপ্রিয় চোখ মেলে তাকাল, হাত বাড়িয়ে রুমার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, এখানে বোসো না, লক্ষ্মীটি, যাও, ঘরে যাও।

—তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো তো। আমি ডাক্তার ডাকতে বলছি।

সুপ্রিয় বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, ডাক্তার ! খবর দিয়েছেন হিমাদ্রিবাবু। তুমি যাও, তুমি যাও।

সুপ্রিয়র অবস্থা দেখে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল রুমার। তবু মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে বলল, কেন, তাড়িয়ে দিতে চাইছ কেন বলো তো !

সুপ্রিয় যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল হঠাৎ। রুমা দেখল, যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সুপ্রিয়র। ধীরে ধীরে সুপ্রিয়র মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিল রুমা। কোনও কথা বললে না।

খানিক পরে সুপ্রিয় চোখ মেলে তাকাল রুমার দিকে। তাকিয়ে রইল দুটি ব্যথাক্লিষ্ট চোখ মেলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তুমি যাও রুমা, তুমি যাও।

—এমন করছ কেন বলো তো। রুমার চোখেও যেন অভিমান ফেটে পড়ল। বললে, আমাকে তাড়াতে পারলে তুমি বাঁচো, না ?

ম্লান হাসি খেলে গেল সুপ্রিয়র মুখে। ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর বললে, আমার ভয় হচ্ছে রুমা, মনে হচ্ছে...

বাইরে জুতোর শব্দ শুনেই উঠে দাঁড়াল রুমা, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখলে, যৌতুকীর পিছনে পিছনে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে সেই ডাক্তার ঢুকল ঘরে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন মিস্টার সেন। ডাক্তার দেখে তিনিও এলেন। আর তাই রুমাকে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হল।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন মিস্টার সেন। এসে শ্রীলেখাদেবীকে বললেন, হাঙ্গামা বাধাল দেখছি। ডাক্তার তো সন্দেহ করছে...

সন্দেহ নয়। সন্ধের আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। সারা শরীরে তখন গুটি

স্মল পক্স। বসন্ত। বড় বড় ফোস্কার মত গুটি সারা শরীরে, মুখে, চুলের গোড়ায়।

না, গায়ত্রীদেবী অসুস্থ মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। বিকেলের প্লেনে চলে গেলেন তিনি, আর তা দেখে মিস্টার সেন ভেবেছিলেন বাঁচা গেল। তুতুনের যদি টাইফয়েড হয়, আর তার ছোঁয়া লেগে যদি রেশম বিছানা নেয়, এই ভয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। গায়ত্রীদেবী যখন চলে গেলেন, মিস্টার সেন স্ত্রীকে এসে বলেছিলেন, যাক বাঁচা গেল।

কিন্তু নতুন একটা বিপদ দেখা দেবে ভাবতে পারেননি। সন্ধের আগেই ডাক্তার এল আবার। বললে, হ্যাঁ, পক্সই।

ভয় পেয়ে গেলেন মিস্টার সেন আর শ্রীলেখাদেবী। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন বিভ্রান্তের মত।

তারপর কি যেন ভাবলেন দু-জনেই। যৌতুকীকে ডাকলেন। বললেন, মালপত্র তেরো নম্বরে নিয়ে চলো।

ছ-সাত নম্বরের একটা ঘর পরেই সুপ্রিয়। তার চেয়ে হোটেলের একেবারে ও-প্রান্তে তেরো নম্বরে সরে যাওয়া অনেক ভাল। তবু কিছুটা দূরত্ব থাকবে।

তেরো নম্বরে উঠে গিয়ে রুমা আর রেশমকে বললেন, খবরদার ওদিক দিয়ে যেয়ো না। সাংঘাতিক রোগ—পক্স।

রুমা শুনল, চুপ করে রইল। রোগের নাম শুনে ওরও যে ভয় না হয়েছে তা নয়। সুপ্রিয়র জন্যে যত না কষ্ট হয়েছে নিজের জন্যে ভয় হয়েছে তার চেয়ে বেশি। ওর এক কলেজের বন্ধুর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল হঠাৎ। কি সুন্দর চেহারা ছিল মেয়েটার, কি কুৎসিতই না হয়ে গিয়েছিল। শুধু রূপের কথাই নয়। চিরজীবনের জন্যে দুটো চোখই হারিয়েছিল মেয়েটি। অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলেজে আসত একটি ঝিয়ের হাত ধরে ধরে, ফিরত তার সঙ্গেই। কতদিন তাকে সিঁড়িতে হোঁচট খেতে দেখেছে রুমা, কতবার অনুনয় করেছে সে রুমার কাছে, পড়ার বই থেকে দু-পাতা পড়ে শোনাতে।

তার কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল রুমা। ভাবলে, না, যাবে না সে সুপ্রিয়র কাছে। ছিঃ ছিঃ, কি বোকা সে, সকালে অতবার করে সুপ্রিয় ওকে চলে যেতে বলল, তবু বোকার মতো কেন সুপ্রিয়র বিছানায় বসতে গেল। কেন স্পর্শ করল সুপ্রিয়কে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেল কেন ? যদি সেজন্যই কিছু হয় রুমার ?

তেরো নম্বর ঘরে শুয়ে পড়লেন মিস্টার সেন আর শ্রীলেখাদেবী। বললেন, শুয়ে পড় রুমা, কাল ভোরে উঠতে হবে। কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব, আর নয়।

সেই ভাল। বারো নম্বর ঘরের দু-খানা তক্তপোশের একখানায় গড়িয়ে পড়ল রুমা, আরেকখানায় রেশম।

—দিদি, তোর ভয় করছে না?

—কিসের।

—ভূতের, আবার কিসের। কেউ কোথাও নেই।

রুমা উত্তর দিল না। না, আজ আর ভূতের, চোরের, ডাকাতের, এমনকি মানুষেরও ভয় নেই তার। আজ শুধু রোগের ভয়। অথচ গতকাল পর্যন্ত সন্ধের পর বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকতেও গা ছমছম করেছে তার। একে একে সব ঘরই তো খালি হয়ে গেছে।

এই সেদিন, যখন প্রথম এল ওরা। সারা হোটেল গমগম করছে। ঘরে ঘরে লোক, কত হাসি-হল্লা, কত ফুর্তি। কত আশা, আনন্দ। আর আজ? চোখের সামনে একে একে সকলেই চলে গেল। রমণীবাবু, ব্রজমাধববাবু, মিসেস ভট্‌চাজ, গৌরীদেবী। গৌরীদেবীর ছেলে বাদল যাবার দিনে সকলকে একটা করে লজেন্স দিয়ে গিয়েছিল। আর শিখিনী, শিবনাথবাবু, বুড়িমা। সকলেই চলে গেল, এমনকি প্রফেসর ঘোষও। সকলকেই বুঝি চলে যেতে হয়। কেউ আগে, কেউ পরে। রুমাদেরও চলে যেতে হবে।

কত কি উদ্ভট কথা মনে আসে রুমার। চিন্তার জাল জট পাকায়। জট পাকায় আর জট খোলে। আর ফাঁকে ফাঁকে চমকে ওঠে সুপ্রিয়র আর্তনাদ শুনে। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়। সুপ্রিয়কে সত্যিই কি ভালবেসে ফেলেছে রুমা? নাকি শুধু ভাল লাগা? ভালবেসেছে যদি, তবে কেন সুপ্রিয়কে ভয় পাচ্ছে সে, রোগকে ভয় পাচ্ছে! ভালবাসেনি? তাহলে ঘুম নামছে না কেন তার চোখে! বারবার সুপ্রিয়কে মনে পড়ছে কেন? সুপ্রিয়র আর্তনাদ ভেসে আসছে যখনই, ওর বুকের ভেতর কেন একটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

না, কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না রুমা। ঘুমোতে পারছে না। কাল সকালেই চলে যেতে হবে। এ হোটেল ছেড়ে, সুপ্রিয়কে ছেড়ে। এই দিন ক-টিকে ছেড়ে।

শুধু ছেড়ে যেতে পারবে না এ ক-টা দিনের স্মৃতি। স্মৃতিটুকু।

—রেশম! খুব হাল্কা চাপা গলায় ডাকল রুমা।

সাড়া পেল না।

রেশম বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে রেশম।

বিছানা ছেড়ে উঠল রুমা। জানালার কাছে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গেল। এ কি, যৌতুকী জল দিয়ে যায়নি? যৌতুকীর তো ভুল হয়নি কোনও দিন। ভুল হয় না।

জল নেই এক ফোঁটাও। অথচ বড় তেষ্টা পেয়েছে তার। ম্যাকে ডাকবে?

থাক।

উঠল রুমা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খিল খুলল কপাটের। বাইরে বেরিয়ে এল।

সুপ্রিয়র চিৎকার ভেসে আসছে থেকে থেকে। বেচারি একা মানুষ, কেউ কোথাও নেই। হয়তো বাপ-মার কাছে খবর দেননি হিমাদ্রিবাবু। হয়তো—

আঃ, কি চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কি সুন্দর জ্যোৎস্নার রাত। দূরে দূরে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোয়। মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছপালা,

রেল লাইনের বাঁকটা। ওদিকের বারান্দায় মাধবীলতার একগোছা ফুল নুয়ে পড়েছে, দুলছে হাওয়ায়।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে এল রুমা। যাবে? ঢুকবে সুপ্রিয়র ঘরে? ভয়? ভয় কিসের? সকালে তো সুপ্রিয়র শিয়রের কাছটিতে বসেছিল সে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হবার হলে ওইটুকু স্পর্শের জন্যেই হয়তো ভুগতে হবে।

রূপ চলে যাবে? চোখের আলো নিবে যাবে? না, ওসবকে ভয় করে না রুমা। সুপ্রিয়ই যদি না থাকল, রূপ নিয়ে কি হবে তার? চোখের দৃষ্টি কি শুধু দেখার জন্যেই, দেখা দেবার জন্যে নয়!

লম্বা অন্ধকার নির্জন নিঃশব্দ বারান্দার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রুমা।

সুপ্রিয়র ঘরে আলো জ্বলছে। বেচারি একা একা পড়ে আছে। চিৎকার করছে। ভয় নেই রুমার, ও গিয়ে একটা সান্ত্বনার হাত রাখবে সুপ্রিয়র কপালে।

মাধবীলতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রুমা। লাল আর সাদা ফুলের থোকাটা ভেঙে নিল।

মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের দৃশ্যটুকু। ফুলটা খোঁপা থেকে পড়ে যেতেই কুড়িয়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিতে গিয়েছিল সুপ্রিয়। পারেনি।

ফুলের থোকাটা হাতে নিয়ে ন-নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল রুমা। লম্বা বারান্দার ও-প্রান্তের দিকে তাকাল। না, বাবা-মা জানে না, জানতে পারেনি।

পর্দাটা সরাল রুমা। আর চমকে উঠল।

যৌতুকী। যৌতুকী তক্তপোশের নীচে মাটিতে বসে বসে বাঁ হাতে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করছে সুপ্রিয়কে। আর ডান হাতে তার চুলে বিলি কাটছে।

টুক করে একটা শব্দ হল বুঝি। ফিরে তাকাল যৌতুকী।

প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল। তারপর নিঃশব্দে হাসল সাদা সাদা দাঁত বের করে। সেই নোংরা হলদে দাঁতগুলো সাদা দেখাল রাতের আলোয়। আর সেই বীভৎস উল্কি-আঁকা কালো মুখখানা কত সুন্দর দেখাল। স্নেহ আর সেবায় উজ্জ্বল। ঠিক যেন মায়ের মুখের মতো। রুমার মায়ের মতো, সুপ্রিয়র মায়ের মতো, সব মায়ের মতো—ম্লান, উদ্বিগ্ন, আশ্বাসে আশায় স্থির।

ইশারায় কাছে ডাকল যৌতুকী।

রুমা এল, দাঁড়াল, তাকাল সুপ্রিয়র তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের দিকে। কপালে—গুটি ওঠা কপালে হাত রাখল।

তারপর বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে আবার ফিরে তাকাল যৌতুকীর মুখের দিকে। আর কি আশ্চর্য। রুমা এবং যৌতুকী দু-জনের চোখ বেয়ে একই সঙ্গে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

ছুটে পালাল রুমা। ছুটে পালিয়ে এসে ঘরের কপাটে খিল লাগিয়ে দিল।

ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল মিস্টার সেনের। শ্রীলেখাদেবীও উঠে পড়লেন।

রুমা ঘুমোচ্ছে। রেশম ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক, ততক্ষণ নিজেদের বেডিং গুছিয়ে নেওয়া যাক।

পর্দা সরিয়ে বাইরে একবার উঁকি দিলেন শ্রীলেখাদেবী। সবে একফালি রুপালি আলো উঁকি দিয়েছে। সূর্য ওঠেনি। বারান্দার ওপারটা আবছা অস্পষ্ট। মাধবীলতার ঝাড়টা

ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে। সিরসিরে হাওয়া আসছে। ধীরে ধীরে দুলছে মাধবীলতার শাখা।

পর্দাটা খুলে ভাঁজ করে রাখলেন শ্রীলেখাদেবী। হোল্ড্-অলের ভেতর পুরে দিতে হবে। শেষ মুহূর্তে যাতে ভুলে না যান, ফেলে না যান, তাই আগে থেকেই পর্দাটা খুলে নিলেন। আর ওটা খুলে নিতেই বেশ মিষ্টি আমেজি বাতাস ঢুকল এক দম্‌কা।

মিস্টার সেন বললেন, শীত চলে গেছে একেবারে, দেখছ। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে আবার সেই ঘাম আর ঘামাচি।

শ্রীলেখাদেবী হাসলেন।—যা বলেছ। কলকাতায় শুধু গ্রীষ্ম আর বর্ষা। ছয় ঋতু শুধু রেশমদের বইয়েই আছে।

মিস্টার সেন সায় দিলেন। বললেন, বসন্ত যে কত মিষ্টি, বাইরে না থাকলে বোঝাই যায় না।

শ্রীলেখাদেবী গম্ভীর হলেন।—মিষ্টিতে কাজ নেই, ও-নাম মুখে এনো না আর। পালাতে পারলে বাঁচি।

মিস্টার সেন চুপ করলেন। একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। বললেন, তবু ভাল যে হিমাদ্রিবাবু বুদ্ধি করে টিকে দেবার লোকটাকে এনেছিলেন।

শ্রীলেখাদেবী ততক্ষণে টুকিটাকি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়েছেন। ওয়াটার-বট্‌ল্-এ জল ভরে নিয়েছেন। তোয়ালে ঢুকিয়ে নিলেন সুটকেসে। পুরনো খবরের কাগজগুলো ফেলে দিয়ে যাবেন কিনা এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর দু-খানা ট্রাঙ্কে রাখলেন। বাকিগুলো সেল্‌ফেই পড়ে রইল।

হোল্ড্-অল বাঁধতে গিয়ে হিমসিম খেলেন মিস্টার সেন। বিছানাটা রোল করে তার ওপর চেপে বসলেন শ্রীলেখাদেবী। কিন্তু বেল্‌ট আঁটিতে পারলেন না মিস্টার সেন। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠলেন দু-জনেই।

বেল্‌ট্ ধরে টানেন মিস্টার সেন, আর স্ত্রীকে বলেন, আরও চেপে বোসো না একটু।

শ্রীলেখাদেবী হাসেন আর ছোটছেলেদের মতো একবার উঠে দাঁড়িয়ে টপ করে বসেন পাকানো বিছানাটার ওপর। কিন্তু বেল্‌টের কড়াটা কিছুতেই লাগাতে পারেন না মিস্টার সেন। এক চুলের জন্যে কেবলই ফসকে যায়।

শেষ পর্যন্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুমা আর রেশমকে ডাকলেন।

ধড়মড় করে উঠে পড়ল দু-জনেই। মাঝখানের দরজা খুলে এ-ঘরে এল। তারপর ঘুম-চোখের ওপর আঁচলটা ঘষে, হাত দুটো টান টান করে একটা আড়মোড়া ভেঙে রুমা বললে, আমি দিচ্ছি, ঠিক করে।

মা আর মেয়েতে চটপট দুটো হোল্ড্-অল্‌ই বেঁধে ফেলল।

তারপর চোখমুখ ধুতে গেল রুমা আর রেশম। দু-জনের চোখেই ঘুম জড়িয়ে আছে তখনও।

রুমার চোখে শুধু ঘুম নয়, স্বপ্নও। দুঃস্বপ্ন। বেচারি সারা-রাত কাটিয়েছে দুশ্চিন্তায়। প্রথমটা ওরও ভয় হয়েছিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। ভয় কাটিয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর ভয় চলে যেতেই ওর মনে হয়েছিল, সবাই কত স্বার্থপর। মা-বাবা, এমন কি নিজেকেও বড় স্বার্থপর মনে হয়েছিল রুমার। এভাবে, এই বিপদে সুপ্রিয়কে একা ফেলে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে তাদের? কে দেখবে তাকে, কে চিকিৎসা করাবে।

মুখেচোখে জল দিয়ে একবার সুপ্রিয়র ঘরের দিকে তাকাল রুমা। একবার গিয়ে উঁকি দিয়ে আসতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সাহস হল না। যদি মা-বাবা দেখতে পায়, বকুনি দেবে নির্ঘাত।

যৌতুকীকে একবার খুঁজল। যৌতুকীকে তবু জিগ্যেস করতে পারবে সুপ্রিয় কেমন আছে। কিন্তু ডাকতে সাহস হল না তাকে। যেমন বোকা আর গোবেচারি, হয়তো মা-বাবার সামনেই বলে বসবে, কাল রাতে সুপ্রিয়কে দেখতে গিয়েছিল ও।

বলুক। হঠাৎ তীব্র একটা জ্বালা অনুভব করল রুমা। সে না বড় হয়েছে, কলেজে পড়ে! স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে! তবে! এত মা-বাবাকে ভয় পাবে কেন। কি এমন অন্যায় কাজ। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে যদি একটা অসুস্থ মানুষের খোঁজ-খবর নিতে যায় কি এমন দোষ হবে। আর রোগের ভয়ই বা কোথায়! টিকে তো নিয়েছে।

না, শেষ অবধি সাহস হল না রুমার।

ঘরে ফিরে এল। আর সে ফিরে আসতেই শ্রীলেখাদেবী বললেন, ছেলেটা কেমন আছে কে জানে।

বুঝেও না-বোঝার ভান করল রুমা। —কে? কার কথা বলছ?

শ্রীলেখাদেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। —সুপ্রিয়র কথা বলছি। ছেলেটার ওপর আমার বাপু বড্ড মায়া পড়ে গেছে। একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না ওকে এভাবে ফেলে যেতে।

সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠল রুমার। রেগে গিয়ে বলে ফেলল, ন্যাকামি কোরো না। তোমাদের যদি এতটুকু মায়াদয়া থাকত, এভাবে ফেলে যেতে না বেচারিকে। বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এল রুমার, চোখে হয়তো আর একটু হলেই জল টলটল করত।

রুমার গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টিতে কি যেন পড়লেন শ্রীলেখাদেবী। কি যেন সন্দেহ হল। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রুমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্মিত হলেন। তারপর বললেন, কি করব বল। নিজেদের কথা তো ভাবতে হবে, শেষে কি চেঞ্জে এসে একটা বড় রোগ ধরিয়ে নিয়ে যাব।

রুমা কোনও কথা বলল না, ছুটে চলে গেল জানালার ধারে। তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। পাছে চোখে জল এসে পড়ে, আর মা দেখতে পায়, বুঝতে পারে।

সত্যি, এতটা বয়স হল রুমার, কিন্তু এ-কটা দিনের মত এত আনন্দ সে বুঝি কখনও পায়নি। আনন্দ? না, এক অবোধ্য নেশার মধ্যে, একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে যেন কেটে গেছে দিনগুলো। কখনও মনে হয়নি এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, এই পান্থপাদপ হোটেল ছেড়ে, সুপ্রিয়কে ছেড়ে। এতদিন তার জীবনে সুপ্রিয় ছিল না তা ভাবতেই পারছে না রুমা। মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে যেন এমনি পাশাপাশি কাছাকাছি ছিল দু-জনে। একজন আরেকজনকে ছেড়ে যাবে, কোনওদিন ভাবেনি।

না, এভাবে চিরকালের মতো সুপ্রিয়কে ছেড়ে যেতে পারবে না রুমা। মা-বাবা, রেশম যে যা ভাবে ভাবুক। একবার, যাবার আগে অন্তত একবারটি সুপ্রিয়র কাছে গিয়ে দাঁড়াবে রুমা।

বলবে, ভুলব না।

বলবে, ভুলো না।

কিংবা অন্য কিছু, অন্য কোনও কথা। অথবা কথা নয়, শুধু চোখ মেলে দেখবে সুপ্রিয়র রোগপাণ্ডুর মুখখানা। আর সুপ্রিয়ও হয়তো চোখ মেলে দেখবে তাকে, একবার এক পলকের জন্যে বিষণ্ণ হাসি হাসবে তাকে দেখে।

না, ওসব সুন্দর সুন্দর কথা ভাববার অনেক সময় পাবে এরপর, এখন তার চেয়েও বড় কাজ আছে।

একটা কাগজে রুমা নিজের নাম আর ঠিকানা লিখল। কোনওরকমে এটা রেখে যেতে

হবে সুপ্রিয়র কাছে।

কি বোকা সে, কি বোকা। এতদিন ধরে এত কথা, এত অন্তরঙ্গতা, অথচ কেউ কারও ঠিকানাটুকুও নিয়ে রাখতে পারল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রুমা, ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতের মুঠোয় লুকিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সুপ্রিয়র ঘরের দিকে। কিন্তু তার আগেই সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে।

এই যে, উঠেছেন দেখছি। এক মুখ হেসে হিমাদ্রিবাবু বললেন, চলুন, চা দিচ্ছে। গোছগাছ করে নিয়েছেন তো?

রুমা কোনও কথা বলল না। শুধু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল।

তারপর পা বাড়াল আবার, সুপ্রিয়র ঘরের দিকে। আর হিমাদ্রিবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না। পক্স...সাংঘাতিক রোগ।

চিৎকার শুনে শ্রীলেখাদেবী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। রুমাকে দেখতে পেলেন। দেখেই তীব্র ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললেন, রুমা!

হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল রুমার। ধীরে ধীরে ফিরে এল সে। ফিরে এসে মুখ নিচু করে বসে পড়ল তক্তপোশের ওপর, জানালার ধারটিতে। চোখ ছাপিয়ে জল এল। আর তো সময় নেই। সময় নেই। কাগজের টুকরোটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিল রুমা। আর পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে।

এই শেষ। এই শেষ। আর কোনওদিন বুঝি সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হবে না। বানের মুখে শেষ খড়কুটোর মতোই কাগজটা বাতাসে উড়ে গেল রুমার চোখের সামনে।

এদিকে চা খাওয়া হয়ে গেল সকলের।

দু-খানা রিক্শা এসে দাঁড়াল একটু পরেই।

হিমাদ্রিবাবু ডাক দিলেন যৌতুকীকে।—ও যৌতুকী! যৌতুকী, হরতুকী, কৌতুকী, আরে ও যৌতুকী!

যৌতুকী সুপ্রিয়র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, যাউছি বাবু, যাউছি।

যৌতুকী এগিয়ে এল। এসে দাঁড়াল সে তেরো নম্বর ঘরের সামনে।

রুমা ফিরে তাকাল। আর অনুশোচনায় মন ভরে গেল রুমার। কাগজের টুকরোটা তখন ফেলে না দিত যদি!

যৌতুকীর দিকে তাকিয়ে শুধু ম্লান হাসল রুমা।

সেই বীভৎস কালো চেহারা, গায়ে কপালে উল্কি। কুৎসিত চেহারার নাকে কানে রুপোর ভারী ভারী গহনায় আরও যেন বীভৎস করে তুলেছে তাকে। হলদে দাঁত বের করে হাসল যৌতুকী। ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, রুমার একবারও মনে হল না যৌতুকীর চেহারাটা কুৎসিত। মনে হল না, বীভৎস। যৌতুকীর হাসিটাও বড় মধুর মনে হল রুমার। অপরূপ রূপবতী একটি ম্লান বিষণ্ণ সেবার প্রতীক যেন। কত আপনজন, কত অন্তরঙ্গ মনে হল।

না, এখন আর অন্য কোনও বাসনা নেই রুমার। ও শুধু চায় সুপ্রিয় ভাল হয়ে উঠুক, সুপ্রিয় যেন ভাল থাকে। রুমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। তবু সুপ্রিয় যেখানেই থাকুক, যেন ভাল থাকে।

বিষণ্ণ হাসি হেসে উঠে এল রুমা, দাঁড়াল যৌতুকীর সামনে, যৌতুকীও হাসল, তাকাল চোখে চোখ রেখে। যেন নির্বাক দৃষ্টির মুখরতায় সান্ত্বনা দিতে চাইল সে, বলতে চাইল,

ভয় নেই।

শ্রীলেখাদেবী বুঝলেন না, মিস্টার সেন বুঝলেন না, শুধু যৌতুকী আর রুমা পরস্পরের চোখের ভাষা পড়ে নিল। একজনের চোখে অনুনয়, অনুরোধ, আরেকজনের চোখে সান্ত্বনা, শান্তি!

ধীরে ধীরে ট্রাঙ্ক, বেডিং, সুটকেস মাথায় নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল যৌতুকী। একে একে সাইকেল রিক্‌শায় তুলে দিল।

তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠাকুর-চাকরের দলও এসে দাঁড়াল রিকশার সামনে।

হিমাদ্রিবাবুর হাতে তাদের বকশিসের টাকা দিয়ে রিক্‌শায় চেপে বসলেন মিস্টার সেন, রেশমকে পাশে নিয়ে। পিছনেরটায় উঠলেন শ্রীলেখাদেবী।

শ্রীলেখাদেবী ডাকলেন, আয় রুমা, তাড়াতাড়ি আয়।

এক পলকের জন্যে থমকে দাঁড়াল রুমা। ন-নম্বরের খোলা জানালার দিকে ব্যর্থ দৃষ্টি ফেলল একবার। তারপর যৌতুকীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে।

পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে যৌতুকীর হাতে গুঁজে দিল রুমা, যৌতুকীর হাতখানা চেপে ধরল। কোনও কথা বলতে পারল না।

ম্লান হাসি হাসল যৌতুকী। পাঁচ টাকার নোটখানা রুমার হাতে ফিরিয়ে দিল। বললে, যৌতুকী অছি। যৌতুকী অছি।

যৌতুকী আছে। যৌতুকী আছে। ভয় করবার কারণ নেই। ভয় নেই। যৌতুকী আছে।

হাসল যৌতুকী। হাসতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আর রুমা ছুটে এসে রিক্‌শায় উঠল।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে সাইকেল রিক্‌শা চলতে শুরু করল। স্টেশনের পথে।

আঁকাবাঁকা লাল ধুলোর রাস্তা। দু-পাশে পাথরের বাড়ি। কুচালি গাছের ছায়া, দূরে দূরে খাটো মাপের টিলা। রাস্তার দু-পাশে কেয়ার ঝোপ, কেয়া আর বেতের, সরু সরু কচি সবুজ বেতের স্ফুলিঙ্গ, দূরে দূরে পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরের চূড়া।

একপাশে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে ছিল রুমা, আর গম্ভীর মুখে শ্রীলেখাদেবী মাঝে মাঝে আড়চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

স্টেশনে এসে মালপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই গাড়ি এসে গেল। হইচই হট্টগোলের মধ্যে কখন যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ট্রেনের কামরায় উঠেছে, উঠে বসেছে রুমা, সে নিজেও যেন টের পায়নি।

ঘন্টি দিয়ে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিতেই তন্ময়তা ভেঙে গেল রুমার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্রেনের কামরার জানালায় মুখ রাখল সে। বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ বাতাস মাটির দিকে!

ট্রেনের লাইন বঁড়শির মতো বেঁকে গেছে। নতুন শহরকে দূরে ফেলে বাঁক দিয়েছে পান্থপাদপ হোটেলের পাশ দিয়ে। একদৃষ্টে হোটেলটার দিকে তাকিয়ে রইল রুমা। রোদ উঠছে, উঠেছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে হোটেলের পাথুরে দেয়াল। গাঁদা ফুলের বাগান।

হঠাৎ টম আর বাদলকে মনে পড়ে গেল রুমার। ট্রেন যেতে দেখলেই সারা বারান্দা ছোটাছুটি করত দুটিতে, আর চিৎকার করত—রেলগাড়ি চলল, রেলগাড়ি চলল।

বাদল যেদিন চলে গেল, টমকে বলেছিল, ট্রেনের জানালা থেকে দেখব আমি,

'রেলগাড়ি চলল' বলবে কিন্তু।

লাজুক ছেলেটা বলেনি। রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাড়তে ভুলে গিয়েছিল সেদিন। আজ রুমাও যেন বাদলের মত ছোট্ট হয়ে গেছে, জানালায় মুখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হোটেলটার দিকে। ট্রেন চলেছে ঝিকঝিক করে। চলছে, চলবে। কিন্তু তার জন্যে কেউ আজ রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

হোটেলটা অদৃশ্য হতেই হঠাৎ দু-হাতের ওপর দু-চোখের প্লাবন বাঁধ মানাবার চেষ্টা করল রুমা।

তারপর অনুভবে একটা নরম স্নেহের সান্ত্বনার স্পর্শ পেল মাথার ওপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রুমা।

সুখের সময়ে, শীতের সময়ে সবাই আসে। তারপর একে একে সকলেই চলে যায়।

শীত সরে গেছে, বসন্ত যায় যায়। আবার সেই পাথুরে মাটির খররৌদ্রের দুপুর। শীতের দিনের সবটুকু আরাম যেন এক নিঃশ্বাসে শুষে নেয় গ্রীষ্মের পিপাসা।

সকলেই একে একে চলে গেল। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুর চলে যাবার উপায় নেই। এই হোটেলটার পাথুরে দেয়ালগুলোর মতোই স্থাণু আর নির্জীব পড়ে থাকতে হবে তাঁকে। পাথুরে শরীর ওই যৌতুকীর মত। জন মানুষের আর দেখা মিলবে না জেনেও আশায় আশায় চোখ চেয়ে থাকতে হবে। যদি কোনও ইন্সিওরেন্সের দালাল, কিংবা ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ হঠাৎ এসে হাজির হয়। না, তার চেয়েও বড় আশা, আরেক শীতের স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

সুপ্রিয় ভাল হয়ে উঠছে, উঠেছে। দুর্বল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে বসে সে বিকেলে। দোতলার বারান্দা থেকেই হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে, কখনও বা বেলুর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে।

লোকজন চলে গেছে বলেই হিমাদ্রিবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রীর মুখ দেখতে পাওয়া যায় মাঝেসাঝে। ঘোমটা খাটো করে বেলুর মা নীচের উঠোনে এসে জিগ্যেস করেন, কেমন আছ আজ ?

—ভালই। ম্লান হাসি হাসে সুপ্রিয়।

কখনও বা সুপ্রিয় নিজেই বলে, রেডিওটা খুলে দিন না একটু।

বেলু ছুটে গিয়ে রেডিও খুলে দেয়।

ছেলের অসুখের খবর পেয়ে সুপ্রিয়র বাবা এসেছিলেন। সেদিন যথারীতি গৌরীকুণ্ডে স্নান সেরে এসে বললেন, কালই সুপ্রিয়কে নিয়ে চলে যাব হিমাদ্রিবাবু।

এমন কিছু নতুন খবর নয়। হিমাদ্রিবাবু জানেন, যে আসে সে থাকবার জন্যে আসে না। সকলেই চলে যায়।

সন্ধের সময় সুপ্রিয় যৌতুকীকে ডাকল।—কাল সকালেই চলে যাব যৌতুকী, হিসেবটিসেব মিটিয়ে নিতে বল।

বলতে গিয়ে খটকা লাগল যেন। যৌতুকীর হিসেব কি মেটাতে পারবে সে! কে কার হিসেব মেটাতে পারে এ-সংসারে।

সুপ্রিয়র নিজেরই ভয় ছিল, বিদায় নেবার মুহূর্তে সে হয়তো নাটকীয় কিছু একটা করে বসবে, হয়তো যৌতুকীর হাত ধরে উচ্ছ্বাসের স্বরে কত কি বলবে। হয়তো মেয়েদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে সে।

না, কিছুই করল না সুপ্রিয়। শুধু ওর ইচ্ছে হল যৌতুকীকে কিছু মোটা টাকা বকসিশ

দিয়ে যেতে। কিন্তু লজ্জায় পেরে উঠল না। এমন কি, স্বাভাবিক অবস্থায় যে টাকাটা দিয়ে যেত, সেটুকুও দিতে বাধল। মনে হল, তার নিখাদ মনের ওজনটুকুও বুঝি বা একটা নিকেলের টাকার সঙ্গে সমান হয়ে যাবে।

রিক্‌শায় মালপত্র তুলে দিল যৌতুকী। হিমাদ্রিবাবু বললেন, আবার আসবেন। বেলু বলল, আবার আসবেন সুপ্রিয়দা।

দূরে খাটো ঘোমটার আড়াল থেকে দুটি চোখ চেয়ে রইল রিক্‌শার দিকে। সে দুটি চোখও যেন বলতে চাইল, আবার এসো।

যৌতুকী কিছুই বলল না। ও শুধু তাকিয়ে রইল। ওর চোখের সামনে দিয়ে রিকশাটা ক্রিং ক্রিং শব্দ করে চলে গেল।

যৌতুকী জানে, যে যায় সে আর ফিরে আসে না। জীবনে কত মানুষকেই তো আসতে দেখেছে। জমজমাট হয়ে উঠতে দেখেছে পান্থনিবাস। তারপর একে একে সবাই চলে গেছে। ঠিক যেমনভাবে ওর জীবনে সকলেই এসেছে, হেসেছে, তারপর একে একে চলে গেছে। ওর স্বামী, পুত্রকন্যা, ওর মা-বাবা... আরও কত কে। তাই কাউকেই আর ফিরে আসতে বলে না ও। শুধু নরম স্মৃতির ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে।

কিন্তু এমন হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে চলে না হিমাদ্রিবাবুর। আশা নেই জেনেও আশায় আশায় রাস্তায় ছুটে আসেন সাইকেল রিকশার ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি শুনলেই। মোটরবাসের হর্ন শুনলেই ছুটে আসেন। কিন্তু রিক্‌শা চলে যায় গেঁয়ো তীর্থযাত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে। মোটরবাস থামে না পান্থপাদপের সামনে।

তবু প্রতিদিন সকালে বাঁধানো খাতাটা আর হ্যাণ্ডবিলের তাড়া নিয়ে সাইকেলে চেপে বসেন হিমাদ্রিবাবু। স্টেশনের পথ ধরেন। নতুন যাত্রী খোঁজেন।

ট্রেন আসে, ট্রেন চলে যায়। হিমাদ্রিবাবু জানেন, বৃথাই তাঁর আসা-যাওয়া।

ক্লান্ত শরীর আর মন টেনে টেনে পান্থপাদপে ফিরে আসেন।

স্ত্রীর উদ্‌গ্রীব দুটি চোখের দিকে তাকাতে ভয় পান হিমাদ্রিবাবু।

চোখ না তুলেই বলেন, না, আসেনি কেউ।

কেউ আসে না, আসবে না, পরের শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, জানেন হিমাদ্রিবাবু। তবু প্রতিদিন স্টেশনের পথ ধরেন ট্রেনের সময় হলেই।

আর রাত্রে ঘুমের ঘোরে কখনও কখনও চমকে ওঠেন। ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলেই কোনওদিন শুনতে পান, যৌতুকী বাসন মাজতে মাজতে কান্নার মত একটানা সুরে গান গাইছে। কোনওদিন বা মনে হয়, পোষা বেড়ালটা সারা হোটেল ঘুরে বেড়াচ্ছে মিউ মিউ করে। যেন বেড়ালটাও কাঁদছে নির্জন নিস্তব্ধ প্রাণহীন পান্থনিবাসটার দুঃখে।



আকাশপ্রদীপ



দক্ষিণের এই এলাকাটা এখন রীতিমত পশ্ এরিয়া। অবশ্য সেটা এমন কিছু নতুন খবর নয়। কলকাতার চরিত্রেই এক ধরনের খামখেয়ালিপনা আছে। প্রথম গজিয়ে ওঠার দিনে যেমন ছিল। আজও তেমনি। আজ যেখানে খানাডোবা ঝোপঝাড় জঙ্গল, হঠাৎ একদিন দেখা যাবে জলাজমি ভরাট করে রাস্তা ফুঁড়ে সেখানেই ঝকঝকে নতুন বাড়ির সারি। তখন সেটাই হয়ে উঠবে পশ্ এরিয়া। আর আগে যেখানে জমি পাবার জন্যে সকলে মাথা খুঁড়েছে, ঝকঝকে নতুন নতুন বাড়িতে যে পাড়াটা আলো হয়ে থাকত, বিশ তিরিশ বছর যেতে না যেতেই সে পাড়ার চেহারা কেমন মরা-মরা, বাড়িগুলো সব যেন রোগজীর্ণ রক্তহীন, বাইরের দেয়ালের রং চটে গেছে, ধুলোয় কালিতে বর্ষার ছাটে গজানো শ্যাওলায় বিবর্ণ পাণ্ডুর। ক্বচিৎ-কদাচিৎ তার ফাঁকে একজন কেউ বাড়ি রং করালে বাকি বাড়িগুলোর দারিদ্র্য যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

পশ্ এরিয়া। কথাটা আজকাল লোকের মুখে মুখে খুব চালু হয়ে গেছে। আগে সবাই শুধু ভদ্র পাড়া খুঁজত। আজকাল চারপাশে তিনতলা চারতলা রংতাজা বাড়ি না থাকলে লোকে হীনমন্যতায় ভোগে।

অতীশবাবুর দূরদৃষ্টি ছিল। এখানে এসে যখন জমি কিনেছিলেন সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

অতীশ সোমকে এখন পাড়ার সকলে অতীশবাবু বলে। কেমন করে মিস্টার সোম অতীশবাবু হয়ে গেলেন তা কারও মনে পড়ে না। আই সি এস মানুষ, এখন অবশ্য ধুতি-পাঞ্জাবিতেই দেখা যায়, হাতে একটা সরু ছড়িও থাকে কখনও কখনও, কিন্তু সিধে হয়ে হাঁটার ধরন দেখলেই বোঝা যায় একদা তিনি দাপটের সঙ্গে জেলায় জেলায় ছড়ি ঘুরিয়েছেন। কর্মজীবনের শেষ দিকে রাইটার্স বিল্ডিঙেও এসেছিলেন। সেই সময়েই এই বাড়ি।

এখন সত্তর পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু বয়েসের ভারে নয়, বোধহয় অন্য কোথাও অন্য কিছু ঘটে গেছে। এখন তাই আগের মত তেমন সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। মেরুদণ্ড সোজা থাকলেও উনি ভিতরে ভিতরে নুয়ে পড়েছেন। চোখমুখ দেখলে মনে হয় বুকের মধ্যে কি এক ধরনের অদ্ভুত ভয় ঢুকে গেছে। তবু সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করেন।

ছেলে কিছু সন্দেহ করেছে কিনা, কিছু বুঝেছে কিনা জানেন না। অন্তু ওদিকে যেতে পারে, সামনাসামনি পড়ে যেতে পারেন, ভাবেননি। আগে থেকে ভেবে রাখলে একটা গল্পও বানিয়ে রাখতে পারতেন। এবং চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তুকে ডেকে সে-কথা বলতে পারতেন।

এখন তো অন্তু ভাবছে বাবা আমাকে এড়িয়ে গেল কেন!

মেয়েটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে গ্যেট থেকে বেরোবেন, মেয়েটি স্মার্ট ভঙ্গিতে হাত তুলে 'সি ইউ' ধরনের হাসি হেসে চলন্ত ট্রামের দিকে ছুটে গেল, আর তখনই উল্টোদিকের ফুটপাথে চোখ পড়ল অতীশবাবুর। দেখলেন, ওঁর দিকে ফিরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্তু।

কি যে হল, বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কোথায় অন্তুকে ডেকে বানানো একটা গল্প

বলবেন, তার পরিবর্তে নার্ভাস হয়ে গিয়ে যেন অন্তুকে দেখতেই পাননি এমন ভান করে সামনের ট্যাক্সিটার দিকে ছুটে গেলেন।

সচরাচর যা হয় না, হয়তো সাদা চুল দেখেই, কিংবা ব্যক্তিত্ব, ট্যাক্সি রাজি হল। উনি অন্তুর চোখের আড়ালে চলে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ট্যাক্সিটা আর বাড়ি পর্যন্ত আনেননি, বাজারের কাছেই ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলেন।

এখন ধীরে-সুস্থে যা-হোক বানিয়ে কিছু একটা বলে দিলেই চলবে। কি অজুহাত দেবেন সেটাই ভাবছিলেন।

কিন্তু নিজেদের রাস্তার মোড়ে এসেই বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল। এ পাড়ায় বাড়ি থেকে বেরোলে সকলেরই এমন হয়।

চার-পাঁচখানা বাড়ি পার হলেই পিচঢালা এমন সুন্দর রাস্তাটা হঠাৎ বিশ পঁচিশ গজ একেবারে নর্দমা। কি নোংরা কি নোংরা! রাস্তার ওপরেই একটা কালোকুলো বাচ্চা ছেলে বসে পায়খানা করছে। হাত তিনেক দূরে রাস্তার আধখানা জুড়ে একটা খাটিয়া পেতে বস্তিরই তিনটে লোক খালি গায়ের ঘাম মুছতে গামছা ঘষছে আর তাস খেলছে। যেন রাস্তাটাও ওদের সম্পত্তি। পা ফেলতেও ঘেন্না। বর্ষার সময় জল জমে এ জায়গাটা একেবারে নরককুণ্ড হয়ে ওঠে।

অতীশবাবু কোনও রকমে পার হয়ে এলেন। এখন আর কিছুই বলেন না। বলে লাভ নেই। এখন তো ওদেরই দিনকাল। মাঝেমাঝেই বস্তির মুখটায় একটা ঝাণ্ডা তুলে দেয়। ঝাণ্ডার রংও পাল্টায় ক্ষণে ক্ষণে।

ওদের বলে কি লাভ, ব্রিটিশ আমল থেকেই তো আই সি এস ছিলেন, স্বাধীনতার পরও বহুকাল। সবাইকে শুধু পতাকার রং বদলাতে দেখলেন. আর কিছুরই বদল হতে দেখেননি।

এই পাড়াতেও না।

কে যেন বলেছিল, এ তো একেবারে পশ্ এরিয়া, মিস্টার সোম।

ওঁরই অধস্তন কেউ, ওঁর রিটায়ারমেন্টের অনেক পরে একদিন দেখা করতে এসেছিল। অর্থাৎ সে যে প্রোমোশন পেয়ে ওঁরই পোস্টের কাছাকাছি এসেছে সে-খবর জানাতে। চারপাশের নতুন নতুন বাড়িগুলো দেখে বলেছিল, পশ্ এরিয়া।

অতীশবাবু যখন জমি কিনেছিলেন তখনও এটাকে কোম্পানি-বাগান বলত। কেন বলত তা জানেন না। কোম্পানি মানে কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি? উনি জানেন না।

এ তল্লাট তখন জমজমাট। এদিকে ওদিকে চোখ-জুড়োনো চওড়া রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া। আর বিশাল বিশাল বাড়ি। বাজার, ট্রাম-লাইন, বিস্তৃত পার্ক। অথচ তারই মাঝে মাঝে যে এতখানি ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে বাইরে থেকে বোঝাই যেত না। কিন্তু সেখানেও লোকের দৃষ্টি পড়ল একদিন। রাস্তা বের হল, বাড়ি উঠতে লাগল। সে সময়েই খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন অতীশবাবু। তখন অতীশ সোম আই সি এস। এমনিতেই লম্বা ফর্সা চেহারা, টিকলো নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। কোটপ্যান্টে একেবারে পাক্কা সাহেব, দাঁড়ানো এবং হাঁটাচলাতেও। পাইপ দাঁতে চেপে কাঁচা রাস্তাটার একপাশে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন।

ওঁর অফিসেরই একজন বড়বাবু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, জমির মালিককে ডেকে আনলেন তিনি, টালি-ছাদের একতলা বাড়িটা থেকে।

পরনে হাতকাটা ফতুয়া, চেক লুঙি। এতখানি জমির মালিক এই লোকটা? অতীশবাবুর প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি। তখনও চাকরিতে বহাল আছেন, সে কি খাতির!

সরকারি গাড়ি থেকে নেমে লিফটের দিকে পা বাড়ালেই পুলিশ ইন্সপেক্টর স্প্রিঙের মত ঝট করে উঠে দাঁড়াত। লিফটম্যান তটস্থ হয়ে সেলাম করত, যারা অগণ্য নগণ্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তাদের মাছি তাড়ানোর মত হাত নেড়ে সরিয়ে দিয়ে সাহেবকে নিয়ে তরতর করে উঠে যেত।

সেই সোমসাহেবের পক্ষে একটা কাঁচারাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা জলা জমি কেনার জন্যে ওই হাতকাটা ফতুয়া আর চেক লুঙির সঙ্গে দর কষাকষি করতে তাঁর রীতিমত সম্মানে লাগছিল। বড়বাবুর ওপর রাগ ও বিরক্তিতে মনে মনে বলছিলেন, স্টুপিড।

বড়বাবু ওঁর অস্বস্তি বুঝতে পেরে ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়েছিলেন, লোকটা খুব একরোখা। জমি আছে বলে ধরাকে সরা দেখে। স্যার, আপনি শুধু জমি পছন্দ করুন, দরদস্তুর আমি করে দেব।

বেশ কিছু বাড়ি তখনই মাথা তুলেছে, কিন্তু ফাঁকা জমিও অনেকখানি। কোথাও কোনও পিলার নেই, এক ধারে একটা ডোবা, সীমানা বোঝাবার জন্যে লোকটা হেঁটে গিয়ে আঙুল দেখিয়ে বললে, চার কাঠা ছ ছটাক।

অতীশবাবু আন্দাজে বুঝলেন কিছুটা, অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ডোবাটা তো মশার ডিপো হবে।

হাতকাটা ফতুয়া একহাতে লুঙিটা ঈষৎ তুলে ধরে বললে, কি ডোবা ডোবা বলছেন, এ হল কোম্পানি বাগান। আপনি কলকাতার লোক তো, নাম শোনেননি ?

না, অতীশবাবু শোনেননি। কিন্তু কথাটায় খোঁচা লাগল। কারণ, অতীশ সোম আই সি এস জীবনের তিন-চতুর্থাংশ জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই নিজেকে তেমনভাবে কলকাতার লোক ভাবতে পারেন না।

বললেন, কিসের বাগান ছিল ?

লোকটা হাসল। বললে, কিসের নয়। দেখছেন না এখনও কত গাছ ! আম জাম কাঁঠাল, গোলাপ ফুলের বাগিচাও ছিল।

অতীশবাবু দেখলেন দূরে দূরে বেশ কয়েকটা গাছ রয়েছে, জলা জমিতে শুধুই ঘাস। বিশ্বাস হল না। তা না হোক্, উনি তো বাগান কিনতে আসেননি, এসেছেন বাড়ি বানাবেন বলে জমি কিনতে।

লোকটা বোধহয় অতীশবাবুর চোখে অবিশ্বাস দেখতে পেল। হেসে বললে, এই যে এত বাড়ি দেখছেন, তামাম জমি কোম্পানি বাগানের।

—তোমার ছিল ? প্রায় বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু লোকটার হাবেভাবে এমন একটা অহমিকা দেখতে পাচ্ছিলেন, যেন বিক্রি করার জন্যে তার খুব একটা তাগিদ নেই। তাছাড়া বড়বাবু বলেছেন, বড্ড একরোখা।

তাই সামলে নিয়ে বললেন, এই সব জমি আপনার ছিল ?

—আজ্ঞে না, শরিকি জমি। বারোজন শরিক, পার্টিশন করে আমার এইটুকু। বলে আঙুল দেখাল।

কোনটুকু কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু জমি পছন্দ হয়ে গেল। জমি পছন্দ হল, নাকি দাম পছন্দ হল, এখন আর মনে নেই।

সেই কোম্পানি বাগান এখন পশ্ এরিয়া। চতুর্দিকে বাড়ি, কোথাও একটুও ফাঁকা জমি নেই। কিন্তু সমস্ত পাড়ার মানমর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছে একটা বস্তি। ইজ্জত রাখাই দায়। যেতে আসতে নাকে রুমাল দিতে হয়। সন্ধের দিকে চোখে ঠুলি বাঁধতে হয়। সব সময়ে ভয়, গা ঘসাঘসি না হয়ে যায়। বাড়িতে থেকেও শান্তি নেই, কানে কুলুপ আঁটো।

সারি দিয়ে গোটা তিনেক হাতে-টানা রিকশা একপাশে। রিকশাওয়ালারা ওই বস্তিতেই থাকে। আরও কত রকমের লোক।

কোনও রকমে পার হয়ে এলেন।

বস্তিটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। শুধু বস্তিতে ঢোকার গলিটুকুই দেখা যায়। কিংবা তাও দেখা যায় না। সব সময়ে গলির মুখে একরাশ নোংরা কাপড় পরা ঝগড়াটে মেয়েমানুষ। আর কিলবিল করছে বাচ্চা। ভেতরের স্থানাভাব থেকে উপচে পড়া মানুষজন, বাচ্চাকাচ্চা এসে মৌরসি পাট্টা করে বসেছে পিচ-রাস্তাটায়। গাড়ি কিংবা ট্যাক্সিকেও সমীহ্ করে চলতে হয়।

অতীশবাবুর গাড়ি ছিল না, নেই। সারা জীবন সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে এসেছেন। যখন রিটায়ার করলেন গাড়ির দাম তখন আকাশছোঁয়া, কেনা দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য, কিংবা মূর্খামি। তাই কেনেননি।

ভাগ্যিস কেনেননি। রাস্তা জুড়ে খাটিয়ার ওপর লোকগুলো তাস খেলছে। এপাশে দুটো কুকুর শুয়ে আছে, আশেপাশে সদ্যোজাত গোটা চারেক কুকুরের বাচ্চা। নেংটি পরা কিংবা ন্যাংটো ছেলেমেয়েগুলো ঘোরাঘুরি করছে। পাছে গায়ে গা লেগে যায়, সতর্কতার সঙ্গে ব্যালান্স করতে করতে গলির মুখটা পার হয়ে এসেই দেখলেন মহীতোষবাবুর গাড়িটা থমকে থেমে পড়ে হর্ন বাজাচ্ছে।

চোখোচোখি হতেই হেসে ফেললেন। এ নিত্যদিন লেগেই আছে।

খাটিয়ার ওপর খেলায় মত্ত লোকগুলোর যেন কানেই যাচ্ছে না। অর্থাৎ তুমি পাশ কাটিয়ে যাও না, আমরা তো রাস্তার একধারে আছি।

ওদিকে যে কুকুর আর কুকুরের বাচ্চাগুলোর মত...

মহীতোষবাবু স্টিয়ারিঙে হাত রেখে অস্ফুটে বললেন, শুয়োরের বাচ্চা।

এমনই অস্ফুটে বললেন, যেন ওদের কানে না যায়। কারণ এ পাড়ার সকলেই ওদের ভয় পায়, রীতিমত সমীহ্ করে চলে।

খাটিয়ার ওপর থেকে একজন হর্ন শুনে কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে ছেলেগুলোকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল।

মহীতোষবাবু হাঁটার চেয়েও ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অসহায় দৃষ্টিতে অতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, কি করা যায় বলুন তো।

কিছুই করার নেই, শুধু সহ্য করে যাও।

বস্তির লোকগুলো কিন্তু এমন ছিল না। রাস্তাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই থাকত। নির্বিবাদে চলাফেরা করা যেত। কখনও বাবুদের সামনাসামনি পড়ে গেলে ছিটকে সরে গিয়ে পথ করে দিত।

প্রথম দিকে মহীতোষবাবুর বসার ঘরে পাড়ার লোকদের ছোটখাটো একটা বৈঠক বসেছিল। অ্যাজেন্ডায় একটাই আইটেম, কি করা যায় বলুন তো!

অতীশবাবু পিঠ সোজা করে বসেছিলেন। চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বসা ওঁর অভ্যাস নয়। মুখে রাশভারী ছাপ। বেশ স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, কিছুই করার নেই।

মহীতোষবাবু আপত্তির স্বরে বলেছিলেন, লোকগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে।

—শুধু ওই লোকগুলো নয়, সারা দেশটাই। দেশের সমস্ত লোকই তো বদলে যাচ্ছে। ধ্রুব সত্য উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে বলেছিলেন।

মহীতোষবাবু চুপ করে গিয়েছিলেন। ভিতরে ভিতরে একটু রাগও হয়েছিল। ভদ্রলোক কি কথাগুলো আমাকেই শোনাচ্ছেন নাকি ? কোথায় একটা সুরাহা খুঁজে বের করার জন্যে ডেকে আনা হ'ল, কফি খাওয়ানো হল, ভদ্রলোক দেশটাকেই বস্তি বানিয়ে

দিতে চাইছেন। রিটায়ার্ড আই সি এস তো। সবজান্তা স্বভাব, সব বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার যেন ওঁদেরই।

বিজনবাবু, চোদ্দ নম্বরের বিজনবাবু কিন্তু অতীশবাবুর কথাতেই সায় দিয়ে বসলেন। পাটভাঙা ধোপদুরস্ত পোশাকের এই নিপাট ভালমানুষটি সাতেপাঁচে থাকেন না, মুখে সদাই ভদ্রতার হাসি, যে যা বলেন, ওঁর মুখ থেকে বেরোয়, তা ঠিকই বলেছেন। কোনও তর্কবিতর্কের মধ্যে উনি যান না। যাঁর সঙ্গেই কথা বলুন না কেন, ওঁর কোনও দ্বিমত নেই।

অতীশবাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন, দেখছেন না, সারা দেশটাই কত বদলে যাচ্ছে? ভদ্রতা সৌজন্য এসব তো এখন উঠে গেছে। আসলে পপুলেশন এক্সপ্লোশন।

মহীতোষবাবু ব্যবসাদার মানুষ। দু-তিনটি ব্যবসার লাগাম নিজেই এক হাতে ধরে আছেন। উনি পপুলেশন বলতে বোঝেন আরও বেশি খদ্দের। কিংবা চিপ লেবার।

বললেন, তার সঙ্গে বস্তিটার কি সম্পর্ক?

অতীশবাবু হাসলেন। একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, বস্তিটায় লোকজন তখন কম ছিল, রুজিরোজগারের রাস্তাও ছিল। তা ছাড়া ওরা প্রথম থেকেই দেখে আসছে আমাদের। তাই সমীহ করত।

নকুলবাবু আর থাকতে পারলেন না। বাধা দিয়ে বললেন, আমি একমত হতে পারছি না। আই বেগ টু ডিফার। আসলে ওই বস্তিটা তখন পাড়ায় ঠিকে-ঝি সাপ্লাই করত। আর তাদেরই বাবা-মা থাকত ওখানে। ন্যাচারেলি মেয়ের মনিবদের রেসপেক্ট করে চলত।

মহীতোষবাবু হেসে ফেলে বললেন, ঠিকে-ঝি কিন্তু এখনও ওরাই সাপ্লাই করছে। বস্তিটা তুলে দেয়ার কথা হলেই দেখবেন গিন্নিরা সব একজোট হয়ে আপত্তি করবে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

অতীশবাবু বললেন, আমি সে-কথাই বলছিলাম। পপুলেশন এক্সপ্লোশন। কাজের লোক পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তারা তো এখন বস্তিতে মাইনরিটি। যে রেটে ওদের ছেলেপিলে হচ্ছে, দেখতে দেখতে সব বড় হয়ে উঠল, তার ওপর বাইরে থেকে এসে ঢুকছে তো ঢুকছেই। ওরা তো আর আমাদের চেনে না। তা ছাড়া বস্তির মধ্যে আর জায়গা নেই বলেই...

মহীতোষবাবু অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। প্রায় ফেটে পড়লেন। সেজন্যে রাস্তাটা পায়খানা করে দিতে হবে, কি বলেন! বর্ষাকালে কি হয় বলুন তো জায়গাটা।

কথাটা মিথ্যে নয়। বস্তির সামনের রাস্তাটাই শুধু নরককুণ্ড নয়, উপরন্তু এক কোণে একটা ডাস্টবিন, অর্থাৎ যেখানে কোনও একসময় একটা ডাস্টবিন রাখা ছিল, সেই জায়গাটা দুর্গন্ধময় নোংরার পাহাড় হয়ে আছে। কালেভদ্রে পরিষ্কার করা হয়। বাদবাকি সময় নাকে রুমাল চেপে পার হও।

শেষ অবধি ডাস্টবিনের কথা উঠতেই কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্র সরকার তো সিনেমা নিয়েই মত্ত, ছবির কি সব পোস্টার মশাই, ছেলেমেয়েগুলোও যা হচ্ছে, পার্কে সেদিন যা দেখলাম...

ইতিমধ্যে 'কাজ আছে' বলে দু'জন চলে গিয়েছিলেন, সুতরাং সভা ভাঙল। এবং এসব বৈঠক যেভাবে ভাঙে সেভাবেই ভাঙল। নিঃশব্দতায়। তখন আর কারও মনে নেই, সকলকে কেন ডেকে আনা হয়েছিল।

এখন আর বৈঠক ডাকাও হয় না। সবাই জেনে গেছে কিছুই করার নেই। একটা বস্তি তুলে দেব বললেই তুলে দেওয়া যায় না।

বড়জোর ওই মহীতোষবাবুর মত হর্ন দিয়ে দিয়ে শম্বুক গতিতে রাস্তাটুকু পার হওয়া যায়। আর যাবার সময় খুব অস্ফুটে অতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে 'শুয়োরের বাচ্চা' উচ্চারণ করা যায়। তার বেশি কিছু নয়।

মহীতোষবাবুর গাড়িটা এগিয়ে যেতেই নিজের বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে যেতে অতীশবাবুর আবার মনে পড়ে গেল, অন্তু ওঁকে দেখেছে। কিছু কি সন্দেহ করেছে? করার কথা নয়। তবু বলা যায় না। কিছু একটা গল্প বানিয়ে রাখতে হবে। কিছু একটা অজুহাত।

কিন্তু এ-সময় অন্তুই বা ওদিকে কেন গিয়েছিল। ওর কি অফিস নেই? না কি আজকালকার ছেলেছোকরাদের মত অফিস ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অতীশবাবু জানেন ওঁর সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলত। রাগী, বদমেজাজি, পান থেকে চুন খসলে হাতে মাথা কাটেন। কে জানে, হয়তো বা স্ক্যান্ডালও। কিন্তু একটা কথা সকলেই স্বীকার করেছে, মিস্টার সোমের মত কাজ-পাগল মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। হি ইজ নট অ্যান আর্মচেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আরাম কেদারায় বসে শুধু অর্ডারে সই করেননি।

আসলে ওঁর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল। কাজ ওঁর কাছে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। বন্যার খবর পেয়েই গামবুট পরে ছুটে গেছেন। দাঙ্গার সময় নিজেই গেছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। যেখানে যা করণীয় সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা হওয়া চাই। সাধারণ মানুষ, নিম্নশ্রেণীর মানুষের যদি একটু কষ্ট লাঘব করা যায়। কিন্তু ওই মানুষগুলোর কাছে যেতে পারতেন না। যেতে চাইতেন না। অতীশবাবু নিজেও বুঝতে পারেন ভিতরে ভিতরে ওই মানুষগুলোকে ঘৃণা করেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চান। তাদের উপকার করতে চাই বলেই তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে নাকি! ওসব বাজে সেন্টিমেন্টের ধার ধারেন না।

যা ন্যায্য, যা উচিত মনে হয়েছে, তা করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেননি। যেমন এই বস্তি। পারলে উনি দু ঘণ্টার মধ্যে উচ্ছেদ করে দিতেন। একটা ভদ্র পাড়াকে এভাবে নোংরা করার অধিকার কারও নেই।

কর্মজীবনের শেষের দিকে সেজন্যেই খটাখটি লাগত। আজকাল কেউ যুক্তির ধার ধারে না। কেবল ভোট হারাবার ভয়। বস্তির লোকেরাও সে-খবর জেনে গেছে। গলির মুখে একটা উঁচু বাঁশে ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়। জনদরদি পার্টির ছোকরারা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। যখন যে-দল স্ট্রং, তখন সে-দলের ঝাণ্ডা।

ওদের ঝাণ্ডা আছে, ভদ্রলোকদের শুধু অ্যান্টেনা। তাও ঝড়ে বৃষ্টিতে এঁকেবেঁকে ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে। ছাদে উঠে গিয়ে ঠিক করার মেহনতটুকুও কেউ করতে চায় না।

অতীশবাবু অ্যান্টেনা ঠিক করার মিস্ত্রির জন্যে অপেক্ষা করার লোক নন। নিজেই স্ক্রু-ড্রাইভার রেঞ্জ নিয়ে ছাদে উঠে যান। এই সত্তর পেরোনো বয়েসেও।

বাড়িতে ঢোকার মুখে তাই ছাদের দিকে তাকালেন, তারপর ব্যালকনির দিকে। ব্যালকনির দিকে নয়, বাড়িটার দিকেই। এত বছর হয়ে গেছে, বাইরের দেয়ালে আর রং করানো হয়নি, তবু তাকিয়ে দেখেন। বড় ভাল লাগে। মনে মনে যেন বাড়িটাকে আদর করেন।

ডিজাইনটা নিজেরই। এক বন্ধু বড় আর্কিটেক্টকে দিয়ে করিয়েছিলেন। ঘোষাল।

তাঁর প্ল্যানটা বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ঘোষাল, ইউ আর্কিটেক্টস আর লাইক ড্রেস ডিজাইনার্স। পোশাকটা পরলে কেমন দেখতে লাগবে, কিংবা ফ্যাশনটা নতুন কিনা, শুধু সেটুকুই ভাবেন। যে পরবে তার হাঁটতে চলতে কষ্ট হয় কিনা, দরদর করে ঘামবে

কিনা সে-সব ভাবেন না।

নিজেই ছক্ কেটে সব বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, নাও মেক ইট পসিব্‌ল্। এ জিনিস করতে হলে কি দরকার করে দিন। আমি এরকম বাড়ি চাই। এই রকম ব্যালকনি, এখানে এখানে বারান্দা, বে-উইন্ডো...

ঘোষাল অতীশবাবুকে চিনতেন। ঠিক ঠিক করে দিয়েছিলেন। শুধু দু' একটা সাজেশন, একটু এদিক-ওদিক! কন্ট্রাক্টর উনিই জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

এখন অতীশবাবুর মনে হয় বাড়িটা উনি নিজেই করেছেন। খুব ছেলেবেলায় কবিতা লেখার নেশা হয়েছিল একবার। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে এখন ভাবেন সত্যি সত্যি একটা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে ফেলেছেন। দীর্ঘ কর্মজীবন যেন একটা চারা বসিয়ে সযত্নে জলসিঞ্চন করে পরিণত গাছ বানানো। সেই গাছের ফল এই বাড়িতে আর পেনশন। একরকম নিশ্চিন্তি। একটাই অভাববোধ কিংবা অস্বস্তি। কাজ নেই। কেমন বেকার বেকার লাগে। প্রথম প্রথম আরেকটা জিনিস খারাপ লাগত। চিরকাল সমীহ পেয়ে এসেছেন। কারও সেলামে, কারও চোখের দৃষ্টিতে, কারও বা 'স্যার' উচ্চারণে। ওঁর কথার কেউ প্রতিবাদ করত না।

এখন উনি বাবু, অতীশবাবু।

বসার ঘরের দেয়ালে টেনিস র‍্যাকেটটা এখনও ঝুলছে। খাকি রঙের কভারটা নোংরা হয়ে গিয়েছিল বলে ফেলে দিয়েছেন।

মহীতোষবাবু একদিন এসেছিলেন। ওটার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনি কি টেনিস খেলতেন নাকি?

—হুঁ। ব্যস্। আর কিছু বলেননি।

তাঁর অতীত যে অতীব বর্ণময় এবং উজ্জ্বল সে-কথা এদের বুঝিয়ে লাভ কি। এখন ওদের চোখে ওঁর যে-টুকু দাম সে শুধু এই বাড়িটার জন্যে। সময়মত এটুকুও না করে ফেলতে পারলে তাঁর আর কোনও দামই থাকত না।

জুতোর শব্দ না করে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকছিলেন অতীশবাবু। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একেবারে নিঃশব্দে।

প্রথমটা অবাক, তারপর মুখে কৌতুকের হাসি ফুটল। তারপর কৌতুক মিলিয়ে গিয়ে বেশ ভাল লাগতে শুরু করল।

স্ত্রীর গলা। খুব চাপা মিহি সুরে গান গাইছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কতদিন, কতদিন পরে। গলায় এখন আর তেমন সুর নেই। গলা কাঁপছে, মাঝে মাঝে বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। তবু বড় মিষ্টি।

মুখে আবার কৌতুকের হাসি ফুটল। ভাবলেন 'ডার্লিং' বলে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরবেন নাকি বুড়ির।

নাঃ।

দুই

কমবয়েসি ছেলেমেয়েরা কেউই দীনেনবাবুর নাম জানে না। তাদের মুখে ওঁর পরিচয় তিন নম্বরের বুড়ো। ওঁর বাড়ির নম্বর তিন। না, বাড়ি ওঁর নয়। উনি তিন নম্বর বাড়ির একতলার ভাড়াটে। গ্রাউন্ড ফ্লোর। বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে হয়তো পাশাপাশি লাইন দিয়ে একই পার্টিকে ভোট দেয়। কিন্তু মানসম্মানে ভাড়াটেরা এমনিতেই খাটো, তার

ওপর গ্রাউন্ড ফ্লোরের ভাড়াটেকে দোতলার ভাড়াটে আবার হেয় চোখে দেখে। সে বেচারি ডবল ভাড়া দিয়ে থাকলেও। নীচে থাকা মানে নিচুতলা।

দীনেনবাবু অবশ্য ডবল ভাড়া দিয়ে থাকেন না। এসেছেন অনেককাল আগে, অনেক কম ভাড়ায়। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক একদিনের জন্যেও তাঁকে ভাড়া বাড়াতে বলেননি বরং দাঁড়িয়ে দু মিনিট কথাবার্তা বলেন, খোঁজখবর নেন।

বাড়ির মালিক অমলেশ গোস্বামী। বয়েস চল্লিশও হয়নি। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। উনি থাকতেন তিনতলায়। পুরো তিনতলাটা নিয়ে ভদ্রলোক একা থাকেন, কানাঘুসো শোনা যায় অনেক কাল আগেই নাকি স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তার সর্বাঙ্গে শ্বেতি হওয়ার অপরাধে। অমলেশবাবু নিঃসন্তান এবং নিপত্নীক। কিন্তু রীতিমত টাকাওয়ালা লোক। নিজের উপার্জন নয়, পৈতৃক সম্পত্তি। ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন পিতার অমতে, তাই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ফিরে এসেছেন। এসেই ভাড়াটেদের জন্যে আলাদা জলের ট্যাঙ্ক করে দিয়েছেন ছাদে। অশান্তির জীবনে আর অশান্তি বাড়াতে চাননি।

ভাড়াটেরা বলে, অতি সদাশয় মানুষ। পাড়ার সবাই বলে, চশমখোর। চোখের চামড়া নেই, অসহায় বউটাকে তাড়িয়ে দিলে।

এই সব কারণেই কিনা কে জানে, বাড়িটাকে কেউ অমলেশবাবুর বাড়ি বলে না। বলে, তিন নম্বর। আর সেজন্যেই দীনেনবাবুকে কমবয়সি ছেলেমেয়েরা বলে, তিন নম্বরের বুড়ো।

দীনেনবাবুকে চেনে সকলেই। অর্থাৎ মুখ চেনে। আর ওই বসার ভঙ্গিটা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের বাসিন্দে, একেবারে রাস্তার ধারে। সামনে একটু সরু বারান্দা, আধখানা জালে ঘেরা। সামনের রাস্তাটা জলেকাদায় নোংরা হয়ে থাকে। কারণ বাড়িটার পাশ দিয়েই বস্তির গলি। আর এই তিন নম্বর বাড়ির পিছনেই বিশাল বস্তি। দরমার বেড়া, কাদামাটির দেয়াল, পচা বাঁশের খুঁটি, কোথাও টালি, কোথাও চট, জং ধরা করোগেটেড টিন, এর ঘর যেন ওর ঘরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, লোকগুলো শরীর আধখানা বেঁকিয়ে ঢোকে, ভিতরে ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ হয়।

মেয়েগুলোর গায়ের কাপড়চোপড় দেখলে বমি আসে, এত নোংরা। আর নানা জাতের মানুষ, বিহারি রিকশাওয়ালা থেকে ছুরি শান দেওয়ার মিস্ত্রি। একজন বেশ ফিটফাট প্যান্টকোট পরে আসে, বউকে পেটায়, ছেলেমেয়েদের পেটায়, তারপর মদ খেয়ে ঘুমোয়। দু'চার ঘর বাঙালিও আছে কিংবা বাঙালি বনে গেছে।

দীনেনবাবুর ফ্ল্যাটের পিছন দিকটাই দক্ষিণ। কিন্তু দক্ষিণের জানালাগুলো তিনি কোনওদিন খুলতে পারেন না। বস্তি-বস্তি গন্ধ, অর্থাৎ প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। তার ওপর এই বিশাল বস্তির অন্তত চার জায়গায় সদাসর্বদাই তীব্র চিৎকারে কলহ লেগেই আছে। বেশির ভাগ সময়ে মেয়েদের মধ্যে। কখনও কখনও পুরুষগুলো যোগ দেয়। তারপর ঈষৎ রক্তারক্তি। হাসপাতালে ছোটাছুটি।

এসবের জন্যেই যে জানালাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে তা নয়। ওঁর স্ত্রী এবং মেয়ে প্রচণ্ড গরমেও খুলতে দেন না উকুনের ভয়ে। ওঁদের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বস্তির মেয়েগুলো বসে। উকুন বাছে।

প্রথম প্রথম ওঁর মেয়ে তৃপ্তি বুঝতেই পারত না এত শ্যাম্পু এত 'উকুনের যম' লাগিয়েও তাদের নির্বংশ করা যাচ্ছে না কেন। পরে বুঝল দেয়াল বেয়ে জানালা ফুঁড়ে আসে বোধহয়। সুতরাং ওদিকের জানালা একেবারে বন্ধ। বন্ধ করার সময়ে পাড়ার লোকদের মতই তৃপ্তি হয়তো বাড়ির মালিক অমলেশ গোস্বামীকে অভিশাপ দিয়েছিল।

কারণ ওই বস্তির জমিটা তিন নম্বর বাড়ির মালিক অমলেশ গোস্বামীর। সকলের ধারণা উনি শখ করে বস্তিটা পুষে রেখেছেন।

চায়ের কাপের শেষ চুমুকটা শেষ হতেই তৃপ্তি বললে, বাবা, তুমি কি এখন বারান্দায় যাবে ?

দীনেনবাবু ঘোলাটে চোখে একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে অস্ফুটে বললেন, হ্যাঁ।

তৃপ্তি এসে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরল, উঠতে সাহায্য করল। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর শরীরটা প্রায় বয়ে নিয়ে গেল বারান্দায়। কারণ সেরিব্রেল অ্যাটাকের পর দীনেনবাবুর বাঁ দিকটা পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছে। একটা পা শুধু ফেলতে পারেন, হাঁটতে পারেন না।

বারান্দায় একটা উঁচু চেয়ার আছে, তৃপ্তি সেই চেয়ারটায় বাবাকে বসিয়ে দিয়ে আসে। কোনওদিন বা এ কাজটা করেন দীনেনবাবুর স্ত্রী।

তারপরই দীনেনবাবুর মনটা বেশ খুশি হয়ে ওঠে।

বারান্দার জালের ভিতর দিয়ে পৃথিবী দেখেন। ওঁর পৃথিবী।

দীনেনবাবু এদিক থেকে ভাগ্যবান। একজন পঙ্গু মানুষের পক্ষে যা সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, তা তাঁর আছে। চোখের দৃষ্টি। আর ভাগ্যক্রমে রাস্তার ওপারের বাড়িটা রাস্তা ঘেঁসে ওঠেনি। ছোট্ট একটুকরো বাগান আছে। বাগানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হলেও পারিজাত গাছটা পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠে পড়েছে। দুটো পেঁপে গাছ, আরও কি কি।

চুপচাপ ওই জালের খাঁচার মধ্যে বসে গাছ দেখেন, রাস্তা দিয়ে যারা যাতায়াত করে তাদের দেখেন। কখনও কখনও ডেকে কথা বলার চেষ্টা করেন। পাছে ডেকে বসেন তাই পাড়ার ছেলেমেয়েরা জায়গাটা দ্রুত পার হয়ে যায়, পার হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। অর্থাৎ খুব বেঁচে গেছি।

গাছ পালায় না। দীনেনবাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে গাছের সবুজ দেখেন। পারিজাত গাছটাও। সারা বছর ধরে তাঁর দেখা আর শেষ হয় না। কাণ্ড আর শাখা গুটি ওঠা সাদা রং, তারপরই কি সুন্দর সবুজ পাতা! দেখতে দেখতে একদিন কচিপাতার মত কুঁড়ি ধরে, আর ওঁকে অবাক করে দিয়ে গাছভর্তি টকটকে লাল পাতা মেলে ধরা ফুলে সারা রাস্তাটা যেন আলো হয়ে ওঠে। পাতা না ফুল বোঝাই যায় না। পৃথিবী খুব সুন্দর হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওই লাল রং ওঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে কি যেন মনে পড়ে যায়, মনে পড়িয়ে দেয়, উনি কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

—তিপু, তিপু! শুনে যা একবার। ফুর্তিতে মেয়েকে ডেকেছিলেন।

আজকাল একবার ডাকলেই সাড়া মেলে না। কিংবা তৃপ্তি হয়তো বাথরুমে গেছে। এখানে অক্ষমের মত বসে বাড়ির ভিতরের কোনও খবরই তো জানতে পারেন না। তাই আবার ডাকলেন, তিপু, একবার আয় না।

তৃপ্তি সাড়া দিল না, কিন্তু এসে দাঁড়াল।

দীনেনবাবু হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে জড়ানো গলায় বললেন, কি সুন্দর দেখেছিস, ফুল হয়েছে।

তৃপ্তিরও দেখে ভাল লাগল। গতকালও কুঁড়ি ছিল, আজ লাল পাতাগুলো মেলে ধরেছে। এক একটা ফুল পঞ্চপত্রে যেন নৈবেদ্যের থালা। পাঁচটা না ছটা, তৃপ্তি গুনতে চেষ্টা করল।

বললে, সত্যি, কি সুন্দর লাল। রক্তের মত নয়, কেমন মিষ্টি মিষ্টি।

রক্তের মত নয়!

দীনেনবাবুর মাথায় বোধহয় শব্দ কটা ঘুরতে শুরু করল। কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। কিছু বোধহয় মনে পড়ে গেল। ছোপ ছোপ রক্ত।

মনকে অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টায় ডাকলেন, লছমি, এই লছমি।

ওঁর কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। খুব মন দিয়ে না শুনলে অনেক সময় বোঝা যায় না। স্ত্রী চারু বোঝেন, মেয়ে তৃপ্তি বোঝে। আর বোঝে রাস্তার এই ছেলেমেয়েরা। বস্তির ছেলেমেয়েরা। পাড়ার ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েগুলো বোধহয় বুঝতে পারে না, সেজন্যেই পালায়।

বস্তির ছেলেমেয়েরা পালায় না।

ওরা তো সদাসর্বদা এই রাস্তাটুকুতেই ঘুরঘুর করে, এক্কাদোক্কা খেলে, দেয়ালে পেচ্ছাপ করে, রাস্তার ধারে বসে পায়খানা করে।

তবু দীনেনবাবুর কোনও আক্ষেপ নেই। ওরা থাকে বলেই তো মানুষজন দেখতে পান, কথা বলতে পান।

কথা বলার লোক নেই বলেই ডাকলেন, লছমি, এই লছমি।

ওদের সকলের নাম ওঁর কণ্ঠস্থ।

বছর দশেকের কালো মেয়েটা ইজেরের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এল। গায়ে একটা নোংরা ছেঁড়া ফ্রক, কিন্তু ডিজাইন ভদ্রগোছের। বোধহয় যাদের বাড়িতে বাসন মাজে তারা দিয়েছে।

লছমি ডাক শুনে এগিয়ে এল। —ডাকছ বুড়াবাবু!

এরা সকলেই ওঁকে বুড়াবাবু বলে। কিন্তু উনি সত্যিই অত বৃদ্ধ নন। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

দীনেনবাবু জিগ্যেস করলেন, তুই কোন বাড়িতে কাজ করিস রে!

—কাজ তো করি না। দিদির সঙ্গে যাই। বাপু চলে আসে তো দিদির কাম করি।

মেয়েটা হাসল।

ওদের জিগ্যেস করে করে অনেক খবর জেনে গেছেন দীনেনবাবু।

লছমির দিদি দুর্গা সাত নম্বরে কাজ করে। সাত নম্বর বাড়িতে। দুর্গা একদিন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল ওর বাবা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়, মাকে কিছুই দেয় না। অথচ মা বা দিদি অন্যের বাড়িতে কাজ করলে ধরে মারে। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করতে হয়।

দুর্গা একদিন হেসে হেসে বলেছিল, সাত নম্বরের পিছনের বারান্দা থেকে বস্তি দেখা যায়। —তো বাবা কইরোজ ফিরে এলে, আমার লাল জাঙিয়াটা মা ঝোপড়ির চালে রেখে দেয়। নজর লাগে তো দৌড় লাগায়।

শুনে হেসেছিলেন দীনেনবাবু, বুদ্ধি আছে। লাল জাঙিয়ার নিশান দেখলেই বুঝতে পারে বাবা ফিরেছে। কাজ ফেলে দৌড়ে চলে আসে।

লছমি বললে, কাজ তো করি না। অর্থাৎ টাকা না পেলে সেটা কাজ নয়।

হয়তো কাজ ফেলে পালাতে হয় বলে বকাঝকা খায় দুর্গা। সেজন্যেই লছমিকে নিয়ে যায়। কিংবা দুজনে মিলে করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে বলে।

দীনেনবাবু আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ওদিক থেকে তীব্র নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, লছমি, ও লছমি।

বোধহয় লছমির মা। রোগা শুকনো চেহারা, কিন্তু গলায় তেজ আছে। প্রায়ই বস্তির মধ্যে, কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারও না কারও সঙ্গে ঝগড়া করে। যেমন কর্কশ গলার স্বর, তেমনি অভব্য ভাষা। কানে আঙুল দিতে হয়। অথচ তাকেই নাকি লছমির বাবা এসে

পেটায় মাঝে মাঝে। স্বামীর ভয়ে তটস্থ। পরের বাড়িতে কাজ করতে যায় লুকিয়ে লুকিয়ে।

মার ডাক শুনেই লছমি ছুটে পালাল।

আর তখনই প্যান্টশার্ট পরা একজন কে হনহন করে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। লছমির দিকে তাকিয়েছিলেন বলে দীনেনবাবু স্পষ্ট দেখতে পাননি। অদৃশ্য হওয়ার আগে তাকে পিছন থেকে দেখে হঠাৎ মনে হল...মনু।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে মনে ভাবলেন, এখনও ভুল হয়। হয়তো এক লহমার জন্যে, তবু তো ভুল।

বিশ বাইশ বছরের কোনও ছেলেকে দেখলেই মনের ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

—বন্ধুদের সামনে তুমি মনু মনু কর কেন, প্রদীপ্ত বলতে পার না।

হঠাৎ এক একটা কথা কেন যে মনে পড়ে যায়।

তখন কতই বা বয়েস মনুর, চোদ্দ পনেরো বছর। স্কুলে পড়ে। কে এক স্কুলের বন্ধু এসেছিল, চলে যাওয়ার পর অভিমানের গলায় বলেছিল। আর তা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন দীনেনবাবু। তৃপ্তিও। মনুর চিবুক ধরে তিপু বলেছিল, বাব্বা, প্রদীপ্ত বলতে হবে তোকে ? তুই কি জেন্টেলম্যান হয়ে গেছিস নাকি ?

ছেলের মান ভাঙাবার জন্যে চারু ওদের ধমক দিয়েছিল।—হাসছিস কেন ? ঠিকই তো বলেছে ও। ও কি বড় হয়নি ?

—ইস। তিপু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, বাবার কাছে কেউ বড় হয় নাকি। প্রদীপ্ত-ফদিপ্ত বাপু আমার মুখ দিয়ে কখনও বেরোবে না, এই বলে রাখলুম।

দীনেনবাবুর মনে পড়ে একবার প্রদীপ্ত বলার চেষ্টা করেছিলেন, উচ্চারণ করতে পারেননি। হাসি পেয়েছিল।

মনুর ওপর বড় আশা ছিল। ভগবান হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে। নিবিয়েই যদি দিলে এভাবে কেন। রোগশয্যায় শুইয়ে রেখেও তো তুমি তাকে নিয়ে নিতে পারতে।

পুরনো দিনের একটা কথা মনে পড়লেই অনেক দৃশ্য ভেসে ওঠে। নিজেকেও যেন দেখতে পান। জালে ঘেরা বারান্দায় বসে যে লোকগুলোকে গটগট করে হেঁটে যেতে দেখেন, নিজেকেও যেন সে-ভাবে হেঁটে যেতে দেখেন।

হ্যাঁ। হাঁটতে পারতেন, দৌড়তে পারতেন। কদিন ধরেই তখন উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটছে। রেজাল্ট বেরোবে, রেজাল্ট বেরোবে।

সন্ধের সময় দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছেন, গলির মুখে ছেলেদের জটলা দেখে থমকে দাঁড়ালেন।—কি ব্যাপার ? কিছু হয়েছে ?

একজন হেসে ফেলে বললে, রেজাল্ট বেরিয়েছে।

দীনেনবাবু তখন দৌড়তেও পারতেন। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরলেন। বুকের ভেতর প্রবল উৎকণ্ঠা।

মনুকে দেখতে পেয়েই জিগ্যেস করলেন, রেজাল্ট বেরিয়েছে ?

মনু কোনও জবাব দেবার আগেই তিপু বলে উঠল, দ্যাখো না, কখন থেকে বলছি, রোল নম্বরটা কিছুতেই দিচ্ছে না। বলছে, বাবা এলে দেখে আসবে।

মনুর কাছ থেকে রোল নম্বরটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিপুও পিছনে পিছনে।

শুধু মনু আসেনি। ওর ভয় করছিল। মনুর ভয় দেখে দীনেনবাবুরও ভয় হয়েছিল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিলেন, যেন জীবনমরণ ব্যাপার। তিপুও ছুটতে ছুটতে আসছে, পিছন থেকে কেবল বলছে, বাবা, আস্তে চলো, আস্তে। তুমি পড়ে যেয়ো না।

কে কখন দৌড়তে দৌড়তে থেমে যায় কিছুই জানা যায় না। তবু দৌড়য়। দৌড়তে হয়।

কি প্রচণ্ড খুশি নিয়ে ফিরেছিলেন। —মনু, মনু, তুই স্টার পেয়েছিস।

মনু বিশ্বাসই করছিল না। স্কুলের টিচাররা বলেছিল, ও স্টার পেতে পারে। দীনেনবাবু নিজেও আশা করেছিলেন। শুধু মনু বিশ্বাস করেনি।

মনুর মুখে উজ্জ্বল হাসি উপছে পড়ছিল। খুশি খুশি গলায় বললে, কি করে পেলাম রে দিদি!

বাড়িতে সে কি স্বর্গীয় সুখের দিন। অনেক রাত অবধি কেউ ঘুমোননি। আনন্দে ঘুমোতে পারেননি। দীনেনবাবুর আজও মনে পড়ে। সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে দেখতে পান।

মনুকে ঘিরে কত স্বপ্ন ছিল। তিপুর বিয়ে দেবেন। মনু চাকরি করবে। এখন ভাবলে হাসি পায়, নিজের উন্নতির কথাও ভাবতেন।

ব্যাঙ্কের চাকরি। প্ল্যান করে রেখেছিলেন, কিছু টাকা জমিয়ে ছোটখাটো একটা বাড়ি করবেন। কোত্থেকে কি যে ঘটে গেল।

দীনেনবাবুর ইচ্ছে ছিল মনু ইঞ্জিনিয়ার হবে। স্ত্রী চারু চেয়েছিল ডাক্তার।

দুটোর কোনওটাই হল না, শেষে কলেজে ঢুকল সায়েন্স পড়তে।

ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার পর এমনিতেই দূরত্ব বাড়ছিল, কখন আসে কখন যায় খোঁজই রাখতেন না। তিপুকে নিয়েই দুশ্চিন্তা।

চারু অনুযোগ করত মাঝে মাঝে। কেউ বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এলেই বোধহয় মনে পড়ে যেত। তাদের সঙ্গে খুব হাসিগল্প। কিন্তু তারা বিদায় নিতে চারুর মুখ থমথমে। —তিপুর বিয়ের কোনও চেষ্টাই করছ না।

একদিন চারুকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, সন্ধের সময়, সঙ্গে তিপুও ছিল। খুব খুশি-খুশি মনে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন, মাঝপথে একটা বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল দেখলেন। আলোয় ঝলমল, টুনি বাল্‌বের মালা সর্বাঙ্গে, রেকর্ডে কিংবা রোশনচৌকিতে সানাইয়ের সুর।

তিপু হাসতে হাসতে বলে উঠল, অনেকদিন নেমন্তন্ন খাইনি, না মা?

মা চুপ করে রইল।

দীনেনবাবু বুঝতে পারলেন। ওঁর বুকের মধ্যেও বোধহয় খচ্ করে লেগেছিল।

চারুর মুখ মেঘের মত। হাঁটতে হাঁটতে চাপা কর্কশ গলায় বললে, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবে বলেছিলে, সে আর তোমার সময় হল না।

একটু থেমে বললে, আমিই দিয়ে আসব।

কথাগুলো শুনলেই বুকের ওপর একটা ভার নেমে আসে।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যার কাছেই যান, চারুর শেষ অবধি ওই একটাই অনুরোধ। —তিপুর জন্যে একটা পাত্র দেখে দাও না ভাই।

ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেতেন না।

কাগজে একবার বিজ্ঞাপনও দিলেন। অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। লাভের মধ্যে শুধু একরাশ চিঠি জমা হয়ে আছে। ফেলে দিতে পারেননি। রেখে দিয়েছেন। তিপুর কাছে এক ধরনের সান্ত্বনা। ওঁদের নিজেদের কাছেও। বেছে বেছে চার পাঁচ জায়গায় চিঠি দিয়েছিলেন, খুঁটিনাটি জেনে আর এগোতে পারেননি।

তবু কেউ বিয়ের কথা বললেই, বাণ্ডিলটা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, পাত্র কি কম

আছে নাকি। এই দ্যাখো না। কিন্তু মনোমত পাত্র পাচ্ছি কই।
চারু বলেছে, মেয়ে বলে তো আর জলে ফেলে দিতে পারি না।
তারপর হাসি-হাসি মুখে বলেছে, তুমিই একটা দাও না দেখে।
দু'একজন দু'একটা পাত্রের সন্ধানও দিয়েছে।
খবরাখবর নিয়ে, কিংবা যোগাযোগ করে দীনেনবাবু বিষণ্ণমুখে ফিরে এসেছেন।
বলেছেন, বাজে বাজে। তোমার কেউ উপকার করতে চায় না, বুঝলে। সবাই ছেলেপক্ষের উপকার করতে চায়। মেয়ে যেন হেলাফেলা।
চারু রেগে গেছেন কখনও কখনও। —তোমার তো সবেতেই খুঁতখুঁতুনি।
তিপু কোনও কথাই বলত না। ওর নিজস্ব কোনও মত নেই। একদিন শুধু হাসতে হাসতে বলেছিল, কেন বিয়ে বিয়ে করছ, বেশ তো আছি বাবা।
ওর মাসি একদিন বেড়াতে এসে বলেছিল, তা তুই নিজেই কর না তিপু, তোর বাবা-মা তো আর আপত্তি করবে না। তোর যদি কোথাও...
তিপু হেসে উঠেছিল, শব্দ করে। —ট্যু লেট ছোটমাসি, অনেক আগে সে স্বাধীনতা দিলে নিজেকে সেভাবে তৈরি করতাম। এখন আর হয় না। তা ছাড়া কি দরকার বিয়ের। বিয়ে না করে কি থাকা যায় না?
ছোটমাসি হাসতে হাসতে বলেছে, তা যা বলেছিস। এই অ্যাদ্দিন বাদে একটু হাসতে পারছি। সহ্য করে করে সব অভ্যাস হয়ে গেছে তো, বয়েসও হয়েছে, এখন আর কান্না পায় না, এখন শুধু হাসি।
ছোটবোনের কথা শুনে চারুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। দীনেনবাবু তো সবই জানেন।
তবু বিয়ে দিতে হয়।
তখন শুধু ওই একটাই ভাবনা। দুর্ভাবনা বলাই ভাল।
সেজন্যেই হয়তো ছেলে মনুর দিকে চোখ রাখতে পারেননি। চোখ রাখলেও কি কোনওদিন জানতে পারতেন।
বারান্দায় জালের খাঁচার সামনে নিথর বসে থাকা, আর সামনের রাস্তার লোকজন দেখা ছাড়া এখন আর তো কোনও কাজ নেই। সারাদিন সেই রাত অবধি শুধু বসে থাকা আর বসে থাকা। বার তিন চার শুধু ধরে ধরে নিয়ে যায় তিপু কিংবা চারু। দুপুরে ঘুম তো হয় না, ক্লান্ত লাগে বলে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন।
আজ এখন আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। আশায় আশায় তাকিয়ে আছেন।
কাঠের চেয়ারে একটা গদি করিয়ে এনে দিয়েছে চারু। বসে থাকতে তেমন কষ্ট হয় না।
বস্তির ছেলেমেয়েগুলো এখন আর কাছে নেই যে ডেকে কথা বলবেন।
পারিজাত গাছটার দিকে আবার তাকালেন। পেঁপেগাছের দিকে। সবুজ, লাল, একটা গাছে সাদা সাদা ফুল, এতদূর থেকে চিনতে পারেন না। শুধু রং দেখেন। পৃথিবীতে আজও কত রং।
রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন দীনেনবাবু।
একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বলে স্পষ্ট দেখতে পাননি। হনহন করে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে জাল না থাকলে গলা বাড়িয়ে দেখতে পারতেন।
একটা বিশ-বাইশ বছরের ছেলে, ঠিক মনুর মতো। মনু নয়, তা তো জানেনই, তবু ছেলেটির মুখ দেখার জন্যে বড় ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।
যখনই এ-বয়সের কোনও ছেলেকে দেখেন, তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।
ওই বয়সেরই একজন এখনই চলে গেল, মুখটা দেখতে পাননি। শুধু পিঠের দিক

থেকে খানিকটা দেখেছেন।

হয়তো আবার ফিরবে। এ পাড়ার কেউ মনে হল না। ফেরার সময় তার মুখটা দেখতে পাবেন। ডাকবেন তাকে। যদি দাঁড়ায় দুটো কথা বলবেন।

—নমস্কার। কথা জড়িয়ে যাওয়া গলায় দীনেনবাবু বললেন, ডান হাতটা তুললেন নমস্কারের ভঙ্গিতে। বাঁ হাতটা তেমনি নিথর পড়ে রইল।

পাড়ার নকুলবাবু। হাতে একটা থলি, যেতে যেতে হঠাৎ এদিকে একবার চোখ ফেলেছিলেন। হন্‌হন্‌ করেই যাচ্ছিলেন, চোখে চোখ পড়ল, আর দীনেনবাবু বললেন, নমস্কার।

চেষ্টা করেন, আশা করেন থামবে, দুটো কথা বলবে। লোকগুলো বিরক্ত হয় তা জানেনও না।

নকুলবাবুর মুখে হাসিও ফুটল না, শুধু ঘাড় নেড়ে দিয়ে আরও দ্রুত চলে গেলেন।

সবাই ব্যস্ত, কেউ থামে না। কারণ ওরা হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে।

দীনেনবাবুও একদিন পারতেন। মনু ওঁর একটা হাত আর একটা পা নিয়ে চলে গেছে।

উনি নিজে অবশ্য তা বলেন না। এমন কি ভাগ্যকেও দোষ দেন না। বলেন, সব দোষ তো আমার।

কলেজে ভর্তি করে দিয়েই যেন দায় সারা। কোনও খোঁজখবরই রাখতেন না। সারাদিন খাটাখাটনির পর বাসের ভিড়ের মধ্যে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যখন বাড়ি ফিরতেন, বড় ক্লান্ত লাগত। তখন আর কারও কোনও খবর নেয়ার ইচ্ছেই হত না। তার ওপর তিপুর বিয়ের ভাবনা। মনুকে তো সকালে একবার শুধু দেখতে পেতেন। ওর জগৎ তখন শুধু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে।

কথাবার্তাও কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল। সব সময়েই একটা রুক্ষ মেজাজ। সব কিছুর বিরুদ্ধে যেন অবোধ্য একটা আক্রোশ।

পিছনের এই বস্তিটাকে নিয়েই তর্কবিতর্ক হতে হতে রাগে ফেটে পড়েছিল।

দক্ষিণের জানালা খোলা যায় না বলে তিপু আক্ষেপ করে বলেছিল, ওদের কেউ উচ্ছেদও করতে পারবে না, আমরা কেউ ভদ্রভাবে বাঁচতেও পারব না।

বস্তিটার ওপর একটা অন্ধ রাগ দীনেনবাবুরও ছিল। তখন হাঁটতে পারতেন বলেই নোংরা মাড়িয়ে আসতে খারাপ লাগত। তার ওপর দিনরাত চিৎকার হট্টগোল।

অথচ মনু হঠাৎ রেগে গেল। বললে, পৃথিবীটা কি শুধু তোদের জন্যেই? ওদেরও তো বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্যেই এসেছে।

তিপু বললে, ভালভাবে বাঁচলেই তো পারে। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি করবে না, সারারাত রামা হো রামা হো...

মনু আরও রেগে গেল।—ওই রোজগারে ভালভাবে বাঁচা যায় না। ভদ্রলোকদের বাড়ির ভেতরের খবর যদি জানতিস, সেও বস্তি।

দীনেনবাবু থামাতে গিয়েছিলেন। এ-সব কথা এ বয়সে সকলেই বলে। নতুন কিছু মনে হয়নি। ওঁর ব্যাঙ্কেও তো ছেলেছোকরারা এই রকমই বলে।

কিন্তু মনু থামতে চাইছিল না। বললে, ওদের রামা হো তোর খারাপ লাগে, কিন্তু আমার পরীক্ষার সময় যে সহদেববাবু মাইকে চব্বিশ প্রহর কীর্তন চালাল, পাড়ার কারও কথা ভাবল না...

তখনও রাগে ফুঁসছে।—কোন শালা দোতলা তিনতলা থেকে নোংরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে না রে। ভদ্রলোক! সবই বস্তি!

দীনেনবাবু চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। বড় হচ্ছে। আর এ-সব কথা তো আজকালকার হাওয়ায় উড়ছে।

একবারও সন্দেহ করেননি মনু বদলে যাচ্ছে।

দু'-একদিন রাত্রে ফেরেনি। অনেক পরে জেনেছিলেন। চারু বোধহয় আড়াল করে রাখত।

উনি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তেন। মনু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দেরিতে ফিরত। সকালে কোনওদিন হঠাৎ খোঁজ করলে চারু কিছু একটা বলে দিত। ফিরেছিল, এই তো বেরিয়ে গেল। তখন তো বোঝেনি।

তারপর একদিন হঠাৎ বুঝতে পারলেন মনু বদলে গেছে।

যার টিকি দেখা যেত না, সে সদাসর্বদা ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। প্রথম প্রথম ভালই লেগেছিল। কিন্তু কথা বলছিল না, কেমন চুপচাপ।

দীনেনবাবু বিছানায় শুয়েছিলেন। ছুটির দিন। ছুটির দিন পেলেই দুপুরে ঘুমোতেন।

দু'দুবার মনু ঘরে ঢুকল, এটা ওটা নাড়াচাড়া করল। যেন কিছু বলতে চায়। দীনেনবাবু ভেবেছিলেন, হয়তো কিছু কিনবে বলে টাকা চায়। হয়তো বেশি টাকা। চারুর কাছে চেয়ে পায়নি, তাই।

ছেলে বড় হয়ে গেলে টাকা ছাড়া আর কিসের সম্পর্ক।

ভিতরে ভিতরে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। দারিদ্র্যের জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে, কত বড় বড় কথা।

অফিসে ইউনিয়নের একজন এই ধরনের সব কথা বলছিল। বৃদ্ধ হরেনবাবু দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সব শুনছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দেশটাকে তো সোডা সাবান দিয়ে মেজে ওয়াক্সপল দিয়ে পালিশ করে দিতে চাইছ। কিন্তু মেটাল ছাড়া তো ভাই পালিশ ধরবে না। চকচকে করতে হলে মেটাল দরকার।

দীনেনবাবু শুনে হেসেছিলেন। মনুর হাবভাব দেখেও মনে মনে হাসছিলেন।

শেষ পর্যন্ত পারলেন না, নিজেই জিগ্যেস করলেন। —কি রে, কিছু বলবি?

মনু ফিরে তাকাল, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটু ইতস্তত করে বললে, নাঃ।

দীনেনবাবু পাশ ফিরে শুলেন। বোধহয় তন্দ্রা মত এসেছিল।

পায়ে কিসের ছোঁয়া লাগতেই চমকে তাকালেন। মনুর হাত। দেখলেন খাটের এক কোনায় ওঁর পায়ের কাছে মনু বসে আছে।

চোখে চোখ পড়তেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

দীনেনবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। —কি হয়েছে! কি হয়েছে মনু?

ও কোনও কথাই বলতে পারল না। পায়ের ওপর মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

দুটো জলেভেজা চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল মনু।

দীনেনবাবু বললেন, কি হয়েছে বল, আমাকে বল কি হয়েছে?

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ডাক এল, প্রদীপ্ত, এই প্রদীপ্ত।

চমকে উঠল মনু। ওর কোনও বন্ধু ডাকতে এসেছে। নিমেষের মধ্যে চোখ মুছে নিয়ে ও সহজ হয়ে উঠল।

দীনেনবাবু বললেন, বলে যা, কি হয়েছে বলে যা।

—পরে বলব, পরে বলব।

মনু ছিটকে বেরিয়ে গেল। দীনেনবাবুর জন্যে ফেলে রেখে গেল অসীম উৎকণ্ঠা।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন, মনু ফিরে আসবে কখন এই আশায়। কখন ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন নিজেই জানেন না।

চারুকে জিগ্যেস করেছিলেন, তোমরা জানো কিছু ? ওকে তো কাঁদতে দেখিনি কখনও।

তিপুকে জিগ্যেস করেছেন, তোকে বলেছে কিছু ?

চারু ঘাড় নেড়েছে। তিপু ঘাড় নেড়েছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। কি হতে পারে কেউ কিছু আন্দাজ করতেও পারেনি।

অনেকরাত্রে কখন যে ফিরে এসেছিল দীনেনবাবু কিছুই জানেন না। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী কিংবা মেয়ে কেউই ওঁকে ডেকে তোলেনি।

ভোর রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। অভদ্রভাবে কে ঘনঘন কড়া নাড়ছে।

উঠে পড়লেন। চারুও তখন উঠে পড়েছে।

জানালা দিয়ে জাল-বারান্দার বাইরে তাকালেন। অন্ধকারে দূরের লাইট পোস্টের যেটুকু আলো পড়েছে, একটা কালো ভ্যান দেখতে পেলেন। বোধহয়, পুলিশের গাড়ি।

এ রাস্তায় পুলিশের গাড়ি প্রায়ই আসে। ওই এক বিরক্তি।

বস্তির লোকদের মধ্যে মারপিট দাঙ্গা, কখনও কখনও রক্তারক্তি লেগেই আছে। তাছাড়া আরেক উপদ্রব শুরু হয়েছে। চোলাই মদ বিক্রি।

মঙ্গল নাম লোকটার। সেই তো বস্তিটাকে শাসন করছে। টাকা দেখিয়ে, ছুরি দেখিয়ে। হাতে বেশ কয়েকজন গুণ্ডা আছে।

দুর্গা ফিসফিস করে বলেছিল, এতনা বড় চাকু আছে মঙ্গলের। বড় ডর লাগে বাবু।

পুলিশের কালো ভ্যানটা দেখে দীনেনবাবু বিরক্ত হলেন। পুলিশ প্রায়ই এসে বস্তিটা সার্চ করে।

দক্ষিণের জানালা খুলে একদিন দেখেছিলেন, তখন বিকেল, পুলিশের গাড়ি আসতেই চোলাই মদের টিন আর রবারের ব্যাগ সব বস্তির এখানে ওখানে চালের ওপর তুলে দিল।

আসলে ওটুকুও বোধহয় দরকার হয় না। পুলিশের সঙ্গে রীতিমত ব্যবস্থা আছে। কারণ মঙ্গলকে কিংবা তার দলের দু-একজনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। কিন্তু দু-একদিন পরেই তাকে আবার দেখা যায়। বেশ বুক ফুলিয়ে চলে।

দীনেনবাবু কড়া নাড়ার শব্দে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিলেন। গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকেন, একেবারে বস্তির গায়ে। তাই যত ঝক্কি ঝামেলা তাঁর উপর দিয়েই যায়।

—দরজা খুলুন। শিগগির দরজা খুলুন। বাজখাঁই গলায় কে বললে।

আলো জ্বেলে দরজা খুললেন, খুলেই দেখেন এস আই আর জনকয়েক কনস্টেবল।

—সার্চ করব। প্রদীপ্ত কোথায় ?

এতক্ষণ বিরক্ত হচ্ছিলেন, হঠাৎ পায়ের তলার মাটি সরে গেল। কেমন বিভ্রান্ত বোধ করলেন।

কোমরে দড়ি দেওয়া একটা ছেলে, প্রদীপ্তরই বয়েসের, তাদের সঙ্গে।

ওরা গটমট করে এ ঘর ও ঘর ঢুকল।

প্রদীপ্ত ইতিমধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। —চলুন, আমিই।

এস আই কোমরে দড়িবাঁধা ছেলেটার দিকে তাকাল। ছেলেটার হাতে হ্যান্ডকাফ।

জিগ্যেস করল, এই।

অর্থাৎ প্রদীপ্তকে চিনিয়ে দিতে বলল।

হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ওরা প্রদীপ্তকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপরও ঘরগুলো সার্চ করল। কিছু পেয়েছিল কি পায়নি, দীনেনবাবু জানেন না।

উনি তখন বিভ্রান্তের মত বসে পড়েছেন।

শুধু মনে আছে চারু কাঁদো কাঁদো গলায় জিগ্যেস করেছিল, কেন নিয়ে যাচ্ছেন, ও কি করেছে ?

এস আই রহস্যের ঢঙে বলেছিল, করেনি, করবে।... বিপ্লব !

'বিপ্লব' শব্দটা খুব নাটুকে ভাবে উচ্চারণ করেছিল।

ওঁদের সকলেই একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস হয়নি। মনু কোনও অন্যায় করতে পারে, এমন কিছু করতে পারে যার জন্যে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যাবে, ভাবতেই পারেননি। নিশ্চয়ই পুলিশ কিছু ভুল করেছে।

হয়তো অন্য কেউ প্রদীপ্ত আছে, তার বদলে ওকেই ধরেছে। কিংবা বন্ধুবান্ধব কেউ আছে ওদের দলে, শুধু আলাপ আছে বলেই ওকেও ধরেছে। কিংবা কোনও দলাদলি। ওই যে ছেলেটা ওকে চিনিয়ে দিল, ও তো মনুর বন্ধু নয়। এত সব বন্ধু আসে, সকলেই তো প্রায় মুখচেনা, দু'-একজনের নামও জানেন, কিন্তু ওই ছেলেটিকে তো কোনওদিন দেখেননি।

ওকে ইচ্ছে করে এইসব ব্যাপারে জড়িয়ে দিয়ে শোধ তুলছে হয়তো। আজকাল তো কলেজের ইউনিয়ন-টিউনিয়নেও কত পলিটিক্স হয়। একবার একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল প্রেমের রেষারেষি নয় তো !

না, মনু কখনও এসবের মধ্যে থাকতে পারে না।

ভোর পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু কি করবেন, কোথায় যাবেন, কার কাছে। একটা তো কিছু করতেই হবে।

দুপুরে মনুর চোখে জল দেখেছিলেন কেন ? ও কি আগেভাগেই কিছু জানতে পেরেছিল ? তা হলে বাড়িতে ফিরে এল কেন ? কি বলতে চেয়েছিল ?

তিপু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।—বাবা, হাজতে নিয়ে গিয়ে ওরা খুব মারে, না ?

দীনেনবাবু তখন মারধোরের কথা ভাবছেন না। বিভ্রান্তের মত শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন। পুলিশে চেনাজানা কে আছে, কারও কথা মনে পড়ছে না।

হাওয়ায় হাওয়ায় কত উড়ো খবর ঘুরে বেড়ায়। কত লোকের কাছে কত কথা শুনেছেন। সত্যি না মিথ্যে তাও জানেন না।

লোকের মনে ওদের সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ভয়, আর সেই ভয় থেকে প্রচণ্ড ঘৃণা। ওঁদের অফিসের ইউনিয়নের পাণ্ডারা তো শুনলে অবাক হয়ে যাবে। হয়তো ওঁকেও ঘৃণা করবে। কিন্তু সে-সব নিয়ে চিন্তা নেই দীনেনবাবুর। এখন একটাই চিন্তা, কি করে ওকে বাঁচানো যাবে।

—আইনটাইন সব উঠে গেছে মশাই, কোর্ট কাছারির ধার দিয়েও যাচ্ছে না পুলিশ। সেদিন কি করেছে জানেন, স্রেফ পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে মাঝপথে ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে বলেছে, পালাও। তারা বিশ্বাস করে যেই পালাতে গেছে, পিছন থেকে গুলি। কেন ? না, পালাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে গুলি চালিয়েছি।

একজন কে অবিশ্বাস করেছে।—দূর মশাই, তাও কি সম্ভব। এটা তো গণতন্ত্রের দেশ, কোর্ট আছে।.

আরেকজন বলে উঠেছে, যদি করে থাকে ঠিকই করেছে। কতগুলো সাধারণ নিরপরাধ মানুষকে যারা...

দীনেনবাবু দেখেছেন, ওদের ওপর কারও কোনও সিমপ্যাথি নেই, কেউ পছন্দ করে না। শুধু ওই কচি কচি বাচ্চা ছেলেগুলোকে পুলিশ কেন শেষ করে দিচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ, সেজন্যেই যত আক্রোশ। ওটা সিমপ্যাথি নয়।

আসলে সকলেই যেন ওদের ভয় পেয়ে গেছে।

—ব্রিলিয়েন্ট সব ছেলে, জানেন। শুধু মিসগাইডেড হয়ে...

কি জানি, সকলেই শুধু ভয় পাইয়ে দিতে চায়। ওরা ভাবছে ভয় পাইয়ে ক্ষমতা অধিকার করা যায়, পুলিশ ভাবছে ভয় পাইয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে দেব। তা কেন, গণতন্ত্রেও তো এখন একই সুর। তুমি যদি আমার দলে না হও, তোমাকে ভয় পাইয়ে আমার দলে টেনে আনব। চোলাই মদের কারবারি ওই মঙ্গলের মত। এত্ত বড় একটা চাকু, বস্তির সকলেই ভয় পায়। এত অশান্তি, ওই বস্তির লোকদেরও তবু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

অন্ধকারে জালে ঘেরা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে এসে বসেছিলেন দীনেনবাবু। ভোরের অপেক্ষায় ছিলেন।

হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জালটা স্পর্শ করলেন। মনে হল মনু নিজেই শুধু গরাদে ঘেরা হাজতের মধ্যে চলে যায়নি, তাঁকেও যেন জালে ঘেরা একটা খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়ে গেছে।

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। যেন ভোর হলেই কারও কাছে গিয়ে বলতে পারলেই শান্তি।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করতেই উঠে দাঁড়ালেন। এখন একজন কাউকে সহায় সম্বল হিসেবে ধরতে হবে। একটা অবলম্বন চাই। কার কাছে যাবেন ?

প্রথমেই মনে পড়ল অমলেশবাবুর কথা। অমলেশ গোস্বামী, দীনেনবাবুর বাড়িওয়ালা। উনি হয়তো ইতিমধ্যে জেনেও গেছেন। এ বাড়ির অন্য ভাড়াটেরাই কি না জেনেছে !

দীনেনবাবু অবশ্য লক্ষ করেননি পুলিশের সঙ্গে পাড়ার কেউ বা এ বাড়ির কেউ ছিল কিনা। তখন তো তিনি উদ্‌ভ্রান্ত। ভাল করে দেখেননি কিছুই। তবে, ওই সময়ে কি কেউ জেগে ছিল ? অমলেশবাবুরা হয়তো কিছুই জানেন না। তেমন হট্টগোল তো হয়নি কিছুই, গাড়িটাও এসেছিল নিঃশব্দে।

দীনেনবাবু উঠে এসে ঘরের মধ্যে একবার তাকালেন। মা আর মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। ওঁকে দেখে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল। দু'জনেই।

দীনেনবাবু স্বগতোক্তির স্বরে বললেন, যাই একবার অমলেশবাবুকে জিগ্যেস করি। পুলিশে চেনাশোনা কেউ আছে কিনা।

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাবে ?

একটু থেমে আবার বললেন, ওরা হয়তো কিছুই জানে না। পাড়ার লোকদের মিছিমিছি জানিয়ে কি লাভ।

দুঃখের হাসি হাসলেন দীনেনবাবু। এ-সময়েও। এই বিপদেও পাড়ার লোক জানবে তাঁর ছেলে ওইসব দলে আছে। কিংবা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে সেটাই বড় হল। নাকি চারু ভাবছে ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছু নয়, মনু এখনই ছাড়া পেয়ে যাবে, অতএব লোক-জানাজানি করে কি দরকার।

দীনেনবাবুর বুকের ভেতর কিন্তু সাঙ্ঘাতিক একটা আতঙ্ক। এখন মনে হচ্ছে সত্যিই দেশে কোনও আইনকানুন নেই, ওসব শুধু আইনের বইয়ে। ছেলেটাকে ওরা গুলি করে মেরে দেবে না তো।

চারুর কথার জবাবে তাই ঈষৎ রুক্ষভাবে বললেন, ছেলেটাকে তো বাঁচাতে হবে।

—তাই যাও। চারু হতাশ গলায় বললেন। পরক্ষণেই বললেন, আমিও যাব ?

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন দীনেনবাবু, তারপর বললেন, নাঃ।

ডাকাডাকির পর ঘুম চোখেই বেরিয়ে এলেন অমলেশ্বাবু। দেখেই বললেন, আসুন আসুন। রাত্তিরেই দেখলাম বারান্দা থেকে, কি ব্যাপার বলুন তো!

সব শুনে বিস্মিত হলেন। —সে কি, মনু তো রীতিমত ভাল ছেলে। কাল ওকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল দেখলাম, আমরা তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি এমন করেছে...

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার তো কেউ চেনাশোনা নেই, আপনি বরং অতীশবাবুর কাছে যান। রিটায়ার্ড আই সি এস, ওঁর নিশ্চয় অনেক চেনা লোক আছে, তা ছাড়া ইনফ্লুয়েন্স আছে।

ভেঙে পড়া অসহায় গলায় দীনেনবাবু বললেন, আপনিও চলুন অমলেশবাবু। আপনি বললে হয়তো...

অমলেশ গোস্বামী এমনিতে খুবই সদাশয়। কিন্তু বলে বসলেন, না না আপনিই যান। আমাকে আবার এর মধ্যে...

অর্থাৎ নিজেকে জড়াতে চাইলেন না। নিজেকে আরও অসহায় লাগল দীনেনবাবুর। হঠাৎ যেন টের পেলেন এই একটা ঘটনায় উনি অচ্ছ্যুত হয়ে গেছেন। পাড়ায় তাঁর বাড়িটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, কিংবা ঘৃণায় অস্পৃশ্য, একঘরে।

অতীশবাবুর বাড়িটা সাত আটখানা বাড়ি পরে। লোহার গ্যেট, গ্যেটের ধারে তামার নেমপ্লেটে লেখা অতীশ সোম আই সি এস। যখন চাকরিতে ছিলেন বাড়িটা তখনই তৈরি, নেমপ্লেটও।

দীনেনবাবু ভাড়াটে হয়ে এসেছেন অনেক পরে। এমনিতেই এ পাড়ায় কারও সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

খানিকটা ভাড়াটে বলে, কিছুটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকেন বলে ঈষৎ হীনমন্যতা বোধহয় ছিলই। নিজে যেচে আলাপ করতে যাননি। অতীশ সোমের সঙ্গে তো নয়ই। একে বয়সে ওঁর চেয়ে অনেক বড়, মর্যাদাতে আরও। তা ছাড়া যেতে আসতে দেখেছেন কেমন গম্ভীর প্রকৃতির। তাই আলাপ করতে সাহসও হয়নি।

এখন এমন একটা অনুরোধ নিয়ে যেতে আরও ভয়। মুখ তুলে কারও দিকে তাকাতেও লজ্জা। যেন ওঁর ছেলে সত্যিই খুনি আসামি। কারণ যারা খুন করে বেড়াচ্ছে ওঁর ছেলেও তাদের দলে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে নিরপরাধ একটি ছেলেকে ভুল করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ভুল করে, কিংবা অন্যায় ভাবে।

—আপনি তো মশাই ভাগ্যবান, এমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলে আপনার। মহীতোষবাবু একদিন বলেছিলেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, শুধু টাকাই করলাম, ছেলে দুটোর একটাকেও মানুষ করতে পারলাম না।

শুনে সেদিন খুব গর্ব হয়েছিল। আর আজ? আজ মনে হচ্ছে মহীতোষবাবু কত ভাগ্যবান। ওঁর ছেলেরা কেউই পড়াশোনায় বেশি দূর এগোয়নি, কিন্তু বাবার ব্যবসায় লেগে গেছে। তাদের জন্যে ওঁকে কোনও অপমান বা অপবাদ সহ্য করতে হয় না। দীনেনবাবুর মত আতঙ্কে ছেলের হৃৎপিণ্ড বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় না। শুধু বেঁচে থাকা—বেঁচে থাকা মানেই সুখ।

অস্বস্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে দীনেনবাবু সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। মোজেক করা সুন্দর সিঁড়ি। দারোয়ান আগে আগে এল। বসার ঘরে নিয়ে এসে বসতে বলল।

ডানলোপিলো গদিআঁটা শোফায় বসে থাকতেও দীনেনবাবুর অস্বস্তি হচ্ছিল। যেন এখন আর ওঁর এ রকম একটা চেয়ারে বসার কোনও অধিকার নেই। একটা কাঠের

চেয়ার—না, তাও নয়। এখন ওঁর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, ছেলের প্রাণভিক্ষা করতে এসেছেন। যদি কোনওরকমে বাঁচাতে পারেন।

অতীশবাবু আসার আগেই চাকরটা এক কাপ চা রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু দীনেনবাবু স্পর্শও করেননি।

তারপর অতীশবাবু এলেন। সব শুনলেন। কপাল কুঁচকে একটুক্ষণ কি ভেবে নিলেন। বললেন, এক কাজ করুন...

একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে দিলেন।—গিয়ে দেখা করুন, আমার নাম করে বলবেন।

দীনেনবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। তবু ভরসা পাচ্ছিলেন না।

অনুনয় করে বললেন, আপনি যদি একটা চিঠি লিখে দেন।

—আপনি চলে যান না, আমি ফোন করে দিচ্ছি। বলে উঠে গেলেন।

ফিরে এসে বললেন, না, ফোনে পেলাম না। আপনি এই চিঠিটা নিয়ে যান।

কৃতজ্ঞতায় নিজেকে বিকিয়ে দিতে ইচ্ছে হল দীনেনবাবুর।

উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, অতীশবাবু হেসে হেসে বললেন, ওই বস্তিটার জন্যে তো পাড়ায় থাকা যায় না। আপনার ল্যান্ডলর্ড মিস্টার গোস্বামীকে বলুন না, একটা কিছু করতে। ওঁরই তো জমি, কেন যে অ্যালাও করেছিলেন...

এসব কথা এখন আর দীনেনবাবুর একটুও ভাল লাগছে না। ভিতরে ভিতরে যেন একটু বিরক্তই হলেন। লোকটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমি এখন বিপন্ন, ছেলেকে বাঁচানোর কথা ভাবছি। আর উনি ভাবছেন বস্তি উচ্ছেদের কথা।

অমলেশবাবুর কি দোষ। উনি কি স্বেচ্ছায় বসতে দিয়েছেন। দীনেনবাবু তো শুনেছেন ওঁর বাড়িওয়ালার কাছে। অমলেশবাবুর বাবা দয়া করে একজনকে থাকতে দিয়েছিলেন জমিটায়। তখন অমলেশবাবু তো প্রায় ত্যাজ্যপুত্র। অথচ পাড়ার লোক ওঁকেই দোষ দেয়। যেন উনিই যেচে নিয়ে এসেছেন ওদের, বসতে দিয়েছেন।

দীনেনবাবু বিদায় নিয়ে গ্যেটের বাইরে এসে চিঠিটা পড়লেন। শুধু একটি লাইন। হি ইজ ইন ট্রাবল, প্লিজ সি ইফ ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর হিম।

চিঠিটা পেয়ে দীনেনবাবু ভেবেছিলেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। কিন্তু ওই একটি মাত্র লাইন?

উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কাজ হবে কি! এ তো দায়সারা চিঠি।

মানুষ তো বিপন্ন হলে খড়কুটোও ধরে। দীনেনবাবুকে সাহায্য করার আর কে আছে। কেউ নেই, কেউ নেই। অন্য কোনও বিপদ হলে হয়তো অনেকেই এগিয়ে আসত। কিন্তু এটা তো এখন অন্য ব্যাপার। ওদের ওপর কারও কোনও সিমপ্যাথি নেই। ওদেরও নিশ্চয় একটা যুক্তি আছে, কিন্তু কেউ বুঝতে রাজি নয়।

একা যেতে সাহস হল না দীনেনবাবুর। শেষ অবধি অফিসের এক বন্ধুকে, বহুকালের সহকর্মী, তাকেই বললেন। গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সকলেই তো জানবে। তখন আরও অপদস্থ হতে হবে, তার চেয়ে আগে-ভাগে বলে রাখাই ভাল।

একজনকে সঙ্গে নিয়েই গেলেন। বাড়িতে পেলেন না, তিনি এখন লালবাজারে। ছেলে বললে, সেখানেই চলে যান।

শেষ অবধি দেখা হল। খুব কড়া মেজাজের ডি সি। প্রথমটা খুব খুশি-খুশি, চিঠি পড়ে জিগ্যেস করলেন, অতীশদা এখন কেমন আছেন? বহুকাল যেতে পারিনি।

তারপর সব শুনলেন, শুনতে শুনতেই ওঁর মুখের চেহারা বদলে যেতে লাগল।

দীনেনবাবু বললেন, ভীষণ ভাল ছেলে, ও এসবের মধ্যে থাকতেই পারে না। ভুল করে ধরেছে। হয়তো বন্ধুদের মধ্যে, মানে কলেজে তো অনেকেই অনেক কিছু করে, চেনে হয়তো।

ডি সি হাসলেন।—সব বাবার কাছে সব ছেলেই তাই। আমার ছেলে কি করছে আমি জানি? ছেলেমেয়ে বাড়ির চৌকাঠ পেরোলেই অন্য রকম, কে কি করছে কিচ্ছু জানার উপায় নেই।

একটু থেমে বললেন, আপনি অতীশদার চিঠি নিয়ে এসেছেন, আই মাস্ট ডু সামথিং ফর ইউ। আমি ফোন করে দিচ্ছি, আপনার থানার ও সি-র কাছে চলে যান। যদি অ্যাকশন কমিটিতে না থাকে....হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এখন কিচ্ছু বলতে পারছি না।

ব্যস্, এইটুকুই। সঙ্গে সঙ্গে ডি সি ভদ্রলোকের ওপর, অতীশ সোম আই সি এসের ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। যেন দেখতে পেলেন মনু ছাড়া পেয়েছে।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মনুর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর এত আশার মধ্যেও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। উনি তো এতদিন লক্ষই করেননি। কিংবা হঠাৎ একদিনে তো বদলে যায়নি, তাই ধরতে পারেননি। মনুর চেহারাটা কত সুন্দর ছিল, কেমন নিষ্পাপ সরল। বড় বড় চোখ। অথচ কখন যেন বদলে গেছে। রুক্ষ, গাল বসা, চোখের দৃষ্টি কেমন অন্যরকম। ক'দিন দাড়ি কামায়নি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওকে কি দেখে ও সি-র খুব ভয়ঙ্কর মনে হবে। আগের মত নিষ্পাপ সরল চেহারা থাকলে হয়তো নিরপরাধ ভাবত।

চেহারা দেখেই তো আমরা সকলকে বিচার করি!

এতদিন বাদে, কত বছর তার আর হিসেব রাখেন না, দীনেনবাবু তাঁর পঙ্গু শরীরটা নিয়ে জালে ঘেরা এই বারান্দার সামনে বসে অনুশোচনা করেন। কিংবা তাও নয়। শুধুই তাকিয়ে থাকেন।

কেউ আসে, কেউ যায়। কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায় না। পাছে উনি ডেকে বসেন, পাছে কথা বলতে শুরু করেন।

আসলে কথা বলার লোক তো পান না, একজন কাউকে পেলেই অনর্গল কথা বলতে শুরু করেন। স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে একটা দিক একেবারে পড়ে গেছে। অকর্মণ্য অবশ শরীর নিয়ে বসে থাকেন, রাস্তার লোক দেখেন, সামনের বাড়ির পাঁচিলের আড়াল থেকে ওঠা পারিজাত গাছটা, তার বিচিত্র লাল ফুল, পেঁপে গাছের সবুজ, এক টুকরো চৌকো আকাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। বস্তির ছেলেমেয়েদের এক্কা দোক্কা খেলা।

একটু আগেই অতীশবাবু এ পথ দিয়ে গেছেন। ফিরেও তাকাননি। পাছে উনি ডেকে বসেন। কে জানে হয়তো অতীশবাবু নিজেও নিজেকে অপরাধী ভাবেন। যেন তিনিই দায়ী, দীনেনবাবুর এই অবস্থার জন্যে।

কে দায়ী কেউ জানে না।

দীনেনবাবু জালের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। একটু আগে বিশ-বাইশ বছরের একটা ছেলে চলে গেল। অন্যমনস্ক ছিলেন বলে, অথবা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাই তার মুখটা দেখতে পাননি।

আশায় আশায় আছেন সে ফিরবে। তার মুখ দেখবেন। আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবেন, ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রেখো। ও যেন বেঁচে থাকে। ওই বয়সে শুধু বেঁচে থাকাটাই সুখ।

তিন

অতীশবাবুর কেবলই মনে হচ্ছিল আর সময় নেই। এবার দৌড়তে হবে।

সারাটা জীবন কাজের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছেন। স্ত্রীর দিকে ভাল করে দৃষ্টি দিতে পারেননি, তেমন করে ভালবাসতে পারেননি। এতকালের অভ্যাসে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েই ছিল, রিটায়ারমেন্টের পর প্রচুর অবসর পেয়েছিলেন, কিন্তু কাছে আসতে পারেননি। এখন হাতে সময় কম, তাই সকলকে গভীরভাবে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। স্ত্রীকে, ছেলে অন্তুকে, পুত্রবধূকে, ছোট্ট নাতিটিকে।

অন্তু তো হোস্টেলে হোস্টেলেই মানুষ। কোনওদিনই তেমন করে কাছে পাননি। সেও এখন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। যেন বাবার সম্পর্কে কোনও কৌতূহলও নেই।

অতীশবাবু ভেবেছিলেন সেদিন অন্তু ফিরে এসেই ওঁকে কিছু প্রশ্ন করবে। তাই ভয়ে ভয়ে ছিলেন। একটা অজুহাতও বানিয়ে রেখেছিলেন। সন্দেহ হয়েছিল ওঁকে প্রশ্ন না করে হয়তো মাকেই বলবে।

কিন্তু না, সেদিক থেকেও কোনও প্রশ্ন আসেনি।

একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, যেন বেঁচে গেছেন। আবার পরক্ষণেই একটা অভিমান বুক ঠেলে উঠেছে। ওরা কি সবাই আমাকে মৃত ভেবে নিয়েছে! আমার সম্পর্কে কোনও কৌতূহল নেই, ঔৎসুক্য নেই?

আরাম কেদারায় বসে বসে অতীশবাবু ওদের দেখছিলেন।

মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা চলে গেছে। সেখানেই আছে, ভালই আছে। কিন্তু তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ক্ষণিকের জন্যে ভেবেছেন টেলিফোনে তাকে একবার চলে আসতে বলবেন। কিন্তু হঠাৎ আসতে বললে তার বোধহয় অসুবিধে হবে।

সেইজন্যেই তো কোনওদিন কাউকে তেমন করে ভালবাসতে পারলেন না। সব সময়েই ভালবাসার চেয়ে কর্তব্য বড় হয়ে উঠেছে।

এখনও অনেক কর্তব্য পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

অতীশবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। বড় ভাল লাগছিল। কি এক অবোধ্য কষ্টে চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

ওঁর এই খাওয়ার ঘরটা বেশ বড়। লম্বা হলঘরের মত। মফস্বলে মফস্বলে ঘুরেছেন, জেলায় জেলায় ডি এম হয়ে। যেখানকার বাংলোয় যেটি ভাল দেখেছেন বাড়ি করার সময় মনে রেখেছিলেন। তার মধ্যে এই এল্ শেপের হলঘর। ডাইনিং টেব্‌লটা আড়ালে পড়ে, এদিকটা লম্বা চলে গেছে ঝুল বারান্দা অবধি। শোফাকৌচ একদিকে, আরেকদিকে একটা ডিভান, মাঝখানটায় গালিচা ধরনের কার্পেট। সুন্দর কাশ্মীরি কাজ। এদিকে একটা বেতে বোনা হাতলওলা আরাম কেদারা।

কিন্তু সবই পুরনো হয়ে এসেছে, নতুন জৌলুস আর নেই। এখন তিনতলায় ছেলের ঘরে সব ঝকঝকে নতুন ব্যাপার। ডিজাইনও।

স্ত্রী নিরুপমা গালিচার ওপর বসে পুত্রবধূ শাশ্বতীকে ক্রুশ বোনার কায়দাকানুন বোঝাচ্ছেন। ওসবের তো এখন আর তেমন চল নেই, তাই শাশ্বতী জানে না, শেখেনি। শাশ্বতী বারবার ভুল করছে বলে নিরুপমা ধমক দিলেন, তোমার শেখার মন নেই।

শাশ্বতী আদুরে ঢঙে ঠোঁট উল্টে বললে, শেখার মন না থাকলে শিখতে চাইব কেন?

নিরুপমা নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, আমাকে খুশি করতে।

অন্তু এক কোণে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল, আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিল, হেসে উঠল না।

হেসে উঠলেন অতীশবাবু।

আর শাশ্বতী রাগের ভান করে বললে, আপনি শেখাতেই জানেন না।

নিরুপমা অন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনছিস ! তোর বউটা বড় ফাজিল হয়েছে। শাশুড়িকে এতটুকু সম্মান করে কথা বলতে জানে না।

অতীশবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, শুনছিলেন। বেশ লাগছিল। অন্তুর আড়াই বছরের ছেলের নাম খুশবু। সে এক মনে খেলছিল। অতীশবাবু ডাকলেন, খুশবু ডিয়ার, আমার কাছে এসো তো একবার।

খুশবু খেলা করতে করতে একবার তাকাল। বললে, পরে দাদুসোনা, পরে।

দাদুসোনা ডাকটা শাশ্বতী শিখিয়েছে, অতীশবাবুর বেশ ভালই লাগে। আরেকটু হলেই হয়তো বলে ফেলতেন, পরে কি আর সময় হবে ভাই। সামলে নিলেন।

রীতিমত হুকুমের মত করে বললেন, না পরে নয়, এখনই এসো।

খুশবু বললে, তুমি এসো। এসো বলছি।

নিরুপমা হেসে উঠে বললেন, হল ? ওর কাছে আর ম্যাজিস্ট্রেটি ফলিয়ো না।

অতীশবাবুও হাসলেন, আরাম কেদারা ছেড়ে খুশবুর কাছে গিয়ে কার্পেটে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে খেলা ছেড়ে দাদুসোনার গায়ে ঠেস দিল। অতীশবাবু বাঁহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে তুলে নিতেও ইচ্ছে হচ্ছিল।

শাশ্বতী এখন ঘোমটা দেয় না, শুধু শ্যাম্পু করা একরাশ চুল, সেটুকুই ঘাড় অবধি ঢাকে। নিরুপমা বিয়ের পর থেকেই ঘোমটা দিতে দেননি। অতীশবাবু বলেছিলেন, ওসব ঘোমটাটোমটা এ বাড়িতে চলবে না, দেখলেই মনে হবে আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু শাশ্বতী অতীশবাবুকে সমীহও করে, শাসনও করে।

খুশবুকে কোলে নিলেই বলবে, আপনার জামার ইস্ত্রি নষ্ট হবে।

ও তো জানে না, অতীশবাবুর এখন আর শৌখিনতার দিকে কোনও দৃষ্টি নেই। এখন আর কোনও কিছুর দিকে দৃষ্টি নেই। এখন শুধু এদের দেখছেন। বড় ভাল লাগছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে।

নিরুপমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, গল্প করতে। কিন্তু কি বলবেন্ !

—ও তোমাকে শেখাতে পারবে না। শুধু নিজে জানলেই হয় না, শেখানো একটা আর্ট। আড়চোখে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বললেন।

নিরুপমা হেসে বললেন, এই তো পারছে, বাঃ, ঠিক হচ্ছে।

তারপর বেশ কপট-গাম্ভীর্য আনলেন। —আমি তো স্কুল-টিচার ছিলাম না, আই সি এসের বউ। এখন বুড়ি হয়ে গেছি বটে, কিন্তু আমিও একবার বব্ করেছিলাম।

শাশ্বতী চমকে উঠে বললে, মা সত্যি ? আপনি বব্ করেছিলেন ? হেসে উঠল।

নিরুপমা হাসতে হাসতে বললেন, ওকে না জানিয়ে করেছিলাম। সে কি রাগ। সাতদিন কথাই বলেনি।

একটু থেমে বললেন, নিজে এদিকে সাহেব হবে, বউ একটু মেম হতে চাইলেই ভেতর থেকে ভেতো বাঙালি বেরিয়ে পড়বে। ওরা ওরকমই।

অতীশবাবু বললেন, এই মিথ্যে বোলো না। বব্ করার জন্যে রাগ নয়, না জানিয়ে করেছিলে বলে।

নিরুপমা বললেন, জানাতেই বা হবে কেন ? যেন রাগটা এখনও আছে।

অতীশবাবুর খুব খারাপ লাগল। ব্যথা পেলেন। একটু অনুশোচনাও। জীবনে এমন কত ভুলই তো করেছেন, এখন মনে পড়লে কষ্ট হয়। ওরা কত সামান্য জিনিসে সুখী হয়, অথচ সেটুকুও কেন যে মেনে নিতে পারেননি। আসলে 'ইগো'। আমিই সব, এই

অহঙ্কার।

এই অহঙ্কার এখন কোথায় রইল। ভাবতেই কেমন মনমরা হয়ে গেলেন। মনটাকে সরিয়ে আনবার জন্যে খুশবুর গালে গাল ঘষলেন।

তারপর ওকে ছাড়িয়ে আরাম কেদারায় আবার উঠে এলেন। উঠে আসার সময় একবার অন্তুর দিকে তাকালেন। ও তেমনি ম্যাগাজিনে ডুবে আছে। এত যে কথাবার্তা, সরস রসিকতা হল, একবারও হাসেনি। কথা বলেনি।

অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল অন্তু অনর্গল কথা বলুক ওঁর সঙ্গে। সেই ছেলেবেলার মত। খুব কাছে এসে বসুক। কিংবা ও যদি সত্যি কিছু সন্দেহ করে থাকে, কিছু ভেবে থাকে, স্পষ্ট বলুক না।

অতীশবাবু তো ভেবে রেখেছেন কি বলবেন। তখন ওর সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

নাঃ। এ বড় অস্বস্তি। তার চেয়ে কাজগুলো সেরে ফেলাই ভাল। এখনও অনেক কাজ বাকি। সব একসঙ্গে মনেও পড়ে না।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে এলেন। ওদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করছে, প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছে অন্তুর ব্যবহার।

নিরুপমাকে নিয়েও বড় মুশকিল। কিছু বোঝাতে চাইলে বুঝতে চান না। কোনও ব্যাপারেই কোনও আগ্রহ নেই। অথচ ওঁরও তো আর সময় নেই। আর দেরি করা চলে না।

যখন নিরুপমাকে ডেকেছেন, 'শুনে যাও, এই কাগজপত্রগুলো দেখে নাও', নিরুপমা একটা না একটা অজুহাত দেখিয়েছেন। হয় বলেছেন 'সময় নেই', আর নয়তো 'ওসব দেখে কি হবে'।

তবু জোর করে একদিন বসিয়েছিলেন, এই যে ইউনিটগুলো, জয়েন্ট নামে আছে, তুমি সই করলেই হবে। মানে আমার অবর্তমানে...

তাকিয়ে দেখেন নিরুপমা, কাগজের দিকে না তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আর তখন চোখে জল এসে গেছে ওঁর।

তা দেখে নিরুপমা বলেছেন, ম্যাজিস্টর সাব, আপনি যাবার আগেই মেমসাব সটকে পড়বে।

আবার একটা কাগজ বের করে বলেছেন, এই ডিবেঞ্চারগুলো যদিও তোমার আর অন্তুর নামে, তবু তোমারই ফার্স্ট নেম। মানে...

নিরুপমা উঠে পড়েছেন। —তোমার পাগলামি শোনার আমার আর সময় নেই।

নিরুপায় হয়ে একটা খাতা বানিয়েছেন, তার মধ্যে স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির কোনটা কি করতে হবে, কখন করতে হবে লিখে রাখছেন। এমন কি ইনকাম ট্যাক্স ওয়েলথ ট্যাক্সের জন্যে কখন কি করতে হবে, উকিলের নাম ঠিকানা...

এসব লিখতে লিখতে এক একসময় মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কান্না পায়। তাঁর বুকের মধ্যের চাপা কষ্টটা কাউকে তো স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। বলতে চান না।

একবার সলিসিটারের কাছে যেতে হবে, মনে মনে ভাবছেন। কোনওদিনই যাওয়া হয়ে উঠছে না।

কেমন একটা অধৈর্য লাগছে। কোনটা যে আগে করি। আর কোনটা পরে, ঠিক করতে পারছিলেন না বলেই অসহায় লাগছিল।

সবে আলমারি খুলে কাগজপত্র বের করবেন ভাবছেন, দারোয়ানটা এসে বললে, পাড়ার এক বাবু এসেছেন।

নীচের তলায় একটা বসার ঘর আছে। কেউ এলে প্রথমে সেখানেই বসতে দেওয়া হয়। খুব কাছের লোক হলে তবেই ওপরে নিয়ে আসতে বলেন।

পাড়ার লোক, তাই অতীশবাবু নিজেই নেমে এলেন। এসে দেখলেন, মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবু একা নন, আরও দু-একজন বাইরে দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার, ওঁরা দাঁড়িয়ে কেন। ডাকুন ওঁদের।

এই সব সৌজন্য অতীশবাবু কোনও সময়েই ভুলে যান না। তবে পাড়ায় ম্যান অফ প্রিনসিপ্‌ল্ হিসেবে ওঁর একটা সুনাম বা দুর্নাম আছে। তাই মহীতোষবাবু কথাটা পাড়তে একটু ইতস্তত করছিলেন। ওঁরা জানেন অতীশবাবুকে নিয়ে মুশকিল এই যে উনি 'হ্যাঁ' বললে হ্যাঁ, 'না' বললে না।

শুধু অতীশবাবু নিজেই জানেন যে উনি আর সেই মানুষ নেই। ভিতরে ভিতরে ভেঙে গেছেন। নরম হয়ে গেছেন। এখন এইসব বাজে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে।

মহীতোষবাবু বললেন, শুনেছেন কিনা জানি না, কাল রাত্তিরে আমাদের রাস্তায়, মানে ওই বস্তির গলির সামনে একটা স্ট্যাবিং হয়ে গেছে।

—অ্যাঁ ? চমকে উঠলেন অতীশবাবু। কখন ?

—খুব হল্লা হল. শোনেননি ? রাত দশটা নাগাদ।

অতীশবাবুর মনে পড়ে গেল। তখন ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন। তা ছাড়া এমন হই-হল্লা বস্তিটায় তো লেগেই থাকে। কোনও কৌতূহল হয়নি।

আরেকজন, অতীশবাবু তাঁর নাম জানেন না, মুখ চেনেন, তিনি পিছন থেকে সামনে এগিয়ে এসে বললেন. মেয়েদের তো যাতায়াতই বন্ধ হয়ে পড়ছে। আমরা কবে ছুরি খাব কে জানে।

মহীতোষবাবু হাত তুলে তাকে থামতে বললেন। তারপর নিজেই শুরু করলেন, ভাটিখানা তো হয়েই ছিল। সন্ধে থেকে মদ বিক্রি, সব্জি বাজারের যত দোকানদার, ঠেলাঅলা রিকশাঅলা এসব তো ছিলই, ওদিক থেকে দু-চারটে ভদ্রলোকের ছেলেও নাকি আসছে।

যারা সঙ্গে এসেছে তাদেরই একজন বললে, ভদ্রলোকের ছেলে নিয়েই তো মুশকিল। এরা তবু জ্ঞান থাকলে সমীহ করে, ভয় পায়। মেয়েদের আসতে দেখলে 'হট যাও', 'হট যাও' বলে, ভদ্রলোকের ছেলে মাতাল হলে তার সে জ্ঞানটুকুও থাকে না।

পিছন থেকে একজন ফোড়ন কাটল, হট যাও হট যাও ওরা করে না। দেখেননি, আমাদের বাড়িতে ঠিকের কাজ করে রামপিয়ারির মেয়ে সুভদ্রা, তার দাদা থাকলে সরে যেতে বলে।

মহীতোষবাবু বললেন, না, শুধু সে নয়। আমার বাড়িতে কাজ করে নন্দা, তার বাবাও আমাদের বাড়ির মেয়েদের দেখলে...

অতীশবাবুর মজা লাগছিল। বেশ বুঝতে পারছেন এই বস্তির বিরুদ্ধেই কোনও অভিযোগ নিয়ে এসেছে। অভিযোগ তাঁর নিজেরও আছে, কিন্তু সেখানেও এদের একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে। ওই বস্তি থেকে ঠিকে-ঝি এসে বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে বলে। আর সেই সুবাদে বস্তির লোক কাকে কতখানি সম্মান করে তা ব্যক্ত না করে পারছে না। ওদের কাছে রেসপেক্ট আদায় করতে পারে বলেই নিজে দামি হয়ে উঠছে।

অতীশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ওটা কোনও কাজের কথা নয়। কে কবে ওখানে থাকবে, সমীহ করে সবাইকে সরিয়ে দেবে সে-ভাবে তো চলে না।

ওঁর মনে পড়ে গেল পুত্রবধূ শাশ্বতী একদিন কেনাকাটা করে, রাত আটটা কি সাড়ে

আটটা, ফিরে এসে রাগ প্রকাশ করছিল। —সন্ধের পর তো বাড়ি থেকে আর বেরোনো চলবে না। ভাল জায়গাতেই বাবা বাড়ি করেছিলেন।

অনুযোগ নিরুপমারও। —এত জায়গা থাকতে এসে ঢুকল কিনা এখানে।

অতীশবাবু বোঝাতে পারেন না, যে তখন বস্তিটা ছিল না। ছিল শুধু ফাঁকা জায়গা। তাও তিনদিক থেকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা না থাকলে তো ওদিকের চওড়া রাস্তাটায় চটপট যাওয়া যেত শর্টকাট করে। তিন নম্বর বাড়ির মালিক নিজেই থাকতেন, তখন কি করে জানবেন, ওটা বস্তি হয়ে যাবে।

রাগ অন্তুরও। সে বলেছিল, ফাঁকা জমির কাছে কেউ বাড়ি করে নাকি। আরও তো কত ভাল ভাল পাড়া ছিল।

অতীশবাবু হেসেছিলেন। বলতে পারেননি, সে-সব জায়গায় জমির দাম কত ! আমার নাগালের বাইরে ছিল। জমি কেনা বাড়ি করা যে কি ঝামেলা, কত রকমের, এ-সব তো ওরা জানে না। ভাবছে বাবার অঢেল টাকা ছিল, আর এমনি বেকার বসে থাকত। একটা বাড়ি যে করে ফেলতে পেরেছিলেন সেজন্যেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেন। একদিক থেকে দুশ্চিন্তা নেমে গেছে। তবে হ্যাঁ, বস্তিটা সত্যিই একটা মানসিক যন্ত্রণা। হয়তো শারীরিকও।

আসলে সারা কলকাতাই তো এই। বাইরে থেকে দেখা যায় না। লোকে ভুল করে বলে, আরে, এ তো পশ্ এরিয়া। কলকাতা শহরকেও।

মহীতোষবাবু বললেন, এখন আরেকটা উপদ্রব হয়েছে।

একটু কিন্তু কিন্তু করলেন, তারপর বলে ফেললেন, ইট হ্যাজ বিকাম এ ব্রথেল।

—মানে ? অতীশবাবু চমকে উঠলেন।

পিছন থেকে একজন বললে, একদম কোণের দিকে একটা টালির ছাদ-অলা ঘরে, লোকটা বাঙালি, সেখানে সন্ধের পর বাজে মেয়েদের আনাগোনা। বস্তির লোকগুলোও ভয়ে কিছু বলতে পারছে না, মঙ্গলের সঙ্গে নাকি বাবুদের ছেলেরাও আছে। ওর মদের ব্যবসার অংশীদার।

এ-খবর অতীশবাবু জানতেন না। গা ঘিনঘিন করে উঠল।

সন্ধের পর, একটু রাত হলেই, জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। তিন নম্বরের নীচের তলায় তিন ফুট বারান্দা এগিয়ে আছে। আধখানা ইটের দেয়াল, ওপরটা এক্সপ্যান্ডেড মেটালের জাল দিয়ে ঘেরা। দীনেনবাবু সদাসর্বদা সেখানে উঁচু চেয়ারে বসে আছেন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। দেখলে বড় কষ্ট হয়। হাওয়া চলাচল করবে বলেই বোধহয় জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। এখন দেখলেই মনে হয় খাঁচার মধ্যে একজন পঙ্গু মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে।

তার পরের লাইটপোস্টে কখনও আলো জ্বলে না। বাল্‌ব্ বদলে গেলেও দু'দিন বাদেই আবার অন্ধকার। ইচ্ছে করেই করে।

অতীশবাবুও দেখেছেন রাস্তা জুড়ে নিচু শ্রেণীর মানুষদের জটলা হয়। রাস্তার ওপরই অনেকে উবু হয়ে বসে। অনেকে দাঁড়িয়ে, হাতে শালপাতায় মদের চাট দিয়ে যায় একটা মেয়ে। চোলাই মদের গন্ধে ভুরভুর করে, মদের আর ঘামের গন্ধ।

প্রথম দিকে দু-চারবার কে যেন কমপ্লেন করেছিল। পুলিশ আসে, ঘুষ নেয়, চলে যায়।

মহীতোষবাবু বললেন, আমি থানার ও সি-র সঙ্গে কথা বলে এসেছি। পাড়ায় ব্রথেল শুরু হবে, সহ্য করা যায় ? বলুন।

একটু থেমে আবার বললেন, ও সি বলছেন পাড়ার সকলে মিলে একটা চিঠি দিন, ঠাণ্ডা

করে দেব। বলছেন, এখন তো পলিটিক্যাল নেতাদের যুগ, হাতে কিছু একটা না পেলে করি কি করে।

অতীশবাবু উৎসাহ দিয়ে বললেন, তা করুন না।

সকলের মুখেই হাসি ফুটল। —সে জন্যেই তো আসা। বলে পিটিশনটা বের করলেন। ওটা এতক্ষণ রোল করে রেখেছিলেন হাতে, মেলে ধরলেন।

একজন বললে, শুধু সই করলে হবে না। আপনাকেও যেতে হবে সঙ্গে। আপনাকে দেখলে সকলে সাহস করে সই করবে।

অতীশবাবু বললেন, বেশ তো, যাব। সই করবে না কেন, এ তো সকলের স্বার্থ।

সই করে দিলেন। —চলুন।

বাড়ি বাড়ি গেলেন ওদের সঙ্গে। ছুটির দিন, কাউকে পাওয়া গেল, কাউকে পাওয়া গেল না। বেরিয়ে গেছেন।

অতীশবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, দু-একজন বললে, ভেবে দেখি।

এর মধ্যে আর ভেবে দেখার কি আছে বুঝতে পারলেন না।

মহীতোষবাবু বললেন, থাক্, আজ এই পর্যন্ত। আরেকদিন বেরোলেই হবে।

অতীশবাবু ফিরে এলেন। বেশ একটা ভাল কাজ করেছেন ভেবে মনে তৃপ্তি।

ফিরে এসে নিরুপমাকে বললেন। —জানো, টালির ছাদওলা ওদিকের ঘরগুলো! বস্তিটা ক্রমশ ব্রথেল হয়ে উঠছে।

নিরুপমা বললেন, সে তো জানি।

জানো? তুমি কি করে জানলে?

নিরুপমা হেসে বললেন, কৌশল্যা বলেছে। ও বেচারি তো কাঁদছিল, ওদের নাকি ইজ্জত রইল না। লোকে বলবে, এই বস্তিতে থাকে, তখন ওদের ধরেও টানাটানি করবে।

অতীশবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, উনিই কেবল জানতেন না।

নিরুপমা বললেন, শাশ্বতীও তো দেখেছে, তিনতলা থেকে তো সবই দেখা যায়, আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে। বাজে বাজে মেয়েদের আনাগোনা।

অতীশবাবু বললেন, সেজন্যেই তো মহীতোষবাবু এসেছিলেন। ওই সব মদ বিক্রি, বদমায়েসি সব বন্ধ করতে হবে। আছিস, ভালভাবে থাক না বাবা, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। থানার ও সিকে পিটিশন করা হচ্ছে।

নিরুপমা বললেন, বুড়োবয়েসে তুমি আর ওসব করতে যেও না।

অতীশবাবু হাসলেন। —সই করে দিলাম তো, বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলাম সই করাতে।

নিরুপমা আঁতকে উঠলেন। —তুমি সই করলে। বাড়ি বাড়ি গিয়েছ? তোমার কি কোনওদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না?

অতীশবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এতে দোষের কি। ওসব তো বন্ধ করতে হবে? নাকি পাড়াটাকে নোংরা করবে ওরা এভাবে?

নিরুপমা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, শাশ্বতীকে যাতায়াত করতে হয়। তুমি বুঝতে পারছ না, কৌশল্যা বলছিল মঙ্গলের লোকরা ছুরিছোরা নিয়ে ঘোরে। পাইপগানও আছে…

বললেন, যাদের বাড়িতে কমবয়েসি মেয়েটেয়ে নেই, তারা করুক। ওই মহীতোষবাবু, ওঁর তো দুটো গুণ্ডা গুণ্ডা ছেলে, গাড়িতে যাতায়াত করেন, ওঁর কথা আলাদা।

অতীশবাবুর এতক্ষণে মনে হল, কাজটা বোধহয় ভাল করেননি। একসময়ে খুব দাপটে চাকরি করেছেন, রিভলভারও ছিল।

দীনেনবাবুর ছেলের ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর ছেড়ে দিয়েছেন। তখন তো বন্দুক রিভলভার ছিনিয়ে নেবার যুগ, কখন চুরি হয়ে যায়, কি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়, সেই ভয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। কলকাতায় কোনও দরকার নেই, থাকলেই ঝামেলা, এই ভেবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওঃ, সেসব দিনে কি আতঙ্ক। একবার ভেবেছিলেন, নেমপ্লেট বদলে দেবেন। আই সি এস লেখা আছে। পরে ভাবলেন, তাতে বেশি করে চোখে পড়বে।

অতীশবাবু স্বগতোক্তিতে বললেন, সুধাকান্তবাবু সেজন্যেই হয়তো সই করেননি। বললেন, ভেবে দেখি।

—বলবেই তো। সকলেই তো হুজুগে মাতে না। ওঁর দু-দুটি মেয়ে···ভয় পাবে না?

অতীশবাবুর মনে হল, এ বড় বিচিত্র অবস্থা। দেশে এখন আর নিয়মকানুন বলে কিছু নেই, সকলেই ভয়ে মরে আছে।

নিরুপমা বললেন, ও ঠিক ওদের কানে চলে যাবে দেখো। যা হয়েছে হয়েছে, তুমি আর ওসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। অন্তু শুনলে কি যে বলবে। যা রাগি ছেলে।

অতীশবাবু একটু নার্ভাস বোধ করছিলেন, আবার অক্ষমতার জন্যে রাগও হচ্ছিল।

তা হ'লে কি এদেশে কোথাও কিছু করা যাবে না। যা চলছে তাই চলতে দিতে হবে। ভয় দেখিয়ে সবাই শাসন করবে, যা ইচ্ছে তাই করবে!

সকলেই যদি ভাবে, সে নিজে এগোবে না, অন্যরা তার হয়ে করে দিক, বিপদের ঝুঁকি তারাই নিক, তা হলে তো পড়ে পড়ে মার খেতে হবে।

বস্তির লোকরাই ওদের ভয় পাচ্ছে, এখন ভদ্রলোকরাও যদি ভয় পায়, তা হলে উপায় কি।

হঠাৎ ক্যান্সার কথাটা ওঁর মনে পড়ে গেল। বস্তিটা যেন একটা ম্যালিগনেন্ট টিউমার। বাড়ছে তো বাড়ছেই। থামার নাম নেই। আর তার জ্বালায় পুড়ে মরছে সারা পাড়া, সারা শহর। আইন করে রাতারাতি উচ্ছেদ করতে না পারলে শান্তি নেই।

অতীশবাবু তো ভেবেছিলেন অন্য কথা। সেজন্যেই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। ওইসব চোলাই মদের ব্যবসা, বাজে মেয়ের আনাগোনা বন্ধ করে দিয়ে নিরুপমার ভবিষ্যৎ, অন্তু আর শাশ্বতী আর খুশবুর ভবিষ্যৎ অঙ্কের মত সুন্দর নিটোল করে দিয়ে যাবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন, কারণ ওঁরও আর সময় নেই।

অতীশবাবু বেশি কিছু চাননি, সকলেই যা চায় সেটুকুই। অন্তু ভাল চাকরি করে। আরও উন্নতি হবে। কিন্তু উনি মানমর্যাদার যে আসনটিতে ছিলেন নিশ্চয় তার সমকক্ষ হবে না অন্তু। সেজন্যই এত সব বিলিব্যবস্থা। অন্তত অর্থ দিয়ে তার মর্যাদাটা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চিন্তা নিরুপমার জন্যে। অতীশবাবু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষ দিন অবধি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে রুমাল নেড়ে চলে যাবেন। নিরুপমাও সারা জীবন একটা অহঙ্কার নিয়ে কাটিয়ে এসেছেন, শেষ দিন অবধি সেই অহঙ্কার যেন থাকে। ছেলের ওপর যেন নির্ভর করতে না হয়। কোনও কিছুতেই যেন ছেলের সাহায্য না চায়।

আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব, মনে মনে ভাবলেন।

গোপন কথাটা ওদের একজনকেও বলতে পারছেন না। বলতে চান না। খবরটা কোনওরকমে যদি ওরা জেনে যায় কি যে ঘটে যাবে উনি কল্পনাও করতে পারছেন না। নিমেষের মধ্যে সব মুখগুলি ফ্যাকাসে সাদা হয়ে যাবে। ভেঙে পড়বে একটা গোটা সংসার। তার চেয়ে ওদের কিছু না জানাই ভাল। ওদের হাসি আনন্দ ওদের মুখেই লেগে থাক। সেখানে হতাশা আর দুঃখ এঁকে দিয়ে কি লাভ!

উনি তো দেখেছেন, একজনের জন্যে একটা পরিবার কিভাবে তছনছ হয়ে যায়।

একজনের জন্যে সমস্ত বাড়িটা আলোবাতাস হারিয়ে গুমোট অন্ধকার হয়ে যায়।

দীনেনবাবু। সুধাকান্ত।

সুধাকান্তর চোখে জল দেখেছিলেন। দীনেনবাবুর চোখে জলও ছিল না।

—আমার এত খারাপ লাগে, দীনেনবাবু। মনে হয় আমিই দায়ী। আমিই তো আপনাকে পাঠিয়েছিলাম ডি সি সাউথের কাছে।

দীনেনবাবু শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। যেন ওঁর কথাগুলো বুঝতেই পারছেন না। চোখে জলও ছিল না।

তারপরই তো স্ট্রোক। সেরিব্রাল। যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, দীনেনবাবু একেবারে পঙ্গু। বাঁ দিকটা প্যারালাইজড। ওঁর স্ত্রী, কিংবা মেয়ে তৃপ্তির দিকে তাকাতে পারেননি অতীশবাবু।

এই তো সকালেই পার হয়ে এসেছেন, আন্দাজে বুঝেছেন জালের খাঁচার মধ্যে বসে আছেন, স্থির নিথর, দুটি উদ্ভ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ। তাকাতে সাহস পাননি।

আর সুধাকান্ত ? রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হয়েছে। হয়তো মনে হয়েছিল, দেখে অসুস্থ লেগেছিল, তাই বলে ফেলেছিলেন, আপনার কি অসুখবিসুখ কিছু হয়েছিল ? কেমন যেন লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাকান্ত দুটি অর্থহীন চোখে তাকিয়েছিলেন। —অসুখ ? হ্যাঁ, আমার সাঙ্ঘাতিক অসুখ। দেখছেন না, আমি ভালভাবে হাঁটতেও পারছি না।

ওঁর দু-চোখে জল।

অতীশবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিগ্যেস করেছেন, কি হয়েছে ?

আর সুধাকান্ত কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছেন, আমি শেষ হয়ে গেছি অতীশবাবু। আমরা সবাই।

শুধু একজনের জন্যে।

অতীশবাবু তা হতে দেবেন না। একজনের জন্যে সকলের সুখ কেড়ে নেবেন না।

অথচ নিরুপমাকে বলতে পারলে ভাল হত। ও তো ভাবছে বৃদ্ধবয়েসে স্বামী মৃত্যুর কথা চিন্তা করছে বলেই ও-সব বিষয়আশয় বুঝিয়ে দিতে চাইছে। সেজন্যেই ডাকলে সাড়া দেয় না, কোনও কথা শুনতে চায় না, কাগজপত্তর দেখিয়ে কিছু বোঝাতে চাইলে বুঝতে চায় না।

—তোমার স্যালাইন ওয়াটার, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নিরুপমা বলছেন, ডাক্তার বলেছে বার তিনেক গার্গল করতে হবে।

গলার কাছে কণ্ঠনালীটা চেপে দেখে অতীশবাবু বলেছিলেন। —ও তো সেরে গেছে।

ওঁর ওই গলার ব্যাপারটা নিয়ে নিরুপমার প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ছিল। ভুরু কুঁচকে একবার জিগ্যেসও করেছেন, এতদিন লাগছে কেন, সেরে যাবার তো কথা। তুমি একজন বড় ডাক্তার কাউকে দেখাও।

উৎকণ্ঠা নিরুপমার আর কতটুকু। ওঁর নিজের উৎকণ্ঠা তার সহস্রগুণ। ওঁর সত্যি কেমন ভয়-ভয় করছিল, কিছুদিন থেকেই। খাবার খেতে গেলেই কেমন এক অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি।

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, ওঁর বন্ধুর ছেলে বড় ডাক্তার। বিলেত থেকে ফিরে একবার এসেও ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল, ক্যান্সার হাসপাতালে জয়েন করছে।

খোঁজ করে করে তার কাছেই চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময়, সিঁড়ি ভাঙার সময়,

আতঙ্কে ওঁর পা কাঁপছিল।

অনেকদিন থেকেই উপসর্গটা লেগে আছে। কতদিন তার হিসেবও নেই। স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন, সচেতন হয়েছিলেন, সেও দু-মাস হবে। ভেবেছিলেন, ঠাণ্ডা লেগেছে। আজকাল একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।

পাড়ার ডাক্তারকে দেখালেন। টর্চ নিয়ে গলাটা ভাল করে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, নুনজলে গার্গল করুন। আর—

খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

কিন্তু সারল না। কখনও মনে হয় কম, কখনও মনে হয় আগের মতই।

নিরুপমা একদিন বললেন, তোমার গলার ওটা অনেকদিন হয়ে গেল, না?

সঙ্গে সঙ্গে অতীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সত্যি তো, অনেকদিন হয়ে গেল।

সেদিনই সুবিমলের কথা মনে পড়ে গেল। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন।

সুবিমল ঘরে ছিল না, অন্য কি কাজে ব্যস্ত। ছিপছিপে একটা কমবয়েসি মেয়ে বসেছিল, প্রথমে বুঝতেই পারেননি পেশেন্ট না ডাক্তার। গলায় স্টেথসকোপ ছিল না।

বললে, সারা হাসপাতাল ঘুরছেন, কোথায় আর খুঁজব। আপনি বরং বসুন, এখনই এসে যাবেন।

অতীশবাবু আগেই বলেছেন, আমি পেশেন্ট না, পেশেন্ট না। সুবিমল আমার বন্ধুর ছেলে। একটা কাজে এসেছি।

উনি জানেন, হাসপাতাল যাদের জন্যে তাদের এখানে কোনও ইম্পর্টান্স নেই। পেশেন্ট হলে তুমি ঘুরে বেড়াও, লাইন দাও, বেঞ্চে বসে বসে ঢুলতে শুরু করো। ডাক্তার কোথায়, কখন আসবেন, এসব খবর কেউ তোমাকে দেবে না। আর সকলেরই ইম্পর্টান্স আছে।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর মেয়েটি উঠে গেল। —দেখি, ওঘরে বোধহয় এসেছেন।

সুবিমল এল, চেয়ারে বসার আগে বোধহয় অতীশবাবুকে ভাল করে লক্ষই করেনি। দেখেই বলে উঠল, জ্যাঠামশাই আপনি?

অতীশবাবু হাসলেন, অর্থাৎ হাসার চেষ্টা করলেন। বুক দুরু দুরু। সুবিমল কি বলে বসে কে জানে। যেন সেশন্স জজের কোর্টে একজন খুনি আসামির বিচার হয়ে গেছে, আজই রায় দেবেন। প্রাণদণ্ড, নাকি যাবজ্জীবন।

—সুবিমল, আমার গলায়, বেশ কিছুদিন ধরে, ওষুধপত্তর গার্গল···

মেয়েটি এবার হেসে উঠল। —তবে যে বললেন আপনি পেশেন্ট না?

অতীশবাবু বললেন, পেশেন্ট হলে কি খুঁজে আনতে?

সুবিমলও হেসে উঠল। মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে, ডাক্তার। তবে রিসার্চ করছে। মিস শেফালি দত্ত।

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই অতীশবাবু বলে উঠেছেন, তাই নাকি? স্টেথসকোপ গলায় না থাকলে বুঝব কেমন করে।

সুবিমল এবং শেফালি হাসছিল।

অতীশবাবুকেও হাসতে হল। কিন্তু হাসি আসছিল না। কথা বলছেন, হাসার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে গলায়। সুবিমল কি বলবে। ও যদি একবার বলে দেয় কিছু নয়, তাহলে পৃথিবীতে ওঁর মত সুখী আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওঁর মনে হবে জীবনে এত সুখ কখনও পাননি।

দীনেনবাবু ছুটতে ছুটতে চলে এসেছিলেন ওঁর বাড়িতে। —অতীশবাবু, অতীশবাবু,

মনু, মানে আমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে। বেঁচে ফিরে এসেছে ও। সবই আপনার জন্যে, আপনি ওই চিঠিটা না দিলে…

দীনেনবাবুর মুখে সে কি উজ্জ্বল আনন্দ। তখন তো উনি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। কত সুখ। তখন হাঁটতে পারতেন, দৌড়তে পারতেন। এমন অথর্ব হয়ে পঙ্গু হয়ে জালের আড়ালে উদাস চোখ মেলে বসে থাকতে হত না।

এত রকম অসুখ তো আছে। হার্ট অ্যাটাক। দীনেনবাবুর অবশ্য স্ট্রোক, সেরিব্রাল, সেরে উঠলেন, কিন্তু জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে, মেমারি চিন্তাশক্তি এসব অবশ্য অনেকখানি ফিরে পেয়েছেন। ওরকম একটা অসুখেও পরিবারের সকলকে যন্ত্রণা দেওয়া, এবং নিজে যন্ত্রণা পাওয়া। তবু এই মুহূর্তে অতীশবাবুর মনে হল, সেও ভাল। কিংবা হার্ট অ্যাটাক হয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মারা গেলাম। কি শান্তি।

ক্যান্সার যেন না হয়!

মৃত্যুকে ভয়, না মৃত্যুযন্ত্রণাকে?

সুবিমল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করছিল, উনি উত্তর দিচ্ছিলেন।

তারই ফাঁকে হঠাৎ অসহায়ের মত জিগ্যেস করে বসলেন, আচ্ছা, সুবিমল, ক্যান্সার হলে কি টেরিফিক যন্ত্রণা হবে? কোন প্যেন্‌কিলার নেই? এমন কোনও ঘুমের ওষুধ যে পেশেণ্ট ঘুমিয়েই থাকবে, কষ্ট পাবে না? আচ্ছা, তোমাদের কি এখনও সেই আইনটা হয়নি। সারানোই যখন যাবে না, পেশেন্টকে শান্তিতে তাড়াতাড়ি মরতে দেবে? ধরো, আমি যদি লিখে দিই…

সুবিমল হেসে উঠল। —জ্যাঠামশাই, আপনি এ-সব কি আজেবাজে কথা ভাবছেন। ইনভেস্টিগেশনই হল না, তা ছাড়া আজকাল অনেক কেস সেরে যায়। দিব্যি সুস্থ হয়ে ওঠে। দশ পনেরো বছর বেঁচেও থাকে।

—সুবিমল, স্তোক দিয়ো না, সত্যি কথা বলো।

সুবিমল আবার হাসল। শেফালির দিকে তাকিয়ে বলল, ইট অট টু বি অ্যান ইনস্পিরেশন ফর ইউ। তোমাদের মত যারা রিসার্চ করছে তাদের সকলের।

ধীরে ধীরে বললে, তোমাকে ওঁর পরিচয়টা দিইনি। অতীশ সোম, আই সি এস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন, যখন যেখানে গেছেন এমন এব্‌ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, মন্ত্রীরা ভয় পেত…

তারপর হাসতে হাসতে বললে, অ্যান্ড লুক, এই রোগটা হয়নি, শুধু হতে পারে এই চিন্তা একজন মানুষকে কিভাবে বদলে দেয়।

অতীশবাবু বললেন, শোনো সুবিমল, একটাই কথা। ধরো যদি হয়েই থাকে, ট্রিটমেণ্ট তো করতেই হবে। কিন্তু সেটা গোপনে করা যায় না?

সুবিমল অবাক হয়ে তাকাল অতীশবাবুর দিকে।

অতীশবাবু কেমন একটা ফ্যাসফেসে হাসি হাসলেন। নার্ভাস হয়েছেন। তবু মনের জোর আনার চেষ্টা করে বললেন, সংসারের সকলকে দগ্ধে দগ্ধে মরতে পারব না। আই ওয়ান্ট টু লিভ দিস্ ওয়ার্ল্ড সাইলেন্টলি। কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে, আসব, চিকিৎসা করাব, অন্তত এখন থেকে যেন জানতে না পারে। যখন উপায় থাকবে না… সে তো কয়েক দিন, না কি?

—কি কথা দিচ্ছ তো? সুবিমলের থমথমে মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুবিমল চোখ নামাল। বোধহয় ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না।

টেবিল থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে বার কয়েক ঠুকল। তারপর বললে, আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আগে তো ইনভেস্টিগেশন

হোক্…

তারপরও তো কয়েকবার এসেছেন। কেউ জানতেও পারেনি। নিরুপমা না, শাশ্বতী না, অন্তুও না। একটাই নিশ্চিন্তি, মেয়ে আমেরিকায়।

সেদিনও সুবিমলের এখান থেকেই বের হচ্ছিলেন।

শেফালিও উঠল। বললে, চলুন, আমিও বাড়ি ফিরব।

গল্প করতে করতে হাসপাতালের গ্যেট পার হয়ে ফুটপাথ দিয়ে আসছিলেন, শেফালি হঠাৎ ট্রাম দেখে হাত তুলে বিদায় নিয়ে ছুটে গেল। আর তখনই অতীশবাবু দেখলেন, ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাথে সামনাসামনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অন্তু।

অতীশবাবু কি করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না, সামনে একটা খালি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই ছুটে গিয়ে ধরলেন। আর ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতেই পিছনের কাচ দিয়ে তাকিয়ে হাসপাতালের গ্যেটটা দেখলেন। গোল করে বেশ বড় বড় অক্ষরে 'ক্যান্সার হাসপাতাল' লেখা আছে।

তারপর থেকে অস্বস্তি। অন্তু কি কিছু সন্দেহ করেছে ? নিরুপমাকে কিছু বলেছে ?

গলার ব্যাপারটা অন্তুও জানে। তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। নিরুপমার কথার পিঠে একদিন শুধু রাগতভাবে বলেছিল, তুমি তো নিয়মিত গার্গলি করছ না।

অতীশবাবু হেসে হাল্কাভাবে বলেছিলেন, ও তো সেরেই গেছে, সামান্য একটু…

নিরুপমাও তাই ভেবেছিলেন।

আচ্ছা, অন্তু কি আমাকে হাসপাতালের গ্যেট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে ? না, ফুটপাথে শেফালির পাশাপাশি হাঁটতে দেখেছে ? ফুটপাথে দেখে থাকলে ভয় নেই, উনি যে গল্পটা বানিয়ে রেখেছেন বেশ মানানসই হয়ে যাবে। কিন্তু ও তো কিছু জিগ্যেসই করল না।

অতীশবাবুই সেদিন যেচে বলেছিলেন, অন্তুকে শুনিয়ে শুনিয়েই, চশমার পাওয়ার বাড়াতে হবে। চোখ দেখাতে যেতে হবে একদিন।

নিরুপমা বললেন, কেন, দিব্যি তো বই পড়ছ।

অন্তু বললে, এই তো কিছুদিন আগে চোখ দেখিয়ে এলে।

এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন। বললেন, না রে, দূরের কিছু আজকাল দেখতে পাই না, কেমন ঝাপসা লাগে।

অর্থাৎ সেদিন তোর দিকে তাকিয়েছিলাম ভেবেছিস ? তোকে দেখতেই পাইনি।

আসলে একটাই ইচ্ছে, কেউ কিছু যেন জানতে না পারে। শেষ অবধি তো জানতে পারবেই, এখন থেকে ওদের সব সুখ কেড়ে নিয়ে কি লাভ। ডক্টর, আই ওয়ান্ট টু লিভ দিস ওয়ার্লড সাইলেন্টলি।

হঠাৎ হাসি পেল অতীশবাবুর। সাইলেন্টলি ! ঠিকই তো। বড় ধ্রুব সত্য বলে ফেলেছেন সুবিমলকে। শেষের দিকে বোধহয় কথা বন্ধ হয়ে যায়, তাই না ? লিখে লিখে বোঝাতে হয়। তাই না ? তারপর লেখার শক্তি থাকে ? হয়তো থাকে না।

সেজন্যেই বোধহয় সকলের সঙ্গে এত কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ভাল লাগছে।

এর মধ্যে ওই এক ঝামেলা, বস্তিটা। কে যেন বলেছিল, ক্যান্সার স্পট। এত সুন্দর সুন্দর চারদিকে সব বাড়ি, ভদ্র পরিবেশ, তার মধ্যে একটা টিউমার। ম্যালিগনেন্ট টিউমার। আজ খুনোখুনি, কাল চোলাই মদ, পরশু ব্রথেল। সমস্ত পাড়ার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে।

সত্যি কি তাই ? সুধাকান্তবাবুর কথা মনে পড়ল। দু-চোখে জল নিয়ে বলেছিলেন, আমি শেষ হয়ে গেছি।

লোকটি সত্যি খুব সদাশয় ভালমানুষ। খবর পেয়ে উনিই তো ছুটে গিয়েছিলেন দীনেনবাবুর কাছে। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে থানার ও সি-র কাছে গিয়েছিলেন।

মহীতোষবাবুরা একটু হাসাহাসি করেছিলেন, সুধাকান্ত সই করতে চাননি বলে।

—আমাকে কেন এর মধ্যে টানছেন। পরে বলেছেন, ভেবে দেখি।

অতীশবাবুর নিজেরও ভেবে দেখা উচিত ছিল। নিরুপমা রেগে গিয়ে বলেছেন, তুমি সই করে দিলে ? আর সঙ্গে সঙ্গে অতীশবাবুর মনে হল, ভুল করেছেন।

ওই বস্তিটা তো তোলা যাবে না। লোকগুলোকেও বদলানো যাবে না। ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হবে এই পর্যন্ত।

ওঁর মনের জোরও আজকাল কমে গেছে।

সুধাকান্ত সই না করাতে অতীশবাবুর আত্মসম্মানে লেগেছিল। উনি তো পাড়ার এই সব ব্যাপারে থাকেন না, তবু মহীতোষবাবুর কথায় সায় দিয়ে গিয়েছিলেন। সই না করা মানে ওঁকে অসম্মান করা। হেসে ফেললেন, এখনও আত্মসম্মান !

সুধাকান্তর সঙ্গে দেখা হলে ক্ষমা চাইবেন। মুখের ভাব একটু রাগ-রাগ করেছিলেন বলে।

আসলে সুধাকান্তও তো ক্যান্সারে ভুগছেন ! আরেক ধরনের ক্যান্সার। বুকের মধ্যে তার জ্বালা যন্ত্রণাও কম নয়।

একজনকে তো চোখের সামনে দেখছেন, প্রতিদিন। দীনেনবাবু। উনি আরেক ধরনের।

পাড়ার মধ্যে ওই বস্তিটার মত। সকলেই ভাবছে উচ্ছেদ করে দিতে পারলেই আবার সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্তি। অতীশবাবুও ভাবতেন। কিন্তু এই কাল, এই সময় থেকে পরিত্রাণ পাবেন কি করে।

মহীতোষবাবু বলছিলেন, বস্তির পিছনে ভদ্রলোকরাও আছে। একবার নাকি অমলেশ গোস্বামী, মানে তিন নম্বর, মামলা করে একটা উচ্ছেদের নোটিশ বের করান। পাঁচ নম্বরের পঞ্চাননবাবু ওঁদের হয়ে ইনজাংশন আনালেন। তারপরই সব ভেস্তে গেল।

—পঞ্চাননবাবুর স্বার্থ ? অতীশবাবু জিগ্যেস করেছিলেন।

মহীতোষবাবু হেসেছিলেন। —ওর মধ্যে দু-কাঠা জমি কেনার ইচ্ছে ছিল ওঁর, দেননি, হয়তো সেই রাগে। একটু থেমে বলেছিলেন, বস্তিটা থাকলেই তো ওঁর লাভ, দোতলা তিনতলা চিরকালের জন্যে দক্ষিণ খোলা। বাড়ি উঠে গেলে তখন তো চাপা পড়ে যাবেন।

সে সুবিধে অবশ্য ওঁদের সকলেরই। দোতলাতেও প্রচুর হাওয়া। তেতলায় এমন যে পাখা খুলতেই হয় না। শাশ্বতী অনুযোগ করে, জামা কাপড় জিনিসপত্র রাখা দায়, ঝড়ে উড়ে পড়ে। দুটো পার্সেলেনের ফুলদানি ভেঙেছে। এখন জানালা বন্ধ রাখতে হয়। শুধু এক পাল্লা খুললেই যথেষ্ট।

অসুবিধে শুধু একতলার লোকদের। বস্তির দিকের জানালাগুলো তাদের চিরকালের জন্যে বন্ধ। ঝগড়া-বিবাদ চিৎকার হট্টগোল এ-সব আবার ওদের কানেই বেশি আসে।

শুধু দীনেনবাবুর এখন আর তেমন কোনও আক্ষেপ নেই। অভ্যাস হয়ে গেছে। তা ছাড়া উনি তো মনের জানালাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছেন। চুপচাপ বসে থাকেন বারান্দায়।

বস্তির ছেলেমেয়েরা এক্কা-দোক্কা খেলে, উনি দেখেন। কেমন এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এক একটা ঘর পার হচ্ছে, ঘুঁটি কুড়িয়ে নিচ্ছে শরীর নুইয়ে। সেই এক পায়ে। দীনেনবাবুর একটা পা আছে, কিন্তু ওদের মত লাফিয়ে লাফিয়েও যেতে পারেন না।

ওঁকে নির্ভর করতে হয়, তিপুর ওপর, কখনও স্ত্রী চারুর ওপর। ওরা এসে হাতটা কাঁধে তুলে নেবে, কোমর জড়িয়ে ধরে সাহায্য করবে, তবে এক পা এক পা করে এগোতে পারবেন। এগিয়ে আর যাবেন কোথায়, এগোবার পথ ওঁর অনেকদিন আগেই তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ঘর আর বারান্দা, বারান্দা আর ঘর।

চার

সকাল হতে না হতে সেদিন খবরটা সকলের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল। পাড়ার সকলের কাছেই।

হয়তো অমলেশবাবু, দীনেনবাবুর বাড়িওয়ালা, বাজার যাওয়ার পথে কাউকে বলেছিলেন। না বললেও ঠিকই পৌঁছে যেত। কারণ ওই বস্তির মেয়েগুলো বাড়ি বাড়ি কাজ করতে এসে গল্প করে আতঙ্কের চোখ তুলে বলেছিল।

ভদ্রলোকের বাড়িতে পুলিশ র‍্যেড হয়েছে, একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে এ খবর চাপা থাকবে কি করে। বস্তির কয়েকজন নাকি দেখেছে।

সুধাকান্তবাবুও শুনলেন। ওঁর ছেলে তখনও স্কুলে পড়ে, স্কুলের গণ্ডি পার হতে কয়েক বছর বাকি। তবু উনিও ভয় পেয়ে গেলেন।

কাজের মেয়েটা, নাকি ঠিকে-ঝি, কে ছিল মনে নেই। ওরা তো কয়েকমাস অন্তর অন্তর বদলে যায়। যেই থাকুক খবরটা তার কাছ থেকেই শুনেছিলেন সুধাকান্ত।

ভাবলেন, একবার দীনেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত। ওঁকে ব্যাঙ্কের ব্যাপারে কি একটা সাহায্য করেছিলেন।

ওঁর মেয়ে তিপু বেরিয়ে এল। দীনেনবাবুর স্ত্রীও।

দেখে মনে হল যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে ওদের ওপর দিয়ে। উস্কোসুস্কো চুল, চোখ বসে গেছে, চোখে গভীর আতঙ্ক আর উদ্বেগ।

তিপু বললে, বাবা বেরিয়ে গেছে।

শুনেছেন, তবু সঠিক খবর জানার জন্যে জিগ্যেস করলেন।

তিপু ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল, চেয়ার দিল বসতে। তারপর আতঙ্ক আর কান্না মেশানো গলায় বললে, কি হবে কাকাবাবু!

দীনেনবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকালেন, জল থমকে আছে চোখের আড়ালে। শুধু একটা ভয়ের মুখ। —ওরা নাকি গুলি করে মেরে দেয়!

হাওয়ায় হাওয়ায় তখন ওই এক রটনা। সুধাকান্তও শুনেছেন। সত্যি না মিথ্যে জানেন না। তবু অভয় দেবার জন্যে বললেন, না না, ওসব মিথ্যে। তা ছাড়া, আমার মনে হয় ওকে ভুল করে ধরেছে।

তিপু বলে উঠল, দাদা ওইরকম ছেলেই নয়।

সুধাকান্তর ধারণাও তাই। দুদিন আগেই ওঁর দেখা হয়েছিল মনুর সঙ্গে। মনু আর মনুর এক বন্ধু খেলা নিয়ে তর্ক করছিল। উনিও এক মিনিটের জন্যে যোগ দিয়েছিলেন, হাসাহাসি করেছিলেন।

সুধাকান্ত বললেন, আমি আবার আসব।

তিপু অনুনয়ের স্বরে বললে, আসবেন কাকাবাবু। কেউ তো আসেনি, বাবা তবু একটু সাহস পাবে।

—আসব আসব।

সুধাকান্ত সেদিন সি এল নিয়েছেন। কি একটা কাজে চুঁচড়ো যেতে হবে। অনেকদিন থেকেই যাওয়া হচ্ছে না। তাই ভেবেছিলেন যাওয়ার পথে আবার একবার খোঁজ নিয়ে যাবেন দীনেনবাবু ফিরেছেন কিনা। ফিরে থাকলে দেখা করে যাবেন।

কিন্তু সেদিন আর চুঁচড়ো যাওয়া হয়নি।

গিয়েই দেখা হয়ে গেল দীনেনবাবুর সঙ্গে।

সে-মুখ দেখা যায় না। চুলে চিরুনি পড়েনি, দাড়ি কামাননি, চোখের কোণে কালি, মুখ শুকিয়ে আছে ভয়ে, লোকটার যেন মেরুদণ্ড নেই। চোখে শুধু উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

দীনেনবাবু বোধহয় আবার বেরোচ্ছিলেন।

সুধাকান্তকে দেখে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন। —আমার সঙ্গে একবার যাবেন আপনি! থানার ও সি-র সঙ্গে তখন দেখা হয়নি, এখন আবার যাচ্ছি। বড় ভয় করছে।

দীনেনবাবুকে জিগ্যেস করলেন, কিছু খেয়েছেন ? না, সকাল থেকে শুধু···

সবাই চুপ করে রইল।

বুঝতেই পারলেন রান্না হয়নি। হয়তো উদ্বেগের মধ্যে রান্নার কথা মনেও আসেনি।

তিপু বললে, শুধু একটু মুড়ি খাওয়ালাম জোর করে।

দীনেনবাবু হাসলেন, এখন কি আর মুখে কিছু রুচবে!

সুধাকান্ত প্রশ্ন করে বড় অস্বস্তি বোধ করলেন। ওঁর বাড়িতেও তো এখন সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখন তো আর অপব্যয়ের সংসার নয় কারও, যে ডেকে নিয়ে যাবেন। অথবা খাবার পাঠিয়ে দেবেন। সকালেই কথাটা মনে পড়লে ভাল হত।

আশ্চর্য, এই বাড়ির কেউ আসেনি। না বাড়িওয়ালা অমলেশবাবু, না ভাড়াটেরা কেউ। রাতারাতি দীনেনবাবু যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেছেন। অথচ কেউ মারা গেলে, এখনও তো প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। সাহায্য করে।

দীনেনবাবু আবার বললেন, চলুন ভাই, আমি একা সাহস পাচ্ছি না।

সুধাকান্ত বললেন, চলুন।

থানার ও সি-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।

রাস্তায় যেতে যেতে দীনেনবাবু সব বলতে শুরু করলেন। অতীশবাবুর চিঠি, লালবাজারে যাওয়া। বললেন, ডি সি সাউথ তো ফোন করে দেবেন বলেছেন। করেছেন কিনা কে জানে।

সুধাকান্তর মনে একটা চাপা বিরক্তি ছিল। চুঁচড়ো যাওয়া হল না, তার ওপর একটা সি এল নষ্ট। অথচ উপায় কি। তখনও ভাবছেন তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারলে চুঁচড়ো গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন।

ছোটাছুটি করে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললেন দীনেনবাবু। বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হল না। সুধাকান্তকে ভিড়ের বাসে নিয়ে যেতেও ইচ্ছে হল না। উনি সঙ্গে আসতে রাজি হয়েছেন এটাই অনেক।

থানাটা দুবেলা পার হয়ে যান, কিন্তু কোনওদিন ভাল করে লক্ষ করেননি দীনেনবাবু। থানার ভিতরটাও একটা রহস্য হয়ে আছে।

দুখানা গাড়ি আর একটা বাস থানার সামনের রাস্তা জুড়ে বহুকাল থেকে পড়ে আছে। রোদবৃষ্টিতে জং ধরে সেগুলো ভেঙে একপাশে হেলে পড়ে আছে। জং ধরে ধরে ওগুলো বোধহয় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আপনা থেকেই রাস্তায় মিশে যাবে। বড়জোর রাস্তার কাদায় মাখামাখি হয়ে একটা উঁচু ঢিবি হয়ে থাকবে। অন্ধকারে লোকে হোঁচট খাবে। এটাই রীতি।

তিনচার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঘরটার মধ্যে ঢুকলেন। একটা লম্বা হলঘর, নোংরা দেয়াল। তিনখানা বড় বড় টেবিল পাশাপাশি জোড়া। একটা টানা টেবিলের মত লাগছে। তার দু'পাশে খানকয়েক চেয়ার। এক কোণে পুলিশের লোক, এস আই বোধহয়, ডাইরি লিখছেন। সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসা ভিতু ভিতু দুটি মেয়ে আর একটি বাচ্চা। 'লোয়ার ক্লাস'। ওই বস্তিতে যারা থাকে সেই শ্রেণীর। দু-একজন খাকি পোশাক আসা-যাওয়া করছিল, কেউ ওঁদের দিকে তাকাচ্ছিল না, কিছু জিগ্যেসও করল না।

ও সি-র ঘরটা পাশেই। সুইং ডোর রয়েছে, সেখানে লেখা।

উঁকি দিতে সাহস হল না, ঢুকে যাওয়া তো দূরের কথা।

একটা কনস্টেবল আসতেই বললেন, ও সি-র সঙ্গে দেখা করব।

লোকটা স্লিপ দেখিয়ে দিল।

স্লিপ দেয়ার পর কনস্টেবল বাইরের চেয়ার দেখিয়ে দিল। —বৈঠিয়ে।

কিন্তু স্লিপটা নিয়ে ও সি-র ঘরে ঢুকল না। দীনেনবাবু অসহায় মুখে বসে রইলেন কনস্টেবল-এর কৃপাপ্রার্থী হয়ে। কিন্তু সুধাকান্তর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

এই হলঘর থেকে সামনের দিকে আধো-অন্ধকার একটা করিডর চলে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওপ্রান্তেও কয়েকখানা ঘর আছে। কারণ অনেকগুলি লোকের উচ্চৈঃস্বর আলোচনা চলছিল ওদিকে, তার মধ্যে দুচারটি কথা বা রসিকতা গুরুগম্ভীর স্বরের সঙ্গে ঠিক মিলছিল না। কেমন অমার্জিত আদিরসাত্মক। মাঝে মাঝে দু-একটি অনুচ্চারণযোগ্য অশালীন গালিগালাজ।

সুধাকান্ত এবং দীনেনবাবু দুজনেই এমন ভান করছিলেন যেন ওই কথাগুলো ওঁরা শুনতে পাচ্ছেন না।

কনস্টেবলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন সুধাকান্ত। অর্থাৎ স্লিপটা দিয়ে আসছ না কেন? স্লিপে দীনেনবাবুর নাম লিখে নীচে লিখে দিয়েছেন ফ্রম ডি সি সাউথ। যদি তিনি ফোন করে দিয়ে থাকেন তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে ডাকার কথা।

কনস্টেবল বোধহয় বুঝল।

বললে, উপ্‌রে আছেন, খানা খাচ্ছেন। তারপর সদয় হাসি হেসে আবার বললে, খানা খাবার টাইম এখোন, রাউন্ডসে ফিরলেন।

সেইজন্যেই হয়তো দীনেনবাবু এসে ফিরে গিয়েছিলেন। দেখা হয়নি।

ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ি দাঁড়াল। পুলিশ ভ্যান। একজন এস আই জনতিনেক লোক নিয়ে ঢুকলেন। দীনেনবাবুদের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে তিনি সঙ্গের লোকগুলোকে বসতে বললেন। কিন্তু কোথায় বসবে তারা।

ওঁদের তুলে দেয়ার জন্যেই বোধহয় এস আই ভদ্রলোক সুধাকান্তর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী চাই?

—ও সি-র সঙ্গে দেখা করব!

—তা হলে আপনারা বরং···উনি কনস্টেবলের দিকে না তাকিয়ে হাঁক দিলেন, দরওয়াজা!

কনস্টেবল ছুটে এল।

সুধাকান্ত জানতেন না, থানা-টানায় কখনও তো আসতে হয়নি, এখন জানলেন দরওয়াজা মানে বোধহয় ও সি-র ঘরের দরজায় থাকার ডিউটি যে কনস্টেব্‌লের তাকে দরওয়াজা বলে ডাকে।

বেশ নাম তো। আর এই বাবুরা, খাকি কিংবা সাদা বাবুরা কে এস আই কে এ এস

আই ইত্যাদি তো জানা নেই, এঁদের 'কেদারা' বলে ডাকলে কেমন হয় ? চেয়ারে বসেন যে পুলিশবাবুরা তাদের 'কেদারা' বললে দোষ কি !

উদ্বেগ এবং ভয় দীনেনবাবুর। মুখ চুপসে আছে। কিন্তু সুধাকান্তর আর তেমন উদ্বেগ নেই।

উনি বুঝে গেছেন আজ আর চুঁচড়ো যাওয়া হবে না। সি এল মাটি। তাই ফ্রি হয়ে গেছেন, এবং এই বদ্ধকূপ আবহাওয়ায় অধৈর্য হয়ে বসে থাকতে থাকতে নিজের মনে মনেই রসিকতা করে নিলেন। কেদারা।

কনস্টেবল আধো-অন্ধকার করিডর দিয়ে ওদিকে কোথায় গিয়েছিল।

সে ডাক শুনে ফিরে আসতেই সেই এস আই কিংবা এ এস আই তাকে বললেন, এঁদের ওদিকে কোথাও নিয়ে গিয়ে বসাও।

বলার ভঙ্গিটা প্রায়, যান না মশাই, অন্য কোথাও গিয়ে বসুন।

উনি মোটা একখানা খাতা টেনে নিলেন। বোধহয় ডায়েরির খাতা।

ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতেই দীনেনবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু সুধাকান্তর একটু অসম্মান বোধ হয়েছিল বলে দেরি করে উঠলেন।

কনস্টেবল বললে, আইয়ে। বলে আধো-অন্ধকার করিডরের দিকে এগিয়ে গেল।

দীনেনবাবু আগে আগে চললেন। খানিকটা গিয়েই থেমে পড়লেন।

সুধাকান্তও।

এই দৃশ্য দেখবেন দুজনের কেউই ভাবেননি।

পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে এটুকুই অপমান লেগেছিল। সুধাকান্তরও। কারণ মনু, অর্থাৎ প্রদীপ্ত দীনেনবাবুর ছেলে। একজন ভদ্রলোকের ছেলে। বস্তির কেউ নয়। বস্তির লোকদেরও, এমনকি মেয়েদেরও অ্যারেস্ট করে পুলিশভ্যানে নিয়ে যেতে বহুবার দেখেছেন। চোর ছ্যাঁচোড়কেও। কাউকে হাতকড়া পরিয়ে, কাউকে হাত খোলা অবস্থাতেই। বস্তিতেও যেদিন রোড হয়েছে, দু-একবার পাঁচসাতজন মেয়েপুরুষকে প্রায় গরু ভেড়ার মত ঠেলেঠুলে পুলিশভ্যানে তুলতে দেখেছেন। শুনেছেন ওদের হাজতে রাখা হয়।

কিন্তু এরই নাম নাকি হাজত ?

দেখে দু'জনেই যেন শিউরে উঠলেন।

লোহার গরাদ দেওয়া গারদ-ঘর বাঁদিকে। চার ফুট বাই চার ফুট লোহার খাঁচা। পাশাপাশি দুটো খাঁচা। ওপাশের কোনও জানালা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়ে গারদঘরটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দু'জনেই। একেই কি হাজতবাস বলে নাকি ?

চোখে জল এসে গেল দীনেনবাবুর। আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেছে সুধাকান্তর।

দেখলেন সেই ছোট্ট গারদঘরে জনা পাঁচেক লোক। যেন জড়াজড়ি করে শুয়ে বসে আছে। এত ছোট ঘর, যে ওরা হাত-পা মেলেও মেঝেতে বসতে পারেনি।

ওঁদের যেতে দেখে সব কজনই উৎকণ্ঠিত চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

আর তার মধ্যে ওঁরা মনুকে দেখতে পেলেন। দীনেনবাবুও। আর সব মুখগুলো ওঁদের চোখের সামনে নিমেষে মুছে গেল। শুধু মনুর মুখ, মনুর বেদনার্ত ভয়ার্ত দুটো চোখ।

গরাদ ধরে একটা পা মেলে দিয়ে বসে ছিল মনু। এখন ওঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। যেন বহুকাল পরে, জাহাজডুবি হওয়া কোনও দ্বীপ থেকে প্রথম মানুষ দেখছে। চেনা মানুষ।

মনু কোনও কথা বলল না, দীনেনবাবুও না। উনি শুধু স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এরকম একটা দৃশ্য দেখবেন ভাবতেই পারেননি।

সুধাকান্তও অস্ফুটে বললেন, ব্ল্যাকহোল।

কনস্টেবল বললে, আইয়ে। সামনের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

ওঁরা দু'জনেই এগিয়ে গেলেন।

দীনেনবাবু পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

আর সুধাকান্ত ভাবছিলেন, কবে কোন যুগে ব্ল্যাকহোল ছিল কি ছিল না তা নিয়ে কত তর্ক। তা নাকি বর্বরতা। আর এই আজকের আধুনিক জগতেও মানবিকতা নিয়ে এত বড় বড় কথা, আইনে নাকি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে অবধি আসামি নির্দোষ। সুধাকান্তর মনে হল আমরা কি প্রচণ্ড হিপোক্রেসির মধ্যে বাস করি। উত্তেজিত হলে পুলিশকে দোষ দিই। যেন সব দোষ তাদের। কিন্তু এই গারদ, এই হাজতবাস— এসবকে জিইয়ে রেখেছে কারা ? পুলিশ, না একটা অথর্ব মৃত পচাগলা নিয়ম।

সুধাকান্ত মনে মনে বললেন, প্রদীপ্ত দোষী না নির্দোষ জানি না। ওরা সঠিক পথে চলেছে, নাকি ভুল করছে, তা নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক। এদের মধ্যে নাকি মানবিকতা নেই। কিন্তু এই গারদঘরের নাম কি মানবিকতা ? ওরা তো এই অথর্ব মৃত পচাগলা নিয়মটাকেই ভাঙতে চাইছে। এই প্রাচীন বর্বর প্রথা, এই ব্যবস্থাকে।

একটা বড়সড় ঘর, অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল। একদিকে কয়েকজন পুলিশের লোক জোর তর্ক করছে। কোনও একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। এদিকের চেয়ারগুলো খালি।

তাদেরই একজন বললে, বসুন না ওখানে, উনি আসবেন এখনই।

এঘর থেকে ও সি-র ঘরে যাওয়ার একটা দরজা। খোলা রয়েছে। উনি এলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

দীনেনবাবু ফিসফিস করে সুধাকান্তকে জিগ্যেস করলেন, দেখে কি মনে হল ? বেচারি মনুকে কি খুব মেরেছে ?

সুধাকান্ত হাসবার চেষ্টা করলেন, না না, ওসব কথা ভাবছেন কেন !

দীনেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

সুধাকান্ত কাচের জানালায় নিজের ঝাপসা মুখ দেখতে পেলেন। অস্পষ্ট একটা মুখ।

সে বললে, সুধাকান্ত তুমি শিউরে উঠেছ ওই দৃশ্যটা দেখে, তাই প্রচণ্ড রেগে গেছ।

সুধাকান্ত বললেন, রেগে যাবারই কথা। এভাবে একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে রাখা বর্বরতা।

জানালার কাচ থেকে ঝাপসা লোকটা বললে, ভদ্রলোকের ছেলে বলেই তোমার এত লেগেছে, তাই না ? তোমাদের বস্তি থেকে যখন কাউকে ধরে নিয়ে আসি, তখন তোমার ঠিক এতখানি লাগে ?

—তাদের তো আমি হাজতে দেখিনি কোনওদিন।

—কল্পনায় দেখেছ। লোকের মুখে শুনেছ। কিন্তু কোনও দিন তাদের জন্যে সমবেদনা দেখাওনি। বরং তোমার মনে হয়েছে আমরা ঠিকই করছি।

সুধাকান্ত বললে, চোর গুণ্ডা বদমায়েসদের কথা অন্য।

ঝাপসা প্রতিচ্ছবি হাসল। —বস্তির লোককে দেখলেই তো তুমি অপরাধী ভাব। তখন বল দোষ না করলে পুলিশ ধরবে কেন। একজন অপরাধীকে এভাবে রাখলে তুমি খুশিই হও। বিশেষ করে সে যদি নিচুতলার মানুষ হয়।

সুধাকান্ত প্রতিবাদ করলেন, মিথ্যা কথা। আমরাই আন্দোলন করে জেলখানাকে ভদ্র

করার চেষ্টা করেছি।

—সেটা ওদের ওপর মায়াবশত নয় নিশ্চয়ই। আসলে ভদ্রলোকদেরও মাঝে মাঝে জেলে যেতে হয়েছে, যেতে হয়, সেজন্যেই।

—পলিটিক্যাল প্রিজনারদের কথা বলছ ? তারা তো দেশের জন্যে দশের জন্যে আইন ভাঙে।

—কাকে পলিটিক্যাল প্রিজনার বলবে আর না বলবে সে তো তোমার মর্জির ওপর।

দীনেনবাবু ওঁর গায়ে আলতোভাবে হাত স্পর্শ করাতেই চমকে উঠলেন সুধাকান্ত।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো পা দেখতে পেলেন সুইং ডোরের নীচে। জুতো মচমচ করে কে যেন ঢুকলেন পাশের ঘরে, ওদিকের দরজা দিয়ে। জুতো মচমচ করা হাঁটার ধরনেই মনে হল ইনিই ও সি।

তবু মিনিট পাঁচেক চুপচাপ।

কনস্টেবলটা একসময় এল, ইশারা করে বললে, যাইয়ে।

ওঁরা দুজনে পাশের ঘরে ঢুকলেন। সুধাকান্ত আগে আগে।

—বসুন। গম্ভীর গলায় ও সি বললেন।

তারপর একটা ফাইলে কি সব সইটই করলেন। —দরওয়াজা !

একেবারে বাজখাঁই গলা। 'দরওয়াজা' ডাকটা আগেও শুনেছেন, কিন্তু সেটা এস আই বা এ এস আইয়ের গলা। উনি ডাক দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন ওঁর পদমর্যাদা।

সুধাকান্ত ধীরে ধীরে বললেন, ইনি প্রদীপ্তর বাবা। আজ যাকে ভোর রাতে অ্যারেস্ট করে এনেছে।

—হুঁ শুনেছি। একেবারে ডিসি-র কাছে ছুটেছিলেন ! বেশ পরিহাসের স্বরে বললেন।

দীনেনবাবু কাচুমাচু হয়ে বললেন, না, মানে পরিচিত বলে···

বাজখাঁই গলায় আবার কাকে ডাকলেন। কি একটা ইশারা করলেন তাকে।

এবার দুপাশে দুই কনস্টেবল, একটা বেশ স্বাস্থ্যবান বেঁটেখাটো চেহারার খালি গা ছেলে, বয়েস সতেরো আঠারো, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এল। কোনও বস্তির ছেলেটেলে, একেবারে নিচু শ্রেণীর। ছেলেটা হাঁটতেই পারছে না। গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও সির মুখোমুখি।

সুধাকান্ত আর দীনেনবাবু দুজনেই পিছন ফিরে ওকে দেখলেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বহু কষ্টে এল, দাঁড়াতে পারছে না। পরনে একটা হাফপ্যান্ট, নোংরা। তার নীচে বাঁ হাঁটুটা যেন ভেঙে গেছে, রক্ত ঝরছে।

ও দেয়ালে পিঠ দিয়েছিল, কনস্টেবল গোঁত্তা মেরে বললে, সিধা খাড়া রহো।

ও সি আবার ইশারা করলেন, বোঝা গেল আরও কাউকে আনতে বললেন।

মিনিট দুই পরেই দেখা গেল মনু ঢুকছে।

দীনেনবাবু ভাল করে তার সারা অঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

মনুকেও এনে ছেলেটার পাশে দাঁড় করাল।

এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মনুর চেহারা যেন একেবারে বদলে গেছে। দাড়ি কামায়নি, কদিন কে জানে, দীনেনবাবু গতকালও লক্ষ করেননি। তখন শুধু ওর কান্না দেখেছিলেন। এই ক'ঘণ্টায় চোখ বসে গেছে, দুচোখ লাল। বোধহয় কোন এক আতঙ্কে রাত্তিরে ঘুমোয়নি। ও কি আগেই কোনও খবর পেয়েছিল ? না, তা না হলে বাড়িতে ফিরে আসবে কেন। অন্য কোনও আতঙ্ক নয় তো !

বেশ গম্ভীর গলায় ও সি হঠাৎ মনুকে প্রশ্ন করলেন, তুমি একে চেনো ?

অর্থাৎ ওই হাফপ্যান্ট খালি-গা ছেলেটাকে।

—হ্যাঁ মানে···

ও সি দীনেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলেন ?

ধমকের সুরে মনুকে বললেন, চিনবেই তো। একটা বস্তির বেশ্যার ছেলে, ছিনতাই করে বেড়াত, তাকে না চিনলে বিপ্লব হবে কি করে !

বেশ ব্যঙ্গের স্বরে 'বিপ্লব' কথাটা উচ্চারণ করলেন।

মনু ঝুঁকে পড়ে বলতে গেল, চিনি মানে···

—চোপ্। এমনভাবে ধমক দিলেন ও সি, যেন বজ্রপাত।

মনু চুপ করে গেল।

আর ও সি প্রচণ্ড রাগের স্বরে চিৎকার করে বললেন, ওকে ছেড়ে দেব ? ছেড়ে দিয়ে নিজে গুলি খেয়ে মরব ? কি ভেবেছেন আপনারা ?

দীনেনবাবুর মাথা নুয়ে পড়ল। সুধাকান্ত চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না।

ও সি বললেন, লে যাও।

ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল।

—ও একটা খুন করেছে, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। মানে ওই বেশ্যার ছেলেটা।

ও সি বললেন।

ওঁরা চুপ করে বসে রইলেন, কি বলবেন খুঁজে পেলেন না। ওঁরাও খুব মর্মাহত। মনু ওই ছেলেটাকে চেনে কেন ? 'তা না হলে বিপ্লব হবে কি করে।' ও সির কথাগুলো কানের মধ্যে ঘুরছে।

সুধাকান্তর মনে হল, কিন্তু শুধু চেনাটাই অপরাধ কেন ? অ্যারেস্ট করার সময় ও-ই কি গিয়ে মনুকে চিনিয়ে দিয়েছিল ? না, অন্য কেউ ?

ও সি এবার ধীরে ধীরে বললেন, যদি অ্যাকশন স্কোয়াডে না থাকে, ভয়ের কিছু নেই। ইন্টারোগেশন তো হোক।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন দীনেনবাবু, ডিসি ফোন করে দিয়েছেন যখন, ভেবেছিলেন হয়তো সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

ওঁর মুখে এখন শুধুই হতাশা।

ও সি বললেন, ছেলেমেয়ে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরোনোর পর সে কি করছে জানা যায় না। বাবা-মার কাছে সবাই ভাল ছেলে।

দীনেনবাবু আর সুধাকান্ত নিঃশব্দে উঠে পড়লেন।

ওঁরা বেরিয়ে আসছেন, থানা থেকে চেকশার্ট পরা একটা লোক পিছনে পিছনে এল। ভদ্রলোক।

বললে, আপনি আসবেন, বিকেলে দেখে যাবেন। আমরা তো আছি। যেন ভরসা দেবার গলায় বললেন।

দীনেনবাবু হঠাৎ বললেন, বোধহয় দাঁত মাজেনি, একটা টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট···

সুধাকান্ত জিগ্যেস করলেন, তা হলে সেফটি রেজারও···

কিনে দিয়ে যান না।

কিনে দিয়েছিলেন।

চেক শার্ট নিজেই নিল টুকিটাকি জিনিসগুলো। বলল, নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রদীপ্তর কাছে পৌঁছে দেব।

তারপর যাবার সময় ফিসফিস করে বলল, থানায় কোনও চিন্তা নেই, বরং আই বিতে কেউ চেনাজানা আছে কিনা…

সুধাকান্ত যেন চমকে উঠলেন। —লর্ড সিনহা রোডে? সেখানে কি নিয়ে যাবে নাকি?

সুধাকান্ত দীনেনবাবুর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর দু চোখ ভয়ে সন্ত্রস্ত।

দীনেনবাবু হতাশ গলায় বললেন, সেখানে তো ভীষণ অত্যাচার করে।

চেক শার্ট হেসে উঠল। — না না। তা ছাড়া আমিও দেখব, যদি কাউকে…

তারপর কথা শেষ না করেই বললে, কাল একবার আসবেন। এখানেই পাবেন আমাকে।

সুধাকান্তর এখন সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে। দীনেনবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যখনই আসেন চেষ্টা করেন ওদিকে না তাকিয়ে চলে আসার। কোনও কোনওদিন চোখ পড়ে যায়। চোখোচোখি হয়ে গেলে দু-একটা কথাও বলেন, কিংবা শুধু ঘাড় নেড়ে 'ভাল?' এই ধরনের একটা ইঙ্গিত করে দ্রুত পার হয়ে আসেন। অন্যদের মত শুধু ওঁকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে হয়তো নয়। ওই দৃশ্যটাই হয়তো সহ্য করতে পারেন না। এক্সপ্যান্ডেড মেটালের জালে আবদ্ধ পঙ্গু অথর্ব একটা মানুষ মূক অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এ দৃশ্য কার ভাল লাগে!

কিন্তু এখন আর অন্যের প্রতি সমবেদনা জানানোর মত মনের অবস্থা নেই সুধাকান্তর। এখন ওঁর নিজেকেই মনে হচ্ছে জীবন্মৃত।

একই মানুষ কত বদলে গেছেন। সামান্য একটা ঘটনায়।

অথচ সেদিন চুঁচড়ো যাওয়া হয়নি বলে কোনও দুঃখ ছিল না। দীনেনবাবুর সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন, সঙ্গ দিয়েছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পরিবারের সকলকে সান্ত্বনা। ওঁর নিজের মনেও কি উদ্বেগ। ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। প্রদীপ্তকে। কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ভেবেছেন। পাড়ার এক উকিলের কাছে গেছেন, জামিনে খালাস করে আনা যায় কিনা। বৃথা, বৃথা।

তখন একটাই ভরসা। 'অ্যাকশন স্কোয়াডে যদি না থাকে ভয়ের কিছু নেই।' ওই একটাই শেষ আশা। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও সি বলেছিলেন, ইন্টারোগেশন তো হোক। চেক শার্ট আরও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, আই-বি-তে কেউ…

তার মানে কি লর্ড সিনহা রোড?

সঙ্গে সঙ্গে বস্তির সেই ছেলেটা, হাঁটু থেকে রক্ত ঝরছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়াল। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এরই নাম কি ইন্টারোগেশন? না, তার চেয়েও অনেক অকথ্য অত্যাচারের কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

তবু সান্ত্বনা দেবার জন্যে সুধাকান্ত বলেছিলেন, না না ওকে যখন ধরতে গিয়েছিল, হয়তো পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে নিজেই পা ভেঙেছে।…

তার পরের খবর সুধাকান্ত স্পষ্ট করে জানেন না। শুধু দেখতে পেতেন দীনেনবাবু কখনও-সখনও ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিংবা ক্লান্ত পা টেনে টেনে বাড়ি ফিরছেন। যাওয়া আসার পথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতেন, দীনেনবাবু টুকিটাকি খবর দিতেন, তাও কিছুটা অস্পষ্ট।

পাড়ার সকলেই তো তখন জেনে গেছে। দীনেনবাবুর বাড়িটাকে তখন সকলেই কেমন আতঙ্কের চোখে দেখে। অর্থাৎ প্রদীপ্তকে। কেউ বা সমবেদনার কণ্ঠে বলে, মনু ওরকম ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র, শেষে সে কিনা ওই রকম একটা পার্টিতে গিয়ে…

মহীতোষবাবু একদিন সুধাকান্তকে বললেন, শুনলাম আপনিও নাকি দীনেনবাবুর সঙ্গে

অনেক ছোটাছুটি করেছেন, ওঁর ছেলেকে ছাড়াবার জন্যে…

সুধাকান্ত ভয় পেয়ে বললেন, না না, ওই একটা দিন শুধু…আমি তো জানতাম না, ভেবেছিলাম ভুল করে ধরে নিয়ে গেছে…

মহীতোষবাবু হাসলেন। —পুলিশ ভুল করে না মশাই। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বেশি মাখামাখি করবেন না। পুলিশ ভাবতে পারে আপনার ছেলেও এর মধ্যে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাকান্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ও তো ছোট, এ বছরই ফাইনাল দেবে।

মহীতোষবাবু বললেন, ওরা তো বাচ্চা থেকেই ধরে। সব পলিটিক্যাল পার্টি মশাই ছেলেধরা। যতক্ষণ বোকাসোকা থাকে ততক্ষণই তো ধরা সুবিধে। কাণ্ডজ্ঞান হয়ে গেলে তো আর কোনও ছেলে কাণ্ডজ্ঞান হারাবে না।

হেসে বলেছিলেন, আমার ছেলে দুটোকে ওসব পথে যেতেই দিইনি, বেশি লেখাপড়া চাই না বাবা, ব্যবসায় বসে যাও…

সুধাকান্তর কাছে কথাগুলো ভাল লাগছিল না। যুক্তিহীন মনে হচ্ছিল। পুলিশ ভুল করে না, অথচ পুলিশ ভাবতে পারে আপনার ছেলেও এর মধ্যে আছে।

কিন্তু সুধাকান্তর মনে হয়েছিল, সত্যি সাবধান থাকা উচিত।

অতীশবাবু একদিন বললেন, এবং ওঁর কথাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হল।

বললেন, মহীতোষবাবুর কাছে সব শুনেছি। ইউ হ্যাভ ডান এনাফ, ওসব থেকে এবার নিজেকে সরিয়ে ফেলুন।

একটু থেমে বললেন, এই পার্টিটাকে বুঝলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ওদের রিজনিং আমাদের আয়ত্তের বাইরে। আপনি ছেলেটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, ওদের কাছে হয়তো সেটাই অমার্জনীয় অপরাধ।

সুধাকান্ত বললেন, ওসব তো আমি কিছুই করিনি, আমি শুধু একদিন সঙ্গে গিয়েছিলাম। একজন অসহায় মানুষ, কিছুই জানতেন না, একেবারে ভেঙে পড়েছেন, সঙ্গে যেতে বললেন,…আমরা তো আফটার অল মানুষ। হিউম্যান কনসিডারেশন না থাকলে…

অতীশবাবু হাসলেন। —এ এক বড় তত্ত্বকথা। রবীন্দ্রনাথ একরকম বুঝেছিলেন, গান্ধী একরকম, আর সেকালের টেররিস্টরা আরেকরকম। একদল ভাবে কিছু মানুষ মানুষই নয়, বাকি সবাই মানুষ। আরেকদল ভাবে ইনডিভিজুয়েল নিয়ে তবেই তো সব মানুষ। ওসব আমি বুঝিও না। আপনি গিয়েছিলেন, দোষ করেননি। ইউ হ্যাভ ডান ইওর ডিউটি। আমিও তো একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, দ্যাটস অল।

সুধাকান্ত এভাবে ভেবে দেখেননি। উনি গিয়েছিলেন, সমবেদনা থেকে। দীনেনবাবুর জন্যে ওঁর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল, মনুর জন্যে। কর্তব্যের কথা তো ভাবেননি। হৃদয় বাদ দিয়ে কি কর্তব্য হয়? কে জানে। অতীশবাবুর কাছে কর্তব্যই বড়, হৃদয়ের কোনও স্থান বোধহয় নেই। একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে সারাজীবন কাজ করে করে ডিউটি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না হয়তো।

তবু অতীশবাবুর কথায় সুধাকান্ত নিজেকে সরিয়ে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সাবধান হয়ে গেলেন। ছেলে বড় হচ্ছে, যা দিনকাল কিচ্ছু বলা যায় না।

স্ত্রীকে একদিন বলেই ফেললেন, দিব্যর দিকে একটু চোখ রেখো, ওই সব পলিটিক্স-ফলিটিক্স যেন মাথায় না ঢোকে।

তারপর স্বগতোক্তির সুরে ও সির কাছে শোনা কথাটা বললেন, ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে গেলে ছেলেমেয়েরা কে যে কোথায় কি করছে কিছু জানার উপায় নেই।

স্ত্রী হেসে ফেলেছিল। —তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? দিব্য তো এখন বাচ্চা।

সুধাকান্তর নিজেরও তাই মনে হয়। তবু বলেছিলেন, ওটাই তো আমাদের সর্বনাশ করে। ওদের আমরা যত ছোট ভাবি, ওরা হয়তো সত্যি তত ছোট নয়।

সংসারকে সুধাকান্ত কোনওদিনই সেভাবে লক্ষ করেননি। করতে শুরু করলেন। এমন কি একটু কড়াকড়িও শুরু হয়ে গেল। —এত দেরি করে ফিরছিস কেন? রাত হয়নি?

কিন্তু কতদিন আর তা সম্ভব। তা ছাড়া স্ত্রী অসীমা রাগারাগি করত। ছেলে বড় হচ্ছে না? সে কি দিনরাত বাড়িতে বসে থাকবে নাকি।

শেষ অবধি সুধাকান্ত ঢিলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিংবা ভুলেই গিয়েছিলেন। আসলে আতঙ্ক তো ছিল যখন দীনেনবাবুর ছেলে মনুকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তারপর কত কি ঘটে গেল, সবই স্মৃতি থেকে মুছে গেছে একে একে। এখন সবই কেমন ভাসা ভাসা মনে পড়ে।

দুবেলা যাতায়াতের পথে দীনেনবাবুর দিকে চোখ পড়লে শুধু বুঝতে পারেন বাঁদিক পক্ষাঘাতে পড়ে যাওয়া একটা মানুষ জালের ওধারে বসে আছে, তাকিয়ে আছে, আর আশা করছে কেউ একজন এসে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলবে।

ইতিমধ্যে কয়েকটা বছর কেটে গেছে। দিব্য এখন কলেজে পড়ে। দিব্যকে নিয়ে সুধাকান্তর বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। দুশ্চিন্তা বড় মেয়ে অরুণাকে নিয়ে।

অরুণাই বড়, তারপর দিব্য। তারও পর একটি মেয়ে এসেছিল, অরুণার সঙ্গে মিল রেখে নাম রেখেছিলেন করুণা।

কলেজে ঢোকার পর থেকেই অরুণার বিয়ের চেষ্টা করে আসছিলেন। প্রথম দিকে একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে। আত্মীয়স্বজনরা দু-একটা পাত্রের সন্ধান দিয়েছে, সুধাকান্তর তেমন পছন্দ হয়নি।

অসীমাকে বলেছেন, এত তাড়া কিসের। বি এ পাশ করার আগে আজকাল কেউ মেয়ের বিয়ের কথা ভাবে নাকি।

অসীমা বলেছে, ভাবে ঠিকই, জোটে না বলেই বি এ পাশ করে যায়।

অসীমা একটু প্রাচীনপন্থী। সেজন্যেই তার কাছে মনের গোপন ইচ্ছেটা কোনওদিন প্রকাশ করেননি সুধাকান্ত।

উনি ভিতরে ভিতরে আশা করেছিলেন অরুণা নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করে ফেলবে। আজকাল তো অনেকেই করছে। নেহাত অবাঞ্ছিত না হলে অরুণার পছন্দ করা পাত্রকে সুধাকান্তর অপছন্দ হবে না।

কিন্তু দেখলেন অরুণা আদৌ সে-সব দিকে গেল না।

ওর এক মাসি একদিন এসে ঠাট্টা করে বলেছিল, কি রে অরুণা, কাউকে ঠিক করে রেখেছিস নাকি, বল। তা হলে বলে বাবা-মার মত করিয়ে দেব।

বলেছিল অবশ্য সুধাকান্তর সামনেই।

কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল অরুণা। বললে, দ্যাখো মাসি, ওসব ভাব-ভালবাসার বিয়ে আমার দ্বারা হবে না। আমি ওসবে বিশ্বাসও করি না। আমার ভাল বাবা-মার চেয়ে কি আমি বেশি বুঝব?

—সে কি রে? একালের মেয়ে হয়ে তুই···

ওর মাসি অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সুধাকান্ত একদিকে খুশি হয়েছিলেন, অন্যদিকে চিন্তিত। একটা আশঙ্কা ছিল অরুণা শেষ অবধি না একটু ভুল করে বসে। এমন তো হামেশাই হচ্ছে। সেই ভয়টা সরে গেল ঠিকই, কিন্তু দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল।

অরুণার বিয়ের জন্যে প্রথম প্রথম উঠে পড়ে লাগেননি। ও বি এ পাশ করে যাওয়ার পর নিরুপায় হয়েই উঠে পড়ে লাগতে হয়েছিল। চেষ্টারও ত্রুটি করেননি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কয়েকবার। কোনও ফল হয়নি।

এম এ পাশ করে আর বসে থাকা যায় না। শেষে অনেক ধরাধরি করে একটা ছোট স্কুলে চাকরি হয়ে গেল অরুণার।

এর মধ্যে একটা জায়গায় বিয়ে প্রায় পাকাপাকি, হঠাৎ ভেঙে গেল।

তার পর থেকে সুধাকান্তও যেন ভেঙে পড়েছিলেন। রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। ঘুম আসত না। সে এক অসহ্য কষ্ট।

মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, বছরের পর বছর। তা হলে কি অরুণার বিয়ে দিতে পারবেন না?

অসীমার অনুযোগ ছিল আরও দুর্বিষহ। সময় থাকতে তুমিই তো চেষ্টা করোনি, সব পাত্রই তখন তোমার অপছন্দ।

সুধাকান্ত ভিতরে ভিতরে রেগে যেতেন। কারণ, সুধাকান্তর যেখানে মনে হয়েছে পাত্র চলনসই, তেমন দু-তিন ক্ষেত্রে অসীমাই নাকচ করে দিয়েছে। কিন্তু সে-সব কথা যখন অসীমা বেবাক ভুলে গেছে, মনে পড়িয়ে কি লাভ।

কিন্তু ক্রমশ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলেন সুধাকান্ত, যে মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। যেন সবকিছুর জন্যে উনিই দায়ী। ওঁরই অক্ষমতা। নিজেকে অপরাধী মনে হত।

অসীমা মাঝে মাঝে দু-একটা বিয়ের খবর জানাত, জানাবার সময় একেবারে ম্লান মুখ। কথার সঙ্গে যেন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত। মোড়ের বাড়িটার ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধছে। দত্তবাবুদের ছোট মেয়ের বিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে হত যেন অসীমা খোঁচা দিয়ে বলছে, অরুণার বিয়ে দিতে পারছ না। তুমি অক্ষম।

অরুণার বড়পিসি একদিন এসে বলেছিল, পাত্রের আবার অভাব, টাকা খরচ করলে পাত্র ঠিকই পাওয়া যায়।

সুধাকান্ত বিষণ্ণ হেসে বলেছে, টাকাই যে নেই।

অরুণার বড়পিসি কেমন বাঁকা ভাবে বলেছে, থাকবে কি করে? আজকাল তো মেয়ের বাবারা মেয়ের বিয়ের কথা ভাবে না, টাকা খরচ করে বাড়ি বানায়।

যেন সেটা খুব অন্যায়। সুধাকান্তর বাড়িটা ছোটখাটো, কোনওরকমে মাথা গোঁজার একটা আশ্রয়। করে ফেলেছিল, তাই রয়েছে। সেটাও যেন অপরাধ।

এরই মধ্যে অরুণার এক বন্ধু এল, নিমন্ত্রণের চিঠি হাতে নিয়ে। মেয়েটি অরুণার সঙ্গেই পড়ত।

তাকে আগেও দেখেছেন সুধাকান্ত। কিন্তু বিয়ের চিঠি হাতে মেয়েটিকে খুবই উচ্ছল আর হাসিখুশি লাগল। যেন কানায়-কানায় আনন্দ উপচে পড়ছে।

এত আনন্দ সুধাকান্তর ভাল লাগছিল না। কারণ, অরুণার বিষণ্ণ মুখখানা তখন ওঁর চোখে পড়ে গেছে।

অরুণা হেসে বোঝাতে চাইছিল বন্ধুর বিয়ের খবরে ও রীতিমত খুশি হয়েছে। কিন্তু

সুধাকান্ত বোধহয় তার আড়ালে ঈর্ষা দেখতে পেলেন।

উনি নিজেও কি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। অখুশি হয়েছিলেন? কে জানে।

অসীমা এখন পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই অরুণার জন্যে পাত্র খুঁজে দিতে বলে। যেন সারা পৃথিবী ওর উপকার করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

মেয়েটি বললে, অরুণাকে নিয়ে আপনিও যাবেন মাসিমা।

আর অসীমা হেসে হেসে বললে, বেশ তো, যাব। কিন্তু বন্ধুরও বিয়ের ব্যবস্থা কিছু করে দাও।

মেয়েটি হাসল। বললে, বলছি তো ওকে, বরের বন্ধুরা তো সব আসবে, একজন কাউকে পাকড়াও করবি।

অসীমা হেসে উঠল। কিন্তু সুধাকান্ত হাসতে পারলেন না। কেমন ছোট লাগল। যেন অরুণাকেও ছোট করে দিচ্ছে।

সুধাকান্তর সত্যি বড় আশ্চর্য লাগত। দেশটা এত বদলে যাচ্ছে, মানুষ এত বদলে গেল, কিন্তু সমাজ এতটুকু বদলায়নি। একটা মেয়ের বিয়ে— সেটাই এখনও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। মেয়েদের লেখাপড়া, চাকরি, এসবই যেন যাত্রা-শুরুর ওয়েটিং রুম।

সুধাকান্তর বুকের মধ্যেও একটা জ্বালা ছিল। ঘুমোতে পারতেন না, কখনও অকারণ ঘুম ভেঙে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে অরুণার বিয়ের কথা মনে পড়ে যেত।

সকলেই বলত বস্তিটা এ-পাড়ার সুখ নষ্ট করে দিয়েছে। সুধাকান্ত নিজেও তাই ভাবতেন। আবার তখনই মনে হত সব সংসারের মধ্যেই হয়তো একটা ছোট্ট বস্তি আছে। যা সব সুখ নষ্ট করে দেয়।

—বস্তি, বস্তি, আমাদের বাড়িটাও বস্তি হয়ে গেছে। অসীমা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেছিল। কিন্তু ওর তখন চোখে জল।

সুধাকান্তও ধসে পড়েছিলেন। দিব্যর জন্যে উনি যে এ-ভাবে ভেঙে পড়বেন কোনওদিন কল্পনাও করেননি।

কি বলবেন অতীশবাবুকে, ওঁর চোখের আড়ালে তখন থমথমে কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না।

সেই সময়েই এলেন অতীশবাবুরা। পাড়ার অনেকে। অতীশবাবু, মহীতোষবাবু, আরও কে কে।

এসে বললেন, পাড়ার সকলে মিলে একটা চিঠি দিচ্ছি থানার ও সি-কে। সই করে দিন, আমরাও করেছি।

বোবা চোখ মেলে সুধাকান্ত তাকালেন ওদের মুখের দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

মহীতোষবাবু বললেন, দিনে দিনে বস্তিটা কি হয়ে পড়ছে দেখছেন। চোলাই মদ বিক্রি, ওপাশে তো রীতিমত একটা ব্রথেল চলছে। বস্তির অন্য সব লোকরা, মেয়েগুলো ভয়ে তটস্থ। ওই মঙ্গল গুণ্ডাটার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে সাহসও পায় না।

অতীশবাবু বললেন, গলির মোড়ে রাস্তাটায় যত মদোমাতালের ভিড় সন্ধে থেকে, মেয়েরা যেতে আসতে পারে না। আমাদেরও ভয় করে।

সুধাকান্ত তাকিয়ে রইলেন, যেন কথাগুলো ভিতর পর্যন্ত পৌঁছল না।

শুধু অসহায় ভাবে বললেন, আমাকে আর এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছেন।

অতীশবাবু আহত হলেন। ওঁর সম্মানে লাগল। এ-পাড়ায় ওঁর একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। সকলেই সমীহ করে আসছে।

অবসর নিয়েছেন ঠিকই, বয়েসও হয়েছে, সকলের চেয়ে বয়েসে বড় উনি, তা ছাড়া ওঁর লোহার ফটকের পাশে নেম-প্লেটে এখনও লেখা আছে অতীশ সোম আই সি এস।

অতীশবাবু বললেন, থাক্ মহীতোষবাবু, উনি যখন করতে চাইছেন না...

ওঁরা চলে গেলেন।

সুধাকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁদের চলে যাওয়া দেখলেন। প্রকাশ করে বলতে পারলেন না ওঁর বুকের মধ্যে কি চলছে।

বড় মেয়ে অরুণা এসে বললে, বাবা, তুমি সই করলে না?

অসীমা বললে, ঠিকই করেছে, কোন মুখে আমরা সই করব? মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করে বলে? সে তো তবু ভাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অসীমার।

অরুণা চুপ করে রইল। তারপর বললে, কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে। যাওয়া-আসার রাস্তাটাও থাকবে না!

ম্লান হাসলেন সুধাকান্ত। —সই করতেও ভয় হয়, কি জানি কখন কি করে বসে।

আসলে এত সব চিন্তা করে উনি বলেননি যে সই করব না। দিব্যর জন্যে দুশ্চিন্তায় ওঁর এখন আর কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

অথচ গতকালই কি উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন অরুণার ফিরতে দেরি হচ্ছিল বলে।

গলির মোড়ের আলোটা তো কোনও দিনই জ্বলে না। মঙ্গলের দলই অন্ধকার করে রাখে।

সন্ধে হতে না হতে মানুষজনের জটলা শুরু হয়ে যায়। সারা রাস্তা জুড়ে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে মদ খায়। কেউ রিকশা টানে, কেউ বাজারে মাছ কিংবা সব্জি বেচে। আর জনকয়েক লোক সদা-সতর্ক, পুলিশের গাড়ি দেখলেই রাস্তা সাফ হয়ে যায়। কিন্তু সে তো কদাচিৎ।

অরুণা গিয়েছিল ছোটবোন করুণাকে নিয়ে, কেনাকাটা করতে। এমন কিছু রাত হয়নি, আটটা কি সাড়ে আটটা।

দূর থেকেই দেখলে বস্তির সামনে লোকজনের জটলা। আর তখন দপ্ করে লোডশেডিং হল।

করুণা বলে উঠল, দিদি, কি করে যাবি রে।

অরুণা ইতস্তত করল, তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়ানো একটা রিকশাওয়ালাকে ডেকে উঠে বসল। শুধু এই বস্তির মুখটুকু পার হবার জন্যে।

রিকশাতে বসেও অরুণার ভয়-ভয় করছিল। এমনিতেই তো অনেক সময় কানে আঙুল দিয়ে পার হতে হয়; এমন অশ্রাব্য গালাগালি করে নিজেদের মধ্যে। না শোনার ভান করে পার হতে হয়।

ঠুং ঠুং করে রিকশা এগিয়ে যাচ্ছিল।

অন্ধকারেও ওদের দেখে কেউ বোধহয় চিনতে পারল। বস্তিরই কেউ।

চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল, হট্ যাও, হট্ যাও।

একজন কে পরিষ্কার বাংলায় বললে, মেয়েদের যেতে রাস্তা দে রে!

যতটা পারল ওরা সরে গিয়ে রিকশার জন্যে রাস্তা করে দিল।

বাড়ির সামনে এসে রিকশা থেকে নেমে পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে, দেখল পাড়ার দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

পাড়ার উঠতি বয়েসের ছেলে, ওরা এক নজর অরুণা আর করুণাকে দেখে নিয়ে আবার গল্প শুরু করল।

করুণা ওদের পছন্দ করে না, তাই এক ছুটে বাড়ি ঢুকে গেল।

কিন্তু অরুণা তখনও রাগে ফুঁসছে! নিজের বাড়িতে ঢোকার জন্যে অকারণ রিকশা করতে হয়েছে বলেই ওর আরও রাগ।

অরুণা ওদের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললে, জীবন, তোমরা একটা কিছু করো, এভাবে তো পারা যায় না।

অরুণা ওদের দিকে এগিয়ে যেতে ওরা প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল।

বললে, কেন, কি হয়েছে অরুণাদি ?

অরুণা রাগের স্বরেই বললে, দিনের বেলায় তবু নোংরা ডিঙিয়ে আসা যায়, বস্তির সামনেটা একবার দেখে এসো।

জীবন বললে, কি করবেন বলুন, আজ তো শুনলাম ওদের জন্যে টিউবওয়েল হবে, সেপটিক ল্যাট্রিন হবে।

তারপর হেসে বললে, দুশো লোকের জন্যে দুটো সেপটিক ল্যাট্রিন।

সঙ্গের ছেলেটি বললে, কেন, সামনের রাস্তাটাই তো ওদের সেপটিক ল্যাট্রিন।

দুজনেই হাসল।

জীবন বললে, ওদের জোর বেশি, তা জানেন। আমাদের এতগুলো বাড়ি মিলে একশো ভোট, ওদের একটা বস্তিতেই দুশো।

অরুণা বুঝল ওদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। চলে এল।

সুধাকান্ত আর অসীমা অনেকক্ষণ থেকে ঘর আর বারান্দা করছিলেন।

নীচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন। দোতলার পিছনের বারান্দা থেকে সারা বস্তিটা দেখা যায়। অমলেশ গোস্বামীর বাড়ির পিছনের এই বস্তিটার তিন দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপাশে একটা বেশ চওড়া রাস্তা গেছে। কিন্তু ওদিকে যাতায়াতের পথ নেই।

অরুণা ফিরেই রাগত স্বরে বললে, সিনেমা যাওয়া বন্ধ করেছি, টুইশনি করা বন্ধ করেছি, এখন মাসে দু-একদিন কেনাকাটা করতে যাই তাও বন্ধ করতে হবে।

করুণা বললে, এমন জায়গাতেই বাবা বাড়ি করেছে, ঘরে বন্দি হয়ে থাকো।

এই একটা অনুযোগ বহুকাল থেকে শুনে আসছেন সুধাকান্ত।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ এলে খুশি হয়ে বলে, আরে এ তো পশ এরিয়া। কেউ বলে, ছোট হোক, কিন্তু দারুণ বাড়ি করেছেন। কেউ বা বলে, বাড়ি তো একটা করে ফেলেছেন, আর কি!

কিন্তু স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের অনুযোগ শুনতে হয়েছে প্রথম থেকেই। ঘরগুলো ছোট, এদিকে একটা বারান্দা করতে হত, শীতকালে পুবের রোদ্দুর আসে না···

তারপর নতুন অস্বস্তি, এই বস্তি।

কিন্তু সুধাকান্ত বা অসীমার কানে করুণার অনুযোগ পৌঁছল না। ওদের জন্যে একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন, ফিরে এসেছে, এখন নিশ্চিন্ত।

সুধাকান্ত ধীরে ধীরে বললেন, অরুণা, দিব্য আবার কখন বেরিয়ে গেছে। আমরা লক্ষই করিনি।

অরুণা চমকে উঠল। —যেতে দিলে ?

—যেতে কি দিয়েছি, ও কখন বেরিয়ে গেছে।

অরুণা ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, ও মরবে, ও মরবে!

বিপদ কোন দিক থেকে আসে কেউ জানে না। সুধাকান্তও জানতেন না।

প্রথম প্রথম উনি সাবধান ছিলেন, দিব্যর দিকে দৃষ্টি রাখতেন। তারপর ভয় কেটে

গিয়েছিল। কিংবা দিব্যকে বিশ্বাস করেছিলেন।

ভাবতে ভাল লেগেছিল দিব্য মনুর মত নয়।

রাজনীতির ওপর দিব্যর আস্থা ছিল না। খুনোখুনির রাজনীতির ওপর তো নয়ই। কিন্তু সুধাকান্ত বুঝতে পারেননি, শুধু রাজনীতি নয়, কোনও কিছুর ওপরই আস্থা ছিল না ওর।

অরুণার বিয়ে— সেটাই ছিল প্রধান দুর্ভাবনা। ওঁর সমস্ত মন জুড়ে তখন শুধু অরুণা। অসীমারও। ওঁরা কেউই দিব্যর দিকে তাকিয়ে দেখেননি।

যেটুকু খবরদারি করত সে শুধু অরুণা। ভালও বাসত। শাসনও করত।

সুধাকান্ত জানতেন না, মাঝে-মাঝেই ওর কাছ থেকে টাকা চাইত দিব্য। প্রথম-প্রথম দিত ও।

হঠাৎ একদিন বলে বসল, এত টাকা তোর কিসে লাগে রে।

—কিসে লাগে তোর কাছে কি জবাবদিহি করতে হবে? দিবি তো দে, নইলে কেটে পড়। বলে একটা তুড়ি মারল।

সুধাকান্ত আর অসীমা বারান্দায় বসেছিলেন। ওখান থেকেই শুনতে পেলেন, দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সুধাকান্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আর অসীমা ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, প্রায় ছুটে গেল দিব্যর কাছে।

রেগে গিয়ে বললে, তুই তো বস্তির লোকেরও অধম হয়ে গেছিস। বড় দিদির সঙ্গে তুই এইভাবে কথা বলিস?

দিব্য তবু বেপরোয়া ভাবে বললে, আবার কিভাবে কথা বলতে হবে? পায়ে ধরে? ফুঃ। একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেল দিব্য।

অসীমা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, হ্যাঁ রে, এইভাবে ও কথা বলে!

অরুণা বিষণ্ণ হাসি হাসল। বললে, ও কেমন যেন বদলে যাচ্ছে মা।

সুধাকান্ত সেদিন কোনও কথাই বলতে পারেননি। ওঁর মনে হয়েছিল বদলে যাচ্ছে নয়, দিব্য বদলে গেছে। কিন্তু কেন?

অরুণা বললে, ওর চেহারা কেমন হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? কত খারাপ হয়ে গেছে।

অথচ রহস্যটা ওরা কেউই বুঝতে পারেনি।

সুধাকান্ত বলেছিলেন, তুই ওকে টাকা দিয়ে-দিয়েই নষ্ট করেছিস।

অরুণা কেঁদে ফেলেছিল। —হ্যাঁ বাবা, তাই।

ও প্রতিজ্ঞা করেছিল আর চাইলেও টাকা পয়সা দেবে না। দেয়নি।

কিন্তু তারপরই একদিন অরুণা বললে, মা, দিব্য বোধহয় টাকা চুরি করছে। এর আগেও একদিন ব্যাগে টাকা কম পড়ল, আমি সন্দেহ করেছিলাম কাজের মেয়েটাকে। ওকে সেদিন খুব বকাঝকা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি দিব্যই চুরি করছে।

কিন্তু অসীমা বিশ্বাস করল না। —তুই রেগে আছিস ওর ওপর, তাই ওকেই সন্দেহ করছিস। আর যাই করুক, দিব্য চুরি করবে ভাবছিস কি করে।

অরুণা চুপ করে গিয়েছিল। তারপর থেকে ও টাকাপয়সা সাবধানে রাখে। মাকে বলে লাভ নেই, হাজার হোক মার মন।

অসীমা কিছুতেই বুঝতে পারত না, কিংবা বুঝতে চাইত না।

খাওয়ার সময় সামনে বসে খাওয়াত। আহা, ছেলেটার চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ভাল করে পেট ভরে খায় না।

একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। ছেলেটা কারও প্রেমে পড়েনি তো! কিংবা ব্যর্থ প্রেম থেকেও এমন হতে পারে। ওকে তো সব সময়ই কেমন উদাস উদাস লাগে।

—শোন দিব্য, টাকার দরকার হলে আমাকে বলিস।

আশেপাশে কেউ নেই দেখে অসীমা বললে।

—তা হলে ছাড়ো না দশটা টাকা।

অসীমা আহত হল। ছেলের মুখে এ কি ভাষা ? ও কাদের সঙ্গে মিশছে। তবু টাকা দিয়েছিল।

আর ভাতের থালাটা ঠেলে দিয়ে দিব্য উঠে পড়তেই অসীমা বলেছিল, এ কি রে, কিছুই তো খেলি না।

—আমার খিদে নেই।

খিদে নেই, খিদে নেই। প্রতিদিন ওই এক কথা।

মুখ তুলে তাকাত না।

এমনি ভাবেই চলছিল। সুধাকান্তও বুঝতে পারছিলেন না।

হঠাৎ একদিন করুণা ছুটে এল। দু-চোখে বিস্ময়।

ফিসফিস করে বললে, দিদি, ছাদে লুকিয়ে দাদা কি খাচ্ছে রে।

অসীমাও শুনতে পেলেন, হেসে বললেন, লুকিয়ে আবার কি খাবে ? ও তো খেতেই চায় না।

করুণা বললে, সে খাওয়া নয়।

ধীরে-ধীরে বললে, একটা সিগারেটের রাংতার নীচে দেশলাই জ্বেলে ধরল, আর কি ধোঁয়া কি ধোঁয়া। ও একটা পাইপের মত কি রেখে টানল।

ওরা কেউই জানত না ব্যাপারটা কি। খুব একটা ভয়ও পায়নি। ভেবেছিল মজার কিছু। কিংবা নিছক সিগারেট।

কিন্তু একসময় ওকে বুঁদ হয়ে বসে থাকতে দেখে সুধাকান্ত প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, কি খেয়েছিস বল ?

কেমন অদ্ভুত ভাবে হেসে দিব্য বললে, হেরোইন। হেরোইন জানো না ? বলে হাসল।

সুধাকান্ত প্রচণ্ড জোরে একটা চড় কষিয়ে দিলেন ওর গালে।

জানতেন না, ও-নেশায় পেয়ে বসলে চড়চাপড় মারধোর করে শাসন করা যায় না।

জানতেন না, এই একটা জিনিসই ওঁকে ভিতরে-ভিতরে ভেঙে দেবে। উনি একেবারে ধসে পড়বেন।

যখন জানলেন, মনে-মনে বললেন, এর চেয়ে প্রদীপ্তর নেশা অনেক ভাল ছিল। দীনেনবাবুর ছেলে মনুর। সেও নেশা, অন্য ধরনের।

পাঁচ

প্রথম-প্রথম বস্তির জমিটার ওপর পাড়ার অনেকেরই লোভ ছিল। কোম্পানি বাগানের শরিকরা যখন টুকরো-টুকরো প্লট করে বিক্রি করছিল তখন যে কেউ চাইলেই বড় প্লট কিনতে পারত। তখন তো জল-কাদা ঝোপঝাড় ডোবা। দেখে ভক্তি হত না। তাই খদ্দেরও কম ছিল। যাঁরা জমি কিনে বাড়ি করলেন তাঁদের টাকা কিংবা সাহস ছিল না। পাড়াটা যখন নতুন-নতুন বাড়িতে ঝলমলে হয়ে উঠল, পিচ রাস্তা হল, এবং অনেকেরই যখন ধারদেনা শোধ হয়ে গেছে, তখন মহীতোষবাবুর মত অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন বস্তিটা উঠিয়ে দিয়ে অমলেশ গোস্বামী যদি জমি বিক্রি করেন তা হলে পিছনের দিকে

আরও এক কাঠা দেড় কাঠা বাড়িয়ে নেবেন। তখন হয়তো চেষ্টা করলে ওঠানো যেত, অন্তত পাড়ার লোকের ধারণা সে-রকমই।

অতীশবাবু বেশি জমি নিয়েই বাড়ি করেছিলেন। ওঁর রাজপ্রাসাদ করার কোনও শখ ছিল না। শুধু মন খুঁতখুঁত করত দোতলা বা তিনতলা থেকে গা ঘেঁসা বস্তিটার দিকে চোখ পড়লে। ধোপদুরস্ত সাদা পায়জামায় রাস্তার কাল্চে কাদা ছিটকে এসে লাগলে যেমন একটা মানসিক অশান্তি ঘটে, বস্তিটা অতীশবাবুর কাছেও ছিল তেমনই। মনে-মনে একটা গোপন আশা ছিল, অমলেশবাবু বস্তিটা তুলে দিয়ে ওখানে খুব সুন্দর একটা বাগান করবেন। ফুলের বাগান।

—বাবা, সেজন্যেই বুঝি নাতির নাম রেখেছেন খুশবু? শাশ্বতী কুলকুল করে হেসে উঠেছিল।

নিরুপমা আড়চোখে শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন— দিবাস্বপ্ন।

অন্তু তখন বাবার কাছে আসত, হাসি-হল্লায় যোগ দিত। সে হাসতে-হাসতে বলেছিল, বাগানের যত গোলাপ জুঁই রজনীগন্ধা, অমলেশবাবু খরচ করবেন, তদারকি করবেন, আর আমরা বিনাপয়সায় ভোগ করব?

অতীশবাবু হেসেছেন। বলেছেন, নামটাই তো ছিল কোম্পানি বাগান, তা একটু বাগানের শখ থাকবে না।

বাগানের শখ মিটিয়েছেন নিরুপমা, লোহার ফটক থেকে গাড়িবারান্দা অবধি আসতে যে ছোট্ট প্যাসেজ, তার এক ধারে কয়েকটা ফুলগাছ বসিয়েছিলেন। এখন হিন্দুস্থানি দারোয়ান-ভৃত্যটি তার তদারকি করে। দোতলার তিনতলার ব্যালকনিতেও পর্সলিনের টবে কয়েকটা গাছ আছে, গাছের চেয়ে টবগুলোরই সৌন্দর্য বেশি। একটা লতানে মানি-প্ল্যান্টও গ্রিলের গায়ে নকশা হয়ে আছে। তাই বস্তির জমিতে ভাগ বসিয়ে নিজস্ব একটা বাগানের লোভ নেই অতীশবাবুর।

শাশ্বতীর মামা অবশ্য একবার বলেছিলেন, নিজে তো দিব্যি ভাল জায়গায় বাড়ি করে নিয়েছেন, দুচার কাঠা যদি পাওয়া যায় দেখবেন আমার জন্যে।

অতীশবাবু সে-কথায় কোনও গুরুত্ব দেননি।

দক্ষিণে বস্তিটা থাকায় লাভই হয়েছে একদিক থেকে। সব সময় হু হু হাওয়া, গ্রীষ্মের দিনে পাখা খুলতেই হয় না।

শাশ্বতী অবশ্য অনুযোগ করে। —বাড়ি নয়, লাইটহাউস। দিবারাত্রি সমুদ্রের ঝড় বইছে, জামাকাপড় রাখার উপায় নেই, টেবলক্লথ উড়ছে, ভাস ভাঙছে।

নিরুপমা বলেছেন, দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখলেই তো পারো। পেয়েছ তো, তাই তার মূল্য বুঝছ না।

অন্তু ফোড়ন কেটেছে, ছিলে তো নর্থে, কলকাতায় এক দমকা হাওয়ার দাম কত জানো?

নিরুপমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, সে-কথা বলিস না, ওদের কি বিরাট বাড়ি বল। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

শাশ্বতী চালাক মেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আহা কি বাড়ি, তিন শরিকে ভাগাভাগি, পলেস্তারা খসে পড়ছে, কবে যে ধসে পড়বে তার ঠিক নেই।

ব্যস, নিরুপমাও খুশি, অন্তুও খুশি।

আর অতীশবাবু বলেছেন, শাশ্বতী, তোমরা একালের ছেলেমেয়ে, ওই পলেস্তারা-খসা বাড়ির রেসপেক্টেবিলিটি অন্য, তোমরা বুঝবে না। তোমরা তো খাটে নকশা থাকলে নাক

সিঁটকোও। প্লেন, সব প্লেন, তাই না?

নিরুপমা হেসেছেন। —তখনকার দিনে মানুষগুলো প্লেন ছিল, খাট-পালঙ্কে বাড়ির আলসেতে ডিজাইন থাকত। এখন মানুষগুলো যত জটিল হচ্ছে আসবাব তত সিম্‌প্‌ল।

শাশ্বতী আর অতীশবাবু শব্দ করে হেসে উঠেছেন।

শাশ্বতী বলেছে, দারুণ। এক-একটা যা কথা বলেন না।

অতীশবাবু ঠাট্টা করে বলেছেন, হাই ফিলজফি। যত বুড়িয়ে যাচ্ছে তোমার শাশুড়ি ততই ফিলজফার হয়ে উঠছে।

খুশবু ওদের হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকাল, খেলনা ফেলে গটগট পায়ে এগিয়ে এসে বললে, দাদুটা, হাসছ কেন?

অতীশবাবু তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, এখন তো আমার হাসবারই দিন হে, হাসব না। বলে তার বুকে নাক ঘষলেন, যেন জুঁই কিংবা বেলফুলের ঘ্রাণ নিতে চাইলেন। খুশবুর ঘ্রাণ।

সেই অতীশবাবু এখন আর মুখ ফুটে বলতে পারেন না, এখন তো আমার হাসবারই দিন হে!

যতক্ষণ পারেন ভুলে থাকেন। আরও গভীর ভাবে ওদের ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কেবলই মনে হয় সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ওদের জানতে দেবেন না। নিজের ভয়, নিজের কষ্ট নিজে বইতে পারলে ওরা অন্তত খুশি থাকবে। অকারণ ওদের কষ্ট দিয়ে ভয় দেখিয়ে কি লাভ।

শুধু কাজগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে হবে।

কিছু শেয়ার-স্ক্রিপ্ট আছে, সেগুলো নিরুপমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বুঝতে চাইল না। তাই নোট লিখে রেখে দিয়েছেন, তার গায়ে, আলপিন দিয়ে আটকে। উনি মারা গেলে কি করতে হবে।

এ ছাড়া একটা উইল করবেন, তার জন্যে সলিসিটরের কাছে যেতে হবে।

এমন ব্যবস্থা করে যেতে চান, নিরুপমাকে যেন কারও ওপর নির্ভর করতে না হয়। আবার অন্তুও যেন বাবাকে দোষ না দেয়।

মৃত্যুর কথা কি কেউ বলতে পারে। দীনেনবাবুই কি জানতেন।

মৃত্যু, না বেঁচে থাকা, কোনটা বড়। কোনটা লোভনীয়? অতীশবাবু এখনও ঠিক করতে পারছেন না। সামনে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, অশেষ যন্ত্রণা। সে-সব কথা ভাবলে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। মৃত্যুই যেন ভাল, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। তবু গুমোট অন্ধকারের মধ্যে একটা রুপোলি শিখা দুলে-দুলে লোভ দেখায়। বেঁচে থাকতেও ইচ্ছে হয়।

প্যারালিসিসে একদিক পড়ে যাওয়া পঙ্গু দীনেনবাবুকে দেখে পাড়ার সকলেই বলত, আহা, বেচারি মারা গেলেই ভাল ছিল।

কিন্তু ওই জালে-ঘেরা খাঁচা-বারান্দায় নিথর বসে বসে দীনেনবাবুকে কতদিন সামনের লাল ফুলে ছাওয়া পারিজাত গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন। ওইটুকুতে কত তৃপ্ত। বস্তির ছেলেগুলোর সঙ্গে, লছমি কিংবা দুর্গার সঙ্গে যখন হেসে-হেসে কথা বলেন, মনে হয় কত সুখী। হয়তো বেঁচে থাকাটাই সুখ। ভিতরে-ভিতরে সেজন্যেই হয়তো অতীশবাবুরও বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে। শুধু বেঁচে থাকা।

যাওয়া-আসার পথে দেখা হয়ে গেলে দীনেনবাবুকে জিগ্যেস করতেন। —কিছু আশা দিয়েছে?

দীনেনবাবু ম্লান হেসে বলতেন, আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি।

সুধাকান্তর কাছেই শুনেছিলেন, ওঁর চিঠি নিয়ে ডি সি-র সঙ্গে দেখা করলেও থানার ও

সি তাঁর টেলিফোনকে কোনও গুরুত্ব দেননি। তাই অতীশবাবু আর বেশি খবরাখবর নিতেন না। একটু মর্যাদায় লেগেছিল, তা ছাড়া ভেবেছেন মনুকে যত নিরপরাধ সরল মনে হয়, সত্যি তা হয়তো নয়। নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আছে।

সুধাকান্তই বলেছেন, দীনেনবাবু মানুষটা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন, যাকে পারছেন ধরছেন, টাকারও শ্রাদ্ধ। বেচারি।

তারপর ফিসফিস করে বলেছেন, ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকানো যায় না। কার কাছ থেকে জেনে ফেলেছেন থানার লক্-আপ থেকে রোজ রাত্রে লর্ড সিনহা রোডে নিয়ে যায়। লর্ড সিনহা রোড!

ওই নামটাই একটা আতঙ্ক। ওখানে নিয়ে গিয়ে কনফেশন আদায় করে। কনফেশন আদায় করার জন্যে কি কি করে তার কিছুটা আভাস অতীশবাবুরও জানা। কিন্তু কানাঘুসো যে-সব কথা শুনেছেন, সত্যি হলে বড় মর্মান্তিক।

সুধাকান্তকে বলেছেন, আফটার অল ছেলেগুলো মিসগাইডেড। তার বেশি তো কিছু নয়। দোষ স্বপ্ন দেখত, কি বলেন? দেশটাকে বদলাতে চাইছে, সকলেই চায়। এই দেশটাকে ভালবাসার মত কিছু আছে নাকি। রেললাইন ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে না গিয়ে ওরা একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চায়। ওটাই ভুল।

সুধাকান্তর কানে ওসব গেল না। বললেন, চোখদুটো জবা ফুলের মত, তাকানো যায় না। একদিন দেখেছি। ভেবেছিলাম কনজাংটিভাইটিস, সবাই বলছে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়েছে চোখে।

শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি অতীশবাবুর। অত্যাচার হয়, তা বলে এ রকম? মনে হয় না।

আগেকার দিনে বলা হত স্টিল-ফ্রেম।

এই ফ্রেমের মধ্যে উনিও তো ছিলেন। এখন অবসর নিলেও গায়ে লেগে আছে, নামের পাশে লেগে আছে। সেজন্যে ভাবতেও খারাপ লাগে।

তাই দীনেনবাবুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। —ওসব উড়ো খবরে বিশ্বাস করবেন না। ডেমোক্রেটিক দেশে অতসব হয় না।

দীনেনবাবু তখনও হাঁটতে পারেন, দৌড়তে পারেন। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারেন। প্রথমটা যে-রকম ভেঙে পড়েছিলেন, অতীশবাবু দেখলেন তা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।

দীনেনবাবুর মুখে একটা ম্লান হাসি এল। —আই বি-র একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ও সি বলছিলেন, মনুর মত ইনটেলিজেন্ট ছেলে উনি খুব কম দেখেছেন। শুধু পলিটিক্স নয়, দারুণ পড়াশোনা, নানা দিকের নানা খবর জানে।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে দীনেনবাবু বললেন, আই বি ভদ্রলোক বলছিলেন, ওর মুখ থেকে একটা খবরও বের করতে পারেননি।

কথাটা বলতে-বলতে দীনেনবাবুর মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অতীশবাবু স্তম্ভিত। একটা মানুষ ভেঙে পড়েছিল, এইসব বাজে দলে মেশে বলে ছেলের ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল, কখনও ভেবেছে ভুল করে ধরেছে। সেই মানুষ ছেলের জন্যে গর্বিত হয়ে উঠছে। দারুণ ইনটেলিজেন্ট! একটাও কথা বের করতে পারেনি!

অথচ ছাড়া পাবে কিনা, বাঁচবে কিনা কিছুই জানেন না।

অতীশবাবু কি আর বলবেন, দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ডি সি-র কথাও শুনল না! আজকাল কেউ কারও কথা রাখে না।

দীনেনবাবু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, ওটা হয়তো লোকদেখানো। পুলিশের লোককে বোঝা দায়।

এইভাবেই চলছিল। দেখা হলে দু-একটা কথা।

সপ্তাহ কয়েক বাদে, হঠাৎ একদিন চমকে উঠলেন।

বড় রাস্তার দোকানে কি একটা কিনতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে দৃষ্টি পড়ল। ট্যাক্সিটা স্পিডে বাঁক নিল কোম্পানি বাগানের দিকেই। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই অতীশবাবু দেখতে পেলেন ট্যাক্সির পিছনের আসনে একদিকের জানালা ঘেঁসে দীনেনবাবু, অন্য দিকের জানালা ঘেঁসে দীনেনবাবুর স্ত্রী। আর মাঝখানে প্রদীপ্ত, দীনেনবাবুর মনু।

চমকে উঠেছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দ। তবে কি ছাড়া পেয়েছে! নিশ্চয় ছাড়া পেয়েছে। দীনেনবাবুর স্ত্রীর হাতে একটা জবাফুল বেলপাতার চ্যাঙারি দেখতে পেয়েছেন। ওটা খুবই পরিচিত দৃশ্য, দেখলেই বোঝা যায়। বোধহয় ছেলেকে ফিরে পেয়ে সটান থানা থেকে মন্দিরে চলে গিয়েছিলেন পুজো দিতে। মানত-টানত তো নিশ্চয় ছিল। লোকে তো নতুন গাড়ি কিনলেও মা কালীর কাছে পুজো দিয়ে আসে। এ তো একটা মানুষের প্রাণ!

অতীশবাবু খুশি হয়ে উঠলেন। যাক্‌, একটা সংসারে শান্তি ফিরে এল। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই ছুটে যেতে। দেখা করতে। কিন্তু না, সেটা উচিত হবে না। এতদিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন, এখন এবেলা ওঁদের সময়ের ওপর ভাগ বসানো চলে না, এ সময়টুকু ওদের নিজস্ব হয়ে থাক।

দোকান থেকে যখন ফিরলেন জাল-বারান্দায় কেউ নেই। বাড়িটাও চুপচাপ। উনি তো ভেবেছিলেন হাসি-হুল্লোড় শুনতে পাবেন।

চলে এলেন, আর বাড়ি ঢোকার আগেই সুধাকান্তর সঙ্গে দেখা।

তিনি হাসি-হাসি মুখে জানালেন, প্রদীপ্ত ছাড়া পেয়েছে, শুনেছেন?

—হ্যাঁ, ফিরলেন ওঁরা, দেখলাম।

অতীশবাবুর মনটা বেশ হাল্কা লাগছিল। ডি সি-কে লিখে-দেওয়া ওঁর চিঠিতে কোনও কাজ হয়নি বলে আক্ষেপ ছিল, নিজেকে অপরাধী-অপরাধী লাগত। মনে হত, চিঠিটা মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে বলেই দীনেনবাবু আর কারও কাছে যাননি। হয়তো খুঁজে-পেতে তেমন কাউকে পেতেন যিনি চেষ্টা করলে ছাড়িয়ে আনতে পারতেন। সেই অপরাধবোধ নিমেষে উড়ে গেল। ছাড়া তো পেয়েছে, যেভাবেই পেয়ে থাক।

পাড়ায় তো এতদিনে এই একটাই বড় খবর। মেয়েদের মধ্যে একটাই আলোচনা। রাস্তায় দেখা হলে, কে জি ক্লাসের বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলবাসের জন্যে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে ফেরার পথে কমবয়েসি মা আরেকজনকে বলেছে, প্রদীপ্তর সঙ্গে এর আগে তো কথা বলেছি, এখন ভাই ভয় করে! কেউ বলেছে, এখন যদি ফিরে আসে তাকাতেও পারব না ওর দিকে।

অতীশবাবু বেশ বুঝতে পারেন গোড়ায় প্রদীপ্তর জন্যে সকলেই দুঃখবোধ করত, দীনেনবাবুর পরিবারের জন্যে সমবেদনা, তারপর কিভাবে নানান রটনায় অনেকের মনেই ভয় ঢুকে গেছে। সেই ব্রিলিয়েন্ট ছেলেটা, যার জন্যে সকলেই একসময় গর্ববোধ করেছে, কি সরল, কি ভালমানুষ, সেই মনু কারও কারও চোখে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

বস্তির সাবিত্রী ঠিকের কাজ করতে আসে। ঘরদোর মোছে, বাসন মাজে। সে একদিন চাপা গলায় জিগ্যেস করেছিল, বাবু, তিন নম্বরের খোকাবাবুর কি ফাঁসি হয়ে যাবে? বস্তির সব লোক বলছে।

ওর কথায় অবাক আর আহত হয়েছিলেন অতীশবাবু। ওসব কথা উনি কোনওদিন ভাবেননি। তার চেয়েও বেশি আঘাত লেগেছিল, ভদ্রঘরের একটা শিক্ষিত ভদ্র ছেলেকে নিয়ে বস্তিতে আলোচনা হয়েছে জেনে। যেন অতীশবাবুদের সকলকে ওরা বস্তিতে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে। পাড়ার সকলকে।

মনু ফিরে আসায় সেজন্যে আরও ভাল লাগছে, আরও নিশ্চিন্ত। ওরা দেখুক সব রটনা মিথ্যে।

সাবিত্রীর কথাটা মনে পড়তে হাসি পেল। এই মিসগাইডেড ছেলেগুলো এদের জন্যেই দেশটা বদলাতে চায়। এই নিচুতলার মানুষদের ভাল করতে চায়। ওরা জানেও না, বোঝেও না, কোনও সিমপ্যাথি নেই ওদের। সিমপ্যাথি অবশ্য কারও নেই। যেটুকু মায়া-দয়া দুঃখ, তা শুধু একজন মানুষের জন্যে, একটা চেনা-জানা ভদ্রঘরের ছেলের জন্যে— মনুর জন্যে। মনুর পরিবারের সকলের জন্যে।

অতীশবাবু বাড়ি ফিরেই নিরুপমাকে বললেন, দীনেনবাবুর ছেলে ছাড়া পেয়েছে; শুনেছ?

—পেয়েছে? নিরুপমার মুখে হাসি ফুটল। বললেন, ওর মা বাঁচল। উঃ, সেদিন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকানো যায় না।

তারপর রাগত-স্বরে বললেন, মা-বাবার কথা তো ছেলেরা ভাবে না।

শাশ্বতী হাসতে-হাসতে বললে, খুশবুকে নিয়ে আমার তো এখন থেকে ভাবনা। আজকাল ছেলেমেয়েদের ঠিকমত মানুষ করা যে কি কঠিন!

অতীশবাবু খুশবুকে নিয়ে বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন।

নিরুপমা ধমক দিলেন, ওকে ছেড়ে দাও, ওর এখন খাবার সময়।

শাশ্বতী ওকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে যেন শুনিয়ে শুনিয়েই নিরুপমা হেসে বললেন, খুশবুকে সব সময় তুমিই তো আটকে রাখছ। ওর বাবা-মারও তো ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে!

শাশ্বতী ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেলে বললে, রক্ষে করুন, আর আদর করতে হবে না, সারাটা দিন জ্বালিয়ে মারছে।

নিরুপমা বললেন, ওসব কথা আমরাও বলেছি, ওকে এখানে রেখে তিনটে দিন দোতলায় নেমো না, দেখব তখন।

শাশ্বতী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, দারোয়ানটা সিঁড়ি থেকে চেঁচিয়ে বললে, বড়বাবুর কাছে তিন নম্বরের বাবু এসেছেন।

—কে?

অতীশবাবু দ্রুত সিঁড়ির মুখে চলে গেলেন। —আরে আসুন আসুন।

দীনেনবাবু, দীনেনবাবুর স্ত্রী, আর সঙ্গে মনু।

এই কদিনেই ছেলেটার চেহারা কেমন যেন হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে, চোখ দুটো অন্যরকম।

দীনেনবাবু বললেন, প্রণাম করো।

মনু অতীশবাবুকে প্রণাম করল। 'অতীশবাবু বলে উঠলেন, আরে না না। কিন্তু প্রণাম নিলেন। একটু অবাকই হচ্ছিলেন।

—যাক্, এবার একটু সাবধানে থেকো। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে অতীশবাবু বললেন।

দীনেনবাবু বললেন, চলি। পরে আসব।

চলে গেলেন।

ব্যালকনি থেকে দাঁড়িয়ে অতীশবাবু দেখলেন। একপাশে বাবা, একপাশে মা। যেন

দুপাশ থেকে গার্ড দিয়ে চলেছেন। ট্যাক্সিতে দেখেও তাই মনে হয়েছিল। এত আনন্দের মধ্যেও দীনেনবাবুর চোখে-মুখে একটা ভয়-ভয় ভাব।

কেন তা বুঝতে পারলেন না। হয়তো ছেলের ওপর আস্থা নেই। অনেক ছোটাছুটি করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু ভয় পাচ্ছেন মনু হয়তো আবার দলে গিয়ে মিশবে। এ এক নেশা। ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে না।

কিন্তু অতীশবাবুর খুব ভাল লেগেছে। এখনও মানুষ কত ভাল, কত সামান্য কারণে কৃতজ্ঞ থাকে। মনুকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে ওঁর ভূমিকা তো নগণ্য। তবু ওঁর কাছে এসেছেন দেখা করতে। ওই প্রণামটা তো নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতা। বরং ওঁর নিজেরই অস্বস্তি লেগেছিল। প্রাপ্য তো কিছুই ছিল না, যেন অনেক বেশি পেয়ে যাচ্ছেন।

এখন সেই দীনেনবাবুকে জাল-ঘেরা বারান্দায় বসে থাকতে দেখলে খুব দ্রুত আর সন্তর্পণে পার হয়ে আসেন। চোখে চোখ পড়লেই একা নিঃস্ব একটা পঙ্গু অথর্ব মানুষ কথা বলতে চাইবে। বড় বিরক্তিকর। সেজন্যে কেউ থামে না, কেউ তাকায় না। প্রথম প্রথম অনেকে হাসাহাসি করত। কিংবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলত, উঃ কি ভয়ে ভয়ে তিন নম্বর বাড়িটা পার হতে হয়। লোকটা ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অনর্গল কথা বলে। তাও সব কথা ওর স্পষ্ট বোঝা যায় না, কেমন জড়ানো জড়ানো।

অনর্গল কথা বলাই কি ওঁর অপরাধ? সকলেই তো অনর্গল কথা বলছে। পরস্পরের সঙ্গে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাটেবাজারে, অফিসে, সর্বত্র। আসলে যে লোকটার সঙ্গ দরকার তাকে কেউ সঙ্গ দিতে চায় না। যে কথা বলার লোক খুঁজছে তাকে সকলেই এড়িয়ে যায়।

ওদিকে না তাকিয়েই পার হয়ে গেলেন অতীশবাবু। মনুর কথা এতদিনে সকলেই তো ভুলে গেছে। দীনেনবাবুর কথাও আর মনে পড়ে না। এখন অতীশবাবুর সামনেই একটা ভয়ঙ্কর ভয়। অথচ সেই ভয় চাপা দিয়ে উনি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করতে চাইছেন। তবু পা কাঁপছে।

এ-সময়ে কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হত। কিন্তু কাকে সঙ্গে নেবেন। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তবু ভাল, অন্ত কিচ্ছু বুঝতে পারেনি, কিছু সন্দেহ করেনি। করলে কোনও দিন না কোনও দিন জিগ্যেস করে বসত। কিংবা নিরুপমাকে বলত।

সুবিমলকে নিয়ে চিন্তা নেই। ও ঠিকই গোপন রাখবে, কথা দিয়েছে।

সুবিমলের মুখ দেখে ওঁর মনে হয়েছিল, সেও সন্দেহ করছে।

—ভয় পাবার কিছু নেই, জ্যাঠামশাই। ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়লে সেরে যায়। কি শেফালি? তুমিই বলো না।

শেফালি দত্ত, ডাক্তার। রিসার্চ করছে। সুবিমল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

সে হাসল। বললে, কত পেশেন্ট তো সেরে গেছে।

সুবিমল বললে, বায়োপসি তো হোক, তার আগেই তো আপনি অর্ধমৃত হয়ে পড়েছেন।

শেফালি বললে, মোটেই না। বরং এ রকম স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড আমি কারও দেখিনি।

একটু থেমে বললে, আমি তো অবাক হয়ে গেছি, এই বয়েসে একা এসেছেন। বলছেন, ফ্যামিলির কাউকে না জানিয়ে চিকিৎসা করাবেন। পরিবারের কাউকে কষ্ট দেবেন না।

এসব কথা অতীশবাবুকে সেদিন স্পর্শও করেনি। বাইরে যতই মনের জোর দেখান, ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছিলেন।

কেমন নার্ভাস ভাবে বললেন, আচ্ছা, সুবিমল, আমার গলার স্বর কি ভাঙা ভাঙা লাগছে ?

সুবিমল এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল। তারপর জোর করে হেসে উঠে বললে, কোয়াইট নর্ম্যালি।

—না, না, এখন ততটা নেই। অতীশবাবু বললেন, মাঝে মাঝেই কেমন গলার স্বর ভেঙে যায়। ভাবতাম, ঠাণ্ডা লেগেছে, গার্গল করতাম, কিচ্ছু হত না। ঢোক গিলতে গেলে লাগে।

সুবিমল হেসে বললে, হজমটজম হয় তো ?

—মাঝে মাঝে হয় না, এনজাইম খেলেও হয় না।

সুবিমল বললে, বয়েস হয়েছে, ওরকম তো একটু-আধটু হবেই। বলে হাসল।

তারপর আবার প্রশ্ন। —একটানা কাশিও হয় নিশ্চয় ? আপনার বয়েসে এ-সব তো হবারই কথা।

অতীশবাবু হাসলেন। —হ্যাঁ, কখনও কখনও।

সুবিমল হঠাৎ প্রশ্ন করলে, সকালে পায়খানায় যান কখন ?

—নটা সাড়ে নটা।

—চিরকালই ওই সময়ে ?

অতীশবাবু বললেন, না। আগে তো সকাল ছটায় যেতাম। এখন···

অতীশবাবু ঠিক বুঝতে পারেননি, কিন্তু মনে হয়েছিল সুবিমলের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছে। উনি একটু ভয় পেয়েছিলেন।

সুবিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসুন, শেফালিকেও ইশারা করল।

ক্যান্সার মানে মৃত্যু। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুযন্ত্রণা। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন ক্যান্সার না হয়। অন্য যে কোনও রোগ, যে কোনও দুরারোগ্য রোগ হোক্···

সুবিমল ফিরে এসে ওর চেয়ারে বসল। অতীশবাবুকে বসতে বলল।

তারপর খসখস করে কি-সব লিখে বললে, নেক্সট উইকে, বাইশ তারিখে আসুন। বায়োপসি রিপোর্টটা তৈরি হয়ে যাবে।

—এত দিন ? অতীশবাবু হতাশ গলায় বললেন, যদি এর মধ্যে বেড়ে যায় ?

—কেন ভয় পাচ্ছেন ? আমি তো আছি। বায়োপসির একটু সময় লাগে।

অতীশবাবু টাকা বের করেছিলেন। সুবিমল দুহাতে অতীশবাবুর টাকাসুদ্ধ হাতটা মুঠো করে দিল। বললে, আমি তো আপনাকে জ্যাঠামশাই বলি।

শেফালি হেসে বললে, এটা হাসপাতাল। অতীশবাবু ভুলে গিয়েছিলেন।

সেদিন উনি যখন চলে আসছিলেন, শেফালিও তার বড় ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেও ফিরবে।

একেবারে অন্য সব কথা বলতে বলতে হাসপাতালের গেট পার হয়ে এল শেফালি। হাসছিল, তারপর হঠাৎ বললে, রোগ নিয়ে একটুও ভাববেন না, কথা দিন।

অতীশবাবু নির্বোধের হাসি হাসলেন, ঘাড় নাড়লেন।

যেন ভাববেন না বললেই না ভেবে থাকা যায়।

তখনও একটু আশা ছিল। তারপর সেই বাইশ তারিখ।

অধৈর্য হয়ে কাটিয়েছিলেন দিনগুলো। ভিতরে ভিতরে চাপা আতঙ্ক।

সুবিমলের ঘরে এসে দেখলেন কেউ নেই। না সুবিমল, না শেফালি।

বিরাট শূন্য ঘরটায় ধীরে ধীরে এসে সুবিমলের চেয়ারটার সামনের চেয়ারে বসলেন।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। শূন্য ঘরখানার মতই ওঁর বুকের মধ্যেও তখন শূন্যতা। যেন একজন আসামি বিচারের রায় শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রাণদণ্ড না মুক্তি।

করিডরে একটা জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। মচ্ মচ্ মচ্ মচ্, পাশে বোধহয় হাই হিল-এর খুট খুট খুট খুট।

উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালেন অতীশবাবু।

সুবিমল অতীশবাবুকে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল। শেফালিও।

ওরা দুজনে বসে কি-সব কাগজপত্র দেখতে শুরু করল।

অতীশবাবু চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। বুক দুরু দুরু কাঁপছে তখন। তবু একটা ক্ষীণ আশা। সুবিমল ওঁর দিকে তাকাল না, চোখ সরিয়ে নিল, বোধহয় অন্য কোনও রুগির কথা ভাবছে। অন্য কোনও রুগিকে নিয়ে বিচলিত বা ব্যস্ত। কাগজপত্র বোধহয় তারই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অতীশবাবুর গলা থেকে আর্তনাদের মত বেরিয়ে এল, সুবিমল, আমাকে কিছু বলো।

সুবিমল চোখ তুলে তাকাতে পারল না, সামনের কাগজটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, একেবারে আর্লি স্টেজ।

তারপরই চোখ তুলে তাকাল, হাসবার চেষ্টা করল।—উই আর লাকি। অনেকেই দেরি করে ফেলে। দুর্ভাবনার কিছু নেই।

অতীশবাবুর কানে গেল না সে-সব কথা। দুটি বিস্ফারিত চোখে সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, তাহলে আমি শেষ হয়ে গেলাম?

শেফালি বলে উঠল, কি বলছেন!

—শেষ হয়ে গেলাম। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আর সুবিমল দেখতে পেল অতীশবাবুর দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশ্চর্য। সুবিমল বুঝতেই পারেনি। যে মানুষটাকে ওর মনে হয়েছিল ভীষণ স্ট্রং, ধসে পড়ার মত লোকই নন, যিনি পরিবারের কাউকে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা দিতে চান না বলে গোপনে চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন, তিনি যে এভাবে দু চোখ ভাসিয়ে কেঁদে ফেলবেন, সুবিমল ভাবতেই পারেনি।

শেফালি হাসবার চেষ্টা করল।—আপনি মিথ্যে নার্ভাস হচ্ছেন। সেরে যাবে, আমি বলছি সেরে যাবে। আমরা তো আছি।

অতীশবাবু শেফালির মুখের দিকে তাকালেন। ওর মুখের হাসিটা বিকৃত হয়ে গেল।—তোমরা আছ। কিন্তু তোমরা আমার চেয়েও অসহায়।

সুবিমল বললে, একবার বিকেলের দিকে আসতে হবে জ্যাঠামশাই। উই মাস্ট স্টার্ট ফ্রম টু ডে।

অতীশবাবু ঘাড় নাড়লেন, তারপর উঠে পড়লেন।

সুবিমল ওঁর সঙ্গে নীচে পর্যন্ত নেমে এল। একজন ওয়ার্ডবয়কে বললে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসতে।

অতীশবাবু বললেন, না না, আমি ঠিক আছি। আমি ঠিক আছি।

একটা ঘোরের মধ্যে বেরিয়ে এলেন। যেন নিজেকে এতদিন চিনতে পারেননি। এই প্রথম নিজেকে চিনতে পারছেন। রাস্তার ভিড়। ট্রাম বাস ট্যাক্সি—সব ঝাপসা আর অস্পষ্ট। দুটো পায়ে যেন জোর নেই, দাঁড়াতে পারছেন না।

আমি কি গোপন রাখতে পারব? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। মনে হল এখন

আর পারবেন না। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। এখন কারও ওপর নির্ভর করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অন্তু, নিরুপমা, শাশ্বতী—সবাইকে বলে দিয়ে নির্ভার হতে ইচ্ছে করছে। বুকের ওপর চেপে বসা পাথরটা একা-একা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবেন না।

মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। যেন উজ্জ্বল এক ঝলক আলো। ভেবে রেখেছিলেন তাকে কোনও দিন জানাবেন না। সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, দূরে আমেরিকায়। জামাই সেখানেই চাকরি করে। মেয়েও। ভেবে রেখেছিলেন যদি সত্যি ক্যান্সার হয় তাকে দুঃখ দেবেন না।

কিন্তু তার কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। তাকে জানালে সে নিশ্চয় ছুটে আসবে। কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। হয়তো আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। কত লোক তো যায়। ফিরে এসে অনেকদিন বাঁচে।

যতদিন জানতে পারেননি, যন্ত্রণাকেই ভয় ছিল। সেই প্রথম দিন জিগ্যেস করেছিলেন, খুব কষ্ট হয় সুবিমল ? অসহ্য যন্ত্রণা হয় ? এমন কোনও ওষুধ তোমরা বের করতে পারনি, কষ্ট থাকবে না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একসময় শান্তিতে মানুষ চলে যেতে পারে ?

তখন যন্ত্রণার কথাই ভেবেছিলেন, যেন মৃত্যুকে তুচ্ছ করা যায়।

কে জানত বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা আরও বড়। শুধু বেঁচে থাকা।

খুশবু, খুশবু, খুশবু। নামটা বার বার উচ্চারণ করলেন।

কত কি স্বপ্ন দেখেছিলেন। একটু একটু করে ওঁর চোখের সামনে বড় হয়ে উঠবে। স্কুলে যাবে। কলেজে। আরও আরও কত কি।

নিরুপমা, অন্তু, শাশ্বতী—ওদের সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবতে পারছেন না।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে গেলেন। গাছের ছায়ায় ভেজা একটা বেঞ্চে বসলেন কিছুক্ষণ। কেমন অস্থির লাগল; উঠে পড়লেন।

তারপর নিরুপায় হয়ে একসময় বাড়ির পথ ধরলেন। রোদের তাপ বাড়ছে। বয়েস হয়েছে, এখন আর এটুকু রোদ্দুরও সহ্য করতে পারেন না।

কেবলই ভয় হচ্ছিল ওঁর মুখ দেখে নিরুপমা কিছু বুঝে ফেলবে। অতীশ সোম আই সি এস, তোমার নাকি দারুণ পার্সোনালিটি। কারও কাছে মাথা নোয়াওনি। তোমার মত স্মার্ট মানুষ দেখাই যায় না। তুমি কি চটপট ডিসিশন নিতে পার! তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলে অনেকেরই হাঁটু কাঁপে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তুমি কত সাধারণ হয়ে গেছ। কত সামান্য।

বাড়ি যতই কাছে এগিয়ে আসছে পায়ের গতি কমে আসছিল।

ওই তো, আর একটু গিয়ে বাঁক নিলেই তিন নম্বর বাড়িটা দেখা যাবে। নীচের তলার জালে-ঘেরা বারান্দার ওপারে দীনেনবাবু বসে আছেন হয়তো। পঙ্গু, অথর্ব, প্যারালিসিসে একটা দিক পড়ে গেছে। কিন্তু দীনেনবাবু, ইউ আর লাকি। আপনি বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকাটাই কত সুখ, আপনি জানেন না।

অতীশবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো কোনও ঝামেলা হয়েছে বস্তিতে। কিংবা মারপিট, খুনজখম। এমন তো লেগেই থাকে। নাকি সকলকে দিয়ে সই করিয়ে সেই যে থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছিল তারই ফল ?

অতীশবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। কি ব্যাপার বুঝতে পারলেন না। এমনিতেই তো সই করার পর থেকে, বিশেষ করে নিরুপমা ধমক দেওয়ার পর থেকে, মনে মনে ভাবতেন চোলাই মদের কারবারি মঙ্গল নিশ্চয় ওঁদের ওপর

চটে আছে। ওদের কাছে খবর যে পৌঁছে গেছে কে কে সই করেছে তা ঠিকের মেয়েটার কাছ থেকেই নিরুপমা শুনেছেন। সাবিত্রী বলেছিল, আপনাদের উপর বহুত গুস্‌সা।

তাই একটু ভয় পেয়েছিলেন।

দেখলেন বস্তি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে, রাস্তায় জটলা করছে, কিন্তু সবারই হাতে নানান মালপত্র। দড়ির খাটিয়া কাঁধে, কারও হাতে হাঁড়ি-কুড়ি, চট টিনের টুকরো টালি, নোংরানোংরি জামাকাপড়।

যে যার নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখলেন সুধাকান্তও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

—কি হল ? উঠিয়ে দিচ্ছে ?

সুধাকান্ত চাপা গলায় বললেন, অ্যাদ্দিনে বাঁচা গেল।

তিন নম্বরের সামনে এগিয়ে এসে অতীশবাবু থেমে পড়লেন।

একটা ছোট টেবিল, আর তিনখানা চেয়ার। দুটো চেয়ারে দুজন অপরিচিত লোক, একটায় অমলেশ গোস্বামী। তিন নম্বর বাড়ির মালিক, বস্তির জমিটার মালিক।

লোকগুলো খাটিয়া, বিছানা, মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছে, অমলেশবাবুর ছোট্ট টেবিলটার সামনে দাঁড়াচ্ছে। পাশের দুটো চেয়ারের দুই ভদ্রলোক টাইপ করা স্ট্যাম্প পেপারটা এগিয়ে দিচ্ছেন, ওরা সই কিংবা টিপসই দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নোট গুনে গুনে টাকা দিচ্ছেন অমলেশবাবু। আর অদ্ভুত ব্যাপার, লোকগুলো দিব্যি হাসছে, যেন কত ফুর্তি।

সুধাকান্ত বললেন, প্রত্যেকটি ঘরকে এক হাজার টাকা করে দিচ্ছেন।

অতীশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কি, সে তো অনেক টাকা লাগবে।

লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন অতীশবাবু। নগদ টাকা পেয়ে দারুণ ফুর্তি, দিব্যি গুলতানি করছে। মালপত্র নিয়ে গিয়ে আশপাশের ফুটপাথে নামিয়ে রাখছে। মেয়েরা কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ কিছু ফেলে এসেছে কিনা তার হদিস নিচ্ছে। ছুটে বেড়াচ্ছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো।

সুধাকান্ত বললেন, যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অতীশবাবু দ্রুত পার হয়ে চলে এলেন। কোনও কথা বললেন না। ওঁর তেমন কিছু আনন্দ হল না। এখন আর পৃথিবীতে কোনও কিছুতেই আনন্দ নেই। কোনও স্বপ্ন নেই, কোনও আশা নেই।

অনেকের কাছে শুনেছেন বলেই সুবিমলকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা ডাক্তার, কার্সিনোমায় ছুরি ছোঁয়ালেই নাকি বেড়ে যায় ? চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ?

ক্যান্সার শব্দটা উচ্চারণ করতে পারেননি।

সুবিমল হেসেছে। —আমি আপনার গলায় ছুরি বসাচ্ছি না।

স্পষ্ট কোনও উত্তর দেয়নি।

সে-কথাটাই হঠাৎ কেন যে মনে পড়ল। বোধহয় ভয় থেকে।

বস্তির মুখটা পার হয়ে এগিয়ে আসতেই মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা। পাড়া-পড়শিদের জটলা সেখানে ; সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। সকলেই বেশ খুশি-খুশি।

দোতলা তিনতলার বারান্দায় মেয়েরা উঁকি দিয়ে দেখছে।

মহীতোষবাবু বললেন, মিছিমিছি আমাদের খাটিয়ে মারলেন অমলেশবাবু, সই করাও, থানায় যাও...তলে তলে যে এই সব ব্যবস্থা করেছেন বললেই তো পারতেন।

একজন কে বললে, এক হাজার টাকা করে দিচ্ছে, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

মহীতোষবাবু হাসলেন। —টাকা আছে মশাই, টাকা আছে, অমন সাদাসিধে দেখতে

হলে কি হবে ! একটা পার্টিকেও হাত করেছেন। দেখছেন না বেপাড়ার ছেলেগুলো হাতা গুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কে একজন বললে, এতদিনে পাড়ায় শান্তি নামল।

দোতলার বারান্দা থেকে একটি মেয়ে চিৎকার করে বললে, মেসোমশাই, মা বলছে আমাদের কাজের লোকের কি হবে ?

সকলেই ওপরের দিকে তাকাল। মেসোমশাই ডাকটা কার উদ্দেশে কেউ বুঝল না। তবু সকলেই হেসে উঠল। দোতলা তেতলার বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়ে-বউরাও।

কে একজন বললে, আচ্ছা মঙ্গলও কি টাকা নিয়ে উঠে যাচ্ছে ? ওর দলের লোকরা ?

মহীতোষবাবু বললেন, তাদের তো কাল রাত্তিরেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

একটু থেমে বললেন, আমার মনে হয় এর মধ্যে পুলিশও আছে।

একজন বললে, আছে মানে ? আছেই তো। তা না হলে অমলেশবাবু আমাদের পিটিশন করতে বলেছিলেন কেন !

—তারা তো ছাড়া পেলে ফিরে এসে দেখবে বস্তিই উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

মহীতোষবাবু বললেন, আর নয় তো, এদের এক হাজার দিচ্ছে, তাদের দশ হাজার দেবে।

—টাকা থাকলে মশাই সবই হয়। কে একজন বললে।

সুধাকান্ত বললেন, উঃ, অনেক টাকা।

অতীশবাবু আর দাঁড়ালেন না। বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

পা বাড়াতে পারছিলেন না। কেউ যেন পিছন থেকে টেনে ধরছে। এই তো বেশ কিছুক্ষণ সব ভুলে গিয়েছিলেন, বুকের ওপর থেকে পাথরটা নেমে গিয়েছিল। বস্তি, অমলেশবাবু, সুধাকান্ত ইত্যাদি নিয়ে অন্যমনস্ক হতে পেরেছিলেন। এখন আবার নিজেকে দুর্বল লাগছে।

ভেবে রেখেছিলেন কাউকে কিচ্ছু জানাবেন না। এখন মনে হচ্ছে সকলকে জানিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়াই ভাল। তাহলে নিরুপমা হয়তো মেয়েকে আমেরিকায় লিখে জানাবে, কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।

বড় বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

—বড়বাবু, আপনার কি তবিয়ত খারাব ? দারোয়ানটার বগলে ট্র্যানজিস্টার বাজছে উচ্চস্বরে। বড়বাবুকে দেখেও সেটা কমাল না।

লোকটা একটু গোঁয়ার টাইপের। নিজের যা ইচ্ছে করে যাবে, বললেও শুনবে না। রাত এগারোটার সময়, যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে তখনও রেডিওয় হিন্দি গান চলে তীব্র আওয়াজ করে। তিনতলা থেকে অন্ত চেঁচিয়ে বন্ধ করতে বললেও শোনে না। কথায় কথায় ভয় দেখায় চলে যাবে। কিন্তু লোকটা খুবই বিশ্বস্ত, শুধু গেট খোলা বা বন্ধ করা নয়, সিঁড়ি মোছা থেকে মালির কাজ অবধি অনেক কাজ করে। তাছাড়া নীচে কোনও লোকজন এলে দোতলা তিনতলার সঙ্গে ওই একমাত্র যোগসূত্র। ও না থাকলে অতীশবাবুকে অন্তুকে বার বার নীচে নামতে হত।

অতীশবাবু বললেন, না না, তবিয়ত ঠিক আছে। বললেন বটে, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগল। তাহলে ওঁর মুখেচোখে ভয় ফুটে উঠেছে ? নিরুপমা দেখলেই ধরে ফেলবে ? সন্দেহ করবে ?

সে তো ভালই। তাহলে বলেই ফেলবেন। আর সহ্য করতে পারছেন না। বলে ফেলে হাল্কা হতে চান। 'একেবারে আর্লি স্টেজ', কথাটা বিশ্বাস করেননি। ওটা বোধহয় সান্ত্বনা। সুবিমল অতি ধূর্ত ছেলে। 'আপনার ক্যান্সার হয়েছে', এই কথাটা গম্ভীরভাবে না

বলে মোলায়েম করে বললে, 'একেবারে আর্লি স্টেজ'।

দুঃখের হাসি হাসলেন। ক্যান্সারের আবার আর্লি স্টেজ। মৃত্যুর আগে মুখে ছেলের হাতের জল দেওয়ার মত। যে মারা যাচ্ছে তার মুখে জলই বা কি ছেলের হাতই বা কি। সান্ত্বনা অন্যদের।

মৃত্যুর সময় কোনও সান্ত্বনা থাকে না। মৃত্যুর আগেই অতীশবাবু বুঝতে পারছেন। থাকে শুধু বৃথা আশা। যেমন উনি নিজেও ভাবছেন সত্যি সেরে যেতে পারে। যেমন আশা করছেন, বলে ফেলতে পারলে মেয়ে-জামাই আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। সারিয়ে দেবে।

মনঃস্থির করে ফেললেন, বলেই ফেলবেন। যতদিন নিছক সন্দেহ ছিল, ভেবেছিলেন গোপনে গোপনে চিকিৎসা করাবেন, ততদিন ভাবতে পেরেছিলেন সংসারের কারও গায়ে আঁচড় লাগতে দেবেন না।

এখন মৃত্যু দেখতে পাচ্ছেন বলেই সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

মৃত্যু বড় বিভীষিকা।

কোথায় যেন পড়েছিলেন জোন অব আর্ককে যেদিন পুড়িয়ে মারা হয় তার আগের দিন তাকে বলা হয়েছিল, স্বীকার করো তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি ঈশ্বরের কথা শোনোনি, তাহলে তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে না। জোন অব আর্ক নাকি পুড়ে মরার ভয়ে প্রথমে রাজি হয়েছিল। সর্বসমক্ষে বলবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে বলে কথা দিয়েছিল। তারপর কি ঘটেছিল কে জানে, পরের দিন রাজি হয়নি। পুড়ে মরেছিল। হয়তো ইগো, হয়তো আত্মসম্মান। সত্য কি তা কে জানে।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই ওঁর জুতোর শব্দ শুনে নিরুপমা আর শাশ্বতী ছুটে এল।

অতীশবাবুর দু চোখে তখন জল, গলার কণ্ঠনালিতে 'আমি শেষ হয়ে গেছি' কথাটা কান্নার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল।

তার আগেই উচ্ছল হাসির প্রগলভতায় মোড়া শাশ্বতীর আনন্দ ঝরে পড়ল, বাবা, বাবা, দারুণ ভাল খবর, দেখে এলেন?

নিরুপমারও হাসিমুখ।—তোমার এতদিনের ইচ্ছে পূরণ হল তাহলে, কি বলো?

শাশ্বতীর মুখে অনর্গল কথা।—কি আনন্দ যে হচ্ছে, আসুন বাবা, বারান্দা থেকে দেখবেন।

নিরুপমা তখনও হাসছেন।—সত্যি দেখে যাও, কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সব তো ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে।

কেউই অতীশবাবুর চোখে আটকে থাকা অশ্রুকণা দেখতে পেল না।

ওদের হাসি দেখে, আনন্দ দেখে উনিও হাসবার চেষ্টা করলেন।

শাশ্বতী বললে, চলুন দেখবেন। এবার বোধহয় আপনার বাগান হবে। জুঁই কিংবা রজনীগন্ধা। আঃ একটা গোলাপের বেড যদি ওখানে হয়ে যায়...

নিরুপায় হয়ে অতীশবাবু বললেন, চলো যাই, দেখে আসি।

এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

বস্তির পিছন দিকটা ইতিমধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে। জংধরা ভাঙা করোগেটেড টিন, দরমা, ভাঙা টালি পড়ে আছে, ঘরগুলো ভাঙা। ঝড়ে ভেঙে যাওয়ার মত। সামনের দিকটায় মালপত্র নিয়ে সব একে একে বের হচ্ছে। কেউ বা ঘর ভাঙছে চালা থেকে কিছু টেনে বের করার জন্যে।

অন্তু আগেই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে। অতীশবাবুর

পাশাপাশি নিরুপমা আর শাশ্বতীও ঝুঁকে পড়ে দেখছিল।

—মা, পিছন দিকের ওই পাঁচিলটা ভেঙে একটা প্যাসেজ করে দিলে আমরা কিন্তু চট্ করে ওই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তাম।

নিরুপমা হাসলেন। —আমার আহ্লাদী বউয়ের জন্যে তা তো করে দেবেই। কি আশা?

শাশ্বতীর কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। বস্তির পিছনের পাঁচিলের ওপারেই বেশ চওড়া বড় রাস্তা। কিন্তু তিন পাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলেই এতখানি ঘুরপথে গিয়ে তবে বড় রাস্তায় পড়া যায়।

বস্তিটা উঠে যাচ্ছে বলেই আনন্দে ছটফট করছিল শাশ্বতী। হঠাৎ বললে, অন্তু, তুমি একবার খবর নিয়ো, জমিটা হয়তো প্লট করে বিক্রি করতে পারে। সেবার মামা এসে বলেছিল, কোনও জমি বিক্রি থাকলে জানাতে।

অন্তু হেসে ফেলে বললে, দেখেছ মা? বস্তি উঠতে না উঠতে বাপের বাড়ির লোকদের টেনে আনার ধান্দা।

শাশ্বতী রেলিং ঝুঁকে দেখতে দেখতে বলছিল, অন্তুর কথায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীরভাবে বললে, বাবা!

—উঁ?

—মামা কি বাপের বাড়ির লোক?

অতীশবাবু এতক্ষণে হেসে ফেললেন। বললেন, না, কক্ষনো না। মেটারনেল কি করে পেটারনেল হবে!

অন্তুও শব্দ করে হেসে উঠল।

আর তখনই খুশবুকে নিয়ে ফিরল ওর আয়া। আসলে চব্বিশ ঘণ্টার ঝি। খুশবু ফিরেই অতীশবাবুকে দেখে পিছন থেকে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। ওর মাথাটা অতীশবাবুর হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছয় না। অতীশবাবু সাবধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, খুশবুবাবু! দেখেছ কি হচ্ছে?

আয়াটা বলে বসল, আস্তায় বাবুরা সব নাপাচ্ছে, বস্তি উটে গেল, আস্তা ফাঁকা হল।

একটু থেমে বললে, নোক দেখুন, বস্তি উটে গেল, কাজের নোক আর পাবেননি। গিন্নিরা সব কাঁদতিছে।

অন্তু হেসে উঠল ওর কথায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমা বললেন, হাসছিস কি রে? ঠিকই তো বলেছে। ওরা সব চলে যাচ্ছে, সাবিত্রী ও-বেলায় আসবে না নাকি!

শাশ্বতীও চিন্তায় পড়ে গেল। হাসি উবে গেল মুহূর্তে। বললে, কি পাজি দেখেছ, সকালে এল, একবারও বললে না যে চলে যাবে!

অতীশবাবু একবার শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকালেন, একবার নিরুপমার মুখের দিকে। দুজনেই যেন চিন্তিত। ঘর মোছা, কাপড় কাচা, বাসন মাজার লোক থাকবে না। একটা ঠিকে-ঝি! তার জন্যে দুজনের মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ।

অতীশবাবু হাঁটু ভেঙে বসলেন বারান্দায়, খুশবুকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আজকাল আর কোলে নিয়ে দাঁড়াতে পারেন না।

খুশবুর গালে গাল ঘষতে ঘষতে মনে মনে বিষণ্ণ-হাসি হাসলেন।

একটা ঠিকে-ঝি চলে যাচ্ছে কিংবা একটা ঠিকে-ঝি পেতে অসুবিধে হবে বলে ওদের মুখ থমথম করছে।

অথচ ওরা জানে না, ওই অসুবিধেটুকু কিছুই নয়। বজ্রের মত একটা কঠিন শব্দ ওঁর

হাতের মুঠোয় রয়েছে। বলবেন বলে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। বলার সুযোগ হয়নি। এখনই যদি সেই শব্দটা উচ্চারণ করেন সমস্ত বাড়িটা মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে, মৃত্যুর মত নিঃশব্দ হয়ে যাবে।

না, বলবেন না। অন্তত এখন নয়।

ছয়

দীনেনবাবুর জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই। একটা দিনের সঙ্গে আরেকটা দিনকে পৃথক করার মত কিছুই ঘটে না।

প্রতিদিনের মতই ওঁর বিছানার ধারে টুলটার ওপর এক কাপ চা রেখে গেল চারু। বললে, তোমার চা।

এ কাজটা কোনও কোনও দিন চারুর শরীর খারাপ থাকলে তিপুই করে। ও কাছে থাকলে পিঠের কাছে দুটো বালিশ দিয়ে বাবাকে বসিয়ে দিয়ে যায়। টুলটা কাছে টেনে দেয়। যাতে ডান হাত বাড়িয়ে কাপটা তুলতে নামাতে পারেন। এখন পারেন।

তিপু কিংবা চারু কাছে না থাকলে এক হাতে ভর দিয়ে দীনেনবাবু নিজেই শরীরটা টেনে টেনে পিছিয়ে নেন, একটু একটু করে উঠে বালিশটা পিঠে গুঁজে নেন। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দেন। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে যেন বেঁচে থাকার সুখ উপভোগ করেন।

তিপু সকালে উঠেই বললে, মা, বাড়িওয়ালা কি-সব বলাবলি করছিল, কাকে যেন বলছিল, উকিলবাবু আসুন তারপর বন্দোবস্ত হবে। উকিল কেন বলো তো ?

অমলেশ গোস্বামীকে ওরা বাড়িওয়ালাই বলে আসছে। লোক অতি সজ্জন, ভাড়া বাড়াননি, উঠে যাওয়ার কথা কোনও দিন বলেননি। তিপুও যে ওঁকে বাড়িওয়ালা বলে তাও তাচ্ছিল্য করে নয়। ওটাই চলে আসছে। তেমনি কেউ যখন ভুল করে ভেবেছে বাড়িটা ওদের, তিপু বলে উঠেছে, না না আমরা ভাড়াটে। ভাড়াটে পরিচয়ের মধ্যে কোনও গ্লানি আছে তিপুর মনে হয়নি। কিন্তু একটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে আসছে, বিশেষ করে বাবা পঙ্গু বলেই ভয় আরও বেশি। উকিলের কথা শুনেই ঈষৎ বিচলিত না হয়ে পারল না। একদিন দোতলার ভাড়াটে বাড়িওয়ালাকে কি-সব বলেছিল, কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অবশ্য সামান্যই। অমলেশবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ, চুপ করে গিয়েছিলেন।

তিপু ভাবল কথাটা দোতলার ভাড়াটেকে বলা। তাই বিচলিত হয়েছিল। উকিলটুকিল মামলা মকদ্দমাকে বড় ভয়। আর একজন ভাড়াটের সঙ্গে বাড়িওয়ালার সম্পর্ক খারাপ হলে আরেকজনের সঙ্গে হতে কতক্ষণ।

সে জন্যেই মাকে বললে, উকিল কেন বলো তো ?

চারু কোনও গুরুত্ব দিল না। বললে, ওঁদের কোনও ব্যাপার হবে !

সব কথাই তিপু এখন মাকে বলে। বাবাকে নয়। বাবা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, ডানদিকে ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছেন। ওভাবে বসলেই ওঁর সোয়াস্তি।

সকালে চা-টুকু উনি বেশ উপভোগ করেন। সকাল চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু চুপচাপ পড়ে থাকেন। কাউকে ওঠাতে সাহস পান না। ওঁর ঘুম নেই বলে সকলের ঘুম ভাঙানো চলে না। চারু বিরক্ত হত। তিপু বিরক্ত হত। তারপর থেকে চুপচাপ পড়ে থাকেন, কাউকে ওঠান না।

চা খাওয়া হয়ে গেলে তিপু ওঁকে ধরে-ধরে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

বন্ধ ঘর থেকে এসে এক টুকরো আকাশ দেখতে পেলেন। খোলা বাতাস গায়ে মাখলেন। তারপর ঠায় তাকিয়ে রইলেন পারিজাত গাছটার দিকে। পারিজাতের পাতা-পাতা ফুলগুলো ঝরে গেছে। বড় ক্ষণস্থায়ী। দিন কয়েক থাকে, তারপর শুধুই সবুজ পাতা। ওপাশে একটা পেঁপে গাছ। এটুকুও না থাকলে কিই বা দেখতেন।

ওঁকে বসে থাকতে দেখে দুর্গা আর লছমি এগিয়ে এল।

হাসি-হাসি মুখে বললে, বুড়াবাবু, আজ সব লোগ বস্তি ছেড়ে চলে যাবে।

দীনেনবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, চলে যাবে ? কেন রে ?

হাসতে হাসতে দুর্গা বললে, তিন নম্বর বাবু বহুত রুপেয়া দিচ্ছে।

দীনেনবাবু আশ্চর্য হলেন। —তোরাও যাবি ?

দুর্গা ঘাড় নাড়ল।

দীনেনবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওরাই তো ওঁর সঙ্গী, ওঁর বন্ধু। বস্তির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তবু তো কথা বলতে পেতেন। তারাও চলে যাবে ?

ডাকলেন, তিপু, ও তিপু, শুনে যা।

তিপু এল। জিগ্যেস করল, বসতে অসুবিধে হচ্ছে ? ঘুরিয়ে দেব ?

দীনেনবাবু হেসে বললেন, না রে। ও ঠিক আছে।

তারপর বললেন, শোন ওরা কি বলছে। তারপর নিজেই বললেন, ওরা নাকি আজ বস্তি ছেড়ে চলে যাবে।

দুর্গা খুশির হাসি হেসে বললে, হাঁ দিদি, বহুত রুপেয়া দিচ্ছে।

তিপুরও খারাপ লাগল। এতকাল ওদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল, এক এক সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় গালাগালিও দিয়েছে। সবচেয়ে রাগ তো দক্ষিণের জানালা দুটো বন্ধ রাখতে হয় বলে। চিৎকার চেঁচামেচি, অশ্রাব্য গালাগালি তো কানে আসতই। তার ওপর উপদ্রব ছিল উকুন।

তিপুর খুশি হয়ে ওঠারই কথা। ওদের বাড়িটা পার হয়েই তো বস্তির মুখ। তার ও-দিকে নিত্যদিন জটলা। বাচ্চাগুলো রাস্তাতেই প্রাতঃকৃত্য সারে।

প্রাতঃকৃত্য শব্দটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। শব্দটা নয়, মনুর কথাটা। মনুর কথা আজকাল মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।

বলেছিল, ফুটপাথে রাতঃকৃত্য আর রাস্তায় প্রাতঃকৃত্য, এ কি একটা জীবন।

মনু ওর এক বন্ধুকে বলছিল, তিপু ঘরের ভিতরে কি কাজ করতে করতে শুনেছিল। শুনে হেসে ফেলেছিল।

মনু প্রায়ই বস্তির লোকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলত। তিপু তখন রেগে যেত।

কিন্তু ওরা চলে যাবে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক অসুবিধে অনেক মনোমালিন্য রেষারেষির পর যখন একটা পরিবার ভেঙে যায়, একজন চলে যায়, তখন যেমন বুকের ভেতর একটা অনুতাপ দগ্ধে মরে এও যেন তেমনই। পাশাপাশি থাকতে থাকতে ওরা যেন শরিক হয়ে গেছে।

কথা শুনে চারুও চলে এসেছে। —কোথায় যাবি রে ? প্রশ্ন করল।

লছমি বললে, কি জানি।

দুর্গা বললে, সুকেশ বলেছে খুঁজে দেবে।

তারপর হাসি-হাসি মুখে বললে, বহুত রুপেয়া দেবে, মা বলেছে একটা দুকান লাগাবে।

দীনেনবাবু শুনছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি নিয়ে বাঁচব রে ! ওদেরও কেড়ে

নিল।

তিপু কোনও কথা বলল না। কেড়ে নেওয়ার কথায় ওর বুক নিঙড়ে একটা যন্ত্রণা বেরিয়ে আসতে চাইল।

ও তো দেখেছে বস্তির লোকদের ডেকে ডেকে বাবা কিভাবে গল্প করে। দেখেছে পাড়ার লোকদের, ভদ্রলোকদের ডাকলেও কেউ বাবার ডাকে সাড়া দেয় না। সকলেই ব্যস্ত। সকলেই এড়িয়ে যেতে চায়। দাঁড়িয়ে দু মিনিট বাবার সঙ্গে কথা বলার কারও সময় নেই। সময় আছে শুধু বস্তির লোকদের।

ওরা সমবেদনা জানায়, কথা বলে, হঠাৎ রাত্তিরে ওষুধ আনতে হলে ওদের যে কোনও একজনকে ডাকলেই হল। কেউ না কেউ এসে বলবে, ছি ছি, দিদি এতো রাতমে কোথায় যাবে বুড়াবাবু, দাওয়াই আমরা এনে দিচ্ছি।

বাবার কাছে ওরাই তো আপন লোক।

তিপুর মনে পড়ে গেল মনুও ওদের আপন ভাবত। তবু ভালও লাগছিল, বাড়ির পাশ থেকে জঞ্জাল সরে যাচ্ছে বলে। জঞ্জালই তো।

ঘরের ভিতর ঢুকে দক্ষিণের জানালা দুটো খুলে বস্তিটা দেখতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু চট্ করে খোলা গেল না। এতদিন বন্ধ থেকে থেকে ছিটকিনিতে জং ধরে গেছে। খোলে কার সাধ্য। একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে ঠুকে ঠুকে কোনওরকমে খুলল জানালাটা।

খুলেই দেখল বস্তির লোকরা হুটোপাটি করে ঘর ভাঙছে, মেয়েগুলো ঘরের ভিতরের জিনিসপত্র বের করে এনে একজায়গায় জড়ো করে রাখছে।

মাকে ডাকল।—মা, এসো এসো, দেখে যাও।

চারুও এল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল।—যাক্, এতদিনে পাপ বিদেয় হল।

তিপুর শুনতে ভাল লাগল না। আসলে মা তো বোঝে না। বাবা ওদের ডেকে ডেকে কথা বললে মা বিরক্ত হত।—ওইসব লোকদের বাড়ির সামনে ডেকে আনাই বা কেন, ওদের সঙ্গে গল্প করাই বা কেন।

আসলে মার বিরক্তি তো তিপুর জন্যেই। বাড়িতে একটা বড়সড় মেয়ে রয়েছে, বিয়ে দিতে পারেনি, সে-বাড়ির সামনে ওইসব ছোটলোকরা এসে দাঁড়াবে কেন, গল্প করবে কেন।

প্রথম প্রথম তিপুরও খারাপ লাগত। ভয় করত। কে জানে, পাড়ার কেউ কখন কি বলে বসে।

এখন আর ভয় পায় না।

—তিপু, ও তিপু! শিগগির আয় একবার, শুনে যা।

দীনেনবাবু ডাক দিলেন। এমনভাবে ডাকলেন যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেছে।

তিপু ছুটে এল।

—দ্যাখ দ্যাখ, ওরা সবাই কি সব মালপত্র নিয়ে...

তিপু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তাই বলো। তুমি এমনভাবে ডাকলে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হেসে বললে, ভাবলাম পড়ে গেছ।

—পড়েই তো গেলাম রে। আর তো কেউ-ই রইল না।

একটু থেমে বললেন, দ্যাখ তো কি ব্যাপার, একটু বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় না।

তিপু দরজা পেরিয়ে দু পা এগিয়ে দেখল।

অমলেশ গোস্বামী একটা টেবিল পেতে বসেছেন, পাশে দুজন লোক। টেবিলের ওপর একটা ব্যাগ থেকে কড়কড়ে নোট গুনে গুনে দিচ্ছেন, আর পাশের ভদ্রলোক

স্ট্যাম্প-পেপারে টিপসই নিচ্ছেন।

এসে বলল—টাকা দিচ্ছে, আর ওরা বেরিয়ে আসছে।

দীনেনবাবু শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করলেন, হুঁ।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, দড়ির খাটিয়া চট-বিছানা হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে একে একে চলে যাচ্ছে ওরা। কোথায় যাবে কে জানে।

দুর্গা বলেছে, ডেরা খুঁজে নেবে। এত টাকা! ওই টাকা নিয়ে দোকান খুলবে।

একে একে সকলেই চলে গেল। আর তখনই ইটভর্তি একটা ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়াল। ইট নামাতে শুরু করল।

অমলেশ গোস্বামীকে দেখতে পেলেন দীনেনবাবু। দুজন রাজমিস্ত্রিকে কি যেন বোঝাচ্ছেন।

দীনেনবাবু ডাকলেন, অমলেশবাবু!

অমলেশবাবু দিব্যি হাসি হাসি মুখে ফিরে দাঁড়ালেন। —কিছু বলছেন?

—ইট কি হবে? প্রশ্ন করলেন দীনেনবাবু।

ওঁর কথাগুলো কেমন জড়ানো। সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর শুধু বেঁচেই ফিরে এসেছেন, বাঁ-দিকটা গেছে, কথাও স্পষ্ট হয় না। তিপু বোঝে, চারু বোঝে।

অমলেশবাবু বুঝতে পারলেন না। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, অ্যাঁ?

—ইট কি হবে?

এবার বুঝতে পারলেন। বললেন, পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছি। আপদ বিদেয় হয়েছে, তাই পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছি।

বাড়িটার পাশে ছেড়ে-রাখা জায়গাটাই হয়ে উঠেছিল বস্তির গলি। ও জমিটুকুও অমলেশবাবুর। পাঁচিল তুলে সেই রাস্তাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

বললেন, ও ব্যাটাদের কোনও বিশ্বাস আছে নাকি। টাকাও নিল, আবার সুযোগ বুঝলেই ঢুকে পড়বে। সে জন্যে পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছি।

সত্যিই দুজন রাজমিস্ত্রি লেগে পড়ল দেয়াল তুলে দেওয়ার কাজে।

ফিরে এলেও ওরা দেখবে সামনে দেয়াল উঠে গেছে।

দেয়াল। ওই দেয়ালটা পার হতে পারেনি বলেই তো একটা টগবগে তাজা ছেলে ফিরে আসতে পারল না।

দীনেনবাবুর মনে পড়ে গেল। চোখ বুজে সেই পুরনো দিনের স্মৃতিতে ফিরে গেলেন।

কি আনন্দ নিয়ে ফিরেছিলেন। কি অসহ্য কষ্ট, কত ভয়। শেষে মনু ছাড়া পেল। মনুকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারলেন।

সুধাকান্ত সাবধান করে দিয়েছিলেন। —ছাড়া তো পাচ্ছে, কিন্তু সাবধানে আনবেন। সাবধানে রাখবেন।

মনু ফিরে এল।

চারুর মুখে হাসি ফুটল বহুদিন বাদে। —যা, ভাল করে সাবান মেখে চান করে নে মনু।

তিপু বললে, ভাইয়া, আর যেন ওসব দিকে যাসনে।

মনু ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কেমন যেন একটু লজ্জিত।

—তুই হাসছিস। বাবা-মার কি করে যে দিনগুলো গেছে তুই তো জানিস না।

চারু বললে, ওসব কথা এখন থাক। চল দেখি...

ওকে ঠেলে স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দিল চারু। সাবান মাখাল, জল ঢেলে দিয়ে গামছা

দিয়ে গা মুছিয়ে দিল। যেন ছোট্ট পাঁচ-সাত বছরের ছেলেটি।

চারুর চোখের দৃষ্টিতে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছিল। যেন হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে। যেন মরা ছেলে বেঁচে উঠেছে।

তিপু বললে, কি রোগা হয়ে গেছে, মা!

মা আর বাবা সেই সক্কাল বেলায় চলে গিয়েছিল। ছেলে ছাড়া পাবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবে।

তাই তিপু সকাল থেকে রান্না করে রেখেছিল। ভাই এতদিন পরে ফিরবে, এতদিন বাদে বাড়ির রান্না খাবে।

জেলখানায় তো শুনেছে লপসি না কি যেন খেতে দেয়। মনুকে কি খেতে দিয়েছে কে জানে। ওকে কি থানার লক্-আপে রেখেছে, না জেলে, তাও বাবাকে জিগ্যেস করতে পারেনি। বাবা নিজে থেকে যা বলত তার বেশি কিছু জানতে চাইত না। বলতে গেলেই বাবার চোখে জল এসে যেত।

খেতে বসে মনু বলে উঠল, কি করেছিস রে। এ তো নেমন্তন্ন বাড়ির চেয়েও বেশি।

চারু বললে, খা বাবা, খা। কতদিন খেতে পাসনি :

দীনেনবাবুও এসে সামনে বসলেন।

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, সত্যি বল, খুব অত্যাচার করেছে ?

মনু কোনও কথা বলল না। মুচকি মুচকি হাসল।

চারু খপ্ করে মনুর হাতখানা ধরে ফেলল।—কথা দে, ওসব দিকে আর যাবি না কোনও দিন।

মনু সম্মতি জানিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

দীনেনবাবু ওর হাতে-পিঠে হাত বোলালেন। নিজের মনেই বললেন, গ্রহ, গ্রহ।

সেদিন অতীশবাবুর কাছে মনুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রণাম করিস।

কেন, তা প্রশ্ন করেনি মনু। বাধ্য ছেলের মত অতীশবাবুকে প্রণাম করেছে, ফেরার পথে সুধাকান্তকেও।

তারপর সব ঠিকঠাক, সব শান্ত।

আবার পড়াশুনো শুরু করেছিল। মাঝখানে কয়েকটা সপ্তাহ যেন শুধুই দুঃস্বপ্ন।

তবু দীনেনবাবুর মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল।

মনু কেন যে ছাড়া পেল তাও স্পষ্ট জানতেন না। কখনও মনে হয়েছে অতীশবাবুর চিঠি পেয়ে ডি সি যে ফোন করে দিয়েছিলেন সেটাই কারণ। ও সি বাইরে প্রকাশ না করলেও তাঁর নির্দেশ মান্য করেছে। কখনও মনে হয়েছে থানা থেকে শার্ট আর ধুতি পরা যে লোকটা বেরিয়ে এসেছিল, বলেছিল, 'আমরা তো আছি', মাঝে মাঝে টাকা নিত, সে লোকটাই ছাড়িয়ে এনেছে।

সেই লোকটিই বলেছিল, ব্রিলিয়েন্ট ছেলে মশাই আপনার। যেমন ব্রিলিয়েন্ট তেমনি জিদ। একটাও কথা বের করতে পারেনি।

ও সি বলেছিলেন, আমি তো বলেছিলাম, অ্যাকশন স্কোয়াডে না থাকলে ছাড়া পাবে। ছিল না, প্রদীপ্ত অ্যাকশন স্কোয়াডে ছিল না।

বলেছিলেন, ভদ্রঘরের একটা শিক্ষিত ছেলে, তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করব কেন।

আসলে কেন যে ছাড়া পেল দীনেনবাবুর কাছে তা অস্পষ্ট। কিন্তু সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সুধাকান্ত এসে বললেন, বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। এখানে রাখবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেলেন দীনেনবাবু।

বাইরে পাঠিয়ে দিন। কেন ?

একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল। তবে কি মিথ্যে গর্ব করেছেন, যে একটা কথাও ওরা বের করতে পারেনি। নাকি সুধাকান্ত সে-কথাই ভাবছেন। তবে যে লোকটা বলল কিছু বের করতে পারেনি। আই বি-র একজনও তো সে-কথাই বলেছে।

মনুকে জিগ্যেস করলেই সব জানা যেত। কিন্তু জিগ্যেস করতে পারেননি। অস্বস্তি লেগেছে। যদি বলে ফেলেই থাকে এমনকি দোষ করেছে। অসহ্য অকথ্য অত্যাচার হলে সব মানুষই বলে ফেলে। যে দু-চারজন বলে না, তারা সাধারণ মানুষ নয়। বাঁচতে কে চায় না। বাঁচার জন্যে মানুষ সব পারে।

বাঁচাটাই তো সুখ। প্রাণ দেওয়া তো শুধু গর্ব। না বাঁচলে সে গর্ব নিয়ে কি হবে। দীনেনবাবু তার বেশি আর কিছু ভাবতে পারেন না। ভেবেছিলেন, মনু বেঁচে আছে এটুকুই এখন সুখ।

—হ্যাঁ রে, তোর কি এখানে থাকতে ভয় করছে? কোথাও দূরে পাঠিয়ে দেব? কানপুরে তোর মাসির কাছে? এর বেশি আর কি জিগ্যেস করবেন।

মনু চুপ করে রইল।

তারপর বললে, বাবা, বিশ্বাস করো ভয় পাবার মত আমি কিছু করিনি। কিন্তু...

—কিন্তু কি ? বল তুই ? উৎকণ্ঠার সঙ্গে দীনেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

মনু বললে, আমি ছাড়তে চাইলেও দল ছাড়বে না।

—তা হলে বাইরেই চলে যা। না হয় আমি গিয়ে রেখে আসব।

সে রকমই ভেবে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন একটু সুযোগসুবিধে হলেই ওকে কানপুরে দিয়ে আসবেন।

তবু সংশয় বা ভয় ছিলই। ওঁরা কেউই মনুর মুখের কথাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

দীনেনবাবু তো নয়ই। ওঁর কেবলই মনে হচ্ছিল সুযোগ পেলে কিংবা স্বাধীনতা পেলে মনু আবার গিয়ে দলে ভিড়বে। কিংবা দলই ওকে টেনে নিয়ে যাবে। এখানে তবু তো চোখের সামনে রয়েছে, কানপুরে গিয়ে আবার যোগাযোগ করবে কিনা কে জানে।

তিপুরও সন্দেহ ছিল। তাই সান্ত্বনার ছলে একদিন বললে, ভাইয়া, ওসব করে বিপ্লব হয় না, এখন বুঝছিস তো ? ভুল করেছিলি এখন মানছিস ?

মনু হাসল। বললে, আমি তো ভুলই করেছি। জানতাম না আমি এ-সবের যোগ্য নই।

তিপু বিস্মিত হয়ে বললে, পথটা ভুল নয় ?

মনু হেসে বললে, কে বিচার করবে রে দিদি।

বলে উঠে গেল।

দীনেনবাবু শুনলেন, আতঙ্কিত হলেন। এ এক অদ্ভুত নেশা, এ এক বিচিত্র পথ। যাওয়া যায়, ফেরা যায় না। ব্যক্তির কোনও দাম নেই।

সে জন্যেই কানপুরে পাঠানোর ব্যাপারে গড়িমসি করছিলেন।

তারপর কি যে ঘটে গেল।

এখন তো শুধু জালে-ঘেরা বারান্দায় বসে থাকা। একটু সবুজের দিকে তাকানো। পারিজাত গাছটা, পেঁপে গাছটা।

আর তো সকলেই পালিয়ে যায়। কেউ দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে না।

বস্তিটা ছিল, একটা বড় ভরসা। বস্তির ছেলেমেয়েদের ডাকলে এসে কথা বলত। তারাও চলে যাচ্ছে।

অমলেশবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবার আগে একবার এসে দাঁড়ালেন দীনেনবাবুর বারান্দার সামনে। হাসতে হাসতে বললেন, ব্যস, কমপ্লিট, দেয়াল তুলে দিয়েছি।

—কোথায় গেল সব? দীনেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

অমলেশবাবু বললেন, তার আমি কি জানি, যেখানে খুশি যাক।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করতে করতে চলে গেলেন।

'দেয়াল তুলে দিয়েছি।' কথাটা মাথার মধ্যে পাক খেল।

মনুর সামনে পিছনে এমনি দেয়াল তোলা ছিল।

একটা মানুষ বাঁচার জন্যে পালাতে চাইছে, কিন্তু দেয়াল টপকে পার হতে পারছে না। এই দৃশ্যটা কতবার দেখেছেন দীনেনবাবু। মানসিক যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারেননি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তিপু তখন মশারি টাঙাচ্ছে। মনুও শুয়ে পড়বে ভাবছে।

—প্রদীপ্ত, প্রদীপ্ত আছিস। হঠাৎ কে যেন ডাকল।

—কে? মনু শুনতে পেয়েই কৌতূহলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দীনেনবাবু সচকিত হয়ে উঠলেন।

ওঁর ধারণা ছিল মনুর বন্ধুবান্ধবরা তাকে ত্যাগ করেছে। ছাড়া পাওয়ার পর থেকে কেউ আসেনি। হয়তো ভয়ে। পুলিশের ভয়ে।

তার জন্যে মনে মনে খুশি ছিলেন। তাদের কাছ থেকে যতদূর সরিয়ে রাখা যায়।

তাই ডাক শুনে চমকে উঠেছিলেন, এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মনুরই বয়েসি দুটি ছেলে।

—কি রে, কলেজ-টলেজ যাচ্ছিস না? যাবি না?

ছেলে দুটি হেসে হেসে বললে। বারান্দার আলোয় তাদের মুখ স্পষ্ট দেখাও গেল না।

মনু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছিল।

চারু আর তিপুও নিশ্চিন্ত হল। তবু তিপু বললে, ভাইয়া দেরি করিস না, দশটা বেজে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত বোধহয়। হঠাৎ সচকিত হয়ে দীনেনবাবু দেখলেন মনু দরজার সামনে নেই।

ভাবলেন হয়তো গল্প করতে করতে একটু দূরে সরে গেছে।

দীনেনবাবু তখন হাঁটতে পারতেন, দৌড়তে পারতেন। তখন এমন পঙ্গু আর অথর্ব ছিলেন না।

দ্রুত পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে আর ছেলে দুটিকে খুঁজলেন।

আর সেই মুহূর্তেই একটা আর্তনাদ শুনতে পেলেন।

—মনু। মনু। চিৎকার করে রাস্তার অন্ধকারের দিকে ছুটে গেলেন।

গুলির শব্দ বুঝতে পারেননি। শুধু আর্তনাদ শুনেই ছুটে গেলেন। মনে হল মনুর আর্তনাদ।

বস্তির লোকরাও অনেকে ছুটে গেল।

দু-তিনখানা বাড়ির পরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িখানার সামনের ফুটপাথে তখন ভিড় জমে গেছে।

দীনেনবাবু তখনও চিৎকার করছেন, মনু, মনু।

বস্তির একজন ভিড় থেকে দৌড়ে এসে বললে, বাবুজি আপনার লেড়কা। তখন কেউ বুড়াবাবু বলত না।

কে একজন বললে, দুটো ছেলেকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি।

উল্টোদিকের ফুটপাথে টিউবওয়েলের পাশে বসে ছিল দুটো ভিখিরি, তারা বললে, পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়েছিল। তার আগেই গুলি এসে লাগল তার পিঠে। ঝপ করে পড়ে গেল লাশটা।

লাশ।

চমকে উঠেছিলেন দীনেনবাবু।

তারপর সব শেষ। দীনেনবাবু নিঃস্ব হয়ে গেলেন। একটা পুরো পরিবার।

পরের দিন, নাকি তারও অনেক পরে, দীনেনবাবুর এখন আর মনে নেই, এসে দেখেছিলেন পাঁচিলের গায়ে রক্ত লেগে আছে।

দেয়াল টপকে পালাতে গিয়েছিল, পারেনি।

এখন আর সে-সব কথা ভাবতে পারেন না। কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

শুধু কষ্ট হয় মনুর জন্যে। বেচারা বাঁচতে চেয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু জানত না বাঁচার পথ নেই। সামনে উঁচু দেয়াল। পার হওয়া যায় না।

একজন বলেছিল, ওটাই তো পুলিশের টেকনিক। পার্টির ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া। আসলে ছেড়ে দিয়েছিল মারবে বলেই।

এ-সব কথার তখন আর কোনও মূল্যই নেই দীনেনবাবুর কাছে।

—তুমিই দেরি করলে ওকে কানপুরে পাঠাতে। চারু একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল।

আর দীনেনবাবুর মনে হয়েছিল, আমিই দায়ী।

গুম হয়ে বসে থাকতেন। কি যে ভাবতেন নিজেও জানেন না। শুধু চিন্তা আর চিন্তা।

তারপর কি হয়েছিল কিচ্ছু মনে নেই।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। বাঁ হাতটা নাড়তে পারেন না, বাঁ পা ফেলতে পারেন না। একটা দিক প্যারালিসিসে পঙ্গু। বাঁ চোখটাও কেমন ছোট হয়ে গেছে, আয়নায় দেখেছেন।

সকলে মিলে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

তারপর থেকে এই ঘর, এই বিছানা আর জাল দিয়ে ঘেরা এই বারান্দার চেয়ারে বসে থাকা। একটু আরাম হবে বলে দুটো গদি করিয়ে দিয়েছে তিপু। ধরে ধরে এনে বসিয়ে দেয়। এখন এটাই দীনেনবাবুর পৃথিবী।

পারিজাত গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। গাছ পালায় না। আর সকলেই পালিয়ে যায়, এড়িয়ে যায়।

বস্তির লোকগুলো ছিল, তারাও চলে গেল। কোথায় গেল, কে জানে।

ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে একবার দেখবেন। সে উপায়ও নেই।

কে একজন, পাড়ার কোনও ভদ্রলোক, ওঁর বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে একবার যেন বলছিলেন, বস্তিটার জন্যে পাড়ায় টেঁকা দায়, খুনোখুনি মারামারি লেগেই আছে।

দীনেনবাবুর মনে হয়েছিল খুনোখুনি শুধু বস্তিতে নয়। তফাত এই, তোমরা তার অন্য নাম দাও।

সাত

সুধাকান্ত খুব সকালে মর্নিং ওয়াক করতে বের হন। এদিকের রাস্তাগুলো যত না চওড়া, অনুপাতে ফুটপাথ আরও চওড়া। এদিকটা তো গড়ে উঠেছে অনেক পরে, তখন সি আই টি হয়েছে, তার মাথায় যোগ্য লোক ছিল, নতুন যা কিছু গড়ে উঠছে তার পিছনে তখন সত্যিকার প্ল্যানিং ছিল। অর্থাৎ প্ল্যানের পিছনে বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি দুটোই ছিল। তাকেই তো প্ল্যান বলে। একালে প্ল্যান মানে একটা টাকার অঙ্ক, সেটা যেন-তেন-প্রকারেণ খরচ করে দেওয়া চাই। অন্তত সুধাকান্তর তাই মনে হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়ে একাই বেরিয়ে পড়েন। একটা বাঁধা ছক আছে, এ-রাস্তা সে-রাস্তা হয়ে পার্কে গিয়ে ঢোকেন, পার্কে একটা চক্কর দেন, তারপর ফিরে আসেন। অত সকালে বৃদ্ধরাও আসে না, সুধাকান্ত প্রৌঢ়। যুবক বয়েস থেকে শরীর ঠিক রাখার জন্যে সকালে খানিকটা দৌড়নোর অভ্যাস ছিল ওঁর। বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অভ্যাস বদলে গেল, নাকি পাড়া বদলে এখানে এলেন তাই দৌড়নো বন্ধ হল তা মনে নেই। আগের পাড়ায় বাড়ির পাশেই পার্ক ছিল, এখানে এসে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে তবে পার্ক।

এ-সময় বাড়িতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলেই ঘুমোয়। তাই বাইরের গ্রিল-দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান। একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে, উনি ফিরে আসার আগে দরকার হলে সেটা দিয়েই দরজা খোলা হয়। দরকার বড় একটা হয় না, হঠাৎ কোনও দিন ঠিকে কাজের মেয়েটা ভোরসকালে এসে পড়ে, ডাকাডাকি করে, তখন স্ত্রী অসীমাকে খুলে দিতে হয়। তবে সে এত সকালে আসে না। বরং দেরি করেই আসে, আর সেজন্যে নিত্যদিন অসীমা রাগারাগি করে। একদিকে অফিসের রান্নার তাড়া, অন্যদিকে বাসন-মাজা কাপড়-কাচার জন্যে বাথরুম আটকে থাকে। তা নিয়ে আরেক দফা চেঁচামেচি। তা ছাড়া ঘর মোছার জন্যে সুধাকান্তকে একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর করতে হয়।

সকালের বেড়ানোর সময়টাই শুধু শান্তি। সে শান্তিও চলে গেছে।

আগে গ্রিল-দরজায় তালা লাগিয়ে চলে আসতেন, ভাবনা ছিল না। ইদানীং আরেক দুশ্চিন্তা দিব্যকে নিয়ে।

ওকে এক রকম আটকে-আটকে রাখছেন। তাও পারছেন না। একটা অ্যাডাল্ট ছেলেকে তো জেলখানার মত আটকে রাখা যায় না।

দুর্ভাবনা সেজন্যেই। উনি বেরিয়ে আসার পর যদি দিব্য উঠে পড়ে, হাতড়ে-হাতড়ে মার বালিশের তলা থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা বের করে নেয় তা হলে আবাব সেই নেশার পাল্লায় গিয়ে পড়বে।

এত চেষ্টা করে এত টাকা খরচ করেও কিচ্ছু করতে পারছেন না।

শুধু ওই একটা কারণে সুধাকান্তর জীবন এখন অর্থহীন হয়ে গেছে।

এতদিন দুর্ভাবনা ছিল অরুণার বিয়ে নিয়ে। লেখাপড়া, চাকরি, যাই করুক না কেন, বাবা-মার মনে হয় মেয়ের বিয়েটাই আসল গন্তব্য। অরুণা একটা স্কুলে টিচারি করে, অর্থাৎ সময় কাটানোর একটা পথ হয়েছে। কিন্তু বিয়ে না দিয়ে কোনও শান্তি পাচ্ছেন না। দু-একটা সম্বন্ধও আসছিল। তারই মধ্যে দেখে-শুনে কোথাও একটা ঠিক করে ফেলবেন ভাবছিলেন। সেই সময়েই এই বজ্রাঘাত।

ভাসা-ভাসা জানা ছিল, অফিসে গল্পও শুনেছেন, কিন্তু কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, এ-সব নেশা যারা করে, তারা ঠিক স্বাভাবিক পরিবারের ছেলেমেয়ে নয়। কখনও মনে হয়েছে তারা নিচুতলার মানুষ, হঠাৎ ওপরে উঠে এসেছে। কখনও মনে হয়েছে

বড়লোকের বখাটে ছেলেমেয়েরাই এ-সব করে। কখনও ভেবেছেন বাবা-মার দাম্পত্য জীবনে কোথাও কোনও গলদ না থাকলে এ-সব সম্ভব নয়।

ওঁর ধারণা যে কতখানি ভুল বুঝতে পারলেন।

অরুণা রেগে গিয়ে বললে, আমি বারবার তোমাদের বলেছি, তোমরা কান দাওনি।

সুধাকান্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই আবার কবে বলেছিস?

—কেন? বলিনি, ও টাকা চুরি করে।

টাকা চুরির কথা অবশ্য কয়েকবারই বলেছে অরুণা। কিন্তু দিব্যকে সন্দেহ করেননি। অসীমা বরং কাজের মেয়েটাকেই ধমকধামক দিয়েছে।

তারপর তো সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। তখনও বুঝতে পারেননি।

শেষে দিব্যর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়লেন। মনে হল জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। সামনে যেন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ দৈত্যের চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দিব্যর মুখের দিকে তাকাতেও যেন ঘৃণা হয়।

তবু তো দিব্য তাঁর ছেলে। তাকে শেষ হয়ে যেতে দেবেন কি করে।

এতদিনের মায়া মমতা, তাকে নিয়ে গর্ব, তাকে নিয়ে স্বপ্ন, সব যে এভাবে এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে কোনও দিন ভাবেননি।

কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

অসীমা, সুধাকান্ত, অরুণা—তিনজনে একত্র হলেই একটাই চিন্তা।

অসীমা কেঁদে ফেললেন, তুই শেষে এরকম একটা ছোটলোকের নেশা ধরলি বাবা!

সুধাকান্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, বস্তি, বস্তি, বস্তিরও অধম।

দিব্য কোনও কথা বলল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণা বললে, দেখলে, ও এখন আর কাউকে গ্রাহ্যই করে না।

সুধাকান্ত বললেন, রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই, ওকে বুঝিয়ে দেখতে হবে।

অরুণা হাসল।—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তুমি ওকে ওই কদর্য নেশা ছাড়াবে? তুমি, বাবা, কোনও খবরই রাখো না।

কাউকে বলতেও লজ্জা। আরেক ভয়, জানাজানি হয়ে যাবে।

অরুণা ছিল না তখন। আক্ষেপের স্বরে সুধাকান্ত অসীমাকে বললেন, অরুণার বিয়ে দেওয়াও মুশকিল হবে। ওর তো বয়েস হয়ে যাচ্ছে। উল্টোডাঙার ওখানে তো কথাবার্তা এগিয়েছে, ওরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে...

চোখে জল এসে গেল সুধাকান্তর।

অসীমা বললে, বিয়ে যদি হয়ও ওখানে, বিয়ের পর জানলেও তো কি মনে করবে কে জানে। আমাদের পরিবারকেই হয়তো খারাপ ভাববে। কে জানে, হয়তো অরুণাকেও খারাপ ভাববে।

কার কাছে যে পরামর্শ নেবেন খুঁজে পেলেন না সুধাকান্ত। পাড়ার কাউকে বলা যায় না, ওরা সাতকাহন করে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে রটনা করবে।

অসীমা সাবধান করে দিল।—পাড়ার কেউ যেন জানতে না পারে, ওরাই শেষে অরুণার বিয়ে ভাঙিয়ে দেবে।

কিন্তু একজন কারও তো পরামর্শ দরকার। সুধাকান্তর নিজেকে অসহায় আর দুর্বল মনে হয়। যেন পায়ের তলায় মাটি নেই।

শেষে অফিসের এক বন্ধুকে বললেন। বলতে-বলতে কেঁদে ফেললেন।

—সে কি? চমকে উঠল সুজয়। বললে, ও তো ভয়ঙ্কর নেশা। ব্রেন নষ্ট করে

দেয়। বাঁচে না।

—বাঁচে না? সুধাকান্ত চমকে উঠলেন।

সুজয় সান্ত্বনা দিল। —না না, তা বলছি না। নেশা ছাড়তে না পারলে বাঁচে না।

একটু থেমে বললে, ও নেশা নাকি ছাড়াও যায় না।

সুধাকান্ত বিশ্বাস করলেন না। নেশা নাকি ছাড়া যায় না।

অফিসের ত্রিদিব অত মদ খেত, লিভার অ্যাবসেস থেকে বেঁচে উঠল। তারপর তো একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। সুধাকান্ত নিজেও তো কলেজে পড়ার সময় সিগারেট ধরেছিলেন, পরে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। চেষ্টা করলে আবার ছাড়া যায় না।

সুধাকান্ত দিব্যকে ডাকলেন। —আয়, আমার কাছে বোস।

দিব্য ডাক শুনে এল, বাধ্য সন্তানের মত বাবার পাশে বসল।

সুধাকান্ত ওর পিঠে স্নেহের হাত রাখলেন। বললেন, তুই ছেড়ে দে দিব্য।

দিব্য স্বাভাবিক গলায় বললে, আমি তো পারছি না, অনেক চেষ্টা করেছি। তোমরা ছাড়িয়ে দাও।

দিব্যর গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে গেল। —আমিও ছাড়তে চাই, বাবা।

একটু থেমে বললে, আমি আর পারছি না। ছেড়ে থাকা যে কি কষ্ট।

সুধাকান্ত যেন একটা আশা পেলেন। ছেলে নিজেও ছেড়ে দিতে চায়। তবে আর ভয় কিসের।

—আমি তো শুনেছি অনেক দাম ওসবের, এত টাকা তুই পেতিস কোথায়? সুধাকান্ত জিগ্যেস করলেন।

দিব্য গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, চুরি করতাম। দিদির টাকা চুরি করেছি, বই বেচে দিয়েছি, এমন কি আমার প্যান্ট শার্ট...

সুধাকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ওঁরা অত খবর রাখেননি। বললেন, জামাকাপড় বেচে দিয়েছিস, কি বলছিস তুই?

দিব্য হাসল। যেন কিছুই নয়। বেশ একটা মজা। বললে, দিদিকে বলো না, খোঁজ করে দেখুক।

—শোনো, শোনো। অসীমাকে ডাকলেন।

সব কথা বললেন।

অসীমা সব শুনে কেঁদে ফেললে। —আমার আর বাঁচার একটুও ইচ্ছে নেই, তোর জন্যে আমি আত্মঘাতী হব।

দিব্য হাসল। তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললে, তোমরা আমাকে তালাচাবি দিয়ে ঘরে আটকে রাখো, মা। আমি বলছি, আমাকে আটকে রাখো।

একটু থেমে বললে, আমি এখন একজন স্মাগলার।

সুধাকান্ত চমকে উঠলেন।

—স্মাগলারই তো। টাকার অভাব তাই বন্ধুদেরও নেশা ধরিয়েছি, বেশি ওদের জোগাড় করে দিই। আর যা লাভ হয় তা থেকে নিজে নেশা করি।

হঠাৎ অসীমার হাতখানা ধরল দিব্য। —মা, আমাকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখো, আমাকে একটুও বিশ্বাস কোরো না। আমাকে বাঁচাও।

অফিসের সুজয় খোঁজ নিয়ে একজন ডাক্তারের নাম বলেছিল। সুধাকান্ত তার কাছে একদিন নিয়ে গেলেন।

তিনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠালেন।

সুধাকান্ত ভেবেছিলেন ভাল হয়ে উঠবে। নেশা ছেড়ে দেবে।

হেরোইন শব্দটা ওঁর কাছে এখন একটা আতঙ্ক। অথচ অফিসের অনেকে আলোচনা করে, হাসাহাসি করে। শুনে কখনও লজ্জা, কখনও রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে।

সত্যি হয়তো ছাড়া যায় না।

হঠাৎ ওঁর ছোট মেয়ে করুণা এসে বলেছিল, মা, দাদাকে কই দেখছি না, বোধহয় আবার বেরিয়ে গেছে।

সারা বাড়ি খোঁজা হল। নেই, কোথাও নেই।

ক্ষোভের সঙ্গে অসীমা বললে, ও মরবে, নির্ঘাত মরবে।

ডাক্তারও ওকে বুঝিয়েছিলেন, ছাড়তে না পারলে অবধারিত মৃত্যু।

দু দিন পরে ফিরে এল দিব্য। বাবার মুখের দিকে তাকাল না, মার মুখের দিকে তাকাল না।

সুধাকান্ত নিজেও কিছু বললেন না। মনে-মনে বললেন, মরুক, মরে গিয়ে ও যদি শান্তি দেয়, মরুক ও।

পরক্ষণেই ভয় পেয়ে গেলেন। অনুশোচনা হল, এ কি ভাবছেন উনি। না, দিব্যকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

একটা সাবালক ছেলেকে তো দিনরাত তালাচাবি দিয়ে রাখা যায় না। একটু চোখে-চোখে রাখা, তার বেশি আর কি করবেন।

শুধু এই ভোরবেলায় একটু সাবধান থাকা।

ওঁদের সময়ে এ-সব নেশার নামও শোনেননি। ছিলই না এ-সব।

একটা বেয়াড়া ছেলেকে আটকে রেখে হয়তো ভাল করা যায়। কিন্তু যে নিজেই নেশার হাত থেকে পরিত্রাণ চাইছে তাকে বাঁচানো কঠিন কাজ।

একদিন যন্ত্রণায় চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সুধাকান্ত প্রথমে ভেবেছিলেন, পেটের যন্ত্রণা। কলিক, কিংবা ওইরকম কিছু। ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। ওষুধ খাইয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি।

—কেন খাস ? কি লাভ হয় ? একদিন জিগ্যেস করেছিলেন।

দিব্য বলেছিল, না খেলে বড় কষ্ট হয়। এক একসময় অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

সুধাকান্ত বড় বিভ্রান্ত বোধ করেন। শেষ অবধি ডাক্তারের কাছেই খুলে বললেন সব।

—একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যান। তিনি বললেন। বললেন, এ-রোগ সারানোর ওষুধ আমার কাছে নেই।

সুধাকান্ত সেটাই ভেবে রেখেছেন। ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের খোঁজ করছেন।

একটাই ভয়, দিব্য শুনলেই হয়তো বলে বসবে, তোমরা কি আমাকে পাগল ভেবেছ নাকি !

আসলে সাইকিয়াট্রিস্ট নামটাই একটা আতঙ্ক। সুধাকান্ত নিজেও তো ভয় পেয়েছিলেন, ডাক্তারের মুখে ওই শব্দটা শুনে। বলে উঠেছিলেন, না না, আর সব ব্যাপারে ও কিন্তু নরম্যাল। পাগলামি-টাগলামি কিছু নেই।

ডাক্তার হেসেছিলেন।—আমি কি পাগলা গারদের কথা বলেছি! ওর একটা সাইকোলজিক্যাল কিওর দরকার।

পরে বুঝেছেন। কিন্তু অরুণার বিয়ের চেষ্টা করছেন। উল্টোডাঙার পাত্রটির জন্যে চিঠি দিয়েছেন, একদিন দেখাও করে এসেছিলেন।

ওই একটাই ভয়। ছেলে হেরোইন খেয়ে পড়ে থাকে শুনলে কেউ বিয়ে দিতে রাজি হবে না। পিছিয়ে যাবে। তার ওপর সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে, সে খবর যদি কোনও রকমে পেয়ে যায়, ভাববে পাগলের বাড়ি। কেউ রিস্ক নিয়ে বিয়ে দিতে চাইবে না। বিয়ের পর

জানলে তো আরও ভয়ঙ্কর। হয়তো অরুণার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, এটাই হয়তো শেষ সুযোগ।

গ্রিলের দরজায় তালা লাগিয়ে টেনে দেখলেন সুধাকান্ত, তারপর চাবিটা পকেটে রেখে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়লেন।

তিন নম্বর বাড়িটার সামনে এসে দেখলেন বস্তির মুখটায় নতুন ইটের গাঁথনি উঠে গেছে। পাঁচিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গলিটা। রাস্তার ওপর কিছু জঞ্জাল জমে আছে এদিক-ওদিক। গতকাল বস্তির লোকরা খাটিয়া চাটাই মালপত্র নিয়ে যাবার সময় অপ্রয়োজনীয় বোধে ওগুলো ফেলে দিয়ে গেছে। রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার জমাদার এসে পরিষ্কার করে দিলেই এ-জায়গাটা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। পাড়াটা আবার ঝকমকে হয়ে উঠবে।

বেশ খুশি মনেই এগোচ্ছিলেন।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে পড়তে হল। এ কি অবস্থা হয়েছে ফুটপাথের।

রাস্তাগুলো বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল, দুপাশে চওড়া ফুটপাথ ধরে হেঁটে বেড়াতে যেতেন। এখন আর ফুটপাথে ওঠার উপায় নেই।

দেখলেন, ফুটপাথ জুড়ে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গেছে বস্তির লোকগুলো। এখনও ঘুমোচ্ছে সব। বিশ্রী দৃশ্য দু-একটা। মেয়েদের শোওয়ার ভঙ্গিতে কিংবা বিস্রস্ত বেশবাসে চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। মালপত্র ডাঁই হয়ে আছে এক-এক জায়গায়। একটু দূরত্ব রেখে-রেখে সব বসে আছে। দুর্গন্ধ।

গলির মুখে শুধু একটা জায়গা নোংরা হত। একটা জায়গাতেই ভিড় করে দাঁড়াত সকলে সন্ধেবেলায়। এখন সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ওরা ; চারপাশের রাস্তাগুলোর ফুটপাথ জঞ্জাল হয়ে গেছে।

অমলেশ গোস্বামী তাঁর জমিটা ফিরে পেয়েছেন সমস্ত পাড়াটাকে বস্তি বানিয়ে দিয়ে। অবশ্য ওঁকেই বা দোষ দেবেন কি করে। জমির দাম বাড়ছে হু হু করে। অতখানি জমি, বস্তির লোকরা জবরদখল করে বসে থাকবে, উনিই বা সহ্য করবেন কেন। তা ছাড়া উনি তো ওদের টাকা দিয়েছেন। দেবার তো কথা নয়। তবু দিয়েছেন। অবশ্য বাধ্য হয়ে। না দিলে ওঠাতেন কি করে।

চেনা মানুষদের মুখ। বাচ্চাগুলোও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে-মনে ভাবলেন, গতকাল সময় পায়নি, নতুন ডেরা খুঁজে নিতে পারেনি। সেজন্যেই এখানে মালপত্র রেখে ঘুমিয়েছে। হয়তো আজই, কিংবা দু-একদিনের মধ্যে সরে যাবে। হাতে তো টাকা আছে, এক হাজার না কত করে যেন পেয়েছে। তা ছাড়া, রোদ্দুরে বৃষ্টিতে ফুটপাথে থাকবেই বা কি করে। নিশ্চয় অন্য কোনও বস্তিতে চলে যাবে। কিংবা অন্য কোথাও বস্তি বানিয়ে নেবে।

রাস্তা ধরে পার্কের দিকে চলে গেলেন সুধাকান্ত।

পার্কটা জনহীন, শূন্য। এখনও কেউ বেড়াতে আসেনি। আরও কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধের দল আসবে। কিছুটা হেঁটেই বেঞ্চ দখল করে বসবে। নিজের-নিজের সমস্যার কথা বলবে।

সুধাকান্ত এখন নিজেকে প্রৌঢ়ও ভাবতে পারেন না। রিটায়ারমেন্টের দেরি আছে।

কিন্তু বুঝতে পারছেন ভিতরে-ভিতরে দুটো জিনিস তাঁকে বৃদ্ধ করে দিচ্ছে। দিব্যর এই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার নেশা। আর অরুণার বিয়ে। দুটো একসঙ্গে মিশে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে জটিল করে দিয়েছে।

পার্কে চক্কর দিতে-দিতে দিব্যর কথাগুলো মনে পড়ছিল।

—আমি তো স্মাগলার হয়ে যেতাম।

—সে কি রে ? কেন, তোকে কি কেউ জোর করে ও-লাইনে নিয়ে যেতে চায় ?

দিব্য হেসেছে।—না না। আমার তো টাকা দরকার, অনেক দাম, ওরা বললে তোমারটা ফ্রি দেব, যত খুশি খাও, কিন্তু আমাদের কাজ করে দিতে হবে।

—করিসনি তো ? আতঙ্কের সঙ্গে সুধাকান্ত বলেছিলেন।

ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

একসময় দীনেনবাবুর জন্যে ওঁর সমবেদনা ছিল। ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হত। কিন্তু এই সমবেদনা মানে তো এক ধরনের সুখ। মনে-মনে হয়তো ভাবতেন, আমি ভাগ্যবান।

দিব্য তখনও স্কুল পার হয়নি।

সে-সব দিনের কথা ভাবলে ভয়ে শিউরে ওঠেন। কিন্তু এখন নিজেকে মনে হচ্ছে আরও অসহায়।

দীনেনবাবু ভেবেছিলেন পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনতে পারলেই মনু বেঁচে যাবে। পারেননি, বাঁচাতে পারেননি। সুধাকান্ত নিজের মনের জোর হারিয়ে ফেলছেন, দিব্যকে কি করে বাঁচাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

সারা পাড়া জুড়ে সেদিন চিৎকার কোলাহল। আর্তনাদের শব্দটা সুধাকান্তও শুনেছিলেন ; হয়তো গুলির শব্দ। সকলেই সচকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেউই বুঝতে পারেনি ওটা দীনেনবাবুর ছেলে মনুর আর্তনাদ।

সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে কে একজন বললে, বস্তিটার জন্যে টেঁকা যায় না, আবার কি খুনোখুনি হল কে জানে।

কিন্তু তখনই পাড়ার একটা ছেলে ছুটতে-ছুটতে এসে চেঁচিয়ে বললে, প্রদীপ্তদা খুন হয়েছে, প্রদীপ্তদা।

—কে প্রদীপ্ত ? দোতলা থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করল।

ছেলেটি বললে, দীনেনবাবুর ছেলে। তিন নম্বরের নীচের তলা।

—তাই নাকি ? কে, কে খুন করল ?

ছেলেটি উত্তর দেবার আগেই তার মা পাশের কোনও বাড়ির দোতলা থেকে ধমকের সুরে বললে, অঞ্জন, শিগগির ওপরে চলে আয়।

তার বাবাও ধমক দিল।

সুধাকান্ত শুনেও যেন বুঝতে পারছিলেন না।

তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বললেন, আমাদের মনু ?

অসীমা শুনেই আঁতকে উঠলেন, ইস্, এত চেষ্টা করে ছাড়িয়ে নিয়ে এল।

অরুণার গলাতেও বেদনার সুর। —বাঁচবে তো ? নাকি মেরে ফেলেছে ?

সুধাকান্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

আর তখনই অসীমা বললে, তুমি যেন আবার খবর নিতে যেয়ো না।

পাড়ার কেউই হয়তো যায়নি। সকলেরই ভয় অকারণ একটা খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কিংবা, যারা খুন করেছে, যেই করে থাক, হয়তো তাদের ভয়েই কেউ যায়নি।

পরে দীনেনবাবুর কাছেই শুনেছেন, পাড়ার কেউ তো আসেনি, বস্তির লোকরাই যা এসেছিল। আর পরে খবর পেয়ে আমার আপিসের দুজন।

শুনে সুধাকান্তর নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল।

তার চেয়ে খারাপ লেগেছিল একটা কথা মনে হতেই। ভয়, আমরা প্রত্যেকটি মানুষ কি তা হলে শুধু ভয় নিয়ে বেঁচে আছি? শুধু ভয় এড়িয়ে বাঁচতে চাইছি?

সুধাকান্তর মনে পড়ে গেল, মহীতোষবাবুরা যখন একটা চিঠিতে সই করাতে এসেছিলেন, ওই বস্তির বিরুদ্ধে, তখনও তিনি সই দিতে সাহস পাননি। পরে শুনেছেন অনেকেই সই করেনি।

দিব্যকে নিয়েও তো এখন আরেক ধরনের ভয়। পাড়ায় কেউ যেন জানতে না পারে। অরুণাকে যারা দেখতে আসবে তাদের নিয়েও ভয়, যদি জানতে পারে।

মনুকে নিয়েও দীনেনবাবুর ভয় ছিল। ভেবেছিলেন বাইরে পাঠিয়ে দেবেন।

মনু মারা যাওয়ার পর দীনেনবাবুর দিকে আর তাকাতে পারতেন না। দীনেনবাবু নিজেও কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর বোধহয় একটা মাসও কাটেনি।

হঠাৎ রাত্তিরে তিপু ছুটে এল ওঁর কাছে। সুধাকান্ত যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। মনুর মারা যাওয়ার দু দিন বাদে গিয়েছিলেন, সেই আক্ষেপে ছুটে গেলেন।

ডাক্তার, হাসপাতাল। প্রতিদিন অফিসের ছুটির পর দেখে আসতে যেতেন।

সেরিব্রাল অ্যাটাক। হয়তো মনুর কথা ভেবে-ভেবে। হয়তো অনুশোচনায়।

একদিন বলেছিলেন, আমিই তো ওকে মেরে ফেললাম। ওকে যদি বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিতাম।

শেষে যখন হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনলেন, তখন শুধু একটা হৃৎপিণ্ড। বাঁ দিকটা প্যারালিসিসে অবশ, পঙ্গু। বসিয়ে দিলে বসেন, শুইয়ে দিলে শুয়ে থাকেন।

ডান হাতের কনুইয়ে একটা মাছি বসেছিল, সমস্ত হাতটা দুলিয়ে-দুলিয়ে মাছিটা তাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল সুধাকান্তর।

মাঝে-মাঝে যেতেন। একটু বুঝি বা সুস্থ হয়েছিলেন।

তিপু নিয়ে এসে জালে-ঘেরা বারান্দায় বসিয়ে দিত। প্রথম-প্রথম দু-একবার দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন সুধাকান্ত। কিন্তু কথা বলতে গেলে ছাড়তে চাইতেন না দীনেনবাবু। সেজন্যেই এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিলেন।

এখন আর বড় একটা দাঁড়ান না, তাকান না ওদিকে, পাছে ডেকে বসেন।

শুধু দৃশ্যটা ছবির মত দেখতে পান, ওদিকে না তাকিয়েও।

সেই দীনেনবাবুকে এখন আর করুণা করার মত স্পৃহাও নেই। ভিতরে-ভিতরে সুধাকান্তও এখন পঙ্গু, অবশ। প্যারালিসিসে অর্ধেক শরীর পড়ে যাওয়ার মত অকর্মণ্য।

পার্কে দুটো চক্কর দিয়ে ফিরে এলেন সুধাকান্ত। রোদ উঠেছে, সেজন্যেই দ্রুত পায়ে ফিরে আসছিলেন।

মন বিস্বাদ হয়ে আছে, কোথাও ফুটপাথ ধরে চলার উপায় নেই। ফুটপাথে শুয়ে-থাকা লোকগুলো উঠে পড়েছে। চিৎকার কোলাহল সারা তল্লাট জুড়ে। কয়েকজন ইতিমধ্যেই উনোন ধরিয়েছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে চতুর্দিক। দুটো বাচ্চা ফুটপাথের ধারে বসে পায়খানা করছে। গা রি-রি করে উঠল।

তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন সুধাকান্ত। দূর থেকেই দেখতে পেলেন দীনেনবাবু এসে বসেছেন, জালে-ঘেরা বারান্দায়।

পাছে চোখোচোখি হয়ে যায়, অন্য দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পার হয়ে এলেন।

বাড়ির কাছে এসে দেখা হয়ে গেল মহীতোষবাবুর সঙ্গে।

সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির চাকরকে দিয়ে গাড়ি ধোয়াচ্ছেন।

দেখা হতেই বললেন, কি, মর্নিং ওয়াক থেকে?

—হ্যাঁ।

দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

মহীতোষবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, যাক্, পাড়ার ইজ্জত ফিরল। বস্তিটা তুলে দিয়ে অমলেশবাবু কি উপকার যে করলেন। একটা ক্যানসার স্পট হয়ে উঠেছিল। যত যন্ত্রণা ওই বস্তিটার জন্যে।

সুধাকান্তর কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। মনের ভিতরে উনি জ্বলছেন। ওঁর বাড়িতেই এখন যন্ত্রণা, দিব্যকে নিয়ে। বস্তিটা ওঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

তবু মহীতোষবাবুর কথা শুনে বললেন, দেখে আসুন একবার রাস্তার ফুটপাথগুলো। ক্যানসার স্পট! ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ওই যে বলে না, ছুরি ঠেকালেই বেড়ে যায়, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে! বস্তি উচ্ছেদ করে দিলে, মশাই, পাড়াটাই বস্তি হয়ে যায়!

মহীতোষবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, ওরা চলে যায়নি?

—কোথায় যাবে?

পাড়ার একটা ছেলে থেমে পড়েছিল। হেসে বললে, হ্যাঁ দেখেছি কাল রাত্তিরেই। কোথায় যাবে মেসোমশাই? টাকাটা দুদিনে ফুঁকে দেবে, তারপর ওই ফুটপাথ।

মহীতোষবাবু গুরুত্ব বুঝলেন না হয়তো। বললেন, হুঁ।

তারপর জিগ্যেস করলেন, জমিটা কি বেচবেন অমলেশবাবু? একটু খবর নিন না, পেলে পিছন দিকে দেড় কাঠা নিতাম।

সুধাকান্ত এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, আপনি নিজেই গিয়ে খোঁজ নিন না।

আসলে এ-সব কথায় ওঁর আর কোনও আগ্রহ নেই। উনি ভিতরে-ভিতরে পুড়ছেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকতে চান, গিয়ে দেখতে চান দিব্য আছে কি না। দেখে তবে শান্তি।

কিন্তু ছেলেটি উত্তর দিল। হেসে বললে, সব জমিটাই তো উনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। বায়না হয়ে গেছে।

—বেচে দিয়েছেন? সে কি? মহীতোষবাবু আশ্চর্য হলেন।

যেন অনেকদিন ধরে পুষে রাখা একটা বাসনা এক ফুতকারে নিভে গেল।

ছেলেটি বললে, হ্যাঁ, সমস্ত জমিটা একজনই কিনছে। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হবে। ওনারশিপ ফ্ল্যাট। একজন গুজরাটি কিনছে।

মহীতোষবাবুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

সুধাকান্তও আশ্চর্য হলেন। শোনেননি।

ছেলেটি বললে, আমাদের ক্লাবই তো বস্তির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে দিয়েছিল। বায়নার টাকা থেকেই তো দিলেন। আমাদের ক্লাবকেও দিয়েছেন।

মহীতোষবাবু হতাশ গলায় বললেন, কত করে দিল?

—সে অনেক টাকা। জানি না ঠিক। একটু থেমে বললে, জমির দাম তো এখন আগুন।

সুধাকান্তর কোনও আগ্রহ ছিল না, উনি চলে গেলেন।

যাবার সময় শুধু চোখের সামনে একটা বিশাল মাল্টিস্টোরিড বাড়ির ছবি ভেসে উঠল। অসংখ্য বারান্দা, অগুনতি জানালা, জানালায় আলো।

সুধাকান্ত বাড়ি ফিরে দেখলেন সকলেই উঠে পড়েছে। উঠে পড়ে এ-সময়।

অরুণা বাবাকে দেখতে পেয়ে বললে, মা, বাবা ফিরেছে, চায়ের জল চাপাও।

সুধাকান্ত ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, দিব্য কই?

—আছে। চাপা গলায় বললে অরুণা।

সুধাকান্ত নিশ্চিত হলেন।

তারপর অসীমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, শুনেছ খবর ?

—কি ?

সুধাকান্ত বললেন, বস্তির জমিটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওখানে নাকি ফ্ল্যাট বাড়ি হবে একটা ; মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠবে।

অরুণা বললে, তা হলে তো আমাদের সব গেল।

—কেন ? সুধাকান্ত অতটা ভাবেননি।

অরুণা বললে, আমরাই বস্তি হয়ে যাব, বাবা। সারা দক্ষিণ দিকটা জুড়ে যদি পেল্লায় একটা বাড়ি ওঠে, একটুকুও হাওয়া পাব না। সব হাওয়া ওই বাড়িটাই নিয়ে নেবে। শীতকালে একটুও রোদ্দুর আসবে না। শীতে কাঁপতে হবে। ঘরে এই যে এত আলো, তখন থাকবে নাকি !

অসীমা চিন্তিতভাবে বললে, ঠিকই তো বলছে অরুণা। আমরাই তো বস্তি হয়ে যাব। সবাই মিলে ঠেকানো যায় না ?

সুধাকান্ত হাসলেন। —ওদের কত টাকা, ঠেকাবে কি করে।

সবারই মুখ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

সুধাকান্ত স্বগতোক্তির স্বরে বললেন, জমির দাম যা হু হু করে বাড়ছে, টাকার লোভে আমাদেরই না শেষে বেচে দিয়ে চলে যেতে হয়।

সুধাকান্তর হঠাৎ মনে হল বস্তিটা থাকলেই ভাল ছিল। ওঁরা তবু মাথা তুলে ছিলেন। দক্ষিণের হাওয়া পেতেন, শীতের রোদ্দুর। আলো। বিশাল আকাশ-ছোঁয়া বাড়িটা উঠবে, তার সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হবে।

অসীমা কি ভাবছিল কে জানে।

হঠাৎ বললে, চিঠির বাক্সটা দেখে এসেছ ? কোনও চিঠি নেই ?

সুধাকান্ত দেখেননি। নীচের তলায় একটা লেটার বক্স আছে। পিওন কোনও কোনও দিন সন্ধের আগে চিঠি দিয়ে যায়।

গতকাল ওঠার সময় দেখেননি। উঠে এসে আর সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করেনি। দিব্যকে পাঠাতেও ভরসা হয় না, হয়তো চিঠি দেখার নাম করে একেবারেই বেরিয়ে যাবে, দু দিন বাদে নেশা করে বুঁদ হয়ে ফিরে আসবে।

হেরোইন। কথাটা শুনলেই সারা গা শিউরে ওঠে।

সুধাকান্ত আবার নীচে নেমে গেলেন। লেটার বক্স দেখতে। যদি উল্টোডাঙার ওঁরা চিঠি দিয়ে থাকেন, কবে আসবেন। মেয়ে দেখতে।

আট

বস্তিটা উঠে গিয়ে সমস্ত পাড়াটাই এখন কুৎসিত দেখায়। ফুটপাথগুলো তো বস্তি হয়েই গেছে, ওদের জড়ো করে রাখা মালপত্রও সব বোধহয় ফেলে দিয়েছে কিংবা বেচে দিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে রাস্তার ভিখিরি। দু-চারজন দু-চারজন কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না, বেশির ভাগই রয়ে গেছে, রাস্তার ফুটপাথকেই বানিয়ে নিয়েছে ঘরবাড়ি। কেউ রিকশা চালায়, রিকশাটা রাস্তার ধার ঘেঁসে রেখে দিয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে। শীত কিংবা বর্ষায় অনেক রাত হলে কোনও গাড়িবারান্দার নীচে চলে যায়।

দুর্গা আর লছমি একদিন এসেছিল দীনেনবাবুর বারান্দার সামনে। হয়তো বস্তিটা

দেখতে। পুরনো দিনের স্মৃতির টানে হয়তো।

—বুড়াবাবু, ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ। দীনেনবাবু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, তোরা আর আসিস না, এখানেই তো থাকিস, তিপুদিদি বলছিল।

দুর্গা বললে, কাজকাম তো নাই, কেন আসব।

—কাজ নেই কেন ? কাজ করিস না ?

দুর্গা হাসল—কেউ কাজ করে না বাবু, কাজ দেয় না।

—দেয় না ? দীনেনবাবু বুঝতে পারলেন না।

আর তিপু শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল। বললে, হ্যাঁ, বস্তির যত মেয়ে কাজ করত, সবাই ছাড়িয়ে দিয়েছে।

—ছাড়িয়ে দিয়েছে ?

তিপু বললে, রাস্তায় ফুটপাথে, হাজার রকম রোগ, ওদের কে বাড়িতে কাজ করতে দেবে ? তাই ছাড়িয়ে দিয়েছে।

ওরা কে কি করে কেউ জানে না। দেখে মনে হয় সব ছন্নছাড়ার দল।

দীনেনবাবু তেমনি বসে থাকেন পঙ্গু শরীরটা নিয়ে, পারিজাত গাছটার দিকে তাকিয়ে।

তিপু বললে, পাড়াটা কেমন যেন হয়ে গেল বাবা।

পাড়া ! কথাটা শুনলেও হাসি পায়। পাড়া কোথায়, কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই। কেউ কারও খবরও রাখে না।

—আর, ওই আকাশপ্রদীপটা উঠে সব যেন অন্ধকার করে দিল।

তিপু বললে।

দীনেনবাবু উচ্চারণ করলেন, আকাশপ্রদীপ।

বস্তির জমিতে একটা বিশাল বাড়ি উঠছে। আকাশছোঁওয়া বাড়ি। নাম দিয়েছে আকাশপ্রদীপ। কত তলা হবে কে জানে, উঠছে তো উঠছেই।

তিপু ভেবেছিল, দক্ষিণের জানালাগুলো খোলা যাবে, হাওয়া পাবে। এখন জানালা খোলা যায়, কিন্তু হাওয়া আসে না, আলো আসে না। সব সময় কেমন ছায়া ছায়া।

পিছনে খানিকটা জায়গা ছেড়ে পাঁচিল তুলে দিয়েছে। আর ওদিকের পাঁচিল ভেঙে দিয়ে বড় চওড়া রাস্তাটার দিকে আকাশপ্রদীপের এনট্রেন্স। সদর দরজা। এদিকের সঙ্গে কোনও যোগই নেই।

তিপু একদিন গিয়ে দেখে এসেছে ; সামনে বড় বড় করে লেখা 'আকাশপ্রদীপ'।

এ-পাড়ার বাড়িগুলো সব যেন রাতারাতি ছোট হয়ে গেছে। মানুষগুলোও। যেন এদের আর কোনও দাম নেই। যেন গরিব দুঃস্থ মানুষ। যত আলো আর হাওয়া আর শীতের রোদ্দুর সব ওই বিশাল বাড়িটা আটকে দিয়েছে।

কি তাড়াতাড়ি উঠছে বাড়িটা। এর মধ্যেই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে লোক এসে গেছে। যখন রাত্রে আলো জ্বলে আকাশপ্রদীপের মতই দেখায়, পাড়ার বাড়িগুলো তখন আরও ম্লান হয়ে যায়।

অমলেশ গোস্বামীর ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি। উনি তেতলায় থাকেন। আগে ঝড়ের মত হাওয়া আসত, আলোয় ঝলমল করত ঘরগুলো। এখন সে-সব তো নেই, অন্য উৎপাত।

একদিন বললেন, জানো তিপু, আর কাজের লোক রাখা যাবে না। একজন এসেছিল, দেড়শো টাকা মাইনে চায়। বলে কিনা আকাশপ্রদীপে ওইরকমই দেয়।

মহীতোষবাবুকে এখন আর হর্ন দিয়ে লোক সরাতে হয় না। বস্তির লোকরা রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওঁর গাড়ি আটকে দেয় না।

এখন যত রাগ ওই আকাশপ্রদীপের ওপর।

—চালচলন পোশাকআশাক দেখছেন সব, ছেলেমেয়েদের ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠবে।

সুধাকান্ত হেসেছেন ম্লান ভাবে। উনি আর কাকে ভয় পাবেন, কিসে ভয় পাবেন। আকাশপ্রদীপকে দোষ দিয়ে কি হবে।

দিব্যকে নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যান। ডাক্তারের পরামর্শ মত চলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

দিব্য মাঝে মাঝে ভালই থাকে। ওসব দিকে যেতে চায় না। কিন্তু হঠাৎ এক-একদিন কি হয়, গুম্ হয়ে থাকে, তারপরই উধাও। বুঁদ হয়ে ফিরে আসে। কিছু মনে রাখতে পারে না। নিজেই বলে, আমার মেমারি চলে যাচ্ছে।

সুধাকান্ত চেষ্টা করেও পারছেন না।

অরুণার বিয়েটাও দিতে পারলেন না। তবু আশা ছাড়েননি।

আকাশপ্রদীপ নিয়ে ওঁর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। যার বুকের ভিতরটাই গুমোট অন্ধকার হয়ে আছে, বাইরের আলো-বাতাসে তার কতটুকু সুখ!

শুধু মনে মনে বলেন, আমরা তলিয়ে যাচ্ছি।

কেন তা খুঁজে পান না। যেমন খুঁজে পেতেন না বস্তির মানুষগুলো কেন ওভাবে জঞ্জাল হয়ে বস্তির মধ্যে থাকে। কেন ফুটপাথে চলে যায়। যেমন এখনও বুঝতে পারেন না কেন আকাশপ্রদীপ আকাশ ছোঁওয়ার দুঃসাহসে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সমস্ত পাড়াটাকে অন্ধকার করে দেয়।

মহীতোষবাবু বলেছিলেন, ওই ফ্ল্যাটবাড়িটা হওয়ার পর জমির দাম বাড়ছে মশাই হু হু করে। ভয় হয়, আমরাও না শেষে অমলেশ গোস্বামীর মত টাকার লোভে সব বেচে দিই।

সুধাকান্ত হেসেছেন। কিন্তু ভয়ও হয়েছে। একটা মাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়। যতদিন বাঁচবেন, আঁকড়ে ধরে থাকবেন। কিন্তু তারপর? দিব্যকে তো এতটুকু বিশ্বাস নেই।

মহীতোষবাবু বলেছেন, দেখবেন, শেষে সব আকাশপ্রদীপ হয়ে যাবে। ছোট্ট এইটুকু তো মশাই বাড়ি, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চেয়েছিলাম...

অতীশবাবু এখন আর ওসব নিয়ে ভাবেন না।

শাশ্বতী অনুযোগের স্বরে একদিন বলেছিল, আমাদের বাড়িটা একেবারে চাপা পড়ে গেল, বাবা। কি ছোট যে দেখায় এখন।

অতীশবাবু হেসে বলেছেন, ছোট দেখালেই তো ছোট হয়ে যায় না।

ব্যালকনিতে বসে বসে এখন আর খোলা আকাশ দেখতে পান না। তাই চুপচাপ চেয়ে থাকেন আকাশপ্রদীপের দিকে।

সন্ধে হলেই আলো জ্বলে ওঠে। একটার পর একটা জানালায় তীব্র আলো জ্বলে, সারা বাড়িটা যেন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন সব সুখ ওখানে জমা হয়ে আছে।

মনে মনে হাসেন অতীশবাবু। একদিন উনি নিজেও তো ভাবতেন, একটা বাড়ি, মনের মত একটা বাড়িই বুঝি সুখ। ভাবতেন আলো মানেই আনন্দ।

কে যেন এসে বলেছিল, আঃ, পাড়াটা কি ব্রাইট হয়ে গেল, ওই মাল্টিস্টোরিড বাড়িটার

জন্যে। বলেছিল, কলকাতা কত সুন্দর হয়ে উঠছে।

অতীশবাবু হেসেছেন।—একটা বস্তি ছিল এখানে, জানেন। খুব নোংরা বস্তি। আমরা বলতাম, ক্যান্সার স্পট। এখন সেখানে একটা ম্যালিগনেন্ট টিউমার, বাড়ছে তো বাড়ছেই। সুন্দর হচ্ছে কিনা জানি না।

এখন ক্যান্সার কথাটা উচ্চারণ করতে আর ভয় পান না।

সুবিমল বলেছে সেরে যাবে। তবে প্রোলঙ্ড ট্রিটমেন্ট দরকার।

এতদিন তো বেঁচে গেলেন। এতগুলো মাস। সেটুকুও তো আশা করেননি। তবু বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে।

তবে একটা পরাজয় ঘটে গেছে।

ভেবেছিলেন গোপন করে যাবেন, গোপনে চিকিৎসা করাবেন। যদি সেরে যায়। জানতেন আশা নেই, তবু।

একদিন বলে ফেলতে গিয়েও বলতে পারেননি।

সুবিমল বললে, এবার তো বাড়িতে জানাতেই হয় জ্যাঠামশাই। এভাবে গোপন রাখার কোনও মানে হয় না। চিকিৎসার অসুবিধে।

সেই ডাক্তার মেয়েটি, শেফালি বললে, আমিও তাই বলি।

কিছুতেই এই ভয়ঙ্কর কথাটা বাড়ির কাউকে বলতে পারছিলেন না।

শেফালি বললে, তাহলে আমিই একদিন গিয়ে বলে আসি।

সুবিমল বললে, আমি। ওঁদের ভয়টাও তো ভেঙে দিয়ে আসতে হবে। আমার কাছে শুনলে বিশ্বাস করবেন যে সেরে যাবে।

অতীশবাবু নিজে মনে মনে হেসেছিলেন। মনে মনে বলেছিলেন, ডাক্তার, তোমার কথাটা যে আমিই বিশ্বাস করতে পারছি না।

অথচ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত।

প্রতিদিন তন্ন-তন্ন করে খবরের কাগজে খুঁজতেন। একটা খবর। একটা আকাশপ্রদীপ।

এখনও সন্ধেবেলায় ব্যালকনিতে বসে ওই বিশাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আলোয় আলো উঁচু বাড়িটার দিকে।

জীবনের চোখের সামনেও যদি এমন একটা বাড়ি থাকত। আলো ঝলমল আশা। সেটাই তো সকলে খুঁজছে। বাড়ি নয়, সত্যিকার আকাশপ্রদীপ।

সুধাকান্ত হঠাৎ একদিন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে ফেলেছিলেন, আমাকে আর এ-সবের মধ্যে টানবেন না, আই অ্যাম এ ফিনিশড ম্যান।

অতীশবাবু নিজেও ভেবেছিলেন, শেষ হয়ে গেছি।

আর দীনেনবাবু, বেচারা পঙ্গু অথর্ব মানুষ, জালে ঘেরা বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকেন। কি দেখেন কে জানে। উত্তরের আকাশ ? সবুজ গাছ ? না কি হেঁটে যাওয়া মানুষদের পা দেখেন ? হাঁটছে, সবাই হাঁটছে।

প্রতিদিনই অতীশবাবু আশায় আশায় থাকেন। একটা ছোট্ট খবর কি বেরোবে না কোনও দিন ? একটা ওষুধ ?

—কি হল শেফালি, কিছু একটা তোমরা আবিষ্কার করে ফেলো। যদি চলে যেতেই হয় অন্তত জেনে যাই।

সুবিমল হেসেছে, আপনারটা কিওরেব্‌ল্‌।

অবিশ্বাসে চুপ করে গেছেন উনি।

তারপর সেই দিনটি। স্পষ্ট মনে আছে অতীশবাবুর। আজও যেন দেখতে পান।

সুবিমল বলেছিল, আর চেপে রাখা উচিত হবে না, জ্যাঠামশাই।

বাড়ি ফেরার পথে কথাটা বারবার মাথার মধ্যে ঘুরল।

এ-কথা কেন বলল সুবিমল। তা হলে কি ওঁর দিন শেষ হয়ে আসছে?

বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা। চোখের কোণে দু ফোঁটা জল।

চোখ দুটো মুছলেন অতীশবাবু। তারপর ধীর পায়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

বস্তির লোকগুলো সবাই মুখচেনা। কতবার দেখেছেন। কিন্তু কোনও দিন কারও সঙ্গে কথা বলেননি। বলার প্রয়োজনও হয়নি।

সেদিন হঠাৎ ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দু-একজনের সঙ্গে কথা বললেন।

অতীশবাবুকে সবাই তারা সমীহ করত। কিন্তু অতীশবাবু তাদের উপেক্ষাই করে এসেছেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখে দু-চারজন এগিয়ে এল।

হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথা বললেন।

—কি রে দুর্গা, তোরা এখানেই রয়ে গেলি?

দুর্গা খুশি-খুশি মুখে বললে, আমার নাম জানেন, বাবু?

অতীশবাবু ঘাড় নাড়লেন। অতীশবাবু ওর নাম জানেন বলেই দুর্গা খুশি।

একজন বললে, রুপেয়া তো সব খতম হয়ে গেছে বাবুজি, ডেরা ভি মিলল না।

আসলে ওদের সমস্যা নিয়ে বিচলিত নন অতীশবাবু। ওদের কথা জানার একটুও আগ্রহ নেই। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওদের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে।

মানুষের সঙ্গ এত ভাল লাগে জানতেন না। চিরকাল দূরত্ব রেখে রেখে চলে এসেছেন। ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। অন্যদের সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রেখে। কখনও কারও জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়নি।

একবার একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন দীনেনবাবুর জন্যে, ডি সি সাউথকে। তাও গা বাঁচিয়ে। মহীতোষবাবুর পাল্লায় পড়ে একবার পাড়ায় সই জোগাড় করেছিলেন বস্তির বিরুদ্ধে। তাও পরে মনে হয়েছিল ভুল করেছেন।

এখন মনে হচ্ছে কারও জন্যে কিছুই করা হল না।

একটা কিছু করার সুযোগ খুঁজে বেড়ালেন। এই এদের জন্যেই যদি কিছু করা যেত। না, বড় অসহায় উনি। কিছু করার নেই।

এখন শুধুই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

কোনও দিন দীনেনবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়াননি। বরং অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে পার হয়ে গেছেন। একটা রুগ্ণ অকর্মণ্য মানুষের সঙ্গ কার ভাল লাগে। ওদের পৃথিবীটা বড়ই ছোট। আর একটা সুস্থ মানুষের পৃথিবী অনেক অনেক বড়। আগে তো অতীশবাবু নিজেকে সুস্থ মানুষ ভাবতেন। এখন তাঁর পৃথিবীও ছোট হয়ে আসছে, ছোট হয়ে গেছে।

তাই দীনেনবাবুর একতলার বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন। —কেমন আছেন?

দীনেনবাবু ভাবতেই পারেননি অতীশবাবু স্বেচ্ছায় সামনে এসে দাঁড়াবেন। অভিভূত হয়ে গেলেন। —আসুন আসুন। তিপু, ও তিপু...

তিপুও দেখেছে। ও হাসিমুখে ছুটে এল। একটা চেয়ার এনে দিল। বললে, বসুন, ভেতরে এসে বসুন।

অতীশবাবু একটু ইতস্তত করে ভিতরে গিয়ে বসলেন চেয়ারে।

দীনেনবাবুর সঙ্গে, তিপুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। অতীশবাবুর মনে পড়ল না আর কখনও এ-ভাবে পাড়ার কারও সঙ্গে গল্প করেছেন কিনা।

বড় ভাল লাগছিল ওঁর। জানেন, এত কথা বলা উচিত হচ্ছে না। উচিত! মনে মনে হাসলেন। তারপর আর কথা বলতে পাব কিনা জানা নেই। তার চেয়ে এখন যত খুশি বলে নিই।

—জ্যাঠামশাই, দেখেছেন ওই বাড়িটা কেমন এ পাড়ার বুকের ওপর চেপে বসেছে!

তিপু বললে।

অতীশবাবু হেসে বললেন, স্যাণ্ডুইচড হয়ে গেছি, তাই না। আমরা তো চিরকালই তাই, একদিকে বস্তি আর একদিকে বড়লোকদের লাক্সারি ফ্ল্যাট। মাঝখানে পড়ে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে।

দীনেনবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, তবু বস্তিটা অনেক ভাল ছিল।

অতীশবাবু কথা পাল্টানোর জন্যে বললেন, কেমন আছেন বলুন।

দীনেনবাবু ম্লান হেসে বললেন, আমার থাকা আর না থাকা। আছি, এই অবধি।

অতীশবাবু কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, সেটুকুই অনেক। শুধু বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই বড় সুখ।

যেন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।

উঠে পড়লেন। —চলি আজ।

—আসবেন আবার। দীনেনবাবু বললেন, আপনার তো পথ আছে। বলে হাসলেন, বিষণ্ণ হাসি।

অতীশবাবু চলে এলেন। মহীতোষবাবুর সঙ্গেও কি একবার দেখা করবেন নাকি। কিংবা সুধাকান্তর সঙ্গে।

আর হয়তো সুযোগ পাবেন না।

সুবিমল বলেছে, আর চেপে রাখা উচিত হবে না জ্যাঠামশাই।

কেন বলেছে কে জানে। সুবিমল কি স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে? বুঝতে পারছে, ওঁর দিন ফুরিয়ে এল?

নিজেকে বড় অসহায় লাগছে ওঁর। বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট দেখতে পান। ছবির মত।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, শাশ্বতী ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছে। নিজেও দু-একটা উপদেশ দিচ্ছিলেন। —দুটো সবুজ পাতা ওখানে গুঁজে দাও।

অতীশবাবু দেখলেন, ডাইনিং টেব্‌লের ওপর একরাশ ফুল। দারোয়ান দিয়ে গেছে। প্রতিদিনই দিয়ে যায়।

—বাঃ, চমৎকার সাজিয়েছ ফুলগুলো। একেবারে জাপানি ইকেবানা।

শাশ্বতী চমকে ফিরে তাকাল, নিরুপমাও। ওরা লক্ষই করেনি অতীশবাবু কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হাসতে হাসতে বললেন, আমার ডেডবডিটা তুমিই সাজিয়ে দিয়ো শাশ্বতী।

হাসলেন, কিন্তু অতীশবাবু নিজেই বুঝতে পারলেন ওটা হাসি নয়।

নিরুপমা কোনও কথা বললেন না। অর্থাৎ রসিকতাটা ওঁর পছন্দ হয়নি।

শাশ্বতী বোধহয় বুঝতে পারল না। বললে, বাঃ রে, মা কি দোষ করলেন, মা তো অনেক ভাল সাজাতে পারেন।

অতীশবাবুর ভাল লাগল না। চুপ করে গেলেন। অথচ এ ধরনের রসিকতা আগেও তো করেছে ওরা, অতীশবাবু নিজেও। বরং উনিই প্রশ্রয় দিতেন।

অতীশবাবু পোশাক বদলাতে চলে গেলেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে পোশাক বদলে ফেলেন আজকাল।

এসে আরাম কেদারায় বসলেন। —নিরু, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। একটা গান শোনাবে। বড় শুনতে ইচ্ছে করছে...

শাশ্বতী নেচে উঠল, হ্যাঁ মা, আমরাও শুনব।

অতীশবাবু বললেন, খুশবুকে নিয়ে এসো তো একবার। আর অন্তুকেও ডাকো। শাশ্বতী চলে গেল সিঁড়ির দিকে। ওর সংসার তো তেতলায়। ছেলের বিয়ে দেওয়ার আগেই তেতলা তুলেছিলেন। তেতলায় দুখানা ঘর, পিছনে বারান্দা, সামনে ব্যালকনি। রান্নার পাট দোতলায়, ডাইনিং টেব্‌লও। ছেলের বিয়ে অবশ্য উনি দিয়েছিলেন, না ওরা করেছিল ঠিক স্পষ্ট নয়। পরিচিতের মধ্যে, যাওয়া-আসাও ছিল। মনে মনে ওঁরাও শাশ্বতীকে পছন্দ করে রেখেছিলেন। চেয়েছিলেন অন্তুও পছন্দ করুক।

—কি রে শাশ্বতীকে বিয়ে করবি তো, নাকি শুধুই ঘোরাঘুরি করছিস? নিরুপমা একদিন ছেলেকে জিগ্যেস করলেন।

অন্তু হেসে ফেলেছিল। —শাশ্বতীকে জিগ্যেস কোরো।

তারপর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অতীশবাবু বললেন, দাঁড়াও, আগে তেতলা তুলে নিই।

তেতলা আছে, তেতলায় সংসার। কিন্তু শাশ্বতী আর খুশবু বেশির ভাগ সময়েই দোতলায়।

অন্তু বিরক্ত মুখে নেমে এল, হাতে একটা ইকনমিক জার্নাল। —কিছু বলছ?

অতীশবাবু হেসে বললেন, বোস, কথা আছে।

খুশবুর দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন। —এসো।

খুশবু এল না। —দিদার কাছে। অর্থাৎ নিরুপমার কাছে যাবে।

—এসো মাই চাইল্‌ড, এরপর আর সুযোগ পাবে না। দিদা তো থাকবে। বলে হাসলেন।

শাশ্বতী চোখের ইশারায় নিরুপমাকে দেখিয়ে বললে, বাবা, গান।

—সেজন্যেই তো সবাইকে ডাকা। বলে হাসলেন।

নিরুপমা বললে, এই মেয়েটাও কম ফাজিল নয়। শাশুড়ির গান শুনবে। কেন তুমি গাও। বলে শাশ্বতীর দিকে কপট ধমকের চোখে তাকালেন।

শাশ্বতী হেসে উঠল।

এ-সব পাট বহুকাল বন্ধ আছে। একসময় গান হত। সকলেই গাইত।

নিরুপমা বললেন, না না, আমার এখন আর গলা ওঠে না, হাঁফ ধরে। অন্তু আর শাশ্বতীকে গাইতে বলো, সেই যে...

অতীশবাবু বললেন, হবে হবে, তুমি স্টার্ট করো। মজা করে বললেন, আরে বাবা, শুনতে চাইছি, শুনিয়ে দাও, এর পর হয়তো সুযোগ পাবে না। তখন কি রিপেন্টেন্স হবে ভেবে দেখেছ?

শাশ্বতী হেসে উঠল। অন্তু বললে, গাও না।

—হ্যাঁ মা, অনেককাল শুনিনি। শাশ্বতী নিরুপমার কাছে গিয়ে বসল।

খুশবুর কি মনে হল, হাঁটি হাঁটি পা পা করে অতীশবাবুর কাছে চলে এল।

উনি খুশবুকে কোলে তুলে নিলেন।

বেশ লাগছিল ওঁর। আঃ। কি সুখ। কিন্তু কেবলই ভয় করছিল কি করে কথাটা বলবেন। এর আগেও চেষ্টা করেছেন, পারেননি।

অথচ এখন আর নিজের ওপরও নির্ভর করতে পারছেন না। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন ভিতরে ভিতরে। এদের ওপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। মেয়ে জামাইকে

আমেরিকায় জানাবে কি জানাবে না, ওরাই ঠিক করুক। আমি শুধু অপেক্ষা করব, কষ্ট পেতে হলে কষ্ট সহ্য করব। এখনও তেমন অসহ্য কিছু হয়ে ওঠেনি। ওই একটাই আতঙ্ক। যন্ত্রণা।

নিরুপমা বললেন, তাহলে শুধু গলায়।

—হ্যাঁ তাই। অতীশবাবু বললেন, একদিন একা একা গাইছিলে, কেউ ছিল না...

নিরুপমা হেসে বললেন, আর তুমি চুরি করে করে শুনেছিলে।

অন্তু আর শাশ্বতী দুজনেই হেসে উঠল।

গান গাইলেন নিরুপমা। অন্তু আর শাশ্বতীও।

ওদের গান থেমে যেতেই খুশবু বলে উঠল, মা, আমি গান করি ?

হল্লা করে হেসে উঠল সবাই। খুশবু লজ্জা পেয়ে গেল।

অতীশবাবু বললেন, গান করো খুশবুবাবু, গান করো। সকলে শুনবে।

খুশবু অভিমান করে বসে থাকল, রাজি হল না।

তারপরই একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। অতীশবাবু সেই দৃশ্যটা আজও স্পষ্ট দেখতে পান।

অন্তু উঠে যাচ্ছিল। অতীশবাবু বললেন, বোস, কথা আছে। তোমরা সকলেই বোসো।

একটু চুপ করে রইলেন। একটু ইতস্তত করলেন। কিভাবে কথাটা বলবেন খুঁজে পাচ্ছেন না যেন।

উনি জানেন এই আনন্দ, এই উল্লাস, এই সুখ, সব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে। শুধু একটা মানুষের দুঃখ নিমেষের মধ্যে সকলের দুঃখ হয়ে যাবে। একজনের আতঙ্ক সকলের আতঙ্ক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ বললেন, তোমাদের আমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ দেব। ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ।

নিরুপমা প্রথমে রসিকতা মনে করে ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

আতঙ্কে কৌতূহলে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

অতীশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, হেয়ার্স এ টেরিব্‌ল্ নিউজ ফর ইউ অল।

একটু থেমে বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। ভয় পাবার কিছু নেই।

বলতে বলতে ওঁর দুচোখে জল এসে গেল।

হাতটা গলার কাছে নিয়ে দেখালেন, অস্ফুটে বললেন, ক্যান্সার !

—কি বলছ আজেবাজে। অন্তু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনায়।

নিরুপমা ভেঙে-পড়া গলায় বললে, তোমাকে কতদিন থেকে বলছি ভাল ডাক্তার দেখাও, মিথ্যে ভয় পাচ্ছ...

শাশ্বতী বললে, আমি আজই আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

অতীশবাবু হাসলেন। —দেখিয়েছি। দুজন টপ্ স্পেশালিস্টকেও।

উঠে চলে গেলেন নিজের ঘরে, পরমুহূর্তেই ফিরে এলেন প্রেসক্রিপশনের তাড়া নিয়ে। অন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দ্যাখ বায়োপসির রিপোর্টটা।

হাসবার চেষ্টা করলেন।—ভয় পাচ্ছ কেন, একেবারে আর্লি স্টেজে ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছে, সেরে যাবে। আই অ্যাম আন্ডার ট্রিটমেন্ট।

চোখে জল নিয়েই অতীশবাবু বললেন, আরে এত গুম্ হয়ে গেলে কেন ? আমি তো এখনই মরে যাচ্ছি না...নাই যদি সারে, তাহলেও সময় আছে। অনেক দিন

টানব...বুঝলে !

হাসবার চেষ্টা করলেন ।

নিরুপমা পাথর । শাশ্বতী ফুঁপিয়ে উঠল । অন্তু একদৃষ্টে রিপোর্ট দেখছে । মাথা তুলতেই পারছে না ।

খুশবু বলে উঠল, কি হল ? দাদু, কি হল ?

খুশবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন অতীশবাবু ।

সেই দৃশ্যটা আজও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পান । এখন কি উনি শুধু অপেক্ষা করেন ? নাকি মনের গোপনে একটা ক্ষীণ আশা । একটা স্তোকবাক্য । কিছু জানেন না ।

চোখের সামনে ওই ফ্ল্যাটবাড়িটা যেন রাতারাতি মাথা তুলে দাঁড়াল । এত দ্রুত, অতীশবাবু ভাবতেই পারেননি ।

বারান্দায় সন্ধ্যার আবছা আলোয় বসে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন আকাশপ্রদীপের দিকে । সত্যি আকাশপ্রদীপ ।

অসংখ্য ফ্ল্যাট । পৃথক পৃথক পরিবার । আলো জ্বলছে প্রতিটি জানালায় । অতীশবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন । নিরুপমা পাশে চুপচাপ বসে থাকেন । কখনও দু-একটা কথা শুধু ।

আকাশপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অতীশবাবুর মনে হয় এরই নাম বোধহয় সমাজ । কখনও বস্তি বলি, কখনও আমাদের ছোট ছোট বাড়িগুলো নিয়ে এক-একটা পাড়া । কখনও এই রকম একটা আকাশছোঁয়া বিশাল বাড়ি । অগুনতি ফ্ল্যাট ; কিন্তু কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই । শুধু একসঙ্গে জটলা বেঁধে আছে, তাই এক মনে হয় ।

আসলে প্রত্যেকটি মানুষ একটি ব্যক্তি । তার দুঃখ শোক আনন্দ শুধু তারই, আতঙ্ক-ভয়-সুখ একমাত্র তার । যেটুকু যোগ তা শুধু একটা পরিবারকে নিয়ে । তার সঙ্গে আর কারও কোনও যোগ নেই । সমাজ সমাজ করি আমরা, ওটা মিথ্যে ।

দীনেনবাবু হতাশ গলায় বলেছিলেন, আমার আর থাকা না থাকা ।

সুধাকান্ত বলেছিলেন, আই অ্যাম এ ফিনিশ্‌ড ম্যান ।

কই, কারও দুঃখে তো তাঁর বাড়িটা অন্ধকার হয়ে যায়নি । যায় না ।

আকাশপ্রদীপের খোপ-খোপ ফ্ল্যাটগুলোও তাই । স্বার্থের বন্ধনে শুধু বাঁধা । প্রত্যেকটি খোপে পৃথক পৃথক সুখ দুঃখ, সমস্যা, আলো, অন্ধকার ।

—কই, খুশবু তো এল না এখনও । অতীশবাবু আহত গলায় বললেন ।

নিরুপমা বললেন, আসবে আসবে, ও এখন পড়ছে শাশ্বতীর কাছে ।

অতীশবাবু আবার আলোয় উজ্জ্বল ফ্ল্যাটবাড়িটার দিকে তাকালেন । ভাবলেন, ওই খোপগুলোর মধ্যে আমাদের মতই এক-একটা সংসার । পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন । পৃথক পৃথক সুখ, দুঃখ, সমস্যা, আলো, অন্ধকার । তারই মধ্যে প্রত্যেকেরই বোধহয় একটা আকাশপ্রদীপ আছে । তাকিয়ে থাকার জন্যে ।



রাজস্ব



দক্ষিণের এই পাড়াটা অনেক পুরনো দিনের। পুরনো দিনের বলেই এ পাড়ায় কেমন একটা উত্তরের গন্ধ আছে। পড়ন্ত বনেদিপনার মধ্যে কেমন একটা হৃতশ্রী ভাব থাকে। বার্ধক্যের চুলে আদৌ কোনও কলপ না দিলে চেহারার সঙ্গে দিব্যি মানানসই লাগে, কুচকুচে কালো চুলে তোবড়ানো গালটাই বেশি চোখে পড়ে। আর নিয়মিত কলপ না দিলে দেহপট যতই শক্তসমর্থ দেখাক না কেন, চুলের লালচে আভাতেই মানুষটাকে কেমন নোংরা নোংরা লাগে। পুরনো পাড়াগুলোর এই একই অবস্থা। বয়েসের নিজস্ব একটা দারিদ্র্য আছে। বাড়িগুলোর গায়েই যে শুধু লেগে থাকে তা নয়, মানুষগুলোকেও যেন বয়েসি করে দেয়। এমনিতে রাস্তাঘাট বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, এ-শহরে যতখানি সম্ভব। কিন্তু মজে আসা পুকুরের পানা সাফ করলেই তো তার চেহারা পাল্টায় না। বাড়িগুলোর সেই অবস্থা। কেউ একজন তার বাড়ির বাইরের দেয়ালে পলেস্তারা বদলালে বা নতুন করে রং ফেরালে পাড়াটা আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। কারণ বেশির ভাগ বাড়িরই গায়ে রং পড়েনি বহুকাল, খসে পড়া পলেস্তারার গায়ে তাপ্পি মারা হয়ে আসছে দু'পুরুষ ধরে, কোথাও কোথাও তাও হয়নি বলে ইট হাসছে, ইটের রংও গেছে বদলে। নতুন গজিয়ে ওঠা ঝকঝকে বসতি থেকে কেউ হঠাৎ যখন এসে হাজির হয়, এমন ভাব দেখায় যেন নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকছে। জানে না, পুরনো হতে তাদেরও সময় লাগবে না। কোন্ উঠতি যুবকই বা তা মনে রাখে, রাখবেই বা কেন। কিন্তু এই পুরনো পাড়াগুলো বৃদ্ধের অহঙ্কার নিয়ে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে। জানে সারা গায়ে হীনমন্যতা কিংবা দারিদ্র্য মেখে থাকলেও নতুন বাবুয়ানার ফ্যাশানদুরস্ত বসতিগুলো এদের আসলে ঈর্ষাই করে। পা বাড়ালেই ট্রাম-বাস, হাত বাড়ালেই দোকানপাট, ডাক্তার, হাসপাতাল, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজ কাছে কাছে, আপিস-কাছারি কোনও সমস্যাই নয়। ওরা ফ্ল্যাটের দাম হাঁকায়, কত বাড়ল। এরা জমির দামে আরও দামি।

দোষ একটাই। পাড়া নয়, যেন যৌথ পরিবার। দেখাসাক্ষাৎ হোক বা না হোক, কার বাড়িতে মেসো এল কিংবা মামা বিদায় নিল, কার বাড়ির সামনে ফেলা নোংরায় মাছের আঁশ বেশ বড় বড়, অথবা কার পুত্রবধূর এবারও মেয়ে, এ-সব খবর এদের জানতে সময় লাগে না। দু'একটা রসালো কুৎসাও কখনও কখনও মুখে মুখে ফেরে। পশ্ এলাকাতেও এসব আছে বৈকি, কিন্তু দানা বাঁধে না, ডোন্ট কেয়ার ছাতি ফুলোনো ভাব ওদের, কেউ কারও তোয়াক্কা করে না বলেই স্ক্যাণ্ডালও ঝিমিয়ে পড়ে। এ পাড়ার চুনোট ধুতির বিষ্ণুচরণ বলেন, তা তো ঝিমিয়ে পড়বেই, ওদের মেয়েরাও যে আজকাল ছাতি ফুলিয়েই হাঁটে।

কিন্তু এই পুরনো পাড়ার কুঁড়ি-ফোটা মেয়েগুলোই নয়, তাদের মা-মাসিরাও তলে তলে বদলে যাচ্ছে, পোশাকে-আশাকে হাঁটাচলায় তা লক্ষ করেও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়নি তাঁরও। মন্দ কি, ভালই তো লাগে। অমৃতের কি শুধু জিভেই স্বাদ, চোখে মানুষের আরও বড় তৃপ্তি। কিন্তু কোথায় কার অতৃপ্তি তার খবর কে রাখে। রাখে না, রাখত না বলেই হঠাৎ এই হুল্লোড়।

এমন একটা টাটকা হাতে-গরম খবর এনে দেয়ার কৃতিত্ব তেরো-পেরোনো মধুশ্রীর, যাকে বিষ্ণুচরণ মাঝেমধ্যে রাস্তায় দেখা হলে মধুবিশ্রী বলে ডাকেন, হেসে জিগ্যেস করেন,

বাবাটা কেমন আছে, দেখছি না দুদিন ? গেঁটে বাতে মালিশ করছে মা ?

নাম নিয়ে ঠাট্টা গা সওয়া হয়ে গেছে। কলে আঙুল চাপা এক ফিনকি হাসি দিয়েই, হাসির সঙ্গে এড়ানো উত্তর, ও তরতরিয়ে সরে পড়ে। কিংবা তার আগেই কোনও সমবয়েসি কিংবা দিদিবন্ধু হয়তো ডেকে বসেছে, এই মধু শোন। ব্যস, তা হলে তো আর ভদ্রতা দেখিয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না।

পাড়ার একদল-হয়ে ফুচকা-খাওয়া মেয়েগুলো ওকে ইচ্ছে করেই মধু বলে ডাকে। ওটা ঠিক ঠাট্টা নয়, একটু নেশাও। মধু নাম তো ছেলেদের, গোটাগুটি একটা ছেলে এগিয়ে এলে ভয়ে ছুটে পালাবে ঠিকই, কিন্তু একটা মেয়েকে ছেলে-ছেলে নামে ডাকতে পেলে দুধের স্বাদ কিছুটা ঘোলে মেটে। তা বলে ওর নাম সত্যি সত্যি মধু নয়।

একেবারে ছেলেবেলায় বাড়ির লোকেদের মুখে কিনচু, ছুটকি, ঘুগুন পেরিয়ে যখন বাইরের দু একজন মধু বলে ফেলছে, তখনই ওর ছোটমাসি এসে মধুকে মাধু বানিয়ে দিয়ে গেছে। ওর বাবাকে বলেছে, মাধু বলে ডাকবেন, জাঁইবু, তা না হলে সবাই মধু করে দেবে।

তারপর থেকে বাড়িতে সেই মাধুই। কিনচু, ঘুগুন লোপাট। মুখে তখনও ভাল করে কথা ফোটেনি, শুনে শুনে হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে 'কিন্তু' শব্দটা বসিয়ে দিত, বলে বসত 'কিঞ্চু', তা থেকে আদুরে উপহাসই নাম হয়ে গিয়েছিল কিনচু। আবার কবে যেন বলে ফেলেছিল 'আরেটটু ঘুগনু দাও', অর্থাৎ ঘুগনি। তা থেকে ঘুগনু নাম হয়ে পড়েছিল। ছোটমাসি এসে রক্ষা করে গেছে। ইস্কুলে ওর পাশে বসা মেয়েটা তো এখনও ফুচকা। ওর বোধহয় ছোটমাসি নেই।

এই মাধুই লাফাতে লাফাতে খবরটা নিয়ে এসেছিল। দুহাত বাড়িয়ে হাতের চেটো মেলে ধরে নাচাতে নাচাতে এমন ভাবে বলল, যেন দুহাতে দুটো সদ্য ফুটন্ত কড়াই থেকে তোলা আলুর চপ, মোড়ের ফুটপাত থেকে নিয়ে এসেছে।

মাধুর চোখেমুখে সে কি উল্লাস। ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাচ্ছে। —হ্যাঁ মা, এইমাত্তর দেখে এলাম।

এ পাড়ার মেয়ে-বউরা বেশির ভাগই বেশ ফর্সা। ফর্সা না হলে তাদের বউ হয়ে আসার যোগ্যতাই প্রমাণ হয় না। নাক চাপা হোক, চোখ ড্যাবডেবে, প্রথম বিচার ফর্সা কিনা, ফর্সা কতখানি। এরা কেউ কালোকে কালো বলে না, বলে বসে, ওদের নতুন বউয়ের গায়ের রং বেশ ময়লা। যেন ময়লা লেগে আছে গায়ে। অলোকেশ দত্তদের পরিবারে কখনও ময়লা রং ঢুকতে পায়নি।

মধুর মা যখন এসেছিল, প্রথম, ঘোমটা সিঁদুর এক-গা গয়না নিয়ে, তখন পাড়ার বয়স্ক গিন্নিগুলোও তার মুখের দিকে তাকিয়ে গয়নার হিসেব নিতে ভুলে গিয়েছিল। অস্ফুটে দুএকজন বলেও ফেলেছিল, সুন্দরী। শুধু গায়ের রঙেই নয়, মুখশ্রীতেও।

সেই মায়েরই তো মেয়ে মাধু। তাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে সকলেরই ভাল লাগে। কাটগ্লাসের ফুলদানির মতো ঝকঝকে কাটা কাটা নাক মুখ চোখের জন্যে তো বটেই, ওর নাচ-নাচ ছোটাছুটি, হাত-পা নেড়ে নেড়ে কথা বলা, কথার ফাঁকে ঝিলিক ঝিলিক হাসি, সব নিয়ে মাধু একটা চুম্বক। এই বয়েসেই। বব ছাঁট কোঁকড়া চুল কাঁধ অবধি, দামি স্কাই-ব্লু কাপড়ের হাঁটু ঢাকা ফ্রকের বুকে ফ্রিল আর লেসের কারুকার্যে ঘুম-জাগা বয়েস আড়াল হয়েও।

চুম্বক হয়ে চোখ টানে, আবার এ-সব বয়েসই এমন, লোহালক্কড় দেখলেই ছিটকে পালায়। এ বয়েস পুরুষ শব্দটাকেই ভয় পায়। সতেরোই হোক সত্তরই হোক, পুরুষ হলেই ভেবে বসে সব হন্যে হয়ে ছুটে আসছে। একটা আতঙ্ক যেন। ওদের কল্পনায়

বেশ রঙিন রঙিন লাগে, কাছ-কাছ বয়েসের হলে, কিন্তু ওই অবধি। বন্ধুদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টাতেও। কিন্তু ও বয়েসের সত্যি সত্যি কেউ এগিয়ে এসে নির্মল কোনও প্রশ্ন করলেও ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, ছুটে পালায়।

চুলে কলপ চুনোট ধুতির বাহাত্তুরে বিষ্ণুচরণকে দেখেও তাই ছিটকে পালায়। তাকেও পুরুষ ভাবে। কিন্তু আজ পারেনি, পালাতে চায়নি। উল্টে নিজেই হাসতে হাসতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এত বড় একটা খবর না জানিয়ে থাকতে পারেনি। বিশেষ করে ও নিজেই যেখানে প্রত্যক্ষদর্শী, নিজের চোখে দেখেছে।

প্রায় ছ ফুট দীর্ঘ বিষ্ণুচরণের শরীরে শৌখিনতা বেশ মানিয়ে যায়। কারণ এই বয়েসেও সোজা হয়ে হাঁটেন। মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়তে ওঁর ভালই লাগল। এই বয়েসে ওই উচ্ছলতার দিকে তাকিয়ে বুকে জোর পান। একটাই খারাপ লাগে, মেয়েটা কোনও দিন ওঁকে মেসোমশাই কিংবা জ্যেঠু বা কাকাবাবু বলে সম্বোধন করেনি। আগে পছন্দ করতেন না, আজকাল দাদু ডাকটাও ভাল লাগে।

একদিন একটু খটকা লেগেছিল, চুলে কলপ বা গিলে হাতার জন্যে ওঁকে খারাপ ভাবে না তো! হেসে ফেলেছিলেন নিজের মনেই। আরে, ওসব পাট অনেককাল চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। বৃদ্ধদের আসরে বসে কখনও কখনও সরস আলোচনা এখনও করেন। গর্ব করে বলেন, আমাদেরও দিনকাল ছিল হে, ছিল। ছোকরাগুলো ভাবে আমরা বুড়ো হয়েই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছিলাম। বলে হো হো হাসি।

একটু থেমে কি যেন ভেবে নেন, অনেকগুলো আবছা মুখ কিংবা অস্পষ্ট নাম, তারপর হঠাৎ বলে বসেন, ওসবে বড় অতৃপ্তি হে, দাঁড়িপাল্লায় ফেলে এখন দেখি স্নেহেই বড় তৃপ্তি।

একজন কে ঠাট্টা করে বলেছে, ঘরে ভাত না থাকলে উপোসে বড় পুণ্যি।

সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে।

সেই বিষ্ণুচরণকে খবরটা জানিয়েই বাড়িতে ছুটে এসেছে মাধু। মধুশ্রী।

নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, মা, কি দেখে এলাম! এইটুকুন, এক্কেবারে এইটুকুন। দেখতেই পেলাম না। ট্যাক্সি থেকে নেমেই ঝট করে ঢুকে গেল।

কিছুটা অবাক কিছুটা অবিশ্বাস মাখা বড় বড় চোখ মেলে মাধুর মা অমলা বলে উঠেছে, দূর, কি দেখতে কি দেখেছিস! সত্যি?

পরক্ষণেই হেসে ফেলেছে, যেন দারুণ একটা মজার খবর।

কিন্তু এমন একটা ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটলে কি এতদিন চাপা থাকত। চাপা থাকবেই বা কেন। এ কি চাপা রাখার জিনিস। ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াত কত আগে থেকেই। ঢোল অবশ্য পেটাতে হয় না, হাওয়ায় হাওয়ায় পাড়াসুদ্ধ সবাই জেনে যায়। পুরনো দিনের গা ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ি, ও-বাড়ির জানালার সঙ্গে এ-বাড়ির জানালায় একটু তেড়চা হয়ে গরাদে গাল লাগিয়ে কথা বলতে হয় এই যা, আসলে দূরত্ব তিন হাতও নয়। জানালাগুলো দিয়ে একটু আলো ঢোকে, বাতাস আসে খেয়াল-খুশি মতো, দুবাড়ি দূরের বড় রাস্তায় হঠাৎ কখনও এক দমকা বাতাস ঢুকে পড়লে এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে জানালা গলেও একটু এসে পড়ে দেহ জুড়িয়ে দেয় গরমের দিনে। কিন্তু জানালার আসল কথা আলো-হাওয়াকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা নয়। প্রথম যখন বিয়ে হয়ে অমলা এসেছিল এ-বাড়িতে, নাকি প্রথম সন্তান হওয়ার পর, মনে নেই, জানালার পাল্লা খুলে মনে হত কয়েদির সামনে জেলের গেট খুলে দেওয়া হল। সে কি আনন্দ, জানালায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির জানালার সঙ্গে কথা বলায়। একবার বড় বউয়ের সঙ্গে, একবার ছোট বউয়ের সঙ্গে, সে কত গল্প। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত এক একদিন বিকেলে।

প্রথম বাচ্চা হওয়ার আগে কত উপদেশ দিত বড় বউটা। নামধাম কিছুই জানত না, ও-বাড়ির পরিচয়ও ছিল অজানা। কিন্তু কত অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল দুদিনেই। বিপদে আপদে ছেলের অসুখে ছুটে আসত, ডাক্তার ডাকতে হলে ডেকে দিত কাউকে পাঠিয়ে। কিংবা টেলিফোনে। ওদের টেলিফোন আছে অনেককাল আগে থেকেই।

চোখে বিস্ময় মনে অবিশ্বাস নিয়ে অমলা দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। একটু আগে হলে এ-ঘরের জানালা থেকেই পেয়ে যেত যে কোনও একটা বউকে। এখন তো রান্নাবান্না সেরে দোতলায় উঠে গেছে। এখান থেকে জিগ্যেস করতে হলে চেঁচাতে হবে। রাস্তা থেকে কেউ শুনতে পাবে, কিংবা ও-বাড়ির রিটায়ার করা শ্বশুরটা।

এজন্যেই জানালাগুলো অমলার কাছে খুব দামি। বড়বউটাও একদিন আক্ষেপ করে বলেছিল, জানালাটা না থাকলে কি করে বাঁচতাম রে। তুই তো তবু হুটহাট করে বাইরে বেরোতে পাস।

অমলা হেসে উত্তর দিয়েছে, বেরোতে পেলেই বা কি লাভ, যাওয়ার আছেটা কোথায়।

সত্যি তাই। যেতে পেলেই কি মুক্তি, যাবে কোথায়? দু-একটা দিন অকারণে দোকানপাট ঘোরা, শো-কেস দেখা, বোতাম কেনা কিংবা উলের রং পছন্দ।

ওদের রাস্তাটা একেবারে বাংলা অক্ষরের দ। বড় রাস্তা থেকে খানিকটা সোজা এসে বাঁদিকে খান কয়েক বাড়ি অবধি গিয়ে আবার ডানদিকে। ফলে আলো হাওঠঘ খেলে না তেমন। রাস্তাটাও বিশ ফুটের বেশি নয়, কিন্তু বাড়িগুলো সবই বেশ বড়সড়। আগেকার দিনের বাড়ি তো, তাই সিলিংও বেশ উঁচু। সিঁড়িটাই যা সরু। দুটো লোক পাশাপাশি ওঠানামা করতে গেলে গায়ে গা লাগবেই। তবে এখন আর অমলাদের বাড়িটা বড় নেই। তিন শরিকে ভাগ হয়ে বেশ ছোটই ওদের দিকটা। তবে দোতলা আছে, ছাদ আছে।

এখন হাতে কাজ নেই তেমন, এবার নিশ্চিন্তে স্নান করতে যাবে, তার আগে খবরটা ভাল করে জানা চাই।

দোতলার ওই জানালাটা অন্য কাজে লাগুক না লাগুক, খবর আদানপ্রদানের একমাত্র গোপন সুড়ঙ্গপথ।

মাধুর বাবা মনোতোষ, তখন বয়েস কম, জিভে রসিকতা ছিল, অফিস থেকে ফিরে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, কি ব্যাপার, আজ চুপচাপ যে বড়, খবরের কাগজ পড়োনি?

জানালায় জানালায় একটা না একটা খবর আসতই, সেটুকু মনোতোষকে না শুনিয়ে শান্তি পেত না, খবর হিসেবে সেটা যত তুচ্ছই হোক। একদিন চুপচাপ ছিল বলেই ওই ঠাট্টা। খবরের কাগজ মানে ওই জানালা।

সিঁড়িটা লাল সিমেন্টের, সেকালের সিমেন্ট না মিস্ত্রি কার গুণে জানা নেই, পায়ে পায়ে ক্ষয়েছে কিছুটা, তবু চকচকে আছে। ঘরের মেঝেগুলোও। শুধু শোয়ার ঘরখানায় সিমেন্ট তুলে ফেলে মোজেক করা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। ভাল পালিশ হয়নি। তবু তো মোজেক। এখন তো মোজেকের হাওয়া, মার্বেলের মেঝে দেখেও লোকে নাক সিঁটকোয়।

দোতলায় উঠে এসে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল কমলা। কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাক ছাড়ল, চুক্কু, এই চুক্কু।

চুক্কু নাম নয় বাচ্চা মেয়েটার। নাম চুমকি। কিন্তু ওই যে প্রথমেই 'চুম' উচ্চারণ করতে হয়, একটু অস্বস্তি হত বলে চুক্কু বানিয়ে নিয়েছিল।

এখন অবশ্য জানালায় জানালায় অনেক খোলামেলা কথা বলে। এখন আর অত সব অস্বস্তি নেই। দিনকাল পাল্টাচ্ছে না? হাওয়াই বদলে গেছে। যা ছিল লজ্জা আর

অস্বস্তি, এখন তো মেয়েদের কাছে তা গর্বের। ফ্যাশনদুরস্ত পাড়ার সেই হাওয়া এখন এপাড়াতেও এসে লেগেছে। কে কত নির্লজ্জ হতে পার।

বার কয়েক ডাকতেই চুক্কুর বদলে চুক্কুর মা অর্থাৎ বড়বউটি এসে হাজির হল। —কি বলছিস রে অম্‌লা ?

বড়বউ প্রথম থেকেই ওকে 'তুই' বলে।

কিন্তু 'কি বলছিস রে' শোনার আগেই অমলা বড়বউকে দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেছে। যেন সত্যি একটা হাসির কথা।

ওর হাসি দেখে বড়বউয়ের মুখেও হাসি এসে গেল, 'কি রে হাসছিস কেন ?'

অমলা কোনওরকমে হাসি চেপে প্রশ্ন করলে, দিদি, লালবাড়ির খবর তুমি কিছু জানো ?

—লালবাড়ি ? হাসি মিলিয়ে গিয়ে চুক্কুর মা'র কপাল কুঁচকে উঠল।

অমলার মুখ তখনও হাসছে। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ সুধাকরবাবুর বউ। শুনেছ কিছু ?

—না তো। কি হয়েছে ?

অমলা বলে উঠল, কিছু হয়েছে কিনা সে-কথাই তো জিগ্যেস করছি তোমায়! বলে আবার কুলকুল হাসি। থেমে থেমে বললে, মাধু এইমাত্র দেখে এল। বলছে...

যা যা বলেছে মাধু সব বলে গেল।

আর চুক্কুর মা অর্থাৎ পাশের বাড়ির বড়বউ ভুরু থেকে অবিশ্বাস ছিটকে দিয়ে বললে, দূর, কি দেখতে কি দেখেছে। আর তুইও বিশ্বাস করে বসলি।

বিশ্বাস করার কথাই নয়।

অমলা বললে, সেজন্যেই তো তোমাকে জিগ্যেস করছি। শেষে এই বয়েসে...

বড়বউকে কেউ হয়তো ডাকল ভেতর থেকে। 'যাই' বলে তার কথার উত্তর দিয়ে শেষ কথাটাও বলে অমলার সন্দেহ দূর করে দিল। বললে, গতমাসেই তো দেখা হল, সিনেমা দেখে ফিরছি আমরা। কই বাবা কিচ্ছুটি বোঝা গেল না। তেমন হলে কি লুকিয়ে রাখতে পারত।

অমলা হাসল, ও জিনিস কি আর লুকিয়ে রাখা যায়।

বলে হেসে উঠল। তারপর হাসি মুছে দিয়ে বললে, লুকিয়ে রাখবেই বা কেন, ও গর্ব করে দেখানোর কথা।

বড়বউ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, মুখে চোখে বিষণ্ণতার ছাপ এনে বললে, সত্যি হলে কি ভালই না হত। বেচারি।

অমলা অস্ফুটে বললে, বেচারি।

কিন্তু খবরটা দেখতে দেখতে চতুর্দিকে রটে গেল। কে রটাল সেটাও এখন আর স্পষ্ট করে জানার উপায় নেই।

বিষ্ণুচরণ মাধুর কথাটা গ্রাহ্যই করেননি। কোনও কৌতূহলও হয়নি বিশদ করে জানার। কারও একটা কচি ছেলে কিংবা মেয়েকে কোলে নিতে দেখলেই সেটাকে খবর বানানোর মধ্যে কি আছে। তা নিয়ে এত হইচই বা কেন।

মাধুকে স্নেহ করেন, তেরো বছরের মেয়েটার ছটফটে বিদ্যুৎ উচ্ছলতার মধ্যে যেন হারানো জীবন খুঁজে পান। ভালই লাগে। ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওর কথাগুলো ভাল লাগেনি।

শুনে শুধু একটা 'হুঁ' বলেছেন। গায়ে মাখেননি। ওর আর কি দোষ, মা মাসিদের কাছে শুনে শুনে মাধু হয়তো ঠাট্টা করতেই চেয়েছিল।

বাহাত্তর বছর বয়সে তো সড়াক করে এসে পৌঁছননি, অনেক অভিজ্ঞতা ঠেলে ঠেলে আসতে হয়েছে। অনেক দেখেছেন। দেখছেন এখনও।

আজকালকার মাগুলো যেন মা নয় আর। মেয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েকে ছেলে বা মেয়ে বলে না, বলে বাচ্চা।

একদিন সমবয়সি এক বৃদ্ধের সঙ্গে গিয়ে কাছের ওই পার্কটায় বসে সারা সন্ধে গল্প করে কাটিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে চার পাঁচজন বৃদ্ধের আসর বসে যায় পার্কটায়। এক দিকে স্মৃতিমন্থন চলে, আরেক দিকে সমালোচনা। কোনও বাড়ির, রাজনীতির, অথবা সমাজের। সমাজ বলতে মেয়েগুলোর। তাদের মাদের। এ-সব না করলে সময় কাটাবে কি করে।

বিষ্ণুচরণ নিজেই সঙ্গীটিকে বলেছিলেন, আমাদের কেউ কখনও বাচ্চা বলেনি, আজকাল সব বাচ্চা। আমরা তো জানতাম ওটা গরু-ছাগলের কুকুর-বেড়ালের হয়। আর শুয়োরের।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

তারপর নিজেই বলেছেন, দিনকালই পাল্টে যাচ্ছে। ধুমসি চেহারা, তিন ছেলের মা, নট বিলো ফিফটি, সেদিন ওপাড়ায় বড় শালার ফ্ল্যাটে গিয়ে, সব শালোয়ার ফালোয়ার কি সব বলে না?

বৃদ্ধ সঙ্গীটি রসিকতা করে বলেছে, শালার বউ শালোয়ার পরবে সেটা আর বিচিত্র কি!

তারপরই টিপ্পনী কেটেছে, লক্ষ তো করেন না, এপাড়াতেও ঢুকে গেছে।

বিষ্ণুচরণ বাধা দিয়েছেন, ঢুকেছে তা দেখেছি, কিন্তু সে ওই নতুন বাড়িটায়। ওরা তো আর আমাদের পাড়ার নয়।

বন্ধুটি হেসেছে। বলেছে, পাড়াটাই কি আমাদের থাকবে শেষ অবধি। জমি বাড়ির যা দাম দিচ্ছে সবাই।

দুজনে মিলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, তা ঠিক।

এতকাল বেশ নিশ্চিন্তে ছিলেন, এখন বড় নড়বড়ে লাগে। ভয় করে। পুরনো ক্ষয় ধরা বাড়িটার একটা আন্দাজ দাম শুনলে ভালও লাগে, আবার ভয়ও করে। লোভে পড়ে যাব না তো!

সঙ্গী বন্ধুটির অবস্থা এখন আর তেমন ভাল নয়, নীচের তলায় দুদুটি কম ভাড়ার ভাড়াটে আছে বলে প্রয়োজনে বাড়িটার দাম শোনাতে পারে না, তাই ওই প্রসঙ্গটাই ভাল লাগে না।

এড়িয়ে গিয়ে আবার মেয়েদের নিয়ে পড়ল। —সব আধুনিক হচ্ছে।

বিষ্ণুচরণও যোগ দিলেন। —কই বাবা, আমাদের হরষিতের বউও তো ডাক্তার। ডাক্তারি করছে, তার তো ওসব লাগে না।

সঙ্গীটি হাসল, ধনঞ্জয়ের মেয়ে ব্যাঙ্ক অফিসার, তারও লাগে না। দিব্যি টাঙাইল শাড়ি পরে যায় আসে।

বিষ্ণুচরণ বললেন, যাই বলো, সেই যে জরি দেওয়া কালো পাড় শান্তিপুরী শাড়ি ছিল, মা মাসিরা পরত, কেমন ঠাকুর ঠাকুর লাগত।

কিন্তু ওই অবধি। সেকালের সঙ্গে একালের একটু তুলনা না করে থাকতে পারেন না। ওঁর বিচারে পাল্লা ভারী সেকালের দিকেই। ওঁর স্মৃতিতে বিয়েবাড়ি মানে সোনালি জরির বেনারসি, হয়তো বালুচরি, গায়ে জড়োয়া গয়না, শীতে কাশ্মীরি পশমিনা, আহা কি তার নকশা। রং চটে যাওয়া একখানা আছে আলমারিতে। স্বর্গগতা স্ত্রীর।

বিষ্ণুচরণদের পরিবারটা বনেদি, এখন আর সে অবস্থা নেই। তবু পাড়ার সবাই একটু

মান্যগণ্য করে, বোধহয় শুধুই বয়েসের জন্যে।
—এই যে বিষ্টুদা, আসুন, আসুন।
প্রৌঢ়দের দু-চারজনও বলে উঠল।
এই ক্লাবঘরটা বহুকালের, লাইব্রেরিটাও। তখন দেশপ্রেমই বড় ছিল, তাই ক্লাব আর লাইব্রেরি চিত্তরঞ্জনের নামে। বেশ পুরনো।
কয়েকটি কম বয়েসি ছোকরা, সবাই চেনা, বিষ্ণুচরণকে ঢুকতে দেখে সমীহ করে ক্যারম খেলা থামিয়ে দিয়েছিল।
বিষ্ণুচরণ বললেন, খেল রে খেল। হেরোইন খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল।
ছেলেগুলো হেসে উঠল।
প্রৌঢ়রা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন বিষ্টুদা, আজকাল আর আসেনই না।
—নতুন বইটই কিছু এল কিনা দেখতে এলাম।
এসেছে। দেখবেন? লাইব্রেরিতে বই দেয়া-নেয়ার কাজ করে একটি যুবক। অফিস থেকে ফিরে বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজটুকু করে দেয়। সরকারি সাহায্য নেই, চাঁদা দিয়েই চলে। তাও আদায় হত কিনা সন্দেহ। পাড়ার মেয়ে-বউরাই টিকিয়ে রেখেছে।
আজকাল পশ্ এলাকাগুলোয় কত কি হচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে ভি সি পি ভি সি আর। কিন্তু লাইব্রেরি হচ্ছে না একটাও। হলেই বা কে পড়ত বই? সাহিত্যের খবর পায় ওরা সিনেমা টিভি থেকে। খুব মডার্ন হচ্ছে তো। টাওয়েল ব্যবহার করে, দাড়ি কামিয়ে আফটার শেভ লোশান।
নতুন বই কখানা দেখে একটা নিলেন, খাতায় সই করে দিয়ে এসে বসলেন চেয়ার নিয়ে।
আর তখনই যে লোকটি 'বিষ্টুদা বিষ্টুদা' করছিল সে প্রশ্ন করে বসল, সুধাকরদের খবর কিছু শুনলেন বিষ্টুদা?
চিড়বিড়িয়ে উঠল বিষ্ণুচরণের ভিতরটা।
ওই লালবাড়িটা এদের চক্ষুশূল হয়ে আছে নাকি! বাড়ির একপ্রান্তে ভাড়াটে হয়ে পড়ে আছে বেচারিরা। তাদের নিয়ে এত কৌতূহলই বা কেন, টীকাটিপ্পনী বা কেন।
—না, কিছু শুনিনি। একটু কড়া ভাবেই যেন বললেন।
লোকটি তবু দমবার পাত্র নয়। —শুনলাম, একটা কচি বাচ্চা...
বিষ্ণুচরণ বললেন, মানে কচি শিশু?
বাচ্চা শব্দটা উনি একদম সহ্য করতে পারেন না।
লোকটি গায়ে মাখল না। বললে, সবাই বলছে...
বিষ্ণুচরণ বললেন, কোলে নিয়েছিল; এই তো? তা, কি এমন অপরাধ করেছে শুনি। একটা শিশু দেখলে কার না আদর করতে ইচ্ছে করে।
সবাই হেসে উঠল। —তা নয়, তা নয় বিষ্টুদা। বাড়িতে নিয়ে এসেছে।
এবার চোখ কপালে উঠল বিষ্ণুচরণের। —নিয়ে এসেছে? কোত্থেকে?
পাশ থেকে একজন বললে, সেটাই তো প্রশ্ন। চুরিটুরি করে আনল না তো? হাসপাতাল থেকে? শেষে পাড়ার দুর্নাম।
বিষ্ণুচরণ এবার রেগে গেলেন। বললেন, সুধাকরকে তোমরা পাগল ভাবো নাকি?
একটু থেমে বললেন, কোনও আত্মীয়টাত্মিয়র হবে হয়তো। কিন্তু তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন হে?
এমন কড়া ভাবে বললেন যে কেউ আর কোনও কথাই বলল না। সমীহ করে বলেই

সকলে চুপ করে গেল।

বিষ্ণুচরণ উঠে পড়লেন, লাইব্রেরি থেকে নেয়া বইটা বগলদাবা করে গটগট করে বেরিয়ে এলেন।

অস্ফুটে বললেন, মেয়েদেরও অধম!

মেয়েদের সম্পর্কে বিষ্ণুচরণের মনে খুব একটা পরিচ্ছন্ন ছবি নেই। হয়তো পুরুষ বলেই, কিংবা সেকালের লোক বলে। আহা, একালের ছেলেরাও কত না মনের মধ্যে ভব্য ছবি গড়ে রেখেছে।

কিন্তু মেয়েদের প্রতি, দুঃখী মেয়েদের প্রতি বিষ্ণুচরণের বেশ একটা সহানুভূতি আছে। একটা কথাই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'বেচারি'।

দুই

সুধাকরের বাবা এই ঘর কখানা ভাড়া নিয়েছিলেন যুদ্ধেরও আগে। এই বাড়িতেই সুধাকরের জন্ম এবং বিবাহ। এমন কিছু কম ভাড়ায় পাননি সুধাকরের বাবা, তখন এইরকমই ভাড়া ছিল। বাড়ি করতেই বা কত টাকা লাগত। তবু, আয়ও তো ছিল কম, তিনি নিজে কোনও বাড়ি করে যেতে পারেননি। সুধাকর এবং তার ভাইবোনরা অবশ্য আগে ভাবত বাবার এদিকে মনই ছিল না, অথবা তেমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধি ছিল না। না হলে এত সস্তায় জমি পাওয়া যেত, বাড়ি তৈরি হত, করেননি কেন? তা নিয়ে অবশ্য সুধাকরের কোনও অনুশোচনা নেই। ও নিজেও ওসব স্বপ্ন দেখত না, এখনও দেখে না, কারণ সবই নাগালের বাইরে চলে গেছে। শুধু কি সেজন্যেই? সন্দেহ হয়। স্বপ্ন না দেখার পিছনে হয়তো কিছু বাস্তব কারণ থাকে।

এই রাস্তাটা একজন লোকের নামে। কিন্তু সেই লোকটা কে সুধাকরও জানে না। জানার আগ্রহও হয়নি কোনওদিন। কলকাতার প্রায় সব রাস্তাই তো এইরকম। একটা লোকের নাম ঝুলত ঢালাই লোহায় এমবস হয়ে, এখন তাও লোপাট হয়ে চলে গেছে কালোয়ারদের পট্টিতে, সেখান থেকে ঢালাইয়ের কারখানাতে। লোহার যা দাম! রাস্তার নাম খুঁজতে হলে বাড়ির নেমপ্লেট খুঁজতে হয়। নেমপ্লেটই বা কোথায়? একজন অ্যাডভোকেট, আর একজন ডাক্তারের। ডাক্তারের নেমপ্লেটে ঠিকানা লেখা নেই, আছে শুধু অ্যাডভোকেটের। অথচ অনেকেই বেশ বড় বড় চাকরি করে। যে দু'জনের আছে, পেশাগত প্রয়োজনেই আছে। বাকিরা নাম জাহির করার কথা ভাবেই না। যারা ভাবে, এ রাস্তাটা বোহয় তেমনই একজনের। লোকটি নিজে হয়তো—কোনওদিনই আত্মপ্রচার চায়নি, কিন্তু পুত্র কিংবা পৌত্ররা ওই ঢালাই লোহার ফলকটার মাধ্যমে নিজেরা বড় হতে চেয়েছিল।

রাস্তাটা কার নামে, আগ্রহ থাকলে সুধাকর জানতে পারত। একশো বছরের পুরনো দুচারখানা বাড়িও তো আছে, তাদের কেউ কেউ হয়তো জানে। কেউ না হোক, বিষ্ণুবাবু। বিষ্ণুচরণ। রাস্তাঘাটে দেখা হলে কথাবার্তা হয় দু'চারটে। জিগ্যেস করলে হয়তো অবাক হয়ে বলবেন, সে কি, জানেন না কার নাম? উনি তো ইয়ে ছিলেন। এই ইয়েটা কি বস্তু বিশদ করে বললেও সুধাকর বুঝতে পারত না। একটা রাস্তার নাম কেন যে সেই ব্যক্তির নামে হয়েছে খুঁজেই পেত না। সুতরাং জেনে কি লাভ!

আগে জল জমত, এখনও জমে। জমত বলেই সব বাড়িগুলোর প্লিনথ বেশ উঁচু। উঁচু হওয়ার ফলে ঠিক একতলা মনে হয় না। সামনে চার ধাপ সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি বেয়ে

উঠতে হয়। ওটুকু বে-আইনিভাবে করা হয়েছিল।

এই বাড়িটাই পাড়ায় লালবাড়ি নামে পরিচিত। দোতলায় একদিকে বাড়িওয়ালা, একদিকে ভাড়াটে। নীচে একদিকে সুধাকর, অন্যদিকে দত্তবাবু। তিনিও ভাড়াটে। কিন্তু অনেককাল পাশাপাশি থাকার ফলে ওরা সকলেই এখন পাড়ার লোক। পরিবারে পরিবারে বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। আর এপাড়ায় বাড়িওয়ালা ভাড়াটেদের মধ্যে তেমন কোনও অসদ্ভাব নেই। একে পাড়াটাই বিধ্বস্ত, মর্গে যাবার মুখে, তার ওপর রাস্তাটা সরু বলে কোনও প্রোমোটার টাকার থলি দেখিয়ে লোভ দেখায় না।

বাবা-মা অনেক আগেই গত হয়েছেন, সুধাকর নিজেই এখন মধ্যবয়সি। বোনরা বিয়ে করে সব দূরে দূরে, এক ভাই ছিল। তার বউ ছেলেও, এই সংসারেই। তিনখানা ঘরের পরেও বাথরুম রান্নাঘর ছাড়াও পিছনে একটু উঠোন-মতো, ঠিকে-ঝি বাসন মাজে, কল আছে। আগে খুবই অসুবিধে হত, ছোট ভাইয়ের বিয়ের পর তো আরও। বোনদের একে একে পার করে দিয়ে বাবা-মা গেলেন, সুধাকরের বিয়ের ক বছরের মধ্যেই তারপর প্রভাকর নিজেই বিয়ে করল। মুন্নি আর মন্টু হওয়ার পর, না সুধাকরের নয়, ছোটভাইয়ের ছেলেমেয়ে ওরা, এ বাড়িতে খুব অসুবিধে হত। তিনখানা ঘর হলেও বাথরুম একটাই। উঠে যাওয়ারও উপায় ছিল না, যেখানেই খোঁজে ভাড়া চারগুণ।

একটা কথা মনে পড়লেই সুধাকরের হাসি পায়।

সুধাকর সেবার বেশ কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, অফিস যেতে পারেনি। একদিন এক সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে হাফ্-বস্, অফিসে যাকে সবাই টি কে বলে, এসে হাজির। খুশি হয়েছিল।

যাবার সময় জিগ্যেস করলেন, ভাড়া কত ?

শুনে হেসে উঠলেন, আপনি তো মশাই বিনাভাড়ায় থাকেন।

এই ভাড়া দিতেই তখন সুধাকর হিমসিম খাচ্ছে, প্রভাকরের তখনও চাকরি হয়নি।

মুখের ওপর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কত মাইনে দেন স্যার ? আমি তো বলতে গেলে বিনা মাইনেতেই খাটছি। খাটাচ্ছেন। তাই না ?

এখন সুধাকরের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, তাও ওই কম ভাড়ার জন্যে।

ছোটভাই হঠাৎ বদলি হয়ে চলে গেল একেবারে ব্যাঙ্গালোরে। সপরিবারে। মুন্নি আর মন্টুকে নিয়ে।

স্থানাভাবের জন্যেই, আসলে ওই বাথরুম একটা, রান্নাঘরও, বারান্দা নেই, সুতরাং একটা চাপা অসন্তোষ ছিল দুপক্ষেই। সমস্যা সমাধান হয়ে গেল প্রভাকর চলে যেতেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটাও কেমন শূন্য হয়ে গেল। একটা হাহাকার চোখ ঠেলে অশ্রু হয়ে বের হতে চাইল। দুজনেরই। সুধাকর আর অতসীর। তিনখানা ঘরের এই একতলা বাড়ি যেন হঠাৎ একটা বিশাল শূন্যতার প্রাসাদ হয়ে গেছে।

শব্দ নেই, চিৎকার নেই, কান্না নেই। এ-ঘর ও-ঘর যেতে আসতে ঠোকাঠুকি নেই। কিচ্ছু নেই। শুধু নিস্তব্ধতা। প্রাণহীন।

অতসী একদিন সত্যি সত্যি কেঁদে উঠল ; আমার একটুও ভাল লাগছে না।

সুধাকর পুরুষমানুষ, কাঁদতে পারে না, ওর শুধু মনে হল মুন্নি আর মন্টুকে ছেড়ে জীবনটাই অর্থহীন।

কারণ অতসীর কোনও সন্তান হয়নি, হবেও না হয়তো। তার জন্যে যে খুব একটা দুঃখ ছিল প্রথম প্রথম তাও নয়।

একসময় অনেক অসুবিধে হত। ঘরভর্তি লোকজন। বাবা-মা ভাই বোন নিয়ে এই তিনখানা ঘরই তবু হঠাৎ হঠাৎ ঝাড়লণ্ঠন হয়ে উঠত। তারপর নিজে বিয়ে করল। সেও

কি কম আনন্দের দিন ছিল নাকি। সন্তান কি জিনিস ভাল করে বুঝতই না। একটু অভাব অভাব, বেশির ভাগটাই আত্মীয়স্বজন বা পাড়াপড়শির সমবেদনার খোঁটা। কিন্তু প্রভাকরের বিয়ের পর মুন্নি আর মন্টু সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। চলে গিয়ে অভাবটা কি তা জানিয়ে দিয়ে গেল।

তার পর থেকেই অতসীর চোখ কেমন বোবা-বোবা।

এখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে গেলে অনুশোচনা হয়। হয়তো অতসীরও। দুঃখ পাবে বলে কোনওদিন মনে পড়ায়নি। শুধু নিজের মনেই একটা দুঃখের হাসি হেসেছে।

এখন যেটাকে মনে হয় বুকফাটা আকাঙক্ষার বস্তু, কি আশ্চর্য, মানুষ তো নিজের ভবিষ্যৎ নিজে দেখতে পায় না, সেটাই ছিল ওদের দু'জনের কাছে একটা কৌতুককর আতঙ্ক।

সুধাকরের কলেজের বন্ধু গৌতম, এখনও দেখাসাক্ষাৎ হলে আড্ডা জমে ওঠে, ফুলসজ্জার রাতে পান চিবোতে চিবোতে বিদায়পর্বে দেখা করতে এল, হেসে বললে, বউটা দারুণ হয়েছে, সুধু, দারুণ থাকে যেন।

একটু থেমে বলেছিল, দুটি বচ্ছর বাচ্চাকাচ্চার দিকে যাবি না, ঝাড়া হাত পা দিব্যি ফুর্তি করে নে। বেড়াতে ফেড়াতে যাবি। তা না হলে দেখবি আমার মত লাইফ হেল।

গৌতমের কথা শুনে নয়, নিজেরই মনে হয়েছিল। বাবা-মা, বোনরা কেউ না কেউ জোড়ে এসে হাজির হয়, ওরা দু ভাই, বাড়তি জনসংখ্যা অতসী। অথচ সেই একটা কলঘর। ওরা বাথরুম বলত না। তবে অত হিসেবনিকেশ করে ভাবেনি। আসলে মনে একটু রোমান্স ছিল। আজকালকার মতো প্রেমফ্রেম করে নয়। নিছক কনে পছন্দ করে বিয়ে, তবু। প্রেম করে বিয়েতে বেশি কি সুখ আজও জানে না।

অতসীকেও কেউ তেমন উপদেশ দিয়েছিল কিনা, সুধাকর জানতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল ওরা দুজনই এ ব্যাপারে একমত।

সেই ঠোঁটে কৌতুকের হাসি নিয়ে কপট চোখরাঙানি হঠাৎ কোনওদিন মনে পড়ে গেলে দুঃখ হয়। অতসীর? অতসীরও কি মনে পড়ে যায়? তা হলে ওর বুকের ভেতরটা নিশ্চয় আরও নিঙড়ে ওঠে। সেজন্যেই আরও কষ্ট পায় সুধাকর।

—এই, অসাবধান হবে না একদম। অতসী চোখ রাঙিয়েছিল একদিন।

মৃদু আতঙ্ক পুষে পুষে দু'তিনটে বছর কাটিয়ে দিয়েছিল। কতদিন এখন আর স্পষ্ট মনেও পড়ে না।

সুধাকর ওর রাগ দেখে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, এমন ভাব করো যেন কলেজ পালিয়ে প্রেম করছ। আরে বাবা, বিয়ে করা বউ। এত ভয় কিসের।

ভয় একটু যে সুধাকরেরও ছিল না তা নয়। কিন্তু অতসীর কাছে ব্যাপারটা যেন আতঙ্ক।

একদিন বলেও ফেলেছিল অতসী। বলেছিল, সব জানা আছে, তখন আর আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। সব ভালবাসা তখন ওদিকেই চলে যাবে।

সে প্রায় শব্দ করে অট্টহাস হেসে উঠেছিল সুধাকর, আর অতসী পিঠে ফটাস করে একটা চাঁটি মেরে ধমক দিয়েছিল, কি হচ্ছে কি, বাবা-মা শুনতে পাবে যে।

ওই এক অস্বস্তি ছিল তখন। জোরে হাসতে পাবে না, ঘনিষ্ঠ কোনও কথা ফিসফিস ছাড়া বলা যাবে না, চেঁচিয়ে রাগ দেখানোও সে তো অসম্ভব, অসতর্ক হয়ে হঠাৎ হাত বাড়ানো যাবে না, দেখতে হবে ওদিকের জানালা এদিকের কপাটে খিল দেওয়া আছে কিনা। কারণ পাশের ঘরেই বাবা-মা, প্রভাকর অথবা জোড়ে আসা কোনও বোন-ভগিনীপতি। তাই মাঝে মাঝে একটু মন খুলে কথাবার্তা বলার জন্যে গঙ্গার পাড়ে

আউটরামে চলে যেত, কিংবা ভিকটোরিয়ায়। কিন্তু কথা আর কি, ফুচকা কিংবা ভেলপুরি খাওয়া হত শুধু।

অতসী একবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললে, এই, মা কি বলছিল জানো ?

—কি ? সুধাকর ভাবতেই পারেনি।

অতসী হাসিতে গা কাঁপাতে কাঁপাতে বললে, ডাক্তার দেখাতে বলছিল।

অবাক হয়ে সুধাকর জিগ্যেস করলে, কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

—বোকা কোথাকার। কিচ্ছু বোঝো না। চোখেমুখে এমন একটা কৌতুক আর ইঙ্গিত ছড়াল যে শেষে বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

হো হো করে হেসে উঠেছিল।

অতসীও তখন হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে, আমিও কিচ্ছু ভাঙিনি। ভাঙা যায় নাকি।

নিজের মনেই যেন বললে, আগেকার দিনের ওরা এত বোকা !

আগেকার দিনকে দোষ দিয়ে কি হবে, পিসতুতো বোন সুধাকরের, সে তো একালের, একবার বেড়াতে এসে অতসীকে বলে বসল, কি গো বউদি, নতুন খবর কিছু শোনাও। বলে অতসীর পেটের ওপর হাত বোলাল সুধাকরের সামনেই। প্রশ্ন করল সুধাকরকে, কি গো বড়দা, লুকোচ্ছে নাকি ? আমার কাছেও ?

অতসী তখন কত নির্ভেজাল হাসি হাসতে পারত এ-সব কথা শুনে। সুধাকরও।

একদিন, হজমটজম হয়নি হয়তো, দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে বেপাড়ার রেস্টুরেন্টে, অতসীই বায়না ধরেছিল, ফাউল কাটলেট খেয়েছিল। সুধাকরের কিছু হয়নি।

কিন্তু কাটলেটটা খারাপ ছিল কিনা কে জানে, একটা ভাল কাফে ছিল কাছাকাছি, তবু সস্তা হবে বলে সুধাকর সস্তার রেস্টুরেন্টেই ঢুকেছিল, ফল হল এই, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই অতসী কলঘরের দিকে ছুটল। একটু পরেই অক অক শব্দ। বমি করছে।

অতসীর কিছু একটা হলেই সুধাকর বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়ত।

অতসী দু একবার ধমক দিয়েছে, ও রকম করো কেন বলো তো। সবারই সামনে, আমার বড় লজ্জা করে।

সুধাকর বে-রসিক ছিল না। ঠাট্টা করে বলেছিল, কি করব বলো, একটাই তো বউ আমার।

চিমটি।

সেই অতসী ফাউল কাটলেট খেয়ে বমি করছে, সুতরাং সুধাকর চুপ করে থাকবে কি করে। বিশেষ করে সস্তার দোকানে কাটলেট খাইয়েছিল বলে ওর একটু আক্ষেপও ছিল।

সুধাকর তাই 'কি হল' 'কি হল' বলে ছুটতে গেল কলঘরের দিকে। তার আগেই দেখল, মা দাঁড়িয়ে আছে পাশের ঘরের দরজায়, চোখ দূরের কলঘরের দিকে, মুখে চাপা হাসি, চোখে তৃপ্তি, বলে উঠল, ও কিছু না, ও কিছু না।

সুধাকরের মাথার মধ্যে একটা চিড়িক দিল, ও নিজের ঘরটিতে ফিরে এল। আর অতসী মুখ হাত ধুয়ে দিব্যি ফ্রেশ হয়ে ঘরে ঢুকতেই মা কি ভেবে বসেছে, সেই খবরটা জানিয়ে দিল অতসীকে।

সঙ্গে সঙ্গে অতসী চোখ বড় বড় করে বললে, সব্বোনাশ। তারপর আঁচলে মুখ চেপে হাসি আর থামাতে পারে না।

সমস্ত ব্যাপারটাই তখন বেশ মজার। এক একজন এক এক কথা ভাবছে আর তা নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে হাসাহাসি।

অতসীর মার ভাবনা একদিকে, এ-বাড়ির মার ভাবনা অন্যরকম। হবে না কেন। কাল বদলালেও মারা সেই মায়েদের মতই। শুধু শাড়ির ডিজাইন বদলে যাচ্ছে, পোশাকের ছাঁটকাট। আগে পুরুষরা শুধু হেয়ার কাট সেলুনে যেত, আজকাল মধ্যবয়সী মাতৃদেবীরাও। সেলুন কি রে, পার্লার বল। অতসীকে ওর মামাতো বোন শুধরে দিয়েছিল। তারা বালিগঞ্জের দিকে থাকে।

অতসীর চেয়ে বয়েসে ছোটই, ও বয়েসে বয়কাট করা চলেও। একটু ছেলে-ছেলে পোশাকে মানায়ও। কত অসাহসী মা তো নিজেদের আকাঙক্ষা পুরিয়ে নেয় মেয়েদের ওপর দিয়ে, তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে দেখে।

কিন্তু অতসী মামাতো বোনকে দেখেই প্রায় আঁতকে উঠেছিল। সে কি মিলু, সেলুনে গিয়ে চুলগুলো মুড়িয়ে এসেছিস।

মিলু ইংলিশ-মিডিয়াম, তাই শুধরে দিয়েছিল। পার্লার।

ওই মিলুর মাও হয়তো মিলুর বিয়ের পর সেই আগেকার দিনের মায়েদের মতোই হয়ে যাবে।

যত তফাতই থাক, এদিক থেকে অতসীর দুবাড়ির দু মা সমান। শুধু একজনের ঘুম নেই, কেমন এক ধরনের চাপা আশঙ্কা, শেষে মুখ ফুটে বলেই ফেলে, হ্যাঁ রে, ডাক্তারটাক্তার দেখিয়েছিস ? দেখা। আরেকজনের মুখ ভার-ভার কেন বুঝতে পারত না, আড়াল থেকে লক্ষ করছেন, মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, ঝট করে চোখ ফেরাতেই অপ্রস্তুত। কিন্তু তার আগেই দুশ্চিন্তায় ভুরু কোঁচকানো চোখে পড়ে গেছে অতসীর, বিব্রত লেগেছে, বুঝতে পারেনি। এখন জলের মত পরিষ্কার। ও কিছু না, ও কিছু না। অক্ অক্ শুনেই। হাসি আর থামে না অতসীর।

সুধাকরের ছোটমাসি অত বোকা নয়, একটু ফাজিল ধরনেব, বয়সও তেমন নয়, একদিন এসে, হোক না মাসশাশুড়ি, ধমকের সুরে অতসীকে বললে, কি হচ্ছে কি, ইয়ার্কি পেয়েছিস ? আর দেরি করিস নে।

ছোটমাসি প্রথম থেকেই তু-তোকারি করে আসছে।

সব শুনে সুধাকরও আর হাসল না, বললে, ঠিকই তো বলেছে ছোটমাসি।

অতসী কৌতুকের হাসি নিয়ে সুধাকরের মুখের দিকে তাকাল, চোখের দিকে। প্রশ্নের ঢঙে চাপা হাসির মুখে বলল, তবে তাই ?

—কি সুধাকরবাবু, বাচ্চাটাচ্চা হল না কিছু ? অফিসের সেই হাফ-বস্ একদিন জিগ্যেস করেছিলেন। হেসে হেসে বলেছিলেন, অন্নপ্রাশনের খাওয়াটা যে ক্রমশই পিছিয়ে দিচ্ছেন।

এমন কি সেই কলেজের বন্ধু গৌতমও একদিন দেখা হতেই বললে, কি বাবা, দেশের জনসংখ্যা কমানোর ভার কি একা তোরই।

সুধাকরের মনে হয়েছিল, সকলে অন্য কিছু ভাবছে না তো। কিছু বলাবলি করে না তো। হেসে ফেলেছে আবার খারাপও লেগেছে। পরচর্চায় ছেলেরাই কি কম যায় নাকি। ধুত্তোর। তার চেয়ে ওদের সন্দেহ দূর করে দেওয়াই ভাল।

অতসী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, তবে তাই ?

শুনে মনে হল অতসীর বুকের মধ্যে হয়তো একটু সংশয় জেগেছে, কিংবা অস্বস্তি, পাঁচজনের কথাবার্তায়।

এই সময়েই, বছর খানেকের মধ্যে মা হঠাৎ, সুধাকরের মা, মাত্র দেড় মাস ভুগে মারা গেল। ক্যান্সারে। পেটে ম্যালিগনেন্ট টিউমার। বাবা তারও বছর দুই পরে। হার্ট অ্যাটাক। সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে যেতেই পারেনি। কারা যেন বন্ধ ডেকেছিল।

পাড়ার ডাক্তারও এলেন, কিন্তু তাঁর টেলিফোন বিকল। সে তো সব সময়েই। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে শেষ অবধি যখন পৌঁছল, ইমার্জেন্সির ডাক্তার রেগে গিয়ে বললে, মেরেই তো এনেছেন। ওরা শেষ অবধি চেষ্টা করেছিল, পারল না।

সুধাকরের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, মার পেটে ক্যান্সার বোধহয় দুশ্চিন্তা থেকে। নাতি-নাতনি কারও মুখ দেখতে চেয়েছিল হয়তো। তা না হলে পুজোআচ্চা এত বেড়ে গিয়েছিল কেন? কোথায় কোন ঠাকুরের আস্তানায় অতসীকে নিয়ে গিয়ে হাতে ফুলপাতার তাগা বাঁধিয়েছিল কেন?

অধিক বয়েসে পৌঁছে এই সব কামনা হয়তো মনে জাগে, চরিতার্থ না হলে বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খায়। অনেকে তো শোনা যায় ছেলের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাবে। একালে আইনে আটকায়. তাই ডিভোর্সের কথাও তোলে। সুধাকরের মা অবশ্য তেমন কিছু বলেনি কোনওদিন। অতসীর ওপর খুব তুষ্ট ছিল। তবু ওর মনে একটা সন্দেহ, হঠাৎ ক্যান্সার কেন।

মা'র তেমন একটা বাসনা থাকারই কথা। থাকবে না কেন। ওদের নিজেদেরও তো ছিল। শুধু দুটো দিন পিছিয়ে দেওয়া। তবু, ফাঁকে ফাঁকে মনে হত, ও আর অতসী যেন একটু দূর দূর, পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে। দুজনে এক একসময় বড় একা, একা। একটা বাচ্চা শিশু, ছেলেই হোক মেয়েই হোক, আধো আধো কথা, টলমল টলমল করে ঘুরে বেড়াবে, সারা বাড়ি তোলপাড়, সে এক অন্য আনন্দ।

অতসী বলেও ফেলল, জীবনটা কি আর অঙ্ক। আগেকার দিনের মানুষরাই ঠিক বুঝত। বলে হাসল।

অর্থাৎ অতসীও কখন থেকে যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। বলবে কি করে, ও নিজেই তো ভয় পেয়েছিল, সুধাকরের কাছে ওর টান কমে যাবে। ও যে তখন সুধাকরকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। কিংবা ও সবই অজুহাত। প্রকৃতিতে একটু কুঁড়ে ছিল বলেই ঝক্কিঝামেলা বাড়বে ভেবে বছর দুই পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারপর কখন থেকে যে একা-একা লাগতে শুরু করেছিল খেয়ালই করেনি।

কাকে যেন বলে ফেলেছিল, বোধহয় সামনের বাড়ির মেয়েটাকেই, কলেজে পড়ে। বলেছিল, সময় আর কাটতে চায় না ভাই। দুপুরে ঘুমোতে পারি না যে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছিল কি!

মেয়েটা হেসে উঠে বলেছিল, কি যে বলো বৌদি, দাদার বাচ্চাটা আসার পর থেকে কেউ তো সময়ই পাই না। তোমারও একটা আসুক, তখন দেখবে।

তারপর থেকেই ইচ্ছেটা জাগছিল। মুখ ফুটে জানাতে পারেনি।

ওই চাপা ইচ্ছেটাই কৌতুকের সঙ্গে বলে উঠল, তবে তাই?

ভাগ্য যে ওর সঙ্গে এমন পরিহাস করবে কে জানত। ও তো এতকাল ভেবে বসেছিল, সুধাকরও, যে ওদের ইচ্ছেটাই বড় কথা। মজা পেয়ে এসেছে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছে। সেগুলোই যে শেষে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরই ব্যঙ্গ করবে একদিন, ভাবেনি।

সেই অক্ অক্ করে বমি করতে যাওয়া নিষ্ফল হল দেখে ভেঙে পড়েছিল ওর মা।

তারপর যে এমন হবে, ভাবতেই পারেনি।

অতসী নিজেও কেমন বিভ্রান্ত। সুধাকর বিষণ্ণ।

এ-বাড়ির মার চোখের দৃষ্টিও তখন অতসীর কাছে অসহ্য লাগতে শুরু করেছে, সুধাকরের কাছেও নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগে।

—কি যে সব সেকেলে ধারণা। সুধাকরকেই হাসতে হাসতে একদিন বলেছিল, একটু চাপা বিরক্তিতেই। শাশুড়ি যেদিন ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কোন ঠাকুরের আস্তানায়। বাহুতে ফুলবেলপাতার পুঁটুলি বাঁধতে বাধ্য হয়েছিল। ওই লালসুতোর তাগা তিন দিনও রাখেনি। সব সময় ব্লাউজের হাতায় ঢেকে রাখা যায় নাকি। আর রাখবেই বা কেন, মা যা ভেবে বসেছে তা তো সত্যি নয়।

—আমার কি মনে হয় জানো। সুধাকর একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেলেছিল, ওই এক কষ্ট থেকেই, চিন্তায় চিন্তায় মার ক্যান্সার।

মারা যাওয়ার পর একদিন বলেছিল।

অতসীর একটু রাগ হয়েছিল, হয়তো অক্ষমতার জন্যেই। দুঃখ আরও বেশি। ও নিজেও তো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। সেই স্বপ্ন যে কয়েক মাসের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন হয়ে যাবে কে ভেবেছিল।

তা বলে ও চটপট ঠাকুরদেবতা করতে শুরু করেনি। একটু আশায় আশায় ছিল, দুরাশাই বলতে হবে। শেষ অবধি না হয় ডাক্তারের কাছেই যাবে। অপারেশন-টপারেশন করলেও তো...

—মা আবার একদিন যাবেন? সেই ঠাকুরের আস্তানায়?

না, সত্যি সত্যি বলে বসেনি। কেমন এক বিবর্ণ বিষণ্ণতায় অতসী লুটিয়ে পড়েছিল বিছানায়, শূন্য দুপুরে, আর মনে মনে না অস্ফুটে বলে ফেলেছিল, তাও জানে না।

কিন্তু তখন আর সুধাকরের মার সে অবস্থা নেই। শরীরটা শীর্ণ হতে হতে বিছানার সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। কেউ টের পায়নি, সন্দেহও করেনি। যন্ত্রণা যন্ত্রণা, কিসের যন্ত্রণা বুঝতেই পারেনি।

সুধাকরের বাবা গুম্ হয়ে গেছেন, দু ছেলে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

শবদেহ খাটের ওপর শোয়ানো। মেয়েরা এসেছে, সাজিয়ে দিচ্ছে কে যেন।

সুধাকরের বাবার চোখের কোণে দুফোঁটা জল। অতসী বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে দেখল।

—এই কদিন যা ছোটাছুটি করলি, দুদিন আগে যদি করতিস। শ্বশুরের কান্নাচাপা কণ্ঠস্বর শুনেছিল অতসী।

মা'র জন্যেই যারা এটুকু করারও সময় পায়নি, তারা, মানে ওই সুধাকর, সে কিনা সময় করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

একটা আক্রোশ ছিল তখন সুধাকরের ওপর। কিন্তু সেটা মিথ্যে আক্রোশ। এখন বোঝে। এখন আর অতসীর কোনও কষ্ট নেই। ওর কোলে সত্যি সত্যি স্বর্গ চলে এসেছে।

তিন

পোষ্যপুত্র শব্দটা আজকাল শুধু অভিধানেই পাওয়া যায়, ব্যবহার করা হয় কেবল ঠাট্টার ছলে। শিক্ষিত মহলে তো একেবারে শোনাই যায় না, এমন কি অপুত্রক ধনী মানুষরাও একালে একটি কন্যা সন্তানেও তুষ্ট। তাও যদি না থাকে, এত সম্পত্তি কার ভোগে লাগবে ভেবে বিচলিত হয় না। দান-ধ্যান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

না ছেলে না মেয়ে সন্তানহীনা দম্পতিরাও কাউকে পুষ্যি গ্রহণ করার কথা ভাবেই না। বুকের লুকোনো ক্ষোভ যা কিছু, তার সঙ্গে দীর্ঘদিন সহবাস করতে করতে একসময় অভাববোধটাও ভুলে যায়। যেটুকু বা থাকে তাও ভুলিয়ে দেয় আত্মীয়-স্বজনের কোনও

সন্তান। মা হওয়ার বাসনা চরিতার্থ না হলে নিজের অপূর্ণতা বা অক্ষমতা কাঁটার মতো বেঁধে ঠিকই, নিজে ভুলে থাকলেও হঠাৎ হঠাৎ কোনও নির্দোষ প্রশ্ন বা নির্বোধ সমবেদনায় কেউ না কেউ কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। কখনও কখনও সেসব কাঁটার মধ্যে চাপা শ্লেষও থেকে যায় হয়তো, মনোমালিন্য ঘটলে বিষাক্ত ফলাও। আসলে মানুষের অর্ধেকটাই যে পশুত্ব, তা থেকে উঠে আসবে কি করে।

কিন্তু নিঃসন্তান যে কোনও দম্পতির বুকের মধ্যে জমা হয়ে থাকা স্নেহপ্রীতি সব সময়েই বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। শেষ অবধি গিয়ে সেটা আশ্রয় নেয় কোনও নিকট কিংবা দূর আত্মীয়ের সন্তানটির কাছে। ভাইয়ের ছেলে, বোনের মেয়ে, অভাবে পাড়াপড়শির ছেলেমেয়ের ওপরও সেই স্নেহ বর্ষিত হয়।

তাই পোষ্য গ্রহণের কথা আজকাল বড় একটা শোনা যায় না।

অনাথ শিশু আর কুড়োনো ছেলেদের নিয়ে গিয়ে তাদের এক টুকরো বাসস্থান জুটিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু কিছু আশ্রম আছে। তাদের কথা লোকে ভুলেই থাকে। আজকাল বিদেশে কালোকুলো এই বাচ্চাগুলোকে কেউ কেউ নিয়ে গিয়ে, মানে অ্যাডপ্ট করে, কিছু যত্নআত্তি নাকি করছে। তা নিয়ে নানারকম সন্দেহও।

সুধাকর একদিন তার অফিসে নিজেই শুনেছিল।

কে একজন উত্তেজিত ভাবে বলেছিল, গাভমেন্টের এসব অ্যালাও করা উচিত নয়। নিয়ে গিয়ে স্মাগলার করবে হয়তো। মেয়েগুলোকে কোন লাইনে পাঠাবে সে তো জানাই।

আলোচনা জোর তর্কাতর্কিতে গিয়ে পৌঁছেছিল।

একজন টিপ্পনী কেটে বললে, এখানে থাকলেও শেষ অবধি যেত কোথায়? সেই স্মাগলিং নয়তো ভিখিরি, আর মেয়েগুলো! আশ্রয় জোটে কজনের।

উত্তেজিত ব্যক্তিটির উত্তেজনা তখন যুক্তি ছেড়ে কণ্ঠস্বরে।

আর তখনই টি কে, সুধাকরদের হাফ-বস্ বলে বসলেন, আসল কথাটা বলুন না, বড় বুকে লাগে, রাস্তার ছেলে ঘেন্না কুড়িয়ে রাস্তায় থাকবে, এটাই দেখতে ভাল লাগে। আমার ছেলেকে টেক্কা দিয়ে সে ব্যাটা সাহেব হয়ে যাবে, প্যান্ট কোট পরবে, ভাল খাবে, বুকে বড় ব্যথা লাগে, বুঝলেন।

হাফ-বসের দিকে অনেকেই সায় দিল হাসতে হাসতে।

একজন বললে, খাঁটি কথা। বিশ্বাস করুন, আমার সত্যি মনে হয়েছিল, তার চেয়ে বাবা আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বিলেতে পড়া না।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল, উত্তেজিত ছোকরাটিও।

আর হাফ-বস্ এবার রং পাল্টে বললেন, তবে সত্যি বড় সম্মানেও লাগে, গাভমেন্টের এসব বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।

একজন না ভেবেই বলেছিল, অ্যাডপটেশনও।

তারপরই কথাবার্তা বিষয়ান্তরে চলে গিয়েছিল। বিষয়টা কাউকে বিশেষ ভাবে ছুঁতে পারেনি। এমন কি সুধাকরকেও নয়। কারণ এ-সব কথা তখন তার মাথাতেই ছিল না। শুধু বুকের মধ্যে একটা কষ্ট ছিল, নিজের জন্যে যত না, অতসীর জন্যে বেশি। আলোচনাটাই ওর ভাল লাগেনি, ভিতরে ভিতরে কেমন এক অস্বস্তি বোধ করেছিল, যেন সবাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ও নিঃসন্তান, তাই ফাইলের ওপর চোখ রেখে এমন কর্মব্যস্ত ভাব দেখিয়েছিল যেন ওদের কথা কিছু কানেই যাচ্ছে না।

তর্কবিতর্ক হঠাৎ দপ্ করে নিভে গিয়ে একেবারে নিঃশব্দতা এবং পরমুহূর্তে হিন্দি সিনেমায় চলে যাওয়ায় ও সন্দেহ করেছিল, কেউ ইশারায় ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে

দিয়েছে। সে আরও অস্বস্তি।

সন্তানহীনদের সবচেয়ে বড় দুঃখ বোধহয় সন্তানহীনতা নয়, চারপাশের কৌতূহলী দৃষ্টি আর মৌখিক সমবেদনা তার চেয়েও বেশি জ্বালা ধরায়। যা ছিল, তা চলে গেলে নিশ্চয় অভাববোধ জাগে, দুঃখ হয়। কিন্তু যা ছিল না, থাকার সুখটাই তো জানা নেই, তা হলে দুঃখ হবে কেন! কে জানে, হয়তো হয়।

একসময় মাধুর মা অমলা মাঝে মাঝে আসত সুধাকরদের বাড়ি। মাধুর বাবা মনোতোষ ঠাট্টা করে এক একদিন জিগ্যেস করত, দুপুরে সেলাইয়ের ইস্কুলে গিয়েছিলে? কোনও একটা কাজ বলে গিয়েছিল হয়তো, অমলা ভুলে গেছে, সেজন্যেই এই ঠাট্টা।

শীতের দিনে, রাস্তায়, প্রভাকরের গায়ে একটা নতুন ডিজাইনের সোয়েটার দেখে এবাড়িতে আসা শুরু। কে বুনেছে, শিখিয়ে দেবে?

অতসী খুব ভাল ভাল ডিজাইনের উল বুনতে জানত। সামনের বাড়ির মেয়েটার জন্যে একটা করেও দিয়েছিল। বেশ শক্ত, দেখে দেখেও তুলতে পারেনি।

শেষে একদিন এসে হাজির হল। মাধুকে সঙ্গে নিয়ে। মাধু তখন বছর তিনেকের। সাহস করে বলতে পারল না, উল কিনে দেব, বুনে দেবে?

বললে, শিখিয়ে দাও না ভাই। মাধুর জন্যে একটা বুনব।

সেই শুরু। শিখতে শিখতে অমলার নেশা ধরে গিয়েছিল। বাড়িসুদ্ধ সবারই জন্যে নতুন নতুন ডিজাইন শিখে নিয়ে বুনে দিয়েছে। যে দেখত সেই প্রশংসা করত, আর প্রশংসা এমন জিনিস তখন আর পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে হয় না।

শুধু মনোতোষ মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটত, চোখের মাথাটি খাবে!

অমলা শুনে হাসত শুধু।

এসে অতসীকে বলত, তোমার প্রশংসাগুলো সব আমি পাচ্ছি, রাগ করছ না তো!

অতসী হাসত শুধু। ওসব উল বোনার প্রশংসা কুড়িয়ে ও কি করবে। নিজে জানে, পরকে শেখাচ্ছে। তা নিয়ে ওর অত মাথাব্যথা নেই। বরং এই উলবোনাকে উপলক্ষ করে অমলাদি যে প্রায়ই আসে এটুকুই ওর উপরি পাওনা। কারণ, তিন বছরের মাধুকে সঙ্গে নিয়ে আসে অমলাদি।

ফুটফুটে কি সুন্দর দেখতে এক ফোঁটা মেয়েটা।

আসতে না আসতে মাধুকে কেড়ে নিত অতসী। তারপর তার সঙ্গেই মেতে উঠত খেলায়। আদর ঢেলে দিত। অমলা তিনবার প্রশ্ন করলে তবে একটা উত্তর, বোনার কাঁটা দুটো নিয়ে বেশ খানিকটা বুনে দিয়ে আপন-আপন গলায় ধমক দিত, মনে রাখতে পারো না কেন!

একদিন এই রকম, মাধুকে নিয়ে খুব মশগুল, লক্ষই করেনি কখন মা, মানে সুধাকরের মা, এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায় হাত দিয়ে।

অতসী আদর করছে মাধুকে।

হাসতে হাসতে বললেন, পরের ছেলেকে আদর করে কি হবে!

অতসীর হাত দুখানা মাধুকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, অবশ হয়ে গেল। মুখ বিবর্ণ। শুধু মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি এনে অস্বস্তি কাটাতে চাইল।

অমলা বাধা দিয়ে বলে উঠল, সে কথা কেন বলছেন মাসিমা, হবে হবে।

একটা স্তোকবাক্যের মতো।

অমলা যাবার সময় ওর হাত ধরে ফিসফিস করে বলেছিল, তুমি এবার একটা ডাক্তারের কাছে যাও অতসী।

শুধু উপদেশ আর উপদেশ, তার সঙ্গে মিশে থাকে কিছু সমবেদনা। সে যেন আরও

অসহ্য। এর চেয়ে সকলেই ভুলে থাকে না কেন, তা হলে অতসী নিজেও ভুলে থাকতে পারত।

ও আর মুখ ফুটে অমলাদিকে বলতে পারেনি, গিয়েছিলাম। ওটাই তো এখন শেষ ভরসা।

একে একে সবই করেছে ও, মানত, তাগা, আঙুলের আংটিতে গ্রহরত্ন। এককালে কিছুই বিশ্বাস করত না। যে যা বলেছে, বিশ্বাস করে বসেছে। শেষে সব কিছুর ওপর আবার অবিশ্বাস। ওসব করে কিছুই হয় না, কিছুই হয় না।

ডাক্তার বলেছিল, একটা ছোট্ট অপারেশন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে তাও করিয়েছিল। শেষ ভরসাটাও যখন ওকে বিমুখ করল তখন কান্না ছাড়া আর কিই বা করার ছিল। নিজের অক্ষমতায় নিজেই কেঁদেছে। আসলে ওর বুকের ভেতরটা সন্তানের জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিল, নাকি সকলের সামনে একটা আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে চাইছিল তা ও নিজেও জানে না।

কোনও এক মেলায় গিয়েছিল একবার। ঘুরতে ঘুরতে ঘুগনি খাওয়ার বায়না ধরে সুধাকরকে টেনে নিয়ে গেল। বেশ খুশি খুশি লাগছিল ওর, কেনাকাটাও করেছে ইচ্ছেমতো। রঙ্গরসিকতাও।

হঠাৎ টেবিলের উল্টোদিকে পকৌড়া খেতে খেতে এক ভদ্রমহিলা আলাপ জুড়ে দিলেন। সঙ্গে তিন তিনটি বাচ্চা।

কেমন নির্দোষ ভাবে প্রশ্ন করলেন, ছেলেমেয়েদের আনেননি কেন, ওদের খুব ভাল লাগত।

আসলে শিশুদের মন ভোলানোর মতো অনেক কিছুই তো ছিল মেলায়, দোষ নেই তাঁর।

মুখের হাসিটা কেমন বিকৃত হয়ে গেল অতসীর। বললে, নেই।

—বেঁচে গেছেন, বেঁচে গেছেন। আমি তো তিন তিনটেকে নিয়ে নাজেহাল। হাসলেন ভদ্রমহিলা।

আসলে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলা। কিন্তু অতসীর মন থেকে সব খুশি-খুশি ভাব, একটু আগের উচ্ছল আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল।

ফেরার সময় সারা রাস্তা গুম্ হয়ে রইল অতসী, একটাও কথা বলেনি সুধাকরের সঙ্গে। সুধাকরও চুপচাপ। ও কি ভাবছিল কে জানে।

রাতে ঘুম আসেনি, বালিশটা বুকের ওপর চেপে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা করেছে। বালিশ নয়। যেন শিশু সন্তানকেই কোলে চেপে ধরেছে।

পাড়ার সকলেই জেনে গিয়েছিল ওদের সন্তান হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বছরের পর বছর কেটে গেছে। অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সকলেই। আর কেউ কোনও আলোচনাও করত না।

ইতিমধ্যে প্রভাকর বিয়ে করল। সংসারে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এল পরপর। ব্যস্। আর কোনও চিন্তা নেই। তাদের ওপরই সব স্নেহ ঢেলে দিয়েছিল। বুকের ভেতরের সেই শূন্যতা যেন ভরে দিয়েছিল তারা।

অন্তত তাই মনে হত সকলের। সুধাকরেরও।

তারপর হঠাৎ একদিন প্রভাকর বদলি হয়ে চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। আর ছোট ছোট তিনখানা ঘর যেন হঠাৎ বিশাল এক শূন্যতার প্রাসাদ হয়ে গেল।

পাড়ায় আবার নতুন করে আলোড়ন উঠল। প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল সকলেই,

খবরটা শুনে।

মাধু বলেছিল, এইটুকুন মা, এক্কেবারে এইটুকুন।

বিশ্বাস হয়নি অমলার। সেজন্যেই ছুটে গিয়েছিল দোতলার জানালায়। যদি পাশের বাড়ির বড় বউ কিছু বলতে পারে।

উল বুনতে শেখার পর আর তো বড় একটা যেত না অমলা। কদাচিৎ দেখা হলে দু-একটা কথা শুধু।

কিন্তু খবর রটে যেতে সময় লাগল না।

সকলেই শুনে অবাক হয়ে গেল, কেউ কেউ আড়ালে হাসাহাসি করল।

—পুষ্যি নিয়েছে? ওসব আবার আজকাল কেউ নেয় নাকি? মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

চুক্কুর মা হাসতে হাসতে বললে।

ক্লাব ঘরে একজন বয়স্ক লোক বললে, অ্যাডপটেশন? আজকের দিনে? কেন বাবা, আমাকে অ্যাডপ্ট করলেই তো পারতে।

মাধুর মা কিছুই বললে না। কোনও উপহাসও নয়। কিন্তু কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না।

সপ্তাহ দুই কোনওক্রমে নিজেকে আটকে রেখেছিল।

শেষে একদিন গিয়ে হাজির হল অতসীর কাছে। মাধুকে সঙ্গে নিয়ে।

শাড়ি বদলে মুখে চটপট পাউডার বুলিয়ে কপালে একটা টিপ পরে নিয়ে অভ্যাসবশে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল অমলা।

তার আগেই মাধু সেজেগুজে তৈরি। ওর আগ্রহই সবচেয়ে বেশি।

বাবা-মাকে মাঝে মাঝেই অতসী মাসিদের বাচ্চাকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুনেছে।

শুনে আব্দার ধরেছে, চলো না মা একদিন গিয়ে দেখে আসি।

শেষে বাবাকে বলেছে, তবে তুমি চলো।

বাবা-মার কেন যে এত অস্বস্তি মাধু বুঝতেও পারে না। আশপাশের যে-কোনও বাড়িতে কারও বাচ্চা হয়েছে জানলেই তো মা গিয়ে দেখে আসে।

বাবা কিংবা মা একবার মুখ ফুটেও বলে না, তুই নিজেই যা না। আগে তো দিব্যি এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে বেড়াত, মা কিছু মনে করত না, বাবা বকুনি দিত না। কত স্বাধীনতা ছিল তখন।

স্বাধীনতা এখন যে একেবারে নেই তাও নয়। স্কুলে যায়, কাছাকাছি কোনও দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে হলেও একাই যেতে পায়। কিন্তু মাথা নিচু করে প্রায় ছুটতে ছুটতে যায়, ছুটতে ছুটতে আসে। মার নির্দেশে, নাকি নিজেই ভয় পায় বলে, তাও জানে না।

তেরো বছর বয়েসে পৌঁছনোর পর থেকে ওর সব সময় কেমন এক অস্বস্তি, নিজেকে নিয়ে। শরীরে দ্রুত একটা পরিবর্তন আসছে বলেই যে নিজেকে নিয়ে তার লজ্জা বাড়ছে তাও নয়। আরও যখন ছোট ছিল, দু বছর আগেও, বিষ্ণুচরণ পথ আটকে 'মধুবিশ্রী' বলে ডাকলে ছুটে পালাত না, এড়িয়ে যেত না। পুরুষদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে শেখেনি। এমনিতে মাধু দেখতে বেশ ছিমছাম সুশ্রী, কেউ কেউ সুন্দরীও বলে। ওর শুনে বেশ ভাল লাগে। আর এমনিতে ওর তো বেশ চটপটে ফুর্তি-ফুর্তি চেহারা, হেসে হেসে নেচে নেচে কথা বলে। রাস্তায় ঘাটে যে দেখে তারই ভাল লাগে। ডেকে কথা বলে।

এতকাল ভাল লাগত, নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ে কথা বলত। এখন বলে না।

মা মাঝে মাঝেই উপদেশ দেয়, বকুনিও। শুনে শুনে ওর মনের মধ্যেও একটা ভয় জড়িয়ে গেছে। পুরুষদের সম্পর্কে।

একদিন বটুকবাবুদের বাড়ি গিয়েছিল, তিনখানা বাড়ি পরে, দ হওয়া রাস্তায় বাঁক পেরিয়ে বাড়িটা। বটুকবাবুর মেয়েই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল।

মা চটেই অস্থির।

পাড়ার দুতিনজন মিলে পার্কের কোণায় ফুচকা খেতে গেলে আপত্তি নেই, সন্ধের পর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করলেও না। কিন্তু কারও বাড়িতে গেলেই রাগারাগি। কেন তাও বুঝতে পারে না। সেদিন বটুকবাবু তো ওর সঙ্গে কথাও বলেননি, তাকিয়ে দেখেনওনি।

এখন নিজেই ভয় পায়, যায় না।

কিন্তু সেই যে একদিন অতসীমাসিকে এত্তটুকুন একটা বাচ্চাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে সুড়ুত করে ঘরে ঢুকে যেতে দেখেছিল, তার পর থেকে এত যেতে ইচ্ছে হয়েছে, মাকে বলেছে, মা কেবলই এড়িয়ে যায়। বাবাকে ধরেছে, বাবা হেসে বলেছে, যাব যাব। ব্যস্।

অথচ ওদের যদি সময় না হয়, ইচ্ছে না থাকে, একবার তো বলতে পারত, যা না তুই নিজেই দেখে আয়।

অথচ আগে মা কত ঘন ঘন যেত, শীত পড়ার অনেক আগে থেকে। একটু বড় হয়েও দেখেছে। আজকাল মা আর উল বোনে না, নেশাটা কেটে গেছে।

একদিন রেগে গিয়ে মাকে বলেও ফেলেছিল। সাত্থপর, তোমরা সবাই সাত্থপর। উল বোনার জন্যে তো বেশ যেতে পারতে।

মা ঠোঁট টিপে হেসেছে, ওর রাগ দেখে বলেছে, যাব যাব।

সেই এতদিনে সময় হল।

অমলার কেন যে অস্বস্তি সেটুকুই বোঝে না কেউ।

চুক্কুর মা বলেছিল, সব জিনিসের একটা বয়েস আছে।

সত্যি তাই। বিয়ের পর পরই যদি অতসীর কোলে একটা বাচ্চা আসত, ওরা সবাই যেত। দেখে আসত। উপদেশ-টুপদেশ। মিছরির জল, গ্রাইপ ওয়াটার, গায়ে কিংবা কপালের পাশে এক পোঁচ কাজল টেনে দিয়ো, নজর লাগবে না।

এত বয়েসে অতসীর নিজেরই যদি সন্তান হত তা হলে ওসব আর বল' যেত না। হয়তো বলে উঠত, জানি জানি, সব জানি।

সত্যি সত্যি অতসীর নিজের সন্তান কিনা, তাও জানে না। না হবারই কথা। আজকাল বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, অত লক্ষ করে কেউ দেখেওনি।

চুক্কুর মা তো বলেছে, মাসখানেক আগে দেখেছিল, অসম্ভব।

ঠিক ঠিক খবর কেউই দিতে পারেনি। সকলেই আন্দাজে ধরে নিয়েছে, পুষ্যি। অর্থাৎ সুধাকর কোথাও থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে এসেছে। একজন তো সন্দেহ করে বসল, হাসাপাতাল থেকে চুরি। আরেকজনের ধারণা, কুড়িয়ে পাওয়া।

এমন একটা খবরে পাড়া তোলপাড় হবারই কথা। বাঁকা অভিযোগও শোনা গেছে সেজন্যেই।

যাকে তাকে একটা পুষ্যি নিলেই কি হল নাকি। তোমার দাদার ছেলে কি বোনের মেয়েকে নিয়ে এসে কাছে রাখো, মানুষ করো, কেউ কিছু বলবে না। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নাও যত খুশি।

তার বদলে সত্যি যদি একটা বাচ্চাকে আডপ্ট করে থাকো, কোত্থেকে আনলে তাকে,

সবারই জানার অধিকার আছে। আমরা সকলেই সমাজে বাস করি। যা খুশি করতে চাইলেই করতে পারি না। অজাত অকুল থেকে যদি নিয়ে এসে থাকো, শেষে বড় হয়ে চোর ছ্যাঁচোড় হয়ে দাঁড়ালে পাড়ারই বদনাম। একটা বেঘোর লম্পট হয়ে দাঁড়ালে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে সামাল-সামাল।

এসব টিপ্পনী শুনে দু-একজন রেগেও গেছেন। মনোমালিন্য থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধও।

কারণ একজন সহব্যথী হয়ে বলে বসেছিল, আপনি মশাই কি ধরনের মানুষ। সুধাকর যদি একটা বাচ্চা পেয়েই থাকে, মানুষ করে যদি শান্তি পায়, বেচারিকে সেটুকুও...

অভিযোগকারী মুখ কাচুমাচু করে বলেছে, আমি কি ওদের বলতে যাচ্ছি নাকি? নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে তাই বলছিলাম।

আসলে ওই অবধি, দূরে দূরে। কাছে গিয়ে বলার কারও সাহস নেই। কারণ এটা কলকাতা শহর। কেউ কারও তোয়াক্কা করে না। বলতে গেলে সুধাকর মুখের ওপর যা খুশি বলে দিতে পারে। এখানে কেউ কারও পরোয়া করে না।

শহরের মানুষগুলোর দুটো করে অস্তিত্ব। একদিকে সে শুধুই এক ব্যক্তি, পুরোপুরি স্বাধীন। অন্যদিকে প্রয়োজনে সমাজের একজন। এই সমাজের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নেই, শুধু দূর থেকে নিন্দেমন্দ করতে পারে, দুটো স্ক্যাণ্ডাল রটাতে পারে, অপবাদ দিতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। অক্ষম বলেই পরচর্চা ছাড়া তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

—এত সাজগোজ করে কোথায় চললি রে?

ওপাশের জানালা থেকে চুক্কুর মা, বড়বউ দেখতে পেল অমলাকে।

অমলা হেসে ফেলল। ব্যাপারটা যেন হাসির। এর চেয়ে বড় কৌতুক যেন নেই। অথচ অতসীর জন্যে অমলার মনে একটু সত্যিকার সমবেদনা ছিল। খুশিই হয়েছে। তা অতসীর নিজেরই হোক বা কোথাও থেকে নিয়েই আসুক।

হেসে ফেলে বললে, যাই একবার দেখেই আসি। লালবাড়ি।

—যাবি? দাঁড়া তা হলে। আমিও যাব।

ঝটপট শাড়ি বদলাতে চলে গেল বড়বউ।

আর মাধু ঠোঁট উল্টে বললে, হল তো?

ও এতক্ষণ ধরে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। মা কেবলই গড়িমসি করছে বলে ভিতরে ভিতরে চটে যাচ্ছিল।

একসময় ও অতুমাসি অতুম্মাসি করত। ছেলেবেলায় ও যে অতসীর কাছে বেশ আদর পেত তা একটু একটু মনে আছে। তাই ওদের ওপর একটা টান রয়েই গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এইটুকুন এইটুকুন বাচ্চা দেখলেই ওর খুব মাখামাখি করতে ভাল লাগে। দূর থেকে ফর্সা মত এইটুকু একটা মুখ দেখেছে শুধু। সেটাকে কোলে নিয়ে একটু চাপাচাপি না করে যেন শান্তি নেই। সেজন্যেই অধৈর্য। বড়দের মতো ওর কোনও কৌতূহলও নেই, কোনও বাছবিচারও নেই। পুষ্যি নেওয়া কাকে বলে তা স্পষ্ট জানেই না। শুধু শুনেছে, ওসব আজকাল কেউ নেয় না। শোনাই যায় না।

ছেলেবেলায় অন্য কার ভাইকে দেখার পর মাকে নাকি বলেছিল দেকান থেকে একটা ভাই কিনে আনো।

তা নিয়ে আজও মাঝে মাঝে ঠাট্টা শুনতে হয়।

কিন্তু নিজের ছেলে কথাটার অর্থ এখনও ওর কাছে খুব স্পষ্ট নয়। সবটুকুই আভাসে।

পুরুষ দেখলেই ভয়ঙ্কর মনে হয়, কিন্তু কেন তাও জানে না। শুধু দেখেছে রাস্তায় ওর

চেয়ে দুতিন ক্লাস ওপরের ছেলেগুলোকে পার হয়ে যাওয়ার সময় মাথা নিচু করে যেতে যেতেও একটু আড়চোখে দেখতে ইচ্ছে করে। তবু দেখে না। কেন তাও বোঝে না। পাঠ্যপুস্তকের কোনও কবিতা বাড়িতে জোরে জোরে পড়ার সময় 'প্রেম' শব্দটা থাকলে, তা 'দেশপ্রেম' হলেও শব্দটা হঠাৎ কণ্ঠস্বরে দু'স্তর নেমে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়, যাতে মা বাবা না শুনতে পায়।

মাকে তাড়া দিয়ে নীচে নামিয়ে এনেছিল, দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল। বড়বউ একটা ঝলমলে শাড়ি পরে বেরিয়ে এল। মুখে পান এবং হাসি। যেন কি একটা মজা করতে যাচ্ছে।

হেঁটে যেতে যেতে ওদের ফিসফাস কথাবার্তা আর হাসাহাসি মাধুর একটুও ভাল লাগছিল না। মা যেন কি! চুক্কুর মার সঙ্গে এত দল পাকানোই বা কেন।

বড়বউ হঠাৎ অমলাকে বললে, হ্যাঁ রে জিগ্যেস করবি তো?

অমলা হাসল, সে তুমি কোরো। তারপর একটু থেমে, কি দরকার!

অর্থাৎ ছেলেটা সত্যি সত্যি অতসীর নিজের কিনা।

বড়বউ স্বচক্ষে অতসীকে নাকি দেখেছে এই কিছুকাল আগে, অতশত হিসেব মনে নেই, মুখে বলেছে এই তো মাসখানেক আগে, কিন্তু সেটা তিনচার মাস আগেও হতে পারে। দেখে মনেই হয়নি। তবু নিজের চোখের ওপরই যেন একটা ক্ষীণ সন্দেহ রয়ে গেছে বড়বউয়ের।

বড়বউয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ভাল, সর্বক্ষণের জানালার বন্ধু, সম্পর্কটা তাই ভাল রাখার জন্য অমলাকেও একটু হাসাহাসি করতে হয়েছে।

কিন্তু কত বউয়েরই তো বাচ্চাকাচ্চা হয় না, বন্ধ্যা বলে কেউ মুখ ঘুরিয়েও নেয় না আজকাল, বরং সমবেদনা জানায়। আবার অনেকের তো সত্যি খুব দেরিতে হয়, দশ বারো বছর পরেও। অমলার কোনও এক দূর সম্পর্কের মাসির তো বিয়ের আঠারো বছর পরে, অনেক ডাক্তার বদ্যি করে, প্রথম সন্তান। প্রথমও এবং শেষও। তাকে নিয়ে একটু কানাঘুসোও হয়েছিল। সেই মাসির কার সঙ্গে নাকি খুব ভাব!

অমলার হঠাৎ মনে হল, আমাদের মনগুলোই খুব ছোট। একজনের দুঃখ নিয়েও আমরা হাসাহাসি করি, একজনের শেষ অবধি একটু সুখ এলে তাও সহ্য করতে পারি না। একটু অপবাদের কাদা মাখিয়ে দিয়ে শান্তি পাই।

বড়বউও তেমন কিছু ভাবছে কিনা কে জানে। বেফাঁস কিছু বলে ফেলে কিংবা বাঁকা প্রশ্ন করে মেয়েটাকে না দুঃখ দিয়ে বসে।

একবার মনে হল ওকে সঙ্গে না আনলেই ভাল ছিল।

তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই দেখল, দরজা হাট করে খোলা। এ পাড়ায় চোরের উপদ্রব তেমন নেই, দুপুরে গৃহিণী খুন হয়ে পড়ে থাকে না, তাই সদর দরজা নিয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত ভাবও নেই। দরজা খোলাই থাকে। পাড়ায় রিটায়ার করা বুড়োর সংখ্যাই কি কম। বেকার ছেলেও কিছু আছে, নীচের তলার জানালার পাশ দিয়ে গেলে গুলতানি আর ক্যারম খেলার শব্দ শোনা যায়।

খানিকটা এগিয়েই ওদের পায়ের গতি কমে গেল।

চিৎকার করে অতসী বলে ডাকবে কিনা ভাবল।

এমনিতেই তো বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, অতসীর দেওর সংসার নিয়ে বাইরে কোথায় বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

আর এই দুপুর বারোটায় সুধাকরবাবুরও ঘরে থাকার কথা নয়। নিশ্চয় অনেক আগেই অফিসে চলে গেছে।

'অতসী' নামটা মুখে আনতেও কেমন অস্বস্তি, সেই উলবোনার সময় বেশ ভাব জমেছিল, 'অতু' বলত, তারপর কতকাল দেখা সাক্ষাৎই হয় না। কাজ ফুরোলে আর কে আসে।

'তোমরা সবাই সাত্থপর !' মাধু বলেছিল একদিন।

তখন হেসেছিল ওর রাগ-রাগ পাগলামি দেখে, এখন মনে পড়তে হাসি পেল না। ঠিকই তো বলেছিল ও।

চল্ চল্ গিয়ে দেখি কি করছে। বড়বউ বললে চাপা গলায়।

মন্দ নয়, অমলা ভাবল গিয়ে চমকে দেবে।

নিঃশব্দে গিয়ে তিনজনেই হুড়মুড় করে চৌকাঠ ডিঙিয়েছে ঘরের, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষতে হল। বিব্রত হয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে এ ওর গায়ে পড়ল।

ভাবেনি সুধাকর এসময় থাকবে।

অতসী ওদের দেখেই প্রথমে অবাক, তারপরই বলে উঠল, এসো দিদি, এসো।

এক মুখ হেসে অমলা কাছে এগিয়ে গেল।

সুধাকর ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

কিন্তু যা দেখার দেখে ফেলেছে অমলা।

অতসীর কোলে সেই ফুটফুটে বাচ্চাটা, আর সুধাকর-অতসী দুজনে মিলে বাচ্চাকে নিয়ে মশগুল হয়েছিল, আদর করছিল।

দেখে খুব ভাল লাগল অমলার। অতসীর মুখে এই হাসি ও কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

হঠাৎ মনে হল এসে পড়ে ভুলই করেছে। একটি শিশুর টান যে এমন সাঙ্ঘাতিক, ধারণাই ছিল না। সুধাকর অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে আছে, ছেলেকে আদর করছে। কি আশ্চর্য। তা হলে সত্যি সত্যি ওদেরই ছেলে নাকি।

সুধাকরকে অমলা বললে, যাচ্ছেন কোথায়, বসুন আপনি।

সুধাকর হেসে ফেলে দূরে খাটের ওপর বসল।

মাদুর বিছিয়ে মেঝেতে বসেছিল অতসী সুধাকর, এবার মাদুরের একপাশে গিয়ে বসল অমলা বড়বউ মাধু।

—কি সুন্দর। কোথায় পেলে ভাই ? বড়বউ প্রশ্ন করল।

আর মাধু ততক্ষণে বাচ্চার কাছে এগিয়ে গেছে, গাল টিপতে চাইছে।

মাধুর হাতটা সরিয়ে দিল অতসী, ছুঁয়ো না।

তারপর বললে, ভগবান দিয়েছেন।

ছেলের মুখের দিকে স্নেহ উজাড় করা হাসি-হাসি চোখে তাকিয়ে বললে, কি দুষ্টু যে হয়েছে বিশ্বাস করবেন না।

হাসতে হাসতে বললে, দেখবেন, দেখবেন ?

দুধের বোতল পাশেই ছিল, তুলে নিল অতসী। বললে, এমন ধূর্ত...

বোতলের নিপল্ শিশুর ঠোঁটে ঠেকিয়ে, এই দেখুন, হাসছে অতসী, বলছে, কেমন ঠোঁট টিপে আছে, সাধ্য কার বোতলে দুধ খাওয়ায়।

শিশুটির কাণ্ড দেখে ওরাও তখন হাসতে শুরু করেছে।

সুধাকরের হয়তো একটু অস্বস্তি হল, ও উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—কোথায় পেলে বলো না। বড়বউ আবার জিগ্যেস করলে।

অতসী আবার হাসল। —বললাম তো, ভগবান দিয়েছেন।

চার

নন্দিনীর চেহারায় সৌন্দর্যের আগে যা সকলের চোখে পড়ে তার নাম আভিজাত্য। যারা কাছের মানুষ তারা জানে চেহারার মতোই ওর চরিত্রেও একটা বিশেষত্ব আছে। দৃঢ়তা। কিন্তু ওর মধ্যে যে একটা কোমল দিকও আছে তার খবর খুব কম লোকই জানে।

পুজোর আগে আগে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল নন্দিনী। মাসখানেক ধরে, কি তারও বেশি, প্রায় রোজই বের হয়। কেনার চেয়ে দর্জির দোকানে দোকানে গিয়ে অর্ডার দেয়ার বহরটাই বেশি। ওর কাছ থেকে অর্ডার নেবার জন্যে যারা আগ্রহী, তাদের দর্জির দোকান বললে, ছোট করা হয়। একালে তাদের নাম ফ্যাশন ডিজাইনার। কিন্তু ফ্যাশনে নন্দিনীর কাছেও হার মানে। মোটামুটি আঁকতে পারে, আর্ট কলেজে শিখেছিল এক বছর, সেই স্বল্পজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ও এমন এক একটা ডিজাইন বের করে ফেলে নিজের ব্লাউজ, মেয়ের ফ্রক বা ছেলের পোশাকের, যে ফ্যাশন ডিজাইনাররাও চমকে যায়, হালে পানি পায় না, সর্বোত্তম দর্জিটিকে ডেকে বলে, বুঝে নাও। কারণ, ডিজাইনটি নন্দিনী কাগজে রঙে এঁকে দেয়, দোকান থেকে কাপড়টা বেছে দেয় বা কোথাও থেকে খুঁজে খুঁজে এনে দেয়।

শপথ বাক্য পাঠ করার মতো নিষ্প্রাণ ভাবে দোকানদার প্রতিশ্রুতি দেয় প্রতিবারই, যে নন্দিনীর দেয়া ডিজাইন নকল করে তারা আর কাউকে ও জিনিস দেবে না। কিন্তু দূরের ধনী ফ্যাশনেবল গৃহে কখনও কখনও তা দেখা গেলে নন্দিনী এসে খুব চোটপাট করে।

মালিক নিজেও এগিয়ে এসে মুখ কাচুমাচু করে এমন ভাব দেখায় যেন কি করে এমন অঘটন ঘটল বুঝতেই পারছে না।

আর পরের বছরই দেখা যায় তার দোকানেই ওই ডিজাইন অঢেল।

তখন শুধুই হাসাহাসি, দুপক্ষেই। নন্দিনীর স্মিতহাস ভর্ৎসনা, চোট্টা হায়।

কারণ নন্দিনীর মনে আর রাগ নেই। ডিজাইনটাই সরে গেছে মন থেকে। মাতামাতি আরেকটা নতুন কায়দা নিয়ে।

আক্ষেপ একটাই, সুপ্রতিমকে কোনও আহ্লাদি পোশাকে সাজাতে পারে না। সুপ্রতিম অর্থাৎ স্বামী।

সাজাবে কি করে, ওদের তো সেই চিরাচরিত শার্ট কোট পাত্তালুন। প্যান্টের পায়ের বেড় বাড়ে বা কমে, কোথায় একটা প্লেট থাকা বা না-থাকা, সে-সব সময়ে সময়ে বদলায় বিদেশি রুচির মর্জিতে। সেখানে খুব বেশি দুঃসাহস দেখাবার মতো বুকের জোর এদেশি পুরুষদের কমই আছে। উঁচু মহলে ওদের নিয়ম ইউনিফর্মিটি। ইউনিফর্ম অবশ্য বিদেশ থেকে আসা চাই, অন্তত ডিজাইনটা।

তবু নন্দিনী ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। শার্টিং স্যুটিংয়ের কাপড় বেছে দেয়ার কাজটা ও নিজের হাতেই রেখেছে। সুপ্রতিমকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টপ দোকান থেকে নিজে রংটা বেছে দেয়। সব সময়ে একটু আনইউজুয়াল হওয়া চাই। একবার জোরজবরদস্তি, আর তো কিছু করার উপায় নেই, কোটের কলারের এক কোনায়, বাঁদিকে, আধ ইঞ্চি সলিড লাল স্কোয়ার, সিল্কের লাল সুতো দিয়ে, সমঝে আপ ? দর্জিকে।

সেটা পরতে সুপ্রতিমের প্রথম প্রথম কি অস্বস্তি।

কিন্তু মনে মনে স্বীকার করে নন্দিনীর সুন্দর একটা রুচি আছে। এটা রুচি নয়, কল্পনা। কল্পনাটা রুচিসম্মত। আসলে ওই একটু-আধটু আঁকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা ওর ইমাজিনেশন।

কলেজে ওর সঙ্গে যারা পড়ত তারা এ-সবের কোনও দিন দাম দেয়নি। কেউ প্রশংসা

করলেও অন্যজন দাবড়ানি দিয়েছে, রাখ তো, ওরকম টাকাওয়ালা ঘরের মেয়ে হলে...

ও যে টাকাওয়ালা ঘরের মেয়ে তা ওর হাবেভাবে, হাঁটাচলায় অথবা হাসি বা কথায় অতখানি বোঝা যেত না। যদিও ও যে একটু পৃথক তা সকলেরই চোখে পড়ত। এম এ ক্লাশেই ধরা পড়েছিল। ধনী কন্যা না হলে ওকে দিতে এবং নিতে দুতিন রকম গাড়ি আসে! একটা বেজায় ঢাউস, একটা সাদা মারুতি, একদিন একটা জিপসিও এসেছিল।

দেখলে ঈর্ষা হবারই কথা, আর ঈর্ষার চোখ কখনও গুণ দেখতে পায় না। রুচির বিচার করবে কি করে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে নন্দিনী দিব্যি আড্ডা দিত, বিল মেটাত কখনও কখনও, কফি হাউসের। অথচ ওই যে চেহারায় একটা আভিজ'ত্য, মনের মধ্যে একটা দৃঢ়তা, 'না' মানে 'না', ওটাই ওকে আলাদা করে রেখেছিল।

সে-সব দিন এখন ওর মন থেকে মুছে গেছে। একটা জীবনই। অন্তত ওর বাবা মারা যাওয়ার আগে অবধি তাই ভাবতেন। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে একটা সময় বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। কষ্ট, না দুঃখ।

এখন বেঁচে থাকলে মেয়েটাকে সুখী ভাবতে পারতেন।

সুখী সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদি বা তার মধ্যে কোথাও কোনও কাঁটা বিঁধে থাকে আজ বাইরে থেকে দেখে জানার উপায় নেই।

নন্দিনীদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সকলেই ওদের বড়লোক ভাবত। ভাবার দোষ নেই। এপাড়ার জমির দাম শুনলেই তো লোকে হতবাক হয়ে যায়। বিশ্বাসই হয় না। তার ওপর এতখানি জমি নিয়ে সেকালের বিখ্যাত এক আর্কিটেক্টকে দিয়ে নকশা করানো এই সুন্দর দোতলা বাড়িটার দিকে তাকালেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে। তোদের নিজেদের বাড়ি? স্কুলের এক বন্ধু একবার অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল। পরের দিনই ক্লাশে সে-কথা কানে কানে রটে গিয়েছিল। আর নন্দিনী টের পেয়েছিল ওকেও সকলে সমীহ করতে শুরু করেছে। বেশ মজা লেগেছিল। এমনিতে ওদের স্কুলেরই-একটা স্ট্যাটাস ছিল, যারা পড়ত সবই উচ্চবিত্ত পরিবারের। গাড়ির ধুম লেগে যেত স্কুল বসার সময়, রাস্তা চওড়া হয়েও জ্যাম সামলাতে পুলিশ আর দরোয়ান হিমসিম খেত। ওকে একটা ঢাউস আকারের গাড়ি পৌঁছে দিত, নিয়ে যেত। সেটা অন্যেরা অত গায়ে মাখত না। বিরক্ত বা বিব্রত হওয়ার কথা পুলিশ বা দরোয়ানের, কিন্তু তারা যেন ওদের গাড়িটাকেই বেশি খাতির করত। সেটাই তো নিয়ম।

কলেজে ঢুকে ও নিজেই জানতে পারে নিজেদের যতখানি ধনী ভাবত ততটা নয়। চায়ের টেবিলে একদিন বলেওছিল। বাঙালি আবার বড়লোক আছে নাকি। বেশির ভাগই আসত মধ্যবিত্ত ঘর থেকে, তাদের দেখে মনে হয়েছিল, ইস্, এত গরিব! একটু কষ্ট হয়েছিল। কারণ সত্যি সত্যি গরিবদের যখন পথে ঘাটে দেখেছে মনে কোনও ছাপ পড়েনি। ওদের ঠিক মানুষ বলেই গণ্য করত না ওর চোখ। কিংবা, ওরাও তো মানুষ, একটু দয়াদাক্ষিণ্য দেখালেই তো পারে গাভমেন্ট। তা হলে আর রাস্তায় বস্তিতে আবর্জনা হয়ে পড়ে থাকত না।

ওদের কোলিয়ারির টাকা, যখন ছিল, প্রচুর রোজগার। সে-সময়েই বাড়িটা করা হয়। সেই টাকায় দু-একটা ব্যবসাও। কোলিয়ারি গাভমেন্ট নিয়ে নিল, তবে কিছু থোক টাকা আদায় করতে পেরেছিল, তাও ঘুসঘাস দিয়ে, ক্ষতিপূরণ বাবদ। এখন ছোট ব্যবসা দুটো দাদা দেখে, বাড়িটাতেও দাদা থাকে সপরিবারে। কিন্তু পাড়াতেই পাঁচ কাঠা জমি কিনে বাবা মারা যাওয়ার আগেই নন্দিনীকে একটা বাড়ি করে দিয়ে গেছে। তেমন বড় নয়, সামনে অতখানি বাগানও নেই। মন ভোলানো এক চিলতে শুধু। তাতেই নন্দিনী সন্তুষ্ট,

দাদা বউদি ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে সম্পর্কটাও ভাল। একটা মোটা টাকাও দিয়ে গেছে বাবা, বণ্ড, ইউনিট, শেয়ারটেয়ার। ওর কাজ শুধু যথাসময়ে সেগুলো অ্যাকাউণ্টে জমা দেয়া ; চেক কেটে প্রয়োজনমতো তোলা। সেও এক বিরক্তিকর কাজ। পে ইন স্লিপে লেখো, চেক আঁটো।

সুপ্রতিমকে খোঁচা দিলে সে বলে, তোমার টাকা তুমি সামলাও।

কোনও দিন রাগারাগি হলে বলে, আমি আমার অফিসের ফ্ল্যাটে উঠে যাব।

সুপ্রতিম আদৌ ফ্যালনা ঘরজামাই নয়। মাইক্রোবায়োলজি, ম্যানেজমেণ্ট দু'মুখো প্রতিভা, চাকরি ছেড়ে চাকরি জোটাতে একটা টেলিফোনই যথেষ্ট। অফিসে এখন নাম্বার টু। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা আইডিয়েল। সুপ্রতিম বিরক্তি বা রাগ দেখালে নন্দিনী বলে, দাদা দিন কয়েক গিয়ে থাকতে বলছিল ওবাড়িতে। নন্দিনী হঠাৎ একসময় কণ্ঠস্বর তুলে ফেললে, সুপ্রতিম বলে, অফিস মাসখানেকের জন্যে আমাকে...

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে মিটমাট। কারণ উভয়ে উভয়কে একটু বেশি বেশি ভালবাসে। নন্দিনীর খামখেয়ালিপনা নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। ঘর-সংসারে বড় একটা টানেও না সুপ্রতিমকে। বছরে একবার পাহাড়টাহাড়ে যেতে হয়, নন্দিনীর চাপে পড়ে। ওর ওসব নেশা নেই। বার তিনেক বিলেত আমেরিকাও ঘুরে এসেছে। নন্দিনীর বেড়ানোয় খুব সখ, পার্টিফার্টি পছন্দ করে না। তবে যায়, যেতে হয়।

আনন্দ ওই কেনাকাটায়। দোকানে দোকানে ঘোরা। কখনও কিউরিও শপে, কখনও ড্রেজ ডিজাইনারের দোকানে, বুটিকে, মাঝে মাঝে ছবির একজিবিশনে বা সেলস গ্যালারিতে। নিজের তো বাসনাই ছিল শুধু, শেষ অবধি হল না, তাই মাঝে মাঝে দু-একটা কিনে ফেলে, কখনও পছন্দ হয়েছে বলে, কখনও চাপে পড়ে। বিশাল সিটিং রুমের দেয়ালে তাদের লোক এসে টাঙিয়ে দিয়ে যায়, পুরনোটা সরে যায় অন্যত্র।

সুপ্রতিমের কাছে ওটাই চমক, একটু নতুন করে ভাল লাগা। ক্যামেরায় টাইম দিয়ে প্রকাণ্ড ছবিটার সামনে দুজনে ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে দাঁড়ায়, কট। স্মৃতি। ছবিটা একদিন সরে যাবে, রঙিন ফোটোটা থাকবে অ্যালবামে।

এই একঘেয়েমি থেকে পুজোর আগে দুটো মাস বেশ ছুটি পাওয়া যায়। মানুষজন দেখতে পায়। কেনাকাটা আসলে এক ধরনের অজুহাত।

কেনাকাটার নাম করেই ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

বড় বড় দোকানগুলো সবই চেনা, মালিকও এগিয়ে এসে খাতির করে। অনেক সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

এয়ার কণ্ডিশন থেকে বেরিয়ে আসতেই ভ্যাপসা গরম। চটপট ঘামের বিন্দু গজিয়ে ওঠে ব্লাউজের নীচে, ঘাড়ে।

চ্যাটার্জিদা ঠিক দেখতে পেয়েছে, গাড়ি পার্ক করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, থাকে, চোখ দোকানের দরজায় নিবদ্ধ।

নন্দিনী হাত তুলে মানা করল। অর্থাৎ এখন নয়।

একটু ফুটপাথের ভিড় আর হুকার দেখবে, এক চক্কর মার্কেটের ভেতর থেকে ঘুরে আসবে। একজন কথা দিয়েছিল ছবি-আঁকা জাপানি টি-সেট আনিয়ে রাখবে। যেটা চোখে পড়েছিল সেটা তখন প্যাকিং হচ্ছে, বিক্রি হয়ে গেছে। নিষিদ্ধ বস্তু। স্মাগলড়। নিষিদ্ধ বলেই তার ওপর এত লোভ। বাবা একবার হেসে বলেছিল, আমাদের সময় দোকানে দোকানে ছড়াফেলা, কেনার ইচ্ছেই হত না।

—তোমাদের টেস্টই ছিল না। নন্দিনী বলেছিল।

বাবা খুশি হয়ে হেসেছিল। নন্দিনীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন।

বাবা যদি দু'চার সেট ওরকম কিনেই রাখত, নন্দিনীর কি পছন্দ হত !

মার্কেটে ঢুকে পটারি পট্টির দিকে যাবে, এই দিকের দোকানগুলোয় বেদম ভিড়, উপচে পড়ছে, কারণ এগুলো জামাকাপড়ের দোকান, একটু কম দামি বলেই ভিড়টা বেশি ।

এগোতে যাবে, একজোড়া চোখ ওর মুখের ওপর পড়ল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। নন্দিনী দেখল, কাছে এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু তার আগেই অতসী চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

নন্দিনীর খুব খারাপ লাগল। ওকে দেখে হঠাৎ মুখ বিবর্ণ কেন, ভয় পাওয়ার কি আছে ?

খপ্ করে গিয়ে অতসীর হাতটা ধরল। হাসতে হাসতে বলল, পালাবার চেষ্টা করছেন ! আমি বাঘ না ভালুক ।

বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলেও মুখে হাসি রাখতে হল ।

পরমুহূর্তেই ভিড়ে ভয় পাওয়া নন্দিনীর করধৃত ছেলেটিকে পিঠে হাত দিয়ে কাছে এনে নিজের দুটি উরুর সঙ্গে যেন লেপটে নিল ।

নুয়ে পড়ে তার গালে চুক করে একটা চুমু খেল। —কি রাজা, আমাকে চিনতে পারছ ?

রাজা চিনতে পারল কি না, তাও বোঝা গেল না। সে তখন গাল মুছছে, যেখানটায় নন্দিনীর ঠোঁট ছুঁয়েছিল। বিচ্ছিরি। মুখ ফুটে বোধহয় বলল কথাটা। হট্টগোলে চাপা পড়ে গেল। নন্দিনী শুনতে পেল না।

ইস্, কি ভিড়, বেরিয়ে চলুন, বেরিয়ে চলুন ওদিকে। নন্দিনী অতসীর হাত ধরে টানল।

অতসী কিছুতেই যাবে না, অথচ মুখে হাসি রাখতে হচ্ছে, ভদ্রতা বলে তো একটা কথা আছে।

অতসী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, বললে, না না ভাই, আমার এখন সময় নেই, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

—অ্যাভয়েড করছেন, কেন আমি কি করেছি ? হাসল নন্দিনী।

এবার নন্দিনীর মেয়েটি চোখে পড়েছে অতসীর। রাজাকে আদর করেছে, ওরও তো একটু পাল্টা আদর জানানো উচিত। সুধাকর এ-সব তো বোঝে না, রাগ দেখিয়েই সন্তুষ্ট। এই রকম অবস্থায় পড়লে বুঝতে পারত ছিটকে চলে আসা যায় না। কথা না বললেই পারো ! যেন সেটা সম্ভব।

শেষে বাধ্য হয়েই বেরিয়ে আসতে হল একটু ফাঁকা জায়গায়। নন্দিনীর মেয়েকে গাল টিপে একটু আদরও করতে হল।

তা দেখে নন্দিনী একটু খুশিই হল। বললে, চলুন না দিদি আমাদের বাড়ি, একটু গল্প করে যাবেন। আমি পৌঁছে দেব।

অর্থাৎ গাড়িতে।

খিঁচ করে লাগল বুকের মধ্যে। সর্বনাশ। সুধাকর জানতে পারলে তো রক্ষা রাখবে না।

ততক্ষণে নন্দিনী রাজাকে, ওই অত বড়, ছেলেটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে, আর রাজা ওর হাত ছাড়িয়ে সরে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

অতসী নন্দিনীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মধ্যবয়সী। আর নন্দিনীর কত বয়েস কে জানে, অনেক কম সে তো বোঝাই যায়, তার ওপর চেহারায় একটা চটক আছে, তোয়াজে থাকে, সাজে প্রসাধনে আরও কমবয়েসি লাগে। এইরকম একটা মেয়ে অতসীর গিন্নি

গিন্নি চেহারার মহিলাকে টানাটানি করছে দেখে কারও কারও চোখ অবাক হয়ে চেয়ে আছে, হেসে ফেলছে, সুতরাং অতসীর প্রচণ্ড অস্বস্তি তো হবেই।

ওদের দৃষ্টি থেকে পালিয়ে আসার জন্যেই ওখান থেকে সরে এল।

—তা হলে চলুন একটা চায়ের দোকানে বসি।

—না। ছেড়ে দাও ভাই, আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। অতসীর কণ্ঠস্বর এমন, যেন আরেকটু হলেই ও কেঁদে ফেলবে।

একটু থেমে বললে, এই সামান্য একটু কেনাকাটা ছিল...

নন্দিনী বললে,.তা হলে আজ আর না বলতে পারবেন না। চলুন আমার সঙ্গে, আমার চেনা দোকান আছে,.রাজার জন্যে...

—না, না, না। প্রায় আতঙ্কের গলায় বলে উঠল অতসী।

নন্দিনীকে ভীষণ ম্রিয়মাণ দেখাল। মুখ ফ্যাকাশে। খুব আঘাত পেয়েছে যেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে খুব রহস্য লাগে। এই অ্যাভয়েড করা। এই অপছন্দ করা। নন্দিনী যেন ওর কাছে একটা আতঙ্ক। এত ভয় কিসের, এড়িয়ে যাওয়াই বা কেন বুঝতে পারে না।

ওর বুকের ভেতরের কষ্টটা যদি দেখাতে পারত।

পিঙ্কি, নন্দিনীর মেয়ে, বিরক্ত হচ্ছিল। বললে, মা চলো চলো।

নন্দিনী কেমন একটা অভিমানের গলায় বলল, এতদিনে আমি কি আপনার বন্ধুও ? রাজাকে পুজোর সময় সামান্য একটা উপহারও দিতে পারব না ?

অতসী কি করবে, শেষ অবধি বলতে হল, কি করব ভাই, ও রেগে যায়।

নন্দিনীর মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেল।

অস্ফুটে বলল, ভালবাসি বলেই তো !

ওর মুখ দেখে অতসীর বোধহয় মায়া হল। বললে, ওই সব দামি দামি পোশাক, আমি তো আর মিথ্যে করে বলতে পারব না, আমি কিনেছি।

বিষণ্ন মুখ একটু যেন উজ্জ্বল হল। —ঠিক আছে কম দামিই।

অতসী হাসল। বললে, তা হয় না।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, রাজা তো বলে দেবে।

ফিসফিস করে বললে।

নন্দিনী ছাড়ার পাত্র নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফিসফিস করে বললে, আপনিই পছন্দ করুন। যেখানে খুশি। আমি বিলটা মিটিয়ে দেব, দেখতে পাবে না।

অতসী দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একদিকে ভয়, আরেকদিকে এই মেয়েটি। কোথায় থাকে, কি নাম, কিছুই জানে না। একবার নাম বলেছিল বোধহয়, মনেও রাখেনি।

তখন তো এ মেয়েটা ওর কাছে রীতিমত আতঙ্ক। ভয়। সকলকেই ভয়, যাকে যেখানে দেখে, যে কেউ রাজাকে আদর করে। এই বুঝি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমার ছেলে বলে দাবি করে বসে।

অনেক বছর কেটে গেছে, এখন আর সেই ভয়টা নেই।

তবু, সুধাকরের কথাটা কানে বাজে। রেগে গিয়ে বলেছিল, আমরা কি ভিখিরি নাকি।

এই সব বড়লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলাও যায় না, ওরা অন্তরঙ্গ ভাব দেখালেও অস্বস্তি লাগে। দূরে দূরে থাকাই ভাল।

কিন্তু বাধ্য হয়েই ওকে সাদামাটা পোশাকের একটা দোকানে যেতে হল।

আর যেতে যেতে নন্দিনী প্রশ্ন করল, কোন ক্লাস হল রাজার ?

উত্তর শুনে নন্দিনী চুপচাপ, তারপর হঠাৎ বললে, একটা ভাল স্কুলে দিলে হত না ?

পাঁচ

এখন আর পাড়ায় কোনও আলোড়নই নেই। উত্তেজনা নেই। রাজার পরিচয় এখন সুধাকরের ছেলে, অতসীর ছেলে। এখন আর কেউ বলে না, ওকে তো অ্যাডপ্ট করেছে, নিজের ছেলে নয়।

কয়েক বছর আগেও পাড়ায় নতুন কোনও ভাড়াটে এলে এবাড়ির গিন্নি কিংবা ওবাড়ির বাবু তার সঙ্গে ভাব জমাতে জমাতে যদি কোনওক্রমে সুধাকরদের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে, কিংবা খোদ রাজার প্রসঙ্গ, তা হলে অবলীলায় তাকে জানিয়ে দেওয়া হত, মৃদুহাস ভঙ্গিতে, জানেন তো, ছেলেটা কিন্তু ওর নিজের নয়। কোনও হোম থেকে এনে পুষ্যি নিয়েছে।

এখন আর ওসব কথা কেউই বলে না।

যখন নিয়ে এসেছিল, অতসীর মাথায় আর কিছুই ছিল না। শুধু সুখ আর স্বপ্ন। হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে। পরের ছেলে যে রাতারাতি এমন আপন হয়ে যেতে পারে ভাবতেই পারেনি। আফসোস হয় এতগুলো বছর নিরানন্দে নষ্ট করেছে বলে। আরও আগে কেন নিয়ে আসেনি।

সন্তানহীন অনেক দম্পতিই তো আছে, তাদের বুকের মধ্যে একটু ক্ষোভ থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু কই, কেউ তো তেমন পাগল হয়ে ওঠে না, হন্যে হয়ে পরের ছেলেকে নিজের করার জন্যে ছটফট করে না। দিব্যি সুখেস্বাচ্ছন্দ্যেই থাকে, সাজগোজ করে, ফুর্তিতে থাকে, দাম্পত্য সুখে এতটুকু হানিও হয় না। ওই একটু কাঁটা ফোটা চিকচিক ব্যথা। ব্যস্। অথচ এক একজন পাগল হয়ে ওঠে। কখনও কখনও বিকৃতি দেখা দিতে শুরু করে। আসলে এক একজন মানুষের মন এক এক রকম।

অতসীই কি কম কষ্ট স্বীকার করেছে। ব্রত উপোস পুজো মানত, কিছুই বাদ রাখেনি। কল্যাণেশ্বরীতে গিয়ে গাছে ঢিল বেঁধে এসেছে। আঙুলে পাথর, বাজুতে লালসুতোর মাদুলি। দু-দুবার অপারেশন, টাকার শ্রাদ্ধ। শেষে সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাগ্য মেনে নিয়ে চুপচাপ ছিল। কিন্তু চুপচাপ থাকতে দেয় কই। কেউ সমবেদনা জানিয়ে অহেতুক বলে বসে, এত সব করলে, হল না ? দুঃখসূচক চ্চ্ একটা শব্দ করেছে। আর নতুন আলাপে প্রথমেই ওই প্রশ্ন, তারপর : নেই ? একটিও না ? অবাক হয়েছে সে, আর ধাক্কা লেগেছে অতসীর বুকে।

ভুলে থাকতে চাইলেই কি সকলে ভুলে থাকতে দেবে ?

তারপর এই রাজা।

রাজা নাম কি আর সাধে রেখেছে, ও যে সত্যি ওদের কাছে রাজা।

প্রথম প্রথম তো বলতে গেলে লুকিয়েই রেখেছিল। গর্ব করে কাউকে বলতে যায়নি, দেখাতে যায়নি। অথচ দু'হাতে তুলে দেখানোর মতোই চেহারা। কি সুন্দর, কি সুন্দর।

—চোখ দুটো দ্যাখো, খবু ধূর্ত হবে। তাই না। বলতে বলতে হেসে উঠেছে অতসী। —আবার শুনে হাসছে, দ্যাখো দ্যাখো।

মাধুর মা, অমলা, এবং চুক্কুর মা, নামটা জানে না অতসী, ওরা ঘুরে যাওয়ার পর একে একে অনেকেই এসেছে।

উপদেশ দিয়েছে, নিজের মনে করে নাও, যেখান থেকেই আসুক, ঠিকই বলেছো, ভগবানই তো দিয়েছেন।

কিন্তু কারও কারও কৌতূহল ছিল, জাতগোত্র কিছু জেনে নিয়েছ ? কাদের ছেলে ?

দু একজন ওর সামনে বলেনি, আড়ালে গিয়ে হয়তো আলোচনা করেছে, কি জানি বাবা, হিন্দু কিনা তাই বা কে জানে।

কেউ বলেছে, বেজাত তো বটেই, হোম থেকে আনা, বুঝতে পারছেন না ? বলে বাঁ-চোখের ভুরু কাঁপিয়ে এমন একটা ইশারা করেছে যা তার মুখের হাসির সঙ্গে মিশে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে হোমে কেন।

পাশের লোক জুড়ে দিয়েছে, তিন হপ্তার বাচ্চা, হোমে দেয় কেউ ? কেমন মা ?

—তা হলেই বোঝো।

এসব কথা অতসীর কানে যায়নি এটাই ভাগ্য। গেলে ভাবত ভগবানের এ কি অবিচার, যে চায় তাকে দেয় না, যে রাখতে পারবে না তাকেই দিয়ে বসে। বড় মজার খেলা, সেই একই শিশু একজনের কাছে স্বর্গ হয়ে আসে, আরেক জনের কাছে নরকের শাস্তি।

অথচ বেচারা ছেলেটা কিছুই জানল না।

জেনে যেতে পারে এই ভয়ে বছর তিনেক বয়েস হতেই অতসী একবার সুধাকরকে বলেছিল, এখন থেকে চেষ্টা করো অন্য পাড়ায় উঠে যেতে। ও বড় হলেই কে কখন বলে দেবে তার ঠিক আছে !

সুধাকর একটু চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কোথায় যাবে এই পুরনো শস্তার ভাড়া ছেড়ে। যাবার উপায় আছে নাকি। এখান থেকে অনেক দূরে গেলেও একখানা ঘরের যা ভাড়া দাঁড়িয়েছে আজকাল, কারা যে নেয়, কি করে যে দেয় ভাড়াটেরা, কিছুই বুঝতে পারে না সুধাকর। ও তো এই কম ভাড়াতেও সংসার চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। এই ছোট্ট শিশুটি আসার পর এমনিতেই খরচ বেড়েছিল, দুজনেই টের পেয়েছে, কেউ মুখ ফুটে বলে ফেলেনি। বুকের মধ্যে একটা ভয়, শুনতে পেয়ে ভগবান না বলে বসে, তবে রে। হয়তো রাগ করে কেড়ে নেবে।

তবে অন্য একটা ভয় প্রথম-প্রথম ছিল, দুজনেরই।

ওসব পুষ্যিটুস্যিতে সুধাকরের খুব একটা মন ছিল না। ডাক্তার দু-দুবার অপারেশন করেও যখন শেষ অবধি বলে বসল, কোনও আশা দেখছি না, তখন সুধাকর ভাগ্য মেনে নিয়েছিল। ওর অক্ষমতা সন্দেহ করে অফিসে কিংবা পাড়ায় কেউ যদি আড়ালে রসিকতা করে, করুক না। ও তো জানে সত্যি নয়। ডাক্তারই বলেছে।

কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতসী কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। একটু অস্বাভাবিক, কখনও কখনও। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হয়েছিল, তিনি আবার ভয় দেখালেন, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে। ওরকম হয় কারও কারও, স্রেফ বাচ্চার জন্যে।

তখনই বৃদ্ধা মামিমা এসে একদিন উপদেশ দিলেন, পুষ্যি নে, পুষ্যি নে।

প্রভাকর যদি থাকত, ব্যাঙ্গালোরে চলে না যেত, তা হলে হয়তো সমস্যা হত না। ওর বিয়ের পর পরই মুন্নি আর মন্টু এল। তখন এই বাড়িটাই কি জমজমাট। চিৎকার হাসি হট্টগোল। পাখা থেকে বেলুন ঝুলছে, রথের মেলা থেকে একটা ব্যাং ডাকা ক্যাঁকরক্যাঁক কিনে দিয়েছিল সুধাকরই, কান ঝালাপালা।

মুন্নি আর মন্টুকে মানুষ করে দিয়েছে কে ? সে তো ওই অতসী। নাওয়ানো খাওয়ানো, অসুখে রাত জেগে পাহারা দেওয়া, দুপুরে হঠাৎ জ্বর এল মন্টুর, দু ভাই কেউই বাড়ি নেই, অতসী একাই ছুটে গিয়ে বড় রাস্তার ওষুধের দোকান থেকে ডাক্তার ডেকে

এনেছিল। পাড়ার ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি বলে।

কেউ কিছু মনে রাখে না, মনে রাখে না।

অতসীর লোভ হয়েছিল ওকে মুন্নি আর মণ্টু বড়মা বলে ডাকবে। জায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি কখনও তেমন হয়। বড়মা বলতে শেখানো দূরের কথা, অতসী শেখালে হয়তো আপত্তি করত।

আশ্চর্য লাগে ভাবলে।

নাড়ির টান তুচ্ছ হয়ে গেল, বড় হল কিনা ওই একটা বাথরুম নিয়ে অসুবিধে, যেতে আসতে ঠোকাঠুকি, তিনখানা মাত্র ঘর। অথচ আগে বাবা-মা বোনরা থাকতে এসব অসুবিধের কথা কারও মনে হয়নি।

মুন্নি আর মণ্টু চলে যেতেই বাড়িটা খাঁ খাঁ করে উঠল। এত জায়গা নিয়ে হবেটা কি, এই তিন তিনখানা ঘর। ঘর নয়, বুকের ভেতরে যেন কেউ 'টু লেট' ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে।

সেজন্যেই পুষ্যি নেওয়া। অ্যাডপ্ট করা, বিষ্ণুচরণের ভাষায়।

বলেছিলেন, আগে সব যৌথ পরিবার ছিল, কোনও প্রবলেম হত না। বিধবাও সংসার করত, বন্ধ্যারমণীরাও সন্তান মানুষ করত।

কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই, যা গেছে তা চিরকালের জন্যে গেছে।

তবু হঠাৎ হঠাৎ ওই পুরনো নিয়মগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এই যেমন অতসী আর সুধাকরের কাণ্ড। হোম থেকে নিয়ে আসা একটা অচেনা-অজানা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করা। বড়লোকেরা করত এককালে। এযুগে কেউই করে না, শোনা তো যায় না বড় একটা। সেজন্যেই সকলে অবাক হয়েছিল, যত হাসাহাসি কৌতূহল। এখন থেমে গেছে একেবারে।

নাড়ির টানকেই বড় করে দেখত সুধাকর। সেজন্যই মুন্নি আর মণ্টুর ওপর এত মায়া। কত সহজে তা তুচ্ছ হয়ে গেল। ও কি বোঝে না, ওরা ইচ্ছে করেই সরে গেল। ছেলেমেয়ে পর হয়ে যাবে এই ভয়ে। দোষের মধ্যে জেঠি বলতে অজ্ঞান ছিল, মান্য করত।

অথচ এই রাজাকে নিয়ে আসার পর, ওকে পর-পরই লাগত সুধাকরের, কিন্তু শুধু ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে একদিন একটা আঙুল এগিয়ে দিয়েছে, এমন শক্ত করে ধরল পাজিটা। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল সুধাকরের। তা দেখে অতসীরও।

বাচ্চাটার মুখে গাল ঘসতে গিয়েছে সুধাকর, অতসী ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, এই ডাক্তার বলেছে না, ইনফেকশন হবে।

সেজন্যেই কেউ এসে ছুঁতে গেলে বাধা দিত। মাধুকেও দেয়নি।

ওই একটা ভয় ছিল মনের মধ্যে। পেয়েছে, যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দিয়ে না নিয়ে নেয়।

আরেকটা ভয়, কোনও কারণ ছিল না তবু। যার ছেলে সে এসে না দাবি করে বসে। যেন ছেলেটা অতসীর নয়। মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করবে বলে গিয়েছিল, মা নেমেছে জলে, ও কাপড় আগলাচ্ছে, মা ফিরে এলে নিজে যাবে, সিঁড়ির ধাপে বসে গঙ্গা দেখছে, গঙ্গায় নৌকো, মনে ভক্তি থাক বা না থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এমন এক অবাক করা মুগ্ধতা থাকে যা ভক্তিভাব এনে দেয়। ওই শান্ত বিস্ময়ের নামই বোধহয় ভক্তি।

অতসীর বাবা বলতেন, তীর্থদর্শন মানে তো ঠাকুরদেবতা নয়, আসলে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা, উপভোগ করা।

কোথাও বেড়াতে গেলে মা আগেই মন্দির খুঁজত, পুজো দিতে চাইত বলেই বাবা

একবার বলেছিলেন।

কথাটা বেশ ভাল লেগেছিল ওর। বলেছিলেন, এত যে জায়গা আছে, তীর্থক্ষেত্র কিন্তু সবই সুন্দর জায়গায়, সমুদ্রের ধারে কি নদীর পাড়ে, হিমালয়ের কোনায় কোনায়, কোনটা নয়।

অতসীর মনে হয়েছে কথাটা সত্যি। পুরী সোমনাথ সমুদ্রের ধারে, কাশী প্রয়াগ গঙ্গাতীরে, বৃন্দাবন যমুনার ধারে, হৃষিকেশ থেকে কৈলাস মানসসরোবর, বরফঢাকা হিমালয়ে। গঙ্গোত্রী গোমুখ সবই তো সেই প্রকৃতি।

গঙ্গার ঘাটে বসে অতসীর মনের মধ্যে কেমন একটা মুগ্ধ আবেগ আসছিল। দূরের নৌকোটির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ লাল পাড় শাড়ি পরা একটি অল্পবয়সী বউ কোলে বাচ্চা নিয়ে এদিক ওদিক বিভ্রান্তের মতো তাকাল। অতসীর সঙ্গে চোখোচোখি, সঙ্গে সঙ্গে একমুখ হেসে, দিদি একবারটি ধরবেন, চট করে একটা ডুব দিয়ে আসি।

আঃ, যেন হাতে স্বর্গ পেল, ঘাড় কাত করে সায় দিল, হাত বাড়িয়ে সযত্নে একরাশ শ্বেতপদ্ম যেন, ছোট্ট শিশুটিকে পরম আদরে কোলে নিল।

দেবশিশু। সন্ত্রস্ত হয়ে এমনভাবে কোলে ধরে রইল, কোথাও যেন বাচ্চাটা এতটুকু ব্যথা না পায়, এতটুকু অসুবিধে না হয় তার। কোথায় একটা পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে কামড়াক, একটা হাত সরিয়ে সেটাকে টিপে মারতে গেলে ছেলেটির মাথা সরাতে হবে, আহা লাগবে।

সে যে কি পরম আনন্দ ভাবা যায় না। কিন্তু লাল পাড় শাড়ির সেই বউটি সত্যি সত্যি চট করে দু দুটো ডুব দিয়েই ভিজে কাপড়ে হন্তদন্ত উঠে এল সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, ভিজে কাপড়ে সপসপ শব্দ, আবার একমুখ হাসি নিয়ে, কই দিন।

গায়ে বুকে ভিজে গামছা শাড়ির ওপর, আব্রু তো রাখতে হবে, যা চোখ সব চারপাশে, বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে পাঁচিল ঘেরা জায়গাটায় চলে গেল কাপড় বদলাতে। একটা পুঁচকে কালোকুলো ছেলে সঙ্গে, শুকনো কাপড় ধরে বসেছিল, নিল তার কাছ থেকে, দাঁড়া ওইখানে।

ব্যস। দুই উরু, নাভিমূল, দুটি হাত যে আনন্দের স্পর্শ পেয়েই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। প্রথম চুম্বনের সদ্য স্মৃতির মতো ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া। আর কিছু নয়।

প্রথম প্রথম রাজাকে নিয়ে সেই অহেতুক ভয় ছিল। এখনই হয়তো কেউ এসে বলে বসবে, কই দিন। কোল থেকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

অথচ ও তো জানে কত কষ্ট করে রাজাকে পেয়েছে। কত মাসের পর মাস হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে কত অনুরোধ, উপরোধ, কান্নাকাটি। কোর্টঘর। আইনসম্মতভাবে পেতে হয়েছে।

সুধাকর বুঝিয়েছে ওর ওপর আমাদের আইনের অধিকার। ও আমাদের ছেলে, কার কি বলার আছে।

কিন্তু অতসীর মনে সন্দেহ, সুধাকরও সেই একই ভয় পায়। তা না হলে অপরিচিত কেউ, এই যেমন নন্দিনী আদর করে কিছু একটা দিলে এত চটে যায় কেন।

—কি রে চুরি করে আনলি নাকি কোথাও থেকে ? দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া খবর পেয়ে দেখতে এসে রসিকতা করে বলেছিল। দেখিস বাপু, শেষে থানাপুলিশ না হয়।

পিন ফোটাবার জন্যে নিশ্চয় বলেনি, পরে তো অনেক আশীর্বাদ করেছে, উপদেশ দিয়েছে, মমতাও। ওটা বোধহয় তাঁর কথা বলার ধরন। কিন্তু অতসীর গায়ে পিন

ফুটেছে। বিবর্ণ হাসি হেসে বলেছে, ইস। কত চেষ্টায় পেয়েছি, হোম থেকে, মাদার্স হোম।

ওইরকম একটা হোম যে আছে জানতই না। খবরের কাগজে যাদের কথা খুব ফলাও করে বেরোয় শুধু তাদের নামগুলোই জানত। আবেদন নিবেদনও করে রেখেছিল।

তারপর সুধাকরই একদিন হঠাৎ খবর পেয়ে গেল।

এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কার্ড দিয়ে একদিন যেতে বলেছিল।

তার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে সেই রাস্তায় দেখে একটা পুরনো দিনের বাড়ি, তেমন বড় নয়, সামনের ফলকে লেখা 'মাদার্স হোম'।

এক বুড়ি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান করেছিল কোন কালে, এখন কেরলি আর বাঙালি সিস্টাররা চালায়। টিমটিম করে টিকে আছে। ওরাও মানুষ হয়েছে এই হোমেই। বন্ধুর কথা বেবাক ভুলে গিয়ে ও ঢুকে পড়েছিল। বিধবাদের মতো সাদা শাড়ি পরা জনকয়েক সিস্টার। মাথায় একজন বাঙালি বুড়ি, তাকে সবাই আন্টি বলে, তিনিই মাথা। মাদার নেই, মাদার ছিলেন সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বুড়ি।

খোঁজখবর নিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে চলে এসেছিল।

সেই বুড়ি আন্টি খুবই কড়া প্রকৃতির। অনাথ বাচ্চাদের মাতৃস্নেহ দেবার জন্যে এই মাদার্স হোম, কিন্তু সুধাকরের মনে হয়েছিল তাঁর শরীরে মনে কোথাও এতটুকু মমতা নেই।

কড়া চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করেছিল, মান্থ্লি ইনকাম ?

আরও কত কি ? সুধাকর ভেবেছিল ডোনেশন আদায় করার ফন্দি। টাকা পয়সা আছে কিনা জেনে নিতে চায়।

সবশেষে ওই কঠিনকঠোর মুখে এক ফোঁটা হাসি বেরিয়েছিল। —এটা আমার হেড-এক নয়। কোর্ট জানতে চাইবে। মানুষ করার মতো সঙ্গতি আছে কিনা।

কথাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। তবু সুধাকরের মনে হয়েছিল কোন পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। এক সন্তানহীন দম্পতি, গরিব হলেই যেন তার বুকের জ্বালাটা কম।

—যদি আসে খবর দেব।

বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে বলেছিল, এরা তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, যেতে চাইবে না।

ওদের দেখে পছন্দও হয়নি।

নিরাশ হয়েই চলে এসেছিল ও। আশা রাখেনি, টাকা পয়সা আছে কিনা এই পরিচয়ই যদি বড় হয় তা হলে তো কোনও সম্ভাবনাই নেই। টাকাওয়ালা লোকের কি অভাব আছে। কত বড় বড় ব্যবসাদার আছে। দুঃখ তাদেরও সমান, কিন্তু টাকা আছে বলেই তাদের পুষ্যি নেবার অধিকারও আছে।

বড়লোক নয় ওরা, কিন্তু কেউ ওদের গরিব ভাবলেও গায়ে লাগে। সুধাকর অতসীরা গরিব হলে সব বাঙালিই গরিব। রাগ সেজন্যেই, অস্বস্তি সেজন্যেই। দেখে ভালবাসো, গালে চুমু খেলে সেও ঠিক আছে, কিন্তু উপহার দিতে চাওয়া কেন। আমরা কি পয়সা দিয়ে কিনতে পারি না। যার আছে তার এত ভাল লাগেই বা কেন। পরের ছেলেকে।

ভিড় বাসে ঠাসাঠাসি করে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কেট থেকে ফিরছিল অতসী। হাতে পলিথিনের ব্যাগ, নন্দিনীর কিনে দেওয়া শার্ট প্যান্ট, নিজেরও কিছু কিনেছে টুকিটাকি, রাজা বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে। চিনতে নিশ্চয় পেরেছে, বাবার কাছে গল্প করে বলবেও। অস্বস্তি সেজন্যেই। দেখা হয়েছে শুনেও হয়তো রেগে যাবে। অথচ ওর কি দোষ। এত ভালবাসে, যখনই দেখা হয়েছে, নন্দিনীর চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।

ভিতরে ভিতরে সন্দেহ, ওই বয়সের একটা ছেলে ছিল হয়তো, মারা গেছে। হয়তো তার কথাই মনে পড়ে।

বাসের ভিড়ে ভিজে ঘেমে গেছে, ব্লাউজ লেপটে আছে পিঠে বগলে, তাড়াতাড়ি গিয়ে স্নান না করে শান্তি নেই। চৌবাচ্চায় জল আছে কিনা তাই বা কে জানে, এপাড়ায় এখন জল কম আসে। সুধাকরের জন্যে আধ চৌবাচ্চা রেখে দিয়ে, রাতের খরচও আছে, তবেই স্নান করতে পাবে ও।

হনহন করে ফিরছিল, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আগে আগে চলছে রাজা।

পথ আটকালেন বিষ্ণুচরণ। —মিস্টার রাজা যে, কোত্থেকে এলে?

বিষ্ণুচরণকে দেখে এখন হাসি পায়। এই কবছরে কত বদলে গেছেন। চুনোট ধুতির গিলে করা পাঞ্জাবির শখ মিটে গেছে, কিংবা বার্ধক্যের জন্যেই হয়তো ক্লান্তি এসেছে। এই কবছরে গাল বসেছে, বার্ধক্যের রেখায় বেশ বুড়োটে লাগে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে চুলের কলপ। আগে নিয়ম করে লাগাতেন, কাছ থেকে দেখলে তবেই বোঝা যেত, কপালে কানের পাশে চুলের গোড়া সাদা সাদা হয়ে গজিয়ে উঠছে। এখন নিয়ম করে লাগান না, বা ইচ্ছেই চলে গেছে, তাই কলপের রং কালো থেকে ক্রমে লাল হয়ে যায়। সেই লাল চুল নিয়েই ঘুরে বেড়ান, পাড়ার ক্লাবে যান লাইব্রেরি থেকে বই পাল্টে আনতে, ফুটবল খেলা দেখে এসে ছোকরাদের সঙ্গে গোষ্ঠ পালের গল্প করেন।

বুড়ো বয়েসে সময় কাটানো বড় দায়, কাউকে ধরলে ছাড়তে চান না।

‘কি রে কি খবর’ দিয়ে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসবেন। সকলেই তাই একটু এড়িয়ে চলে, বাচ্চা মেয়েগুলো দূর থেকে দেখতে পেলে ফুটপাথ বদলায়। ফুটপাথ আছে কোথায়, যে যেটুকু পেরেছে এনক্রোচ করে বসে আছে। উঁচু প্লিনথ বাড়িগুলোর সিঁড়ির ধাপি নামিয়েছে ফুটপাতে। দোষ কর্পোরেশনের, রাস্তায় জল জমে কেন, প্লিনথ উঁচু করতে হয়েছে কেন!

অতসী এড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। ঘাম জ্যাবজেবে শরীর নিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়াতেও ঘেন্না। নিজের ওপর। মানুষটা কিন্তু ভাল।

একসময় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ছেলে মানে ছেলে, তার আবার আপন-পর। ওসব কথায় কান দিয়ো না তুমি।

সেই বিষ্ণুচরণ পথ আটকেছেন।

বললেন, প্রিন্সকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল বউমা?

হাসতেই হল, উত্তর দিতেও। বললে, মার্কেটে। হাতের পলিথিন ব্যাগ দেখাল, থলের পেট বেশ মোটাসোটা হয়ে আছে।

বললে, আসি।

ওঁর নানাদিকে ইনফ্লুয়েন্স আছে, একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তার জন্যে ওরা খুবই কৃতজ্ঞ। অতসীর ইচ্ছে হয়েছিল একটা সোয়েটার বুনে দেয়। ওর বোনার হাত ভাল, বুড়োটে ডিজাইনও জানে। কিন্তু শেষ অবধি পারেনি, পাড়ার লোক কে কি বলবে এই ভয়ে। বুড়োরা চুলে কলপ দিলেই নাকি খারাপ লোক। এদের ধারণাগুলোও এত অদ্ভুত। স্লিভলেস ব্লাউজ চালু হল, যারা সাহস করে প্রথম প্রথম পরত, খারাপ খারাপ।

তবে ওঁকে অপছন্দ করার একটা কারণ আছে। নামটা প্রায় সকলেরই হয় বদলে দেবেন, অথবা বিকৃত করবেন।

মাধুও একদিন ঠোঁট উল্টে রাগ দেখিয়েছিল, কে বলবে ও বুড়োর সঙ্গে কথা, মধুবিশ্রী বলে কেন।

তেমনি রাজাকে প্রথমবার রাজা বলে ডেকেও, বদলে দিয়ে প্রিন্স।

'প্রিন্স' নামটা রাজার পছন্দ হয় না, চলে আসতে আসতে রাগের স্বরে বললে, বুড়ো।

অতসী হেসে ফেলে বললে, বলতে নেই।

কিন্তু অতসীর সমস্যা এখন অন্য। লুকিয়ে রাখা।

একটা মানুষের সঙ্গে, যে ভালবাসতে চাইছে, ভালবাসা দেখাতে চাইছে, কতখানি অভদ্র হওয়া যায়। সুধাকর বোঝে না। বোঝে না বলেই খরচ না হওয়া টাকাটা লুকিয়ে রাখতে হবে। নন্দিনী কিনে দিয়েছে এ-কথা তো বলা চলবে না।

অতসীর কিন্তু একটু লোভ হচ্ছিল, জোর করে সেই লোভটাকে দমিয়ে দিয়েছে। নন্দিনী চেয়েছিল বড় দোকানে নিয়ে গিয়ে অর্ডার দিয়ে কোট প্যাণ্ট বানিয়ে দেবে।

বলেছিল, খুব বাচ্চা ছেলেরা ট্রাউজার্স পরলে বেশ লাগে।

লাগে তো লাগে, নিজের ছেলেকে পরাও না বাবা। আছে তো একটা, সেবার সঙ্গে ছিল, দেখেছে।

কিন্তু সব চেপে যাওয়া উচিত হবে না, রাজা হয়তো কোন ফাঁকে বলে দেবে।

—ছেলে যা বিচ্ছু, তুমি জানো না। সব বলে দেবে।

সামনের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে একদিন পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেয়েছিল। 'তোমার দাদা যদি শোনে', দুগাল ফুলিয়ে গোল করে বলেছিল, 'এই রকম করবে'। অর্থাৎ রাগ। তোমার দাদা মানে সুধাকর।

ঠিক তাই। গল্প করতে করতে বাবাকে বলে দিল, মা ফুচু খেয়েছে।

—জানো কোথায় ওসব তৈরি হয়? নোংরা যতসব। নিজে তো মরবে, ছেলেকেও...

আঁতকে উঠেছিল অতসী। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, না, আর কোনও দিনও নয়।

তাই ভরসা করে রাজাকে শেখানোও যায় না, মার্কেটে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলিস না যেন।

বারণ করলে তো আরওই বলে দেবে।

টাকাটা যে নন্দিনী দিয়েছে তা অবশ্য রাজা লক্ষ করেনি।

সেজন্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলাই ভাল।

সন্ধেবেলায় চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়েই অতসী হাসতে হাসতে বললে, আবার সেই পাগলিটার পাল্লায় পড়েছিলাম আজ।

সুধাকর অবাক হয়ে তাকাল অতসীর মুখের দিকে। পাগলি? সে আবার কে?

অতসী আবার হেসে উঠল। এটুকু অভিনয় ওকে করতেই হবে। উপায় নেই। কিন্তু ঠিকমতো অভিনয় করতে পারছে তো?

হাসতে হাসতে বললে, বাঃ, ভুলে গেলে? সেই যে মেয়েটা, একটা বউ, হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ত। কে জানে বাবা, তোমার টানে কিনা।

সুধাকরের কপালে রেখা দেখা দিল, মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। বললে, ইয়ার্কি ছাড়ো, ব্যাপারটা কি বলো আগে।

অতসী ভিতরে ভিতরে বিব্রত বোধ করল, তবু মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললে, সেই নন্দিনী গো, আবার কে। আমি অবশ্য এড়িয়ে চলে এসেছি।

সুধাকর কঠিন হয়ে বললে, নন্দিনী নয়, রাহু। কি চায় ও!

—কি জানি। একটু থেমে বললে, চাইবে আর কি। একটু ভালবাসাবাসি দেখাচ্ছিল। আমি চলে এসেছি।

বলে চুপ করে গেল। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিল রাজা কাছেপিঠে কোথাও আছে কিনা।

না, নেই। খট খট খট খট শব্দ হচ্ছে। ও বোধহয় পাশের ঘরে টেবল-টেনিস খেলছে দেয়ালে। জুড়ি তো পায় না, তাই একা একাই। একটু পরে হয়তো সুধাকরকে ডাকবে, জুড়ি হয়ে খেলবে। ওইটুকু ছেলেটার সঙ্গে সুধাকর যখন মেঝের ওপর বসে বসে টেবল-টেনিস খেলে, হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ে, তখন দেখতে বেশ মজা লাগে।

যেমন মজা লাগে চোখের সামনে রাজাকে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে দেখে। অথচ মনে হয় এই সেদিন। কটা বছর তার হিসেবও থাকে না। মনে হয় রাজা চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে।

মানুষের কত রকম ভুল ধারণা যে থাকে।

বয়কাট চুলের সেই মামাতো বোন মিলু কত বড় হয়ে গেছে, বিয়ের পর একবার বাচ্চা কোলে নিয়ে এসেছিল। ইয়া লম্বা চুল। সুন্দর করে খোঁপা বাঁধে। পুনা না কোথায় যেন থাকে।

ছেলে দেখাতেই এসেছিল তা কি আর অতসী বোঝেনি। ওদের তো ওইসব ধারণা। নিজের ছেলে, পরের ছেলে। বোঝে না, ভালবাসাটাই আসল। ভালবাসা, ভালবাসা পাওয়া।

কই, ওর তো কোনওদিন ভ্রম হয় না রাজা ওর নিজের নয়। ভালবাসা না পেলে নিজের ছেলেও পর হয়ে যায়। এখন রাজা ওর প্রাণ।

দুদিনের মধ্যেই ওই ফুটফুটে শিশুটা ওকে কত আপন করে নিয়েছিল।

দুপুরবেলায় ঘুমোচ্ছে। ঘুমোনো ছাড়া সারা দুপুর কাটাবেই বা কি করে। যখন মুন্নি আর মণ্টু ছিল, প্রভাকরের ছেলেমেয়েরা, তাদের ঘুম পাড়াতেই দুপুর কাবার হয়ে যেত। তারা চলে যাওয়ার পর বুকের ভেতরটাই ফাঁকা, ঘরগুলো নির্জন নিঃশব্দ। চাপা কান্নার মতো।

সুধাকর স্তোক দেবার মতো করে বললে, 'মাদার্স হোম' বলে একটা জায়গায় নাম লিখিয়ে এলাম।

গলার স্বর শুনে বোঝা গেল শুধুই স্তোক, ও নিজেও বিশ্বাস করেনি।

সেজন্যে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সুধাকরই বলেছিল, ওসব বড়লোকদের জন্যে।

কিন্তু দুপুরে হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। কে যেন ডাকছে।

দরজা খুলে প্রথমটা চিনতেই পারেনি। সুধাকর ওকে সঙ্গে নিয়ে দুতিনবার গিয়েছে তা সত্ত্বেও।

মানুষ কখনও কখনও শুধু পোশাকটাকেই চিনে রাখে। পোশাক পাল্টালেই তাকে আর চেনা যায় না। হাসপাতালের নার্স, কিংবা পুলিশের লোক ইউনিফর্ম বদলে সাধারণ হয়ে এলেই অচেনা লাগে। অতসীর মনে পড়ে বাবা একবার একটা কাণ্ড করেছিল। বৃদ্ধবয়েসে এক ডেন্টিস্টের কাছে বার বার গিয়েছে, সাত আটটা দাঁত তুলিয়েছে। যতবার গেছে তাঁকে দেখেছে দাঁতের ডাক্তারদের সাদা পোশাকে। রক্ত-ফক্ত লাগবে বলে যেটা পরেন ওঁরা। তার একবছর পরে এক সভায় দেখা। তিনি ঠিকই চিনলেন, বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অতসীও শুধু পোশাকটাই চিনে রেখেছিল।

—আমি সিস্টার ভিষা, চিনতে পারছেন না ?

কেরলি মেয়ে একেবারে বাঙালি হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের সেই সাদা শাড়ির বদলে রঙিন শাড়ি। শতভিষা নাম, ওরা ছোট করে নিয়ে ভিষা বলে। সুধাকর বলেছিল, নক্ষত্রের নাম।

—আরে ভিষাদিদি, আপনি, চিনতেই পারিনি।

ভিষা হাসল, তারপর বললে, স্বামীকে নিয়ে আজ সন্ধেবেলাই একবার যাবেন। আছে।

—আছে? অতসী তখনই ওর সঙ্গে ছুটে যেতে পারলে বাঁচে।

ভিষা বাধা দিল। বললে, তার আগে একজন দুধ-মা জোগাড় করতে হবে। আমরা অনেক কষ্টে একজনকে পেয়েছি।

মাধুর মা অমলাদিকে বলেছিল, ভগবান দিয়েছেন।

ভগবানই তো।

সিস্টার ভিষা বলে দিয়েছিল, হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ করুন আয়াদের কাছে। টাকা দিতে পারবেন তো?

সেই টাকা।

লেখাজোখা কোর্টকাছারি করে শেষ অবধি নিয়ে এসেছিল। দুধ-মা জোগাড় করতেও পেরেছিল।

হপ্তা তিনেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা। কোলে নিয়ে গালে চুমু খেয়ে মনে হয়েছিল, আরে এ তো আমারই।

শুধু একটা ক্ষোভ ছিল, তখন দুশো টাকা মাইনের দুধ-মার দিকে তাকিয়ে হিংসে হত। বুকের ভেতরে একটা কষ্ট। বুকের দুধটুকুও খাওয়াতে পারছি না, নিজের ছেলেকে। হ্যাঁ, নিজের ছেলেই মনে হত। আর কারুও নয়, নিজের।

সিস্টার ভিষাকে জিগ্যেস করেছিল, কার ছেলে? কোথায় পেলেন?

ভিষা হেসেছিল।—বলা নিষেধ। জানি না, জানলেও বলতাম না। আণ্টি হয়তো জানেন। নাও জানতে পারেন।

রীতিমত রহস্য করে বলেছিল ভিষা।—নিয়ে আসতেই আপনার কথা মনে পড়েছিল, আণ্টিকে বললাম।

একটাই চুক্তি। প্রতি সপ্তাহে গিয়ে দেখিয়ে আনতে হবে। ওঁরাও যখন খুশি আসতে পারেন। ভালভাবে আছে কিনা দেখতে।

পাগল, পাগল। আরে এ যে আমাদের বাড়ির রাজা। এক টুকরো স্বর্গ। ওকে কি আমরা খারাপ ভাবে রাখতে পারি নাকি।

পীড়াপীড়ি করতে একদিন ভিষা বলেছিল, বুড়ো লোক একটা, দাড়ি কামায়নি, সাদা সাদা দাড়ি নিয়ে এসে, দিয়ে গিয়েছিল। কোনও ভদ্র পরিবার হয়তো তার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে।

একটু কাঁটা বেঁধেনি তা নয়, তবু মনকে বুঝিয়েছে, যার কাছেই এসে থাকুক সেও তো ভগবানেরই দেওয়া।

শুধু মনে মনে ভেবেছে, তার মা না জানি কি নিষ্ঠুর। এমন চাঁদের টুকরোকে কেউ বিলিয়ে দিতে পারে।

সেই তখন খুব ভয়-ভয় করত, কেউ ছিনিয়ে নিয়ে না যায়, কেউ হঠাৎ এসে না বলে বসে, এই আমার ছেলে ফেরত দাও। ও আমার।

তখন সব স্বপ্ন মনে হত।

গঙ্গার ঘাটে লাল পাড় শাড়ি পরা বউটা বলেছিল, দিদি একটু ধরবে, চট করে গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে আসব।

কোলে নিয়ে কি ভাল যে লাগছিল, হঠাৎ ভিজে শাড়িতে সপসপ করে এসে বললে, দিন। বলে নিয়ে চলে গেল। আর অতসীর বুকের ভেতরটাই খালি হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক তেমনি। বিশ্বাসই হত না তখন, এ আমার।

কেউ তাকিয়ে দেখলেই মনে হত তাকিয়ে আছে। কেন! কেন! বুকের ভেতরটা দুরদুর করে উঠত।

একদিন তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সন্ধের দিকে এক মহিলা ওদের বাড়ির নম্বরটা কাকে যেন জিগ্যেস করছে।

ছুটে জানালার কাছে এসেছে, ওদের বাড়ির নম্বর কেন? সুধাকরের নাম কেন?

চিনতে পেরে স্বস্তি। ভিষার বদলে আরেক সিস্টার খবর নিতে এসেছিল কেমন আছে।

তারপর যা হয়। ওরাও ভুলে গেল। অতসী ভুলে যেতেই চেয়েছিল। পাড়ার লোকও ভুলে গিয়েছিল, কোথাও কোনও আলোচনা ছিল না।

বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সিস্টার ভিষা এসে হাজির। রাজাকে দেখল, আদর করল, তারপর একখানা কার্ড এগিয়ে দিল। যেতে হবে। মাদার্স হোমের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। গোল্ডেন জুবিলি উৎসব। যাঁরা নিয়মিত চাঁদাটাঁদা দেন, যাঁরা পৃষ্ঠপোষক এবং এই হোমের ছেলেমেয়ে সকলে মিলে ফাংশন হবে। রাজাকে নিয়ে ওদের দুজনকেই যেতে হবে।

গিয়েছিল ওরা। খুব ভাল লেগেছিল। যারা এখান থেকে ছেলেমেয়ে পেয়েছে, পুষ্যি নিয়েছে, তারা অনেকেই এসেছিল। দেখে বিশ্বাসই হয়নি অতসীর। ভিষা ফিসফিস করে বলে দিচ্ছিল, ওই যে দেখছেন মিস্টার মিসেস রাজঘরিয়া, এখন ক্লাশ সেভেনে, ওই ছেলেটি, ভাবতে পারেন?

অনেকে এসেছিলেন নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাঁরা কিছু কিছু চাঁদা দিচ্ছিলেন, আর ভিষাদের আণ্টি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিলেন।

নন্দিনীকে সেখানেই প্রথম দেখে অতসী। সুধাকরও। অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়েটির দিকে চোখ না পড়ে উপায় ছিল না। তার বেশবাস, হাঁটাচলা, কথাবার্তায় এমন একটা আভিজাত্য ছিল যা সকলেরই চোখ কাড়ছিল। ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট শিশুদের দেখছিল, নুয়ে পড়ে আদর করছিল, হাসছিল। আর মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল মার্দাস হোমের বৃদ্ধা আণ্টির দিকে। আণ্টিও হাসছিলেন।

এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি অতসী। ওর সামনাসামনি এক দম্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাচ্চাকে কাছে টেনে নিয়ে এমন মমতার সঙ্গে আদর করছিল, নুয়ে পড়ে তার বুকে মুখ ঘষল, সঙ্গে সঙ্গে সিঁথির সিঁদুরে চোখ পড়ল অতসীর। এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি মেয়েটি বিবাহিতা।

আণ্টি বৃদ্ধা খাতির করছিলেন তাঁদেরই, যাঁরা মোটা টাকা ডোনেশন দিচ্ছিলেন। নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখেই বোঝা গেল সেও বেশ বড় অঙ্কের ডোনেশন দিয়েছে।

বেশ কয়েকটি শিশুকে আদর করে অতসীদের সামনে এল। রাজাকেও জড়িয়ে ধরল, গাল টিপল, চুলে বিলি কেটে দিল। আবার সেই হাসি, আবার সেই আণ্টির দিকে তাকানো। ফিরে তাকিয়ে দেখল আণ্টি হাসছেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, অত অত শিশুর মধ্যে রাজাকেই ভাল লেগে গেল মেয়েটির। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কোলে তুলে নিল, বুকে চেপে ধরল। আদরে আদরে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তারপর অতসীদের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

রাজাকে কাছে টেনে নিয়ে অতসীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। সুধাকরের সঙ্গেও।

সেই তখনই নাম বলেছিল। নন্দিনী।

—আপনার নাম কি দিদি?

যেন কত আপন, কতকালের আপন।

সিস্টার ভিষাকে বলে কাগজ কলম আনাল, নাম ঠিকানা লিখে নিল। বললে, একদিন যাব কিন্তু।

শুনে একটু সঙ্কোচ হয়েছিল ওদের দুজনেরই। নন্দিনীর সাজপোশাকে চেহারায় এমন কিছু ছিল যা দেখে মনে হয়েছিল ওদের বাড়িতে ওকে ঠিক মানাবে না। না গেলেই যেন ভাল।

এত বাচ্চা থাকতে রাজাকেই ওর কেন যে এত ভাল লাগল। শুধু সুন্দর দেখতে বলে?

তবে নন্দিনী রাজাকে একটু বেশি বেশি আদর করছে দেখে অতসীর ভালই লেগেছিল। সুধাকরেরও। কেমন একটা গর্ব গর্ব। ছেলের জন্যে।

যতক্ষণ ওরা ছিল নন্দিনী নড়ল না। ওদের কাছেই বসে রইল। রাজাকে কাছে টেনে নিয়ে, নিজের শরীরের সঙ্গে সেঁটে নিয়ে। ওর মুখে-চোখে কি অদ্ভুত খুশি খুশি ভাব।

একবার অতসীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, ভয় নেই, কেড়ে নেব না।

অতসী জড়তা কাটিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার নেই? হয়নি এখনও?

এই প্রশ্নটা একসময় নিজে যখন শুনত, কি খারাপই না লাগত। লোকগুলোকে নৃশংস নিষ্ঠুর মনে হত। তবু সব ভুলে গিয়ে নন্দিনীকে সেই একই প্রশ্ন করে বসল।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল নন্দিনী। বললে, নেই আবার? দু-দুটি। একটি মেয়ে একটি ছেলে—দুটোই বিচ্ছু।

সুধাকরও হেসে উঠল।

ওরা যখন চলে আসছে, দেখল নন্দিনী ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। দুচোখ থেকে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে।

খুব ভাল লেগেছিল অতসীর। কোন মা না চায় যে তার ছেলেকে সবাই ভালবাসুক। সবাই ভালবাসলে বুকের মধ্যে কেমন একটা গর্ব হয়।

সারা রাস্তা নন্দিনী সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে ফিরেছিল ওরা। কি ভাল, কি ভাল।

সেই নন্দিনী সম্পর্কে এখন ওর অস্বস্তি, ভয়। সুধাকর কেন যে ওকে পছন্দ করে না।

অতসী জানে সুধাকর শুনলেই রেগে যাবে। তবু না বলেও উপায় নেই। কোন ফাঁকে রাজাই হয়তো বলে বসবে, বাবা, সেই মেয়েটা...

ধমক দিয়েছিল একদিন। 'সেই মেয়েটা' আবার কি কথা। মাসিমা বলতে পারো না।

ওর জন্যে ভিতরে ভিতরে অতসীর একটু মায়া আছে।

তবু অভিনয় করার মতো করেই বলতে হল, ছাড়তে কি চায়। যেখানে যাচ্ছি পিছনে লেগে আছে।

একটু থেমে সুধাকরের মুখখানা দেখে নিয়ে বললে, আবার বলে কিনা আমাদের বাড়ি চলো।

সুধাকরের কপাল কুঁচকে উঠল, তুমি কি বললে?

—কি আবার বলব। ওর বাড়ি আমি যাবই বা কেন।

সুধাকর ধীরে ধীরে বললে, ওরা সব বড়লোক, বুঝলে না। ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক...

ঠিক কি ? কি বলবে বুঝতে পারল না। মানায় না ? মেশামেশি চলে না ? কিংবা ওদের সঙ্গে আমরা তো আর পাল্লা দিতে পারব না, তার চেয়ে কাছে না যাওয়াই ভাল।

সুধাকর হঠাৎ কি মনে পড়তে হাসল। বললে, আজ আবার কিছু দিতে চায়নি রাজাকে ? একটু বড়লোকি দেখানো ?

অতসী রাগ দেখাল। —দিতে চাইলেই যেন নিতাম।

একটু থেমে। —কেন, আমরা কি খেতে পাই না, না পরতে পাই না। ছেলেকে কিছু দিতে হলে নিজেরা পারি না নাকি।

তারপর স্বগতভাবেই যেন বললে, বড়লোক আছো, বড়লোক থাকো, আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন বাবা !

সুধাকর বললে, ভদ্রমহিলা মানুষ কিন্তু খারাপ নয়।

সুধাকর মনে মনে ঈষৎ নন্দিনীর দিকে ঢলেছে দেখে অতসী রাগের সঙ্গে বলে উঠল, অত টাকা থাকলে আমরাও ডেকে ডেকে একে-ওকে দিতাম।

একটু থেমে বললে, ওদের কথাই আলাদা। কি ভাগ্যবান দেখো, এত টাকা, বাড়ি গাড়ি, আবার ঠিক যেমনটি লোকে চায় একটা ছেলে, একটা মেয়ে।

হাসতে হাসতে বললে, ওরা হল ভগবানের পোষ্যপুত্র।

বলে ফেলেই খট করে কানে লাগল। ইস্ কথাটা কি করে যে মুখে এসে গেল, শুনতে এত খারাপ লাগে, কেউ বললেও, সেটাই কিনা নিজে উচ্চারণ করে ফেলেছে। ছি ছি।

সুধাকরের কাছ থেকেও ঝট করে সরে গেল। অস্বস্তিতে।

ছয়

আনন্দ আর বিষাদ মেশানো মন নিয়ে মার্কেট থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল নন্দিনী। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অতসী রাজার হাত ধরে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে বাস রাস্তার দিকে। একটা ট্যাক্সি ধরারও চেষ্টা করল না।

বুকের মধ্যে লাগল কোথায়। আহা বেচারি। হয়তো ছুটতে ছুটতে বাস ধরবে, ভিড় ঠেলে দম বন্ধ হওয়া গরমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী বলেছিল, চলুন দিদি, আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে অতসী এমনভাবে 'না না না' করে উঠেছে, যেন ও ভয়ঙ্কর কোনও প্রস্তাব করে ফেলেছে। কেন যে এভাবে ওকে বারবার ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়, একটা দেয়ালের আড়ালে নিজেদের গুটিয়ে নিতে চায় ! নন্দিনী বুঝতেই পারে না। তার জন্যে মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছে দিনে দিনে, চোখের আড়ালে স্তব্ধ কান্না। সমস্ত মন জুড়ে শুধু বিষাদ। আনন্দ একরত্তি। তবু তো জামাকাপড়ের বিলটা মেটাতে দিয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে হলেও সেটা দেওয়া।

অথচ নন্দিনীর কত ইচ্ছে হয়। সেই সব ইচ্ছে পূরণ করার মতো সঙ্গতিও আছে। অতসী আর সুধাকর কেন যে ওকে পছন্দ করে না, অথবা ভয় পায়, তাও বুঝতে পারে না। রাজাকে দেখার আগে ওই বয়সের যে-কোনও ছেলেকে দেখলেই ওর ভালবাসতে ইচ্ছে করত। ছুঁতে, জড়িয়ে ধরতে, আদর করতে। ওর যদি তেমন সামর্থ্য থাকত ওদের সকলের জন্যে পুজোর জামাকাপড় কিনে দিত, আরও কত কি।

এখন অবশ্য ইচ্ছে করে শুধু রাজাকে সত্যি সত্যি রাজা বানিয়ে দিতে।

সকলের জন্যে পারবে না বলেই মাদার্স হোমে প্রতি বছর একটা মোটা টাকা ডোনেশন

দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজাকে যেদিন প্রথম দেখে তার আগেই দিয়েছিল। তা না হলে বুড়ি আণ্টি এত খাতির করেছে কেন। রুক্ষ কঠিন চেহারার বুড়িটার মুখে সেদিন হাসি দেখা দিচ্ছিল কেন। সে ওই ডোনেশনের জন্যে।

রাজা চলে যেতেই মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মেয়ের হাত ধরে গাড়ির দিকে ফিরে তাকাতেই দেখল গাড়ির পাশেই ড্রাইভার চ্যাটার্জিদা দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

অতি বিশ্বস্ত পুরনো ড্রাইভার বলেই বাবা মারা যাওয়ার পর চ্যাটার্জিদাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রেখেছে নন্দিনী। সেই ছোট বয়েস থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। এখন অবশ্য নন্দিনীকে দিদিমণি বলে।

বাবার কাছে শুনেছে চ্যাটার্জিদা একটা মোটর সারাইয়ের কারখানায় কালিঝুলি মেখে কাজ করত। একটু একটু করে মোটর মেরামতির কাজ শিখে নিয়েছিল। নন্দিনীর বাবা তাকে বলেন, তুমি ড্রাইভিং শিখে নাও। তারপর থেকেই চ্যাটার্জিদা ওদের বাড়িতে। প্রায় বাড়ির লোকের মতোই।

—চলুন।

মাথায় খাটো বিশাল বড় গাড়িটার দরজা খুলে ধরে রইল চ্যাটার্জিদা।

মেয়েকে গাড়িতে ঢুকিয়ে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিল নন্দিনী। এখন নরম বিস্তৃত গদিতেও বিন্দুমাত্র আরাম নেই। ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে।

ভিড়ের মধ্যে মার্কেটে হঠাৎ অতসীর ওপর রাজার ওপর চোখ পড়তেই ওর সারা শরীরে মনে এক ঝলক আনন্দ উপছে পড়েছিল। এখন বিষণ্ণ।

নন্দিনীর ইচ্ছে করে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যত বড় বড় দোকানে গিয়ে সবচেয়ে দামি পোশাক পরিচ্ছদ কিনে দেয়। ওর যা সখ, যা কিছু দেখবে, কিনতে চাইবে, সব কিনে দেবে। কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখবে না।

স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু অতসীর কাছে স্কুলের নামটা শুনেই ওর মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। নন্দিনীর ইচ্ছে ওকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার। ভাল স্কুল, ভাল রেজাল্ট, বড় হয়ে বিলেত আমেরিকায় পড়তে যাওয়া। অতসী কিংবা সুধাকরকে মুখ ফুটে বলতেও হবে না, শুধু নন্দিনী যা দিতে চায় ওকে, ওরা শুধু সেটুকু নেবার জন্যে একটু সায় দিলেই ও সন্তুষ্ট। রাজাকে মানুষ করে তোলার জন্যে যা কিছু করতে চায় সেটুকু করতে দিলেই ওর আনন্দের সীমা থাকবে না।

অথচ প্রতিবারই অতসী ওকে প্রত্যাখ্যান করছে। ভিতরে ভিতরে নন্দিনীর মনে হয়, ও যেন ভিখিরি হয়ে গেছে। এ আরেক ধরনের ভিখিরি। যে দিতে চায় অথচ নিচ্ছে না বলে মনের মধ্যে একটা শূন্যতা। কখনও কখনও চোখের আড়ালে অশ্রু। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা।

বাড়ি ফিরে এল। সিঁড়ি বেশ চওড়া, সিঁড়ির ধাপগুলোও উঁচু নয়, তবু মেহগেনির কাঠের রেলিং ধরে ধরে দোতলায় উঠতেও ক্লান্তি। কে যেন ওর সমস্ত শক্তিটুকু কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। কে আবার, ওই রাজা।

শাড়িটা বদলে এসে ডিভানের এক কোণে বসল। স্নান করতে যেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। মার্কেটের ভ্যাপসা গরমে ঘেমে গিয়েছিল, গাড়ির মধ্যে ঠাণ্ডায় ঘাম মরে গেছে, তবু একটু চিড়বিড় করছে।

মেয়ে ঘরের এয়ারকন্ডিশনার চালিয়ে দিয়ে গিয়ে টিভি চালাল। হয়তো ক্যাসেটে কোনও ছবি দেখবে।

সে ওদিকের একটা শোফায় গিয়ে পা তুলে দুহাঁটু মুড়ে বসতেই নন্দিনী বললে, ও কি

হচ্ছে।

একটু থেমে, জামা ছাড়লে না ?

মেয়ে জিভ বের করে ইস্‌স্ বলার মতো করে উঠে গেল। ছেলে বোধহয় রামরতনের সঙ্গে সাঁতারের ক্লাবে গেছে। না, আজ তো বুধবার, যোগব্যায়ামের মাস্টার আসবেন। নন্দিনী নিজেও দু-একটা আসন শিখে নিয়েছে তাঁর কাছে। ফিগার ভাল রাখার জন্যে। কিন্তু কখনও করে কখনও করে না। মনেই থাকে না। কিংবা আলস্য।

চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ, কিন্তু কিছুতেই মন থেকে রাজাকে মুছে ফেলতে পারছে না।

একটু পরেই গাড়ির হর্ন বাজল, কিন্তু নন্দিনীর কানে গেল না। কানে গেলেও ওর তেমন কিছু করণীয় নেই। আশাদি আছে, সেই সব ব্যবস্থা করবে।

এসবই বাবার শেখানো। মানুষটা অত্যন্ত রাগী এবং একগুঁয়ে ছিলেন, যা ভাবতেন তা থেকে নড়চড় করানো যেত না। আসলে সেই মানুষটাই তো বলতে গেলে প্রকৃত ধনী ছিলেন। সাদা কথায় বড়লোক। তাঁর কাছে দাদা বা নন্দিনী কেউই তেমন অবস্থাপন্ন নয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে না ছিল ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার বাসনা, না ছিল সকলের কাছে কেউকেটা সাজা। তখন তো কোলিয়ারি দুটো তাঁরই। হপ্তায় হপ্তায় টাকা আসছে। নিজেও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখাশোনা করতেন। তারপর তো গাভমেণ্ট সব নিয়ে নিল।

আদৌ প্রাচীনপন্থী ছিলেন না, কিন্তু একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। কাজের লোককে দাদা দিদি বলা। যেমন ওই চ্যাটার্জিদা, আশাদি।

হর্ন নন্দিনীর কানে যাক বা না যাক কিচেনে আশাদির কানে ঠিকই পৌঁছে যাবে।

বিষণ্ণ তন্ময়তা ভাঙতেই মনে পড়ে গেল, উঠে গিয়ে একটা ফোন করল। স্বপ্না, আজ আর যেতে পারছি না। শরীর ভাল নেই।

ওদের একটা মেয়েদের মিলনসঙ্ঘ আছে। বারোজন মেম্বার। সকলেই বেশ সচ্ছল ঘরের গৃহিণী, নাতিবয়স্ক, সপ্তাহে একদিন ঘুরে ঘুরে এক একজনের বাড়িতে একটু আড্ডা, হাল্কা খাওয়া। এখন একঘেয়ে লাগে, তবু যেতে হয়। আজ একেবারেই ইচ্ছে নেই।

ফোন সেরে এসে বসতে যাবে, সুপ্রতিম।

ওকে বয়েসের চেয়ে অনেক ইয়াং দেখায়, চলাফেরাতেও। বললে শোনে না, 'রাখো তোমার চ্যাটার্জিদা', নিজেই নিজের ফিয়েট ড্রাইভ করে ফেরে, দুধাপ করে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে।

এসেই কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিল নন্দিনীর দিকে, টাইয়ের নট খুলতে খুলতে বললে, ফেড আপ। অথচ শরীরে কোথাও ক্লান্তির ছাপ দেখা গেল না।

বললে, রাস্তায় নামলেই লোকগুলো সব বর্বর হয়ে যায়, রাস্তা যেন শুধু তাদেরই।

আবার।—তার ওপর সর্বত্র পটহোলস।

টাই খুলে ফেলে সেটা লম্বা করে হাতে ঝুলিয়ে চলে গেল নিজেই টাঙিয়ে রাখতে। যাবার সময় বাঁহাত বাড়িয়ে ঝট করে নন্দিনীর হাত থেকে কোটটা তুলে নিল। তারপর হঠাৎ নন্দিনীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্নকণ্ঠ, ডিপ্রেসড !

নন্দিনী ঈষৎ হাসার চেষ্টা করে বললে, না না।

সুপ্রতিম তো এখন স্নান করে এসে ব্যালকনিতে বসবে বই নিয়ে। কিংবা ম্যাগাজিনস। টি ভি দেখেই না। বরং প্রশ্ন করে, তোমরা এ সব দেখো কি করে।

নন্দিনী এখনও স্নান করেনি জানলে ভেবে বসবে শরীর খারাপ। ও আসুক তারপরই না হয় যাবে। ও ওদিকেরটায় গেলে, নন্দিনীর অসুবিধে নেই, এদিকেরটায় যেতে পারে। কিংবা ছেলেমেয়ের ঘরে। কিন্তু যদি কিছু চেয়ে বসে সুপ্রতিম। একটা না একটা কিছু

তো চাইবেই, ভুলে গেছে বলে।

এত পাজি এখনও, নন্দিনী স্নান করতে গেলেই এক একদিন, ছেলেমেয়ে কাছে না থাকলে, এই শোনো, দরজায় টোকা, জড়িয়ে জড়িয়ে কি বলল, বোঝা না গেলে, আহ্ দরজাটা একটু খুলেই শোন না।

খুললে পা বাড়িয়ে আটকে দেয়, ঠেলেও বন্ধ করা যায় না।

সুপ্রতিম স্নান করতে চলে যেতেই আবার ভাবনাটা পাথর হয়ে চেপে বসল। রাজা।

মনে পড়ে গেল।

চিরকূটটা যত্ন করে ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল। হারিয়ে না যায়। সেসময় মনে হয়েছিল একটা পরম রত্ন আবিষ্কার করেছে। অতসীদের ঠিকানা। সাত সাতটা দিন ভেবেছে, যাবে কি যাবে না।

একদিন রাস্তায় সিগন্যালে গাড়ি আটকেছে, ও আর সুপ্রতিম, চ্যাটার্জিদা চালাচ্ছে, ছেলের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে এক যুবতী মা। মা নিজে সেজেছে রীতিমতো, শাড়িটাও বেশ দামি, কিন্তু ছেলের দিকে নজর নেই, বেশ খারাপ লাগছে, যেন ওই মা'র ছেলে নয়।

সুপ্রতিমেরও চোখ পড়েছিল। —কি শ্যাবি দেখছ, মাকে দ্যাখো।

সত্যি বড় খারাপ লেগেছিল। ওই মা আর ছেলেকে তো বটেই, সুপ্রতিমের কথাটাও। যেন সব মাকে ও এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল।

তক্ষুনি তক্ষুনি গাড়ি থেকে নেমে ওই মা'টার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাল এক সেট পোশাক কিনে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল।

রাজাকে দেখে, মাদার্স হোমের ফাংশনে যেদিন গিয়েছিল, ওই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই রকমই না হলেও কানে 'শ্যাবি' কথাটা বেজেছিল। নন্দিনী সত্যি সত্যি শক্‌ড। তবে অতসীকে দোষ দিতে পারেনি। সুধাকর এবং অতসীর পোশাকআশাক দেখেই বুঝতে পেরেছিল একেবারে মধ্যবিত্ত। এর চেয়ে ভাল পোশাক পরাবে কি করে। নিজেরাই তো পরতে পায় না।

চিরকূটে ওদের ঠিকানা লেখা ছিল। মাঝে মাঝেই বের করে নেড়েচেড়ে দেখত। রেখে দিত।

সাত সাতটা দিন যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে কেটে গেল। একবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, একবার ধসে পড়া মানুষ হয়ে বসে পড়ে। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে শুরু করে।

তারপর হঠাৎ এক দুপুরে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। উঠে দাঁড়াল।

—আশাদি, ওরা রইল, একটু ঘুরে আসছি।

তারপর ব্যালকনি থেকে হাঁক, চ্যাটার্জিদা। চ্যাটার্জিদা, একবার বেরোব।

চ্যাটার্জিদার কাজ থাকেই না বড় একটা। নন্দিনী কিংবা ছেলেমেয়েরা বেরোলে তবেই। সুপ্রতিম নিজের গাড়ি নিজে চালাতে ভালবাসে। অন্য কেউ চালালে চড়ে সুখ পায় না। চ্যাটার্জিদার ধীরে ধীরে চালানোয় অধৈর্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া ও বলে ড্রাইভিং জানা লোক অন্যে ড্রাইভ করা গাড়িতে আরাম পায় না। পিছনে আরাম করে বসেও হঠাৎ হঠাৎ ব্রেকের জন্যে পা বাড়িয়ে ফেলে। অস্বস্তি।

কই, নন্দিনীর তো তেমন কিছু হয় না। ড্রাইভিং তো ও-ও জানে। এই বড় গাড়িটা চালাতে সাহস পায়নি, বাঁদিকে কতখানি ক্লিয়ার আছে ঠিক আন্দাজ পায় না, কিন্তু ফিয়েট তো দিব্যি চালিয়েছে। অন্যে চালালে পিছনে শরীর এলিয়ে দিয়ে কোনও অস্বস্তি হয় না, ব্রেকের জন্যে পা বাড়িয়ে ফেলে না। সুপ্রতিম শুনে রসিকতা করে বলেছিল, ওটা

মেয়েদের স্বাভাবিক চরিত্র। এভরি হাউসওয়াইফ'স বার্থরাইট। অন্যে চালাবে, আমি ঘুমোব।

—হাউসওয়াইফ ? সুপ্রতিম ঠাট্টা করেই বলে, কিন্তু গায়ে লাগে।

বলেছিল, জানো আমি ইচ্ছে করলেই চাকরি করতে পারি ?

—আই নো। দাদার কোম্পানিতে। সুপ্রতিম তখন হাসছে। চাও তো আমার সেক্রেটারি হতে পার।

উত্তর। —আহা রে, সেক্রেটারি যদি হই, তো তোমার কেন।

আবার হাসি। —যদি চাও জি এমেরও হতে পার, একসটেনশনে আছেন, সিক্সটি ফাইভ।

চিমটি।

নন্দিনী দুপুরে একদম ঘুমোতে পারে না। এটা ওটা করে, বই পড়ে, ছবি আঁকার একটু-আধটু চেষ্টা, একটা নতুন ধরনের পোশাকের ডিজাইন ভাবা, ছেলেমেয়ে কিংবা সুপ্রতিমকে চমকে দেবার জন্যে ইংরেজি খাবারের বই দেখে, আশাদি এসো তো, আজ একটা জিনিস বানাব।

তবু সুপ্রতিম বলবে, বেশ তো দুপুরে ঘুমিয়ে কাটাও।

দুপুরে যে বাড়িতে থাকতেই ইচ্ছে করে না বুঝবে কি করে।

—চ্যাটার্জিদা, একটু বেরোব।

ড্রাইভার চ্যাটার্জিদা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সব সময়েই প্রস্তুত।

একবার নন্দিনীকেই রসিকতা করে বলেছিল, দিদিমণির কাছে চাকরি মানে ফায়ার ব্রিগেডে চাকরি। ঘণ্টি বাজল কি লাফিয়ে স্টিয়ারিঙের সামনে বোসো।

শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিল নন্দিনী।

তরতর করে নেমে এসে গাড়িতে গিয়ে বসেছিল, গদিতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে নয়, একটু সামনে ঝুঁকে, বেশি তাড়া থাকলে কিংবা উদ্বেগ, মানুষ যেভাবে বসে।

ব্যাগ দেখে নিয়েছিল। বেশ থোকা থোকা নোট আছে, উপরন্তু ওইসব ডাইনার্স ক্লাবের কার্ডফার্ড, ব্যাঙ্কের। যেন কত কি কিনবে।

বয়েস তো জানতই, দেখেছেও। সুতরাং অসুবিধে হবে না।

সারা দুপুর এদোকান ওদোকান। ওইটুকু বাচ্চার জন্যে দুর্মূল্য কিছু তো পাওয়া যায় না। অর্ডার দিয়ে বানাতে হয়। পরে ভাল দর্জি দিয়ে করিয়ে দেবে, সঙ্গে এনে, এখন কেনাই যাক।

খেলনার দোকানে কয়েকটা খেলনা কিনল, বেশ দামি দামি। আহুজার দোকানে চলে গেল, জাপানি জিনিস রাখে, স্মাগলড্। খোলাখুলিই বিক্রি করে, ব্যবস্থা আছে পুলিসের সঙ্গে।

ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র পিয়ানো একটা চাই। টোন ব্যাঙ্ক। বারোটা সিম্ফনি, বোতাম টিপলেই বাজে। দেড়ফুট লম্বা, হাল্কাও, দিব্যি কোলে রেখে বাজাতে পারবে। আহুজা মাঝে মাঝে বিদেশি জিনিস সাপ্লাই দেয়। আনিয়েও দেয় বললে।

—ডাকু, এক নম্বরের ডাকু।

হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু কিনলও। আজ আর দরদস্তুর করল না।

অন্যদিন করে, দাম কমায়। ওসব করলে নিজেকে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হয়। আর ওরাও জানে বলে দাম বাড়িয়েই বলে।

যা দাম বলেছিল, দর করল না বলে নিজের থেকেই একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ফেরত দিল। আপকি লিয়ে, সিরফ আপকি লিয়ে। বলে হাসল।

নন্দিনী বেশ খুশি, সারা শরীরে যেন আনন্দ উপচে পড়ছে। আহুজা বলেছে, আপনার জন্যে, কিন্তু ওর মনে হল চোস্ত ব্যবসাদার লোকটাও যেন মমতা দেখাল। না আমার জন্যে নয়, রাজার জন্যে, শুধু রাজার জন্যে। রাজাই তো, ঠিক নামটাই দিয়েছে।

নন্দিনীকে কখনও কিছু বয়ে আনতে হয় না। সবই তো চেনা, দোকানের লোকরাই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সেলাম করে। হাত বাড়িয়ে বকশিস নেয়।

এবার চিরকুটটা চ্যাটার্জিদাকে এগিয়ে দিল নন্দিনী। —খুঁজতে হবে।

চ্যাটার্জিদা চিরকুট দেখল। নাম ঠিকানা।

কিছুই বুঝল না, শুধু ঠিকানাটা দেখল। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত বিদ্যে। নিজের চেষ্টায় ওইটুকুই পড়তে পারে।

পাড়া বুঝে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

রাস্তায় পৌঁছে একটু খোঁজাখুঁজি।

পড়বি তো পড় বিষ্ণুচরণের সামনে। সদ্য দিবানিদ্রা দিয়ে ঘুম থেকে উঠেছেন, বাড়ির সামনের রকে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। রক্তে কিছুটা বনেদিয়ানা আছে বলে, অথবা বার্ধক্যের জন্যে দুপুরের ঘুমের পর বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে আলস্য কাটিয়ে উঠতে না পারলে শরীর ফিট লাগে না।

বিশাল গাড়িখানা দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই রাস্তায় এরকম গাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। তবে বিষ্ণুচরণের অবাক হবার কথা নয়, যখন স্কুলে পড়তেন, ওঁদের ঠাকুর্দা তখন বাড়ির কর্তা, একটা সেভ্রলে ছিল, পেল্লায় মাপের, পুরনো হয়ে গিয়েছিল, তা হোক, ঠোকাঠুকি করে সারিয়ে বেশ চলত। বিয়ে বাড়িতে যেতে হলে সাতদিন আগে মিস্ত্রিকে খবর দিত। এখন লোকে সব বড় বড় গাড়ি দেখায়, জানে না, আটআনা পয়সায় ইয়া ব্বড়বড় পন্টিয়াক সেভ্রলে ট্যাক্সি খাটত এই সেদিনও। গাড়িটা জলের দরে বেচে দেওয়ার পর কতবার বিষ্ণুচরণ নিজেই চেপেছেন।

তবু গাড়িখানাকে সমীহ করতে হল, ওঁর তো আর আগেকার সেই দিন নেই।

—উঠে এলেন রক থেকে। কাকে চান ?

উঠে আসার আসল কারণ গাড়ি নয়, গাড়ির মধ্যে বসে থাকা রমণীটি ; যার বসে থাকা এবং তাকানোয় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। ওঁর শরীরে সেই রক্ত যা শিখে এসেছে সাধারণ মানুষের জন্যেও মায়ামমতা রাখতে হয়, কিন্তু আভিজাত্যকে সমীহ করা উচিত। কিন্তু চোর-জোচ্চোর হলে, যদি গরিব হয়, তাকে বেদম ঠেঙিয়ে আধমরা করে দাও। খেতে পায় না ওটা অজুহাত, দেশসুদ্ধ সবাই চুরি করছে ?

সুতরাং গাড়ি যত বড়ই হোক তার ড্রাইভার মানে ড্রাইভার।

দূর থেকেই হাঁক ছাড়লেন, কাকে খুঁজছ হে ?

যদিও ওকে চ্যাটার্জিদা বলে ডাকে, সহবত শিখিয়ে গেছে বাবা, তবু ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিল বলেই ওরা চ্যাটার্জিদাকে 'তুমি' বলে। কিন্তু কলপ মিলিয়ে যাওয়া লাল চুলের ওই বুড়োটা চ্যাটার্জিদাকে 'তুমি' বলল বলে কানে লাগল।

দোষ তো চ্যাটার্জিদার নিজের, বলে বলেও শেখাতে পারেনি।

যতই দাও, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরাতে পারবে না। বোধহয় ধুলোয় মাটিতে ঘসে ময়লা করে নেয়। ড্রাইভাররা বোধহয় ড্রাইভার হয়ে থাকতেই ভালবাসে। আর ওই খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনচার দিন পর পর কামায়, এদিকে সব সাদা হয়ে গেছে, কালো গালে চিবুকে সাদা দাড়িগুলো গজিয়ে উঠে মানুষটাকেই বিশ্রী করে দেয়। লং ড্রাইভে যখনই কোথাও বেড়াতে গেছে দুপাশের মাঠের এমনি দশা দেখেছে ধান কেটে নেবার পর।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল নন্দিনী, নম্বরটা বলল।

—নাম কি ?

নন্দিনী নাম বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিষ্ণুচরণ। বললে, ওই লালবাড়ি। ওদিকের পোর্শেন।

তারপরই—মা, কে হয় তোমার ?

মা। ব্যস বুড়ো লোকটাকে ক্ষমা করে দিল নন্দিনী। বজ্জাত হোক, পাজি হোক, আজকাল তো মা ডাক উঠেই গেছে। ফুটপাথে হাঁটতে গেলে হকার্স কর্নার ডাক ছাড়ে বউদি কিংবা বড়জোর মাসিমা। বিয়ে না হওয়া অবধি দিদি।

কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়, ওর কথার উত্তর না দিলেও নন্দিনী বললে, থ্যাঙ্কস।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হেসে উঠল, আবার থ্যাঙ্কস কিসের ?

কিন্তু পরক্ষণেই, কে হয় বললে না তো ?

নাছোড়বান্দা। এদেরই সুপ্রতিম বলে ইনসাফারেবল। অসহ্য। সব ব্যাপারে নাক ঢোকানো চাই। নন্দিনীদের পাড়ায় কেউ কারও কোনও ব্যাপারে মাথা গলাবে না, যে যেমন থাকতে চায় থাকো। নির্বিবাদে। রাস্তায় দেখা হলে বড়জোর একটা শুকনো নড। আর এরা যেন আত্মীয় হয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল, বাড়িতে একটু কান্নাকাটি শুনেছে কি ছুটে আসবে। নন্দিনীর মাসিমা এইরকম একটা পুরনো পাড়ায় থাকত, তার কাছেই শুনেছে।

গাড়ি নড়তে শুরু করেছে, বিষ্ণুচরণ তখনও উত্তর পাবার আশায় দাঁড়িয়ে। ছোকরাগুলো দেখলে ভাবত নন্দিনীকে দেখার অজুহাতেই দাঁড়িয়ে আছে, নন্দিনীও হয়তো তাই ভাবত, একটু আগে 'মা' না শুনলে নিস্তার পাবার জন্যে ছোট্ট করে বললে, দিদি।

গাড়ি চলে গেছে ইতিমধ্যে, বিষ্ণুচরণ অবাক হয়ে অস্ফুটে বললেন, দিদি ?

গাড়ি এসে দাঁড়াল লালবাড়ির সামনে।

নন্দিনী বিষ্ণুচরণকে ভুলে গেছে, ওর শরীরে দারুণ একটা উত্তেজনা। একটা আনন্দ।

গাড়ি থেকে নেমে তবু বাড়িটার সামনের সোপান বেয়ে উঠতে উঠতে কেমন ভয়-ভয়ও করছিল। বুক দুরুদুরু। কেন কে জানে।

একটা লম্বা প্যাসেজ ঢুকে গেছে, আধো অন্ধকার, কেমন স্যাঁতসেঁতে লাগল, ইটগুলো যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ। রোদ ঢোকে না বলে, নাকি নোনা ধরা দেয়ালে ড্যাম্প ওঠে বলে।

নন্দিনীর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ইস রাজা এখানে ? এই বাড়িতে ?

খুব আপন হবার জন্যে 'দিদি' 'দিদি' বলে ডাকতেই অতসী বেরিয়ে এল। তাকাল। অবাক হল। কারণ প্রথমটা চিনতেই পারেনি। কথা বলেছে, ঠিকানাও দিয়েছে সেদিন, কিন্তু বোধহয় অত ভাল করে লক্ষ করেনি। পোশাকটাই দেখেছিল, শাড়িটা, এখন সেটা বদলে গেছে। না, তা নয়, আসলে যাকে এই বাড়িতে আশাই করেনি, কোনওদিন আসতে পারে ভাবেইনি, সে এসে পড়লে হঠাৎ চেনা যায় না। একজন মানুষকে এক জায়গায় দেখতেই আমরা অভ্যস্ত।

বেশ কয়েক সেকেন্ড পরে চিনতে পেরে অবাক। আপনি।

নন্দিনী হেসে উঠল, আসব বলেছিলাম না।

তারপরই, রাজা কোথায় ?

এবার কোথাও নিয়ে গিয়ে বসতে বলতে হয়। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে। অতসী ভীষণ বিব্রত বোধ করল, লজ্জিতও। ওরা সত্যি তো গরিব নয়, বেশ সচ্ছল ভাবেই

সংসার চালিয়ে আসছে। তবু আগে থেকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ নন্দিনীর মতো বড় ঘরের কেউ এসে উপস্থিত হলে নিজেদের অবস্থাকে দৈন্যদশা মনে হবারই কথা, সঙ্কোচ হবারও।

প্রভাকর চলে যাওয়ার পর তার শোবার ঘরখানাকেই বসার ঘর করে নিয়েছে অতসী। এটাকে অবশ্য ঠিক বসার ঘর বলাও চলে না। একটা তক্তপোশ, তোশকে চাদরে ঢাকা, দুখানা কাঠের চেয়ার, পিঠে কাঠ, বসার জায়গাটুকু বেত, এক কোণে একটা ছোট টেবিল, একসময় সুধাকর পড়েছে, পরে প্রভাকর, দুটোই অতসীর শোনা, নিজের চোখে দেখেনি।

এঘরে নন্দিনীর মতো ফ্যাশনদুরস্ত কোনও মহিলাকে নিয়ে এসে বসাতে বড় লজ্জা। ইচ্ছে করলে ছিমছাম একটা বসার ঘর করে তোলা যেত। সোফাকৌচ হয়তো কেনা যেত, এমন কি আর দাম, কিন্তু এঘরে মানাত না। তবে দোকানে দেখেছে, কাদের বাড়িতেও যেন, সেই যে পিঠে বেত-বোনা, বসার জায়গাটাও বেশ হেলান দিয়ে বসা যায় তেমন থ্রি-পিস সেট। আসলে কোনও দিন মনেই হয়নি। ওদের কাছে কেই বা আসে। আত্মীয়স্বজন এলে তারা তো ঘরের লোক, তাদের কাছে লুকোবার কিছু নেই। সুধাকরের অফিসের কেউ ? তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। জমিয়ে আড্ডা দিতে পেলেই হল, আর চা। মুড়ি সিঙাড়াতেই তৃপ্ত, কিংবা তেলেভাজা।

যেটুকু ব্যবস্থা আছে তাই যথেষ্ট মনে হত। তাছাড়া ওগুলোর ওপর একটা মায়া আছে, পুরনো আসবাবের ওপর মায়া কাটানো বড় দুরূহ। এ-বাড়ির বাবা, মানে সুধাকরের বাবা তাঁর দারিদ্র্যের দিনে কষ্টের টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। ফেলে দিতে তো পারে না। হাজার হোক একটা স্মৃতি।

তবু অতসী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মনে হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচারটে কথা বলে বিদেয় হলেই যেন বাঁচে।

নন্দিনী হেসে উঠল। বললে, বসতেও বলবেন না ? চলুন দিদি, রাজাকে দেখি একবার। কোথায় সে।

অগত্যা শোবার ঘরেই নিয়ে যেতে হল। ও ঘর তবু ভাল, নক্সা কাটা পালঙ্ক আছে, আয়না বসানো স্টিলের আলমারি আছে।

বললে, সে বাবু এখন ঘুমোচ্ছে।

—তাই বুঝি। চলুন দিদি, চলুন। রাজার আমার ঘুমন্ত মুখখানা একটু দেখি।

অতএব শোবার ঘরেই।

বোধহয় জোরে হেসে উঠেছিল নন্দিনী, শব্দ করে। ঘরে ঢুকে দেখে রাজা বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছে।

কি গো রাজাবাবু, চিনতে পারো ?

চোখ তুলে ওর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল রাজা। অপরিচিত লোক দেখে, অপরিচিত কারণ রাজা মনেও রাখেনি নন্দিনীকে, একটু সঙ্কোচ বোধ করল। মাথা হেঁট।

নন্দিনী পাশে গিয়ে বসল, হাত বাড়িয়ে কাছে টানতে চাইল, তারপর বললে, তোমার জন্যে কি এনেছি বলো তো ?

লজ্জা সঙ্কোচ ততক্ষণে কেটে গেছে অতসীর, না কাটলেও হেসে হেসে বিব্রত ভাবটা চাপা দিতে পেরেছে।

তাই বলে উঠল, আবার আনাআনি কেন !

কথাটা কানেও গেল না, নন্দিনী বললে, এক মিনিট।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে সোঁদা গন্ধের প্যাসেজ পার হয়ে একেবারে দরজায়। —চ্যাটার্জিদা, ওগুলো দিয়ে যাও না।

পলিথিনের দু-তিনটে পেটমোটা ব্যাগ নিয়ে চ্যাটার্জিদা ভিতরে ঢুকতেই অতসী বলে উঠল, একি একি ! এতসব কি এনেছেন।

নন্দিনী বললে, এনেছি তো রাজার জন্যে, আপনি বলার কে ?

হাত থেকে ব্যাগ কটা নিয়ে নিতেই চ্যাটার্জিদা নিঃশব্দে চলে গেল। আর নন্দিনী সেগুলো নিয়ে এসে ফেলল খাটের ওপর। ইলেকট্রনিক পিয়ানোটা বাজিয়ে দেখাল, খেলনাগুলোও।

তারপর পোশাকের ব্যাগ থেকে একটা মোড়ক বের করে এগিয়ে দিল অতসীর দিকে। হাসতে হাসতে বললে, দিদির জন্যে সামান্য একটা...

শাড়ি।

এতক্ষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই প্রতিবাদ করতে পারছিল না। এবার রুষ্ট না হয়ে উপায় রইল না। বললে, না না, এসব কি ? তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি কিচ্ছু নেব না। নিতে দেব না ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর মুখখানা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, যেন চরম আঘাত হেনেছে অতসী ওর গালে। আহত বিষণ্ণ মুখে নন্দিনী বললে, নিতে দেবেন না ?

রাজা ততক্ষণে পিয়ানোটায় বেশ মজা পেয়েছে, বোতাম টিপছে আর সেটা সারেগামা হয়ে বাজতে শুরু করছে। মার গলাটা একটু উঁচু পর্দায় উঠল বলেই কথাটা শুনে বিভ্রান্তের মতো অতসীর দিকে তাকাল। পিয়ানোটা দূরে সরিয়ে দিল।

আর নন্দিনীর মুখের দিকে তাকাতেই অতসীর মনে হল অন্যায় করে ফেলেছে। আঘাত দিয়ে ফেলেছে। তা না হলে নন্দিনীর চোখ এমন হয়ে যাবে কেন। যেন এখনই চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসবে।

কেমন বিষণ্ণ গলায় নন্দিনী বললে, নিতে দেবেন না ?

বলেই অতসীর দুখানা হাত জড়িয়ে ধরল দু'হাতের মুঠোয়। অনুনয়ের গলায় বললে, দিদি, আজ, শুধু আজ এগুলো নিন। কথা দিচ্ছি, আর কোনওদিন আনব না।

স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে অতসী শুধু ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ রাজি হ'ল।

তাল কেটে গিয়েছিল, সুর কেটে গিয়েছিল। তবু অনেকক্ষণ ছিল নন্দিনী ! রাজাকে আদর করল, বুকে চাপল, পোশাকআশাক দেখিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললে, পছন্দ হয়েছে ?

রাজা কোনও কথাই বলল না। শুধু মার মুখের দিকে তাকাল।

নন্দিনী চলে যেতেই নিশ্চিন্ত বোধ করল অতসী, সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্ভাবনাও।

সেই প্রথম যখন নিয়ে এসেছিল রাজাকে, সব সময় কি এক দুর্বোধ্য ভয়। একটা আশঙ্কা, এই বুঝি কেউ এসে দাবি করে বসে, নিয়ে চলে যায়। সুধাকর বোঝাত, তবু মন বুঝত না।

আবার সেই ভয়টাই উঁকি দিল। এই সব রাশি রাশি জিনিস দিয়ে রাজার ভালবাসাটা না কেড়ে নেয়। তাছাড়া এই সব দামি দামি জিনিসপত্র দিয়ে নন্দিনী যেন ওদের হেয় করে গেছে। যেন জানিয়ে দিয়ে গেছে রাজাকে ওরা এ-সব কিছুই দিতে পারে না।

অথচ কি করবে অতসী, কি করার ছিল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল ফিরিয়ে দিলে এখনই মেয়েটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে।

সুধাকর এসে শুনল সব। জিনিসগুলো এক ঝলক দেখল।

তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বললে, নিলে সব ?

—কি করব বলো। অসহায়ের মতো অতসী বললে, মেয়েটার ওপর এমন মায়া

হ'ল—

সুধাকর গুম্ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, অতসী চা এনে দিল, চিঁড়ের পোলাও। তারপরই ওর মনে পড়ে গেল, নন্দিনীকে এক কাপ চা, তাও দেয়নি। দেবার কথা মনেই ছিল না। একদিকে নন্দিনী ওই পাহাড়প্রমাণ উপহার নিয়ে এসেছিল বলে অস্বস্তি, আরেকদিকে ভয় সুধাকর ফিরে এসে কি বলবে।

সুধাকরের সমস্ত মন বিস্বাদ; নানা রকম চিন্তা। একটুখানি হীনমন্যতায় ভুগছিল। একটা রহস্যময় প্রশ্নও, কেন দেবে এত সব। না হয় রাজাকে তার ভালই লেগেছে, কত লোকেরই তো লাগে, তার জন্যে এই এত বাড়াবাড়ি কখনও দেখেনি। বেশির ভাগ লোকের তো চিবুকে হাত দিয়ে চুক্, একটা ক্যাডবেরিও হাতে করে আনে না। আনলেও অবশ্য অতসী খেতে দিত না। 'কিরমি হয়, খেয়ো না', কিংবা 'দাঁতে পোকা হবে তখন বুঝবে।'

চিঁড়ের পোলাওয়ের প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে চাটুকু শেষ করল সুধাকর, তখন একটু শান্ত।

উঠে এসে জিনিসগুলো একে একে দেখল নেড়েচেড়ে, নিজেই একবার পিয়ানোর বোতাম টিপে বাজাল। পোশাকআশাক। দেখেই বুঝল বেশ দামি দামি জিনিস, পছন্দও আছে। বুকের ভেতরে ঈষৎ কুঁড়ি ফোটা ফুলের সুবাস, খারাপ তো লাগছে না। কিন্তু এসব মোটেই ভাল নয়, বরদাস্ত করা উচিত নয়।

—এর পর আবার যদি আসে, কিচ্ছু নিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো মুখের ওপর। রাজাকে ভাল লেগেছে, ঠিক আছে, এক প্যাকেট ক্রিম বিস্কুট দিলেই যথেষ্ট বড়লোকোমি দেখানো যেত।

অতসী ধীরে ধীরে বললে, তুমি মিথ্যে রাগ করছ, আমার কি দোষ।

—নিলে কেন, গিয়ে ওর গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলেই তো পারতে। কি ভেবেছে কি ওরা, বড়লোক আছে নিজের বাড়িতেই থাকুক না। আমরা কি ভিখিরি? রক্ত জল করা টাকাতেও আমরা ছেলে মানুষ করতে পারি।

একটু থেমে বললে, একেবারে মেশামেশি করবে না, ও যেন বুঝতে পারে ওর আসা আমরা পছন্দ করছি না। না হয় মুখের ওপর বলেই দেবে, আসবেন না কোনওদিন।

অতসী হেসে গুমোট ভাবটা হাল্কা করার চেষ্টা করল, ও মা, আমার চেয়ে কত ছোট, ওকে আমি আপনি আপনি বলব? বলে হাসল।

সুধাকরের তখনও দুশ্চিন্তা। ভেঙে পড়া গলায় বললে, এবার এসে যদি ওর মেয়ের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে বসে, ভেবে দেখেছ?

অতসী ভয় পেয়ে গেল, বললে, ও-বাবা, অত বড়লোকের বাড়ি আমি যেতেই পারব না। হাঁটু কাঁপবে। বলে হাসল।

সুধাকর তাকাল অতসীর মুখের দিকে। —তুমি শুধু যাওয়ার কথাটাই ভাবলে!

একটু থেমে বললে, একটা কিছু রিটার্ন দিতে হলে, এতসব দিয়ে গেছে, মানইজ্জত রাখতে হলে, কি দিতে হবে ভেবেছ!

ভয় পেয়ে গেল অতসী। ঠোঁট উল্টে বললে, যাবই না।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে থাকল সুধাকর।

রাজা কামান দাগা ট্যাঙ্কটা নিয়ে মেঝেতে বসে খেলতে খেলতে চুপ করে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। কথা শুনছিল। কিছুটা বুঝছিল, কিছুটা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ উঠে চলে গেল।

আর সুধাকর বললে, রাজার কাছেই আমাদের ছোট করে দিয়ে গেছে। ও তো ভাববে, বাবা-মা কিছুই দিতে পারে না, পুজোয় একটা দামি কোটপ্যান্টও না।

অতসী হাসার চেষ্টা করে বললে, দূর, ছেলেরা তাই আবার ভাবে নাকি ! বাবা-মার ভালবাসাটা কিছু নয় !

সাত

ফেরার পথে গাড়ির পিছনের সিটে নন্দিনী বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বসে ছিল। যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন উত্তেজনা, একটা আনন্দের স্বপ্ন। কি ভাল লেগেছিল মার্কেটিং করার সময়। ঠাণ্ডা গাড়ি থেকে ঠাণ্ডাঘর দোকানে যাওয়ার মাঝপথে ভ্যাপসা গরম, তবু এতটুকু ক্লান্তি লাগেনি।

ফুলপ্যান্ট আর ব্লেজার পরিয়ে রাজাকে কেমন দেখতে লাগে ইচ্ছে ছিল দেখার। সে-কথা মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। অতসী যে এরকম ব্যবহার করবে, সব ফিরিয়ে দিতে চাইবে কল্পনাও করেনি। ওর তো একসময় চোখে জল এসে গিয়েছিল। নিজেকে নিঃস্ব একটা ভিখিরি মনে হচ্ছিল। যেন হাতে একটা রঙচটা এনামেলের বাটি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দয়া ভিক্ষে করছে। ভিক্ষে একটাই, শুধু ওর দেয়া পোশাকটা রাজা যেন পরতে পায়।

ঠিক ওই রকম একটা নীল ব্লেজার গায়ে দিয়ে বাবুন খেলতে যায়। রোয়িং দেখতে। আরেকটু বড় হলে রোয়িং ক্লাবে ঢুকিয়ে দেবে। যত সাধ আহ্লাদ সবই তো মেটায় বাবুন আর উনুর ওপর দিয়ে। সাধ জেগেছিল রাজাকেও ওদের সমান সমান করে দেবে। না, তা অবশ্য নয়, তা হবার নয়। কোথায় সীমারেখা টানা আছে তা জানে। তবু যতটা পারা যায়। ওর ধারণা ছিল সঙ্গতি থাকলেই তা সম্ভব। দিলে নেবে না, ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে, এসব কথা ভাবেইনি।

এখন বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা, একটা যন্ত্রণা। অথচ কাউকে বলার উপায় নেই। এ দুঃখ কেউ বুঝবেও না।

পিছনের সিটে ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে বসেছিল পিঠের গদিতে হেলান দিয়ে। একটাও কথা বলছিল না।

চ্যাটার্জিদা সাধারণত কোনও প্রশ্ন করে না, হুকুম তামিল করেই খুশি। যত গালগল্প তার বাবুন আর উনুর সঙ্গে।

তবু ওর কেমন খটকা লাগল। এরকম তো কোনওদিন দেখেনি।

বিষ্ণুচরণ প্রশ্ন করতে গাড়ির জানালা থেকে নন্দিনী উত্তর দিয়েছিল, দিদি।

খটকা তখন থেকেই। নন্দিনীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, কই এপাড়ায় তো কখনও আসেনি। এরকম কোনও দিদির কথাও শোনেনি। আর ঠিকানা খুঁজে খুঁজেই বা আসতে হল কেন।

গাড়ি চালাতে চালাতে কৌতূহল চাপতে পারল না চ্যাটার্জিদা।

হঠাৎ প্রশ্ন করল, এরা কারা দিদিমণি ?

নন্দিনী হাসার চেষ্টা করল। বললে, কেউ নয়, এমনি।

তারপরই, চলুন চলুন, বাবুন উনুকে আশাদির কাছে রেখে এসেছি। কি করে বসল কে জানে।

সত্যি সত্যি উদ্বেগ হল। নিজে না থাকলেই কিছু না কিছু করে বসে। রেখে এসে শান্তি নেই।

নামার সময় শুধু ছোট্ট করে বললে, সাহেবকে বোলো না।

সাহেব অর্থাৎ সুপ্রতিম।

চ্যাটার্জিদাকে একথা না বললেও চলত। এরকম নির্দেশ মাঝে মাঝেই শুনতে অভ্যস্ত।

গোড়ার দিকে একটু খটকা লাগত, পরে দেখে কিছুই না, একেবারে নির্দোষ কোনও ব্যাপারস্যাপার। কলেজের কোনও মেয়েবন্ধুকে নিয়ে ফ্লুরিতে গিয়ে চা-পেস্ট্রি খেয়েছে, ভিক্টোরিয়ার সামনে আলসে ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে, তাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ছোট্ট করে হেসে, সাহেবকে বোলো না। এ-রকম কতবারই তো বলেছে। মেয়েরা বোধহয় কিছু কিছু কথা গোপন করতে ভালবাসে। তার নিজস্ব কিছু। বলে ফেললেই যেন গোপন আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু একটা সন্দেহ একদিন মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল।

বেচারি চ্যাটার্জিদা মনের মধ্যে একটা কথা গোপন করে আসছিল, এমন কি এই নন্দিনীর কাছেও। সে যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা। অথচ বড়বাবুর কাছে এমনই কৃতজ্ঞ ছিল যে গোপন না করে পারেনি। তিনি মারা যাওয়ার পরেও গোপনই থাকত। হ্যাঁ, গোপনই আছে, থাকবেও। কিন্তু শেষ অবধি কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফেলেছিল। সে ওই নন্দিনীর মুখের দিকে চেয়ে।

সুখী মানুষ, নন্দিনীকে দেখে বেশ সুখীই মনে হয়েছিল। বাবুন আর উনুকে নিয়ে। সাহেব তো দিব্যি ফুর্তিবাজ মানুষ, সংসারে কি করে শান্তি রাখতে হয়, সুখী করতে হয়, জানে।

ড্রাইভার চ্যাটার্জির ধারণা হয়েছিল নন্দিনীর মন থেকে সব মুছে গেছে, কোথাও কোনও স্মৃতির কাঁটা নেই।

বাবুন আর উনুকে নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকত ওর দিদিমণি এই নন্দিনী। সাহেবের সঙ্গে কখনও বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরছে হাসতে হাসতে। উনুর একটুখানি জ্বর হল তো কি উতলা। ফোন খারাপ, নিজেই ছুটেছে ডাক্তারের কাছে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ঘোর সংসারী যাকে বলে। সব দিকে চোখ।

সংসারে এরকম ফোয়ারা ফোয়ারা ভাব দেখতে কার না ভাল লাগে। এ বাড়িতে কাজ করেও সুখ।

মানুষের মনের ভিতরে কখন কি হয় তা জানা যায় না।

বড়বাবুর বাড়ির সামনে বেশ বড় বাগান ছিল। এবাড়িটায় নেই। অর্থাৎ যেটুকু আছে তাকে বাগান বলা যায় না। তবু সেই গাছগুলোর নিয়মিত তদারকি করত নন্দিনী। রামবিলাসকে ডেকে নির্দেশ দিত বা ধমক।

সেদিন সকালে সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই গাছগুলো তদারকি করতে নেমে এসেছিল নন্দিনী। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জিদা দেখছিল, দরকার হলে রামবিলাসকে হাঁক দেবে, বা নিজের হাতেই করে দেবে।

—চ্যাটার্জিদা!

ফুলগাছটার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই। শুধু উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে হয়তো, কেমন গাঢ় গম্ভীর গলায় বললে, একটা কথা আছে।

ও এগিয়ে এল।

—কি করেছিল জানো?

নন্দিনী তখন ফিরে দাঁড়িয়েছে। আর তার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে চ্যাটার্জিদার বুকের ভিতরটা যেন চমকে উঠল।

হু হু করে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল নন্দিনীর।

হঠাৎ কেঁদে উঠে বললে, তুমি থাকতে মরতে দিলে !

চ্যাটার্জির বুকের ভেতরে কি যে করে উঠল ও নিজেও জানে না। বড়বাবুর কাছে দেওয়া সব প্রতিজ্ঞা নিমেষে ভুলে গেল নন্দিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কান্নাভেজা চোখ, গলার স্বর, ভেঙে পড়া—সবকিছুর মধ্যে কি যে ছিল। সে বলে উঠল, না না দিদিমণি, কি বলছো, বড়বাবু কি তেমন করতে পারেন !

একটু থেমে বললে, সে কথা ভাবাও পাপ।

সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর সমস্ত শরীর যেন আগ্রহ হয়ে উঠেছিল। —তবে ?

পরক্ষণেই বলে উঠল, এতদিন বলোনি ? কোথায়, কোথায় সে ?

বলবে না ভেবেও শেষ অবধি পারেনি।

বলেছে, বড়বাবুর হুকুম, কি করব দিদিমণি, নিজের হাতে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। দেবার সময় আমার বুকটাও ফেটে গিয়েছিল।

নন্দিনীর বুকের মধ্যে সেজন্যেই এত জ্বালা, এত ক্ষোভ। এত কান্না। অথচ মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না। অতসীকেও নয়। শুধু একটুখানি ভালবাসা দেবার জন্যে একটা ফুটো ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দয়া ভিক্ষে করতে হবে। অতসীর কাছে। আর যতবার যাবে রাস্তার মানুষের মতোই হয়তো নির্দয়ভাবে সে নন্দিনীকে ঠেলে সরিয়ে দেবে।

একটা মাস নিজেকে আটকে রেখেছিল নন্দিনী। না, যাবে না, যাবে না, আর। এই দোটানার মধ্যে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না। ওর বুকের মধ্যে তখন শুধুই জ্বালা।

অথচ সুপ্রতিমের প্রতি ও কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ? না, সুপ্রতিমকে ও ভালবাসে। বাবুনকে, উন্নুকে। ওদের নিয়েই ওর সংসার। এর মধ্যে আর কাউকে ও উঁকি দিতে দেবে না। ওর সুখ কিংবা শান্তি ছিনিয়ে নিতে দেবে না।

নন্দিনীর মনে হল ও একটা ভুল করে ফেলেছে। যাকে মুছে দিয়েছিল জীবন থেকে তাকে ভুলে যেতে পারলেই ভাল ছিল।

রাজা ওর কেউ নয়।

কি প্রয়োজন ছিল মাদার্স হোমের ওই আন্টি বুড়ির কাছে অনুনয় করা, ভিক্ষে চাওয়া। অর্থলোভী ওই বুড়িটাকে অর্থের লোভ দেখানো।

অর্থলোভী ! নন্দিনীর মনে হল ওর বিচারে ভুল হয়ে যাচ্ছে। রাজাদের বাঁচানোর জন্যেই তো ওর অর্থলোভ। ওর কি দোষ।

প্রথম দিন কি নির্মম মনে হয়েছিল ওই আন্টি বুড়িকে।

মাদার্স হোমের নামে একটা মোটা টাকার খাম এগিয়ে দিয়েছিল ও, আর সেই কঠিন কঠোর বলিরেখায় পূর্ণ একখানা বার্ধক্যের গম্ভীর মুখে হাসি দেখতে পেয়েছিল।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। বুড়ি আন্টি আনন্দের আধিক্যে তিন তিনবার থ্যাঙ্কস দিয়েছিল।

কিন্তু তার পরের প্রশ্ন শুনেই মুখ থমথমে হয়ে গিয়েছিল বুড়ির। যেন আইনের ঘেরাটোপে বাঁধা, নীতিতে আবদ্ধ, জীবনে ডিসিপ্লিন ছাড়া আর কিছু জানে না এমন একটি কাঠের মূর্তি, যার মধ্যে কোথাও কোনও প্রাণ নেই, মানবিকতা নেই।

অবাক লেগেছিল নন্দিনীর। যে মানুষটি অজ্ঞাতকুলশীল অসংখ্য শিশুকে এতকাল ধরে আশ্রয় দিয়ে আসছে, পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রাখছে, তার মধ্যে মানবিকতা নেই তা তো হতে পারে না। অথচ একজন মানুষের জন্যে, একজন দুঃখী মানুষের জন্যে, তার মনে কোনও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকবে না, এমন কি করে হয়। অসংখ্য শিশুর জন্যে যার

প্রাণ কাঁদে, তাদের মঙ্গল কামনা করে, একটি শিশুর জন্যে তার কোনও সমবেদনা থাকবে না, তা কি সম্ভব। বহু মানুষের মঙ্গল চিন্তা মেকি, একেবারে মেকি, যদি না ব্যক্তি মানুষের জন্যে তার হৃদয় থাকে।

বুড়ি আণ্টি নিমেষের মধ্যে যেন মানুষটাই বদলে গেল। খাম হাতে পেয়ে যে মুখে একটু হাসি দেখা দিয়েছিল, সেই মুখ তখন কঠিন কঠোর।

অবাক হয়ে বললে, কি বলছেন আপনি, ইট্‌স ইমপসিব্‌ল।

একটু থেমে বললে, তাছাড়া আমরা যখন নিয়েছি তাকে, বাচ্চাটাকে, তখন তো তার পরিচয় না জেনেই নিয়েছি, নিই। হি ওয়াজ জাস্ট আ বেবি, নাথিং এলস্। রেজিস্টারে আর কিছুই লেখা থাকবে না। একটু থেমে বলেছে, তাছাড়া সে রেজিস্টারই এখানে নেই।

নন্দিনী অনুনয় করেছে, তারিখটা আমি জানি, মাত্র তিন সপ্তাহের বাচ্চা। প্লিজ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, শুধু জানতে চাই বেঁচে আছে কি না।

তারিখটা বলল নন্দিনী। আবার বললে, তিন সপ্তাহের বাচ্চা।

বুড়ি আলতো ভাবে একটা পুরনো রেজিস্টার খুলে বোধহয় তারিখ মিলিয়ে দেখল। আশা পেয়েছিল নন্দিনী।

কিন্তু পরক্ষণেই নির্মমভাবে আণ্টি বুড়ি টাকাটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে, ফেরত নিতে পারেন।

নন্দিনী বলেছে, না না, এটা মাদার্স হোমের জন্যেই এনেছিলাম। সে বেঁচেই থাক বা মারা যাক্, হোমের সব শিশুই আমার সেই হারানো ছেলে। ওই বয়েসের, এখন তার বয়স কত তার হিসেব আমার চেয়ে বেশি কে জানে। রাস্তায় ওই বয়েসের কোনও ছেলে দেখলেই মনে হয় আমার সেই হারানো ছেলে। আমি কাঁদি। ভেতরে ভেতরে কাঁদি।

এই বুড়িকে অনুরোধ উপরোধে কোনও ভাবেই নরম করা যাবে না। ভেবে এক বুক হতাশা নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে একটা স্নেহ মাখানো মরমী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

—রেস্ট অ্যাসিওরড, সে বেঁচে আছে, ভালই আছে। হে-ল অ্যান্ড হার্টি।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল নন্দিনী।

বুড়ির মুখ হাসছে, যেন দারুণ খুশি কথাটা বলতে পারার জন্যে। এ এক আলাদা চেহারা। একজন মা, মাদার্স হোমের মা। লোকে ভুল করে আণ্টি বলে।

বুড়ি এগিয়ে এল। নন্দিনীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললে, আমি তোমার দুঃখ বুঝি। তোমার মতো মেয়েদের দুঃখ আমার চেয়ে কেউ ভাল বোঝে না।

তারপর একটু থেমে বললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে একজন মা পেয়েছে, বাবাও। সে সমাজে মাথা উঁচু করেই দাঁড়াবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্ছল আনন্দ আর গভীর দুঃখ নন্দিনীর মুখের ওপর ছায়া ফেলল। ওর সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল পরক্ষণে। সে মা পেয়েছে, বাবা পেয়েছে, তার নিজের সন্তান একদিন নাকি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই সমাজে, যে সমাজে তার নিজের বাবা-মা'র হয়ে সন্তানকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সারা জীবন। সমাজ তাকে হয়তো গ্রহণ করবে, যদি কোনওদিন তার ইতিহাসটা ভুলতে পারে। পারে না, পারে না। কেউ না কেউ আঙুল দেখিয়ে বলে দেয়, জানেন তো, ও অ্যাডপটেড সন্, নিজের নয়, হোম থেকে এনেছিল। আর যদি বা কোনওদিন ভুলে যায়, তখনও তার সেই বাবা-মার মনে একটা কাঁটা হয়ে থাকে, হয়তো। কে জানে, উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মুহূর্তে, কিংবা ছেলে কোনও দোষ করলে, কথাটা মনে পড়ে যায় কিনা, একটা আফসোস জাগে কিনা, নিজের মনকে

হয়তো বলে ওঠে, ফেলে দেওয়া একটা হোমের ছেলে তো, ও তো ও রকম হবেই, হবারই কথা।

বুড়ির কাছে এইটুকু আনন্দের খবর, এইটুকু সমবেদনা পেয়েই নন্দিনীর তখন দু চোখ জলে ভাসছে। ও হঠাৎ 'না না' করে কিছু একটা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। না, বলা যাবে না, বলা যায় না। চিরকাল শুধু গোপন করে যেতে হবে, একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে। তার নিজের ভুল, কিংবা বাবার, চ্যাটার্জিদা যাকে বড়বাবু বলে আজও সম্মান করে। প্রতিজ্ঞা রাখে।

নন্দিনী দু'চোখের জলে দুগাল ভাসিয়ে কান্না-গাঢ় গলায় বললে, শুধু একবার, একবার যদি তাকে দেখতে পেতাম।

হাসবার চেষ্টা করলে, আমি তো তাকে কেড়ে নেব না। নিতে পারব না। আমার পক্ষে তা সম্ভবও নয়।

বুড়ি গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমাদের জুবিলি ফাংশনে আসবেন আপনি, সমস্ত অ্যাডপটেড চাইল্ডরাই আসবে। আপনি তাকে দেখতে পাবেন, বাট আই ওন্ট সে হুইচ্ ওয়ান।

নন্দিনীর তখন মনে হয়েছে সেটাই যথেষ্ট, যথেষ্ট। নিজের চোখে তাকে দেখতে পাবে।

একটা কার্ড এগিয়ে দিল আণ্টি। বললে আমি আপনার নামও জানতে চাই না। এইটাই নিয়ম। কিন্তু আসবেন।

ও যখন চলে আসছে বুড়ি হাসতে হাসতে 'কিন্তু আসবেন' বলে একটু থেমে কথার পিঠে আরও তিনটি শব্দ জুড়ে দিল, উইথ আ ডোনেশন।

এতক্ষণ মানুষটাকে কাঠবাদামের মতো মনে হয়েছিল, বাইরেটা নির্মম এবং কঠিন হলেও ভিতরটা সুস্বাদু। কিন্তু হঠাৎ যেন বাদামটা বের করে খেতে যাবে, একটা পোকা, দুর্গন্ধ।

না, ভুল করছে। আণ্টি বুড়ির এছাড়া যে উপায়ও নেই। এই হোম চালাতে হবে তো। এতগুলি শিশু, আরও আসবে, মাদার্স হোমকে বড় করার স্বপ্ন, এক ধরনের আত্মতৃপ্তি, হয়তো একটুখানি 'ইগো', আমি করেছি, এত বড় ছিল না, আমার সৃষ্টি, হয়তো বা একটু খ্যাতির মোহ। এত লোক অবাক হয়ে তাকাবে, এই মানুষটা করেছে, এই আণ্টি বুড়ি।

তা কেন। নন্দিনীর মনে হল এসব কিছুই নয়। নিঃস্বার্থভাবেও তো মানুষের প্রাণ কাঁদে। শুধু কাঁদে বলেই কিছু করতে চায়। নন্দিনী নিজে কেন কাঁদছে, কেন ভুলে যেতে পারল না। মা তো সন্তানকে শুধুই ভালবাসতে চায়, কিছু পাব ভেবে ভালবাসে না। যাকে নিতে পারব না, পাওয়া সম্ভব নয়, তাকেও। শুধু সন্তান বলেই। সে-রকম ভালবাসাও তো কারও কারও মধ্যে থাকে, থাকতে পারে, সব শিশুর জন্যে। তাদের ভিতরটা স্নেহ মাখানো সন্ন্যাসিনী ; বাইরেটা 'উইথ আ ডোনেশন'।

সেজন্যেই অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল সেই জুবিলি ফাংশনে।

অনেকে বসেছিল। বাঙালি অবাঙালি অনেকগুলি দম্পতি। নানা বয়েসের শিশু এক এক দম্পতির সামনে।

হোমের ছেলেমেয়েরা ছোট্ট স্টেজে নাচগান করছিল। সবাই হাততালি দিচ্ছিল। আর নন্দিনী প্রত্যেকটি শিশুকে নিয়ে আদর করছিল। যেন সে নন্দিনীরই সন্তান, জড়িয়ে ধরছিল, চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল দুষ্টুমি করার ভঙ্গিতে, কারও মাথায় ঠোঁট। আর একবার

করে আণ্টি বুড়ির দিকে তাকাচ্ছিল, যদি ইশারায় একটু বলে দেয়।

আণ্টি বুড়িকে দেখল বেশ খুশি খুশি, বোধহয় অনেক ডোনেশন পেয়েছে বলেই। নন্দিনীও দিয়েছে। দান নয়, বোধহয় ঘুস ভেবেই। যদি জানতে পারে কে, কোনজন। যাকেই জড়িয়ে ধরে মনে মনে বলে, আমার, আমার।

একজনকে ছেড়ে আরেকজন।

আণ্টি বুড়ি শুধু হাসছে। যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে জানতে দেবে না।

ঠিক সেই সময়েই রাজাকে এসে জড়িয়ে ধরল নন্দিনী। সুধাকর আর অতসীর মাঝখানে বসেছিল রাজা।

নন্দিনী সেই একইভাবে তাকেও আদর করল। গালে চুমু দিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চুমুর জায়গাটা মুছে দিল রাজা। অতসী দেখে হাসল, সুধাকরও। শুধু নন্দিনীর বুকে একটা কাঁটার মতো বিঁধল।

কারণ তার এক মুহূর্ত আগে রাজাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে আণ্টি বুড়ির দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী, আর বুড়ি, কি হল তার কে জানে, ঘাড় কাত করে জানাল, হ্যাঁ। অর্থাৎ তোমারই।

যে হারিয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্যে, রেজিস্টারে যার কোনও নামধাম পরিচয় ছিল না, শুধু একটা বিশেষ তারিখে জমা হওয়া একটি তিন সপ্তাহের শিশু, একটা ওয়েট নার্স জোগাড় করো, একটা ওয়েট নার্স...নন্দিনীর তখন মনে হয়েছিল ওর মুঠোর মধ্যে সেই হারানো স্বর্গ ফিরে এসেছে। যাকে ও শুধু দূর থেকে ভালবাসা দিতে পারবে। নিতে পারবে না, পরিচয় জানাতে পারবে না, যাকে বুকের দুধটুকুও দিতে পারেনি।

এটাই বোধহয় ওর চরম শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু রাজা, এই বাচ্চা শিশুটার কি দোষ ছিল। নন্দিনী তাকে বুকের দুধটুকু দিতে পারেনি। অতসীও না। মার বুকের দুধ কি জিনিস তা ও চিনতেই পারল না।

অতসী একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, দুশো টাকা মাইনে, দুধ-মা, কত কষ্টে যে জোগাড় করেছিলাম। তিন সপ্তাহের বাচ্চা, কেমন মা বলুন তো, ফেলে দিয়ে যেতে পারল।

বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিল নন্দিনীর।

ও কত কি স্বপ্ন দেখেছিল। এই অতুল ঐশ্বর্য, অভাব কাকে বলে কখনও জানেনি, কারণ অভাবকে চিরকাল টাকার অঙ্কেই ভেবে এসেছে, হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছে একটা ছোট্ট ভুল একজন মানুষকে দীনদরিদ্র করে দিতে পারে।

মনে মনে বলে উঠেছে, রাজা, তোর দুটো মা, অথচ তারা পরস্পরের শত্রু।

একটা ভাল পোশাক পরানোর অধিকারও আমাকে দেবে না সে। একটা ভাল স্কুলে ভর্তি হতে দেবে না। তোকে এই সমাজে একটা অতি সাধারণ মানুষ হয়ে বড় হতে হবে। কে একজন সুধাকর, কে একজন অতসী—তোর বাবা মা। শুধু একটা ভুলের জন্যে, শুধু একটা ভয় থেকে।

মার্কেটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে অতসী আর রাজাকে দেখতে পেয়ে সারা মন রক্তিম পলাশ হয়ে গিয়েছিল, একটা আনন্দের ঝরনা।

বাড়ি ফিরে এল বিমর্ষ বিষণ্ণ।

একটু খুশির রেশ তারই মধ্যে। সাদামাটা একটা পোশাকের বিল মেটাতে দিয়েছে ওকে। দূর থেকে হলেও সেটা দেওয়া। ভালবাসা দেওয়া। তার বেশি যে আর উপায় নেই।

অতসীর কথাটা মনে পড়ল। একদিন বলেছিল, তুমি এসো না ভাই আমাদের বাড়ি।

কিছু এনো না। ও খুব রাগ করে।

ও মানে সুধাকর।

যাবার পথটুকুও বন্ধ হয়ে গেছে। সেজন্যেই হঠাৎ দেখতে পেয়ে এত আনন্দ হয়েছিল।

মুখ ফুটে বলে ফেলেছিল, একটা ভাল স্কুলে দিলে হত না?

অর্থাৎ আমি দেব, আমি। ওর জন্যে যা কিছু লাগে। ও তো আমারই ছেলে, আমি চাই সগর্বে মাথা তুলে এই সমাজে হেঁটে বেড়াক।

অথচ অতসী ওর কথাটা কানেই তুলল না। রোদ্দুরে ভ্যাপসা গরমে রাজার হাত ধরে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বাস রাস্তার দিকে চলে গিয়েছিল।

ভিড়ের বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে ছেলেটার কি কষ্টই না হবে। আহা বেচারি।

আর নন্দিনী ফিরে এসেছিল ঢাউস গাড়িটার মধ্যে, ঠাণ্ডা মেশিন চলতে শুরু করেছিল চ্যাটার্জিদা গাড়ি ছোটাতেই।

এমন কোমল ঠাণ্ডা, তবু সারা শরীর যেন জ্বলছিল।

ভুল, ও বারবার ভুল করে বসছে। হয়তো মারা গেছে, অথবা মারা যায়নি, এই বৃহৎ পৃথিবীর ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গেছে, সে কথাই তো ভাবত। তখন তবু এক ধরনের শান্তি ছিল। মনের মধ্যে তখন অনেক কাছে।

এখন আছে, কাছেই আছে, এই গাড়িতে গেলে কতক্ষণই বা, অথচ কত দূরে।

লুকিয়ে রুমালে চোখ মুছেছিল নন্দিনী। চ্যাটার্জিদা দেখতে পাবে।

আট

রাজা যাতে শুনতে না পায় নন্দিনী চাপা গলায় বলেছিল, আরেকটু ভাল কিনলে হত না?

অতসী চোখের ইশারায় বাধা দিয়েছে। আরেকটু ভাল কিনলেই তো দামটা আন্দাজ করে ফেলবে সুধাকর। তখন সমস্যা, কোথায় পেলে এত টাকা।

রাজার চোখের আড়ালে দোকানিকে টাকা দিয়েছে নন্দিনী, ইঙ্গিতে ক্যাশ মেমো দিতে বলে অতসীকে। রাজা লক্ষও করেনি, ও তখন নতুন জামাকাপড়ের আনন্দে মশগুল।

সন্ধেবেলায় সুধাকর ফিরে আসতে গল্প করে অতসী নিজেই বলেছে, আবার সেই পাগলিটার পাল্লায় পড়েছিলাম আজ। নিতান্তই কপট তাচ্ছিল্যের গলায় বললে।

ভয় রাজা না আগেই বলে দেয়।

—পাগলি? সে আবার কে? অবাক হয়ে সুধাকর জিগ্যেস করল।

নন্দিনী নামটা শুনেই সুধাকর সারা শরীরে কাঁটা ফুলিয়ে শজারু। ওই নাম ও যেন আজকাল সহ্য করতে পারে না।

কেন যে সহ্য করতে পারে না তাও বোঝে না ও। শুধু বড়লোক বলে? নাকি ভয় পায় একটার পর একটা উপহার দিয়ে রাজার ভালবাসা কেড়ে নেবে। কিন্তু তাও কি কেউ পারে। রাজা তো জানে সে আমাদেরই ছেলে। আমাদের ছেলেই তো। কিন্তু এই নিরর্থক ভয়ই বা কেন। তবে কি সুধাকরের মনের গভীরে কোথাও কোনও সন্দেহ রয়ে গেছে? অবিশ্বাস? এত ভালবাসা, এত আদরযত্ন, কিন্তু সত্যি সত্যি নিজের বলে ভাবতে পারেনি, এতদিন বাদেও!

নাকি এসবই ওর হীনমন্যতা। ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষ।

আসলে এখন তো রাজার ওপর ভীষণ মায়া, মানুষ একসঙ্গে থাকতে থাকতেই বোধহয় এরকম মায়া জন্মায়, মমতা হয়, তখন তাকে নিজের ছেলেই মনে হয়, বাঃ রে, নিজেরই তো। লুকিয়ে ব্লেড দিয়ে উড পেন্সিল কাটতে গিয়ে একদিন আঙুল কেটে ফেলেছিল, দরদর করে রক্ত পড়ছে, হাতটা পিছনে রেখে লুকোতে চাইছিল রাজা, দেখি, দেখি, রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও, অতসীও উতলা, ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে তখনই ছুটে গেছে পাড়ার ডাক্তারের কাছে, পুরনো ব্লেড, টেটভ্যাক নিতে হবে না তো ডাক্তারবাবু, রাজা, বাবা খুব লাগছে।

দূর কি যে ভাবছে ও, রাজা নাকি ওর নিজের ছেলে নয়।

না, এসব কিছুই ভাবে না ও। কি ভাবে ও জানে। ওই বড়লোকের বাড়ির মেয়েটা ওই নন্দিনী ভালবেসে রাজাকে যা যা দিতে আসে, নেব না নেব না বলে ও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, কারণ ওর নিজের মনের মধ্যে একটা চাপা অক্ষম স্বপ্ন আছে। এ-সবই, কিংবা এর চেয়েও বেশি কিছু, আরও দামি, আরও সুন্দর খেলনা, জামাকাপড়, পড়ার ঘর, দামি টেবিল ওরা রাজাকে দিতে চায়, পারে না বলেই এত রাগ। এত ক্ষোভ, এত তাচ্ছিল্য।

সুধাকরের মনের মধ্যে কি চলছে তা অতসী বুঝতে পারেনি।

ও তো তখন শুধুই অভিনয় করছে যাতে সুধাকর সন্দেহ না করে যে রাজার পোশাকের দামটা নন্দিনীই দিয়েছে। বাড়তি টাকাটা সেজন্যেই ওকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে।

কপট হাসি হেসে বলে উঠল, আবার কি বলছিল জানো, রাজার ইস্কুলের নাম শুনে বললে, একটা ভাল ইস্কুলে দিলে হত না।

একটু থেমে বললে, যেন ওর ছেলে, রাজার ভবিষ্যতের দায় দায়িত্ব যেন ওর।

সুধাকর একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে, কেন, এই স্কুলটাই বা খারাপ কিসের। যত সব বড়লোকি।

কথাটা অতসীর একটুও ভাল লাগল না। ওর নিজেরও তো স্বপ্ন ছিল, রাজাকে খুব ভাল স্কুলে দেবে, ভাল কলেজে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, বিলেতে কিংবা আমেরিকায় যাবে। মামাতো বোন মিলুর বর গিয়েছিল। পাড়ার একটা ছেলে এই সেদিন গেল।

অতসী তাই বলে উঠল, ওকথা বোলো না। নামী ভাল ইস্কুলের গুণই আলাদা।

সুধাকর হেসে ফেলল। —কত খরচ জানো? মাসে মাসে অতগুলো টাকা।

অতসী রেগে গেল। বললে, সে তোমার অক্ষমতা। তুমি পারবে না বলে কথাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। ভাল স্কুল মানে ভাল স্কুল।

সুধাকরের সমস্ত রাগ মুহূর্তে মাথা নত করল। নিজেকে ভীষণ অক্ষম আর অসহায় মনে হল। সত্যি কথাটা অতসী এভাবে ওর মুখের ওপর না বললেই যেন ভাল ছিল। বলেছে বলেই আরও অসহায় মনে হল নিজেকে। একটা রুগ্ণ দুর্বল পঙ্গু মানুষকে কেউ যেন বলছে, ছি ছি, নিজের পায়ে ভর দিয়ে তুমি দাঁড়াতে পার না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষোভের সঙ্গে সুধাকর বললে, তবে যাও, সেই নন্দিনীর কাছে যাও ; গিয়ে ভিক্ষে করো।

কথাটা জ্বালা ধরিয়ে দিল অতসীর মনে। ক্ষিপ্তভাবে বলে উঠল, শুধু অহঙ্কার আর অহঙ্কার। গরিবের অত অহঙ্কার মানায় না। ভিক্ষে নেব না, নেব না, রাজা যেন কিছুই নয়। আমাদের ছেলে নয় যেন।

এবার সত্যি সত্যি মাথা নুয়ে পড়ল সুধাকরের। চোখ ঠেলে জল।

বললে, আর শুনিয়ো না, শুনিয়ো না আমাকে।

এতকালের জমা হওয়া ক্ষোভ যেন আজ একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে অতসীর মুখ থেকে। —তুমি কি দিয়েছ রাজাকে, কি দিতে পেরেছ ?

রাগে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে অতসীর। চোখ ছাপিয়ে জল। —আমি কিচ্ছু জানি না ? কিচ্ছু বুঝি না ? তুমি নিজে দাওনি, দিতে পারনি, তবু নন্দিনীর দেওয়া নীল ব্রেজারটা পরতে দাওনি। সামান্য একটা ট্রাইসাইকেল দিয়ে গেল একদিন, তুমি সেটা লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

এতদিনের জমা হওয়া সমস্ত কথা যেন ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে একে একে। থামতে চাইছে না অতসী।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, একদিন কি সুন্দর একরাশ ছবির বই নিয়ে এল। তুমি ছিলে সেদিন, তুমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে, বললে, আসবেন না আপনি। কেন, কেন, আমি কি কিছুই বুঝি না মনে করো ?

অতসীর এই চেহারা কোনওদিন দেখেনি সুধাকর। এতকাল শুধু নিজেই রাগ দেখিয়ে এসেছে, বিরক্তি দেখিয়ে এসেছে, আর অতসী ওর প্রতিটি নির্দেশ মেনে আসার চেষ্টা করেছে। আজ অতসীর আরেকটা চেহারা দেখতে পাচ্ছে সুধাকর। এ চেহারা ও কোনওদিন দেখেনি, এই অতসীকে ও যেন চেনেই না।

ও যেন অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

'আমি কি কিছুই বুঝি না মনে কর ?'

অবাক চোখে তাকাল সুধাকর। একটা বিধ্বস্ত মানুষ, চোখে জল।

আর তীব্র ঘৃণার সঙ্গে অতসীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেই কথাটা যা কোনও দিন শুনতে হবে কল্পনাও করেনি ও।

অতসী বললে, আমি জানি, তুমি কোনও দিনই রাজাকে আমাদের ছেলে বলে ভাবতে পারনি, শুধু অভিনয় করে এসেছ, আমাকে স্তোক দেবার জন্যে।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, তুমি একটা অমানুষ। তুমি রাজার একটুও ভাল চাও না আমি জানি।

হতাশায় ভেঙে পড়ে সুধাকর শুধু বলতে পারল, আমি রাজার একটুও ভাল চাই না ?

ঠিক এই কথাটাই নন্দিনী একদিন বলেছিল অতসীকে। অনেক ক্ষোভ থেকে। সেদিনও নেব না নেব না করে কি একটা ফিরিয়ে দিতে চাইল অতসী, আর দুর্বোধ্য বিস্ময়ে নন্দিনী বলে উঠল, আপনারা কি ওর ভালও চান না দিদি !

নন্দিনী ভাল ভেবেই দিতে আসে, কেন যে এরা বোঝে না সেটাই ওর কাছে দুর্বোধ্য। দিতে পারলে একটু সুখ। ভালবাসা তো দিতে পারে না, বুকের মধ্যেই জমা হয়ে থাকে, তবু দু-একটা জিনিস দিতে পারলে তার মধ্যেই ভালবাসার রেশ মিশে থাকে, তৃপ্তি হয়। ও তো রাজার ভালই চায়, ভালর জন্যেই দেয়। কেন যে এরা বোঝে না।

ওর কথাটা হয়তো অতসীকে আঘাত করল। দুদিক থেকে দুটো চাপ সহ্য করতে পারছিল না বহুদিন থেকেই। এমনিতেই একটু নরম প্রকৃতির, প্রয়োজনেও রূঢ় হয়ে উঠতে পারে না, তাছাড়া নন্দিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে এমন একটা মমতা দেখতে পেত, ফিরিয়ে দিতে পারত না। অথচ নন্দিনী এসেছিল, কিছু একটা দিয়ে গেছে শুনলেই সুধাকরের মুখে বিরক্তি দেখা দিত। কেন আসতে দাও ? যেন একটা মানুষ অন্তরঙ্গ হতে চাইলে, তার ছেলেকে ভালবাসলে, ঢুকতে দেব না ব'লে তার মুখের ওপর কপাট বন্ধ করে দেওয়া যায়। অতসীর ছেলেকেই তো দিচ্ছে, অতসীরই ছেলে, তার মধ্যে একটু আনন্দও পায় ও। ছেলেকে অন্য কেউ ভালবাসলে যে কোনও মার কাছে সেটা তো গর্ব।

কিন্তু নন্দিনীর কথাটা ওকে ভীষণ আঘাত করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে অতসী বললে, আমার ছেলের কিসে ভাল কিসে মন্দ সেটা আমিই ভাল বুঝি।

রাগটা নন্দিনীর ওপর, নাকি সুধাকরের ওপর বুঝতেও পারল না।

মুখ শুকিয়ে গেল নন্দিনীর, ভয় পেয়ে গেল। যেটুকু পাচ্ছে, অন্তত চোখের দেখা, সেটুকুও না বন্ধ হয়ে যায়।

অতসীর কাঁধে হাত রেখে শান্ত করার চেষ্টা করল, আমি দিদি সে ভাবে বলিনি। আমি শুধু ওর ভাল চাই। একটু থেমে, ভালবাসতে চাই।

আবার থেমে দীনতার কণ্ঠে বললে, অনুনয়, সেটুকুও কেড়ে নেবেন না দিদি।

ওই কথাটা বোধহয় অতসীর মাথার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

ও কখনও সুধাকরের কোনও কথার প্রতিবাদ করেনি। বরং সমীহ করে এসেছে, চেষ্টা করেছে ওর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার। সুধাকর রাজি না হলে কোথায় পেত ও রাজাকে। অতসী কি আর বোঝে না, ও চেয়েছিল বলেই, ওকে সুখী করার জন্যেই সুধাকরের মনেও স্বপ্ন জেগেছিল। পেয়ে সুখী হয়েছিল।

অথচ নন্দিনীর কাছে শোনা সেই নির্মম কথাটাই কিনা শুনিয়ে দিল সুধাকরকে।

ক্ষোভ হয়তো জমা হয়েছিল আরও অনেক।

সেই প্রথম দিন যখন হঠাৎ এসে হাজির হল, একরাশ জিনিসপত্র, খেলনা, ইলেকট্রনিক পিয়ানো, পোশাক, সেদিন কেমন অন্তরঙ্গভাবে হেসে, আপনার জন্যেও আছে দিদি, একটা দামি শাড়ি দিয়েছিল।

সুধাকর ফিরে এসে সব শুনে এতই বিরক্ত হয়ে উঠল, রেগে গেল, যে শাড়িটা লুকিয়ে না ফেলে উপায় ছিল না, আর কোনও দিন বলতেও পারেনি। অথচ কতবার ইচ্ছে হয়েছে একবার পরতে, পরে কোনও বিয়ে বাড়িতে যেতে।

সেটা লুকোনোই আছে, আজ যেমন মার্কেট থেকে ফিরে এসে, নন্দিনী ক্যাশ মেমোর টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছিল বলে ওই বাড়তি টাকাটাই লুকিয়ে ফেলতে হল।

নন্দিনীর কি দোষ?

ও একটা বেশ দামি পোশাক করিয়ে দিতে চেয়েছিল, অতসী রাজি হল না বলে মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল, নিজের চোখেই দেখেছে।

বিষণ্ণ মুখ নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল নন্দিনী।

চোখের সামনেই বলতে গেলে বাবুন রয়েছে, উনু পড়ছে পাশের ঘরে, ইচ্ছে করলেই কাছে গিয়ে আদর করা যায়। অথচ একটুও ইচ্ছে করছে না, মন ছুটে যেতে চাইছে রাজার কাছে। এ এক রহস্য, এর তল খুঁজে পাচ্ছে না ও।

চ্যাটার্জিদার কাছে হঠাৎ ওভাবে কথাটা না বললেই পারত। ওর তো মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল, সেই তিন সপ্তাহের শিশু, বুকের দুধ না পেলে বাঁচে না, তাকে কি আর বাঁচানো যায় নাকি। ধরে নিয়েছিল খিদেয় কেঁদে কেঁদে শেষ অবধি মারাই গেছে। কিংবা বাবাই হয়তো বলেছিল, যাও চ্যাটার্জি, কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।

বড়বাবুর কথা অমান্য করবে চ্যাটার্জিদা, ভাবাই যায় না।

ও নিজেও তো কোনও দিন খোঁজ নেয়নি। তখন এমন প্রচণ্ড রাগ, মনের মধ্যে প্রতিহিংসার জ্বালা, যেন ছেলেটার ওপর দিয়েই সব নৃশংসতার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।

অথচ হঠাৎ একদিন টের পেল, ভেতরে একটা চাপা কান্না গুমরে উঠছে। যখন সব

ভুলে যাবার কথা, যখন নন্দিনীর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই, তখনই একদিন পুঞ্জীভূত বেদনা যেন উথলে উঠল।

—চ্যাটার্জিদা, ওকে কি তোমরা মেরে ফেলেছিল।

দাদা সে-ঘরেই আসেনি। দূরে দূরে থাকছিল।

বউদির তখনও ছেলেটার ওপর মায়া, চুপি চুপি এসে বলছে, ও যে মরে যাবে, ওকে একটু বুকের দুধ দাও।

তবু নন্দিনীর মন এতটুকু নরম হয়নি, তাকিয়ে দেখেনি পাছে মায়া পড়ে যায়।

বাবা, সেই প্রচণ্ড রাগী মানুষটা বলেছে, দেখিস না, দেখলেই মায়া হবে। ও তোর শত্রু, তোর বন্ধন। সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দেবে।

নন্দিনী নিজেও তাই ভেবেছিল। সঙ্গে সঙ্গে—আমার জীবন তো চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়েই গেছে।

বউদি যখনই লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে আসত, অনুনয় বিনয় করত, চোখ বন্ধ করে দিত নন্দিনী, দেখবে না, দেখবে না। কিন্তু শরীরের শিরায় শিরায় কি এক বিচিত্র অনুভূতি, ভয় পেয়ে যেত হঠাৎ, ঠেলে দূরে সরিয়ে দিত ও, নিয়ে যাও ওকে, নিয়ে যাও।

আজ তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে রাজা।

প্রতিশোধ শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই যেদিন জেনেছে, আছে, বেঁচে আছে।

কি বলছ দিদিমণি, তাও কি পারেন বড়বাবু!

নন্দিনী তাকিয়ে দেখেওনি, শুধু অনুভব করেছে, কানে গেছে দু-একটা কথা, বুঝতে পেরেছে দূরের বেবি-কট থেকে চ্যাটার্জিদা তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায়, কেন, কিছুই বোঝেনি। বুঝতে চায়ওনি ।

মনের মধ্যে তখন শুধুই প্রতিশোধের আগুন।

আঙুলে গুনে গুনে হিসেব করে তারিখটা মনে পড়ল, চ্যাটার্জিদা শেষ অবধি গোপন রাখতে পারল না। মনে মনে হয়তো বলেছে, ক্ষমা করো বড়বাবু! পারলাম না।

নন্দিনীকে অস্ফুটে বলেছে, মাদার্স হোম।

বড় গাড়িটায় চ্যাটার্জিদাকে নিয়ে ওখানে যেতে পারেনি। এখন কি ভাববে ও, ওর কাছেই তো লজ্জায় পড়ে যাবে।

যার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করেনি, বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে ভয় পেয়ে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, আজ তার কথাই কি না জানতে চাইছে ও, বেঁচে আছে না মারা গেছে, যদি বেঁচে থাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়।

চ্যাটার্জিদা জেনে এসেছে নন্দিনী একটা ডাইনি, একটা উইচ। আজ হঠাৎ তাকে মানুষ হয়ে উঠতে দেখলে, মা হয়ে উঠতে দেখলে অবাক হয়ে যাবে। হয়তো গিয়ে ও বাড়িতে দাদাকে বৌদিকে জানিয়ে আসবে। বউদি বলবে, আমি তখনই বলেছিলাম, প্রতিবাদ করো, তোমার দাদাও সাহস পেল না, তুমি চুপ করে রইলে যেন ও ছেলের মরাই ভাল। এখন বোঝো।

চোখে জল এসে যাচ্ছিল নন্দিনীর। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। চ্যাটার্জিদাকে না জানিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে একাই চলে গিয়েছিল। মাদার্স হোম। বুড়ি আণ্টি। সিস্টার ভিষা।

এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই যেন ভাল ছিল।

বাবা বলেছিল, দেখিস না, তাকিয়ে দেখিস না, মায়া পড়ে যাবে, ও তোর শত্রু, জীবনটা নষ্ট করে দেবে।

বাবা বোঝেনি, তখন নন্দিনী ধরেই নিয়েছে ওর জীবন শেষ হয়ে গেছে। এর পর আর নতুন জীবন হয় নাকি।

এখন নন্দিনী দোটানার মধ্যে। সুপ্রতিমকে বলতেও পারে না, বলা যায়ও না। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে। সুপ্রতিমকে ও যে হারাতে পারবে না। যাকে নিজেই ভালবেসে ফেলেছে তাকে হারাবে কি করে। বাবুন, উনু—ওদের হয়তো দূরে সরিয়ে নেবে। সে আরও কষ্টের। সে আরও দুঃখ। না, না, তা হয় না।

অতসীকেও বলা যাবে না। সুধাকরকেও। শুধু গোপন রেখে যেতে হবে। এমন একটা নৃশংস মার ছেলে জানলে, ওরা হয়তো রাজাকেই ঘৃণা করতে শুরু করবে। আমার রাজাকে।

এখন আর সেই মানুষটার ওপর রাগও নেই, অভিমানও নেই, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটাও চলে গেছে। সব ঝাপসা হয়ে গেছে দূরত্বে আর চোখের জলে। কার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কার ওপর নিয়ে বসেছে। রাজার ওপর। নাকি নিজের ওপর।

নন্দিনী কিছুই ভাবতে পারে না।

শুধু দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। যেন আয়নায় নিজের চেহারা নিজেই দেখতে পাচ্ছে। কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়েই নিজেকে যেন দেখতে পেয়েছিল নন্দিনী। বাবার ভীত, বিস্মিত, বিভ্রান্ত চোখ। একটা অবোধ্য কান্না চাপা আছে সে চোখের আড়ালে।

অথচ কত স্বপ্ন ছিল। কত আশা। সুখ আর আনন্দ দেখেছিল।

বাবা বলেছিল, খুব ভাল ছেলে, বিনয়ী, বেশ বনেদি ঘর।

দেখেও খুব ভাল মনে হয়েছিল নন্দিনীর।

দুটো মাসও পার হয়নি, একটা অন্য মানুষ বেরিয়ে এল সেই অমায়িক স্মিতহাস মানুষটার মধ্যে থেকে। একটা নৃশংস ক্লেদাক্ত জীব।

অথচ রাজা তখন এসে গেছে, ভিতর থেকে জানান দিচ্ছে।

বাবা যে অনেক আশা করেছিল, অনেক স্বপ্ন দেখেছিল, কি করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। বাবা, তুমি আমার সর্বনাশ করে দিলে!

বলা যায় না। ওই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ মানুষটা একটা মিথ্যে সুখ নিয়ে বেঁচে আছে, তার সেই সুখটা কেড়ে নিয়ে তাকে চিরদুঃখী বানানো যায় না।

আরও ছ'ছটা মাস কিভাবে যে কাটিয়েছে নন্দিনী, ওই মানুষটার সঙ্গে, ও ভাবতেও পারে না। সব সময় মনে হয়েছে যেন কৃমিকীটে পরিপূর্ণ একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে ও। ঘৃণাকে সঙ্গে নিয়ে। আর রাজাকে।

তারপর একদিন সেই শীর্ণ বিষণ্ণ বিভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

—বাবা! বলেই ডুকরে কেঁদে উঠেছে নন্দিনী।

ভীত বিভ্রান্ত চোখে বাবা তাকিয়ে থেকেছে।

—কি হয়েছে বল্, বল্ কি হয়েছে নন্দি।

বলতে পারেনি, সব কথা স্পষ্ট করে বাবাকে বলতে পারেনি।

শুধু বলেছে, ওখানে আমি থাকতে পারব না, ওখানে থাকতে আমার ঘৃণা হয়।

তারপরই উন্মত্তের মতো গায়ের কাপড় সরিয়ে বলেছে, আমি বাধা দিয়েছি বলে, ওর কাছে যেতেও আমার ঘেন্না হয়, বলেছি বলে, এই দ্যাখো।

কাপড় সরিয়ে সরিয়ে দেখিয়েছে।—সারা শরীরে আমার সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, দিনের পর দিন, এই দ্যাখো।

বলেই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে ও।—যাব না, যাব না আমি।

যেন বাবার কাছে অনুনয় করছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী দেখেছে যাকে স্নেহময় বাবা বলে চিনে এসেছে, সেই মানুষটা নিমেষের মধ্যে চ্যাটার্জিদার রাশভারী বড়বাবু হয়ে উঠেছে।

বলেছে, ডিভোর্স। আমি তোর আবার বিয়ে দেব।

কিন্তু নন্দিনীর শরীরে তখন একটা নতুন মানুষ এসেছে, জানান দিচ্ছে।

—বাট ইটস্ ট্যু লেট। দেরি হয়ে গেছে। ডাক্তারের কথাটা যেন শুনতে পাচ্ছে নন্দিনী।

নন্দিনী বললে, আমি চাই না, চাই না ওই ঘৃণ্য বাপের ছেলে। ইনসেসচুয়াস ব্রুট! কেঁদে উঠল। দিনের পর দিন আমার চোখের সামনে উঠে গিয়ে...ভাবতেও ঘেন্না।

বাবার গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পাচ্ছে, চ্যাটার্জি! তোমাকেই করতে হবে। নিয়ে যাও।

অনুভবে বুঝতে পারছে, চ্যাটার্জিদা দূরের বেবি-কট থেকে ওকে তুলে নিল। বেরিয়ে গেল। চিরকালের জন্যে, জীবন থেকে।

দাদা বলেছিল, তোকে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে, ও থাকলে চিরকাল একটা প্রবলেম হয়ে থাকবে। তুই ভালবেসে ফেলবি, আর ও কেড়ে নিয়ে যাবে।

বাবা বলছে, ও আমাদের কেউ নয়, কেউ নয়।

একদিন সত্যি তাই মনে হয়েছিল নন্দিনীর। ও আমার কেউ নয়।

তখন চোখের সামনে শুধুই ওই পাপের ঘর, ঘৃণা, সারা শরীরে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা। সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে দিতে হাসছে লোকটা, আনন্দ পাচ্ছে।

আর নন্দিনীর মনের মধ্যে শুধু প্রতিহিংসা, রাগ, নৃশংসতা। আমি প্রতিশোধ নেব।

প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু কার ওপর? মনে হচ্ছে নিজেরই ওপর।

রাজা, তুই আমাকে একটুখানি ভালবাসা দে, আমি আবার বেঁচে উঠব। আমি তোর ওপরই প্রতিশোধ নিয়ে বসেছি, সে-কথাটা ভুলে যা, লক্ষ্মী ছেলে!

বাবা বলেছিল, সব মুছে দিয়ে তুই আবার নতুন জীবন শুরু করবি।

নতুন জীবন!

ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার ছমাসের মধ্যে এই সুপ্রতিম। চেনাজানা অ্যাডভোকেটের বাড়িতেই। রীতিমত সঙ্কোচ হচ্ছিল। এত নামীদামি অ্যাডভোকেট, কিন্তু বানানো আইনের কচকচিতে সারা জীবন কাটিয়ে এসেছেন বলেই হয়তো মানুষের মনের ভিতরের খবর রাখার সময় পাননি। আরও দু'জন মক্কেল বসে আছে। একজন এই সুপ্রতিম। ওদের সামনেই বাবার সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেওয়ায় নন্দিনী মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।

সুপ্রতিম এসেছিল ওদের কোম্পানির কোনও একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

চুপচাপ বসে ছিল, যেন শুনছেই না। এদের কথা শেষ হলেই নিজের কথা শুরু করবে।

অ্যাডভোকেট বলছিলেন, তার চরিত্র যে খারাপ তা প্রমাণ করতে পারবে না। পারবে কি?

বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে তাকাল নন্দিনী। যা সত্যি, দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখেছে, ওকে মানসিক কষ্ট দেবার জন্যে লুকোতেও চায়নি, তা আবার প্রমাণ করতে হয় নাকি।

—হ্যাঁ, সিগারেটের ছ্যাঁকা, বলছেন ডাক্তারের রিপোর্ট আছে, থানায় ডাইরিও...

নন্দিনীর বাবা বললেন, দাগও সব মিলিয়ে যায়নি এখনও।

—দ্যাখা না। বলে নিজেই নন্দিনীর বাহুমূল থেকে আঁচল সরিয়ে দেখালেন।

কি লজ্জা, কি লজ্জা। দু'-দুটো বাইরের লোকের সামনে। একটাই বাঁচোয়া, নন্দিনী নতমুখ আড়চোখে দেখল, সুপ্রতিম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে না। যেন কানে শুনছে না, চোখে দেখছে না।

—ছেলেমেয়ে ! অ্যাডভোকেটের প্রশ্ন। বাবা বলে দিল, নেই।

নন্দিনীকেও সে-কথাই শেখানো ছিল, কিন্তু বলতে হল না। যদিও ওই মিথ্যে কথা কি করে ওর মুখ দিয়ে বের হবে সে-বিষয়ে ওর নিজেরই দুশ্চিন্তা ছিল।

সত্যিই তো নেই তখন। উপায় ছিল না, দেরি হয়ে গেছে বলে যাকে জন্ম দিতে হয়েছে, যার ওপর কোনও মায়ামমতাই জন্মায়নি ওর, তিন সপ্তাহের বাচ্চাকে যখন চ্যাটার্জিদা নিয়ে যাচ্ছে, একবারও ফিরে তাকায়নি। 'তাকাস না, তাকিয়ে দেখিস না, দেখলেই মায়া হয়ে যায়।' 'একটা ক্রিমিনালের ছেলেকে নিজের ছেলে ভাবা যায় না।' নন্দিনীর নিজের কি মনে হয়েছিল তাও জানে না, কিংবা মনে নেই। ওর মাথার মধ্যে সে-সময় সবই জট পাকানো, মস্তিষ্ক কাজ করছে না, বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত, কি ভেবেছিলাম কি হয়ে গেল। নিজে একেবারে জড়পদার্থ হয়ে গেছে। চোখ ঘোলাটে, যে যা বলছে শুনে যাচ্ছে, বিশেষ করে বাবার কথা। বাবার হাতে একটা কাঠের পুতুল। মনের মধ্যে একদিকে চরম হতাশা, অন্যদিকে শুধুই খ্যাপা কুকুরের মতো রাগ, লোকটার ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। স্বামী নয়, সে তখন লোকটা। অথচ প্রতিশোধ কিভাবে নেবে তাও জানে না।

তিন সপ্তাহের বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে দেওয়াই মনে হয়েছিল প্রতিশোধ।

—যাক, তা হলে বেঁচে গেছে। অ্যাডভোকেট হাসলেন। বললেন, বাচ্চা থাকলেই পরে নানারকম জটিলতা হয়।

তারপর বললেন, ফিজিক্যাল টর্চারই সাফিসিয়েন্ট। মেন্টাল টর্চার তো আছেই।

পরমুহূর্তে অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক দু'জন ক্লায়েন্টকে শুনিয়েই যেন বললেন, সংসারে কত রকম যে মানুষ আছে, আমারও মেয়ে বড় হচ্ছে, বড় ভয় হয় বুঝলেন।

এতক্ষণে সুপ্রতিম একটা কথা বলল, অবাক হওয়া কথা : এ রকম হয় !

একটু থেমে আবার, বিলিভ মি, লোকটাকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অ্যাডভোকেট হেসে উঠেছিলেন, তা হলে তো ভালই, আরেকটা কেস পাওয়া যাবে। অবশ্য ক্রিমিন্যাল তো করি না, অন্য কাউকে দিয়ে দেব।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন, দেশটা কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি।

আবার হাসতে হাসতে, লোকে ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার বলবে বলে ক্রিমিন্যাল সাইডে গেলামই না।

নন্দিনীর তখন ওইসব রসিকতা, দেশ নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি একটুও ভাল লাগছে না। ডিভোর্স পাব কিনা। অন্য কোনও প্রতিশোধ নেওয়া যায় কিনা, আইনে কোথাও কোনও অসুবিধা ঘটবে কিনা। শুধু ওর মামলা নিয়েই আলোচনা হোক। কেন যে বোঝে না, নন্দিনীর মতো অবস্থার একটা মেয়ের কাছে পৃথিবীতে আর কোথাও কিচ্ছু নেই। শুধু ডিভোর্স। মুক্ত হওয়া। কেবলই ভয়, বাবা যতই সান্ত্বনা দিয়ে থাক, সেই স্কাউনড্রেলটা না এসে দাবি করে বসে ওকে, বাবা না হঠাৎ মত বদলে ওকে তার কাছেই ফিরে যেতে বলে।

সুপ্রতিমের সঙ্গে ওখানেই ওর আরও দুদিন কথা হয়েছিল। দু চারটে কথা, একটু সমবেদনা। ওকে দেখে, ওর রূপ, কিংবা অন্যকিছু দেখে, সুপ্রতিম মুগ্ধ হয়েছিল কিনা তা লক্ষ করার মতো মনের অবস্থাই ছিল না নন্দিনীর।

ডিভোর্স পেয়ে যাওয়ার পর বইয়ে পড়া 'মুক্ত বিহঙ্গ' শব্দ দুটোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে

পেরেছিল। পৃথিবীতে কোথাও কিছু ছিল না, শুধু নিজের কষ্ট আর যন্ত্রণা ছাড়া, হঠাৎ মনে হল কোনও কষ্ট নেই, কোনও যন্ত্রণা, শুধু বাঁচার জন্যে একটা বিশাল পৃথিবী রয়েছে, আকাশ, সূর্যোদয়, সবুজ মাঠ, সমুদ্র, পাহাড়, উড়ন্ত শঙ্খচিল, বাড়ির গ্যেটে রাখা ফুলের টবে একটা ঘাসফুল।

বাবা চ্যাটার্জিদাকে দিয়ে বিশাল বড় বড় দুটো সন্দেশের প্যাকেট, দু হাঁড়ি রসগোল্লা আনাল, নিজে পছন্দ করে এনেছিল একটা দারুণ সুন্দর কাশ্মীরি শাল।

বললে, চল, উকিলবাবুকে দিয়ে আসবি।

সেদিনও দেখা হল সুপ্রতিমের সঙ্গে। প্রাণ খুলে হাসল সব শুনে। তারপর নন্দিনীকে বললে, ফরগেট ইট। যতটুকু ফেলে এসেছেন, যেটা বাকি আছে জীবনের, তার কাছে এটা তুচ্ছ।

তারপর চলে এসেছিল, সুপ্রতিম ওর মনে কোনও দাগই কাটেনি। নিমেষের জন্যে বোধহয়, মনে হয়েছিল, এ তো সেই জানোয়ারটার মতো নয়। অন্য রকমও আছে!

পুরুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, আতঙ্ক, সুপ্রতিম তার মধ্যে এক চিলতে বিশ্বাস এনে দিয়েছিল, অন্য রকমও আছে।

বাবা একদিন এসে বললে, সুপ্রতিম ছেলেটা মন্দ নয়, আমার ভালই লেগেছিল, কি বলিস?

গুরুত্ব না দিয়ে নন্দিনী বলল, সবাই কি আর খারাপ হয়!

—না না, তা নয়, তোর বিয়ের ব্যাপারে...

—বিয়ে?

যেন চোখের সামনে একটা ফণা তোলা সাপ দেখল নন্দিনী। ও মুক্তি চেয়েছিল, মুক্তি পেয়েছে। এখন শান্তি, স্বস্তি। আর নয়।

বাবা হাসতে হাসতে বললে, উকিলবাবু ফোন করেছিলেন। সুপ্রতিম নাকি ওঁকে বলেছে, বিয়ে করতে চায়।

একটু থেমে বললেন, সব জেনেশুনেই চাইছে। ভাল চাকরি করে। নির্ঝঞ্ঝাট। 'তুই কি বলিস?' আবার থেমে, 'তুই যা বলবি' আমি কিছু চাপাচ্ছি না। আমার নিজের ওপরই বিশ্বাস চলে গেছে।

নিজের মনকে ঠিক করার জন্যে দুটো মাস সময় নিয়েছিল।

বউদি দিনের পর দিন বলেছে, জীবনটা এভাবে নষ্ট করা চলে না।

হঠাৎ একদিন, বাবা বসে দলিলপত্র ওলটাচ্ছে, কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাবা চোখ তুলতেই বললে, করব। অর্থাৎ সেই লোকটা দেখুক।

এই পাড়াতে আলাদা একটা বাড়ি সেজন্যেই। বাবা বললে, আর দূরে নয় চোখের সামনে থাকবি। আমার নিজের ওপরই বিশ্বাস চলে গেছে, বুদ্ধি কাজ করে না।

সব জেনে, নিজের চোখে দেখে সুপ্রতিম বিয়ের পর বলেছিল, গুড হেভেনস্, এত বড়লোক জানলে বিয়ে করতাম না

নন্দিনী জবাব দিল, বড়লোকরা মানুষ নয়?

সুপ্রতিম হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, বড়লোকরা বড়মানুষ। আমি গরিবই থাকতে চাই। আমার ওই ফিয়েটই ভাল।

তারপর সুখ, সুখ, সুখ। বাবুন আর উনু।

অথচ সেই স্কাউনড্রেলটা হেরে গিয়েও প্রতিশোধ নিচ্ছে। রাজাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অ্যাডভোকেটের সামনে বাবা বলেছিল, নেই।

সেই মিথ্যেটাই ওকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

লোকটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে এই ভয়ে, পরে প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে এই ভয়ে, বাবা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এখন আর বলার উপায় নেই যে রাজা আমার।

একটা ভাল জামাও তাকে কিনে দেবার অধিকার নেই, নিয়ে গেলে সুধাকর হয়তো ওর চোখের সামনেই সেটা রাস্তায় ছুঁড়ে দেবে। বলবে, কেন এসেছেন, বেরিয়ে যান।

অথচ রাজাও তো আমারই ছেলে, সেদিন কেন যে মনে হয়নি। রাগ, শুধুই রাগ নন্দিনীকে অন্ধ করে দিয়েছিল ? ছিনিয়ে নিতে চাইবে অথবা পরে প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে এ-সব কথা তখন নন্দিনীর চিন্তায় বিন্দুমাত্র ছিল না। শুধু ঘৃণা ছিল লোকটার ওপর। ঘৃণা এবং ঘৃণা থেকে রাগ। সেই ঘৃণা থেকেই ভাবতে ইচ্ছে হয়েছে ছেলেটা আমার নয়। ও একটা জঞ্জাল, জঞ্জালেই চলে যাক। বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেও ইচ্ছে করেনি।

কিন্তু এখন অনুশোচনা। বুকের গভীরে একটা চাপা কান্না থমকে আছে। বাবুন আর উনু চোখের সামনে রয়েছে, অথচ মন ছুটে যেতে চাইছে রাজার কাছে। আমার রাজা।

এই এত টাকাকড়ি, অর্থ ঐশ্বর্য, সব যেন মূল্যহীন। অর্থহীন। টাকার এত ক্ষমতা, সকলেই বলে, অথচ সেই টাকা কত অসহায়। নিজের ছেলেকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে পারে না।

অথচ নন্দিনী স্বপ্ন দেখে। রাজা বাবুনের মতোই নীল ব্লেজার পরে রোয়িং ক্লাবে যাচ্ছে, চ্যাটার্জিদার মতোই কেউ ওকে স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছে, সবচেয়ে ভাল স্কুল, সেরা স্কুল, কলেজেও, সবাই বলছে ব্রিলিয়াণ্ট, আমেরিকায় যাচ্ছে পড়তে, আজকের ফ্লাইটে, নন্দিনী হাত নাড়ছে...

কত স্বপ্ন, কত ইচ্ছে।

মাথার ভেতরটা কেমন করছে, শরীরে উত্তাপ। অস্থির হয়ে উঠল নন্দিনী।

একটা সত্যকে বলে ফেলতে চায় নন্দিনী। যা হয় হবে। সুপ্রতিম তো ভীষণ ভাল। সব জেনেশুনেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। সব জানায়নি, সে তো সুপ্রতিমের দোষ নয়। হ্যাঁ, একদিন সুপ্রতিমকে বলবে। ও নিশ্চয় ক্ষমা করবে। আর যদি না করে, তাতেই বা কি এসে যায়। রাজা তো বাঁচবে।

সেই বুড়ো লোকটা, কলপ পুরনো হয়ে গিয়ে লাল চুল, চুনোট ধুতি ময়লা হয়ে গেছে, হাতে গিলে মিলিয়ে গেছে, 'কে হয় আপনার ?' নন্দিনী গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, দিদি। সে জানবে, হয়তো অতসীই বলবে, দিদি না, দিদি না, ও-ই রাজার আসল মা, কিংবা তাও বলতে চাইবে না, গোপনই রাখবে, পাছে কেড়ে নিতে চায় সেই ভয়ে।

নন্দিনী অস্থির ভাবে পায়চারি করছিল, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল, চ্যাটার্জিদা, একবার বেরোব।

ব্যস। এখন ও শান্ত, স্থির।

অতসীর কাছে, সুধাকরের কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইবে। ভিক্ষে। যত নীচে নামতে হয়, দীনদরিদ্রের মতো, ও তো এখন ভিখিরিই হয়ে গেছে।

'কেন আসি জানেন, কেন দিতে চাই ?' দিদি, ও তোমারই থাক, ও তোমারই। আমি কোনও দিন কেড়ে নিতে আসব না। শুধু চোখের দেখা, একটু ভালবাসতে চাই। আর, আর ওকে সত্যি সত্যি সকলের মধ্যে রাজা করে তুলতে চাই। এখন শুধু একটা ভাল স্কুল, পরে একটা ভাল কলেজ, দিদি, তোমার অহঙ্কারের জন্যে ওকে মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে দিয়ো না।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল নন্দিনী।

নয়

অতসী ভাবতেও পারেনি ওদের দুজনের মধ্যে কোনও দিন এমন তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। ওর আর সুধাকরের মধ্যে। কি করে যে এমন হয়ে গেল বুঝতেই পারে না ও। হলই যদি তো সেই রাজাকে কেন্দ্র করে।

আশ্চর্য মানুষের মন, কখন যে কি হয়ে যায়। অথচ সুধাকর আর ওর মাঝখানে যে এরকম দেয়াল উঠে যাবে কল্পনাও করেনি কোনও দিন। দেয়াল নয়, একটা কপাট। সে কপাটের কোনও দিকেই খিল আঁটা নেই, আগল দেওয়া নেই। না, শিকল তোলা নেই কোনও দিকেই। একটুখানি ঠেলে দিলেই খুলে যাবে, সব সহজ হয়ে যাবে আবার। কিন্তু কেউই কপাটে ঠেলা দিয়ে সেটা খুলে ফেলা তো দূরের কথা, একটুখানি ফাঁক করতেও রাজি নয়। সব সহজ হয়ে যাবে? বোধহয় না, আর কোনও দিনই তা হবার নয়।

এ কদিন বারে বারে সেদিনের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। অথচ তার জন্য অতসীর মনে কোনও অনুশোচনা নেই। বরং অক্ষম ক্রোধ, অভিমানও তাকে বলা যায় না, কেমন একটা বিদ্বেষ।

অনেক কাল আগে বিয়ের পর পরই কি নিয়ে যেন একবার রাগারাগি হয়েছিল, মান-অভিমান। একটা দিন কথা বন্ধ, বাবা-মা প্রভাকর কিছু টের পাবে তাই অন্য ঘরে শোয়ার উপায় ছিল না, একই ঘরে রাত কাটাতে হয়েছে। রাতকাটানোই সার। ডবল বেড খাটে সুধাকর ইচ্ছে করে এমন হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছে যে অতসী এক পাশে একটু গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়বে তারও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে মেঝেতে শুতে হয়েছে। একটা মাদুরও পেতে নেয়নি, অভিমানে একটা বালিশও নয়। আশা ছিল, একটু রাত হলে সুধাকরই এসে ওকে ডেকে তুলবে, খাটে শুতে বলবে। হয়তো একটু আদরও।

অর্ধেক রাত জেগে জেগেই কেটে গিয়েছিল অতসীর, এই বুঝি আসবে, এই বুঝি আসবে, ডেকে তুলবে। ও ঘুমের ভান করবে তখন।

কোথায় কি, অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টেরও পায়নি। অভিমানে সেদিন বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। নিজেকে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ মনে হয়েছিল, সুধাকরের কাছে যার কোনও দামই নেই।

ভয় হয়েছিল সেদিন, সুধাকরকে হারাবার ভয়।

শেষে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিল সুধাকরের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে অতসীকে জাপটে ধরেছিল সে, কাছে টেনেছিল।

আর নিমেষের মধ্যে নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছিল অতসী।

সে ছিল অভিমান, আর আজ শুধু রাগ।

একটা ঘরে অতসী, আরেক ঘরে সুধাকর। সুধাকর ও ঘরে রাজার সঙ্গে কথা বলছে, হাসছেও হয়তো, কিন্তু অতসী তা শুনে একটাও কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে না। অতসী এ ঘরে রাজাকে ডেকে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে, কিন্তু সুধাকর তা শুনতে পেয়েও একটা কথাও বলছে না। অথচ ওই রাজাকে কেন্দ্র করেই যা-কিছু ঘটে গেছে।

রাজাই যেন ওদের দুজনকে আলাদা করে দিয়েছে।

আশ্চর্য! এই রাজাই একদিন এই শূন্যতার ঘরে এসে ওদের দুজনকে কত অন্তরঙ্গ করে দিয়েছিল।

প্রভাকর চলে যাবার পর এই বাড়িটা মনে হয়েছিল একটা বিশাল রাজপ্রাসাদ, বিশাল কিন্তু নির্জন। মুন্নি আর মন্টু এই বাড়িটাকেই নির্জনতা থেকে জনারণ্য করে তুলেছিল। ওরা চলে যেতেই শুধু শূন্যতা আর শূন্যতা। আর সেই শূন্যতার মধ্যে কিভাবে যেন ওরা

দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। একই খাটের দু'পাশে দু'জন, তবু মাঝখানে যেন একটা বিশাল রুক্ষ মাঠ, তৃণহীন। সারা বাড়ি জুড়ে শুধু নিঃশব্দতা। কথা বলছে, কথা শুনছে, কিন্তু সব কথা যেন অর্থহীন, প্রাণহীন।

শেষে একদিন এই রাজা এল। তিন সপ্তাহের একটি বাচ্চা। মাদার্স হোমের আন্টি বুড়ি ওদের হাতে তুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িটা হয়ে উঠল একটা রঙিন আলো-ফেলা ঝরনা, জলপ্রপাত, সবুজে ভরা মাঠ, অঝোর বর্ষা, নিঃসীম পুষ্পকানন, সমুদ্রের ঢেউ। আনন্দ আর আনন্দ।

—দ্যাখো, দ্যাখো কেমন হাসছে। তাকিয়ে দেখছে আমাকে।

একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল সুধাকর। অতসী নিজেও।

রাজা শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে। ঘুমোতে ঘুমোতে হাসছে। আর তা দেখার জন্যে ওরা দুজনে দুপাশ থেকে এগিয়ে যেতেই মাথা ঠোকাঠুকি। দুজনই হেসে উঠেছে।

আঙুলটা সুধাকর ওর মুঠোর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে, আর রাজা সেটা শক্ত করে ধরেছে। সুধাকর বলছে, নাঃ, আজ আর যেতে দেবে না বলছে।

সেদিন আর অফিসই যায়নি সুধাকর।

ওদের দু'জনকে কত কাছে এনে দিয়েছিল রাজা।

আজ সেই রাজাই দুজনকে পরস্পর থেকে কত দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কপাট তুলে দিয়েছে মাঝখানে।

কারণ একজন রাজাকে ভালবাসতে চায় নিজের মতো করে। আরেকজন চায় রাজা রাজার মতো হবে। ভাল পোশাক, ভাল খেলনা, ভাল স্কুল, ভাল কলেজ, আরও অনেক কিছু। যা ওকে সকলের মধ্যে আলাদা করে দেবে। সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে।

অতসী জানে ওদের সে সামর্থ্য নেই। সুধাকর পারবে না, পারবে না। তবু সে অহঙ্কার নিয়ে বাঁচতে চায়। 'কেন দেবে সে এত সব, আমরা কি ভিখিরি নাকি ?'

'আমরা আমাদের মতো করে ওকে মানুষ করব।'

কথাগুলো মনে পড়লেই যেন বুকের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নন্দিনীর বিষণ্ণ করুণ মুখখানা মনে পড়ে যায়। নন্দিনীর এই ভালবাসাকে সুধাকরের এত ভয় কেন ? রাজার কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে ? অতসীর কাছেও !

ও তো ছোটই। কি পারবে ও রাজাকে দিতে ! কেমন মানুষ করে তুলবে ? বছর বছর ফেল করা একটা ছেলে, যাকে একদিন ঘৃণা করতে ইচ্ছে করবে ! একটা ছেলে যে সকলের সামনে মাথা নিচু করে চলবে ? সুধাকর কি করে তুলতে পারবে ওকে, একটা বড় আপিসের ছোট কেরানি ? তার চেয়ে আর কি বেশি পারবে ও।

—একটা ভাল স্কুলে দিলে হত না। নন্দিনী কি বিষণ্ণ গলায় কথাটা বলেছিল।

আর সেই কণ্ঠস্বর অতসীকে যেন বলেছিল, আমি তো আছি, কেন ও ভাল স্কুলে পড়বে না।

সেই প্রথম দিন থেকে নন্দিনীর চোখে একটা কথাই ও পড়ে এসেছে। আমি তো আছি, আমি তো আছি। কারণ নন্দিনী রাজাকে ভালবেসে ফেলেছে। রাজাকে।

সেজন্যেই অতসীর এত লোভ। সুধাকরের বিরুদ্ধে ওর এত ক্ষোভ সেজন্যই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠেছিল, কি দিয়েছ তুমি রাজাকে, কি দিতে পেরেছ।

সত্যি তো, কিছুই দিতে পারেনি, কিছু না।

তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সেজন্যেই বলে উঠেছে, তুমি কোনও দিনই রাজাকে আমাদের ছেলে বলে ভাবতে পারনি, শুধু অভিনয় করে এসেছ আমাকে স্তোক দেবার জন্যে।

বলেছে, তুমি রাজার একটুও ভাল চাও না, আমি জানি।

এখন তার জন্যে একটু যে অনুশোচনা নেই তা নয়। তবু ওর মনে হচ্ছে রাগের মুহূর্তে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে সেগুলো সব হয়তো মিথ্যে নয়।

হয়তো সত্যি কথাগুলোই বলে ফেলেছে, তাই সুধাকর মাঝখানের কপাট ঠেলে খুলতে চাইছে না। আঘাত পেয়েছে। আঘাত পাবারই কথা।

জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল অতসী, বুকের মধ্যে ক্ষোভ নিয়ে।

ও হঠাৎ চমকে উঠল। অনুভবে বুঝল কে যেন নিঃশব্দ পায়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরমুহূর্তেই কাঁধে হাতের স্পর্শে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল।

তিক্ততার সঙ্গে হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই সুধাকর নরম গলায় বলল, শোনো।

সুধাকরের মুখের দিকে তাকাল অতসী।

আর সুধাকর ধীরে ধীরে বললে, সেই ভদ্রমহিলা আর এসেছিলেন?

ভদ্রমহিলা!

অবাক হয়ে গেল অতসী। সুধাকরের মুখে নন্দিনী এতদিন ছিল 'সেই মেয়েটা'। সে আজ হঠাৎ ভদ্রমহিলা হয়ে গেছে নাকি! অতসীকে খুশি করার জন্যে?

বেশ কঠিন গলায় অতসী বললে, না, না, এলে কি তোমার কাছে আমি লুকোতাম! কেন লুকোব, কিসের ভয়ে?

বিব্রত লজ্জিত ভাব ফুটে উঠল সুধাকরের মুখে।

বললে, না, না, আমি তা বলছি না।

একটু থেমে বললে, দ্যাখো, ভেবে দেখলাম, আমি সত্যি রাজার ওপর বড় অবিচার করে এসেছি! নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছি। আসলে কি জানো, আমার ভয় করত ওইসব পেয়ে পেয়ে রাজা হয়তো ওকেই ভালবেসে বসবে।

বিস্ময়ের চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল অতসী। একটু একটু করে হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। এখন যেন মানুষটাকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে। এ তো সেই সুধাকর যাকে বিয়ের পর থেকে দেখে আসছে। কোথাও অহঙ্কার নেই দারিদ্র্যের, কোথাও বিদ্বেষ নেই নন্দিনীর বিরুদ্ধে। ধনীর দুলালী সেই নন্দিনী।

আর রাগ নেই, ক্ষোভ নেই।

অতসী এবার হেসে উঠল, বললে, বিশ্বাস করো, প্রথম প্রথম আমারও ভয় করত। ভয় পেতাম, কেউ হয়তো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এখন জানি, ভালবাসা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

সুধাকর এসে বসল তক্তপোশের ওপর। অতসী দাঁড়িয়ে রইল। কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ সুধাকর বলে উঠল, ওঁরা তো বড়লোক, তা হলে নেব না কেন? এভাবে যদি রাজার ভবিষ্যৎটা তৈরি হয়ে যায়...

অতসী বললে, আমরাও তো চাই একটা ভাল স্কুলে পড়ুক। যেন স্তোক দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাকরকে কেমন হতাশ দেখাল। —আর এলেন না কেন? আর একবার যদি আসতেন উনি!

অতসী বললে, তুমি যেভাবে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আসবে না, আসবে না, আর হয়তো আসবেই না।

সুধাকর বিভ্রান্ত দু চোখ তুলে অতসীর মুখের দিকে তাকাল। —আসবেন না আর?

কেমন হতাশ দেখাল ওকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ওঁর বাড়ির ঠিকানাও নিয়ে

রাখোনি ?

—না, মনেই হয়নি।

আসলে বলতে পারল না, নিতে সাহসই হয়নি। তুমি তো তখন নন্দিনীর নাম শুনলেই জ্বলে উঠতে, দেখা হলেও যেন আমারই দোষ।

কিন্তু মুখ ফুটে সে-কথা বলতে পারল না। ইচ্ছেও হল না, কারণ ও নিজেও কেমন হতাশ বোধ করছে। সত্যি কি নন্দিনী আর আসবে না, দেখা হবে না আর !

সুধাকর অন্যমনস্ক ভাবে বললে, যদি না আসে...

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, বললে, মার্কেটেই তো দেখা হয়েছিল, হয়তো যায় মাঝে মাঝে, তুমিও যাও না আবার, যদি দেখা হয়ে যায়...

একদিকে হতাশা, আরেকদিকে লোভ। অতসী ধীরে ধীরে বললে, শুধু রাজা কেন, আমরাও, জানো, তোমাকে বলিনি, প্রথম যেদিন এল নন্দিনী, রাজা তখন কত ছোট, সেই বোতাম টেপা পিয়ানো, জামাকাপড়, খেলনা...

—কি বলোনি, কি ?

অতসী হাসল, আমাকেও একটা বেশ দামি শাড়ি দিয়েছিল। তোমার ভয়ে আমি কোনও দিন পরতে পারিনি, লুকিয়ে রেখেছি।

—শাড়ি, দামি শাড়ি ! তোমার জন্যে ? অবাক হয়ে গেল সুধাকর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় হাসল।—আমরা বড্ড বোকা, আমরা দুজনেই।

তারপর শুধু অপেক্ষা, আর অপেক্ষা। যদি আবার আসে।

প্রতিদিন সেই এক কথা, অফিস থেকে ফিরেই।—আসেননি ?

—না। অতসীর মুখও বিষণ্ণ।—বোধহয় আর আসবে না।

দিনের পর দিন কেটে গেছে। আসেনি, আসেনি।

শেষে একদিন সুধাকর বললে, বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে মার্কেটে গেলেও তো পারো, যদি দেখা হয়ে যায়।

•—যাব। অতসী বললে।

আশায় আশায় সুধাকর যেন উত্তেজিত। বললে, দেখো, যদি দেখা হয়ে যায়, খুব ভাল ব্যবহার কোরো, জোর করে বাড়িতে নিয়ে এসো।

একটু থেমে।—বাড়িতে যদি আসেন, দেখা হলে আমি বরং ক্ষমা চেয়ে নেব। বলব, মাথা ঠিক ছিল না।

অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, রাজাকে ভগবান দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভাগ্যও। হয়তো আমাদেরও। নিতে পারলাম না।

সুধাকর প্রায় কান্নার গলায় বললে, কিই বা আছে আমাদের। শুধু মিথ্যে গর্ব, আর ভয়।

তারপর সত্যি সত্যি হন্যে হয়ে নন্দিনীকে খুঁজে বেড়িয়েছে অতসী। মার্কেটে, এখানে ওখানে, মেলায়, রাস্তাঘাটে। একটা বড় গাড়ি দেখলেই দ্রুত কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেয়েছে, ভিতরে কে, নন্দিনী কিনা।

সুধাকর আর অফিস থেকে ফিরে জিগ্যেসও করে না। জিগ্যেস করতেও লজ্জা। 'না' কথাটা শুনতে ভাল লাগে না। চোখে জল এসে যায়।

একদিন বিষ্ণুচরণের সঙ্গে রাস্তায় অতসীর দেখা হয়েছিল। মার্কেট থেকেই ফিরছিল। অকারণ রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত; অবসন্ন। বাসের ভিড়ে ভ্যাপসা গরমে সারা শরীর ঘর্মাক্ত।

—এই যে বউমা। কোথায় গিয়েছিলে ?

অতসী এড়িয়ে যাবার জন্যে হেসে বললে, এই আর কি।

বিষ্ণুচরণ সহজে ছাড়ার পাত্র নন। কিংবা কথা বলার লোক পান না বলেই নিজে এগিয়ে এসে কথা বাড়ান। চুলে এখন আর কলপ দেন না, আজকাল আর ধোপদুরস্ত চুনোট ধুতি আর গিলে হাতা পাঞ্জাবি পরেন না।

ধুতি পাঞ্জাবি আধময়লা হয়ে গেলেও সেদিকে দৃষ্টি নেই। একেই বোধহয় প্রকৃত বার্ধক্য বলে।

কিন্তু কৌতূহল যায়নি।

কাছে এগিয়ে এলেন বিষ্ণুচরণ।—তোমার সেই বোন, বড় একটা গাড়ি করে আসত, কই আর তো আসে না।

—বোন ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, কে ?

বিষ্ণুচরণ হাসলেন, বাঃ রে, ভাবছ বুড়ো ভুলে গেছে ? সেই যে আসত, প্রথম দিন আমিই তো বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

ততক্ষণে অতসী বেশ বুঝতে পারছে কার কথা বলছেন।

বিষ্ণুচরণ বললেন, আমি তো জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি কে হও ওর। বললে, দিদি।

বিষ্ণুচরণ হাসলেন।—বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে না হে। বোনটি দেখতেও খুব সুন্দর, বেশ বড়লোক, না ?

কি উত্তর দেবে অতসী। বললে, হ্যাঁ।

বলেই দ্রুত পা চালিয়ে দিল। অসহ্য, অসহ্য।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল। ঘর্মাক্ত শরীরটা নিয়ে স্নানের ঘরে ঢোকার জন্যে তাড়া নয়।

আসলে কাজের মেয়েটার কাছে রাজাকে রেখে গেছে। যদি এই ফাঁকে নন্দিনী এসে পড়ে রাজা যেন তাকে বসিয়ে রাখে। রাজা তো চেনে, বহুবার দেখেছে, আর সেই বড় গাড়ি, চিনতে অসুবিধা হবে না।

বিষ্ণুচরণের কথায় বুঝতে পারল, আসেনি। দেখাও হল না মার্কেটে।

একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ল যেন। তারই মধ্যে একটু আশার আলো বিষ্ণুচরণের কথায়। অতসীকে দিদি বলেছে। সামনাসামনি দিদি বলে ডাকা আর বাইরের লোকের কাছে দিদি বলে পরিচয় দেওয়া, অনেক তফাত। রীতিমত আপন মনে না করলে বলা যায় না।

অতসীর বেশ ভাল লাগছিল, বিষ্ণুচরণ নন্দিনীকে ওর বোন ভেবে নিয়েছে দেখে। সুধাকর যতই তুচ্ছ করুক, টাকার অন্য একটা মহিমা আছে। না থাকলে হঠাৎ এতদিন বাদে বিষ্ণুচরণ ওকে সমীহ করবে কেন। সমীহ নিশ্চয়ই। এতকাল কত আত্মীয়স্বজন এসেছে, কই কোনও দিন তো প্রশ্ন করেনি।

এমন কি মিলুকে দেখেও নয়। বিয়ের আগে মিলু আসত বয়-কাট চুলে। চোখে পড়ার কথা।

বিষ্ণুচরণের চোখ ফাঁকি দিয়ে এ রাস্তায় কেউ আসতে পারে না। ঘাঁটি আগলে বসে থাকেন নিজের বাড়ির রকের ওপর। পাঁচ শরিকের বাড়ি, সব দেয়াল তুলে তুলে পার্টিশন হয়ে গেছে কোন কালে, সবাই পৃথগন্ন, কিন্তু বসে থাকেন এবং ভাব দেখান যেন গোটা বাড়িটা এখনও ওঁরই। অতসীরও সে-রকম ধারণা ছিল প্রথম প্রথম।

—বেশ বড়লোক, না ?

ওই 'বেশ বড়লোক' কথাটার মধ্যেই সমীহ ছিল। বোন বড়লোক হলেও হয়তো

বাড়তি একটা দাম পাওয়া যায়।

বিষ্ণুচরণ এখন আর তেমন অর্থবান নন বলেই হয়তো বড়লোকদের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। আড়ালে কি বলবেন কে জানে। পড়ন্ত ধনীরা উঠতি বড়লোকদের সহ্যই করতে পারে না। ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। অতসী নিজেই দেখেছে, টাকা মানে টাকা একথাই জানত, বড় পিসিমাদের এককালে অবস্থা ভাল ছিল, পাশের বাড়ি তেতলা তুলল, দেখে বলেছিল কাঁচা টাকা, বুঝলি না ? টাকার আবার কাঁচা পাকা কি জানতই না। মিলুর মা, মানে মেজমাসি কাকে যেন ঠেস দিয়ে বলেছিল, ওসব কালো টাকার ব্যাপার। যেন সাদা কালোয় সত্যি সত্যি কোনও তফাত আছে।

টাকার জন্যে কার লোভ নেই ! অতসী জানে, ওর নিজেরও আছে। তা সে কাঁচা হোক পাকা হোক, সাদা হোক কালো হোক। ওসব বলে শুধু গায়ের ঝাল মেটানো যায়।

এই যে নন্দিনীকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আশায় আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে, যদি আসে, ও কি খোঁজ নিতে চেয়েছে ওদের টাকার রং কি ? কাঁচা না পাকা ? টাকা মানে টাকা। যা না থাকার জন্যে রাজা হয়তো শেষ অবধি একজন কেরানি হয়ে যাবে।

সুধাকর, সেই প্রথম প্রথম যখন রাগ করত, তর্ক করে বলেছিল, সাধারণ বাড়ির ছেলেরা কি বড় হয় না ? মাথা থাকলে বাজে স্কুল থেকেও ব্রিলিয়াণ্ট হয়ে বেরোয়।

ওটা শুধুই তর্ক। অতসী তাই প্রশ্ন করেছে, ক'জন ?

সব সুযোগ হাতের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, হেলায় হারিয়েছে, সুধাকরের জন্যেই। 'আমরা কি ভিখিরি নাকি ?' আমরা তো তারও অধম, অথচ অহঙ্কার ষোল আনা। আমাদের ছেলেকে আমাদের মতো করে মানুষ করব। কেন ? রাজা কি দোষ করল। সেভাবে মানুষ হবেই বা কেন ? কোর্টে যেদিন যেতে হল, জিগ্যেস তো করেছিল, কত মাইনে পান, চালাতে পারবেন কি না। ওয়েট নার্স রাখতে পারবেন মাইনে দিয়ে ? ওয়েট নার্স কথাটার মানেই জানত না তখন। সিস্টার ভিষা বলেছিল, দুধ-মা।

কত কষ্টে জোগাড় করে এনেছিল। মাসে দুশো টাকা। বড় গায়ে লাগত, কিন্তু তিন হপ্তার বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গিয়েছিল। ওদেরও উপায় ছিল না, তাই পেয়েছিল ওকে। হাতের মুঠোয় বিশাল একটা স্বর্গ। স্বর্গসুখ।

বাড়ি ফিরে এসে কাজের মেয়েটাকে বললে, কেউ আসেনি, না ?

সে ঘাড় নাড়ল। রাজা মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না। কাজের মেয়েটার সঙ্গে কি যেন খেলছিল।

একবার তাকিয়ে বললে, কিছু কেনোনি ?

অতসী মাথা নাড়ল। না। দু হাত উল্টে দেখাল। বললে, কিচ্ছু না।

একটু খারাপও লাগল, একটা ক্যাডবেরি নিয়ে এলে হত। মার্কেটে গেছে, অথচ ফিরে এল খালি হাতে, এটা বোধহয় রাজার ভাল লাগল না।

আগে যেত কম, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেত, কিছু না কিছু কিনে দিত।

এখন ঘন ঘন যায়, রোজ কি আনা যায় নাকি !

ভালবাসা দেবার জন্যে, ভালবাসা জানানোর জন্যও টাকা দরকার। শুকনো ভালবাসায় কিছুই হয় না।

এতক্ষণ ছিল না, অতসী ভেবেছিল ওকে ফিরে আসতে দেখেই রাজা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরবে।

কিন্তু একমনে ও খেলাই করছে, উঠল না।

পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে তার নীচে এসে বসল অতসী। একটু পরে স্নান করতে যাবে। বসে বসে খেলা দেখল।

আর তখনই হঠাৎ রাজা মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, মা, সেই মেয়েটা আর আসে না কেন গো?

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল অতসী।

আশা ছেড়ে দিয়েছিল ওরা দুজনেই।

অতসী রান্নাঘরে। সুধাকর রাজার স্কুলের 'বাক্য লিখ' করে দিচ্ছিল। যা করে দেয় কোনওটাই ওদের স্কুল-টিচারের পছন্দ হয় না। কি যে চায় ওরা কে জানে। সেকালে লেখাপড়া জিনিসটাই অন্যরকম ছিল। একালে কত কি বদলে গেছে। বুঝতেও পারে না। কিংবা ওই স্কুলের টিচাররাই বোঝে না। এই বাজে স্কুলগুলোকে নিয়ে আরও ঝঞ্ঝাট।

ওকে পড়াতে পড়াতে অনেক দূর থেকে একটা হর্নের শব্দ যেন কানে এসেছিল, ভ্রূক্ষেপ করেনি, ভেবেছে, দূরের বড় রাস্তার হর্ন।

কিন্তু এবার হর্নের শব্দ আরও কাছে মনে হল।

এ গলিতে ট্যাক্সি ঢোকে না এমন নয়, গাড়িও কদাচিৎ আসে। কিন্তু এ হর্ন যেন একেবারে অন্যরকম। আওয়াজটা তেমন রুক্ষ কর্কশ নয়।

সুধাকর উৎকর্ণ হয়ে রইল।

অতসী নিশ্চয়ই আওয়াজটা চেনে, চেনা ঠেকলে এতক্ষণে কি আর ছুটে আসত না। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, রান্নাঘরের দরজাটা এখান থেকে দেখা যায়। না, অতসী রান্না নিয়েই ব্যস্ত।

আবার হর্ন, একেবারে বাড়ির কাছে।

আশায় আশায় উঠে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল অতসী। কে এল? সুধাকরকে দেখেই জিগ্যেস করল। —দেখিনি, কার গাড়ি?

ওরা দুজনেই দুদ্দাড় করে সদর দরজার দিকে ছুটে গেল। যদি নন্দিনীর গাড়ি হয়। নন্দিনীর গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।

দরজায় পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। দুজনেই!

সঙ্গে সঙ্গে দুটি মানুষই ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দুজনের মুখেই উল্লাস, আনন্দ, হাসি।

হ্যাঁ, নন্দিনীর গাড়ি। দরজা খুলে নামল নন্দিনী, আর সুধাকর দ্রুত পায়ে একেবারে গাড়ির কাছে, যেন গাড়ির দরজাটা ও নিজেই খুলে দিতে চেয়েছিল।

অতসীও পৌঁছে গেছে।

নন্দিনীর মুখ কেমন ভীত বিভ্রান্ত ছিল। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারেনি বলেই ছুটে এসেছে। তবু ভয়, সুধাকর আবার না ফিরিয়ে দেয়, অতসী না নিরুপায় বিষণ্ণ মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

থাকলেও আর ভয় নেই নন্দিনীর। ও মনঃস্থির করে ফেলেছে। সব প্রকাশ করে বলে ফেলবে, ভিক্ষে চাইবে। ওর এত অর্থ, ঐশ্বর্য, সব অর্থহীন হয়ে যেতে দেবে না।

ভীত সন্ত্রস্তভাবেই ও নামল, তাকাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে গেল। আরে, এমন তো ভাবেনি। সুধাকরও হাসছে। কি স্মিত হাসি, বিনয়নম্র দৃষ্টি। এমন সৌজন্য ওর কাছ থেকে কোনও দিন পায়নি।

অতসীর চোখেও আমন্ত্রণের হাসি।

সুধাকর বলে উঠল, আসুন।
অতসীও। —এসো।
দুজনের মুখেই অমায়িক হাসি।
এতক্ষণে নন্দিনীও হাসল। বললে, আসব বলেই তো এসেছি।
আর তখনই পিছন থেকে একটা বেজায় ফুর্তির তীব্র ডাক শোনা গেল। —মা-সি
আর 'সেই মেয়েটা' নয়।



ডুবসাঁতার



এ-বাড়িতে আগে কখনও এমন ঘটা করে জন্মদিনের উৎসব হয়নি। তাও কি না একটা মেয়ের জন্মদিন। পুচকে একটা মেয়ের। কালে কালে কি যে হচ্ছে! মেয়ের জন্মদিন তো আগে কেউ মনে রাখতেই চাইত না। মনে রাখার বিপদ অনেক, জন্মদিন করে সেটা আবার আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শিকে মনে পড়িয়ে দেয় নাকি। তা হলেই তো বছর বছর বয়েসের হিসেব কষবে তারা। ওমা, পনেরোয় পড়ল, তা হলে তো তোর রাতে ঘুম নেই রে সুহাস।

সুহাস মানে সুহাসিনী, এ-বাড়ির চাবিকাঠি। আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা এখনও কাঁধে ফেলেন, এই বয়েসেও বেশ গটগট করে হাঁটেন, হুকুমের স্বরে না হলেও দু একটা আদেশ-উপদেশ দিতে কসুর করেন না। তবু কারও বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে চাবির গোছাটা আসলে আঁচলকে যথাস্থানে রাখার জন্যেই। তার বেশি কিছু নয়। সকলেই জানে ওর একটা চাবিও এ সংসারের একজনেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছের কপাট খুলতেও পারে না, বন্ধ করতেও পারে না। যেটুকু সমীহ তা শুধু চক্ষুলজ্জার কিংবা কর্তব্যের, হয়তো বা ভালবাসার। টিকলো নাক আর ফর্সা রঙের জন্যে আগে মনে হত বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে চেহারায়, এখন সামনে আর কানের দুপাশে ঈষৎ কোঁকড়ানো ঝকঝকে সাদা চুলের ঢেউ দেখা দিলেও বয়েস তেমন কোনও ব্যক্তিত্ব দিতে পারছে না। কারণ চাবির গোছাটা নেহাতই একটা চাবির গোছা হয়ে গেছে। তার পিছনে কোনও জোর নেই।

কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়, বলে ফেলেছিলেন, বেশ অবাক হয়েই বলেছিলেন, কি বলছ তনু, তিতুনের জন্মদিন? মেয়েদের আবার জন্মদিন!

দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে মাঝেসাঝে সে জন্যেই খিটিমিটি লাগে। এই অবুঝ সহধর্মিণীটিকে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না যে ঢল নামা জলকে বাঁধ দিতে গেলে নিজেকেই ভিজে মরতে হয়। তার চেয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানোই ভাল। দুর্গাপ্রসাদ জানেন হাঁটু দুটোয় আজকাল তেমন জোর পান না। তা নিজের কাছেও চাপা দেবার জন্যেই বলেন, আসলে হয়েছে কি ওপর নীচে ওঠানামা তো কমে গেছে, অফিসটাও ছিল তিনতলায়, এখন তো রিটায়ার্ড লাইফ, হাঁটুর এক্সারসাইজই কমে গেছে।

ছোট শালি আর ভায়রাভাই একবার দেখা করতে এসেছিল, তাদের সামনেই কথাটা।

ছোট শালি সুভাষিণী ওরফে মিনুরও বয়েস হয়েছে, তিন তিনটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু ফাজিল ভাবটা এখনও যায়নি, কিংবা দুর্গাপ্রসাদের কাছে এলেই হয়তো তার ফাজলামিটা বেড়ে যায়।

বয়েস এবং হাঁটু নিয়ে দুঃখ করতে করতেই সহাস্যে বলেছিলেন কথাটা।

হাঁটুর এক্সারসাইজ কথাটা শোনামাত্র মিনু মুখে আঁচল দিয়ে এমন হাসতে হাসতে ছুটে পালাল, যে ভায়রাভাইয়ের সামনে বৃদ্ধ দুর্গাপ্রসাদ রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। সুহাসিনীও এমন ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে সরে গিয়েছিলেন যেন উনি কি এক গর্হিত কথা বলে ফেলেছেন।

আজকাল এই হয়েছে এক দায়, যা বলবে যা করবে তাতেই সুহাসিনীর মুখ ঝামটা সহ্য করতে হবে। তা হোক, তাতে আপত্তি নেই, একটু খিটিমিটি লেগে না থাকলে অবসর জীবনের সারাটা অকর্মণ্য দিন কাটাতেন কি করে। কিন্তু ছেলেদের সংসারে নাক গলাতে

যাওয়ার দরকারটা কি। তুমি তো জানো, তোমার ওই চাবির গোছাটার এখন আর কোনও জোর নেই। ওরা মান্য করত, মান্য না করে উপায় ছিল না বলেই। ওসব ভালবাসা-টালবাসা অন্তরের টান সবই বানানো কথা। স্বাধীনতা কে না চায়, তুমিও তো একসময় দিনরাত গজগজ করতে। এখন ভুলে যাচ্ছ কেন। তার চেয়ে ওরা যা করতে চায়, করতে দাও, শান্তি বজায় থাকবে, শিকড় ছিঁড়তে চাইবে না। শিকড় ছিঁড়ে চলে আসা যে কি কষ্টের সে তুমি বুঝবে না। যে ছেঁড়ে তারও কষ্ট, যার শেকড় তারও কষ্ট। কষ্ট আরও বেশি দু পক্ষের কেউই মুখ ফুটে বলতে পারে না বলে।

দুর্গাপ্রসাদ কোনও দিনই সে-কথা সুহাসিনীকে বলতে পারেননি।

বললে তো সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ আসত, আদিখ্যেতা ছাড়ো, আমিও আমার বাবা-মাকে ছেড়ে এসেছি, আমারও কষ্ট কম হয়নি।

এখন তাই দুর্গাপ্রসাদের এত ভয়। একটু সমঝে চললেই তো হয়। ওরা একটু স্বাধীনতা চায়, আর তো কিছু নয়। ওরা ওদের মত চলতে চায়। দিনকাল যে পাল্টে গেছে সে-কথা তো মনে রাখতে হবে।

সুহাসিনী যে সমঝে চলেন না তা নয়। বেশ একটা সুখী-সুখী ভাবও ওঁর মুখে লেপটে থাকে। অথচ ওরা কেউই যেন ওঁকে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধেই। এতকাল দিব্যি চলে গেছে, যতদিন চাকরি ছিল, সংসারের কাজ, রান্নাবান্না করে স্বামীকে আপিসে পাঠিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের স্কুলে কলেজে, বিকেল থেকেই এক একজন ফিরছে, হেঁসেল থেকে মশারি খাটানোর মধ্যেই দিনগুলো কেটে যেত। দুপুরে একা থাকাও আর দুর্বিষহ ঠেকত না। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

দুর্গাপ্রসাদ রিটায়ার করে এখন ঘরে বসে আছেন বলেই বরং কেমন যেন লাগে। একটা পুরুষ মানুষ সদাসর্বদা বাড়িতে থাকলে খিটিমিটি তো লাগবেই। নেই কাজ তো খই ভাজ। ঝাঁটাটা কপাটের আড়ালে রাখলেই তো পারো। শার্টটা কাচতে দিয়ে দিলে, ওটা তো আরও দুদিন পরা যেত।

অথচ দোষ নাকি শুধু সুহাসিনীর। একদিন জামাকাপড় আলমারি থেকে বের করে রেখেছেন, দুর্গাপ্রসাদ আলনায় রাখা লাট হওয়া জামাকাপড় পরেই বের হচ্ছিলেন।

সুহাসিনী চটে গিয়ে বললেন, ধোপদুরস্ত পোশাক পরতে তোমার কি লজ্জা করে নাকি।

ব্যস, বাবু চটে আগুন। —সকাল থেকেই খিটখিট শুরু করলে!

আসলে মানুষটা বোঝে না কেন যে রিটায়ার করেছে বলেই এখন পোশাক-আশাকে আদর আপ্যায়নে একটু বেশি বেশি সচ্ছলতা দেখানো দরকার। পাড়ার লোক, আত্মীয়, তাদের কাছেই শুধু নয়। ছেলে, ছেলের বউদের কাছেও। সত্যি সত্যি তো আমরা গরিব দুঃস্থ হয়ে যাইনি, ছেলের হাততোলাও খেতে হচ্ছে না। হবে না।

—সব সময় খিটখিট খিটখিট, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন দুর্গাপ্রসাদ। নিজের মনকেই বললেন, নাকি সুহাসিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে তা জানেন না।

সুহাসিনীর মন ভাল ছিল। স্বামী খেতে ভালবাসে বলে রান্নার লোককে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে মোচার ঘণ্ট রেঁধেছেন সেদিন। রান্নার লোক তো ছোটবউমার কথায় ওঠে বসে, কি রান্না হবে না হবে তা যেন ওঁর বলার অধিকারই নেই। সুক্তো? ম্যাগো, ও সব কে খায়! এই সংসারটাকে যে এতদিন টেনে এসেছে তার পছন্দ অপছন্দ যেন কিছুই নয়। সে কি খেতে ভালবাসে কেউ একবার জিগ্যেসও করে না। হেঁসেলটা হাত থেকে

কেড়ে নিয়ে সুহাসিনীকেই যেন ওরা রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে।

আর যার জন্যে এত কষ্ট করে মোচার ঘণ্ট রাঁধা, সেই বলে বসল কিনা আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। দুর্গাপ্রসাদ খবরের কাগজটা পড়ছিলেন, দোষের মধ্যে সুহাসিনী তাড়া দিয়েছেন, সারা সকাল তো কাগজ মুখস্থ করলে, এবার যাও, চান করে নাও।

আসলে ইচ্ছে ছিল সামনে বসিয়ে খাওয়াবেন, উল্টে শুনতে হল : সব সময় খিটখিট খিটখিট...

মন ভাল ছিল বলে সুহাসিনী হেসে ফেললেন। এই নির্বোধ লোকটাকে কি করে বোঝাবেন যে যেটাকে খিটখিট ভাবছে সেটা আসলে বেকার কর্মহীন মানুষটাকে সঙ্গ দেয়া, কথা বলা। মুখ ফুটে সে কথা তো বলাও যায় না, লজ্জা করবে যে!

ননদ এসেছিল একদিন, তার কাছেও অভিযোগ করলেন দুর্গাপ্রসাদ। আর তা শুনে সে এসে বললে, এমন করো কেন গো বউদি! দুঃখ করছিল দাদা।

সুহাসিনী হেসে বললেন, তুমি থামো তো। বুড়ো বয়েসে ওটাই আমাদের ভালবাসা। হেসে ফেলে বললেন, এই বয়েসে কি তোমাদের মত প্রিয়তম প্রিয়তম ভালবাসাবাসির কথা বলব!

ননদ শ্যামলী হেসেই আকুল, সুহাসিনীকে জড়িয়ে ধরে বললে, দাঁড়াও, তোমার নন্দাইকে বলে দেব।

সুহাসিনী হেসে বললে, খবর্দার!

ছেলে ছেলের বউদের নিয়েও সেই একই ব্যাপার। ওরাও বোঝে না। নাকি সুহাসিনী নিজেই ওদের বুঝতে পারছেন না তাও জানেন না।

অভিষেক হেসে বললে, মা, এবার তিতুনের জন্মদিন করব ভাবছি।

সুহাসিনীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, মেয়ের আবার জন্মদিন! একটু অবাকও হয়েছিলেন বইকি!

সঙ্গে সঙ্গে তনু, অভিষেকের পিছনেই ছিল, বলে উঠল, আপনাদের কাছে মেয়ে ফ্যালনা হতে-পারে, আমাদের কাছে নয়।

সুহাসিনী বিব্রত বোধ করলেন, শুধরে নিয়ে বলতে গেলেন, না না ছোটবউমা, আমি তা বলতে চাইনি।

কি বলতে চেয়েছিলেন তা শোনার জন্যে দাঁড়াল না তনু।

তাই অভিষেককেই বললেন, এখনকার কিছু কি ছাই আমরা বুঝি। আজকাল কত কি হয়েছে।

দুর্গাপ্রসাদ রেলিং-ঘেরা বারান্দার চেয়ারে বসে বসে শুনছিলেন, সব কথাই তাঁর কানে যাচ্ছিল, চেঁচিয়ে বললেন, কিছুই বোঝো না যখন, ফোড়ন কাটার কি দরকার। ওরা করতে চাইছে, করুক না।

দুর্গাপ্রসাদ সারমর্ম বুঝেছেন, ছেলেরা যা করতে চায় করুক, ওরা তো আর ওঁর কাছে হাত পাততে আসছে না।

কিন্তু তাঁর কথায় সুহাসিনী একেবারেই কান দিলেন না। স্বামীর কথা গ্রাহ্য করতে গেলে এ-বাড়িতে সদাসর্বদা মুখ বুজে থাকতে হবে।

অভিষেককে বললেন, তিতুন কি আমাদের পর নাকি যে মেয়ে বলে হেলাফেলা করব? আসলে আমাদের সময়ে তো হত না!

দুর্গাপ্রসাদ কথা ছুঁড়ে দিলেন বারান্দা থেকেই।—তখন যে মেয়ের বয়েস জেনে যাবে বলে ভয় ছিল।

সুহাসিনী অভিষেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন, জানি না

কেন, কিন্তু অন্নপ্রাশনটা মেয়েদেরও ঘটা করেই হত।

একটু থেমে বললেন, তোরা তো ছেলে, তোদের জন্মদিনেই বা কি করেছি।

অভিষেক বলে উঠল, তোমরা তো আমাদের জন্যে কিছুই করোনি। কিছুই না। সেজন্যেই তো তিতুনের জন্যে ঘটা করে করতে চাইছি।

সুহাসিনী হেসে ফেললেন, দুঃখের হাসি। বললেন, হ্যাঁ রে কিছুই করিনি, কিছু না ?

দুর্গাপ্রসাদ দূরে বসে শুনছিলেন, চটির শব্দে বোঝা গেল উনি উঠে আসছেন। হয়তো মনটা বিষিয়ে দেবার মত কিছু বলে বসবেন তিক্তকণ্ঠে।

চোখে জল এসে গিয়েছিল অভিষেকের কথা শুনে। আঁচলে মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন সুহাসিনী।

কিন্তু তার আগেই এসে পড়েছেন দুর্গাপ্রসাদ। সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুহাসিনীকে আটকালেন। —দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ধীরে ধীরে বললেন, ছেলে ছেলে করেছ চিরকাল, একটার পর একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে রাতের ঘুম চলে যেত বলে। ছেলের কাছ থেকে আরও কত কি শোনার আছে, শুনে যাও।

তারপর অভিষেকের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তোদের জন্যে কিছু করেনি রে তোর মা, কিচ্ছু না। শুধু নির্জলা উপোস করে মন্দিরে পুজো দিয়ে এসেছে, নিজের হাতে পায়েস রেঁধেছে, পাঁচ ব্যঞ্জন, তোকে খাইয়ে দুপুর দুটোয় খেতে বসেছে। সারাদিন শুধু ঠাকুর ঠাকুর করে তোর জন্যে প্রার্থনা করেছে। আর কিছু করেনি, কিছু না, একজন ক্যাটারারও ডাকেনি, রাশি রাশি খেলনাও আনেনি। শুধু একটা জামা আর প্যান্ট, আর কিছু না।

বলে চটির শব্দ করেই আবার চলে গেলেন বারান্দার চেয়ারটিতে।

আর সুহাসিনীর দু চোখে তখন জল। দিনরাত পিছনে লাগে, দিনরাত খিটখিট করে, ওই মানুষটার হল কি। সুহাসিনীর দু চোখের সামনে সব ঝাপসা।

কি কাণ্ড যে করে বসল, বারবার নিজেই উপদেশ দিয়েছে, একটু সমঝে চললেই তো পারো, ওরা যা ইচ্ছে করুক না। হঠাৎ কি হল কি মানুষটার !

আজকাল এ-ধরনের কোনও কথা বলতে তো সাহসই হয় না ওর।

ভয় সুহাসিনীরও। অভ্যাসের দোষে কখনও-কখনও বলে ফেলেন। এই যে তিতুনের জন্মদিনের কথাটা। আগে হত না বলেও বটে, আবার মনে হয়েছে, কেন মিছিমিছি এত অপব্যয় ! থাকলে অভিষেকেরই থাকবে, তুতুনের বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

চোখের জল মুছে নিয়ে অভিষেকের ঘরের দিকে গেলেন, হাসতে হাসতে ডাকলেন, তিতু, এই তিতুন !

ঢুকে পড়লেন ঘরে। —এই যে !

তিতুনকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, তোমার জন্মদিনে আমাকে নেমন্তন্ন করবে তো দিদিভাই !

তিতুন স্মার্ট মেয়ের মত বললে, সিওর !

—তা হলে কি নেবে বলো জন্মদিনে ? কানের কিছু, না আংটি ?

মুখ তুলে তাকাতেই দেখলেন, অভিষেকের মুখে ঈষৎ হাসি, ছোটবউমা, তনুর মুখ বেশ খুশি-খুশি।

যেন দোষ করে ফেলেছেন, এখন শুধরে নিতে চান, সেভাবেই হাসি হাসি মুখে তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাড়িতে অনেকদিন কোনও আনন্দটানন্দ হই হই কিছু হয়নি, ভাল

করেই করো ছোটবউমা।

অভিষেকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর বাবাও কিছু দেবে বলেছে।

চলে এলেন না, খাটের একপাশে গিয়ে বসলেন, তিতুনকে গায়ের সঙ্গে সেঁটে নিয়ে।

আসলে তিতুন মেয়ে হলেও উনি যে তাকে বুকের ভেতর থেকে ভালবাসেন তা ওদের বোঝাবেন কি করে। বোঝাতে হয় তাই যে জানেন না।

মাকে কথাগুলো বলে ফেলে অভিষেকের নিজেরও খুব খারাপ লাগছিল।

মাথার ওপর এখনও বাবা-মা আছেন। বাড়িতে কিছু একটা করতে হলে তাঁদের কানে তো তুলতে হবে কথাটা। সেজন্যেই মাকে বলতে যাওয়া। একেবারে কিছু না জানিয়ে বাড়িতে একটা জন্মদিনের পার্টি করা যায় নাকি। কিছুকাল আগেও সংসারটা মিলেমিশে যেমন এক ছিল, যেন একই শিকড়, একই কাণ্ড, এখন তা থেকে অনেক বদলে গেছে। এখন শুধু ছাদটাই এক। কিংবা অভিষেকের অফিসের সিঁড়ির মত। একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, কিন্তু এক এক দরজা খুলে এক একটা আলাদা অফিস। বহুকাল ধরে চোখোচোখি হয়েও লোকগুলো অচেনা।

অভিষেকের নিজেরই আশ্চর্য লাগে। এই কিছুকাল আগেও এ-বাড়িতে সবাই মিলে কেমন একটা ঘননিবদ্ধ সংসার ছিল। অভিষেক গর্ব করে বন্ধুদের কাছে বলত, আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি।

এখন মনে হয় বাবা-মাও কত দূরে চলে গেছে। কেন যে এমন হয় ও নিজেও বুঝতে পারে না।

কিছুই করোনি, কিছুই করোনি, কথাগুলো মাকে বলে ফেলে অভিষেকের ভীষণ খারাপ লাগছে। বাবার চিমটি-কাটা কথাগুলো শুনে ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল ও। কিছু একটা বলে বসব হয়তো, ভাগ্যিস বলে ফেলেনি।

মা খাটের কোনায় বসে তিতুনকে আদর করছে, গল্প করছে তার সঙ্গে।

মাঝে মাঝে তনুকে প্রশ্ন করছে দু-একটা। হাসতে হাসতে বলছে, ও সব চপ কাটলেট যাই করো, পায়েস কোরো কিন্তু। পায়েস না হলে জন্মদিনই হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে পরমান্নশাল চালের গন্ধটা নাকে এসে লাগল অভিষেকের। কিছুই করোনি, কিছুই করোনি। কি করে সব ভুলে গিয়েছিল ও। অথচ ভোলার তো কথা নয়।

এই সেদিনও, অফিসের তাড়া, অভিষেক তনুকে ধমক দিচ্ছে, 'কি হল অফিস যেতে হবে না ? ঠাকুরকে খেতে দিতে বলো' ; তনু বলে উঠল, দাঁড়াও তোমার পায়েস হোক।

ওর নিজেরও খেয়াল ছিল না, কিন্তু মা কখনও ভোলেনি, একটা দিনও নয়। অফিসের যত তাড়াই থাক, মা সেই মান্ধাতা আমলের রুপোর বাটিতে এক বাটি পায়েস নিয়ে এসে সামনে বসেছে, পুজোর পুষ্প ঠেকিয়েছে মাথায়।

অথচ অভিষেক দু-চার চামচ খেয়েই বাটিটা সরিয়ে দিয়েছে।

বাবা হয়তো এ-সবের খবরও রাখে না আজকাল। সেজন্যেই শুধু ছেলেবেলার কথাগুলোই বলল। সেই ছেলেবেলার কথাগুলোই হয়তো বাবার মনে স্মৃতি হয়ে আছে। যখন অভিষেকের জন্মদিনের দিনকয়েক আগে থেকেই পরমান্নশাল চালের জন্যে বাবা হন্যে হয়ে দোকানে দোকানে ঘুরত। এখন তো ও সব চাল নিয়ে শৌখিনতা উঠেই গেছে।

তবু এতদিন বাদে সেই ছেলেবেলায় খাওয়া পরমান্নশাল চালের পায়েসের গন্ধটা নাকে এসে লাগল।

কি করে যে সব ভুলে গিয়েছিল, নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

একবার পায়েস রাঁধতে গিয়ে একটুখানি ধরে গিয়েছিল, পোড়া পোড়া গন্ধ। মায়ের সে কি মন খারাপ, কি ভয়। কোনও অমঙ্গল হবে না তো। কোনওদিন তো ধরে যায়নি, এবার এমন হল কেন।

একটা বছর পার হয়ে গিয়ে আবার জন্মদিন এল, পায়েসের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে কাকে যেন বলেছিল, উঃ, এই একটা বছর কি উদ্বেগে যে কেটেছে।

তখন জন্মদিনে রাশিরাশি উপহার ছিল না, কিন্তু কি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। তনুকে সে কথা বলা যাবে না, বোঝানো যাবে না।

চটে গিয়ে বলবে, আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালবাসি না, যত ভালবাসা তখনই ছিল।

আসলে ভালবাসা একই, কিন্তু তার চেহারা বদলে গেছে। বদলে যাচ্ছে।

না, আমাদের ইচ্ছেয় নয়। বদলে যেতে হচ্ছে চারপাশের চাপে।

অথচ কি আশ্চর্য, একটু আগেই অভিষেকের মনে হয়েছিল, আমরা ছেলেবেলায় কেউই বাবা-মার ভালবাসা পাইনি। ওরা তো ভালবাসতেই জানত না। শুধু টাকা বাঁচাত। ওদের চোখে সবই ছিল অপব্যয়। সেই শস্তাগণ্ডার বাজারেও কখনও কোনও দামি পোশাক-আশাক দেয়নি, কখনও কোনও ভাল রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যায়নি, নামী কোনও স্কুল-কলেজেও ভর্তি করায়নি। মা কিংবা বাবা সামনে বসে থেকে ছোট ছোট করে চুল কাটিয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজের মাঝখানটা গর্ত করে সেটাই মাথা গলিয়ে জামার মত পরে যখন কাঁচির সামনে মাথাটা এগিয়ে দিত, আড়চোখে তাকিয়ে দেখত কেউ কোথাও দেখছে কি না, দেখে ফেললে কি লজ্জা! মুড়িয়ে ছোট ছোট করে কাটা চুলের মাথাটা নিয়েই কি কম লজ্জা ছিল নাকি।

সেজন্যেই অভিষেকের কাছে ছেলেবেলাটা হয়ে আছে দুঃখের শৈশব। স্মৃতির মধ্যে কোনও সুখের চিহ্নও নেই। যা কিছু সুখ দিতে পারত সেই জীবনে, ওদের চোখে তার সবই ছিল বাবুয়ানি, ছেলে বিগড়ে যাবে। শুধু পড়ো আর পাশ করো। কষ্ট সহ্য করতে শেখো।

না পেয়ে পেয়ে জীবনে কিছু পাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল। সব দিক থেকে সাধারণ হয়ে থাকতে থাকতে কোনওদিন বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শেখেনি।

অভিষেকের মনে হল একালে আমরা বোধহয় তার রিভেঞ্জ নিচ্ছি, রিভেঞ্জ। হ্যাঁ, প্রতিশোধ। তোমরা তো কথায় কথায় ছেলে মানুষ করার কথা বলো, ছেলেকে মানুষ করতে জানতে না। আমরা জানি।

তিতুন যখন তিন বছরের, একটা খুব ভাল ফ্রক কিনে আনল তনু, বেশ দাম দিয়েই।

তা দেখে কোথায় খুশি হবে, মা বলে উঠল, এত ভাল জামা, এখন কিনলে কেন, পুজোর সময় কিনে দিলেই তো পারতে।

যেন পুজোর সময় ছাড়া ভাল জামাকাপড় কিনতে নেই, ভাল জুতো পরতে নেই। ওদের ছিল শুধু 'নেই' 'নেই'!

তিতুনের জন্যে ও যখন যা-কিছু করে, এক একসময় মনে হয়, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রতিশোধের ইঙ্গিত আছে। যেন বাঁকা পথের একটা প্রতিবাদ।

হন্যে হয়ে ঘুরে, একে ওকে ধরে, অনেক কষ্টে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়েছে তিতুনকে। যেদিন ফর্মটা পেল, কি আনন্দ। যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে। ভাল স্কুল মানেই ভাল রেজাল্ট, দিব্যি গর্ব করে বলতে পারবে। গর্ব! নিমেষের জন্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে অভিষেকের মনে। ওই স্কুলটায় ভর্তি করতে না পারলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল কেন? সবটাই কি শুধু তিতুনের ভবিষ্যৎ ভেবে? ইংলিশ

মিডিয়াম ছাড়া এখন আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই তাও ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা ইচ্ছেও কি ছিল না, যে স্কুলের নামটা কেউ জিগ্যেস করলে বেশ অহঙ্কারের গলায় শোনাতে পারবে! ইন্টারভিউয়ের সময় নিজের স্কুলের নামটা উচ্চারণ করতে রীতিমত অস্বস্তি হয়েছিল অভিষেকের। সে-কথা বাবাকে বলাও যায় না, ওরা শুধু রেজাল্ট নিয়েই খুশি। জানেই না, চাকরির বাজারে স্কুল-কলেজের নামগুলোরও এক একটা জাত আছে।

তবু কেমন করে যে অভিষেক এমন একটা ভাল চাকরি পেয়ে গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য।

বাবা তো বলে, সবই কুষ্ঠি। হবে হয়তো।

তিতুনের ভর্তির চিঠিখানা পেয়েই ছুটেছিল অভিষেক, সঙ্গে তনুকে নিয়ে। এ-সব স্কুলের কায়দাকানুন তো ভাল জানে না, ভর্তির আগে তো শুধু ছেলেমেয়ের পরীক্ষা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। বাবা-মার ইন্টারভিউও নেয়। পাছে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে কোনও ছেলেমেয়ে ঢুকে পড়ে। টাকা করেছ ঠিক আছে। টাকা দিতে পারবে তাও জানি, কিন্তু এ স্কুলের তো একটা সম্ভ্রম আছে। যাদের সমাজে একটা স্ট্যাটাস আছে তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই যে এখানে পড়ে।

ভর্তিটর্তি করিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরে এল অভিষেক আর তনু। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে।

দুর্গাপ্রসাদ শুনলেন, স্কুলের নামটাও। মুখের হাসিটা সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে এল।

বললেন, সে কি রে? ওখানে তো অনেক খরচ। আমাদের ডি জি এমের মেয়ে পড়ত।

বাবা শুধু ডি জি এম চিনে এসেছে। অভিষেকের চাকরি কি ফ্যালনা নাকি। ও যে মাইনেপত্তর ভালই পায় বাবা তো তা জানে। তবু কৃপণ-কৃপণ স্বভাব গেল না। নাকি সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকতে থাকতে মাথা তুলতেও ভয় পায়।

শেষে অবশ্য বাবা-মা দুজনেই খুব খুশি। তিতুন প্রথমদিন স্কুলে যাবার জন্যে নেভি-ব্লু স্কার্ট আর বুকে ব্যাজ লাগানো সাদা ব্লাউজ পরে এসে দাদু-ঠাকুমাকে প্রণাম করতে এল।

দুর্গাপ্রসাদ হেসে হেসে তিতুনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, তোকে যে একেবারে মেম-বাচ্চা মনে হচ্ছে রে। কি সুন্দর লাগছে!

সুহাসিনী আশীর্বাদ করে বললেন, দাঁড়া দাঁড়া।

বলে ছুটে গিয়ে দইয়ের ভাঁড়ে আঙুল ডুবিয়ে ফিরে এলেন। তিতুনের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিলেন। বললেন, ভাল করে লেখাপড়া করো। বড় হও।

তখন সবাই খুশি, এখন জন্মদিনের কথা শুনেই চমকে উঠছে।

প্রথমটা অবশ্য জন্মদিনের কথা শুনে অভিষেকও চমকে উঠেছিল। পায়েস থেকে পার্টিতে উঠতে একটু তো সময় লাগে। তবু করব করব বলে স্তোক দিতে দিতে দুটো বছর কাটিয়ে দিয়েছে।

এখন আর উপায় নেই। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে গেলে সকলে যা করছে তোমাকেও তা করতে হবে।

বোধহয় অনুপমকে দিয়েই শুরু। তারপর দীপা, তারপর শ্রীলেখা। এখন একে একে সকলেই। বাদ আছে শুধু তিতুন। সুতরাং এবার না করলেই নয়।

স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের আনাআনি করতে তাদের মাদের মধ্যেও বেশ একটা সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, সব স্কুলেই। জ্বর হয়ে একদিন অ্যাবসেন্ট হলে কারও বাড়ি ছোটো 'পড়া' জেনে আসতে অথবা হোম টাস্ক টুকে আনতে। এ ছাড়া টিচারদের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে একজোট হওয়া তো আছেই, যদিও তা শুধু পরস্পরের মধ্যে

আলোচনায় চাপা ক্ষোভ উগরে দিয়েই শেষ হয়ে যায়। অভিযোগ করার উপায় নেই, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ দেবে নষ্ট করে। আবার নিজেদের মধ্যেও যে একটু ঈর্ষা-বিদ্বেষ নেই, তাও নয়। কে ম্যাথ্‌স্‌-এ তিন নম্বর বেশি পেল, এবং কে ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর কম, এবং কেন।

এ-সব সত্ত্বেও বেশ একটা নির্ভেজাল বন্ধুত্বের দল গড়ে উঠেছে তনুদের।

অভিষেক এ-সবের বাইরেই ছিল। দু চারটে কথা কখনও-সখনও কানে আসত, তাও তনু মারফত। দীপা, অনুপম, শ্রীলেখা নামগুলো শুনতে পেত তিতুনের কাছে। শুনে ভুলেও যেত।

তিতুনের মুখে ততদিনে একটু-আধটু ইংরিজি বুলি ফুটছে। তা শুনে শুধু অভিষেক আর তনুই যে বেশ খুশি তা নয়, দুর্গাপ্রসাদের মুখেও কখনও কখনও অবাক উল্লাস দেখা দেয়। সুহাসিনী তো হেসেই অস্থির।—হ্যাঁ রে, তিতুন, এরপর যে আমি তোর সঙ্গে কথাই বলতে পারব না, আমাকেও ইংরিজিটা শিখিয়ে নে।

তিতুন তো একদিন দুর্গাপ্রসাদকেই বলে বসল, তুমি ইংরিজিও জানো না?

দোষের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ 'জি কে' ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি।

তিতুন হোম টাস্কের খাতায় জিরাফের ওপর একটা বারো লাইনের এসে লিখে দুর্গাপ্রসাদকে দেখাতে এসেছিল।—দ্যাখো তো দাদু, ঠিক হয়েছে কি না।

দুর্গাপ্রসাদ টিক মারতে মারতে শেষে বললেন, কিন্তু মা-মণি আসল কথাটাই যে লেখোনি। জিরাফের বাচ্চা যে জন্মানোর দু ঘণ্টা বাদেই চল্লিশ মাইল বেগে দৌড়তে পারে।

তিতুন বলে বসল, উঃ, দেখতে দিয়েছি এসে। তুমি জি কের ক্লাশ নিচ্ছ।

দুর্গাপ্রসাদ অবাক।—জি কে? সেটা আবার কি?

তনু এসে বাঁচাল। হাসতে হাসতে বললে, জি কে মানে জেনারেল নলেজ।

দুর্গাপ্রসাদ অট্টহাসে হেসে পড়লেন তিতুনের কথা শুনে।—তুমি ইংরিজিও জানো না.।

ক্লাশ টেস্টের খাতা নিয়ে এসে পরের সপ্তাহেই তিতুন দুর্গাপ্রসাদকে গিয়ে বললে, দাদু, ইউ আর রাইট, জিরাফের দৌড়নো অনুপম লিখেছিল, দু নম্বর বেশি পেয়েছে!

অভিষেককে বললে, অনুপমকে চেনো না? খুব ব্রাইট, এসেতে দু নম্বর বেশি পেয়েছে।

সেই অনুপমের মা একদিন ছেলের হাত ধরে এসে হাজির!

দরজা খুলে দেখেই তনু অবাক, তারপর দুজনের মুখেই উচ্ছল হাসি।

—কি ব্যাপার রে, হঠাৎ? বাড়ি খুঁজে পেলি?

অনুপমের মা নন্দিতাকে নিয়ে এসে বসল।

—তনুকা শোন, আগামী বুধবার সন্ধে, অনুপমের জন্মদিন, জয়শ্রীকে নিয়ে, যাবি আমাদের বাড়ি।

এই যাওয়াযাওয়ি ব্যাপারগুলো আজকাল কারও তেমন ভাল লাগে না। অথচ ভিতরে ভিতরে ইচ্ছেও করে। গুমোট একঘেয়ে জীবনে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া কার না ভাল লাগে।

তনু খুশিই হল। হেসে একবার বললে, আবার আমাকে কেন? জয়শ্রীকে গিয়ে দিয়ে আসব। পরে গিয়ে নিয়ে আসব।

—তনুকা তুই পাগল নাকি। ওটা তো উপলক্ষ, আসলে সবাই মিলে সেদিন আড্ডা দেব। বলে হাসল নন্দিতা।

সেই শুরু।

তারপর দীপা, শ্রীলেখা। আরও অনেকে। একে একে ওরা সকলে মিলে একটা দল হয়ে গিয়েছিল। জন্মদিনে যাওয়া, উপহার দেওয়া, খাওয়াদাওয়া কিন্তু তার চেয়ে বড়, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া।

শেষে তনুই একদিন অভিষেককে বললে, এবার তিতুনের জন্মদিনে কিন্তু সবাইকে নেমন্তন্ন করতে হবে।

সমাজে থাকতে হলে তো সামাজিক জীব হিসেবেই টিকে থাকতে হয়।

সুতরাং তিতুনের জন্মদিনে একটা ছোটখাটো পার্টি, তার সঙ্গে কাছের আত্মীয়স্বজনও।

বড় ঘরখানা, ঘর বারান্দা, একটা উৎসবের চেহারা নিল। তার পিছনে দুদিনের ছোটাছুটি, বেলুন কেনো, রঙিন কাগজের রিবন কেনো, গোলাপের তোড়া, তিতুন ওরফে জয়শ্রীর বন্ধুদের জন্যে গিফটপ্যাকেট নিয়ে এসো নিউ মার্কেট থেকে। তারপর মেনু ঠিক করো।

জনা পনেরো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে মিলে বাড়িটাকে একটা দিনের জন্যে যেন হুল্লোড়ের মেলা বানিয়ে তুলল।

শেষে খেয়েদেয়ে বিদায় নেবার পর, উপহারের রাশি এক ধারে স্তূপীকৃত পড়ে আছে, দুর্গাপ্রসাদ খেতে বসলেন, টেবিলে।

সুহাসিনীকে একটা বড় প্লেটে সব সাজিয়ে দিল তনু, উনি সেটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, একা একা বসে খাবেন। স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে একসঙ্গে বসে খেতে এখনও ওঁর অস্বস্তি।

এ-বাড়িতে আগে কখনও এমন হই-হল্লার জন্মদিন হয়নি বলেই দুর্গাপ্রসাদ কখনও এই আনন্দের স্বাদও পাননি। চিরকাল এই মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুঁ দেওয়া, ইয়াব্বড় একটা কেক কাটা, সব অবশ্য জানতেনই না, তবু শোনা কথার জন্মদিনে পার্টিফার্টিকে সাহেবিয়ানা ভেবে এসেছেন। কিন্তু এখন বেশ ভালই তো লাগছে।

ফিশফ্রাইয়ে কামড় দিতে দিতে বললেন, তিতুনভাইয়া, তোমার তো দেখি অনেক বন্ধু। ছেলেবন্ধুও আছে দেখছি।

ইঙ্গিতটা তিতুন বুঝতেই পারল না, কিন্তু তনুর ভুরু কুঁচকে উঠল। এ-ধরনের বিসদৃশ রসিকতা, বিশেষ করে তিতুনের সামনে, তনুর একেবারেই পছন্দ নয়।

ওঁদের পছন্দ-অপছন্দ তনু খুব ভাল করেই জানে, জানে বলেই তিতুনকে ভর্তি করার সময় একটু আশঙ্কাও ছিল। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে বলে আপত্তি করে বসে সব ভেস্তে না দেয়।

দুর্গাপ্রসাদ 'ছেলেবন্ধু' কথাটা বলে ফেলেই হয়তো বুঝতে পারলেন বলা উচিত হয়নি।

লুচি-মাংস খেতে খেতে বললেন, কত কি পেয়েছিস রে, দেখা একটু।

উপহারের রাশি একপ্রান্তে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল, সেদিকে এক নিমেষের জন্যে তাকিয়ে নিয়ে তিতুন বললে, দাদু প্লিজ়, আজ বড্ড টায়ার্ড, কাল দেখাব।

উপস্থিত সকলেই হেসে ফেলল। তনুও। তারপর ধমকের স্বরে বললে, দেখা না।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে দুর্গাপ্রসাদের। হাতমুখ ধুয়ে এসে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। মুখে বেশ তৃপ্তির হাসি। আজকের দিনটা ওঁর আনন্দে কাটল।

বাড়িতে এ-ধরনের কোনও উৎসবটুৎসব হলে তবেই তো মনে হয় জীবনকে নিঙড়ে নিয়ে উপভোগ করছি। তা না হলে শুধুই একঘেয়েমির জাঁতা ঘোরানো।

দুর্গাপ্রসাদ সারাজীবন শুধু ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়েই কাটিয়ে এসেছেন। অপব্যয় সামলে সামলে ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন। ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে,

তবু তাদেরও সাবধান করতে যান অভ্যাসদোষে। কেন এত বাজে খরচ করতে যাস। থাকলে তো তোরই থাকবে।

কিন্তু আজকের দিনটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। সারাটা দিন বেশ উপভোগ করেছেন। তিতুন গান গাইল, শুনে তো মুগ্ধ। গানের স্কুলে যাতায়াত করে এটুকু জানতেন, এমন ভাল গাইতে পারে জানা ছিল না। একটা ছেলে কি চমৎকার সব ক্যারিকেচার করছিল। সবাই হেসে লুটোপুটি। আসলে পৃথিবীটা কখন যে ওঁর পায়ের তলা দিয়ে একেবারে পাল্টে গেছে টেরই পাননি।

এখন যেন মনে হচ্ছে অপব্যয়টাই আনন্দ। শুধু জমিয়ে গেলে জীবনের ঘরটাই যে শূন্য হয়ে যায়, জমেও না কিছু। তার চেয়ে এই অপব্যয় জীবনকে অন্তত ভরিয়ে দিতে পারে।

তবু অভ্যাস যাবে কোথায়। তিতুন কি কি উপহার পেল তা দেখার, জানার আগ্রহ চাপতে পারছেন না।

খাওয়া শেষ করে সুহাসিনীও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

দুর্গাপ্রসাদ তখন গিফট-প্যাকেটগুলোর ওপর আলতোভাবে হাত বোলাচ্ছেন। তাই চোখ গেল। —এত সব পেয়েছিস, তোর তো ঘর ভরে গেল রে।

বেশ খুশি। কিন্তু আগ্রহ ওঁর অন্যদিকে। দু-চারজন খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কেও বলা হয়েছিল। তারা কে কি দিয়েছে। এ-সব হিসেব রাখতে হয়। ওদের বাড়িতেও কোনও দিন এ-ধরনের জন্মদিনে নেমন্তন্ন পেলে কাকে কি দিতে হবে, কত দামের, তার একটা হদিস মিলবে এখন দেখে রাখলে। পেতে আর কার না আনন্দ হয়, তখন আর খেয়াল থাকে না একদিন দিতেও হবে।

তিতুন উপহার পাওয়া একটা ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সেজন্যেই দাদুর কথাগুলো শুনেও শুনছিল না। বইটায় মন বসে গিয়েছিল তাই : দাদু প্লিজ, আজ বড্ড টায়ার্ড।

এবার উঠে এল। বললে, সরো দেখাচ্ছি।

আসলে ও নিজেও ভাল করে সব দেখেনি এখনও। এত ছোটাছুটি দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে যে, সত্যি ক্লান্ত। দাদু উপহারের প্যাকেটগুলি খোঁচাখুঁচি করছে দেখে নিজেই এল। দাদুর ওপর কোনও বিশ্বাস নেই, হয়তো কোনওটা ছিঁড়ে ফেলবে কিংবা ভেঙে ফেলবে।

তনুর আবার তিতুনের ওপর বিশ্বাস নেই। বললে, সর, আমি দেখাচ্ছি।

একটা একটা করে খুলে দেখাচ্ছিল তনু। তিতুন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল, হাতে নিয়েই নামিয়ে রাখছিল। ক্ষোভ মা ওকে সরিয়ে দিল বলে। যেন ও আর এটুকু করতে পারত না। শুধু তো প্যাকেট খোলা।

দুর্গাপ্রসাদ দেখতে দেখতে বেশ প্রসন্ন হচ্ছিলেন।

বললেন, বাবা, উপহার দিতেও আজকাল দেখছি অনেক মাথা খাটাতে হয়।

অভিষেক পাশেই একটা চেয়ারে পা লম্বা করে ড্যামনড় টায়ার্ড।

তার দিকে তাকিয়ে দুর্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের সময় তো কিছুই ছিল না, তোদের সময়েও কি এতসব জিনিস পাওয়া যেত নাকি।

সেই যে কানে লেগে আছে 'তোমরা কিছুই করোনি, কিচ্ছু করোনি আমাদের জন্যে', বোধহয় তারই জবাবে স্তোক দিতে চাইলেন।

অভিষেক চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল। কিছুই ছিল না, কিছুই পাওয়া যেত না, এ ধরনের কথা বহুবার শুনেছে। তবু বিশ্বাস হয়নি, বিশ্বাস হয় না। ও সব ওদের মনগড়া

কথা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তিতুন নিজের হাতেই একটা রঙিন প্যাকেট খুলে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে।—গ্র্যান্ড।

ভাল করে ঘুঁটিগুলো দেখতে দেখতে বললে, এটাই বেস্ট, বুঝলে দাদু।

দুর্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, কি ওটা ?

—তাও জানো না ? এটা চেসবোর্ড। চেস খেলার পুরো সেট। ঘুঁটিগুলো কি সুন্দর দ্যাখো।

দুর্গাপ্রসাদ বললেন, দাবা ? একটু থেমে, কর্মনাশা।

দুই

সুনির্মল বড় কোম্পানির চৌকস অফিসার। তার বাবা ছিলেন একটা স্কুলের হেডমাস্টার, কিন্তু ছেলেকে পড়িয়েছিলেন অন্য ভাল স্কুলে। কিন্তু ছেলের লেখাপড়ার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল ষোলো আনা। সুনির্মলের নিজস্ব বুদ্ধি এবং মেধাও কম ছিল না। তার ফলে সুনির্মলের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার অত্যুজ্জ্বল না হলেও চোখে পড়ার মত। আর হেডমাস্টারের ছেলে হলেও বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকা গুড বয় ছিল না ও। এই বয়েসেও দিব্যি স্মার্ট।

ওর বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে বড় হয়ে কোনও বড় কলেজের অধ্যাপক হবে। সারা জীবন স্কুলে চাকরি করতে করতে অধ্যাপকদের সম্পর্কে তাঁর একটু হীনমন্যতা ছিল কি না কে জানে। তবে মনে মনে তাঁর একটা উচ্চাশাও ছিল, যদি আই এ এস হতে পারে, তা হলে তো কথাই নেই।

সুনির্মল প্রাকটিক্যাল মানুষ। স্কুলে ছাত্র ঠ্যাঙানো বা কলেজে ছাত্র ভোলানো কোনওটিকেই ও সম্মানজনক বলে মনে করতে পারেনি। বাবার সামাজিক তাকে কোনও দিনই আপ্লুত করতে পারেনি, মার মুখের ক্লিষ্ট বলিরেখায় সংসারের আর্থিক বিপন্নতা পড়ে এসেছে ছেলেবেলা থেকেই। তাই বাবার স্বপ্ন বা আশা পূরণ করার দিকে তার আদৌ কোনও দৃষ্টি ছিল না। বাধাও আসেনি, কারণ বাবা তার আগেই গত।

খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকার জন্যে কোনও তদ্বির তোষামোদ বা বাজার সরকারি করতে হয়নি সুনির্মলকে। পাঁচ ছটা জায়গায় দরখাস্ত করেছে। ইন্টারভিউ পেয়েছে সব কটিতেই, একটা কোম্পানিতে সম্ভাবনা ছিল, কলকাতার বাইরে গেলে, নেয়নি। কারণ তার আগেই এ চাকরিটা পেয়ে গেল। এই কবছরে সেখানেই বেশ ওপর তলায় পৌঁছে গেছে।

কোম্পানির ফ্ল্যাট নয়, নিজেই জোগাড় করেছিল দালাল লাগিয়ে। বেশ বড় ফ্ল্যাট, ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং—রুম নয়, হল ; অতিদীর্ঘ এবং নাতিপ্রশস্ত। বিধবা মা সম্ভবত ওদের আধুনিক হালচাল বরদাস্ত করতে পারেন না বলেই অধিকাংশ সময় ছোট ছেলের কাছেই থাকেন। কদাচিৎ এসে একটা মাস কাটিয়ে যান।

একদিন নন্দিতাকে বলেছিলেন, যাই বলো বাপু, তোমাদের এখানে কেমন হোটেল হোটেল লাগে।

নন্দিতা হেসে ফেলেছিল। এত সুন্দর ফ্ল্যাট, কত লোকের ঈর্ষা জাগায়, তাও নাকি পছন্দ নয়।

পছন্দ যে নয় তাতে নন্দিতাই নিশ্চিন্ত।

তবু মনমরা ভাবে বললে, কেন মা, সবাই তো বলে এত সুন্দর ফ্ল্যাট।

বড় বউমার ওপর ওঁর কোনও শাসন খাটে না, তাই যেটুকু বলার মুখে হাসি এনেই বলতে হয়। নন্দিতাকে দোষ দিয়ে কি হবে, ছেলে সুনির্মলই পর হয়ে গেছে। আসলে যা-কিছু ওঁর আপন আপন মনে হয়, তার কোনওটাই সুনির্মলের পছন্দ নয়। তা নিয়ে বুড়ো বাপের সঙ্গেই একসময় তর্কাতর্কি করে বসত। অবশ্য ওরা যদি এতে সুখ পায় তো পাক না। সুখে থাক, ভাল থাক, তা হলেই আমি খুশি। তা বলে আমার যা মনে হয়, মুখ ফুটে তা বলব না কেন? মুখ বেঁকিয়ে নাক সিঁটকে না বলে মুখ হাসি হাসি করে বলে ফেলেন।

বললেন, যার কাছে সুন্দর তার কাছে সুন্দর। তোমাদের যখন ভাল মনে হয় আমার কিছু বলার নেই।

নন্দিতাও সমান চালাক, মোটেই চটে না। ও তো জানে শাশুড়ির এখানে বেশি দিন থাকা পোসাবে না। তাই সদাসর্বদা 'মা' 'মা' করে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। আবার বেশি সমীহ করা, ভালবাসা দেখানো সেও যে উচিত নয়, তাও বোঝে। কি জানি বাবা, শেষে এখান থেকে আর নড়তে না চায় যদি। দু-চারদিনের জন্যে আসো, সুতরাং আদরযত্ন করব না কেন। কিন্তু সেই আদর যত্নের সুযোগ নিয়ে এমন চমৎকার ফ্ল্যাটকে বলে দিল কি না হোটেল হোটেল! আসলে বোধহয় রান্নার লোক আছে, কাজের মেয়ে আছে সেজন্যেই। সারা জীবন তো নিজে রান্না করেছেন, এখনও ইচ্ছে নন্দিতা নিজের হাতে পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করে ছেলেকে খাওয়াক। আহা রে, সুনির্মলের, মানে হাবলুর, বড় খাওয়ার কষ্ট। রান্নার লোকটা তো বড়িপোস্ত কি দুধসুক্তো রাঁধতেই জানে না।

সে-কথা তো শাশুড়ির বলার সাহস নেই, বললেন কি না হোটেল হোটেল।

নন্দিতা প্রতিবাদ করতেই বুঝলেন কথাটা বলা উচিত হয়নি। তাই একটু নরম করার চেষ্টায় ব্যাখ্যা দিলেন, হোটেল হোটেল কি সাধে বলছি, দেখলেই মনে হয় বাড়ির লোক দুদিন থেকেই চলে যাবে। বাড়ি এমন হবে যে বাইরে বেরোতে গেলে আঁচল ধরে টানবে। এ হল গিয়ে তোমার আসুন-বসুন।

নন্দিতা কিছুই বলেনি।

এ মানুষকে কিই বা বলা যায়। এঁদো গলির একটা বাড়িতে চল্লিশ বছর কাটিয়েছিলেন, এ-সব ফ্ল্যাটের মানমর্যাদা ওঁর জ্ঞানগম্যির বাইরে।

দেখলে মনে হয় বাড়ির লোক দুদিন থেকেই চলে যাবে। হোটেল হোটেল!

দুদিন থেকে চলে যাওয়ারই তো বাসনা নন্দিতার। সুনির্মলেরও। একটা প্রোমোশন পেয়েছে না কিছুদিন আগে। একটা অফিসের গাড়িও পেয়েছে বেশ কিছুদিন হল।

সুনির্মলই কথাটা প্রথম বলেছিল। আরেকটু বড় ফ্ল্যাট নিলে কেমন হয়, ভাড়াটা অফিস থেকেই পাব। মাসে মাসে টাকাটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

নন্দিতা সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছে, সে কি, নিচ্ছ না কেন? সত্যি, আরেকটু বড় ফ্ল্যাট না হলে, অনু তো বড় হচ্ছে...

যেন অনুপম এই ফ্ল্যাটের অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে, হাত পা ছড়াবার জন্যে তার আরও বেশি জায়গা দরকার।

সুনির্মল হেসে বলেছে, ওর তো এখনই দু-দুখানা ঘর। একটা স্টাডি, আরেকটা শোবার ঘর।

—বাঃ রে, যখন কোনও লোকজন আসে, দেখেছ ওর টিউটর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ায়, কি অস্বস্তি লাগে! বড় ফ্ল্যাট হলে ওর পড়ার ঘরখানা একটু দূরে হবে। এখানে এসে কেউ হো হো করে হেসে উঠলে ও বেচারিরও তো অসুবিধে হয়।

সেই তখন থেকেই মনে মনে নন্দিতার একটা ধারণা হয়েছে, এ-ফ্ল্যাটে ওরা দু চারদিনের জন্যেই আছে, একটা বড় ফ্ল্যাটের খবর পেলেই...

কিন্তু শাশুড়ি বলল বলেই গায়ে ফোস্কা পড়ল। ফ্ল্যাটের দোষ কি, না উনি যখন ছোটছেলের কাছে ফিরে যান তখন ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং-এর আসবাবপত্রগুলো ওঁর আঁচল ধরে টানে না।

আসলে এ-বাড়ির কোনটা ওঁর অপছন্দ তা নন্দিতা ভালই জানে। এই যে ঘর-সংসারের কাজকর্মে সুবিধে বলে শালোয়ার-কামিজ পরে, বেরোবার সময়ও এক একদিন, ওড়না জড়িয়ে, সে-সব ওঁর দুচক্ষের বিষ। উনি যে ক'দিন থাকেন, রাতে নাইটি পরে না। দেখলে তো ভিরমি খাবেন। লেসের কাজ করা সাদার ওপর সাদা নকশা একটা নাইটি আছে নন্দিতার। ও জানে, নাইটিটায় জাদু আছে। অথচ যে-কদিন এই শাশুড়ি ঠাকুরুন এ-বাড়িতে থাকেন, পরার উপায় নেই।

নন্দিতা পরেনি, ওয়ার্ডরোব খুলতেই দেখতে পেয়েছিলেন, হ্যাঙারে টাঙানো ছিল। কৌতূহল হতে হাতে নিয়ে দেখলেন। নন্দিতা লুকোতে পারেনি, লুকোতে চায়ওনি।

এমন একটা অভব্য মন্তব্য করে বসলেন, এ-সব উলঙ্গবাহার পোশাক যে তোমরা কোথায় পাও!

উনি এখানে যে-কটা দিন থাকেন, নন্দিতা গোলাপি নাইটিটাও পরতে পারে না। বিরক্তিতে সুনির্মলের ভুরু কুঁচকে ওঠে তবু।

কপাটে খিল দিয়েও স্বস্তি নেই, হঠাৎ এসে দরজায় ঠুকঠুক করবে, বউমা, অম্বলের ওষুধ আছে কিছু, বড্ড অম্বল হয়েছে।

বিদেয় হলেই বাঁচে নন্দিতা। মুশকিল শুধু অনুপমকে নিয়ে। যে-কদিন থাকেন লেখাপড়া ভুলে অনুপমের কেবল ঠাম্মা ঠাম্মা। চলে যাবার পর বেশ কদিন মনমরা থাকে।

সুনির্মলকে বলতেই সেই বাঁধা রসিকতা, ওয়ান চাইল্ড ফ্যামিলিতে চাইল্ডরা একটু মনমরাই থাকে। ওকে বরং একটা সঙ্গী এনে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা হেসে ফেলে বলেছে, রক্ষে করো। আমার অত শখ নেই।

সঙ্গী না আনার প্ল্যান সুনির্মলেরও। একবার বলেছিল, নট নাও।

তার কারণ ওই অনুপমই।

নিজেদের সাধ-আহ্লাদ অনেকখানি মিটেছে, বাকি স্বপ্নটপ্নও একদিন মিটে যাবে। কিন্তু এখন ওদের যাবতীয় ধ্যানজ্ঞান অনুপম। অনুপমকে এমনভাবে মানুষ করতে হবে যাতে সে সুনির্মলকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অনুপমের কাছ থেকে ওদের দুজনেরই একটাই চাহিদা—গর্ব।

তার জন্যে এই এত অল্প বয়েস থেকেই সুনির্মল আর নন্দিতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ওকে ব্রিলিয়েন্ট করে তুলতে হবেই।

ওদের দৃষ্টিতে অনুপম সত্যি ব্রিলিয়েন্ট। সব কটা সেকশন মিলিয়ে ক্লাশের ফার্স্ট বয় শুধু নয়, যেই সেকেন্ড হোক না কেন, বারো তেরো নম্বর কম।

টিচারদের মুখে : ভেরি ব্রাইট।

নন্দিতার মামাশ্বশুর একদিন এসেছিলেন। শব্দ করে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, ছেলে লেখাপড়ায় কেমন ? সুনির্মলের মত হতে পারবে তো!

নন্দিতা হেসে বলেছে, আপনার ভাগ্নে আবার কবে ফার্স্ট হয়েছে!

অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ভাল হলেও সুনির্মল কোনওদিন ফার্স্ট বয় ছিল না।

পাছে মামাশ্বশুর অবিশ্বাস করে বসেন তাই প্রোগ্রেস রিপোর্টটা এনে দেখাল।

পাঁচ-পাঁচটা সাবজেক্টে হায়েস্ট মার্ক্স যা দেখানো আছে তার সব কটা অনুপমেরই। প্রতি বছরই অঙ্কে একশোয় একশো, একবার ছিয়ানব্বই পেয়েছিল বলে সারা বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

সুনির্মলের মুখ গম্ভীর, তুমি ওর পড়াশুনো কিছুই দ্যাখো না।

অথচ এখন নন্দিতার সারাটা দিনই কেটে যায় ছেলে ছেলে করে।

একসময় এই ফ্ল্যাটে এসে নন্দিতা সারা দুপুর বোরড্। লোনলি। একা একা ওর কান্না পেয়ে যেত। কি যে করবে, কি করে সময় কাটাবে খুঁজে পেত না।

শেষে সঙ্গী এল একটা ভি সি আর। দিনে দুটো তিনটে করে ক্যাসেট আনছে। টিভিতে কোনও ভাল ছবি দেখলেই রেকর্ড করে রাখছে। এক ছবি তিনবার দেখা।

তারপর অনুপমকে স্কুলে ভর্তি করে মনে হল, ও নিজেই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, সুনির্মলের অফিসের গাড়িতে অবশ্য। তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে কাজের ফাঁকে নিয়ে বসছে। অঙ্ক করো, হোম টাস্ক করো, হাতের লেখা আরও ভাল হচ্ছে না কেন। তখন তো টিউটর ছিল না।

অনুপমের স্কুলের পরীক্ষা নয়, যেন নন্দিতাকেই পরীক্ষা দিতে হবে সুনির্মলের কাছে। সে যে কি টেনশন, কি ভয়।

নন্দিতা এম-এ পাশ ঠিকই, কিন্তু নামতা মুখস্থ করা নন্দিতাকে টেবল্স্ শিখতে হয়েছে অনুপমের জন্যেই। টু টু জা ফোর, টু থ্রি জা সিক্স।

প্রথম বছরেই ক্লাসে ফার্স্ট হল অনুপম, আর নন্দিতার মনে হল ও নিজেই ফার্স্ট হয়েছে। সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। গর্বে বুক ভরে উঠল ওর। সুনির্মলের কাছে ওর দাম যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে।

—জানো মা, ওই ছেলেটা, অনুপম দত্ত, ও ফার্স্ট হয়েছে।

স্কুল থেকে অনুপমকে নিয়ে সবে গ্যেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসছে, ওদের বয়েসি একটা বাচ্চা মেয়ে তার মাকে বললে অনুপমের দিকে আঙুল দেখিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল, অনুপমকে পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বললে, তুমি ফার্স্ট হয়েছ ?

আলাপ ছিল না, আলাপ হয়ে গেল। তনুকা। ভারী মিষ্টি নাম। আর তার মেয়ে জয়শ্রী। তার জন্মদিনে গিয়ে তবেই জানতে পেরেছিল ডাক নাম তিতুন। তবে জয়শ্রী নামেই ওকে সকলে চেনে।

একটা কৃষ্ণঘন নাক থ্যাবড়া ফ্রকপরা মেয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

তিতুন বললে, জানো মা, ওরা না ট্রাইবেল। খ্রিস্টান।

বলেই জিগ্যেস করল, খ্রিস্টান কি মা ?

তিতুনকে বোঝানোর মত উত্তর হয়তো মুখে জোগাল না, কিংবা উত্তর দেয়া বাহুল্য মনে হল।

নন্দিতার সেদিন খুব ভাল লাগছিল। বাঁ হাতে অনুপমের প্রগ্রেস রিপোর্ট, আর ডান হাতে অনুপমের হাত ধরে বেরিয়ে আসছে।

চারপাশে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর তাদের মা, হাঁটতে হাঁটতে চেনামুখদের সঙ্গে গল্প হয় প্রতিদিনই। কিন্তু কেউ কোনও দিনই নন্দিতাকে একটু বেশি মর্যাদা দেয়নি। শুধু যে-কজনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা জমে গিয়েছিল, তারা কখনও কখনও বলেছে, তোমার আর চিন্তা কি, তোমার ছেলে তো ব্রাইট। আসলে ওদের সামনেই কোনও এক আন্টি বলেছিল কথাটা। তাই।

নন্দিতা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তখন মনের মধ্যে একটা ভীতি ছিল। কি

জানি কি হয়। ক্লাশ-পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া আর ফাইনালে ফার্স্ট হওয়া এক নয়।

সুনির্মল ছেলের পড়াশুনোর দিকে কখনও তেমন নজর দেয় না। নন্দিতা না জানলে, জানবে কি করে, আজকালকার রীতিনীতিই তো অন্যরকম, তখন অনুপমকে পাঠায় সুনির্মলের কাছে। —যা বাপিকে গিয়ে জিগ্যেস করে আয়।

সুনির্মল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তিনবার প্রশ্ন করলে একবার কানে যায়, কিছু একটা উত্তর দেয়, কিংবা বলে 'পরে, পরে'। বলে টাইম কিংবা নিউজ উইকের পাতায় মগ্ন হয়। নন্দিতার তো ধারণা, স্বামীর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার যতই ভাল হোক, অনুপমের প্রশ্নের উত্তর অনেকসময় তার মুখে জোগাচ্ছে না। ফলে নন্দিতাকেই গিয়ে জেনে নিতে হয় অন্য কারও কাছে, কিংবা টিচারদের কাছে গিয়ে। অনুপম উইকলি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেত বলেই তারা নন্দিতাকে একটু খাতির করত।

ওর লেখাপড়ার খবরাখবর সুনির্মল ওপর-ওপরই রাখত। যেন যাবতীয় দায়িত্ব নন্দিতার। অথচ আশা করত ছেলে ওর চেয়েও ব্রিলিয়েন্ট হয়ে উঠবে।

সেজন্যে একটা চাপা ক্ষোভ নন্দিতার মনে ছিলই। দু-একবার বলতেও কসুর করেনি। 'তোমার তো ধারণা শুধু ভাল স্কুলে ভর্তি করলেই, দরকার মত টাকা-পয়সা খরচ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।'

—তুমিও তো এম এ পাশ!

তবে আর কি। স্বামীগুলো বোধহয় সে-জন্যেই একালে গ্র্যাজুয়েট বউ পাওয়ার জন্যে কাঙাল। ছেলেমেয়ের সব দায়দায়িত্ব দিব্যি তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যায়।

সুনির্মল একদিন অনুপমকে প্রশ্ন করেছিল, অনু, ফার্স্ট হতে পারবে তো? ফার্স্ট হওয়া চাই কিন্তু।

প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল নন্দিতার।

অনুপম তার আগে অতশত ভাবত না। মন দিয়ে পড়াশুনো করত। ফার্স্ট হওয়া যে বিশেষ কিছু তাও ভাবত না।

কিন্তু বাপির কাছ থেকে ওই কথাটা শোনার পর থেকে পরীক্ষার কথা উঠলেই ওর মুখে কেমন একটা ভয়ের ছাপ পড়ত। —মা, ফার্স্ট হতে পারব তো?

কখনও বলেছে, ফার্স্ট না হলে বাপি খুব রেগে যাবে, না মা?

শেষে সত্যি সত্যি ফার্স্ট হ'ল অনুপম।

নন্দিতার সে কি আনন্দ, বুকের ভিতরে গর্বে একটা ঢাউস বেলুন যেন ফুলে ফুলে উঠছে। আনন্দের আতিশয্যে অনুপমের গালে একটা চুমুই খেয়ে ফেলল। তারপর সন্দিগ্ধ হয়ে আবার প্রগ্রেস রিপোর্টটা দেখল। হ্যাঁ, ফার্স্ট।

স্কুল থেকে বেরোবার সময় তো চারপাশ থেকে চেনা-অচেনা সবাই ছেঁকে ধরেছে। অনুপম নয়, নন্দিতাই যেন বিশেষ কেউ হয়ে উঠেছে।

ভালই লাগছিল, কেউ কেউ রিপোর্টটা দেখতে চাইছিল বলে।

সেদিন, সেই প্রথমবার, যেন যুদ্ধ জয় করে বাড়ি ফিরল। ফিরে এসে, তখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি, সোজা ফোন করল সুনির্মলের অফিসে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গলা শুনতে পেয়েই হাসতে হাসতে বললে, ফার্স্ট, অনুপম ফার্স্ট হয়েছে।

নন্দিতা আশা করেছিল সুনির্মল বলবে, সবই তোমার ক্রেডিট, সারাদিন যেভাবে ওর পিছনে লেগে ছিলে।

কথাটা মিথ্যেও নয়। নন্দিতা তো জীবনের সব সুখ আনন্দ বিসর্জন দিয়েছে শুধু অনুপমকে তার বড় হওয়ার রাস্তায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। লক্ষ্য একটাই। রেজাল্ট। আর কিছু নয়। শুধু রেজাল্ট।

অথচ সুনির্মল খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাল না। টোটাল কত ?

নন্দিতা জানাল।

তারপরই : জানতাম। ও তো দারুণ ইনটেলিজেন্ট, তা ছাড়া মেমারিও দিব্যি শার্প।

নন্দিতার নিজেরও তাই ধারণা। তা ছাড়া ও খুব স্টুডিয়াস। কিন্তু যে-সব ছেলেমেয়ে দেখে, তাদের তুলনায় অনুপম যে অনেক বেশি ইনটেলিজেন্ট, তা তো জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে। ছেলের প্রশংসা তার বাপির মুখে হলেও শুনতে ভাল লাগল।

কিন্তু তা বলে সুনির্মল ওর ঐকান্তিক চেষ্টা, বলতে গেলে, সাধনাকে কোনও দামই দিল না ?

ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল নন্দিতার।

তার পর থেকে প্রতিবছর কি টেনশনে ভুগেছে ও। রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে। সামান্য একটা তিন নম্বরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার জন্যে কি ছোটাছুটি।

আর কি ভয়। এবারও ফার্স্ট হবে তো অনুপম। না হতে পারলে যেন নন্দিতা একটা উঁচু আসন থেকে ধপাস করে নীচে পড়ে যাবে।

রসিকতা করে জয়শ্রীর মা তনুকাকে বলেছিল, তোরা যে আমাকে ভি আই পি বানিয়ে দিলি, ছেলে ফার্স্ট হয়েছে বলে।

কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল আমার এই ভি আই পির আসনটা যেন টাল না খায়। তার জন্যে কখনও কখনও অনুপমের ওপরও হয়তো অত্যাচার করে বসেছে। পড়া, পড়া, পড়া। যেন তার বাইরে আর কোনও জগৎ নেই।

ফার্স্ট, ফার্স্ট, ফার্স্ট।

সবাই অবধারিত জানে, অনুপম ফার্স্ট হবে।

জানে না শুধু একজনই। নন্দিতা। সারা বছর ওর কেটে গেছে একটা চাপা ভয় নিয়ে। বছরের পর বছর।

আনন্দ এটুকুই, প্রোগ্রেস রিপোর্টটা হাতে পেয়ে। সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অনুপমের দিকে। নন্দিতার দিকে। রিপোর্ট দেখতে চাইছে। তুমি নিজে পড়াও ? টিউটর রাখোনি ?

একটু ওপরের ক্লাশে পৌঁছে নন্দিতা একদিন সুনির্মলকে বললে, তুমিও একটু না দেখলে...

—কেন, ভাল টিউটর রেখে দাও। যা লাগে...

টাকা দিলেই যেন সব হয়।

নন্দিতার ভালও লাগে, ভাবতে ভাল লাগে ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে ও সব সুখ বিসর্জন দিয়েছে। স্বার্থত্যাগের আনন্দ। ছেলে বড় হবে, মাথা তুলে দাঁড়াবে। সুনির্মলের চেয়েও আরও উঁচুতে মাথা তুলে।

ভিতরে ভিতরে, নিজেরই অজান্তে, ও বোধহয় সুনির্মলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিল। যেন সুনির্মলের প্রতিদ্বন্দ্বী করে দাঁড় করাতে চায় অনুপমকেই।

মামাশ্বশুরের কথাগুলো সে জন্যে ভাল লাগেনি।

তখন তো অনুপম একটু উঁচু ক্লাশে। পর পর ফার্স্ট হয়ে আসছে। একটা বছর দশেকের ছেলের গর্বে নন্দিতার বুক ভরে আছে।

মামাশ্বশুর এসে ছেলে কেমন লেখাপড়া করছে জানতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসির ফুলঝুরি ছড়িয়ে প্রোগ্রেস রিপোর্টখানা এনে দেখাল। মুখে বললে, ও তো বরাবর ফার্স্টই হয়, এবারও হয়েছে।

রিপোর্টখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মামাশ্বশুর, দু-তিনবার বাঃ বাঃ করলেন।

অনুপমকে আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বড় হও।

তারপর নন্দিতাকে : জানো বউমা, এই ফার্স্ট হওয়াটা কিছু নয়।

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল নন্দিতা। কিছু নয় ?

মামাশ্বশুর বললেন, বয়েস তো কম হল না আমার। একটা কথা কি জানো, সব বাবা-মাকে দেখেছি, ভেবে বসে ছেলে তার প্রডিজি। ভীষণ চালাক, দারুণ বুদ্ধি, বিরাট প্রতিভা।

হাসতে হাসতে বললেন, কোনও বাড়িতে দু-চার বছরের বাচ্চা থাকলে আমি সে বাড়িতে যাই না। কেন জানো ? হাসি চাপতে পারি না বলে।

ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ, তবু একটু কৌতূহল দেখাতে হল হাসিমুখে।

—কেন ?

মামাশ্বশুর আবার হাসলেন। বললেন, গেলেই দেখবে সে-বেচারার বাবা-মার কি অত্যাচার। সে-বেচারির তখন খেলার দিকে মন, জোর করে টেনে এনে বলবে, সেই ছড়াটা শুনিয়ে দাও তো কাকুকে।

একটু থেমে বললেন, উদ্ভট উচ্চারণ, কিংবা মাঝপথে ভুলে যাবে, তোমাকে হাসি চাপতে হবে, আর ছেলেটা ধমক খাবে।

নিজের মনেই যেন বললেন আবার, না হয় ভালই আবৃত্তি করল, তাতে কি এসে যায় ! সত্যি সত্যি সে তো আর প্রডিজি নয়। কেউ প্রডিজি নয়। একটু বড় হলেই...

নন্দিতা প্রতিবাদ করল। —আপনি দেখেননি তাই বলছেন। আমার ছেলের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু ওদের সঙ্গেই পড়ে, জয়শ্রী, তার মা তনুকা আমার বন্ধু। ওইটুকুন একটা মেয়ে, কি যে দারুণ দাবা খেলে ভাবতে পারবেন না। আন্ডার-টেন কমপিটিশনে নেমেছিল, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রডিজি নয় ?

হাসতে হাসতে বললে, তার জন্মদিনে আমি একবার একটা দারুণ সুন্দর এক চেসসেট উপহার দিয়েছিলাম। তখনও চ্যাম্পিয়ন হয়নি। খুব ভাল খেলে, সে-কথা শুনেই দিয়েছিলাম।

মামাশ্বশুরটি নিছক জন্ম-সিনিক।

বললেন, দেখা যাক্।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এই যে তুমি আনন্দ করছ, ফার্স্ট, ফার্স্ট, ফার্স্ট। আনন্দ আমারও হচ্ছে বউমা, অস্বীকার করব না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, শেষ অবধি হবেটা কি ? একটা ভাল চাকরি, এই তো !

মামাশ্বশুরকে বিদায় দিয়ে কপাটে সজোরে খিল দিয়ে মনে মনে বলেছিল, হতচ্ছাড়া।

সুনির্মল ফিরে আসতে মামাশ্বশুরের কথাগুলো ক্যারিকেচার করে বর্ণনা করে গেল। সব শেষে : তোমার মামা।

নন্দিতার এই মামাশ্বশুর সম্পর্কে সুনির্মলও খুব শ্রদ্ধাপ্লুত নয়।

শুনে বললে, নিজের ছেলেদের একটাকেও তো মানুষ করতে পারেনি, পরের ভাল সহ্য হবে কেন।

তারপর : খুব বড় একটা চাকরি পাওয়া যেন কিছুই নয়। সাকশেস কাকে বলে ওরা জানেই না। ওপর ওঠা মানে পাওয়ার, নীচে থাকা মানে শুধুই তোষামোদ।

একটু চুপ করে থেকে বললে, আমার ছেলেকে আমি এমন করতে চাই, যে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

চাও ? নন্দিতার মনের মধ্যে একটা হাসি খেলে গেল।

তিন

তিতুনের দাবার নেশাটা দুর্গাপ্রসাদ প্রথম প্রথম ভাল চোখে দেখতেন না। এখনও যে খুব একটা প্রশ্রয় দেন তাও নয়।

শহুরে মানুষ, দাবা সম্পর্কে একটা বাজে ধারণা গড়ে উঠেছিল পুরনো দিনের সিনেমা দেখে। বাংলা সিনেমায় গ্রাম কিংবা গ্রাম্য জমিদারবাড়ি নিয়ে কোনও গল্প থাকলেই আত্মভোলা একজন কি দুজন বৃদ্ধ থাকবেই, যারা সদাসর্বদা দাবার মধ্যে ডুবে থাকে। সেজন্যেই বলেছিলেন, দাবা কর্মনাশা।

অনুপমের মা নন্দিতা যে তিতুনের জন্মদিনে সুন্দর একটা দাবার সেট উপহার দিয়ে গিয়েছিল তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। সেজন্যেই তিতুন অত অত রকমারি উপহারের মধ্যে দাবার সেট একটা পেয়েই বলে উঠেছিল, গ্র্যান্ড... এটাই বেস্ট। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ বা সুহাসিনী কেউই সে-খবর জানতেন না।

দুর্গাপ্রসাদ অবাক হয়েছিলেন তিতুনের উল্লাস দেখে। একটা বাচ্চা মেয়ের দাবা নিয়ে এত উৎসাহের কি আছে।

দুর্গাপ্রসাদকে অবাক হতে দেখে তনু হাসতে হাসতে বললে, ও তো খেলতে জানে।

—জানে ?

তনু হেসে ঘাড় নাড়ল।

হয়তো প্রশ্ন করে বসতেন, কি করে জানল, তার আগেই সুহাসিনী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ম্যাগো, মেয়েদের আবার দাবা খেলা, কস্মিনকালে শুনিনি।

আসলে দাবাকে একটা গ্রাম্য এবং ঘৃণ্য খেলা হিসেবেই চিনে এসেছেন এতদিন। গল্পেই শুনেছেন আগেকার দিনে নাকি রাজারাজড়ারা খেলত। খেলত তো খেলত, তা বলে একটা মেয়ে ঘরে বসে দাবা খেলবে।

তনুর নিজেরও যে খুব একটা প্রশ্রয় ছিল তাও নয়। কিন্তু বাধাও দেয়নি।

দিনরাত পড়া পড়া আর পড়া। আজকাল একেবারে নিচু ক্লাশ থেকে পড়ার ওপর এত চাপ, তাছাড়া এইসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোয় যে ক্লাশের পড়া করে আর বিশেষ সময়ই থাকে না। তারই ফাঁকে আছে টি ভি দেখা, কখনও কখনও। ছোটদের কোনও ছবি বা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির কোনও সিরিয়াল থাকলে। জি কের অর্থাৎ জেনারেল নলেজের ভাঁড়ার পূর্ণ করতে। কাঠবিড়ালী তো জীবনে চোখে দেখেনি, গ্রামেই যায়নি কখনও, কিন্তু টিভি থেকেই কিছুটা জ্ঞানসঞ্চয় হয়েছিল। কাঠবিড়ালী নিয়ে রচনা লিখতে দিয়েছিল পরীক্ষায়, বেশ বানিয়ে বানিয়ে দশটা লাইন লিখে দিয়েছিল। নীচের ক্লাশে পড়ে তখন। তারপর থেকে নেশা হয়ে গেছে। দেখতে ভাল লাগে, তাছাড়া কখন কি কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে।

এছাড়া আর কোনও বিনোদন ছিল না। একালের ছেলেমেয়েরা সময়ই পায় না যেখানে, সেখানে সময় কাটানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়ে যখন, তাই এর মধ্যে গানের স্কুলে ভর্তি করেছে। তনুর ইচ্ছে, আঁকার স্কুলেও ওর নাম লেখাবে। তনুর নিজের ছেলেবেলায় খুব ইচ্ছে ছিল ছবি আঁকতে শেখার, সুযোগ হয়নি বলে এখনও ভাল কোনও ছবি দেখলেই অনুতাপ হয়। মনে মনে ভাবে, শিখলে আমিও হয়তো এরকমই আঁকতে পারতাম।

এখনই তিতুনের এত পড়ার চাপ, এরপর তো আরও বাড়বে। তাই ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। মনে হয়, শেষ অবধি সব বাসনাই শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

আর শিখেই বা কি হবে। গান জানত, পাশ করার সার্টিফিকেটও পেয়েছিল, কিন্তু

বিয়ের পর সে চ্যাপ্টার ক্লোজড। দুচারটে যা মনে আছে মুখে মুখে কখনও-সখনও তিতুনকে শেখাবার চেষ্টা করেছে।

জন্মদিনে তিতুন সেরকমই একটা গান গেয়েছিল। ওর বন্ধুরা সবাই হাততালি দিয়েছিল।

জন্মদিনে একটু বেশি বেশি হই-হল্লা হওয়ায় পরের দিন থেকে তিতুন আরও লোনলি হয়ে গেল।

—রোজ রোজ জন্মদিন হলে বেশ হত; না মা ?

তিতুন হাসতে হাসতে বলেছিল।

একটু থেমে। —কত বন্ধু আসত, কত রকম মজা হত।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা সবাই বোধহয় নিঃসঙ্গ। কিন্তু সংসারের নানান কাজে তনুর সময় কোথায় সঙ্গ দেবার। তবে দিতে পারলে নিজেকেও এত একা একা লাগত না।

আগেকার দিনে বিরাট বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকত, একান্নবর্তী পরিবার। তার হয়তো দোষ ছিল, পারস্পরিক ঈর্ষা, ঝগড়াঝাঁটি, মানুষের মনকে অনেকসময় ছোট করে দিত। সবচেয়ে বড় দোষ সে-সংসারে কারও কোনও স্বাধীনতা থাকত না।

কিন্তু এই ছোট ছোট সংসারগুলোয় মানুষ বড় একা হয়ে গেছে।

আরও একা হয়েছে এই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। আগেকার দিনে বাড়িতে কম করে তিন-চারটে ভাইবোন থাকত, ঝগড়া মারামারি করেও দিন কেটে যেত। এখন সবাই একা এবং নিঃসঙ্গ।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা থাকে না বড় একটা, বন্ধু বলতে শুধু স্কুলের বন্ধু। তারা সবাই দূরে দূরে থাকে, অবসর সময়ে যে তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করবে তারও উপায় নেই।

তনু নিজেও হাঁপিয়ে উঠছিল, এক মাসের ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল গত বছরে। তিতুনের পরীক্ষা হয়ে গেছে তখন, পড়ার চাপও ছিল না। বছরে ওই একটা মাস কিছুটা হাল্কা লাগে নিজেকে।

তিতুনের তো দারুণ ফুর্তি ছোট মামাকে পেয়ে। মামাতো ভাইবোনরাও তুচ্ছ হয়ে গেল। হবে না কেন, ছোটমামা অনেক মজার মজার জোকস বলে।

—এখন কি করছিস রে ছোটদা ?

তনু জানতে চাইছিল এখন কোন অফিসে। ও দেখে আসছে, ছোটদা কোথাও থিতু হয়ে বসে না। মাঝেমাঝেই চাকরি ছেড়ে দেয়, আবার একটা নতুন কোম্পানিতে ঢোকে। ওর এক একসময় অবাকই লাগে। আজকাল অনেকে চাকরিই পায় না। অথচ এই ছোটদা এর মধ্যে যে কতবার চাকরি বদলাল !

ছোটদা বলে বসল, এবার একটা দারুণ বই আনিয়েছি, মাস্টার্স গেম।

বললে, গতবার তো সামান্যর জন্যে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলাম না, এবার হবই।

বোঝো ব্যাপার, সেই দাবা নিয়েই আছে। যেন 'কি করছিস' বলতে কোনও কাজ বোঝায় না। এখনও সেই দাবাই ওর ধ্যানজ্ঞান।

যখন বেকার ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে খেলত। তখন বন্ধুরাও বেকার। ফিরে এসে তনুকে বলত, জানিস। আজ সাতটা গেমের পাঁচটাই আমি জিতেছি, দুটো ড্র।

ফুর্তিতে মাঝে মাঝে শিস দিয়ে উঠত ছোটদা।- যেদিন জিতে ফিরত।

সেই নেশা যে এখনও টিকে আছে ভাবতেই পারেনি।

—ছাড়ব মানে, জানিস দাবা এখন সবচেয়ে অ্যারিস্টোক্রেটিক খেলা। কত নাম

গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারলে।

তনু ওই হেডমাস্টার অবধি জানত, গ্র্যান্ডমাস্টার কি বস্তু ধারণায় এল না।

ছোটদা বললে, টাকাও হয় রে, তেমন বড় হতে পারলে টাকাও হয়।

খেলায় আজকাল প্রচুর টাকা তা অবশ্য জানত। ফুটবলে তো হামেশাই প্লেয়ারদের ভাঙিয়ে নিয়ে যায় অন্য দল, বেশি টাকা দিয়ে। টি ভি-র কল্যাণে টেনিস খেলা সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে ওর। ফ্যানও হয়ে উঠেছে কারও কারও।

উইম্বলডন জিতলে কত টাকা পাওয়া যায় তার একটা হিসেবও বেরিয়েছিল। পড়েছে। প্রায় অবিশ্বাস্য লেগেছে। এত টাকা?

ছোটদা বললে, অত না হলেও দাবাতেও পাওয়া যায়। তারপর সম্মানটা ভাব, সারা পৃথিবী জুড়ে নাম।

তারপরই ডাকলে, তিতুন, আয় তোকে খেলা শিখিয়ে দিই।

তনু বললে, ধ্যাত, ও কেন দাবা খেলতে যাবে।

—মেয়ে বলে বলছিস? নোনা, ভিরা মেনচিক এরাও তো মেয়ে, ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

তিতুন ততক্ষণে আব্দার জুড়ে দিয়েছে, হ্যাঁ ছোটমামা, শিখিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও।

ছোটদা হাসতে হাসতে বলেছে, তুইও শিখে নে তনু, কতবার বলেছি তখন তো শুনিসনি। শিখে নে, মা মেয়েতে খেলবি, দেখবি দাবার মত সঙ্গী নেই।

তনু হেসে সরে গেছে। না বাবা আমার দরকার নেই, তাঁর ছোট বউমাকে দাবা খেলতে দেখলে নির্ঘাত হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে শ্বশুরের।

বলেছে, তাছাড়া আমার অত সময়ও নেই।

বাচ্চাদের চোখের সামনে চকোলেট দেখিয়ে সেটা সরিয়ে নিলে যেমন হয়, তিতুন নাচতে নাচতে বায়না ধরেছে, শিখিয়ে দাও ছোটমামা, শিখিয়ে দাও। ছোটমামার জামার প্রান্ত ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে বারবার।

তনু অত খবরও রাখেনি, ঘোরাঘুরি করছে, বাবা-মার সামনে বসে নানান কথা, বউদিদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা।

হঠাৎ একদিন দেখে দোতলার ঘরে দুজনে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে দাবার বোর্ডের সামনে। একটু দাঁড়াল। কি আশ্চর্য, তিতুন নিজে নিজেই একটা দান দিল।

আর ছোটদা বলে উঠল, বাঃ বাঃ। তুই তো আমাকেও ভাবিয়ে দিলি।

ভুল হোক ঠিক হোক, এই কদিনে শিখে নিয়ে তিতুন নিজে নিজে একটা দান দিতে পারছে দেখেই তনু অবাক।

হেসে উঠে বললে, সে কি রে, সত্যি সত্যি শিখে গেলি?

তিতুন বললে, শিখব না কেন, এ তো খুব সহজ। তোমাকে শিখিয়ে দেব।

তনু অত মন দিয়ে দেখেনি কোনওদিন, ওপর ওপর শুনেছে, ঘোড়া গজ নৌকোর কার আড়াই চাল, কার সোজাসুজি, আর কার কোনাকুনি শুনেছে বহুবার, ছোটদার কাছেই, তাই মনে হয়েছে বেশ জটিল। ও সব কি আমার দ্বারা হবে নাকি। সেজন্যেই এগোয়নি।

তিতুন যখন পারছে, ভরসা পেয়ে নিজেও বসে পড়ল।

তিতুন টপাটপ ঘুঁটি খাচ্ছে দেখে বেশ মজা পেয়ে গেল।

আরেকটা ঘুঁটি খেতেই ছোটদা সাবধান করল, ভেবেচিন্তে খা তিতুন, বিপদ আসছে কিন্তু।

শেষ অবধি তিতুন হেরে যেতেই কি কান্না তার। জোর করে জিতিয়ে দিয়ে কান্না

থামাতে হল।

কিন্তু দাবার নেশা শেষ অবধি পেয়ে বসল তিতুনকে।

যে-কদিন ছিল ছোটমামার সঙ্গে তার একবার না একবার দাবায় বসা চাই-ই চাই।

তনু বললে, দিলে মাথাটি বিগড়ে, এবার আর পড়ায় মন বসবে না।

তিতুন বললে, কেন বসবে না ? পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা। সেই শুরু। সেটাই ইতিহাস।

আসার সময় ছোটদা একটা দাবার সেট কিনে এনে দিল তিতুনকে। —যা নিয়ে যা, মাকে শিখিয়ে নিবি।

সেই শস্তা দাবার সেটটা পেয়েই তিতুন বেজায় খুশি।

মামার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে।

তারপর একটু একটু করে, পিছনে লেগে থেকে, মাকেও শিখিয়ে নিয়েছিল।

প্রথম প্রথম তনু ভুলে যেত, কখনও নৌকোর ঘুঁটিকে আড়াই চাল দিয়ে বসত, কখনও ঘোড়াকে চালিয়ে দিত কোনাকুনি।

তিতুন তো হেসেই অস্থির।— উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। মিসটেক আর মিসটেক।

শেষে তনুও খেলা শিখে গেল।

স্কুলের পড়া শেষ হলেই, এসো না মা, এক দান খেলি।

সেদিনও ঠিক এই রকমই খেলতে বসেছে, মা আর মেয়ে।

রিটায়ার্ড মানুষের যা কাজ, দুর্গাপ্রসাদ সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোন। সুহাসিনীও তাই। ওটা ওঁর সারাজীবনের অভ্যাস। দুপুরে না ঘুমোলে সুহাসিনীর গা ম্যাজ ম্যাজ করে, আর দুপুরে ঘুমোলে দুর্গাপ্রসাদের হজম হয় না। তবু ঘুমোন, রিটায়ার্ড লোকের এছাড়া আর সময় কাটানোর কোন রাস্তাই বা আছে।

তাই দুপুরে এ-সময়টা তনু নিশ্চিন্ত।

তিতুন একবার বলতে খেলতে বসে গেল। আসলে নেশাটা বোধহয় তনুকেও পেয়ে বসেছিল। একা মানুষ, শ্বশুরশাশুড়ি থেকেও নেই। একই বাড়িতে থাকলেও তাঁরা একটু দূরে দূরেই থাকেন। খানিকটা অভিমান থেকেই হয়তো নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। বাড়িতে প্রাণচঞ্চল একটা বাচ্চা নাতনি। চটপটির মত কথা বলে সেই কথা-ফোটার বয়েস থেকে। বেশ ভাল লাগত।

ইচ্ছে করে তিতুন সব সময়ে কাছে আসুক, চারপাশে ঘুরঘুর করুক। করতও এক সময়।

তারপর ওই স্কুলে ভর্তি হল।

দুর্গাপ্রসাদ হয়তো ডাকলেন, তিতুন, কি করছ একবার এসো এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে তনু বলে উঠেছে, বারান্দা থেকেই, বাবা, ও এখন হোম টাস্ক করছে।

কখনও নিজেই কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিতুন বলেছে, দেখছ না হ্যান্ডরাইটিং করছি। ডোনট্ ডিস্টার্ব। প্লিজ।

সুহাসিনী নিজের হাতে হয়তো কোনও খাবার করেছে, আদর করে খাওয়াতে এসেছেন, তনু বলে উঠেছে, ওর আজ পেটটা খারাপ মা।

ব্যস। অভিমানে মুখ ভার করে ফিরে গেছেন সুহাসিনী।

এখন আর ওঁরা সাতেও নেই পাঁচেও নেই। মনে মনে বলেন, তোমাদের মেয়ে, তোমরা তোমাদের মত করে মানুষ করো। দিনকাল যে পাল্টেছে বেশ বুঝতে পারেন। সারা দিনে হয়তো দু-পাঁচ মিনিট কথাবার্তা তিতুনের সঙ্গে। কখনও সে আসে, কখনও

নিজেরাই যেচে যান। কথা না বলে থাকতে পারেন না।

দূরে দূরে থাকেন বলেই ওঁরা কোনও দিন খবর পাননি।

সেদিন হঠাৎ দুপুরবেলা দুর্গাপ্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল। ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। ওটা প্রতিদিন তনুই ঢাকা দিয়ে রেখে যায়। কবে যেন কাউকে বিরক্ত করব না ভেবে নিজেই গড়িয়ে খেতে গিয়েছিলেন। পিতলের কলসিতে এক কলসি জল রাখা আছে রান্নাঘরের তাকে, ভাবলেন নিজেই নিই।

অবসর নেবার পর নিজের ব্যক্তিত্বটাই যেন চলে গেছে। একটা কাজের মানুষকে সবাই সমীহ করত, এখন দুর্গাপ্রসাদ অকাজের মানুষ। তাই নিজের প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতে ভরসা পান না। চায়ের নেশা সেই ছেলেবেলা থেকে, নিয়মমত দুবেলা চা করেও দেয় তনু। কিন্তু কোনও দিন যদি এক কাপ বাড়তি চায়ের শখ হয় বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন। না খেতে পেয়ে বেশ অস্বস্তি হয়, কিন্তু বলতেও পারেন না।

সেজন্যেই কাউকে না ডেকে নিজেই কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেতে গিয়েছিলেন। সামলাতে পারলেন না। হাত ফস্কে কলসিটা সশব্দে নীচে পড়ে গেল।

সে যে কি লজ্জা, কি অস্বস্তি।

সুহাসিনীর ঘুম ভেঙে গেল, ছুটে এলেন। তনুও।

সুহাসিনী সব দেখে শুনে বললেন, কি আক্কেল তোমার, পায়ে পড়ত যদি।

তনু বললে, বাবা, আমাকে ডাকলেই তো পারতেন।

দুর্গাপ্রসাদ কি করে বোঝাবেন যে নিজেকে তিনি এখন অবাঞ্ছিত মনে করেন। এক গ্লাস জলের জন্যে হুকুম দিতেও অস্বস্তি। একবার ভেবেছিলেন সুহাস বলে ডাকবেন, কিন্তু বেচারি ঘুমোচ্ছে ঘুমোক ভেবে...

তনু পিতলের ঘড়াটা তুলে দেখছিল ফেটে গেছে কিনা। আজকাল একটা পিতলের ঘড়ার যা দাম!

না, ফাটেনি।

রান্নাঘরের মেঝের জল মুছতে মুছতে বললে, কাল থেকে আপনার ঘরে এক গ্লাস জল রেখে দেব।

সেজন্যেই ভেবেছিল ঘুম ভেঙে জলতেষ্টা পেলেও উনি এদিকে আসবেন না।

নিজেদের ঘরের দরজাটা খোলা রেখেই খাটের ওপর বসে মা-মেয়ে দুজনে দাবা খেলছিল।

দুর্গাপ্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল, ঢকঢক করে জলটা খেলেন।

তারপর ভাবলেন, যাই একবার বাথরুমটা ঘুরে আসি।

বাথরুমে যাবার রাস্তা তনুদের ঘরের সামনে দিয়ে।

রবারের স্লিপারে পা গলিয়ে পা টিপেটিপে যাচ্ছিলেন। পাছে পায়ের শব্দে কারও অসুবিধে হয় বা ঘুম ভেঙে যায়। এবাড়ির সকলের মুখের চেহারাতেই 'ডোন্‌ট ডিসটার্ব' লেখাটা পড়তে পারেন। আদরের নাতনি তিতুন, সেও মাঝে মাঝে বলে বসে, এখন ডিসটার্ব কোরো না, প্লিজ দাদু, অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে।

তাকিয়ে না দেখলেও কেমন যেন মনে হল ঘরে খাটের ওপর বসে ওরা কি যেন করছে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে তনু ওঁকে দেখতে পেয়ে বালিশ চাপা দিয়ে কি লুকোল।

সুতরাং কৌতূহল হবারই কথা। জিগ্যেস করলেন, গম্ভীর মুখে কিছু জিগ্যেস করার দিন তো চলে গেছে, তাই হাসিমুখে জিগ্যেস করলেন, কি হচ্ছিল ভাই তিতুন?

অম্লান মুখে তিতুন উত্তর দিলে, কিচ্ছু না, নাথিং।
ও, বলবে না, বেশ। বলে দুর্গাপ্রসাদ চলে যাচ্ছিলেন।
তিতুন এবার হেসে উঠে বললে, চেস খেলছিলাম।
—চেস! প্রথমটা বুঝতেই পারেননি।
তিতুন বলে উঠল, উঃ, তাও বুঝলে না। দাবা, দাবা।
দুর্গাপ্রসাদ বাথরুমের দিকে চলে গেলেন, কিন্তু অবাক ভাবটা কাটল না। ওইটুকুন মেয়ে, ও দাবা খেলতে জানে। শিখল কোত্থেকে?
সুহাসিনী ঘুম থেকে উঠতেই বললেন, জানো সুহাস, তিতুন আমাদের দাবা খেলতে জানে। শিখল কোত্থেকে বলো তো?
সুহাসিনী গা করলেন না। —কি জানি, আজকাল মেয়েরা কি না করছে।
দাবা খেলতে জানাটাই যে বেশ দুরূহ ব্যাপার তা তো জানেন না। খেলা না খেলা। শুধু জানেন মেয়েদের ওসব খেলা মানায় না।
দুর্গাপ্রসাদ বললেন, তিতুন কিন্তু দারুণ ইনটেলিজেন্ট।
বলেই মনে পড়ে গেল ওর জন্মদিনে কে যেন এক সেট দাবা উপহার দিয়ে গিয়েছিল। আর তা দেখে তিতুন বলে উঠেছিল, গ্র্যান্ড। এটাই বেস্ট।
এখন বোঝা যাচ্ছে রহস্যটা কোথায়।
তিতুন এতদিনের গোপন রহস্যটা প্রকাশ করে দিতেই চোখ কটমট করে তাকিয়েছিল তনু। কে কি ভাবে নেবে বলা তো যায় না। ছোটদার কাছে শিখেছে জানলে ধরে নেবে ছোটদা একটা নিষ্কর্মা। যতক্ষণ না একটা প্রাইজটাইজ পাচ্ছ, কাগজে নাম উঠছে, লোকে কোনও দাম দেয় না।
অভিষেকের কাছেও তাই খবরটা চেপে রেখেছিল। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, দুর্গাপ্রসাদ জেনে গেছেন মানেই অভিষেকও জানবে। সুতরাং আগে থেকে বলে ফেলাই ভাল।
সন্ধেবেলা গল্প করতে করতে অভিষেককে বলে ফেলল।
বললে, জানো, তিতুন না, দারুণ দাবা খেলে। তিনটে গেমই আমাকে হারিয়ে দিল।
অভিষেক তো অবাক। বেশ খুশি খুশি লাগল ওকে। —সত্যি? খেলতে শিখেছে?
তনু প্রশ্রয় পেয়ে বললে, ছোটদা এসেছিল একদিন, বললে আন্ডার-টেন ক্লাবে ভর্তি করে দিতে।
আসলে ওটা তনুরও অনেকদিনের ইচ্ছে। ছোটদা বলে যাওয়ার পর থেকেই।
স্কুলে তিতুনকে দিতে গিয়ে, আনার সময়, যারা বন্ধু হয়ে গেছে, নন্দিতা, বর্ণালি, মধুমিতা—তাদের কাছে একদিন বলেই ফেলেছিল।
—কি করিস সারা দুপুর? আমি তো ক্যাসেট আনিয়ে ভি ডি ও দেখি।
মধুমিতাই বোধহয় বলেছিল।
আর তনু ওরফে তনুকা বলেছিল, কি আর করব, সময় পেলে মা-মেয়েতে দাবা খেলি।
সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে উঠেছে সকলের। —ওইটুকু মেয়ে, ও দাবা খেলতে জানে? তুই জানিস?
বিস্ময়টা সবচেয়ে বেশি নন্দিতার।
এই দলের মধ্যে নন্দিতাই একমাত্র ভি আই পি। সবাই বেশ সমীহ করে ওকে। কারণ ও অনুপমের মা। ক্লাশের ফার্স্ট বয় অনুপম, তার মা। কেউ কেউ একটু গা ঘেঁসাঘেঁসি করে ওর সঙ্গে, যদি বেশি নম্বর পাওয়ার তুকতাক কোনও রকমে জানতে

পারে। সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, তবে আড়ালে একটু ঈর্ষাও আছে। ফার্স্ট হবে না কেন, আন্টিরা যে ওকে ভীষণ পছন্দ করে। ফার্স্ট হয় বলেই আন্টিরা পছন্দ করে সে-কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না।

সেজন্যেই কি না কে জানে, তিতুন ওরফে জয়শ্রীর এমন একটা গুণ আছে শুনে তনু রাতারাতি ভি আই পি হয়ে গেল।

অনেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ওই জয়শ্রী, দাবা খেলতে জানে।

খবরের কাগজে প্রায়ই দাবা-খেলার খবর থাকে বলেই সকলের মনে হয়েছে জয়শ্রী হয়তো বা একটা প্রডিজি। কে জানে ভবিষ্যতে কি হয়ে দাঁড়াবে!

ওদের অবাক হতে দেখে তনুর বেশ ভালই লাগছিল, প্রশংসা শুনে মনে হল ছোটদার কথাটাই ঠিক। আন্ডার-টেন ক্লাবে ভর্তি করে দেওয়াই ভাল।

ছোটদা তো বলছিল মাত্র সপ্তাহে দুদিন। তনুই দিয়ে আসবে নিয়ে আসবে, ও আর এমন কি কঠিন কাজ। কিংবা নিজেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখবে।

তিতুনের নিজেরও যেন নেশা ধরে গেছে। হ্যাঁ মা, ক্লাবে ভর্তি হব।

ছোটমামা মাঝেমাঝেই আজকাল আসে, এসে ওর নেশাটা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন এসে বললে, অ্যাদ্দিন তো দিশি মতে খেলে এসেছিস, এবার বিলিতি চালটা শিখে নে।

তিতুন তো হেসেই অস্থির, এর আবার দিশি বিলিতি আছে নাকি।

তনুও জানত না।

এখন আর কোনও লুকোচুরি নেই। একদিন ডাইনিং টেবলে বসে তনু আর তিতুন খেলছে, দুর্গাপ্রসাদ এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিজে বোঝেন না তবুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

খেলার মাঝেই জিগ্যেস করলেন, সাদা ঘুঁটি কতগুলো, তিতুন।

তিতুন খেলতে খেলতেই বললে, সাদাও বত্রিশ, কালোও বত্রিশ। তা না হলে সমান সমান হবে কি করে।

—তা হলে দুটো মিলিয়ে কত ঘর?

তিতুন বলে উঠল, উঃ, ডিস্টার্ব করো না তো, এটা কি ম্যাথসের ক্লাশ।

তারপর বললে, চৌষট্টি, যাও এবার।

দুর্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে চলে এলেন।

এই সময়েই একদিন ছোটমামা এসে হাজির। —আয়, এক হাত খেলে নিই, দেখি কেমন খেলতে শিখেছিস।

তিতুন দারুণ খুশি।

খেলতে খেলতে ছোটমামা একবার বলে বসল, তুই তো আমাকেও হারিয়ে দিবি রে।

সত্যি সত্যি হারিয়ে দিল তিতুন।

তনু পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ছোটদা উৎসাহ দেবার জন্যে ইচ্ছে করে হেরে গেল কিনা বুঝতে পারল না।

সেদিনই তনুর ছোটদা বললে, আন্ডার-টেন ক্লাবে ভর্তি করে দে। খেলার উন্নতি হবে।

আর তিতুনকে বললে, তার আগে বিলিতি চাল শিখে নে। ওখানে তো কথা বলতে গেলে রাজা মন্ত্রী নৌকো ঘোড়া গজ এসব চলবে না। ওখানে সব কিং কুইন রুক নাইট বিশপ। আর বোড়ে নয় পন। মন্ত্রীটা হয়ে গেছে রানি, রাজা রানির দেশ তো। আমাদের ঘোড়া ওদের ঘোড়ায় চড়া নাইট, নৌকো হয়ে গেছে দুর্গ, মানে রুক। গজ

মানে বিশপ।

একে একে দিশি বিলিতির তফাতটা কোথায় কোথায় বুঝিয়ে দিল।

তনু হেসে উঠে বললে, ও আমার মাথায় ঢুকবে না।

কিন্তু নতুন নিয়মে তিতুনের সঙ্গে দু গেম খেলার পরই ছোটদা বললে, ফ্যান্টাস্টিক। কি শার্প মেমারি রে, ভর্তি করে দে, ভর্তি করে দে।

তনু বললে, হুঁ, লেখাপড়ার বারোটা বাজুক আর কি!

দুর্গাপ্রসাদও একদিন সেই কথা বলেছিলেন, কর্মনাশা।

—কি যে বলিস। টলস্টয় তো এত এত বই লিখেছে, কিন্তু দাবাও খেলত। ব্রেন পরিষ্কার হয়, বুঝেছিস। দেখবি একদিন মায়া চিবুরদানিজ হয়ে যাবে। রেসোভস্কি তো ওর মত বয়েসেই একসঙ্গে দু-ডজন পাকা দাবাড়ুর সঙ্গে খেলেছে। জিতেছে। দেখবি কি নাম হবে তখন।

নাম হবে।

সেই স্বাদ একটু একটু পাচ্ছিল তনু।

এতকাল সকলেরই দৃষ্টি ছিল অনুপমের দিকে, অনুপমের মা নন্দিতার দিকে।

এক একসময় মনে হয়েছে তার জন্যে নন্দিতার গর্বও কম নয়।

গর্ব না চালাকি তাও বোঝা মুশকিল।

উইকলি পরীক্ষায় একটা কোনও প্রশ্নের উত্তর তিতুনের ভুল হয়েছিল। অনুপমের রাইট। তাই তনু তিতুনকে বলে দিয়েছিল অনুপম কি লিখেছিল জেনে নিতে। ওর নিজের বুদ্ধিতে কুলোয়নি।

যেমন ছেলে তেমনি মা।

অনুপম এড়িয়ে গিয়ে বলেছে, ভুলে গেছি।

তনু জিগ্যেস করেছে, নন্দিতাকে।

নন্দিতাও চালাক মেয়ে, হেসে উঠে বলেছে, কি জানি ভাই, ও যে কি লেখে আর কি না লেখে, তা কি আমিই জানি।

অন্যেরা শুনে বলেছে, দাবার সেট কেন প্রেজেন্ট করেছিল জানিস তো? যাতে দাবার নেশায় পড়া খারাপ হয়।

শুনে অবশ্য বিশ্বাস হয়নি তনুর। মেয়ে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করবে এমন কোনও স্বপ্ন ও কোনও দিনই দেখেনি। ভাল রেজাল্ট হলেই ভাল।

আন্ডার টেন ক্লাবে ভর্তি হয়ে প্রথম বছরেই তিতুন একটা প্রাইজ পেল।

ক্লাবের সবাই অবাক। একজন তো বলেই বসল, ও একটা প্রডিজি।

নন্দিতাও শুনল। শুনে বললে, ও একটা প্রডিজি।

এসব প্রডিজির গল্প—তনু অনেক শুনেছে। ছেলেবেলায় কত ছেলেমেয়ে কত কি কীর্তি করে বসে। ছেলেবেলায় কাউকে ভাল ছবি আঁকতে দেখলে সবাই মনে করে এ-ছেলে নির্ঘাত বড় আর্টিস্ট হবে। ভাল নাচতে জানলে, এ মেয়ে বালাকেও ছাড়িয়ে যাবে, বালা সরস্বতী। পাঁচ বছরে কেউ সেতার কি সরোদ বাজিয়েছে, নির্ঘাত আলাউদ্দিন।

হাসতে হাসতে নন্দিতাকে এই উদাহরণগুলো দিয়েছিল তনু। বলেছিল, তোর আর চিন্তা কি, শেষ অবধি ফার্স্ট হয়ে হয়ে অনুপম বিরাট কিছু হবে।

বিরাট কিছু হবে এমন কোনও স্বপ্ন অবশ্য নন্দিতারও নেই। যদি তেমন রেজাল্ট করে বেরোতে পারে, জয়েন্টে বসবে, চান্স পেলে ইঞ্জিনিয়ার। আই আই টি পেলে তো কথাই নেই। আজকাল সকলে এটুকুই ভাবে, নন্দিতাও। তাও অত দূর অবধি এখন দেখতে

পায় না। প্রোমোশনের পর শুধু একটাই টেনশন, এবারও ফার্স্ট হবে তো। না হতে পারলেই নন্দিতার যেন মাথা কাটা যাবে।

এত লোকের অবাক হয়ে তাকানো বন্ধ হয়ে যাবে।

তবু মামাশ্বশুরের কথাটা মনে ছিল বলেই তনুকাকে স্তোক দেবার মত করে বললে, ফার্স্ট হলে কি হয় কি ? শেষ অবধি সেই তো একটা ভাল চাকরি।

তনু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছে, কি যে বলিস। শুধু চাকরি ? জানিস, যত বড় বড় সায়েন্টিস্ট সব প্রথম থেকেই ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে। দেখবি, অনুপম শেষে হয়তো কিছু আবিষ্কার করে বসবে।

শুনে হো হো করে হেসে উঠেছে নন্দিতা। সেই প্রডিজি !

ও অবশ্য এসব কথা ভাবেও না। স্বামী সুনির্মলও নয়। আই আই টি কিংবা জয়েন্টের কথা হয়তো ভাবতেও পারে, কিন্তু আসল বাসনা তার বিরাট চাকরি। শোনাবার মত একটা ডেজিগনেশন। মোটা মাইনে, গাড়ি বাড়ি। একটাই ইচ্ছে, সে যেন সুনির্মলকেও ছাড়িয়ে যায়।

যখন ভাল চাকরি পেয়েছে, কিংবা ইন্টারভিউয়ের সময় বস কিংবা বোর্ডের কেউ হয়তো প্রশ্ন করে বসেছে, বাবা কি করতেন ?

বলতে সঙ্কোচ হয়েছে সুনির্মলের। বলেছে, টিচিং লাইনে ছিলেন।

হেডমাস্টার কথাটা উচ্চারণ করতে পারেনি, পাছে তার দামি স্যুট, স্মার্ট হাঁটাচলা, বি বি সি শুনে রপ্ত বিশুদ্ধ ইংরিজি বলার চটপটানি শুধু ওই একটা 'হেডমাস্টার' শব্দে অকস্মাৎ ধসে পড়ে।

ভাগ্য ভাল, অনুপমকে সে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে না। এর মধ্যেই সুনির্মলের পরিচয়টা জোর গলায় বলার মত। অনুপম বড় হতে হতে ও কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা ওর নিজেরই হিসেবের বাইরে।

এ-সব কথা নন্দিতা জানে, বাড়িতে আলাপ-আলোচনায় সুনির্মলের ইচ্ছেটা অজানা নয়। মামাশ্বশুরের কথায় একটু দমেও গিয়েছিল। সত্যি তো, কি দাম এসবের ! শুধুই একটা ভাল চাকরি !

তনুকা, খুশি করার জন্যে কিনা কে জানে, বলে বসল, দেখিস ও কিছু একটা আবিষ্কার-টাবিষ্কার করে বসবে, বিরাট সায়েন্টিস্ট হবে।

শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা ফুরফুরে দখিনা বাতাস হয়ে গিয়েছিল।

তনুকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেছিল, দেখিস, তোর জয়শ্রীও খুব নাম করবে দাবায়। এই বয়েসে ওর যা ব্রেন !

তনুর মনে হল, সত্যি।

ভিড়ের মধ্যে প্রথম সারিতে বসে ছিল তনু। নন্দিতা দীপা আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তিতুন আন্ডার-টেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, প্রাইজ নেবে। দেখাবে না ওদের !

ডায়াসের ওপর অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি।

'জয়শ্রী' নাম ডাকল একজন, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে।

তিতুন, উঠে গেল হাসিমুখে। একজন তখনও জয়শ্রীর প্রশংসা করে যাচ্ছেন। পুরস্কার নিল।

কি হাততালি, কি হাততালি।

ছোটদা পাশেই বসেছিল, একটা কনুইয়ের গোঁতা দিয়ে বললে, দেখলি তো !

তনুর মনে হল আরেকটা হাততালি যেন চাপা পড়ে গেছে এই হাততালির কাছে।

তিতুনদের স্কুলে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি হয় প্রতি বছরই।

এ-বছরও হয়েছে।

তনু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ডায়াসের ওপর থেকে অনুপমের নাম ডাকা হল।

এই কবছরে সমবেত সকলেই অনুপমকে চিনে গেছে। সকলেরই দৃষ্টি তার দিকে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে আছে অনুপমের মুখের দিকে। হাসি হাসি মুখে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অনুপম এগিয়ে যাচ্ছে।

তনু দূরে বসা নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। উচ্ছল আনন্দ আর গর্ব মেশামিশি হয়ে আছে সে-মুখে। ওর বন্ধুদের কেউ কেউ উঁকিঝুঁকি মেরে নন্দিতাকে খুঁজছে।

ঠিক তখনই দুহাত বাড়িয়ে পুরস্কারটা নিল অনুপম।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

তনুও।

মনের মধ্যে একটা ঈষৎ হীনমন্যতা উঁকি দিচ্ছিল। তনু বেশ জোরে জোরে হাততালি দিল। তনু, তনুকা। মুখে বেশ একটা আনন্দের রেশ এঁকে নিল।

সেই হাততালিটা, হলভর্তি মানুষের হাততালি মাঝে মাঝেই ওর কানে বাজত।

আজ মনে হল সে হাততালি ম্লান হয়ে গেছে। তিতুনের জন্যে দেওয়া এই তুমুল হাততালির কাছে।

সকলের মুখে মুখে একটাই নাম ঘুরছে। জয়শ্রী, জয়শ্রী, জয়শ্রী।

চার

বছরই এই দিনটিতে স্কুলের অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে একটা জমজমাট ফাংশন হয়।

কাঁধে ঝোলানো বিরাটাকৃতি ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তিতুন নিজেও বিছানার ওপর শরীর ছড়িয়ে দিল। এই দুপুর রোদ্দুরে ফিরে মা-মেয়ে দুজনেই তখন দরদর করে ঘামছে।

ঘরে পৌঁছেই তনু ঝট্ করে ফ্যানের সুইচ টিপে দিয়েছে, ফুল ফোর্সে পাখা ঘুরছে বনবন করে। পাখার হাওয়া খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে তবেই স্নান-খাওয়া। তনু তো সটান মেঝের ওপর।

মিনিট পাঁচেক নিথর ক্লান্তিতে পড়ে থাকার পর, রোদে-লাল মুখটা সবে স্বাভাবিক হয়ে আসছে, তিতুন ঝট করে উঠে বসে বলেছিল, আমাদের জন্মদিনের পাঁচটা টিকিট কিনতে হবে মা, আন্টি বলে দিয়েছে।

এটা নতুন কিছু নয়, প্রতি বছরই কিনতে হয়। কিন্তু প্রতি বছরেই শুনে মুখ ব্যাজার হয় বলেই ভুলে যেতে চায় এবং ভুলেও যায়।

তাই বুঝতে না পেরে তনু বলল, জন্মদিনের টিকিট, সে আবার কি?

এমনিতে তিতুনের মুখে ইংরিজি বুলি লেগেই আছে। শুনে তনু আর অভিষেক তদ্‌গত হয়, কিন্তু একটু মজা করার জন্যেই হয়তো জন্মদিন কথাটা বললে।

মা অবাক হয়েছে দেখে হাসতে হাসতে বললে, আরে বাবা, অ্যানভার্সারি। আমাদের জন্মদিন হয়, স্কুলের জন্মদিন হবে না।

কেন হয় তাও জানে তনু। বিল্ডিং ফান্ড।

ট্রাম রাস্তার ওপরে পাঁচিল ঘেরা এই বিশাল স্কুল বাড়িটার সামনে একটা বড়সড় মাঠও আছে। পি টি ক্লাশ হয়, আবার ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে, খেলাও করে। সেই মাঠ জুড়ে বিশাল প্যান্ডেল হয়, স্টেজ বাঁধা হয়। ফাংশন।

এই স্কুলবাড়ি ওদের স্কুলের নিজস্ব নয়, মান্ধাতা আমল থেকে ভাড়া নেওয়া। ভাড়াটে হয়ে থাকতে কারই বা ভাল লাগে, সবাই স্বপ্ন দেখে একটা নিজস্ব বাড়ির। অতএব স্কুলই বা সে স্বপ্ন দেখবে না কেন!

এই স্কুলটার ঠাটবাট একটু বেশি বেশি। আর সে-কারণে প্রতি মাসে বিল্ডিং ফান্ডের জন্যে একটা টাকা ফি-বইয়েই লেখা আছে। এ ছাড়াও মাঝেমাঝেই কিছু না কিছু বাড়তি টাকাও দিতে হয়। ভাল স্কুলে পড়াবে অথচ বাড়তি টাকা খরচ করবে না তা তো হয় না।

আমাদের প্রাইজ সেরিমনির কথাই ভাবুন। এমন এলাহি কাণ্ড আর কোথাও হয়?

স্কুলের ফি জমা দিতে গিয়ে তনু নন্দিতা আরও কে কে যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল।

শুনতে পেয়ে টাকা জমা নেওয়ার কাউন্টারে বসা ক্লার্কটি বলেছিল।

তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাদের মাইনে কিন্তু পাঁচ টাকা বাড়াতে হলেই ম্যানেজমেন্ট বলবে স্কুলের টাকা নেই।

লোকটির ওপর ওরা কেউই সদয় নয়, কারণ কাউন্টার খোলেন উনি মর্জিমাফিক, আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা দেরি করে। জল খাবেন, চা খাবেন, পান আনতে বলবেন, এবং ওদের লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে পাশের লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবেন।

রাগে এক একবার ইচ্ছে করে চাবকাতে। কিন্তু উপায় কি, সারা দেশটাই তো এখন এই রকম।

সুতরাং মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ওঁর কখন মর্জি হবে তার জন্যে। আর টাকা গুনবেন, সই করবেন, সে যেন কে জি ক্লাশের বাচ্চার মত।

একজন অতিষ্ঠ হয়ে আড়াল থেকে রসিকতা করেছিল, বানান করে করে সই করে নাকি রে?

লোকটা চোখ তুলে তাকাল, দেখতে পেল তনুকে। যে বলেছে তাকে নয়।

তনু তো ভয়ে কাঠ। এর পরের বার না কোনও ফ্যাকড়া বের করে আধ ঘণ্টা আটকে রাখে।

আজকাল স্কুলের মত আর কোনও ব্যবসা নেই। আর কি দাপট কেরানি থেকে হেড-মিস্ট্রেস অবধি। টিচারদের কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাও, হাসপাতালের সিসটাররাও তার চেয়ে ভাল-ভাবে কথা বলে। না, এখন আর তারা তনুর সঙ্গে তেমন ব্যবহার করে না।

একজন তো হেসে হেসে একদিন যেচে আলাপ করেছিল। 'আপনি তো জয়শ্রীর মা, তাই না?'

এই স্কুলটার ক্লাশ ফাইভ অবধি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে। তারপর ছেলেরা চলে যায় বয়েজ-এ, মেয়েরা গার্লস-এই থেকে যায়। নামে একটু খ্রিস্টানি ভাব আছে, আর সেজন্যেই বোধহয় এত আদর।

একটাই খুঁত আছে, তবে ওদের চোখে।

প্রত্যেক ক্লাশেই একটি কি দুটি আদিবাসী খ্রিস্টান ছেলে বা মেয়ে পড়ে। তারা পিছনের দিকে একধারে পাশাপাশি বসে। সবাই জানে ওরা ফ্রি স্টুডেন্ট।

প্রথম দিকে এই স্কুলের যখন খুবই দারিদ্রদশা, ছোটনাগপুরের এক পাদ্রি বেশ কিছু ডোনেশান জোগাড় করে দিয়ে স্কুলটাকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু একটা চিরস্থায়ী শর্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। আদিবাসী, যাদের সবাই ট্রাইবেল বলে, সেই সব খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের কয়েকটা সিট থাকবে। তারা বিনা পয়সায় পড়তে পাবে। শুধু তাই নয়, দুখানা ঘরের একটা বোর্ডিং হাউসও রাখতে হবে, যেখানে ওরা বিনা পয়সায় থাকতে খেতে পাবে সারা বছর।

এই সব ছেলেমেয়েদের গলায় ক্রশ ঝোলে। তার ফলে স্কুলটারও একটা মিশনারি মিশনারি ভাব আসে। বিশেষ করে স্কুলের নামটা যখন এমনই। যা শুনলে মিশনারি স্কুল বলে ভ্রম হয়। চটপট স্কুলটা যে এত নাম করে ফেলেছে এটাও তার একটা কারণ হতে পারে। এখন ভর্তি করাই দুরূহ।

সুতরাং সব রকম বায়নাক্কা মেনে চলতে হয় তনুদের। পাঁচটা টিকিট কিনতে হবে মানে কিনতে হবেই। তাও এক একটা টিকিটের দাম কুড়ি টাকা। কতকাল ধরে যে বিল্ডিং ফান্ডের টাকা নিয়ে আসছে, আর এই টিকিট বিক্রি, তার হিসেব নেই। সে টাকায় এতদিনে টাটা সেন্টারটাই কেনা হয়ে যেত। টাটারা কেন যে লোহা থেকে ইস্পাত বানাতে গেল, তার চেয়ে দেশ জুড়ে স্কুল করলে দশগুণ ফুলে ফেঁপে উঠত।

'আরে বাবা, অ্যানিভার্সারি।'

স্কুলের মেন গেট ফুলে আর দেবদারু পাতায় সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে টুনি বাল্‌ব। তার মাথার ওপর শুধু লাল গোলাপ দিয়ে স্কুলের বয়েসটা লেখা হয়েছে সংখ্যায়।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তনু। অভিষেককে বললে, কি সুন্দর করেছে দেখেছ ?

অভিষেকও খুব খুশি। বললে, ওয়ান্ডারফুল।

—ওয়ান্ডারফুল তো হবেই, আমাদের স্কুল না ! আমাদের স্কুলের সবই ভাল। তিতুন বলে উঠল।

পাঁচটা টিকিট কিনতে হয়েছে বলেই যে দুর্গাপ্রসাদ আর সুহাসিনীকে নিয়ে এসেছে তা নয়। কোনও বারই আনেনি, বাড়তি দুটো টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কেমন একটা সন্দেহ ছিল, ওঁরা এ-সব পছন্দ করবেন না, কারণ এই স্কুলটায় ভর্তি করার সময়ই দুর্গাপ্রসাদ রীতিমত অপ্রসন্ন ছিলেন। 'কেন, তুই তো সাধারণ ইস্কুল থেকেই পাশ করেছিলি। অশিক্ষিত হয়েছিস নাকি ?'

প্রথম প্রথম দুর্গাপ্রসাদকে বোঝাতে পারেনি যে দিনকাল পাল্টে গেছে।

কিন্তু যেদিন প্রথম তিতুন একটা প্রাইজ নিয়ে এল, তনু আর অভিষেক উচ্ছ্বসিত হয়ে শোনাচ্ছিল কে কি বলেছে তিতুন সম্পর্কে, তিতুন কি রকম চটপট একটার পর একটা দান দিচ্ছিল, আর ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটা, ওর চেয়ে বয়েসে বড়, সে কি রকম ঘাবড়ে গিয়ে সময় নিচ্ছিল ইত্যাদি, তখন দুর্গাপ্রসাদ রীতিমত গর্ব অনুভব করেছেন। তখন আর দাবা খেলাটাকে কর্মনাশা মনে হয়নি। তারপর একটার পর একটা মেডেল, পুরস্কার। শেষে আন্ডার টেন কমপিটিশনের চ্যাম্পিয়ান। ইয়াব্বড় একটা শিল্ড। কাচের আলমারিতে পুরস্কারগুলো সাজানো আছে। আত্মীয়স্বজন কেউ এলে দুর্গাপ্রসাদ নিজেই দেখান।

গেটের কাছে কয়েকজন আন্টি দাঁড়িয়ে ছিলেন অভ্যাগতদের সুস্বাগতম্ জানাবার জন্যে।

ওরা ঢুকতে যাবে তার আগেই দুতিনজন ছুটে এল তিতুনের কাছে।

—আরে, জয়শ্রী তুমি !

ওপরের ক্লাশের একজন টিচারকে আরেকজন টিচার দেখিয়ে দিল।

—এই যে, এই আমাদের জয়শ্রী ।

কি খাতির ।

একজন এসে তনুর সঙ্গে আলাপ করল । —আপনি জয়শ্রীর মা ? হাউ লাকি !

আরেকজন বললে, সি'জ রিয়েলি আ প্রডিজি ।

গর্বে বুক ভরে যাচ্ছিল দুর্গাপ্রসাদের, তনুর, অভিষেকের ।

একটু এগিয়ে এসে দুর্গাপ্রসাদ বললেন, তিতুন, তোর যে ভীষণ খাতির রে ।

খাতিরটাতির অত বুঝতে পারছিল না তিতুন । ওর বরং অস্বস্তিই লাগছিল ।

কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের কথা শুনে বলে উঠল, উঃ, এটা স্কুল, এখানে নিক্ নেম বলবে না দাদু, প্লিজ । স্যে জয়শ্রী ।

একজন টিচার এগিয়ে এসে বললেন, চলুন, চলুন, আপনাদের সামনের দিকে গিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি ।

ওদের যেখানে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল, ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরতেই দেখল পিছনের রোয়ে নন্দিতা । নন্দিতা, পাশে অনুপম ।

নন্দিতা হাসল ঠিকই, দুএকটা কথাও বললে, কিন্তু মনে হল যেন মুখে একটা অখুশি ভাব ফুটছে । তনু বুঝতে পারল না, এত বন্ধুত্ব, এত গল্পগুজব, মাঝে মাঝেই ফোন করে, তাহলে এখানে এখন দুহাতে একটা কাচের পর্দা ধরে কথা বলছে কেন ?

তারপরই হঠাৎ সন্দেহ হল, ওই যে একজন আন্টি এসে ওদের সামনের রোয়ে বসিয়ে দিয়ে গেল, সেজন্যেই কি ? আন্টিরা যখন 'জয়শ্রী' 'জয়শ্রী' করছে, সে-সব কি দেখেছে নন্দিতা ? দেখে ঈর্ষা বোধ করেছে ?

কে জানে, তা হতেও পারে । কিন্তু ঈর্ষা হবে কেন ? প্রথম যেদিন তিতুন প্রাইজ পেল, ও তো নন্দিতাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল । দেখেছে কেমন জোরে জোরে হাততালি দিয়েছিল ও । না দিলেও কিছু যায় আসত না, কারণ সারা হল ফাটিয়ে সকলেই হাততালি দিয়েছিল । তারপরও তো আরও কতবার । চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একজন মন্ত্রীর হাত থেকেই তো প্রাইজ নিয়েছে । একটা বড় কোম্পানি আন্ডার টুয়েলভ কম্পিটিশন করল, সেখানেও প্রাইজ পেল তিতুন ।

খবরের কাগজে বড় করে খবরটা বেরিয়েছিল । বন্ধুরা সবাই ফোন করে বলেছে, দেখেছিস ? কাগজে বেরিয়েছে ।

ওর মনে পড়ল নন্দিতা কিন্তু ফোন করেনি । সেই প্রথম দিনের উচ্ছ্বাস ওর মধ্যে বোধহয় আর ছিল না । কিংবা এই কমপিটিশনকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি ।

আশ্চর্য । বরং তনুরই ঈর্ষা হবার কথা ।

নন্দিতাকে তো ও ভীষণ লাকি ভাবে । অমন একটা ব্রিলিয়েন্ট ছেলের মা হওয়া ভাগ্যের কথা । ফার্স্ট বয়, ফার্স্ট বয় !

সবাই কেমন সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায় । যেচে কথা বলে, অনুপমকে আদর করে ।

কেউ অনুতাপের গলায় বলে, আমার ছেলেটা ভাই একেবারে গবেট ।

একজনই শুধু বলেছিল, ফার্স্ট বয় তো কি হয়েছে, এত দেমাক কিসের । সব ক্লাশেই একজন করে ফার্স্ট বয় থাকে ।

আসলে কি একটা খাতা চেয়েছিল নন্দিতার কাছে, পায়নি ।

বোধহয় অনুপম ছেলেটাকেই ভালবেসে ফেলেছে তনু । দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, ধীর স্থির, কথাবার্তায় শান্তশিষ্ট । তনুমাসি বললে ভালই লাগত, কিন্তু বাড়িতে যে তনুকা থেকে তনু হয়ে গেছে স্কুলের এরা কেউই জানত না । ফলে সেই যে প্রথম থেকে অনুপমদের কাছে তনুকা-আন্টি হয়ে আছে, এখনও তাই ।

সামনে থেকে পিছন ফিরে তনু ওকে জিগ্যেস করল, তুমি কিছু করলে না কেন ফাংশনে ?

অনুপম শুধু হাসল, জবাব দিল না।

নন্দিতা বললে, তোর মেয়েই বা করল না কেন ?

তারপর নিজেই জবাবদিহি করল, এ সব করতে গিয়ে পড়া নষ্ট করে কি লাভ।

হতেও পারে, কিন্তু তনু জানে ব্যাপারটা তা নয়।

এই স্কুল অ্যানিভার্সারির ফাংশনে স্কুলের ছেলেমেয়েরাই অংশ নেয়। কেউ নাচে, কেউ গায়। আবৃত্তি, এমনকি একটা ছেলে একবার ম্যাজিকও দেখিয়েছিল। এ ছাড়া নাটক আছে, ছোটদের হাসির নাটক। বড় মেয়েদের নৃত্যনাট্য। ব্যবস্থাপনা সবই টিচারদের। কয়েকজন প্রতিবছরই করে কিছু না কিছু।

তিতুন একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললে, জানো মা, আমাদের ক্লাশ থেকেও দুজন ফাংশন করবে।

তনু হেসে বলসে, তাই নাকি ?

—একটা ড্রামা হবে তো, তাতে প্লে করবে রীতা আর গৌরাঙ্গ। ওরা রোজ স্কুলের ছুটির পর রিহার্সাল দিতে যায়।

তনু হেসে বললে, তুইও তো করলে পারতিস। আর কেউ কিছু করবে না ?

তিতুন একটু অভিযোগের গলায় বললে, বেণু আন্টি তো আর কাউকে কিছু বললেই না, শুধু ওদের দুজনকে সিলেক্ট করল।

একটু থেমে বললে, অনুপম তো ফার্স্ট হয়, ওকেও নিল না।

তিতুনের কথা শুনে মনে হল, ওদের কাউকে নেয়নি, সেটা বড় কথা নয়। ফার্স্ট বয়কে নেবে না কেন। যেন পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে সব ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকার জন্মে যায় এরকম একটা ধারণা তিতুনের। হয়তো সকলেরই। তনুরও সে-রকমই ধারণা হয়েছিল।

'এসব করতে গিয়ে পড়া নষ্ট করে কি লাভ !'

নন্দিতার কথা শুনে তাই মনে মনে হাসল তনু। হয়তো হাসত না। যদি না টিচার দুজন ওদের নিয়ে এসে সামনের রোয়ে বসাত।

ওদের খাতির করে সামনের রোয়ে এনে বসাল বলে ও মনে মনে খুবই খুশি হয়েছিল। আশাই করেনি, কেউ ওদের বিশেষ করে চিনবে বা সমীহ করবে। ঘটনাটা দুর্গাপ্রসাদ আর সুহাসিনীর সামনে হল বলে ও আরও খুশি। শ্বশুর শাশুড়ি বুঝুক যে স্কুলেও ওদের মেয়ে কিছু উপেক্ষা করার মত নয়।

একবার তিতুন বেশ উল্লাসের সঙ্গে তার রেজাল্ট দেখাতে গিয়েছিল দুর্গাপ্রসাদকে :

বেশ ভাল রেজাল্টই করেছিল। সব সাবজেক্টেই আটের ঘরে। কিন্তু বার্ষিক রিপোর্টখানা খুঁটিয়ে দেখে দুর্গাপ্রসাদ বললেন, স্ট্যান্ড তো করতে পারলে না।

তনুর বুকে একটা খোঁচা লাগল :

অভিষেককে বলেছিল সে-কথা। 'বাবার কাণ্ডই এই রকম, কোথায় খুশি হয়ে ওকে একটু উৎসাহ দেবেন, তা নয় দমিয়ে দিলেন একেবারে। স্ট্যান্ড তো করতে পারলে না।'

মেয়ের পরীক্ষা মানে কি যে টেনশন, সে তনুই জানে। ওর তো জীবনের সব আনন্দ ফুর্তিই চলে গেছে শুধু এই তিতুনের লেখাপড়ার পিছনে। কার নয় ? অধিকাংশ মায়েদের কথা শুনেই তো মনে হয় সবাই টেনশনে ভুগছে, কিনা ছেলে বা মেয়ের পড়া। পরীক্ষা মানে তো রাতের ঘুম নষ্ট।

অভিষেককে বলেছিল, কি জানো, বাবা এই স্কুলটাই পছন্দ করতে পারছে না।

বাবা মানে শ্বশুর দুর্গাপ্রসাদ।

তবে স্কুলের ওপর ওদেরও একটা অভিযোগ ছিল। ওর এবং অভিষেকের।

আন্ডার-টেন দাবা কমপিটিশনে তিতুন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর খবরটা রটে গিয়েছিল ওদের স্কুলে। কেউ কেউ কাগজে খবরটা দেখেছিল, তনু নিজেও যেচে যেচে শুনিয়েছে দুচারজনকে। ছড়াতে ছড়াতে খবরটা কিভাবে যে স্কুলের টিচারদের কাছেও গিয়ে পৌঁছয়।

ক্লাশ-টিচার বীণা-আন্টি একদিন জিগ্যেস করল, জয়শ্রী, সত্যি ? তুমি দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছ ?

বোধহয় শুনেও বিশ্বাস হয়নি, বলেছিল, প্রাইজটা একদিন নিয়ে এসো তো।

হারিয়ে ফেলবে বা ফেলে আসবে ভয় ছিল, তবু না দিয়েও পারেনি।

বীণা-আন্টি দেখে খুব খুশি হলেন, সারা ক্লাশকে শোনালেন। তারা অবশ্য আগেই জেনে গেছে, কিন্তু গুরুত্ব বোঝেনি।

তিতুন ফিরে এসে বলেছিল, প্রাইজটা দেখাবার কি আছে বলো তো ?

আসলে তিতুন নিজেও গুরুত্বটা অত বোঝেনি।

বলেছিল, প্রাইজটা নিয়ে আবার হেডমিস্ট্রেসকে দেখাতে গিয়েছিল বীণা-আন্টি।

—আমাকে হেডমিস্ট্রেসের কাছে নিয়ে গেল। আমি তো ভয়েই মরি। খুব অ্যাংরি-লুকিং।

তনু হেসে ফেলে জিগ্যেস করল, তারপর ?

তিতুন বললে, অ্যাংরি-লুকিং হলে কি হবে, খুব হাসছিলেন। দারোয়ানকে দিয়ে একটা আইসক্রিম আনিয়ে আমাকে দিলেন।

—তারপর ?

তিতুন বললে, আন্টি যারা আসছিল, তাদের বলছিলেন, এই সেই জয়শ্রী।

দুজন টিচার তো তারপর তনুকেই ডেকে পাঠিয়ে বলেছে, আপনি জয়শ্রীর মা !

সে-সময় খুব গর্ব হচ্ছিল।

দু-একজনকে বলেও ফেলেছে, এরপর ও বড়দের সঙ্গেও কমপিটিশনে নাম দেবে।

ওটা ছোটদাই মাথায় ঢুকিয়ে গেছে। রাশি রাশি বই এনে দিচ্ছে। তাতে সব গ্র্যান্ডমাস্টারদের খেলার বিবরণ আছে। খেলতে বসিয়ে বই দেখে দেখে নিজেই কখনও ববি ফিশার কি বরিস স্প্যাসকি, কখনও কারপভ বা মায়া চিবুরদানিজ। শুনে শুনে তনুরও নামগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

কিন্তু স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অন্য কারণে।

ওরা ভেবেছিল, ও এবং অভিষেক, যে হেডমিস্ট্রেস এবং আন্টিরা যখন এত ভালবাসাবাসি দেখিয়েছে তখন নিশ্চয় স্কুল থেকে কোনও ফাংশন করে সব ছাত্রছাত্রীদের সামনে ওকে একটা অভিনন্দন-টভিনন্দন জানাবে।

কিন্তু তার ধারেকাছেও গেল না। সব চুপচাপ।

সেই অসন্তোষ কিছুটা ঘুচে গেল ওই অ্যানিভার্সারি ফাংশনে এসে কিছুটা আপ্যায়ন পেয়ে। সামনের রোয়ে এনে ওদের বসিয়ে গেল বলে।

নন্দিতার যদি কিছুটা ঈর্ষা হয়েই থাকে, হোক না। ঈর্ষাও এক ধরনের প্রশস্তি।

ঠিক এই সময়েই নন্দিতা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, বকুল না ?

খুব সাজগোজ করা, দামি শাড়ি গয়না পরা একজন তনুদের রোয়েই এসে বসছিলেন। ওই টিচারদের দুজন ওঁকে ডেকে এনে বসতে বলল।

অর্থাৎ বেশ সম্মানীয় কেউ। দেখে মনে হয় বেশ বড় ঘরের বউ। সাচ্ছল্য তার গা

থেকে যেন সেন্টের মত আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

সামনের রোয়ের আসনগুলো প্রায় সবই ভর্তি হয়ে আসছে। এ-রকম বেশবাস কেশবন্ধনের মহিলা আসাতে তনুর একটু বুক দুরদুর করল।

এইরকম গণ্যমান্য লোক আরও এসে পড়লে অচেনা টিচাররা তনুদের সবাইকে উঠিয়ে দেবে না তো?

হয়তো বলবে, পিছনে গিয়ে বসুন।

যারা বসিয়ে দিয়ে গেছে তাদের আর দেখতেও পাচ্ছে না। হয়তো গ্রিনরুমে গিয়ে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করছে।

যদি উঠিয়ে দেয়, অপমানের একশেষ। এই ফাংশনের টিকিট আসলে তো টিকিট নয়। সিনেমা হলের মত নম্বর থাকে না। স্রেফ ছাপানো কার্ড। ইনভিটেশন। এখন উঠে যেতে হলে একেবারে শেষের দিকে।

নন্দিতা ইতিমধ্যে নিজের আসন ছেড়ে চলে এসেছে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই।

নন্দিতা তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ডাকল, তনুকা, আয় একবার।

তনু উঠে গেল।

তনুকে : 'এ আমার স্কুলের বন্ধু বকুল।'

তনুর পরিচয় দিল। 'এর মেয়ে আর আমার ছেলে একই ক্লাশে।'

তনু হঠাৎ উদার হবার চেষ্টা করল, হেসে বললে, ও কিন্তু ক্লাশের ফার্স্ট বয়ের মা। বলে অনুপমকে দেখিয়ে দিল।

ব্যাপারটাকে হেসে হাল্কা করে দিয়ে নন্দিতা বললে, বকুল তুই এখানে? উঃ কতকাল দেখা হয়নি বল তো। দুই পুরনো বন্ধু জলে জলে মিশে গেলে, নতুন বন্ধু তনুর পক্ষে তখন তেলের মত ভেসে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি।

ভদ্রমহিলা নন্দিতার দুই বাহু দুহাতে ধরে হেসে উঠলেন। বললেন, মেয়ে নাচবে রে।

—অ্যাঁ। চমকে উঠল নন্দিতা। —কত বড়?

ভদ্রমহিলা অর্থাৎ বকুল বললে, ক্লাশ নাইনে।

তারপর ব্যাখ্যা করলে, গত বছরই কলকাতায় এসেছি, এখানেই ভর্তি করে দিলাম।

—তোর এত বড় মেয়ে।

প্রশ্ন করেই চুপ করে গেল নন্দিতা। তারপর তনুর দিকে তাকিয়ে বললে, ক্লাশ নাইনে পড়তে পড়তেই বকুলের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে এত বড় হবে না?

বকুলকে বললে, কই সে?

—স্টেজেই দেখবি।

প্রথমে বলেনি বকুল। ওর এক একটা নাচ হয়ে যাচ্ছে আর প্রচণ্ড হাততালি পড়ছে। না থাকতে পেরে বকুল নন্দিতার দিকে ফিরে একটু চাপা গলায় বললে, এই।

তনুও শুনতে পেল।

ওরা ভাবতেও পারেনি এই অনিন্দিতা, বকুলের মেয়ে। কি ভাল যে নাচে। দেখতেও সুন্দর। মায়ের চেয়েও।

প্রথম দিকে একটার পর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। যেমন হয়, স্কুলের অনুষ্ঠানে কেউ আবৃত্তি করল, কেউ ক্যারিকেচার। কেউ নাচ দেখাল। দু-তিনটি মেয়ে গান গাইল। একটা ছোট্ট ছোটদের নাটকও হয়ে গেল। কেউ কেউ পার্ট ভুলে যাচ্ছিল, স্টেজ সাজানো হচ্ছে, হঠাৎ কেউ স্ক্রিন খুলে দিল দড়ি টেনে। তাই হাসির হুল্লোড় পড়ে যাচ্ছিল মাঝে

মাঝে। যারা একটু-আধটু ভাল করছিল, তারা সামান্য হাততালি পাচ্ছিল। কিন্তু সে যেন নিতান্তই সৌজন্যবোধ থেকে।

এরপরই মাইকে ঘোষণা হল অনিন্দিতার নাম। 'আমাদেরই স্কুলের এক ছাত্রী। প্রথমে দেখাবে সে ভরতনাট্টম, ওড়িশি, শেষে কত্থক।'

তখনও ওরা কল্পনা করেনি এই অনিন্দিতাই বকুলের মেয়ে। বরং ভেবেছে আগে যে মেয়েটি নাচল কিন্তু তেমন হাততালি পেল না সে-ই বুকলের মেয়ে। হাততালি পায়নি বলেই হয়তো বুকল পরিচয় দিচ্ছে না আমার মেয়ে বলে।

ওরা কেউ আশাও করেনি যে এমন চমৎকার নাচতে পারে এই স্কুলেরই কোনও মেয়ে। বছর পনেরো-ষোলো মাত্তর বয়স, দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল। নাচের পোশাকে।

নাচ শুরু হতে না হতে সারা প্যান্ডেল নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। দুমিনিটের মধ্যে যেন সবাইকে জাদু করে ফেলল মেয়েটি।

অপূর্ব! অপূর্ব।

দুর্গাপ্রসাদের মত গুরুগম্ভীর মানুষও বলে উঠলেন।

আর নাচ শেষ হতেই সারা প্যান্ডেল জুড়ে কি তুমুল হাততালি, যেন থামতেই চায় না। এরপরও ওড়িশি, তারপর কত্থক। প্রতিবারই এক একটা নাচ থামছে, কিন্তু হাততালি যেন আর থামতে চায় না।

তনু আর নন্দিতাও জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছিল।

আর তখনই বকুল তারা সারা মুখ, সারা শরীরকে দমকা বাতাসের গোলাপবন বানিয়ে ফেলে পিছন ফিরে হাসতে হাসতে নন্দিনীকে বললে, আমার মেয়ে রে।

তনু শুনতে পেয়েই অবাক হয়ে বললে, তোমার মেয়ে!

নন্দিনী পিছন থেকে ছুঁড়ে দিল, ও তো দারুণ নাচে রে।

বকুল তখন হাসছে আর হাসছে, সে হাসি যেন আলো ছড়াচ্ছে চারপাশে।

তনুর রীতিমত গর্ব হচ্ছিল ওর এই একটু আগে বকুলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে। অনিন্দিতার মাকে আমি চিনি এ-কথা বলতেও যেন গর্ব। একেবারে আত্মীয় মনে হচ্ছিল, তা না হলে প্রথম আলাপের পরেই 'তুমি' বলে বসবে কেন। অবাক হয়ে বলেছে, তোমার মেয়ে!

এরপরও 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে আবার অনিন্দিতা। আবার সেই হাততালি।

ফাংশন শেষ হল, কিন্তু সারা প্যান্ডেল জুড়ে তখন একজনকে নিয়েই আলোচনা। মুখে মুখে শুধু একটাই নাম। অনিন্দিতা, অনিন্দিতা।

হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল, স্কুলের পক্ষ থেকে অনিন্দিতাকে একটা স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। সোনার মেডেল।

সমবেত সকলে আনন্দে হইহই করে উঠল।

তনু আর নন্দিতা বকুলের কাছে গিয়ে তার মেয়ের প্রশংসা করে চলে আসছিল।

বকুল বললে, দাঁড়া, মেয়েকে দেখবি না।

কিন্তু দেখবে কি করে। অনিন্দিতা গ্রিন রুমে গিয়ে পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই চারপাশ থেকে সব টিচাররা তাকে ঘিরে ধরল। যেন অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলতে পেরে তারা কৃতার্থ।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ওদের।

অনিন্দিতা ছাড়া পেয়ে ওর মার কাছে এগিয়ে এল।

দেখে এখন আর চেনাই যায় না। একটা ঝকঝকে জমকালো প্রিন্টের 'ধোতি' আর

শরীর ফোটানো নীল গেঞ্জি। মুখে তখনও মেক-আপের রংচং, চোখে কাজল, ভুরু-টান, কপালে নাচের টিপ।

ধোতি-গেঞ্জিতে দেখতে ভাল লাগল না। তবু খুব প্রশংসা করল ওরা।

'পরে দেখা হবে' বকুলকে, নন্দিতাকে বললে, চল চল।

বাড়ি ফিরেই তনুকে ফোন, কি কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে বকুল ভাবতে পারবি না। তা না হলে পনেরো বছরে বিয়ে হয়।

তারপরই : মেয়েকে দেখলি ?

দুপক্ষেই হাসি। তারপর ! কি করে এত ভাল শিখল বল তো ? ওর শ্বশুরবাড়িও তো খুব কনজারভেটিভ ছিল।

তনু বললে, যাই বল, ও একটা জিনিয়াস। ওর মেয়ে। দেখিস পরে খুব নাম করবে।

পাঁচ

গোপীনাথ মল্লিক রোডের একটি বড় যৌথপরিবারে বকুল মানুষ হয়েছে। বাবা কাকা জ্যাঠা সকলেরই পুত্রকন্যা নিয়ে বেশ বড় বড় পরিবার, কিন্তু সকলকে নিয়ে সংসার একটিই।

প্রায় একশো বছর আগে এই বিশাল বাড়িখানা যিনি করেছিলেন, তিনি শুধু ধনগর্বে এমন একখানা চোখ ধাঁধানো অট্টালিকা গড়ে তুলেছিলেন কি না সন্দেহ আছে। সম্ভবত তাঁর কিছু দূরদৃষ্টিও ছিল। চারপাশে বিঘে কয়েক জমি নিয়ে একটা আম লিচুর বাগানও ছিল, একটা পুকুর। পুকুর বুজে গেছে অনেকে কাল আগেই, বাগানও প্লট করে বিক্রি হয়ে গেছে কয়েক পুরুষ হল। যিনি তৈরি করেছিলেন এই দুর্গপ্রতিম বাড়িটি, তিনি হয়তো ভাবতে পারেননি তাঁর বংশধররা শুধু সংখ্যায় বাড়বে, সম্পদে বাড়বে না।

বকুল উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু একটা গর্ব পেয়েছিল, যা কেবল বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করা যায় বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে, বলা যায় আমাদের বাড়ি। বাইরের লোক বলতে স্কুল বাসের সঙ্গীরা। ফ্রক পরা সেই সঙ্গীরা অবাক হয়ে প্রথম দিনই প্রশ্ন করেছিল, তোদের নিজেদের বাড়ি ? বাড়ি ফিরে সেই মেয়েগুলো নিশ্চয় বাবা-মার কাছে বিশাল বাড়িখানার বর্ণনা দিয়ে নিজেদের বাড়িটা সম্পর্কে অসন্তোষও প্রকাশ করেছিল।

বাড়িটার দরজার কাছে এসে স্কুল বাস থামত, স্কুলের ইউনিফর্ম পরে বকুল বেরিয়ে আসত। কিন্তু ওই দরজা অবধি এসে বাসে উঠবে, তাও বাড়ির কেউ না কেউ পৌঁছে দিত। বিকেলে একের পর এক মেয়েদের নামাতে নামাতে স্কুলবাস এসে পৌঁছত ওদের বাড়ির দরজায়, তখন দেখা যেত কেউ না কেউ অপেক্ষা করছে। যৌথপরিবারে লোকের অভাব হয় না, লোকবলও তাদের অন্য সম্পদ।

নন্দিতাদের খুব কৌতূহল ছিল বাড়িটা সম্পর্কে। স্কুলবাসে বসে বাইরে থেকে দেখেছে থামের পর থাম, দোতলায় সারি সারি জানালা, জানালায় খড়খড়ি। নীচে প্রশস্ত গাড়ি বারান্দা, আর তারই ওপরে খোলা ছাদের মত, সুন্দর নকশায় রেলিং দিয়ে চারপাশ ঘেরা। সেই রেলিঙে ঢালাই লোহার রাধাকেষ্ট মূর্তি।

বাড়ির ভেতরটা দেখার খুব সাধ ছিল নন্দিতার। কিন্তু বকুল কোনও দিনই তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলত না। কিন্তু গর্ব করে বলতে ছাড়ত না যে পাড়াটার সব জমি একসময় তাদেরই ছিল।

আম লিচুর বাগান ছিল, পুকুর ছিল, এসব কথা বকুল অনেকবার শুনিয়েছে নন্দিতাদের।

'আমাদের বাড়ি একদিন আয় না,' একথা বলার কিন্তু সাহস ছিল না বকুলের। আম লিচুর বাগান, পুকুর, এসব বকুলের শোনা কথা। নিজের চোখে সে কোনও দিন দেখেনি। নিজের চোখে যা দেখেছে তা কাউকে ডেকে এনে দেখাবার কথা নয়। টাকা পয়সায় টান ধরেছে অনেককাল আগেই, বাড়ির ভিতরটার তাই হতশ্রী অবস্থা। বাইরের দেয়াল তবু কর্নিকের ছোঁয়া পেয়েছিল একবার, থামের ক্ষয়ে যাওয়া ইঁট বদল হয়েছিল, রংও পড়েছিল রাধা-কেষ্ট ডিজাইনের রেলিঙে। কিন্তু ভেতর বাড়িতে যে প্রশস্ত উঠোন, তার লাল সিমেন্ট, তার সর্বত্র ফাটাফুটো, কোথাও কোথাও চুনসুরকি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু মেরামতের দিকে কারও মন নেই।

বকুলের মা একদিন বলেছিল, পাঁচ ভূতের বাড়ি, কে করবে!

ঘরগুলোও হতশ্রী। পুরনো দিনের দু-চারটে নকশাকাটা খাট আসবারের এপাশে ওপাশে সেকেন্ড হ্যান্ড বাজার কি ফুটপাথ থেকে কেনা টেবিল-চেয়ার, কিংবা এটা ওটা।

বাড়িটা পেল্লায় হলেও বকুলদের ভাগেও দুখানা ঘর। একটাই রক্ষে, ঘরগুলো বিশাল বিশাল, সিলিং খুব উঁচু। মাঝখানে রোদ বৃষ্টির উঠোন, পিছনে আবার এক সারি ঘর। সেও দোতলা।

বকুল শুনেছে একসময় সব রান্না নাকি একসঙ্গেই হত। ওর সময়ে নামেই যৌথপরিবার, একান্নবর্তী নয়। অন্ন সব পৃথক পৃথক। যে যার চাকরি, দোকান কিংবা জমানো টাকার সুদে নিজের নিজের সংসার চালায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে সকলে মিলে একাত্মবৃত্তি। বাইরের দুনিয়া যে বদলে যাচ্ছে সে বিষয়ে সবাই অন্ধ। রক্ষণশীল গোঁড়ামির নিয়মে মেয়ে বউরা একা বার-দরজার চৌকাঠ ডিঙোবে না। সেজন্যেই কেউ না কেউ বকুলকে বড় দরজা থেকে বাস দরজা অবধি পাহারা দিত।

বাসে উঠেই বকুল কিন্তু আনন্দে ফুর্তিতে অন্য মানুষ হয়ে যেত। আর মশগুল হয়ে নন্দিতাদের সঙ্গে গল্প করলেও ওর চোখ বাসের জানালা ছাড়ত না। বাইরের সেই একঘেয়ে রাস্তাঘাট, দোকানপাট, রাস্তার চলন্ত মানুষ সব দেখত। পলকের জন্যে কোনও চলন্ত চোখে চোখ, সঙ্গে সঙ্গে হাসি। নন্দিতার কানে ফিসফিস। ছেলেটা তাকাল। তারপরই হাসি।

ওদের বাড়িটা সম্পর্কে সকলেরই কৌতূহল ছিল, নন্দিতার একটু বেশি। সরস্বতী পুজোর দিন ওরা ক-বন্ধু ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে খুব সেজেগুজে। দু-একটা ঠাকুর দেখার পরই নন্দিতার মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি এল।

বললে, এই চল্ তো বকুলদের বাড়ি যাই।

বাড়ির ভেতরটা সম্পর্কে ওর প্রথম থেকেই অদম্য কৌতূহল। বকুল যে ওদের পুরনো দিন নিয়ে এত গর্ব করে তার সব সত্যি কি না। বাড়িটা সত্যি সত্যি ওদের, নাকি ভাড়া থাকে। আরও নানা রকম প্রশ্ন জাগত মনে।

স্কুল বাস থেকে নেমে বকুলের সঙ্গে ওদের বাড়ি যাওয়া তো সম্ভব নয়, স্কুলের বাস অপেক্ষাও করবে না ওর জন্যে, আবার ছেড়ে দিয়েও যাবে না।

রামশরণকে সেই ছেলেবেলা থেকে জানে, নামতে গেলেই ধমক দেবে।

যাকে বলল বকুল তারও খুব উৎসাহ। —ঠিক ঠিক, চল যাই।

ব্যস, তিন বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল গোপীনাথ মল্লিক রোডে। বকুলদের বাড়ি কিন্তু হন্ হন্ করে হেঁটে এসে পৌঁছল বটে, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কিন্তু কেমন এক অস্বস্তি। এত বড় বাড়িটায় ঢুকে কোথায় যাবে কোনদিকে তা বুঝতে পারল না।

তাছাড়া, ওরা তিনজন একসঙ্গে থাকলেও সেই কুমারী বয়েসে একটা অজানা বাড়ির ভেতর ঢুকতেও ভয়। কে কোথায় আছে কে জানে, কে কেমন লোক তাই বা কে জানে। যদি নীচের তলায় কেউ না থাকে, আর কোনও পাজি লোক ওদের তিনজনকে...

সে বয়েসে ওদের ওই একটাই ভয়।

ভিড়ের রাস্তাকে ভয় ছিল না, ভয় একমাত্র নির্জনতাকে।

ওরা তাই অস্বস্তিতে বাইরে পায়চারি করছিল, মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে দোতলার জানালাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল।

একটু পরেই একটা হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা ছেলে বাইরে বেরোল।

নন্দিতা এগিয়ে গিয়ে তাকে জিগ্যেস করল, বকুল আছে ?

ছেলেটা বাঁ চোখ কুঁচকে এমন ভাব দেখাল যেন ওরকম কোনও নামই শোনেনি। তারপর বললে, জানি না। বলে চলে গেল।

আবার একটু পরে আরেকজন, আরেকটু বড়। বাড়ি ঢুকছিল।

নন্দিতা পিছন থেকে বললে, বকুলকে একটু ডেকে দেবেন ?

সে ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, কারও কোনও দেখা নেই। বেশ বুঝতে পারল যাকে বলেছে সে কোনও খবরই দেয়নি।

ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল বকুল হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বর কত জন জানিস ? সেভেন্টি টু, বাহাত্তরজন।

একটা বাড়িতে, তা সে যত বড়ই হোক, একসঙ্গে একই পরিবারে বাহাত্তরজন লোক থাকতে পারে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ধরে নিয়েছিল বকুলের অন্য সব কথার মতই এ-কথাটাও বাড়িয়ে বলা।

ভাবল, যাকে বলেছে সে হয়তো খবরই দেয়নি। হাফ-প্যান্ট পরা যে বাচ্চা ছেলেটা বেরিয়ে গেল, সন্দেহ হল, সে জানে তবু বলল না।

সেই সময়েই একজন ঠিকে-ঝি ভিতর থেকে এক বালতি নোংরা নিয়ে এসে রাস্তার ওপরই ফেলল।

নন্দিতা তাকেই ধরল। —বকুল আছে ?

—বকুল ! একটু কি যেন ভাবল।

তারপর বললে, ও। সে তোমার ছোট তরফের। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাও, সামনের ঘর।

এবার একটু সাহস হল, সেই ঝিয়ের পিছনে পিছনে ভেতরে ঢুকল।

ঢুকে জিগ্যেস করল, সিঁড়ি কোনদিকে।

ঝি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মুখ নেড়ে ইশারা করল, অর্থাৎ উঠে যাও।

মুখে কোনও কথা বলল না। আর ইশারা করে দিয়েই দ্রুত উল্টো দিকে চলে গেল।

ওরা সিঁড়ি দেখতে পেয়ে ভয়ে ভয়ে বেশ খানিকটা উঠে চেঁচিয়ে বকুলের নাম ধরে ডাকল বারকয়েক।

নানা বয়সের এক একটা ছেলে বা মেয়ে এক একবার এসে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে, কোনও কথা না বলে।

শেষে ডাক শুনে বকুল এল। ওদের দেখেই প্রথমটা অপ্রতিভ, অস্বস্তির ছায়া।

তারপর হাসার চেষ্টা করে বললে, আয় আয়। কি খবর রে।

নন্দিতা বেশ বুঝতে পারল বকুলের জড়তা কাটছে না। যেন ওরা এসে পড়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছে।

নন্দিতা বললে, কখন থেকে তোকে খুঁজছি, কেউ যেন চেনেই না তোকে। জবাবই দেয় না।

বকুলের মাও তখন এগিয়ে এসেছেন।

বকুল হেসে বললে, মা, আমার ইস্কুলের বন্ধু।

লালপাড় সাদা শাড়ির ঘোমটায় প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানা হাসল।

—অনেকক্ষণ এসেছ ? কেউ কিছু বলেনি ?

আসলে নন্দিতার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। হেসে বললেন, ওসব শরিকি ব্যাপার তোমরা বুঝবে না। এসো এসো।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাট-বিছানা দেখিয়ে বসতে বললেন।

ততক্ষণে নন্দিতাদের সব কৌতূহল মিটে গেছে।

দরজার আড়াল থেকে জনাকয়েক বাচ্চা ছেলেমেয়ে উঁকি দিয়ে ওদের দেখছিল বলে নন্দিতার একটু অস্বস্তি হল।

ইতিমধ্যে একটা কাঁসার রেকাবি করে গোটা কয়েক সন্দেশ এনে দাঁড়ালেন বকুলের মা।

ওরা মাথা নাড়তেই বললেন, পুজোর দিন না খেলে কি চলে।

বকুলের মার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা আপত্তি করতে পারল না। কি ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ মুখ, চোখে কেমন তৃপ্তির চাউনি। যেদিকে তাকাচ্ছে নন্দিতা সেদিকেই সচ্ছলতার অভাব ফুটে উঠছে, অথচ বকুলের মার দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন খুব সুখী মানুষ।

নন্দিতা নিজের মার মুখে কখনও এই তৃপ্তি, এই স্নিগ্ধতা দেখেনি।

কিছু একটা বলতে হয় বলেই নন্দিতা বললে, কি বিশাল বাড়ি আপনাদের।

ওর মা হাসলেন, বাড়ির আর কি আছে, শুধু ইঁট কখানা।

এই সময় বকুল এসে দাঁড়াল দুহাতে দুগ্লাস জল নিয়ে। —ধর, আরেক গ্লাস আনছি।

বকুলের কানে মার কথাগুলো গিয়েছিল।

আরেক গ্লাস জল নিয়ে এসে বললে, আয়, দেখাই তোদের।

অর্থাৎ বাড়িটা।

এই অভাবের সংসার নিয়ে মার কোনও সঙ্কোচ নেই বকুল তা জানে। কিন্তু এই নন্দিতারা তো বাইরের লোক, তাদের কাছে নিজেদের ছোট করবে কেন।

ওদের বারান্দায় নিয়ে এসে দেখাল, ওই যে দেখছিস উঠোনের ওধারে, একসময় ওটাই ছিল ভেতর-মহল।

নন্দিতা দেখল একটা বিশাল উঠোনের রোদ ডিঙিয়ে ওধারেও ব্যারাক ধরনের দোতলা বাড়ি। সারি সারি জানালা, জানালায় খড়খড়ি।

—আমরা যেদিকটায় রয়েছি, এটা ছিল পুরুষমহল। বৈঠকখানা, কাছারিঘর, নাচঘর ...

—নাচঘর ? নন্দিতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

বকুল হেসে বললে, আয় দেখবি আয়।

বারান্দা ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল। —ওই দেখ।

বেশ বড়সড় নকশাকাটা কাঠের দরজা, দরজার দুপাশে এখানে ওখানে চুনকালি খসে পড়েছে। কাঠের দরজা, দরজার নকশা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে, ময়লা জমে জমে কাল হয়ে আছে। দেখানোর মত কিছু নয়।

বকুল বললে, ওপরটা দেখ।

ঘরের সিলিং যেমন উঁচু, দরজাগুলোও। এই দরজাটা আরও।

ঘাড় উঁচিয়ে এতক্ষণে চোখে পড়ল।

অর্ধবৃত্তাকার একটা বিশাল পাথরের চাঁই দরজার মাথায়। তার ওপর লতাপাতাফুলের নকশা করা। মাঝখানে খোদাই করা আছে 'নাচঘর'।

এ বাড়ির ছেলেমেয়ে বউরা কেউ কেউ যাতায়াত করছিল নানা কাজে, একবার তাকিয়ে দেখছিল, ব্যস। কেউ কোনও প্রশ্নও করছে না, বকুলও কাউকে কিছু বলছে না। যেন অচেনা লোক তারা।

এ কেমন বাড়ি রে বাবা, নন্দিতার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।

বুঝতে পারছিল এক পরিবারের লোক হলেও কারও সঙ্গে কারও বিশেষ সম্পর্ক নেই। হয়তো সম্পর্কটা রেষারেষির, রাগারাগির, হিংসের। বকুলের মার কথাটার মানে বুঝতে পারছিল। 'শরিকি বাড়ি, বুঝতেই তো পারছ।'

জয়েন্ট ফ্যামিলি কথাটা শুনে এসেছে এতকাল, তার চেহারা যে এরকম তা জানত না। কিংবা কে জানে, আগে হয়তো ভাল ছিল। এরাই এরকম।

—ভেতরটা দেখবি? এখন জেঠিমারা থাকে।

ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল নন্দিতাদের। বললে, না না।

বকুলদের ঘরে ফিরে এল, এসে বললে, চল্, একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে বকুলের মুখ শুকিয়ে গেল। —না রে, আমি যাব না।

—মাসিমা, বলুন না ওকে। ঠাকুরটাকুর দেখে ওকে আমরা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

বকুলের মা বললেন, ভাইবোনদের নিয়ে ও তো একবার ঘুরে এসেছে।

একটু থেমে বললেন, আগে তো বাড়িতেই পুজো হত।

নন্দিতা তখনও আব্দার করছে, না না, আমাদের সঙ্গেও একবার চলুক, মাসিমা।

বকুলের মার মুখে ছায়া পড়ল। বললেন, তোমরা বুঝবে না। তোমাদের সঙ্গে গেলে কে কোথায় কি বলে বসবে, এ বাড়ির হালচাল তোমরা জানো না।

বকুল মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। ওদের কাছে রক্ষণশীল গোঁড়ামির চেহারাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে বলে। অথচ না বলেও উপায় নেই।

বললে, কাকিমা জেঠিমাদের জানিস না। জেঠতুতো বউদিগুলো আরও সাংঘাতিক।

নন্দিতারা ফিরে এল।

বাইরে থেকে দেখে বিশাল বাড়িটা সম্পর্কে যেটুকু মোহ গড়ে উঠেছিল এক নিমেষে সব ধসে পড়ল।

খুবই অসন্তুষ্ট ওরা, একজন আবার হেসে টিপ্পনী কাটল, হ্যাঁরে, নাচঘর আবার দেখাবার জিনিস নাকি? ওখানে তো আগে বাইজিরা নাচত।

বাড়ি ফিরে ওর বাবা-মার কাছে নন্দিতা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওদের বাড়ির গল্প বলল। নাচঘরের কথাও। শুধু বলল না, ওদের বাড়িটা কি গোঁড়া, বকুলকে ওদের সঙ্গে একটু বাইরে বেরোতেও দিল না। পাছে ও-সব শুনে ওর বাবা-মাও যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে, তা কেড়ে নেয়। মা তো কথায় কথায় বলে উঠতি বয়েসের মেয়েদের এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই। উঠতি বয়েস! তখন তো সবে ক্লাশ এইটে পড়ে। কিন্তু মনে মনে ওরা নিজেদের পুরোপুরি সাবালক ভাবত। বড়ই। যেন ওদের বুদ্ধিবিবেচনা নেই। কি যে ভাবে বড়রা।

কিন্তু একটা ব্যাপার নন্দিতার বড় অদ্ভুত লেগেছিল।

বকুলদের সবারই তো ভিন্ন ভিন্ন সংসার, কেউ কারও তোয়াক্কা করে না। নাম বলে জিগ্যেস করলে, চিনি না বা জানি না। ঠিকে-ঝিটা যে ইশারায় সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে তরতর করে চলে গিয়েছিল, বোধহয় কথা বলাও মানা। বকুলের মার কথা শুনে তো বুঝেছে কেউ কাউকে পছন্দ করে না। তবে তারা কে কি বলল, না বলল তাতে কি যায়

আসে। তাদের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকারই বা কি অর্থ হয়।

বড় হয়ে বুঝেছে, এরই নাম সমাজ। কতকগুলো নিচু মনের মানুষ হিংসে দিয়ে সমাজটাকে ধরে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সবাই পৃথক, সবাই স্বাধীন। কিন্তু কিছুই করার নেই, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

স্কুলে একদিন বকুলকে ঠাট্টা করে বলেছিল, বাড়িতে নাচঘর আছে, নাচ শিখিস না কেন ?

এমন ভাবে বলেছিল যেন ওখানে একসময় বাইজি নাচাত তা জানেও না।

বকুল দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলেছিল, খুব শখ ছিল রে, নাচের স্কুলে ভর্তি হব। ওরা কেউ রাজি হল না ; জেঠি, কাকিরা, খুড়তুতো জেঠতুতো বউদিরা। তা হলে নাকি ওদের মেয়েদেরও বদনাম হবে।

হেসে বলেছিল, যে-বাড়িতে একসময় এত নাচগানের চর্চা হত, সে বাড়ির মেয়ে নাচের স্কুলে ভর্তি হলে বদনাম হবে !

নন্দিতা আর ওর দু-বন্ধু সেদিন বেরিয়ে এসে বলেছিল, এত আটকে আটকে রাখে, ও মেয়ে দেখিস একদিন একটা কীর্তি করে বসবে।

না, তেমন কিছুই ঘটেনি।

ক্লাশ নাইনে উঠে হঠাৎ শুনল বকুলের বিয়ে। কতই বা বয়েস তখন। চোদ্দ কি পনেরো। একটু বয়েস লুকিয়েও যদি থাকে, ষোলো।

ওরা হেসেই আকুল। স্কুলে পড়তে পড়তে বিয়ে ! ম্যাগো !

তারপরই ছাড়াছাড়ি। বিয়েতে ওরা যায়নি।

এই এতকাল পরে আবার দেখা !

সেই নাচঘরের কথাটাই মনে পড়ে গেল। বকুলের কথাটাও। এত শখ ছিল নাচের ইস্কুলে ভর্তি হবার !

সে-সব কথা নন্দিতা তনুকাকে ফোন করে বললে।

—মার শখ এখন মেয়ের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে, বুঝলি না ?

তারপরই : ওর বিয়েও তো হয়েছিল ওই রকম জয়েন্ট ফ্যামিলিতে, খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। কি করে শেখাল বল তো !

তনু হাসতে হাসতে বললে, শুনলি না, বলল বাইরে ছিলাম, এ বছরই এসেছি। ও ঠিক বরকে নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

বকুলের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ওর মেয়ে বড় হয়ে গেছে বলে পৌঁছে দেওয়ার বা নিয়ে যাওয়ার জন্যে বকুলকে আসতে হত না। সেজন্যেই এতদিন দেখতে পায়নি।

ড্রাইভার গাড়ি করে অনিন্দিতাকে নামিয়ে দিয়ে যেত, ছুটির পর নিয়ে যেত।

দু-একদিন দেখল দূর থেকে। দিব্যি স্কুলের নীল-পাড় শাড়ি পরে ভাল মেয়ে সেজে আসে যায়। কে বিশ্বাস করবে এই মেয়েই জমকালো পোশাকে স্টেজে উঠে নাচে মাতিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। আবার ঝকমকে পাঁচরঙা প্রিন্টেড ধোতি আর নীল গেঞ্জিতে শরীর ফুটিয়ে চমকে দিয়েছিল নন্দিতাকে, তনুকাকে।

বকুলের ফোন নম্বরটা সেদিন জিগ্যেস করা হয়নি, চেয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল অনিন্দিতার কাছ থেকে।

কিন্তু স্কুলে এসে অনিন্দিতাকে ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়নি।

কেন হবে।

পরের দিন স্কুলে এসেই দেখে সবারই মুখে অনিন্দিতাকে নিয়ে আলোচনা। যেন

একটা দিন নাচ দেখিয়েই বিশ্বজয় করে ফেলেছে।

হতচ্ছাড়া দারোয়ানটা কাউকে কেয়ার করে না, ছুটে এসে অনিন্দিতার গাড়ির দরজা খুলে বললে, আসুন দিদি, আসুন।

কে যেন বললে, বাবা, ও যে ভি আই পি হয়ে গেল!

নন্দিতা আর তনুও দেখল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুখ টিপে হাসল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই শুনতে পেল পিছনে কয়েকজন বলে উঠেছে, ওই তো গেল, ওই যে অনিন্দিতা!

—কই? কই?

আরও কয়েকজনের কণ্ঠস্বর।

তনু ফিরে তাকাল। ওদের বন্ধুদের দুচারজনও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে। শ্রাবণী, দীপা, মুকুল।

তনু ফিরে তাকাতেই শ্রাবণী বললে, অনিন্দিতা গেল এখনই, দেখলি?

তনু শুধু ঘাড় নাড়াল।

দীপা না মুকুল কে একজন বললে, কি দারুণ নাচল কাল, দেখিসনি?

শ্রাবণী বললে, বড় হলে ও খুব নাম করবে। তখন হয়তো আমাদেরই লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হবে।

একজন অচেনা কে বলে উঠল, ও তো এখন স্কুলের গর্ব।

গত সন্ধ্যায় তনুরও গর্ব হয়েছিল। নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে ও যখন জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছিল তখনই শুনতে পেল বকুল নন্দিতাকে হাসতে হাসতে বলছে, এই আমার মেয়ে!

অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। যে কিশোরী মেয়েটি এত সুন্দর নাচে, সারা প্যান্ডেল মাতিয়ে দিয়েছে যে মেয়েটি, তার মা বকুলের সঙ্গে একটু আগেই আলাপ হয়েছে বলে।

আজ সকালেও দুর্গাপ্রসাদ ও সুহাসিনী যখন অনিন্দিতাকে নিয়েই আলোচনা করছিলেন, অভিষেক বলে উঠল, ও একটা প্রডিজি, তখন খুশিতে তনু মনে মনে বলেছে, আমি ওকে চিনি, ওকে চিনি। যেন ওর সঙ্গে আলাপ হওয়াটাও গর্বের।

আর এখন সারা পৃথিবীটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

যেদিকে তাকায় সকলের মুখে-চোখেই উদ্দাম উচ্ছ্বাস। অভিভূত ভাব। যেন এর আগে কেউ কখনও ভাল নাচ দেখায়নি। যেন পৃথিবীতে আর কেউ নাচতে জানে না।

অবাক লাগছে তনুর। এই দুদিন আগে যারা ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে এসেছে, তিতুনকে দেখতে চেয়েছে, জয়শ্রী কই, জয়শ্রী কই, তারা আজ আর কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে তনু।

নন্দিতাও ওর কাছে এগিয়ে এল, শ্লেষের হাসি হেসে বললে, সকলে পাগল হয়ে গেছে। নেচেছে, ভাল নেচেছে, তার বেশি তো কিছু নয়।

তনুও শ্লেষের হাসি হাসল।

মনে মনে বললে, তিতুন, তুই আরও আরও বড় হ। অনেক বড়। ছোটদা, ওই যে কি সব নাম বলে, তুই তাদের মত হয়ে ওঠ, পৃথিবী জুড়ে তোর নাম হলে...

চোখে জল এসে গেল তনুর। মনে মনে বললে, তুই আমাকে বাঁচিয়ে তোল তিতুন, আমাকে আবার ভিড়ের মানুষ হয়ে যেতে দিস না।

—কি রে বাড়ি যাবি না? নন্দিতা বললে।

—চল।

ফোন নম্বরটা জেনে নেবার ইচ্ছেও চলে গিয়েছিল নন্দিতার। অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা করে কথা বলার ইচ্ছেও ছিল না।

এই বন্ধুর দল, যারা একদিন সপ্রশংস ভাবে বলেছে, 'তোর আর কি চিন্তা বল, তোর ছেলে তো ফার্স্ট বয়', 'তুই কি লাকি রে, এমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলে তোর', কে একজন বলেছিল, 'বীণা-আন্টি তো বলে অনুপম একটা জুয়েল', তারা সব নন্দিতার কাছে যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কথা বলতেও ইচ্ছে করে না।

স্কুলের করিডর দিয়ে যাচ্ছিল নন্দিতা, কোনও এক টিচারের সঙ্গে দেখা করা দরকার। হঠাৎ দেখল অনিন্দিতা আসছে। আর তখনই তিন চারজন টিচার পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনিন্দিতার দিকে এগিয়ে গেল।

দেখল তারা হেসে হেসে কথা বলছে অনিন্দিতার সঙ্গে। এমন ভাবে কথা বলছে যেন অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে অরা কৃতার্থ।

টিচারদের সেই বিরক্তি মাখানো পাথরের মুখ একটা ক্লাশ নাইনের ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে যেন সুখী মানুষের মুখ হয়ে উঠেছে।

নন্দিতা চলে আসবে কি না ভাবছিল। অনিন্দিতার সঙ্গে মুখোমুখি হতেও অস্বস্তি।

ও ফিরে আসতে যাচ্ছিল, আর তখনই অনিন্দিতা চিৎকার করে ডাকল, মাসিমা!

অমায়িক বিনয়ের হাসিতে টিচারদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল ও।

—মাসিমা! আপনার ফোন নাম্বারটা। মা চেয়েছে।

নন্দিতার মুখে হাসি দেখা দিল। বাঃ রে, মেয়েটার কি দোষ।

গতকালের একটুক্ষণের দেখা সাক্ষাৎ। ভাল করে দুটো কথাও বলা হয়নি। অথচ দেখো, ও কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে।

নন্দিতা ভেবেছিল, দেখা হলে ওকেই নতুন করে পরিচয় দিতে হবে, ওদের ফোন নম্বরটা চেয়ে নিতে হবে। তার বদলে দেখো, অনিন্দিতাই ওকে মনে রেখেছে, চিনতে পেরেছে। বকুলের ওপরও খুশি হয়ে উঠল, সে নিজেই ফোন নম্বরটা চেয়েছে বলে।

বকুলের ফোন নম্বরটাও জেনে নিয়েছিল ও।

হঠাৎ একদিন ফোন করে বসল।—কে বকুল, কি খবর বল। তোর বরকে তো দেখলামই না।

—সতেরো বছরের পুরনো বরকে আর কি দেখবি। টাক পড়ে যাচ্ছে।

দুপক্ষই হেসে উঠল।

বকুল একে একে সতেরো বছরের ইতিহাস বলে গেল। কিভাবে তার স্বামীকে—মাতৃভক্ত ছেলেটিকে অনেক কসরত করে অনেক চেষ্টা করে সেই রক্ষণশীল গোঁড়া যৌথ-পরিবার থেকে সরিয়ে এনে ম্যাড্রাস চলে গিয়েছিল।

বললে, ভাগ্যিস ম্যাড্রাস।

একটু থেমে হেসে উঠে বললে, তুই তো আমাদের বাড়ি একবার গিয়েছিলি। একটা নাচঘর দেখিয়েছিলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ।

বকুল বললে, নাচের স্কুলে ভর্তি হওয়ার কি যে শখ ছিল। পারিনি। ওই বাড়িটার জন্যে। কি যে রাগ হত জানিস নন্দিতা। কিছুই দেখলাম না, কিছুই বুঝলাম না, বিয়ে দিয়ে দিল পনেরো বছর বয়েসে।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপরই: কি যে রাগ হত বাবা-মার ওপর। শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ম্যাড্রাসে ট্র্যান্সফার।

হেসে উঠে বললে, মেয়ে হল। প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি যা-যা পাইনি সব মেয়েকে দেব। নাচের শখ মা মেটাতে পারেনি তো মেয়েকে দিয়ে মেটাব। ভাল গুরু পেয়ে গেলাম ম্যাড্রাসে। তারপর তোরা তো দেখেছিস।

নন্দিতা বললে, তোর মেয়ে খুব নাম করবে রে, খুব নাম করবে।

ফোন রেখে দেওয়ার পর ওর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল বকুলের কথাগুলো। 'আমি যা-যা পাইনি সব মেয়েকে দেব। মা শখ মেটাতে পারেনি তো মেয়েকে দিয়ে মেটাব।

আজকাল সবই বদলে যাচ্ছে। সবাই তা বলে। মানুষ, সমাজ, পৃথিবী। নন্দিতার হঠাৎ মনে হল আমরা সবাই হয়তো বকুলের মতই। জীবনে যা-যা পাইনি, ছেলেমেয়েদের সব দিতে চাই। যার যা শখ ছিল, স্বপ্ন ছিল, বাসনা ছিল, ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে তা মেটাতে চাই। সেজন্যেই সব বদলে যাচ্ছে। আমরা নিজেরাই হয়তো বদলে যেতে চেয়েছিলাম।

ছয়

তিতুনের জন্যে স্কুলে যেতে আসতে তনুর অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। সেই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েদের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

দুজনে খুবই বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে একটু চিড় খেয়েছিল। দোষটা কার তনু জানে না। তনুর মনে হয়েছিল প্রথম প্রথম উৎসাহ দেখালেও, আনন্দ প্রকাশ করলেও, তিতুনের এখানে-ওখানে বারবার প্রাইজ পাওয়াটা নন্দিতা বোধহয় সহজ ভাবে নিতে পারছে না। কিংবা, ওই যে তনুকে ঘিরে স্কুলের সকলে টানাটানি করছিল, উল্লাস দেখাচ্ছিল, সেটাই কারণ বলে মনে হয়েছে। কিংবা টিচাররা ওকে একটু গুরুত্ব দিয়েছিল বলে।

ফার্স্ট বয়ের মা হিসেবে ওর যা প্রাপ্য এবং পেয়ে আসছিল, একটা বাজে খেলা এই দাবা—তার কমপিটিশনে প্রাইজ পেতে পেতে তিতুনই যেন নন্দিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। অতএব তনুই দায়ী। হাসাহাসি গল্পগুজব সত্ত্বেও একটা দূরত্ব তনু অনুভব করতে পারছিল। তার জন্যে অভিমানও হয়।

ফলে জেদ চেপে গিয়েছিল তনুর। শুধু এই স্কুলের গণ্ডির মধ্যে প্রশংসা, বা যারা প্রতিযোগিতায় নামে, বা পুরস্কার পাবার সময় হাততালি দেয়, সেই ছোট্ট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আরও বড় জায়গায় পৌঁছতে হবে তিতুনকে। খবরের কাগজের বড় হরফে।

ছোটদা এসে বলেছিল, ওদের বড়দের কমপিটিশনেই নামিয়ে দেব।

অভিষেককে বললে, কিছু টাকা ছাড়ুন স্যার। পরে দেখবেন ও আপনাকে অনেক টাকা এনে দেবে।

অভিষেক ওর কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছিল।

ছোটদা বললে, ওর প্রতিভা আছে এ লাইনে, নষ্ট হতে দেবেন না।

অভিষেক তা হতে দেবেই বা কেন। নিজেরা তো, কোনদিকে ট্যালেন্ট ছিল নিজেদের, তা জানতেই পারল না। সুযোগও ছিল না তখন এত, তখনকার বাবাদের দৃষ্টিও ছিল সঙ্কীর্ণ। শুধু লেখাপড়া হলেই যেন সব হয়ে গেল। ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরি, তার বাইরে ভাবতেই পারত না।

অভিষেকের তো ইচ্ছে করে সব সুযোগগুলো তিতুনের সামনে এনে দেওয়ার। ওর সাফল্যে নিজেকে উঁচুতে তুলে ধরার।

ছেলেমেয়ের সাফল্যের চেয়ে বড় কিছু বাবা-মার কাছে আছে নাকি!

কাল হয়েছে আজকালকার এই লেখাপড়ার চাপ। স্কুলের পরীক্ষা যেন এক একটা লাফ দিয়ে খাদ পার হওয়া।

সমস্ত সময়টুকুই তো নিয়ে নেয় ওই স্কুল আর পরীক্ষা। তার ফাঁকে যে এই দাবা খেলার একটু অবসর করে নিতে পারছে এই ঢের।

এখন অভাব টাকাপয়সার নয়, বাবা-মার উৎসাহেরও কমতি নেই, অভাব একমাত্র সময়ের। তা না হলে অভিষেক আর তনু সব সুযোগই এনে দিত তিতুনের সামনে। একবার তো ইচ্ছেও হয়েছিল, ছবি আঁকা শেখাবে, গানের স্কুলে ভর্তি সত্ত্বেও, আরও যদি কিছু থাকে, সব সব।

ছোটদা বললে, বই পড়ে পড়ে গ্র্যান্ড মাস্টারদের খেলা শিখে নিতে বড় সময় লাগে। টাকা ছাড়ুন, ফ্যান্সি মার্কেটে একটা চেস-গেমের ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে। নিজে নিজে খেলা যায়।

দাম শুনে চমকে উঠেছিল অভিষেক, তারপর বললে, ঠিক আছে, দেব।

দাবার সেই ভিডিও গেম বাড়িতে এসে গেছে। তিতুন এখন সেটা নিয়েই মেতে আছে।

ওর একটা নিজস্ব ট্যালেন্ট আছে, বড্ড চটপট দান দিয়ে ফেলে।

ছোটমামার উপদেশে কান দেয় না।

—একটু ভেবেচিন্তে দিবি, এত তাড়াহুড়োর কি আছে?

পাকা মেয়ের মত ওর উত্তর, আরে বাবা, যার সঙ্গে খেলব তাকে তো একটু নার্ভাস করে দিতে হবে। টেনশন হলেই ভুল দান দেবে।

শুনে ওরা সবাই হেসে উঠেছিল। যুক্তিটার জন্যে নয়, ওর মুখে 'টেনশন' শব্দটা শুনে। ওই শব্দটা তো শুধু বুড়ো আর আধা-বুড়োদের মুখেই শোনা যায়। তা বলে তিতুনের মুখে!

ভিতরে ভিতরে তনু স্বপ্ন দেখছিল, বড়দের কমপিটিশনেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। এ ছাড়া নন্দিতার এই অবহেলা কিংবা হিংসের মুখোমুখি জবাব আর কিই বা হতে পারে!

অথচ সামান্য একটা ঘটনায় দু-দুজনেরই মন থেকে সব মেঘ কেটে গেল।

অনিন্দিতার নাচ।

রাতারাতি ওই একটা ঘটনা যেন ওদের দুজনকেই অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে। অনেক কাছাকাছিও।

এখন আর ওদের দুজনের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ নেই, হিংসে নেই। ছিল কি কোনওদিন? তনুর মনে হচ্ছে সবটাই শুধু ভুল বোঝাবুঝি। আসলে ওরা তো পরস্পরের বন্ধুই ছিল, বন্ধুই আছে।

নন্দিতা একদিন ফোন করে বললে, কেমন নাচে কে জানে ভাই, আমরা তো নাচের কিছু বুঝি না। ওই জমকালো পোশাকের জন্যেই হয়তো ভাল লেগেছে সকলের।

তনুর অবশ্য তা মনে হয়নি। নাচ সম্পর্কে ওরা কিছু জানে না ঠিকই, কিন্তু দেখে তো বুঝেছে ভাল নাচে। সবচেয়ে বড় কথা ভাল লেগেছে।

নিজেরাই তো উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করেছে সেদিন। জোরে জোরে হাততালি দিয়েছিল, হাততালি থামাতে ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু খারাপ লেগেছে সকলেই ওকে নিয়ে এতখানি মাতামাতি করছে বলে। এমনকি

টিচাররাও !

নন্দিতাকে এসব কথা বলতে ইচ্ছে হল না।

শুধু বললে, আসলে কি জানিস, স্কুলের মেয়ে যে এত ভাল নাচবে আশা তো করেনি কেউ।

তারপর : ও একাই তো আর ভাল নাচতে জানে না। দেশে অমন কত আছে।

—ঠিক বলেছিস। বকুলের ধারণা...

—ফোন করেছিলি ?

নন্দিতা হেসে উঠল। —হ্যাঁ রে। একদিন যেতে বলল। বোধহয় বাড়িঘর দেখাতে চায়।

একটু থেমে বললে, সেবার তো নাচঘর দেখিয়েছিল, এবার কি দেখাবে কে জানে। বলে হেসে উঠল। বললে, তোকেও নিয়ে যেতে বলেছে।

তনুর বিশ্বাস হল না। সেই এক পলকের আলাপে কেউ কি মনে করে রাখে নাকি। নন্দিতার হয়তো একা যেতে অস্বস্তি, সেজন্যেই সঙ্গী চাইছে। তনুকে ছাড়া আর সঙ্গী পাবেই বা কাকে। অন্য সকলেই তো এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। এক একজনের এক এক রকম অভিযোগ। তনুকে শোনাতেও কসুর করেনি। অনুপম ফার্স্ট বয় হওয়াতে নন্দিতাই যেন কোনও দোষ করে ফেলেছে। কার কাছে পড়ে, ও প্রশ্নটার কি উত্তর লিখেছিল বল না, তোর ছেলের খাতাটা একবার দিবি।

তনু দেখেছে ওকেও সকলে ইদানীং এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখা হলে হাসাহাসি গল্পগুজব হয় ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারে মাঝখানে একটা অদৃশ্য পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে ওরা।

আসলে কেউ তো কারও ভাল দেখতে পারে না।

নন্দিতার কথা ও বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু সত্যি সত্যি বকুল একদিন ফোন করে বসল তনুকে। —এসো না একদিন, নন্দিতা তো আসবে, তার সঙ্গেই।

ফোন নম্বরটা পেল কোথায়। নিশ্চয় নন্দিতা দিয়েছে।

স্কুলগ্যেটের বাইরে দেখা হতেই নন্দিতাকে জিগ্যেস করতে যাবে, ওরা তো সবাই জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঊর্মিলা বললে, সকলকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলল, ছেলেকে এবার সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দিলাম।

কে একজন ঠাট্টা করে বললে, কি ব্যাপার, সোনা আনবে নাকি তোর ছেলে ?

ছেলে মানে শান্তনু। চটপটে, ছটফটে। কাছে পেলে সকলেই একটু আদর করে নেয়।

ঊর্মিলা হেসে উঠে বললে, না রে না। ডাক্তার বলেছে।

তারপর : খুব সর্দিকাশি হয়, ডাক্তার বলেছে রোজ সাঁতার কাটলে সেরে যাবে।

আবার হেসে উঠে : সোনা দরকার হলে কিনেই নেব।

হাসাহাসি চলছিল, এরই ফাঁকে নন্দিতা কাছে এসে বললে, কবে যাবি বল। বকুল ফোন করেছিল ?

গিয়েছিল। যাবার সময় তনু বললে, ঊর্মিলা তার ছেলেকে সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছে। তুইও দে না অনুপমকে।

নন্দিতা হেসে বললে, ঊর্মিলার কথা আলাদা, ও তো নিজেই সাঁতার কাটতে ওস্তাদ।

সাঁতার শব্দটার অর্থ তনুও বুঝল। দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

একটু মজা করার জন্যেই উর্মিলা সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, ছেলেকে সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দিলাম।

কথাটা মিথ্যে নয়। ডাক্তারের পরামর্শে শান্তনুকে সাঁতারে ভর্তি করতে হয়েছে। ছেলেটা প্রায়ই সর্দিকাশিতে ভোগে, একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। সেজন্যে ওদের বাড়ির ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন, রোজ একটু সাঁতার কাটলে সেরে যাবে।

প্রথমে ওদের বিশ্বাস হয়নি, ভয় পেয়েছে যদি রোগ সারার বদলে বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যায়।

পরে মনে হয়েছে, দেখাই যাক না।

কিন্তু কথাটা বলার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। সফলও হয়েছে।

তা না হলে একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে বসবে কেন, কি ব্যাপার, ছেলে তোর সোনা আনবে নাকি ?

হাসি পেয়েছিল ওর। ও জানত ওরা সকলেই মনে মনে এক একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

অভিজিৎকে হাসতে হাসতে বললে, ওরা কমপিটিশন ছাড়া এখন আর কিছু ভাবতেই পারছে না। শান্তনুকে সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করেছি শুনেই ভেবে নিয়েছে, সোনার মেডেল পাবার জন্যে ভর্তি করেছি।

অভিজিৎও হেসে ফেলল।

উর্মিলা হেসে বললে, আমাদের কোনও কমপিটিশনে নামার দরকার নেই, আমরা তো আগে থেকেই জিতে বসে আছি।

অভিজিৎ প্রশ্ন করল, কি রকম ?

—বলব না।

সত্যি সত্যি উর্মিলা এক জায়গায় জিতে বসে আছে। উর্মিলা তা জানে। ওদের কথাবার্তা হাবভাবে তা ধরা পড়েছে অনেক আগেই।

আসলে উর্মিলা আর অভিজিতের প্রেমের বিয়ে। বাবা-মার অমতেই বিয়ে করেছে অভিজিৎ। উর্মিলাও।

তাই প্রথম থেকেই ওদের এই আলাদা ফ্ল্যাট।

সকলেই কথায় কথায় বাবা-মা কিংবা শ্বশুরশাশুড়ির গল্প করত। নন্দিতা, তনুকা, দীপা, শ্রাবন্তী, আরও অনেকে।

উর্মিলা কোনও দিনই ওদের কথায় কোনও আগ্রহ দেখায়নি। ও সব কথা ওকে কোনও দিন স্পর্শও করত না, কিংবা বুকের মধ্যে এমন কোথাও স্পর্শ করত যেখান থেকে টেনে এনে সেটা বাইরে প্রকাশ করা যায় না। ওদের সমস্ত কথাই ওর কাছে বিস্বাদ ঠেকত।

ও যে ওদের আলোচনায় কখনও যোগ দেয় না তা বোধহয় অনেকেই লক্ষ করেছিল। চুপচাপ আসত, পাশাপাশি বসে অপেক্ষা করত, চলে যেত শান্তনুকে নিয়ে। বড় জোর দু-চারটে কথা ছেলের পড়া সম্পর্কে।

দীপা একদিন হঠাৎ ধরে ফেলল উর্মিলাকে। —এই, তুই কিছু বলিস না যে। কি ব্যাপার কি তোর ? শাশুড়ি খুব ভালমানুষ বুঝি ?

উর্মিলা হেসে ফেলল। কিছু বলল না।

শ্রাবন্তী বললে, তোর কিছু একটা ব্যাপার আছে।

ওদের একটু সন্দেহ জাগতে শুরু করেছিল উর্মিলা কোনও দিন সংসারের কোনও গল্প করত না বলে।

সকলে চেপে ধরতে শেষ অবধি ঊর্মিলা হেসে ফেলে বললে, আমাদের তো প্রথম থেকেই দুজনের সংসার, এখন আড়াই জনের। কি গল্প বলব ?

প্রথম থেকেই দুজনের ? কেন ? কেন ?

ঊর্মিলা হেসে ফেলে বললে, আমাদের তো প্রেমের বিয়ে।

—লভ ম্যারেজ ! দীপা বলে উঠল বেশ রসিকতার ভঙ্গিতে।

আর সবাই হই হই করে উঠেছিল। ওর প্রেমের গল্প শোনার জন্যে।

বিয়েটা দুজনেরই বাবা-মার অমতে শুনে ওদের কারও বোধহয় পছন্দ হয়নি। ভাবখানা এই, স্বামী বাবা-মার অমতে করলে ঠিক আছে, কিন্তু ঊর্মিলা কেন করল।

তবু ওদের প্রেমের গল্প শোনার জন্যে আগ্রহ কমল না।

—বল, বলতেই হবে তোকে।

ঊর্মিলা বলেছিল। এমনভাবে বলেছিল যেন সমস্তটাই একটা প্রচণ্ড হাসির ব্যাপার।

বলেছিল, কি আর শুনবি, চাঁদনি রাত, ফুলটুল, ফুলের বাগানে ঘুরে ঘুরে গানটান, ও সব কিচ্ছু নেই।

এখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে গেলে হাসি পায় এবং অভিজিতের সঙ্গে রাগারাগি হলে কোনও কোনও দিন তা বলে ফেলে এবং বলে ফেলে হাসাহাসি করে।

কে একজন চেপে ধরেছিল, প্রথমে আলাপ কি করে হল সেটাই বল।

ঊর্মিলার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিল এরা রীতিমত একটা প্রেমের গল্প শুনতে চাইছে। অথচ সত্যি সত্যি তো ওর জীবনে কোনও গল্প নেই। একটা মজার ব্যাপার আছে এই পর্যন্ত।

ঊর্মিলা তাই হেসে ফেলে বললে, আলাপ ? যা ভাবছিস, চার চক্ষুর মিলনটিলন কিছু হয়নি।

—তবে ?

ঊর্মিলার মুখে হাসি। বললে এ বি সি ডি সকলের সঙ্গে আলাপ ছিল, মানে হয়ে গিয়েছিল। আমার একার নয়, এক্স ওয়াই জেডের।

ওরা সবাই হাসছিল।

ঊর্মিলা বললে, তারপর জেডের মনে হল এ কিংবা ডি-র সঙ্গে বসে গল্প-তেমন জমছে না, সি-র সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই বনিবনা হয় না।

আবার হাসি সকলের।

—তারপর ?

ঊর্মিলা বললে, জেডের হঠাৎ মনে হল, একদিন দেখা না হলে, বি ওরকম মুখ ভার করে কেন !

একটু থেমে হাসতে হাসতে বললে, তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, বি একদিন সিনেমা দেখাবে বলে হলের সামনে অপেক্ষা করতে বললে, এল দেরিতে, আর জেড অপেক্ষা করতে করতে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। দেখতে পেয়েই খুব খুশি ভেতরে ভেতরে, কিন্তু হঠাৎ কি হল খুব রেগে গিয়ে যা-তা বলে বসল।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ঊর্মিলা হেসে ভুরু কাঁপিয়ে বললে, তার পরেরটাই আসল। সিনেমা তো দেখা হল, কথাবার্তা কি আর হত, সব ফালতু। কিন্তু বাড়ি ফিরে জেডের মাথায় তখন একটা কথা ঘুরছে, এত রেগে গেলাম কেন, ও আসছিল না দেখে কান্না পেয়ে গেল কেন ! তখন নিজেরই লজ্জা হচ্ছে।

নন্দিতাই বোধহয় ঠাট্টার স্বরে বললে, তারপর 'তুম মুঝে সাদি করোগি' কবে বলল ?

উর্মিলা হেসে উঠল, বললে তার চেয়েও মজার।

—কি ? কি ? সবাই উদগ্রীব।

উর্মিলা হাসতে হাসতে বললে, হঠাৎ ডাকে একটা বিয়ের চিঠি এল আমার নামে। কার বিয়ে ভেবে খুলে দেখি আমারই।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে অট্টহাসে হেসে উঠল। —সে কি রে !

উর্মিলাও তখন হাসছে। হাসতে হাসতে বললে, ওপরে লাল কালিতে লেখা 'ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস'। বি আর জেডের বিয়ের চিঠি, শুধু তারিখের জায়গাটা ফাঁকা।

উর্মিলা এরপর সংক্ষেপে সেরে দিয়েছিল।

উর্মিলা বলেছিল, এরপর মাকে বললাম, মা বললে গেট আউট, বাবাকে মা বললে, বাবা বললে, গেট আউট। অভিজিতেরও সেই এক অবস্থা। দুজনেই কিছুদিন অপেক্ষা করলাম, যদি মত বদলানো যায়। শেষে সত্যি সত্যি গেট আউট হয়ে গেলাম।

বলে হেসে উঠল উর্মিলা।

—শেষে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়নি ? কে একজন প্রশ্ন করেছিল।

উর্মিলার মুখটা বোধহয় একটু বিষণ্ণ হয়েছিল : বলেছিল, শান্তনু হওয়ার পর দুপক্ষ থেকেই এসেছিল। আমি অভিজিৎকে বলে দিলাম, নাথিং ডুইং। প্যান্ডেল বাঁধল না, সানাই বাজল না, রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে, তার আবার শ্বশুর-শাশুড়ি কি ?

নন্দিতা সেই সময় ফোড়ন কেটেছিল, তা হলে বিয়ের আগে একেবারে আনটাচড ?

উর্মিলা হেসে উঠে বললে, দূর, তা হলে চিঠি লেখার সাহস পেত নাকি ?

এই ইতিহাসটা তনু নন্দিতাদের সকলেরই জানা।

জানিয়ে ও নিজেই বেশ আনন্দ পেয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল প্যান্ডেল আর সানাইয়ের জন্যে, বেনারসি আর কপালে চন্দন ফোঁটা দিয়ে সাজগোজের জন্যে যেমন ঈষৎ অসন্তোষ রয়ে গেছে ওর, এদেরও তেমনি কোথাও একটা অসন্তোষ আছে। তা না হলে এত আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাইবে কেন।

তাই অভিজিৎকে বলে বসল, আমরা তো আগে থেকেই একটা জায়গায় জিতে বসে আছি।

অভিজিৎ প্রশ্ন করল, কোথায় ?

মুখ ফুটে বলতে পারল না, এড়িয়ে গিয়ে বললে, বলব না।

কিন্তু ও যা এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি, অভিজিৎ হঠাৎ সে কথাটাই বলে ফেলল। বললে, কার কোন দিকে ট্যালেন্ট কেউ বলতে পারে !

হাসতে হাসতে বললে, সোনা আনতেও তো পারে।

সাত

পুজোর ছুটিতে স্কুল বন্ধ, সুতরাং কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ থাকে না। কদাচিৎ কেউ একজন আরেকজনকে ফোন করে বসে।

ছেলেমেয়েদের হোম টাস্ক তো থাকেই, তার ওপর পুজোর কেনাকাটায় সকলেই ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ এই সুযোগে বাইরে বেড়াতেও চলে যায়।

নন্দিতা কুলু মানালি বেড়াতে যাবে তনু জানত। অতএব তাকে ফোন করার প্রশ্নই ওঠে না। তাও একদিন করেছিল, তিতুনের হোম টাস্কের কি যেন বুঝতে পারছিল না, সেজন্যেই। রিং হয়ে গেল অনেকক্ষণ, কেউ তুলল না। বেড়াতে চলেই গেছে, নাকি

ফোনটাই খারাপ জানার উপায় নেই। টেলিফোনের কথা উঠলেই আজকাল যে-কেউ চটে যায়। সকলেই জানে, এমন অপদার্থ ডিপার্টমেন্ট আর একটিও নেই। অথচ তারও একজন মন্ত্রী থাকে। কেন যে থাকে।

তবু এক একসময় টেলিফোন ঠিক থাকে, এবং লাইনও পেয়ে যায়, পেয়ে অবাকও হয়।

নন্দিতাকে না পেয়ে তনু একবার ভাবল বকুলকে ফোন করবে কি না। হোম টাস্কের ব্যাপারে ওর কাছ থেকে কিছু জানার কথাই ওঠে না, ওর মেয়ে অনিন্দিতা ক্লাশ নাইনে পড়ে। হাতে আর কোনও কাজ নেই, কেনাকাটার জন্যে বের হওয়ার কথা নেই। এ সময় নন্দিতাকে পেলে কাজও হত, একটু গল্পও করা যেত।

সেই যে একদিন নন্দিতার সঙ্গে বকুলদের বাড়ি গিয়েছিল, তারপর নিজেই সে দুদিন তনুকে ফোন করেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল, ফোন করে কি লাভ। সেই তো সুযোগ পেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়ের গুণকীর্তন শুরু করবে। ম্যাড্রাসে কোন গুরুর কাছে প্রথমে নাচ শিখেছিল, পরে কার কাছে, কি সব উদ্ভুট উদ্ভুট নামও বলে যায়, যার একটাও তনু কস্মিনকালে শোনেনি। শোনার কথাও নয়। যারা এসব নিয়ে চর্চা করে তারা জানতেও পারে।

শেষ অবধি ফোন করল না ও।

স্কুল বন্ধ থাকলে তিতুনের ভাল লাগে না। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না বলে। কিন্তু তনুরও নেশা হয়ে গেছে। হবে না কেন। বকুলের মেয়ে বড় হয়ে গেছে, তা ছাড়া ওদের দু দুটো গাড়ি, ড্রাইভার আছে। সেই গাড়িতেই অনিন্দিতা আসে যায়। বকুলের আসার প্রয়োজনও নেই। তবু এক একদিন ওই গাড়িতে বকুল চলে আসে। ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্যে। বোধহয় ওরও নেশা হয়ে গেছে।

স্কুল অবশ্য একেবারে বন্ধ থাকে না। কারণ অন্য স্কুলের সঙ্গে এ স্কুলটার একটু পার্থক্য আছে।

স্কুল বিল্ডিঙের পিছনে ছোটখাটো একটা বোর্ডিং হাউস আছে। সেখানে ছুটির সময়েও জনকয়েক ছাত্র থাকে। কালোকুলো কয়েকটা ছেলে।

এই স্কুলটা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন প্রতিষ্ঠাতা ভদ্রলোক খুব বুদ্ধি করে এমন একটা নাম দিয়েছিলেন, যেটা শুনলেই মনে হবে একটা মিশনারি স্কুল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যারা ছেলেমেয়েদের পড়াতে চায় তাদের কাছে স্কুলের গায়ে একটু আধটু মিশনারি ধরনের নামের যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে তা বোধহয় তিনি জানতেন।

এখন এটা সত্যি সত্যি ভাল স্কুলই হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম দিকে যখন খুব আর্থিক টানাটানি চলছিল, ছোটনাগপুরের এক পাদ্রি অনেক টাকা ডোনেশন জোগাড় করে দিয়েছিলেন স্কুলের জন্যে। শেষ অবধি এটা যে একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে তা হয়তো তিনি বুঝতে পারেননি।

পাদ্রি হয়তো নিঃস্বার্থ ভাবে দান সংগ্রহ করে দেননি। স্কুলের সঙ্গে একটা লিখিত শর্ত তিনি করে দিয়ে গেছেন। বিনা বেতনে কিছু খ্রিস্টান আদিবাসী ছাত্রছাত্রীকে এই স্কুলে পড়াতে হবে। একটা ট্রাস্টও করে দিয়ে গেছেন, যার আয় থেকে দুটি বোর্ডিং হাউসে সেইসব ছেলেমেয়েরা বিনাপয়সায় থেকে খেতে পরতে পাবে। মেয়েদের বোর্ডিং হাউসটা অন্যত্র, ছুটি হলে তারা নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যায়। কিংবা অরফ্যান হাউসে।

ছেলেদের বোর্ডিং হাউস স্কুল বিল্ডিঙের পিছনেই। দেখে মনে হয়, একদা ওই ঘর কখানা দারোয়ান বা কাজের লোকদের ঘর ছিল। সেই ঘরগুলোই বোর্ডিং হাউস। সেখানে অন্য কেউ থাকতে পায় না। পেলেও থাকত কি না সন্দেহ।

যে-কজন খ্রিস্টান আদিবাসী ছেলে ওই বোর্ডিং হাউসে থাকে তারা সকলেই বোধহয় অরফ্যান। অনাথ বালক। তাই ছুটিছাটাতেও তাদের কোনও যাবার জায়গা নেই। বোর্ডিংয়েই থেকে যায়। থাকা খাওয়ার জন্যে তো পয়সা লাগে না, তাই।

এখন বোধহয় কর্তৃপক্ষের কাছে ওরা ঘাড়ের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ছেলেমেয়েদের এ স্কুলে এত এত টাকা দিয়ে পড়ায়, তারাও বোধহয় এদের খুব একটা পছন্দ করে না।

প্রায় প্রতি ক্লাশেই দু-একটি খ্রিস্টান ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রী আছে। তিতুনদের ক্লাশেও দুজনকে দেখেছে তনু। তিতুনের কাছে নামও শুনেছে, মেরি কিস্কু আর ডেভিড মুর্মু।

দিব্যি হাসিখুশি মুখ। ওরা ক্লাশের পিছনের দিকে বেঞ্চে একপাশে বসে।

তনুর একটু আগ্রহ হয়েছিল। তিতুনকে জিগ্যেস করেছিল, ওরা কেমন পড়াশুনো করে রে?

তিতুন হেসে উঠে বলেছে, আন্টিরা তো ওদের কিছু জিগ্যেসই করে না।

একটু থেমে বলেছে, আমরাও মিশি না। কেউই ওদের সঙ্গে মেশে না।

তনু হয়তো প্রথম প্রথম লক্ষ করেনি, তিতুনের কাছে শোনার পর দেখেছে সত্যি তাই। অন্য ক্লাশের ওই কালো কালো ছেলেমেয়েগুলো আলাদা আলাদা থাকে। ওদের সঙ্গে কেউ কথাবার্তাও বড় একটা বলে না।

নিজেদের মধ্যে আলোচনায় দেখেছে, ওই ছেলেমেয়েগুলো সম্পর্কে সকলের মনেই কেমন একটা তাচ্ছিল্য আছে।

একজন তো বলেই ফেলল, ওদের বিনাপয়সায় পড়ানোর কোনও মানে হয়?

আরেকজন বললে, আমাদের কত কাঠখড় পুড়িয়ে সিট পেতে হয়। ও জায়গায় দুটো ভাল ঘরের ছেলে ভর্তি হতে পারত।

তনুর মনেও ওদের সম্পর্কে যে খুব একটা সহানুভূতি আছে তা নয়। তবু, কেন জানি, 'ওই ভাল ঘরের ছেলে' কথাটা ভাল লাগেনি।

ওদের সঙ্গে কেউ মেশে না এ কথাটা শুনে খারাপই লেগেছিল। তবু তিতুনকে বলতে পারেনি, তুই মিশিস না কেন!

কেমন যেন মনে হয়েছিল, কোথাও একটা অদৃশ্য গণ্ডি টেনে দিয়ে ওদের আমরা বাইরে রেখে দিয়েছি। ক্লাশে পাশাপাশি একপ্রান্তে বসলেও।

এটা সত্যি তাচ্ছিল্য কি না তাও তনু বুঝতে পারেনি।

কয়েকটা ছেলে পুজোর ছুটিতেও কোথাও যায় না, কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে, তা জানত। কিন্তু ওরা সে সময় কি করে না করে তা জানার ইচ্ছেও হয়নি। আসলে ওরাও যে এই স্কুলে আছে সে কথাটা ভুলে থাকত। তনুরা সকলেই।

সেজন্যেই খবরটা শুনে ওরা চমকে উঠল।

ছুটির পর স্কুল খোলার আগের দিন তনু নন্দিতাকে ফোন করল। পরের দিনই স্কুল খুলছে কি না নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। তারিখটা ঠিক ঠিক মনে আছে কি না সে বিষয়ে তনু নিশ্চিত হতে পারছিল না। শেষে তিতুনকে নিয়ে গিয়ে বোকা বনে না যায়।

একবার হয়েছিল এমন কাণ্ড। ছুটির পর স্কুল খোলার তারিখ ভুলে গিয়ে একদিন আগেই গিয়ে হাজির হয়েছিল। গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই, এমন কি দারোয়ানও নেই। শুধু ভিতরের মাঠে বোর্ডিং হাউসে কয়েকটা কালোকুলো ছেলে ফুটবল খেলছিল।

তাদের ডেকে জিগ্যেস করতে বললে, স্কুল তো কাল খুলবে।

সকাল থেকে তাড়া দিয়ে তিতুনকে তৈরি করেছে, নিজে তৈরি হয়েছে, তারপর এই

কাণ্ড। নিজের ওপরই রাগ হয়েছিল।

তার পর থেকে কোনও একজনকে ফোন করে জেনে নেয়। খাতাতেও তিতুন লিখে রাখে, কিন্তু সেই খাতাটাই শেষ সময়ে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তনু নন্দিতাকে ফোন করেছিল।

নন্দিতা ফোন তুলেই গল্প জুড়ে দিল কুলু মানালির। সে আর থামতে চায় না। কোথায় কি দেখেছে, কোথায় কি ঘটেছে, অনুপমের হঠাৎ অসুখ হওয়ায় কতখানি চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, কিভাবে ডাক্তার জোগাড় হল, ডাক্তার পেল তো ওষুধ পায় না, তবে সত্যি বেড়ানো সার্থক, সে যে কি অপূর্ব, কর্তাকে বলে যা একবার ঘুরে আয়, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না, ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমি পুজোর সময় কলকাতায় বসে বসে কাটাইনি, বেড়াতে গিয়েছিলাম, তাও দীঘা পুরী দার্জিলিং নয়, কুলু মানালি।

অতশত শোনার ইচ্ছেই ছিল না তনুর, কারণ ওর বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। দুর্গাপ্রসাদ আর সুহাসিনীকে কার কাছে রেখে দিয়ে যাবে। দুই বুড়োবুড়ি। অসুখ হলে তো ডাক্তার ডাকারও লোক নেই। টেলিফোন আছে, কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস নেই। প্রয়োজনের সময়টিতেই খারাপ হয়ে থাকবে। হয় ওদের কিংবা ডাক্তারের টেলিফোনটা।

সব শেষে : হ্যাঁ কালই, যাচ্ছিস তো ?

রিসিভার নামিয়ে রেখেছে, একটু বাদেই বকুল।

ক্রিং ক্রিং শুনে রিসিভার তুলল। আবার কে ? নন্দিতাই নাকি ? হয়তো কিছু বলতে ভুলে গেছে।

—চিনতে পারছ ?

গলা শুনে চট্ করে চেনার কথাও নয়, বারকয়েক তো মাত্র ফোনে কথা হয়েছে। আর একবারই নন্দিতার সঙ্গে গিয়েছিল।

বকুল।

যেদিন গিয়েছিল ওদের ওখানে, সেদিনই আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসে। এখনও তুই হয়নি। একটু দূরত্ব আছে।

সেটা চাপা ঈর্ষার জন্যে কি না ঠিক বলা যায় না। তনুর অন্তত মনে হয় না ওর কোনও ঈর্ষা আছে। যেমন নন্দিতার ছেলে ক্লাশের ফার্স্ট বয় বলে ওর কোনও ঈর্ষা নেই। বরং অন্যের কাছে, এমনকি তিতুনের কাছেও অনুপমের প্রশংসা করে। উর্মিলার ছেলে শান্তনু সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হয়েছে শুনে ঈর্ষা তো দূরের কথা, ভালই লেগেছে। সুতরাং বকুলের মেয়ে স্কুল অ্যানিভার্সারিতে ভাল নেচে স্কুলের সকলের চোখের মণি হয়ে উঠেছে বলে ঈর্ষা হবে কেন। বকুল তো ওর বন্ধু হয়ে গেছে। বন্ধুর ভাল কিছু হলে কার না ভাল লাগে।

তবে একটা জিনিস সত্যি খারাপ লাগে। ভাবখানা এমন দেখায় যেন বকুল সকলের ওপরে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাল নাচে, ভাল নাচতে পারে এমন মেয়ের অভাব আছে নাকি।

সেদিক থেকে বরং তনুরই গর্ব করার কথা। তিতুন এবার বড়দের কমপিটিশনে নামবে। যদি সেখানেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তখন স্কুলের সকলের চক্ষুস্থির তো হবেই, খবরের কাগজেও বড় হরফে নাম বেরোবে। তখন স্কুলে নিশ্চয় একটা ফাংশন হবে তিতুনকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে। ছোটদা তো আশা করে বসে আছে। 'আমার হল না, তিতুন পারবে, সবাইকে চমকে দেবে।' সেজন্যে ছোটদা ওর

পিছনে লেগেও আছে।

তবু এই নন্দিতা বকুল তনু, এখন উর্মিলাও এত বন্ধু হয়ে গেল পরস্পরের, কেন ? অন্যদের মধ্যে ওরা কজন এত রেষারেষি সত্ত্বেও একটা গ্রুপ হয়ে গেছে। বোধহয় সবারই কিছু কিছু গর্ব করার আছে বলেই। শান্তনু একটা মাসেই সাঁতার কাটতে শিখে গেছে, উর্মিলা বলেছে।

—আমি বকুল বলছি।

গলা চিনতে পারেনি দেখে বকুল বললে।

তারপর : কাল স্কুলে যাচ্ছ তো ? আমিও যাব। কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, হাঁপিয়ে উঠেছি।

আড্ডা এমন জিনিস, নেশার মত টানে, প্রয়োজন না থাকলেও। ওদের গাড়ি দু-দুটো, ড্রাইভার আছে, বকুলের আসার কোনও প্রয়োজনই হয় না, তবু আসবে।

নিজের মনেই হেসে ফেলল তনু। ভাবলে, বোধহয় মেয়ের প্রশংসা আরও একবার শোনার জন্যে।

যেদিন বেড়াতে গিয়েছিল, অনিন্দিতাকে ডেকে খুব প্রশংসা করে দিয়েছিল।

ওরা কেউই কিছু জানত না। নন্দিতা বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল, তার না জানারই কথা। বকুল হয়তো খবরের কাগজ অত খুঁটিয়ে পড়ে না। তনুরই শুধু অস্পষ্ট ভাবে মনে হল, খবরটা ও বোধহয় পড়েছিল। নাম ছিল কি না তাও জানে না, থাকলেও কিছু বুঝতে পারত কি না সন্দেহ।

স্কুল গ্যেটের কাছে পৌঁছে নন্দিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তিতুন আর অনুপম ঢুকছে, দারোয়ান বললে, তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাবে। —এক ঘোণ্টা পোরে।

ভেবেছিল, প্রথম দিন, সেজন্যেই হয়তো।

নন্দিতা বললে, বকুল আসবে।

এসেও গেল।

আর তখনই দেখল দুজন টিচার, একজনের হাতে একটা বড় ফুলের তোড়া, গ্যেটের ভিতরে ঢুকল হাসতে হাসতে। কি বলাবলি করছিল।

একটু পরেই শুনল খবরটা। একটু একটু মনে পড়ল, যেন কাগজে পড়েছিল।

নীল-পাড় সাদা শাড়ির অনিন্দিতা ভিতরে ঢুকে গেল, আজ আর দারোয়ান এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলল না। কেউ অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে দেখলও না ; যেচে কথা বলতে আসা তো দূরের কথা। বকুলের দিকেও কেউ তাকাচ্ছে না।

সবাই কাকে যেন দেখতে চাইছে।

ওহি তো, ওহি তো।

ভিতরের করিডরে একজনকে দেখাল দারোয়ান। ঘন কালো চেহারার একটা আদিবাসী ছেলে, বছর বারো বয়েস।

একজন নাম বলল। জোশেফ সরেন। ওই বোর্ডিং হাউসে থাকে যারা, তাদেরই একজন। অরফ্যান বয়।

জোশেফ সরেন, জোশেফ সরেন। সকলের মুখে মুখে তখন ওই একটা নামই ঘুরছে। সবাই অবাক হয়ে গেছে। এই বছর বারো বয়েসের একটা বাচ্চা ছেলে এমন একটা কাজ করে বসেছে।

কে একজন বললে, ক্লাশ ফাইভে তো পড়ে।

আরেকজন বললে, ওরা তো লেখাপড়া একটু দেরিতেই শুরু করে।

দু-একজনের আগ্রহ এত বেশি, ছেলেটাকে ভাল করে দেখতে চায়। তারা গেটের ভিতর ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল।

দারোয়ান বললে, চলে যান না, আজ তো ক্লাশ হবে না। একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে।

বকুল জিগ্যেস করল, ছুটি হবে কেন ?

নন্দিতা বললে, ওই জোশেফ সরেনের জন্যে।

বকুল এর আগে শোনেনি। শুনে অবাক হল, মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

পাশে দাঁড়ানো কে একজন সমস্ত ব্যাপারটা আবার বলল।

ততক্ষণে তনুর স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। কাগজে পড়া এক টুকরো খবর। জোশেফ সরেনের নামটা ছিল কি ছিল না তাও এখন আর মনে নেই। থাকলেও চিনতে পারত না। ওদের নামগুলো সবই তো অচেনা। কোনও একটা খবরের মধ্যে এ-ধরনের নাম থাকলে কি করে বুঝবে সে এই স্কুলেরই কোনও ছাত্র। এ স্কুলে ওরাও যে আছে, সে কথাটাই তো ভুলে থাকে সব সময়।

ছবিটা এবার যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। টিচারদের একজনের কাছ থেকে কে একজন শুনেছিল, তার কাছ থেকে অন্য সকলে। ফুলের তোড়াটা বোধহয় ওরই জন্যে।

প্রতিমা বিসর্জনের দিন। তনু যেন ছবিটা দেখতে পাচ্ছে। পাবে না কেন, একবার তো গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের দিন।

একটার পর একটা লরি এসে দাঁড়াচ্ছে। লরি থেকে কাঁধে করে প্রতিমাকে নামিয়ে এনে গঙ্গার দিকে নিয়ে যাচ্ছে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে। কেউ কেউ নৌকোয় তুলে দিচ্ছে প্রতিমা, গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেবার জন্যে। চতুর্দিকে মানুষ আর মানুষ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবার জায়গা নেই। নাচ গান বাজনা হইহই চলছে তো চলছেই।

বিসর্জন দেখতে যারা এসেছে তাদের মধ্যে কারও কারও উৎসাহ বেশি। তারা নৌকো ভাড়া করে একটু এগিয়ে গেছে গঙ্গার দিক থেকে বিসর্জন দেখবে বলে।

দূরে একটা নৌকো থেকে প্রতিমাকে ফেলে দিতেই একটা ঢেউ এসে লাগল অন্য নৌকোয়। সঙ্গে সঙ্গে টাল খেয়ে গেল নৌকোটা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ :

সবাই চিৎকার করে উঠল, ডুবে গেল, ডুবে গেল।

সবাই স্তম্ভিত বিস্মিত। কিন্তু কেউই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল না।

শেষ অবধি নৌকোর একজন মাঝি বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। কিন্তু সে কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না।

আর তখনই একটা বাচ্চা ছেলে, বছর বারো বয়েস। বোধহয় সেও এসেছিল প্রতিমা বিসর্জন দেখতে, জেটির কাছ থেকে জলে ঝাঁপ দিল।

কারা যেন চিৎকার করে বলছে, একটা বাচ্চা ছেলে, একটা বাচ্চা ছেলে। নৌকো থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে। ওই তো, ওই তো।

বছর বারো বয়েসের কালোকুলো একটা ছেলে গঙ্গার জলে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলেটাকে। জলে ডুবে যাওয়া একটা ছেলেকে।

এক একবার জলে ডুব দিচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে।

পেয়েছে, পেয়েছে।

পাড় থেকে, নৌকো থেকে, জেটি থেকে বহু লোক চিৎকার করে বলে উঠল :

হ্যাঁ, ওই তো টেনে টেনে নিয়ে আসছে।

শেষে পাড়ে এনে ফেলল।

প্রায় অচৈতন্য একটা বছর দশেকের ছেলে। ডুবন্ত সেই বাচ্চা ছেলেটাকে পাড়ে টেনে নিয়ে এল আরেকটা কালোকুলো বছর বারো বয়েসের একটা ছেলে।

সবাই ভিড় করে ছুটে এল। বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।

নাক থ্যাবড়া কষ্টিকালো ছেলেটার চুল থেকে সারা গা থেকে জল ঝরছে, শার্টপ্যান্ট ভিজে সপসপ, হাসছে আর হাসছে।

হইচই শুনে, দুর্ঘটনার খবর শুনে পুলিশের এস আই কিংবা আরও ওপরওয়ালা কেউ ছুটে এল। এসে কালোকুলো বাচ্চা ছেলেটাকে কি যেন প্রশ্ন করছে। আর সাদা সাদা দাঁত বের করে ছেলেটা সরল হাসি হাসছে। হাসছে, হাসছে।

সেই ছেলেটাই জোশেফ সরেন। এই স্কুলেরই একজন। ওই পিছনের বোর্ডিং হাউসে থাকে। একটা আদিবাসী খ্রিস্টান ছেলে। অরফ্যান বয়। ওদের তো কোথাও যাবার জায়গা নেই পুজোর ছুটিতে। সেজন্যে এখানেই থাকে।

দল বেঁধে ওরা প্রতিমা বিজর্সন দেখতে গিয়েছিল। একটা বাচ্চা ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখে স্থির থাকতে পারেনি। জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সকলের কাছে একটু একটু করে শুনে সমস্ত ছবিটাই যেন তনুর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

তনু বললে, চল চল ছেলেটাকে একবার দেখে আসি।

নন্দিতা বলল, চল।

বকুল বললে, ধন্যি ছেলে, সাহস আছে বলতে হবে।

উর্মিলা বললে, ভাগ্যিস সাঁতার জানত।

পাশ থেকে কে একজন বললে, সাঁতার জানলেই হয় না, বুকের ভেতরে কিছু থাকতে হয়।

ছেলেটার কাণ্ডকারখানা শুনে সকলেই যেন আবেগে আপ্লুত।

ওরা গ্যেটের ভিতরে চলে গেল।

মাঠের মধ্যে ছেলেটাকে দাঁড় করিয়েছে।

সাদা সাদা দাঁত বের করে সে শুধু হাসছে। আর দু-চারজন টিচার ফুলের তোড়া এনেছে, ওকে দিচ্ছে। হেডমিস্ট্রেস কি যেন বলছেন :

'আমাদের স্কুলের গর্ব', 'এতদিনে সত্যি সত্যি গর্ব করার মত কিছু করেছে এই স্কুলেরই একজন'—হেডমিস্ট্রেসের কথাগুলো শুনতে পেল ওরা সবাই। নন্দিতা, তনু, বকুল, এমনকি উর্মিলাও। যারা সকলেই একটা না একটা কিছু গর্ব করার মত খুঁজে পেয়েছিল। গর্বিত হয়েছিল। কত সামান্য কারণে।

সবাই যেন বুঝতে পারছে, তারা অনেক কিছু পারে, পেরেছে, কিন্তু একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারেনি। এই একটা অরফ্যান বয় আজ সকলের সামনে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক উঁচু আসনে।

ওরা সবাই কত তুচ্ছ হয়ে গেছে—নন্দিতা, তনু, বকুল, উর্মিলা।

স্কুল, স্কুল, স্কুল। পরীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষা।

ওরা সব ভুলেই গিয়েছিল। খাতায় কটা ক্রশ পড়েছে আর কটা টিক্ চিহ্ন। কে কার চেয়ে কত নম্বর বেশি পেল। ও কেন তিন নম্বর কম পেয়েছে। টিচারের পার্শিয়ালিটি। ও তো আগেই প্রশ্ন জানতে পেরেছিল। একজন টিচারই তো ওর প্রাইভেট টিউটর।

হঠাৎ একদিন স্কুলে গিয়ে শুনল জোশেফ সরেনকে দিল্লি নিয়ে গেছে। ও একা নয়,

সারা দেশ থেকে যোশেফের মত দশ বারোটা ছেলেকে নিয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে ওদের গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেবেন।

নন্দিতা ফোন করছে তনুকে।

রিসিভার তুলেছে তনু।

নন্দিতা বলছে, আজ টিভি দেখিস তনু, জোশেফকে দেখাবে।

তনু ফোন করছে বকুলকে। —ভুলে যেয়ো না বকুল, টিভিতে দেখো, আমাদের জোশেফ সরেনকে দেখাবে, প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে তার গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দেবেন।

বকুল বলছে, দেখব বইকি, দেখব, দেখব। ঠিক বলেছ তনু, আমাদের জোশেফ সরেন।

বকুল ফোন করছে ঊর্মিলাকে। —ঊর্মিলা দেখো, আজ, আজই টিভিতে দেখাবে।

ঊর্মিলা বলছে, জানি, জানি। সকাল থেকেই তো শান্তনু বারবার বলছে, লোডশেডিং না হয়ে যায়।

ওই তো খবর শুরু হয়েছে টিভি-তে। ওই খবরের মধ্যেই দেখাবে। জোশেফকে দেখাবে তো শেষ অবধি।

টিভির সামনে উদগ্রীব হয়ে বসে আছে নন্দিতা আর অনুপম।

টিভির সামনে তনু আর তিতুন।

টিভির সামনে বকুল, অনিন্দিতা। ঊর্মিলা, শান্তনু।

ওই তো প্রেসিডেন্টের সামনে, দর্শকদের আসনের সামনে ওরা বসে আছে।

প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতা শেষ করলেন। ওঁর শেষ কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেছে। দ্য নোবলেস্ট ম্যান ইজ হি হু সেভস দ্য লাইফ অফ অ্যানাদার ম্যান।

এবার ওরা একে একে এগিয়ে আসছে। এক একজনের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট।

ওই তো, ওই তো, আমাদের জোশেফ সরেন। একটা খ্রিস্টান আদিবাসী ছেলে, অ্যান অরফ্যান বয়। কিন্তু আমাদের জোশেফ।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল অনুপম, তিতুন, অনিন্দিতা, শান্তনু। জোর হাততালি দিয়ে উঠল। যে যার নিজের ঘরে, টিভির সামনে।

আঃ, আরেকটু দেখাল না কেন।

আঃ, কি শান্তি, কি আনন্দ।

নন্দিতা, তনু, বকুল, ঊর্মিলা ভাবছে আমাদের সকলকে তুচ্ছ করে দিয়ে জোশেফ সরেন একটা বড় উপকার করে দিল। এখন আর আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই, কোনও ঈর্ষা-বিদ্বেষ নেই। আমরা সবাই এক হয়ে গেছি।

এমনকি ওই জোশেফ সরেনও। এখন ও আমাদের জোশেফ সরেন।

খবর শেষ হয়েছে।

ওরা সকলেই একে একে উঠে পড়ল।

কিন্তু সকলেরই কানে বাজছে একটাই কথা। প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার শেষ কথাটা : দ্য নোবলেস্ট ম্যান ইজ হি হু সেভস দ্য লাইফ অফ অ্যানাদার ম্যান।

লালবাঈ

প্রথম প্রকাশ : মাসিক বসুমতী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৬২ থেকে বৈশাখ ১৩৬৩ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৩। প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার ; ডি এম লাইব্রেরি। প্রচ্ছদ : সমীর সরকার।

উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় ছিল :

'আওরেঙ্গজেব-শাসিত ভারতের নিষিদ্ধ কলা সঙ্গীতকে
যাঁদের সাধনা সেদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলো
এবং পরবর্তী কালে ভারতীয় সঙ্গীতকে নবজীবন দান করে
যাঁরা বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করে গেছেন,
সেই তানসেন-বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ
সঙ্গীত-ভগীরথ রাজা রঘুনাথ সিংহ
ও বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার অন্যান্য উত্তরসাধকদের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে'

'লালবাঈ' উপন্যাস চল্লিশ বছর আগের রচনা। আজ (১৯৯৪) যাঁদের বয়েস চল্লিশ, তাঁদের তখন জন্মই হয়নি। যাঁরা অর্ধশতাব্দী পার হয়ে এলেন, মনে রাখতে হবে তাঁরা তখনও পাঠক হয়ে ওঠেননি। আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, যে এই লেখকও তখন নিতান্তই তরুণ সাহিত্যযশপ্রার্থী। লেখক হিসেবে তিনি তখন পাঠক সমাজের কাছে প্রায় অপরিচিত, যদিও সাহিত্যে আগ্রহী বেশ কিছু পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর ছোটগল্প সংকলন 'দরবারী' গ্রন্থের সুবাদে। 'দরবারী' আশাতীত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, বোধহয় বাংলা ভাষায় (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে অনুল্লেখনীয়) প্রথম জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থ। এই জনপ্রিয়তা একদিক থেকে শুভপ্রদ হয়েছিল অন্তত প্রকাশন ক্ষেত্রে। খ্যাতিমানদের ছোটগল্পের প্রতিও প্রকাশকদের যে অনাগ্রহ ছিল, একটি উপন্যাসপ্রাপ্তির আশায় যে-কালে প্রকাশকরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন-তেন-প্রকারেণ একটি গল্পের বই ছেপে দিতেন প্রায় উৎকোচ হিসেবে, 'দরবারী'র সাফল্য দেখে সেই সেকেলে প্রকাশকরাই নতুন লেখকদের গল্পের বইয়ের দিকেও সাগ্রহ হাত বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি।

গল্পলেখক হিসেবে 'দরবারী' আমাকে পরিচিতি দিয়েছিল, কিন্তু আমার প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' সেই পরিচিতিসত্ত্বেও, সীমিত সংখ্যকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করলেও, প্রায় অনাদৃত রয়ে গিয়েছিল। অস্বীকার করব না, তার ফলে কিছুটা হতাশাও এসেছিল সাহিত্যিকজীবনে। কারণ উপন্যাসের সাফল্য দিয়েই একজন লেখকের শ্রেণীবিচার ঘটত, অন্তত বৃহত্তর পাঠকসমাজে। সাহিত্যোৎসাহী স্বল্পতর পাঠকসমাজেও নয়, এ কথাও হলফ করে বলা যায় না। দিন খুব একটা পাল্টেছে বলে মনে করার হেতু নেই, একালেও তা সমান সত্য। অথচ বিদেশে অনেকেই সর্বোচ্চ আসনে ঔপন্যাসিকের পাশাপাশিই অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন শুধুমাত্র ছোটগল্পের দৌলতে। সুতরাং ছোটগল্পে বহুজনপ্রীতি অর্জন করেই তৃপ্ত থাকতে পারিনি। বাসনা ছিল ঔপন্যাসিক পরিচিতির জন্যে, অথচ 'প্রথম প্রহর' অপেক্ষাকৃত অজনপ্রিয় হওয়ায় কিঞ্চিৎ হতাশা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। অবচেতনে বা অসচেতনে লোকপ্রিয় হওয়ার তাগিদেই ইতিহাসকে বেছে নিয়েছিলাম কিনা জানি না। শুধু এটুকুই জানি, 'লালবাঈ' এমন অভূতপূর্ব পাঠকসমাদর পাবে বা পেতে পারে এমন কোনও ধারণাই আমার ছিল না। যেমন কল্পনাও করতে পারিনি 'দরবারী'র সাফল্য, কারণ তার আগে তিন-তিনটি গল্পগ্রন্থ উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছিল।

একালের পাঠককে বোধহয় বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে উপন্যাস লেখার রেওয়াজ পরবর্তী কালে দেখা দিলেও 'লালবাঈ' প্রকাশিত হওয়ার আগে দীর্ঘকাল লেখা হয়নি। জনপ্রিয়তার এটি একটি কারণ হতে পারে।

'লালবাঈ' কেন লিখেছিলাম এখন বিশ্লেষণ করলে কিছুটা বুঝতে পারি। দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর যে-কোনও দেশ স্বাধীনতা পেলেই পিছনের ইতিহাস ফিরে দেখার একটা প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। সে-কারণেই হয়তো তৎকালে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'পলাশীর যুদ্ধ' নামের ইতিহাস। আরও অনেকে ইতিহাসপন্থী হয়েছিলেন। যদ্দূর মনে পড়ে, ক্লাসিকাল সব কিছুরই তখন নবজাগরণ ঘটছে। রাতভর ধ্রুপদী গানের জলসায় সাধারণ শ্রোতার ভিড় উপচে পড়ছে। 'আমাদেব ছিল' এই গর্ব, বা আমাদের কি ছিল তা জানার কৌতূহলবশতই হয়তো। কারণ আমবা সকলেই জানতাম প্রকৃত অতীতকে এতকাল আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। পঙ্কটুকুই তুলে দেখানো হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন জাগত, পঙ্কজও কি দু-চারটে ছিল না ?

বিষ্ণুপুর ঘরানা নামটাই শুনেছিলাম, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসায় প্রথম শুনলাম। মুগ্ধতা গানের দিকে নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল ইতিহাসের দিকে। বইয়ের পর বইয়ের পাতা উল্টে খুঁজে চলেছি, অথচ জানতাম না, শুধু বিষ্ণুপুব নয়, আমাদের এই বাংলাদেশেরও কোনও প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। যা লেখা হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে, এলোমেলোভাবে, তার অধিকাংশই অসত্য। নিতান্তই জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীনির্ভব। কোথাও কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। খণ্ড খণ্ড কালের উচ্চবর্গের প্রভাবশালীদের ঈর্ষা ও ক্রোধে কালিমালিপ্ত বা তাদের আত্মগর্বে অতিরঞ্জিত। আমি বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা বলছি। বাঙালির প্রকৃতই কোনও ইতিহাস ছিল কিনা এ-প্রশ্ন যখন অনেকে করেন, দু-একটি নাম উচ্চারণের পরেই থেমে যেতে হয়। কারণ একটিও সুবৃহৎ পাথুরে প্রাসাদ, দুর্গ বা মন্দির মঠ আমরা দেখাতে পারি না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হলে ঝটিতি ইংরেজ আগমনের পবের যুগে চলে আসতে হয়। অথচ একটা দেশের ইতিহাস ছিল না এমন হতে পারে না। সন্দেহ হয়, প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধাব করাব পরিবর্তে আগের যুগের প্রভাবশালী মানুষ প্রকৃত ইতিহাসকে লুপ্ত কবাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন, যার ফলে তাঁদের মনঃপূত বানানো ইতিহাস সত্যতা পায়।

'লালবাঈ' উপন্যাস লেখাব পর বিষ্ণুপুরের ইতিহাসেব দিকে অনেক গবেষকের চোখ পড়েছে। কিন্তু আমি কোনও প্রামাণ্য আকর গ্রন্থেব সাহায্য পাইনি। অসংখ্য গ্রন্থের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আবিষ্কার করেছিলাম ইতিহাসের টুকরো টুকবো উপাদান চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অথচ সেগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্রও আছে। সব বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে একসঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে বাংলাদেশের তথা মুমূর্ষু মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় শেষ পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি ছবি ফুটে উঠবে। সুতরাং মনঃস্থ করে ফেললাম উপন্যাসের ছদ্মবেশ পরিয়ে সেই যুগটিকে উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নটি রসের উল্লেখ আছে . আদি বা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও শান্ত। সচেতনভাবেই যে এর সবকটি রসই এ উপন্যাসে এনে হাজির করেছি, তা নয়। অথচ খুঁজলে বোধহয় সব কটি রসকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু শাস্ত্রকাররা একটি সামগ্রিক রসের উল্লেখ করেননি। ইতিহাসও একটি পৃথক রস। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' ও 'বউঠাকুরানীর হাট' পাঠ করলেই তার স্বাদ আবিষ্কার করা যায়। এই উপন্যাসগুলিই আমাকে 'লালবাঈ' লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল এমন অহঙ্কারী উক্তি দিয়ে ওঁদের খাটো করব না, তবে স্বীকার করতেই হবে যে আমার মধ্যে কৈশোর-তারুণ্যের সেই স্বাদগন্ধ সুপ্ত ছিল বলেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত অতীতের বর্ণাঢ্য জগতে অবগাহন করার। 'লালবাঈ' হয়তো সেই সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছিল।

পূর্বকালের গ্রন্থগুলিতে বাহাদুর খাঁকে তানসেন বংশধর বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। কোনও বিশেষ ঘরানার পরম্পরাগত শিষ্যকে হয়তো বংশধর বলে সম্মান জানানো হত।

উপন্যাসটি লিখতে শুরু করার আগেই লক্ষ করেছিলাম এই পর্বের ইতিহাস গ্রন্থ গুটিকয়েক, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে তথ্য ও ভাষ্যের অমিলও কম নয়। কেউ কেউ গোপাল সিংহকে রঘুনাথের পুত্র হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। এমনকি সুকুমার সেনও। এখানে অনুজ হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে। এবং উপন্যাসের প্রয়োজনেই গোপাল সিংহকে কিশোর বয়েসে উপস্থিত করেছি। বলা বাহুল্য পার্শ্বচরিত্রগুলি কাল্পনিক। কৃষ্ণমোহন, গদাধর প্রমুখ কয়েকটি চরিত্রকে পরবর্তী কাল থেকে পিছিয়ে আনা হয়েছে বিষ্ণুপুর ঘরানার যোগসূত্রটি দেখানোর প্রয়োজনে। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের চরিত্রকে প্রয়োজনে পশ্চাতের পটভূমিতে উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও গর্হিত বিবেচিত হয়নি।

সেকালে মোগল শাসক ও সৈন্যরা ছিল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ামক শক্তি। তাদের মুসলমান শাসক হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। কারণ, তাদের দিকেও বহু হিন্দু ভূস্বামী ছিল। আবার শোভা সিংহের বিদ্রোহ যদি শুধুই হিন্দুর বিদ্রোহ হত তা হলে তার সহায়তায় পাঠান রহিম খাঁর যোগদান ব্যাখ্যার অতীত হয়ে পড়ে। কিন্তু তৎকালের সাধারণ প্রজাবর্গ ধর্মের দ্বারা শাসক বা বিদ্রোহীকে চিহ্নিত করত। রাষ্ট্রনীতি তথা কূটনীতির গভীর রহস্য বুঝত না।

'যবন' শব্দটি নিন্দাবাচক ছিল না। পুরাকালে যবন শব্দটি প্রযুক্ত হত গ্রিকদের সম্পর্কে। 'যবন' শব্দের উৎপত্তি 'আয়োনিয়া' নাম থেকে। পরে বিদেশাগত যে কোনও ব্যক্তিকেই যবন বলা হত। সম্মানের সঙ্গেই। আমাদের রঙ্গমঞ্চে যে যবনিকা পতন ঘটে, তার উৎসও যবন শব্দ। দুজন গ্রিক নারী দুপাশে দাঁড়িয়ে সামনের পর্দাটি ধরে থাকত বা অপসৃত করত বলেই পর্দা বা স্ক্রিনটির নাম হয়ে যায় যবনিকা। কালক্রমে বহিরাগত মুসলমান শাসকদেরও সম্ভবত যবন বলা হত তাঁরা বহিরাগত ছিলেন বলে। ধর্মের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পাওয়ার ফলে যবন শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ভিন্নধর্মী। সেকালের পরিবেশ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যথাযথভাবে আঁকতে গিয়ে শুধু যবন শব্দটি যে ব্যবহার করতে হয়েছে তাই নয়, বহু সংলাপের মধ্যেও তার আভাস আনতে বাধ্য হয়েছি।

প্রকৃত প্রাচীনকাল কেমন ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাহিত্যের প্রাচীনকাল ঐতিহ্যের তথা আত্মগর্বের রঙে রঞ্জিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট চিত্র নিয়ে পাঠকের মনে বিরাজ করে। তা থেকে বিচ্যুত হওয়া দুরূহ। সে-কারণেই এ উপন্যাসে জ্যোতিষশাস্ত্র তার ভূমিকা পালন করেছে। লেখক তাকে সত্য প্রমাণিত হতে না দিলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী মন ঈষৎ মিলকেও অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী মনে করে। তার মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও ষড়যন্ত্র অংশটুকু তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তেমনই সতীদাহ চিত্রে। রঘুনাথের পত্নী স্বয়ং তীর ছুঁড়ে রঘুনাথকে হত্যা করেছিলেন এমন একটি ভাষ্য ইতিহাসেই পেয়েছি, যদিও কেউ কেউ মনে করেন চন্দ্রপ্রভা শুধুই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন বা ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। তবে পতিহত্যার পর রঘুনাথের চিতায় তিনি সহমরণে যান বলেই তিনি 'পতিঘাতিনী সতী' নামে পরিচিত। সতীদাহ প্রথা ঘৃণ্য, সন্দেহ নেই। অধিকাংশ স্থলেই হয়তো তাদের সতী হতে বাধ্য করা হত বা তন্মুহূর্তে নেশাগ্রস্ত করে চিতায় পাঠানো হত। কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রমও যে ছিল না তা নয়। রঘুনাথপত্নীও হয়তো অনুতাপদগ্ধ তেমনই এক নারী। এই আত্মহনন ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু তার গৌরব ক্ষুণ্ণ করা চলে না। অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাছাড়া সতীদাহপ্রথার একটি দৃশ্য উপস্থিত করাও সম্ভবত সেই নবীন লেখকের কাছে লোভনীয় মনে হয়েছিল। সতী হওয়ার জন্য যে লেখক একালে নারীদের প্ররোচনা দিচ্ছেন না, তার প্রমাণ হিসেবেই এসেছে জব চার্নক ও

লীলার উপাখ্যান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার প্রয়োজন এ কারণে, যে এই ব্যতিক্রমী ঘটনা একই সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও সতীপ্রথার বিরুদ্ধে উচ্চকিত প্রতিবাদ।

উপন্যাসের শুরুতেই একটি শ্লোক উচ্চারিত হয়েছে।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ উপদেশ-সমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তকথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—মানবজীবনের এই চতুরাশ্রয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপদেশেরও সমন্বয় ঘটেছে, এ উপন্যাসে। যদিচ শাস্ত্রবাক্য হলেও গল্পে-উপন্যাসে উপদেশ বস্তুটি বর্জনীয়। পুরাবৃত্তকথাকে আমি অবশ্য ইতিহাস রূপে গড়ে তুলতে চাইনি, চেয়েছি শুধুই ইতিহাসরসসিক্ত একটি উপন্যাস লিখতে।

'লালবাঈ' উপন্যাসটি পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কোনও কথা ছিল না, সম্ভাবনাও ছিল না। 'প্রথম প্রহর' উপন্যাস যেমন সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, 'লালবাঈ'ও সেভাবেই ছাপা হচ্ছিল। প্রথম উপন্যাসটি আমাকে হতাশ করলেও ডি এম লাইব্রেরিকে বোধহয় ততখানি নিবাশ করেনি। ফলে, গোপালদাস মজুমদার আরেকটা উপন্যাস চাইলেন। প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু লিখে দিই, পাণ্ডুলিপি প্রেসে চলে যায়, প্রুফ দেখি। বেশ কয়েক ফর্মা লেখা ও প্রুফ দেখা হয়ে গেছে, কয়েক ফর্মা যে ছাপা হয়ে এসে গোপালবাবুর টেবিলে পড়ে আছে, জানতামও না। কলেজ স্ট্রিট তখন আমাদের ছোট বড় সব লেখকদের আড্ডাস্থল। কোনও না কোনও অপরিসর বইয়ের দোকানে, কিংবা অমিতব্যয়ী হবার মত কিঞ্চিৎ অর্থ পকেটে থাকলে, কফি হাউসে। আমরা হবু লেখকরা তখন খুব দাপটে ঘুরে বেড়াই, আড্ডা দিই, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যেন আমাদের ওপরই নির্ভর করছে, কিংবা ভবিষ্যতের সাহিত্য যেন আমাদের নির্দেশ মেনে গড়ে উঠবে। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিঙের নীচের তলায় এবং মির্জাপুর স্ট্রিটে 'ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি' সাইনবোর্ড মারফত জানান দিত ইস্টবেঙ্গল ও ওয়েস্টবেঙ্গল নামে দু-দুটো বেঙ্গল আছে—অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতাপূর্বের দিনগুলিতেও। হয়তো খেলার মাঠেও। কিন্তু স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরেও আমরা লেখকরা কোনওদিনই সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুটি বাংলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। দুটি ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কেও না। বাংলা সাহিত্যই ছিল আমাদের জগৎ। তাই রাজনীতির সংস্পর্শবিহীন পত্রপত্রিকার জগতেও কোনও রেষারেষি ছিল না।

এই সূত্রে প্রাণতোষ ঘটকের কথা এসে পড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাথমিক দিনগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি প্রাণতোষ ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধনীসন্তান হলেও সাহিত্যের প্রতি তার ছিল গভীর ভালবাসা। ফলে তার চরিত্রে কিছুটা স্ববিরোধও যে ছিল না তা নয়। আমি তখনও তেমন প্রতিষ্ঠা পাইনি, কিন্তু বিবাহসূত্রে প্রাণতোষ সেই বয়সেই বসুমতীর অন্যতম কর্ণধার, 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক। আমার মধ্যে একটা অহঙ্কারী মানুষ আছে, যে অহঙ্কার তাকে কোনও সম্পাদকের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেতে দেয়নি। প্রকাশকের আমন্ত্রণ না পেলে সে সেখানেও যেত না। সুতরাং অন্তরঙ্গ বন্ধু যে-কাগজের সম্পাদক সে-কাগজে কোনও লেখা দেওয়া সম্পর্কে আমার অসীম অনীহা ছিল। নেহাত বন্ধুত্বের উপরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি বলেই দু-একটি গল্প লিখেছি। কিন্তু উপন্যাস? নৈব নৈব চ। অথচ দুজনে আড্ডা দিই, পরস্পরের বাড়ি যাওয়া-যাওয়াি আছে, কালীঘাটে ট্রামডিপোর সামনে স্যাঙ্গুভ্যালির অনুপাদেয় ডবল হাফ চা নিয়ে সাহিত্যবিষয়ে গভীর তত্ত্বকথার বিরাম ছিল না। (আড্ডায় আরও যে-সব সাহিত্যিক বন্ধু ছিল তাদের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।) এরপর কিভাবে যে দু-বন্ধুর মধ্যে একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছিল! আমাদের দুজনেরই চরিত্র কি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল! জানি না।

সম্পর্কটা যখন এই রকম, হঠাৎ কলেজ স্ট্রিটে দেখা হল। মুগার সাতনরি ধাক্কা পাড়, কোঁচানো ধুতির কোঁচা সামলাতে সামলাতে এবং সিল্কের সার্টের কাঁধ রুমাল

দিয়ে মুহুতে মুহুতে যতখানি হন্তদন্ত হওয়া সম্ভব, সেভাবেই ছুটে এল বন্ধুটি। অর্থাৎ প্রাণতোষ।

হাতে ধরা দুটো ছাপা ফর্মা দেখিয়ে বললে, তোর বই। ডি এম থেকে নিয়ে এলাম।

শুনে প্রথমে অবাক। পর মুহুর্তেই ডি এম লাইব্রেরির গোপালবাবুর ওপর বেজায় চটে গেলাম। আমার বইয়ের ছাপা ফর্মা অন্যকে দেবেন কেন! অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একদিন ঠাট্টাছলে বলেছিলেন, গোপাল মজুমদার একমাত্র তোমাকেই ভয় পায়। একটু থেমে বলেছিলেন, তোমার রাগকে।

কথাটা মনে ছিল বলেই রাগ সামলে নিতে হল।

প্রাণতোষ পরক্ষণেই বলল, দারুণ! পড়ে ফেলেছি।

ফর্মা দুটো দেখিয়ে বলল, পরের সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক বের করব। মাসিক বসুমতীতে।

এমন ভাবে বলল, যেন অসম্মতি জানানো অসম্ভব।

অজুহাত হিসেবে বললাম, দু মাস পরেই বই বেরোবে, গোপালবাবু রাজি হবেন না।

ও হাসতে হাসতে বললে, গোপালবাবু রাজি।

সন্দেহভঞ্জনের জন্যে তখনই দুজনে চলে গেলাম ডি এম লাইব্রেরিতে।

প্রাণতোষের অলক্ষ্যে গোপালবাবুকে চোখ টিপে ইশারা করছি, 'না' বলাব জন্যে। বলছি, ধারাবাহিক ছাপতে এক বছর লেগে যাবে, কাগজ লাল হয়ে যাবে।

গোপালবাবু বলে বসলেন, কাগজ লাল হয়ে গেলে আবার ছেপে দেব।

কোনও উপায় না দেখে রাজি হতে হল। সেখান থেকেই প্রাণতোষ সোজা চলে গেল শিল্পী অন্নদা মুন্সীর বাড়ি, হেড পিস আঁকিয়ে নেবার জন্যে।

দশ মাস পরে 'লালবাঈ' ভূমিষ্ঠ হল। ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর। পনেরো দিনেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। আমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। এবং কোনও কোনও মহলে নিন্দিত। তবে যাঁরা নিন্দা করলেন তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল উচ্চরব প্রশংসার কাছে। যাঁরা নিন্দা করলেন, তাঁরা লেখক হিসেবে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন না। অবহিত হলেন। কারণ জনপ্রশস্তির চাপে পড়ে বইটি তাঁদের না পড়ে উপায় ছিল না।

এখন স্বীকার করি, প্রাণতোষ জোরজবরদস্তি করে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ না করলে এত দ্রুত বইটি জনপ্রিয়তা পেত না। আর বুঝতে পারি, গোপালবাবু মনেপ্রাণে আমার প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখতেন। নিছক লাভের হিসেব কষেননি।

'লালবাঈ'য়ের মত জনপ্রিয়তা আমার আর কোনও উপন্যাসই পায়নি। আমি রাতারাতি বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম। অথচ লেখার সময় আদৌ বুঝতে পারিনি, সংশয় ছিল প্রথম সংস্করণই বিক্রি হবে কিনা। বেশ কয়েক বছর ধরে বছরে তিন-চারটি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। ফলে, আমি লেখক হিসেবে সামনের সারিতে পৌঁছে গেলাম।

উপন্যাস রচনার একটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, কিন্তু তাকে পরিশ্রম মনে হয়নি। কারণ এই একটি বছর আমি একটি কল্পনার জগতে বাস করেছি।

অনেককাল আগে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যায় আমার সাহিত্যজীবন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আত্মকথা লিখতে বলা হয়েছিল। সেই প্রকাশিত রচনা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

> " 'দরবারী' দিয়েছিল পরিচিতি, 'প্রথম প্রহর' দিল প্রতিষ্ঠা, তারপর আরো একখানা উপন্যাস লিখে আমি কিভাবে রাতারাতি যেন বিখ্যাত হয়ে গেলাম। তার রহস্যটা দেখলাম সব সমালোচকের জানা হয়ে গেছে, জানি না শুধু আমি

নিজেই। আমার পরের উপন্যাস, আমার প্রথম এবং একমাত্র অতীতভ্রমণ 'লালবাঈ'-এর কথা বলছি। সঙ্গীতের নদীতে আমার সেই কল্পনার পাল তুলে ভেসে যাওয়া। মধ্য রাত্রির একটি গানের জলসায় বিমুগ্ধ হয়ে গেছি, কি এক নৈসর্গিক আনন্দে যেন মন ভরে গেছে। বিষ্ণুপুর ঘরানা নামটা তখন পর্যন্ত আমার কাছে অস্পষ্ট, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তারপর বহুদিন পর্যন্ত সেই গানের রেশ আমার শিরাউপশিরায় নেচে বেড়ালো। তখন তো উপন্যাস লেখার কথা আমার মনেও হয়নি। শুধু একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যেই বইয়ের পাতা উল্টে গেছি একটার পর একটা।

তারপর কিভাবে যেন লিখে গেছি, কেন লিখেছি তাও আমার কাছে স্বচ্ছ নয়।

কেন লিখেছি, কেন লিখেছি। আমি কি নিজেই জানি।

'আনন্দমঠ পড়েছিস? কপালকুণ্ডলা?' শৈশবে কে যেন তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল। ঐ তো আলমারির চাবিটা এগিয়ে দিচ্ছে তার বাবা। আলমারির নয়, কল্পনার। ঐ তো হিজলির বনজঙ্গল পার হয়ে আরো অনেকখানি এগিয়ে গেলেই সমুদ্র, নবকুমারকে সেখানে বনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।' নবকুমারের মতই একটি নারীকে সে ভালবেসে ফেলেছে—তার জীবনের প্রথম প্রেম, কপালকুণ্ডলাকে সে খুঁজছে, খুঁজছে। যৌবনসন্ধির দিনগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাস তার সহযাত্রী, রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' কিংবা 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। ঐ তো সেই ছেলেটির বাবা সংস্কৃত সাহিত্যের দরজা খুলে দিচ্ছেন তার সামনে, কালিদাসের কাব্য পড়ে শোনাচ্ছেন, আর ছেলেটি অবাক হয়ে বলছে, তুমি না বিজ্ঞান পড়েছিলে, মেডেল পেয়েছিলে? ছেলেটি হাসছে, হাসছে।

আমি তাই জানতাম, তাকে একদিন না একদিন কল্পনায় ডুব দিতে হবেই।

বাইরের প্রচণ্ড কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে আমি সেই কিশোর বালকটির একাকিত্বের ঘরে মুখোমুখি বসে ঠাট্টার সুরে বললাম, তুই তো সহজ সরল হতে চেয়েছিলি? তুই তো জীবনের কথা লিখতে চেয়েছিলি?

সে অভিমানের গাঢ় গলায় বললে, আমার বুকের মধ্যে অনেক রঙ জমা হয়ে গিয়েছিল। সহজ সরল কিছু লিখতে গেলেই নানা রঙ কানা উপচে বেরিয়ে এসে তাকে রঙিন করে তুলতো। তাই সব রঙ আমি ওর মধ্যে উজাড় করে দিলাম, সব অলঙ্কার আভরণ ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে আমি নিঃস্ব হাতে বেরিয়ে আসতে চেয়েছি।

নিঃস্ব হাতেই সে বেরিয়ে এলো। তখন থেকে সে মাটির রঙেই ছবি আঁকবে। মনের গভীরে ডুব দিয়ে মুখের ভাষায় কথা বলবে।"

আগেই জানিয়েছি 'লালবাঈ' ইতিহাস নয়, উপন্যাস। বিষ্ণুপুরের ভৌগোলিক চালচিত্রটিও দৃশ্যপট রচনার প্রয়োজনে কিছু কিছু বদলে দেওয়া হয়েছে। যদিও তার একটি মানচিত্র উপন্যাস লেখার সময় হাতের কাছেই রেখেছিলাম। যাঁরা ইতিহাস বা ভূগোল জানতে চান তাঁদের জন্য এ উপন্যাস লেখা হয়নি, তৎসত্ত্বেও 'লালবাঈ'য়ের কল্পনাতীত জনপ্রিয়তাই বিষ্ণুপুরকে টুরিস্ট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য করে। এ-খবর হয়তো অনেকেরই অজানা। তার চেয়েও একটি বড় খবর, বিষ্ণুপুর আমি আজও দেখি নাই। অর্থাৎ শুধুই কল্পনার চোখে দেখিয়াছি। এবং দেখাইয়াছি। বিষ্ণুপুর আজও আমার কাছে 'ইয়ারো আনভিজিটেড' রয়ে গেছে।

ধর্মযুগ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এ উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে হিন্দি ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষায়। তবে গর্বিত বোধ করেছিলাম সিন্ধি

ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায়। অনুবাদ করেছিলেন শ্রীমতী শোভা কৃপানি। শরৎচন্দ্র-পরবর্তী কালের কোনও বাংলা উপন্যাস সিন্ধি ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিনা জানা নেই।

চল্লিশ বছর বাদে সেদিনের অষ্টাদশী লালবাঈয়ের বয়েস যেহেতু এখন আটান্ন, এ কালের পাঠককে সে কতখানি আকর্ষণ করতে পারবে সে-বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। তবে তার কাছে আমি আজও কৃতজ্ঞ, কারণ লালবাঈ একই সঙ্গে আমাকে অভাবনীয় অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা এবং লোকপ্রিয়তা দিয়ে একদা আমাকে সামনের সারিতে পৌঁছে দিয়েছিল।

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৭। প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরি।

প্রচ্ছদ : সমীর সরকার।

ভূমিকাপত্রে : 'এ উপন্যাসে বর্ণিত হোটেলটি যদি কোন সত্যিকার হোটেলের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে সেই হোটেলের মালিককেও কেউ যেন হিমাদ্রিবাবু মনে না করেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও সকলেরই চেনাজানা, সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়।'

বিশাল মহানদীর তীরবর্তী ছোট্ট সুন্দর কটক শহর ছিল ওড়িশার রাজধানী। যে-শহরকে প্রায় সকলেই উপেক্ষা করে চলে যেত পুরী এবং ভুবনেশ্বর। স্বাধীনতার পর রাজধানী স্থানান্তরিত হল ভুবনেশ্বরে, গড়ে উঠতে শুরু করল একটি নতুন শহর। কিন্তু ভুবনেশ্বরের একটা আকর্ষণ ছিলই। শিশুপালগড় তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নন্দনকানন ছিল না, ছিল না বড় বড় হোটেল, কিন্তু আকর্ষণ ছিল উদয়গিরি-খণ্ডগিরি এবং তিনচারটি প্রধান মন্দিরের। ফার্গুসন এখানে পাঁচশোটি ছোটবড় মন্দিরের হিসেব দিয়েছিলেন। শৈশবে কৈশোরে বহুবার গিয়েছি ওখানে, স্বচক্ষে ভগ্নপ্রায় মন্দির দেখেছি তিরিশ-চল্লিশটি! সেগুলিও এখন লুপ্ত। ভাবগম্ভীর লিঙ্গরাজ ও তৎসংলগ্ন আরও দুটি মন্দির এবং উদয়গিরি-খণ্ডগিরি সেকালে যত না ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণ করত, তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল দুধকুণ্ডের সর্বরোগহর জলের। বিশেষ করে ঔদরিক ও আন্ত্রিক রোগের ওষুধপত্তরও তখন আবিষ্কৃত হয়নি, ফলে ওই দুধকুণ্ডের জলের লোভে চেঞ্জারের ভিড় হত। মাছ-দুধ-শাকসবজি সস্তা পেয়ে তাবা 'ড্যামন চিপ' বলে উঠত বলেই তাদের নামই ড্যাঞ্চিবাবু। রাঁচিতেও ছিল ওই নাম। কারা চালু করেছিল কে জানে। এই চেঞ্জারদলের চাহিদায় ভুবনেশ্বরে দু-একটি সুলভ হোটেল দেখা দেয়, এবং চেঞ্জার আকর্ষণ করার জন্যে কোনও কোনওটির নামের শেষে হোটেল অ্যান্ড স্যানাটোরিয়াম শব্দত্রয়ী যোগ করে দেওয়া হত।

ভুবনেশ্বর যখন সদ্য ক্যাপিটেল শহর হিসেবে গড়ে উঠছে, সেই সময়ে পুরনো শহরের এ-জাতীয় একটি হোটেলে সস্ত্রীক সকন্যা দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম পুরী য'ওয়ার পথে। ফিরে এসেই লিখে ফেলি এই উপন্যাস।

যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম তার সঙ্গে এই উপন্যাসের কোনও সম্পর্কই নেই। বড় হোটেল নিয়ে উপন্যাস ছিল ভিকি বমের 'গ্র্যান্ড হোটেল'। ('চৌরঙ্গী' অবশ্য অনেক পরে লেখা)। হঠাৎ তাই খেয়াল হল ধর্মশালা টাইপের এই রকম একটা ছোট হোটেল নিয়ে লিখলে কেমন হয়, যে-হোটেল জেগে ওঠে শীতের পাখির মত শুধু শীতকালে, এবং শীত ফুরোলেই মৃতপ্রায়, নিঃশব্দ। কারণ তখন আর চেঞ্জারের ভিড় দেখা দেয় না।

লিখতে গিয়ে দুটি কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলাম। এক—কোনও সম্পূর্ণ গল্প বানাব